

মীলাদুন্নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
উদযাপনের শরঈ বৈধতা

মীলাদুন্নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
উদযাপনের শরঈ বৈধতা

মূল

শাইখ ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী

অনুবাদ ও প্রকাশনায়

কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

মীলাদুন্নবী

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদযাপনের শরঈ বৈধতা
শাইখ ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী

অনুবাদ ও প্রকাশনায়
কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

শরঈ সম্পাদনা

মওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন
মওলানা মীর মুহাম্মদ খাইরউল্লাহ

পরিবেশনায়

চৈত্রি

১৪, টিকাপাড়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

ফোন : ০১৯১৪১২০৬৬৮, ০১৬৩৭-৫৬০৫৫৩

প্রকাশকাল

মূল্য

প্রারম্ভিক কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

শায়খ ড: মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী সাহেব বর্তমানে জগদ্বিখ্যাত একজন আলেম। তাঁর সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার সুযোগ আমার নেই। তিনি অসংখ্য গ্রন্থপ্রণেতা, যার মধ্যে ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-বিষয়ক এই বইখানি অন্যতম। এটা এতদসংক্রান্ত বিষয়ে এ যাবতকালের অন্যতম সেরা বই। বিশেষ করে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি বিষয়গুলোও এতে আলোচনা করা হয়েছে। সর্ব-জনাব মুহাম্মদ ইমরান সুলাইমান ও ওয়াহ্বাস আহমদ আমীন কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত এবং মিনহাজুল কুরআন ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রকাশিত প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার এ বইটির বাংলা অনুবাদকর্ম আমি সম্পন্ন করেছি। বইটির কোথাও কোথাও শাইখ তাহিরুল কাদেরী সাহেব তাঁর জন্মভূমি পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন। তবে এই দৃশ্য ভারত, বাংলাদেশ ও অপরাপর দেশের মুসলমান কমিউনিটিগুলোতেও বিরাজমান। অবশ্য বর্তমানে শাইখ তাহিরুল কাদেরী সাহেব কানাডার বাসিন্দা।

গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে শরঈ সম্পাদনা করেছেন দ্বীনীভাই সর্ব-মওলানা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন ও মীর মুহাম্মদ খাইরুল্লাহ। আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জয়নাব প্রেসের মালিক মওলানা ফিরোজ

আলমভাই এবং স্টাফ মেহদীভাইয়ের প্রতিও জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। মূল বইটি বিদেশ থেকে আনিতে দেয়ার জন্যে সাঞ্জেরী পাবলিকেশনের মালিক মওলানা আবু তৈয়্যব চৌধুরীভাইকেও জ্ঞাপন করছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। উল্লেখ্য যে আল-কুরআনের উদ্ধৃতিগুলো শাইখের কৃত “ইরফানুল কুরআন” গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ থেকে নেয়া হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর অসীলায় এবং আমার পীর ও মুশীদ সৈয়দ মওলানা এ, জেড, এম, সেহাবউদ্দীন খালেদ সাহেব কেবলা (রহমতুল্লাহি আলাইহি)’এর নেক-নজরে অনুবাদটি নসীব করায় মহান প্রভুর দরবারে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আমীন।

- কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন
প্রকাশক ও অনুবাদক

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদযাপনের শরঈ বৈধতা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَاكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

—বলে দিন, ‘(এ সবকিছু) আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর রহমতের কারণে (যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে)। কাজেই মুসলমানদের উচিত এতে আনন্দ উদযাপন করা। তা (সমস্ত ধন-সম্পদ) থেকে উৎকৃষ্টতর যা তারা জমা করে রাখে।’^১

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শরীফ

أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَيُشْرَى عَيْسَى وَرَأَتْ أُتَيَّ أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهَا قُصُورُ الشَّامِ.

—আমি হলাম আমার পূর্বপুরুষ (পয়গম্বর) ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর দোয়া এবং পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর প্রদত্ত শুভসংবাদ। (আমার ধরাধামে শুভাগমনের সময়) আমার মা তাঁর (পবিত্র দেহ মোবারক) হতে নূর (তথা আলো/জ্যোতি) প্রত্যক্ষ করেন যা শাম-দেশের অর্থাৎ সিরিয়ার প্রাসাদগুলো আলোকিত করে।^২

১. আল কুরআন: সূরা ইউনুস, ১০:৫৮।

২. আহমদ ইবনে হাম্বল: আল মুসনাদ, বাবু হাদীসী আবু উমামা বাহেলী, ৪৫:২২৬, হাদীস নং: ২১২৩১; তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ৭:১৯২; বায়হাকী : দালায়েলুন নরুয়্যাত, বাবু দাওয়াতি আবী ইবরাহীম, ১:২৩, হাদীস নং : ১৬।

মুখবন্ধ

পয়গম্বর আলাইহিমুস সালামবৃন্দের মাঝে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহাসিক বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমন উপলক্ষে খুশি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভিব্যক্তিই হচ্ছে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদযাপন। এটা এমনই এক প্রশংসনীয় আমল (ধর্মীয় অনুশীলন), যা দ্বারা এমন কি আবু লাহাবের মতো একজন কাফেরও উপকার পেয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করায় আবু লাহাবের মতো কট্টরপন্থী কাফেরের শাস্তি যদি প্রতি সোমবার লাঘব করা হয়, তাহলে সেই (মু'মিন) মুসলমানের ক্ষেত্রে কী পুরস্কার বরাদ্দ রয়েছে যিনি সারা জীবন এই দিনটি উদযাপন করে আসছেন?

সৃষ্টির সেরা খোদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই নিজের বেলাদত দিবস সোমবারকে সম্মান করতেন। (আল্লাহর প্রতি) শুকরিয়া জানানোর উদ্দেশ্যে তিনি এই দিনটিতে রোযা রাখতেন। কেননা এই দিনেই তিনি পৃথিবীবাসীর কাছে পরিচিত হয়েছিলেন। এ কাজ করে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের খোদায়ী আদেশই পালন করেছিলেন মাত্র, যেহেতু তাঁর সম্মানিত অস্তিত্বের উপলক্ষেই বিশ্বজগতের সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছিল।

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদযাপন, তাতে অংশগ্রহণকারীদের অন্তরে মহাসম্মানিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে উৎসাহ যোগায়, যা অন্তরে (তাঁর সান্নিধ্য লাভের) আকাঙ্ক্ষার অনুভূতি জাগ্রত করে। শরীয়ত অনুযায়ী তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠের আমলটি ব্যাপক সওয়াবের উৎস, আর তাই উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মীলাদ'কে উপকারী আমল হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

মীলাদের সমাবেশগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাহ (জীবনী) মোবারকের গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত ও তাঁর প্রতি ভালোবাসা নতুন করে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ কারণেই মীলাদের মাহফিলে অন্তর্ভুক্ত থাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের অনুকরণীয় আদর্শ, তাঁরই গুণাবলী, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মো'জেয়াসমূহের তথ্যকোষ (স্মরণার্থে আলোচনা) এবং বর্ণনা। মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ও সান্নিধ্য অর্জন এবং প্রত্যেক মু'মিন-মুসলমানের কাছে সবচেয়ে সম্মানিত সত্তা তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁদের আত্মিক সম্পর্কের বন্ধন সুদৃঢ়করণ। এটা আপনাপনি-ই শরীয়তের মূল লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করে। তাঁর গুণাবলী ও পূর্ণতাকে স্বীকার করলে কারো অন্তরে সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাতের প্রতি ঈমান মজবুত হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্মান প্রদর্শন হচ্ছে ঈমানের সর্বপ্রথম মৌলিক প্রয়োজনীয় শর্ত।

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে প্রকাশিত খুশি, (আল্লাহর) যিকিরের মাহফিল অনুষ্ঠান ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে না'ত-কসীদা-সেমা' আবৃত্তি, এর পাশাপাশি মানুষের মাঝে খাবার পরিবেশন, এসব-ই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি পদ্ধতি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমাদের মাঝে প্রেরণ করে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁরই অশেষ, অফুরন্ত রহমত-বরকত-নেয়ামত (মানে আশীর্বাদ) লাভে হৃদয় করেছেন; আর তাই তিনি আমাদের এই সর্বাধিক সেরা পুরস্কারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা যেমন রমযান মাসকে কুরআন নাযেলের কারণে অন্যান্য মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করেছেন, ঠিক তেমনি রবিউল আউয়াল মাসটিও আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে এ মর্মে যে এই মাসে কুরআন মজীদ যিনি আমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন, সেই মহান সত্তা এই ধরাধামে শুভাগমন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদধন্য বেলাদত দ্বারাই এই মাসটি অন্যান্য সব মাসের চেয়ে অধিকতর পুণ্যময় হয়েছে।

বস্তুত যে রাতে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত হয়, সেটা লাইলাতুল কুদরের রাতের চেয়েও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। লাইলাতুল কুদরে সর্বপ্রথম আল-কুরআন ও ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। কিন্তু হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাঁর অন্তরে আল-কুরআন নাযেল হয়, তিনি না হলে আমরা কোনো ঐশী শাস্ত্রলিপি পেতাম না, লাইলাতুল কুদর-ও পেতাম না, কিংবা খোদা দ্বীন ইসলাম-ও পেতাম না। এসব নেয়ামত হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমেই কেবল অর্জিত হয়েছে। অতএব, তাঁর বেলাদতের রাতটি লাইলাতুল কুদরের রাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতির প্রতি তাঁর অগণিত ও সীমাহীন রহমত-বরকত ও নেয়ামত দান করেছেন। এসব আশীর্বাদ অসংখ্য এবং এগুলো চিরকাল বর্ধিত হতে থাকবে। প্রতিটি নেয়ামত অপর যে-কোনো নেয়ামতের মতোই বড়। এতদসত্ত্বেও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা নিজের আশীর্বাদগুলো সম্পর্কে গর্ব করেন না। তিনি আমাদের স্বাদগ্রহণের জন্যে আহ্বারের এক বিশাল তালিকা মঞ্জুর করেছেন, কিন্তু তিনি তাঁর এই দান স্মরণ করেন না। তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের পানীয় দ্রব্য দ্বারা সতেজ রেখেছেন, কিন্তু নিজের এই দান সম্পর্কে কোনো গর্ব তিনি করেন না। রাত ও দিনের আবর্তমান চক্রের সুবাদে আমাদের সময় সুনিয়ন্ত্রিত হওয়ার দরুন আমরা বিশ্রাম নিতে পারি এবং জীবনের নানা চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হই; আসমান, জমিন ও দরিয়া, এসব কিছুকেই আমাদের অধীনস্থ করে দেয়া হয়েছে; আমাদেরকে ‘আশরাফুল মাখলুকাত’ তথা আল্লাহ তা‘আলার সেরা সৃষ্টি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে এবং সম্মান ও মর্যাদা-ও মঞ্জুর করা হয়েছে, কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা তাঁর এসব দান স্মরণ করেন না। আমাদেরকে পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা আশীর্বাদধন্য করা হয়েছে; এই বিশ্বজগতের বিশাল ও বিস্তৃত প্রান্তসীমা হতে আরম্ভ করে আমাদের অন্তর্নিহিত সত্তার গভীরে এমন নেয়ামত আমাদের প্রতি মঞ্জুর করা হয়েছে, যা আমাদের মস্তিষ্কের উপলব্ধিও অতীত; অথচ বিশ্বজগতের রব (রাব্বুল ‘আলামীন) হওয়া সত্ত্বেও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা তাঁর এ অনুগ্রহ ও আশীর্বাদের গর্ব করেন না। তবে বিশ্বমানবতার জন্যে এমন এক আশীর্বাদ আল্লাহ পাক

মঞ্জুর করেছেন, যাঁর খাতিরে তিনি প্রকাশ্য ও স্পষ্টভাবে নিজের করুণা, আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করেন। তিনি ঈমানদার মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে সচেতন করেছেন এই বলে:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ.

—নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুসলমানদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্য থেকে (মহিমার অধিকারী) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামকে) প্রেরণ করেছেন।^৩

দ্বীন-ইসলামে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি তাঁরই প্রদত্ত আশীর্বাদের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দাসত্ব ও বন্দেগীর একটি নিদর্শন। এর যৌক্তিকতা আল-কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে—

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

—যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করো তবে আমি অবশ্যই তোমাদের উপর (অনুগ্রহ) বর্ধিত করবো আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠিন।^৪

এই আয়াতটির ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ তা‘আলার নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ফলশ্রুতিতে আরো অতিরিক্ত আশীর্বাদ লাভ সম্ভব হয়। খোদায়ী নেয়ামতের প্রতি শুকরিয়া আদায় করাটা এই উম্মতের জন্যে খাস বা সুনির্দিষ্ট নয়, বরং এটা পূর্ববর্তী উম্মাতগুলোর প্রতিও আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বনু ইসরাঈল (ইহুদী) সম্প্রদায় যে আশীর্বাদের কারণে অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর উপরে আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিল এবং ফেরাউনের জুলুম-অত্যাচার হতে মুক্তি পেয়েছিল, তা সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে:

وَإِذْ جَعَلْنَاكَ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ.

৩. আল কুরআন: সূরা আলে ইমরান, ৩:১৬৪।

৪. আল কুরআন: সূরা ইবরাহীম, ১৪:৭।

—আর (স্মরণ করো সে সময়ের কথা) যখন আমরা তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ফেরাউনের সম্প্রদায় থেকে যারা তোমাদেরকে দুঃসহ কঠিন শাস্তি দিত।^৫

এই আয়াতে করীমার ব্যাখ্যা এই যে, দাসত্ব থেকে মুক্তি এমনই এক মহা নেয়ামত যার দরুন এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা পরবর্তী প্রজন্মগুলোর জন্যেও অত্যাবশ্যক হয়। এর থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়, কোনো জাতির মুক্তি অর্জন আল্লাহ তা‘আলারই দানকৃত একটা উপহার, যেটার শোকর-গুজারী করা বাধ্যতামূলক। এই আয়াতটি সাক্ষ্য দেয় এ বাস্তবতার যে, সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে খোদায়ী নেয়ামতের মূল্যায়ন ও খুশি উদযাপন করা জরুরি, যাতে পরবর্তী প্রজন্মগুলো এই আশীর্বাদের মূল্য অনুধাবন করতে পারে এবং এর গুরুত্ব-ও উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

মানুষ সাধারণতঃ সারা বছরই আল্লাহ তা‘আলার আশীর্বাদগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে; তবুও সময়ের পরিক্রমণে সমগ্র উম্মাহর নিকট আল্লাহর মঞ্জুরিকৃত কোনো তাৎপর্যপূর্ণ দিন আগমন করলে এর খুশির বহিঃপ্রকাশ আপনাআপনি সামষ্টিক উদযাপনে রূপ নেয়। কুরআন মজীদে বর্ণিত আছে যে, বনু ইসরাঈল বংশকে ফেরাউনের অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে মুক্ত করার পর এবং নীল-নদের স্রোত পার হয়ে নিরাপদে সিনাই উপত্যকায় তাদের প্রবেশের পর তারা মারাত্মক গরম আবহাওয়া ও খরা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, যার দরুন তাদেরকে ছায়া দেয়ার জন্যে মেঘ পাঠানো হয়। এটা এমন-ই এক আশীর্বাদ ছিল যে আল-কুরআনে এ সম্পর্কে বিবৃত হয়:

وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ.

—আর (স্মরণ করো) যখন আমরা তোমাদের উপর (তিহা উপত্যকায়) মেঘের ছায়া সন্নিবেশ করলাম এবং তোমাদের নিকট ‘মান্না’ এবং ‘সালওয়া’ প্রেরণ করলাম।^৬

৫. আল কুরআন: সূরা বাকারা, ২:৪৯।

৬. আল কুরআন: সূরা বাকারা, ২:৫৭।

কুরআন পাকের অনেক জায়গায় সুনির্দিষ্ট রহমত-বরকত সম্পর্কে উল্লেখ করার সময় (রহমত বর্ষণের) ওইসব দিনের স্মরণার্থে খুশি উদযাপন করার বিধান আল্লাহ তা‘আলা জারি করেছেন। পয়গম্বর আলাইহিস্ সালাম-মণ্ডলীর অনুশীলিত রীতিও ছিল এটাই। পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর উম্মতের জন্যে আসমানী খাদ্য-খাঞ্চ প্রার্থনাকালে আরয করেন এভাবে:

رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ.

—হে প্রতিপালক! আমাদের জন্যে আসমান থেকে (নিয়ামতের) দস্তরখানা অবতীর্ণ করো, যা (অবতীর্ণ হওয়ার দিন) আমাদের জন্যে হবে ঈদ-উৎসব, আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্যে(ও) এবং আমাদের পরবর্তীদের জন্যে(ও); আর (এ দস্তরখানা) হবে তোমার পক্ষ থেকে নিদর্শন।^৭

পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর বাস্তব উদাহরণের আলোকে কুরআন মজীদে এই আয়াতটিতে আমাদের সামনে একটি স্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে এই মর্মে যে, খোদায়ী নেয়ামত (মানে ঐশী আশীর্বাদ) যে দিনে অবতীর্ণ হয় সেদিনটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিবস হিসেবে উদযাপিত হওয়া উচিত। আয়াতটি আরো ইঙ্গিত করে যে-কোনো নির্দিষ্ট আশীর্বাদপ্রাপ্তি উপলক্ষে খুশি প্রকাশ শুধু সেসব মানুষ-ই করে থাকেন, যাঁরা ওই আশীর্বাদ যে পয়গম্বর আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি মঞ্জুর হয়েছে তাঁর সাথে (আত্মিকভাবে) সংশ্লিষ্ট।

আল্লাহ তা‘আলার নেয়ামতপ্রাপ্তির প্রতি খুশি প্রকাশের পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি সাধারণ পদ্ধতি হলো, অন্য সবার সামনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলার আশীর্বাদগুলোর বর্ণনা প্রদান করা। তাঁর প্রতি এভাবে গুরুত্ব জ্ঞানো কুরআন মজীদ হতেও প্রমাণিত, যেমনটি এরশাদ হয়েছে:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.

৭. আল কুরআন: সূরা মায়েদা, ৫:১১৪।

–আর আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহের আলোচনা করুন (উত্তমরূপে)।^৮

প্রথমে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলার দানকৃত নেয়ামত ও আশীর্বাদ স্মরণের ব্যাপারে আজ্ঞা জারি হয়, যেক্ষেত্রে ওই আশীর্বাদকে অন্তর ও জিহ্বা দ্বারা স্মরণ করা চাই; কিন্তু এই স্মরণ অন্য কারো জন্যে নয়, কেবল সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলারই জন্যে নির্দিষ্ট। অতঃপর এই আশীর্বাদটি উল্লেখ করার বিধান দেয়া হয়েছে, যার দরুন কেউ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে এই আশীর্বাদ সম্পর্কে প্রকাশ্যে উল্লেখ করেন এমনভাবে যাতে এর তাৎপর্য মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, এই স্মরণ (যিকর) একদিকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলার সাথে সংশ্লিষ্ট, অপরদিকে তা উল্লেখ করা (তায়কেরা) সৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট, যাতে অনেক মানুষ এই স্মরণ করার কাজে ব্যাপৃত হতে পারে। কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ.

–সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণে রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করো, আর কখনো আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না।^৯

আরেক কথায়, তোমরা আমার নেয়ামতগুলো (ব্যক্তি পর্যায়ে) স্মরণ করো না, বরঞ্চ এমন কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক পরিবেশে তা উল্লেখ করো যাতে মানুষেরাও তা শোনতে পায় এবং জানতে পারে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি বাড়তি পছা হচ্ছে ঈদের মতো খুশি উদযাপন করা। পূর্ববর্তী উম্মতগুলো যেদিনটিতে কোনো বিশেষ নেয়ামত লাভ করতেন, সেদিনটি তারা ঈদ হিসেবে উদযাপন করতেন। কুরআন মজীদ হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর দোয়া সম্পর্কে বর্ণনা দেয় এভাবে:

رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا.

৮. আল কুরআন: সূরা হোহা, ৯৩:১১।

৯. আল কুরআন: সূরা বাকারা, ২:১৫২।

–হে প্রতিপালক! আমাদের জন্যে আসমান থেকে (নিয়ামতের) দস্তরখানা অবতীর্ণ করো, যা (অবতীর্ণ হওয়ার দিন) আমাদের জন্যে হবে ঈদ-উৎসব, আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্যে(ও) এবং আমাদের পরবর্তীদের জন্যে(ও)।^{১০}

এ আয়াতে খাদ্য-খাঞ্চর মতো একটি অস্থায়ী আশীর্বাদ লাভকে ঈদের দিন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এমন কি আজো খৃষ্টান সম্প্রদায় রোববারকে অশীর্বাদপ্রাপ্তির দিন হিসেবে পালন করে থাকে। খাদ্য-খাঞ্চ প্রেরণের আশীর্বাদ কি কোনো পয়গম্বর প্রেরণের নেয়ামতের সমতুল্য? ওই ধরনের অগণিত আশীর্বাদ-ই তো আমাদের মহাসম্মানিত হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতিরে বিসর্জন দেয়া যেতে পারে।

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَنَسًا مِنَ الْيَهُودِ قَالُوا لَوْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا فَقَالَ عُمَرُ أَيُّهُ فَقَالُوا [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا] فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ مَكَانٍ أَنْزِلَتْ، أَنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ.

–জৈনক ইহুদী একবার হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেন যে, আল-কুরআনের [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ] –আজ তোমাদের ধীন (ধর্ম)কে তোমাদেরই জন্যে পূর্ণ করলাম] আয়াতটি যদি তৌরাতে প্রকাশিত হতো, তাহলে ইহুদী সম্প্রদায় ওই দিনটিকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করতো। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কথার উত্তরে বলেন যে, আয়াতটি কোন্ দিনে এবং কোথায় অবতীর্ণ হয়েছিল তা তাঁর স্মরণে

১০. আল কুরআন: সূরা মায়দা, ৫:১১৪।

আছে: সেটা ছিল আরাফাতের ময়দানে হজ্জের দিন, অধিকন্তু শুক্রবার (উভয় দিন-ই ঈদস্বরূপ)।^{১১}

একটি প্রশ্ন: যদি ধর্মকে পূর্ণতাদানের বাণী বহনকারী আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হওয়ার দিনটি ঈদ হিসেবে গণ্য হতে পারে, তাহলে মানবতার চূড়ান্ত কল্যাণকারী যেদিন ধরাধামে শুভাগমন করেন সেদিনটি কেন ঈদ হিসেবে পরিগণিত হবে না? এই জিজ্ঞাসা শুক্রবার দিনের মর্যাদাময় বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চিন্তার খোরাকও যোগায়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শরীফেও উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমন দিবস উদযাপন উপলক্ষে ছাগল কুরবানী করতেন এবং এর গোস্ত অতিথিদের মাঝে বিতরণ করতেন। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতানুযায়ী, নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুওয়্যত ঘোষণার পর আকীকা (নবজাতক শিশুর জন্যে কৃত পশু কুরবানী) পালন করেন। ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ুতী (৮৪৯-৯১১ হিজরী সাল) এই রেওয়য়াতটিকে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে প্রদর্শন করে যুক্তির অবতারণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা আবদুল মুত্তালিব হযূরে পাকের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেলাদতের সপ্তম দিনে তাঁর আকীকা পালন করেছিলেন, আর আকীকা জীবনে একবার পালন করাই আবশ্যিক। অতএব, এটা স্পষ্ট যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলটি আকীকা ছিল না, বরঞ্চ তা ছিল আতিথেয়তা, যা তিনি তাঁরই বেলাদতের স্মরণে পালন করেছিলেন। [এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো খোদায়ী আশীর্বাদ কল্পনা করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। এ উপলক্ষে যে স্পষ্ট আনন্দ ও সুখানুভূতি ব্যক্ত হয়েছে, তা ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ হতে জানা

যায়। নবুওয়্যতের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যবিষয়ক বইপত্রে এমন প্রচুর উদাহরণ বিদ্যমান, যেখানে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমন উপলক্ষে আনন্দ ও সুখ অনুভব করেন।

যে বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদত শরীফ (মানে ধরাধামে শুভাগমন) হয়, সেই পুরোটা বছর জুড়ে অনেক আশ্চর্যজনক ও ব্যাখ্যার অতীত বাস্তব ঘটনাবলী দেখা যায়। ওই আশীর্বাদধন্য (বেলাদতের) সময়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলার বর্ষিত বিশেষ রহমত তথা করুণা, যার জন্যে সমগ্র বিশ্বজগৎ অধীর আগ্রহে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ অপেক্ষারত ছিল, অবশেষে যখন সেই নির্ধারিত শুভমুহূর্ত উপস্থিত হলো তখন বিশ্বজগতের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা এই ধরণীর বুকে প্রকাশ করলেন তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যমণিকে; আর তিনি (মহান রব) এমন নূর (জ্যোতি) বিচ্ছুরণের প্রদর্শনী দিলেন যে, পূর্ব হতে পশ্চিম দিগন্ত অবধি আলোয় আলোকিত হলো।

হযরত উসমান বিন আবি আল-আস্ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন যে, তাঁর মা তাঁকে জানিয়েছিলেন:

شَهِدْتُ أَمِنَةً لَّمَّا وَلَدَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَرَبَهَا الْمَخَاضُ نَظَرْتُ إِلَى التُّجُومِ تَدَلَّى، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ لَتَقَعَنَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا وَلَدَتْ، خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهُ الْبَيْتُ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ وَالْدَّارُ، فَمَا شَيْءٌ أَنْظَرُ إِلَيْهِ، إِلَّا نُورٌ.

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদতের সময় আমি (মা) আমিনা’র কাছে উপস্থিত ছিলাম। ওই মুহূর্তে আমি দেখতে পেলাম তারকারাজি এতো কাছে চলে এসেছে যে (মনে হলো) সেগুলো বুঝি আমার উপরই পতিত হবে। অতঃপর হযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত শরীফ হলে (মা) আমিনা হতে এমন এক জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়, যার দরশন আমরা যে ঘরে ছিলাম সেটা এবং আশপাশের

১১. সহীহ আল-বুখারী: কিতাবুল ঈমান, ‘ঈমানের বৃদ্ধি ও হাস’ অধ্যায়, ১:২৫ #৪৫; সহীহ মুসলিম: কিতাব আত-তাফসীর, ৪:২৩১৩ #৩০১৭; জামিউত্ তিরমিযী: আবওয়াব তাফসীর আল-কুরআন (কুরআন তাফসীরের অধ্যায়গুলো), অধ্যায়: ‘আল কুরআন: সূরা আল-মা‘য়েদা’, ৫:২৫০ #৩০৪৩; আল-নাসাঈ রচিত আল-সুনান: কিতাব আল-ঈমান, ‘ঈমানের হাস-বৃদ্ধি’ অধ্যায়, ৮:১১৪ #৫০১২

এলাকা আলোকিত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আমি তাকিয়ে ওই নূর ছাড়া আর অন্য কোনো কিছুই দেখতে পাইনি।^{১২}

আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেন,

يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَا كَانَ أَوَّلُ بَدْءِ أَمْرِكَ؟ قَالَ: دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَنُشْرَى عَيْسَى وَرَأَتْ أُمِّي أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهَا قُصُورُ الشَّامِ.

-এয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার বিষয়টির আরম্ভ কীভাবে? হযূরে পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, আমি হলাম আমার (আদি)-পিতা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর দোয়া বা প্রার্থনার (জবাব) এবং হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর প্রদত্ত খোশ-খবরী (শুভসংবাদ)। (আমার বেলাদতের সময়) আমার মা (আমিনা) তাঁর (পবিত্র শরীর) থেকে নূরের বিচ্ছুরণ প্রত্যক্ষ করেন, যা সিরিয়া-রাজ্যের প্রাসাদগুলোকে আলোকিত করে।^{১৩}

১২. ইমাম মুহাম্মদ শায়বানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক নিজ ‘আল-আহাদ ওয়াল-মাসানী’ গ্রন্থে বর্ণিত, ৬:২৯ #৩২১০ (উম্মে উসমান বিন আবি আল-‘আস হতে গৃহীত); আত্ তাবারানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত ‘আল-মু’জাম আল-কবীর’, ২৫:১৪৭ ও ১৮৬, #৩৫৫ ও ৪৫৭; আল-মাওয়াদী প্রণীত ‘আলম আল-নবুওয়্যা’, ২৪৭ পৃষ্ঠা; আত্ তাবারী রচিত ‘তারিখ আল-উমাম ওয়াল-মুলুক’, ১:৪৫৪; আল-বায়হাকী লিখিত ‘দালায়েল আল-নবুওয়্যা ওয়াল-মা’রিফা আহওয়াল সাহিব আল-শরী’আ’, ১:১১১; আবু নু’য়ইম কৃত ‘দালায়েল আল-নবুওয়্যা’, ১৩৫ পৃষ্ঠা, #৭৬; ইবনে আল-জাওযী প্রণীত ‘আল-মুতায়াম ফী তারিখ আল-উমাম ওয়াল-মুলুক’, ২:২৪৭; ইবনে আসাকির রচিত ‘তারিখ দিমাশক আল-কবীর’, ৩:৭৯ ও ‘আল-সীরাহ আল-নববীয়া’, ৩:৪৬; ইবনে কাসীর লিখিত ‘আল-বেদায়া ওয়াল-নেহায়া’, ২:২৬৪; আল-হায়সামী প্রণীত ‘মজমাউল যাওয়াঈদ ওয়া মানবা’ আল-ফাওয়াঈদ’, ৮:২২০; ইবনে রাজাব হাম্বলী কৃত ‘লাতা’ইফ আল-মা’আরিফ ফীমা লি-মাওয়াসিম আল-‘আম মিন আল-ওয়ায়া’ইফ, ১৭৩ পৃষ্ঠা; আল-আসকালানী রচিত ‘ফাতহুল বারী’, ৬:৫৮৩।

১৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল কর্তৃক নিজ ‘আল-মুসনাদ’ গ্রন্থে বর্ণিত, ৫:২৬২ #২২৩১৫; ইবনে হিব্বান তাঁর ‘আল-সহীহ’, ১৪:৩১৩ #৬৪০৪ গ্রন্থে এসব কথার আলাদা একটি এসনাদ-সহ আরো দীর্ঘ একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেন; আল-বুখারীও নিজস্ব ‘আল-তারিখ আল-কবীর’, ৫:৩৪২ #৭৮০৭/১৭৩৬ পৃষ্ঠকে ভিন্ন এসনাদ-সহ আরো দীর্ঘ একটি রেওয়ায়াত লিপিবদ্ধ করেন; ইমাম বুখারী নিজস্ব ‘আল-তারিখ আল-আওয়াত’, ১:১৩ #৩৩ বইয়ে পৃথক এসনাদ-সহ আরো দীর্ঘ একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেন; ইবনে

মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর প্রিয় পুত্রের বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনের সাথে সম্পর্কিত (অলৌকিক) ঘটনাবলীর ব্যাপারে বলেন:

لَمَّا فَصَلَ مِثِّي خَرَجَ مَعَهُ نُورٌ أَضَاءَ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ.

-সৃষ্টিকুল শিরোমণি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত হলে তাঁর সাথে একটি নূর (জ্যোতি) এমনভাবে বিচ্ছুরিত হয়, যার দরুন পূর্ব হতে পশ্চিমে যা কিছু ছিল সবই আলোকিত হয়ে যায়।^{১৪}

অন্য এক রেওয়ায়াতে (বিবরণে) মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের জিসম মোবারক হতে এমন এক নূর বিচ্ছুরণের কথা উল্লেখ করেন, যার দরুন তিনি শাম দেশের বসরায় (বর্তমান ইরাকে) অবস্থিত প্রাসাদগুলো ও

আবি উসামা রচিত ‘আল-মুসনাদ’, ২:৮৬৭ #৯২৭; আল-কায়ানী কৃত ‘আল-মুসনাদ’, ২:২০৯ #১২৬৭; ইবনে আল-জা’দ প্রণীত ‘আল-মুসনাদ’, ৪৯২ #৩৪২৮; আল-তায়ালিসী লিখিত ‘আল-মুসনাদ, ১৫৫ #১১৪০; আল-তারানী রচিত ‘আল-মু’জাম আল-কবীর’, ৮:১৭৫ #৭৭২৯; আল-তাবারানী কৃত ‘মুসনাদ আল-শা’মিয়ীন’ ২:৪০২ #১৫৮২; আল-দায়লামী প্রণীত ‘আল-ফেরদাউস বি-মা’সউর আল-খিতাব’, ১:৪৬ #১১৩; আল-লালকান্দি লিখিত ‘এ’তেক্বাদ আহল আল-সুন্নাহ ওয়াল-জামা’আ’, ১:৪২২-৩ #১৪০৪; আবু নুয়ইম রচিত ‘হিলইয়া আল-আউলিয়া ওয়া তাবাক্বাত আল-আসফিয়া’, ৬:৯০; ইবনে আল-জাওযী কৃত ‘আল-মুনতায়াম ফী তারিখ আল-মুলুক ওয়াল-উমাম’, ২:২৪৮; ইবনে আসাকির প্রণীত ‘আল-সীরাহ আল-নববীয়া’, ১:১২৭; ইবনে কাসীর লিখিত ‘আল-বেদায়া ওয়াল-নেহায়া’, ২:২৭৫, ৩০৬ ও ৩২২; আল-হায়সামী তাঁর রচিত ‘মজমা’ আল-যাওয়াঈদ ওয়া মানবা’ আল-ফাওয়াঈদ’, ৮:২২২ গ্রন্থে বলেন যে ইমাম আহমদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এটা হাসান (সহীহ) তথা নির্ভরযোগ্য সনদ-সহ বর্ণনা করেছেন; ইমাম সুয়ূতী কৃত ‘কেফায়াত আল-তালেব আল-লাবিব ফী খাসায়েস আল-হাবীব’, ১:৭৯।

১৪. সা’আদ কৃত ‘আল-তাবাক্বাত আল-কুবরা’, ১:১০২; ইবনে জাওযী প্রণীত ‘সাফওয়া আল-সাফওয়া’, ১:৫২; ইবনে আসাকির রচিত ‘আল-সীরা আল-নববীয়া’, ৩:৪৬; ইবনে কাসীর লিখিত ‘আল-বেদায়া ওয়াল-নেহায়া’, ২:২৬৪; ইবনে রাজাব হাম্বলী কৃত ‘লাতা’ঈফ আল-মা’আরিফ ফীমা’য়া লি-মাওয়াসিম আল-‘আম মিন আল-ওয়ায়া’ঈফ’, ১৭২ পৃষ্ঠা; ইমাম সুয়ূতী প্রণীত ‘কেফা’য়াত আল-তা’লিব আল-লাবিব ফী খাসা’ইস আল-হাবীব’, ১:৭৯; আল-হালাবী রচিত ‘ইনসা’ন আল-উয়ূন ফী সীরা আল-আমীন আল-মা’মুন’, ১:৮৩

বাজার এলাকাগুলো প্রত্যক্ষ করেন; এমনকি তিনি সেখানে চলাচলকারী উটগুলোর গলাও দেখতে পান।^{১৫}

মুহাদ্দেসীন উলামাব্দ (হাদিসশাস্ত্র বিশারদমণ্ডলী) ‘আশূরা’-এর হাদীসগুলোর সাহায্যে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের বৈধতা প্রমাণ করেছেন। ‘ইয়াওমে আশূরা’ ইহুদী সম্প্রদায় পালন করে থাকেন। এই দিনটিতে পয়গম্বর মুসা আলাইহিস্ সালাম ও বনু ইসরাঈল (ইহুদী সম্প্রদায়) ফেরাউনের উৎপীড়ন হতে মুক্তি লাভ করেছিলেন। ফলে এটা তাঁদের স্বাধীনতা বা মুক্তি দিবস, যা তাঁরা নিজেদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে রোযা রেখে উদযাপন করতেন। (মদীনায়) হিজরতের পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসী ইহুদীদের দ্বারা এই প্রথা অনুশীলিত হতে দেখে বলেন, “আমি তাদের চেয়ে পয়গম্বর মুসা আলাইহিস্ সালাম-এর আরো ঘনিষ্ঠ (পয়গম্বর হওয়ার সূত্রে)।” এমতাবস্থায় কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও ‘ইয়াওমে আশূরা’তে রোযা রাখা আরম্ভ করেন এবং তাঁর

১৫. ইবনে সা‘আদ কৃত ‘আল-তাবাক্বাত আল-কুবরা’, ১:১০২; আল-তাবারানী প্রণীত ‘আল-মুজাম আল-কবীর’, ২৪:২১৪ #৫৪৫; ইবনে হিব্বান রচিত ‘আল-সহীহ’, ১৪:৩১৩ #৬৪০৪; আবদুর রায়যাক্ক লিখিত ‘আল-মুসান্নাফ’, ৫:৩১৮; আল-দারিমী কৃত ‘আল-সুনান’, ১:২০ #১৩; আল-শায়বানী প্রণীত ‘আল-আহাদ ওয়াল মাসানী’, ৩:৫৬ #১৩৬৯; আল-হাকীম রচিত ‘আল-মুত্তাদারাক’, ২:৬৭৩ #৪২৩০; আল-হায়সামী নিজ ‘মজমা’ আল-যওয়াঈদ’ (৮:২২২) গ্রন্থে জানান যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও আল-তাবারানী এই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন, আর ইমাম আহমদের বর্ণনার সনদ হচ্ছে হাসান সহীহ; আল-হায়সামী লিখিত ‘মাওয়া‘রিদ আল-যামা‘ন ইলা’ যাওয়াঈদ ইবনে হিব্বান’, ৫১২ #২০৯৩; ইবনে এসহাক রচিত ‘আল-সীরা আল-নববীয়া’, ১:৯৭ ও ১০৩; ইবনে হিশাম কৃত ‘আল-সীরা আল-নববীয়া’, ১৬০; ইবনে আসীর প্রণীত ‘আল-কা‘মিল ফী আল-তারীখ’, ১:৪৫৯; আল-তাবারী লিখিত ‘তারীখ আল-উমাম ওয়াল মুলুক’, ১:৪৫৫; ইবনে আসাকির রচিত ‘তারীখ দিমাশক আল-কবীর’, ১:১৭১-২; ইবনে আসাকির কৃত ‘তারীখ দিমাশক আল-কবীর’, ৩:৪৬৬ এবং ‘আল-সীরা আল-নববীয়া’, ৩:৪৬; ইবনে কাসীর প্রণীত ‘আল-বেদা‘য়া ওয়াল-নেহা‘য়া’, ২:২৬৪ ও ২৭৫; ইবনে রাজাব হাম্বলী লিখিত ‘লাতা‘ঈফ আল-মা‘আরিফ ফীমা লি-মাওয়া‘সিম আল-‘আম মিন আল-ওয়ায়া‘ঈফ’, ১৭৩ পৃষ্ঠা; ইমাম সুয়ুতী রচিত ‘কেফা‘য়াত আল-তা‘লিহ আল-লাবীব ফী খাসা‘ইস আল-হাবীব’, ১:৭৮; আল-হালাবী কৃত ‘ইনসান আল-উয়ুন ফী সীরা আল-আমীন আল-মা‘মুন’, ১:৮৩; আহমদ বিন যাইনী দাহলা‘ন মক্কী প্রণীত ‘আল-সীরা আল-নববীয়া’, ১:৪৬।

সাহাবা-এ কেরাম রাঈয়াল্লাহু আনহুম-কেও তা অনুসরণ করতে আদেশ করেন।^{১৬}

এ বিষয়ে অসংখ্য বর্ণনা বিদ্যমান, যা থেকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, ইহুদীরা যদি তাদের পয়গম্বর (মুসা আলাইহিস্ সালাম)-এর বিজয় ও মুক্তিতে খুশি প্রকাশ করতে পারেন, তাহলে মুসলমান হিসেবে আমাদেরও মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে একই রকমের অনুভূতি প্রকাশ করা চাই। আর তা এ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে যে, বিশ্বজগতের প্রতি খোদায়ী রহমত, অর্থাৎ, ঐশী করুণা (বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশ্বমানবতাকে অত্যাচার-অবিচার ও অমতো হতে মুক্তি দিতে ধরাধামে গুণাগুণ করেছিলেন এই বিশেষ দিনে। যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ ফরমান:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

-এবং তাদের থেকে তাদের (নাফরমানীর কারণে চাপিয়ে দেয়া) ভারী বোঝা ও (বন্দিত্বের) শৃঙ্খল অপসারণ করেন (এবং তাদেরকে মুক্তির নিয়ামতের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান করেন)।^{১৭}

১৬. আল-বুখারী কর্তৃক নিজ ‘সহীহ’ গ্রন্থে বর্ণিত: কিতাবুস্ সওম (রোযা-সংক্রান্ত অধ্যায়), ‘এয়াওমে আশূরা’র রোযা’ অধ্যায়, ২:৭০৪ #১৯০০; আল-বুখারী লিখিত ‘সহীহ’: কিতাবুল আযিয়া (পয়গম্বরবৃন্দের অধ্যায়), ‘আল্লাহর বাণী: মুসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর সংবাদ কি তোমাদের কাছে পৌঁছেছে?’ শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১২৪৪ #৩২১৬; আল-বুখারী কৃত ‘সহীহ’: কিতাব ফাযা‘ইল আল-সাযা‘বা (সাহাবাবৃন্দের সং গুণাবলীর বই), ‘মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় তাশরীফ নিলে ইহুদীদের তাঁর কাছে আগমন’ শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১৪৩৪ #৩৭২৭; মুসলিম রচিত ‘সহীহ’: কিতাব আল-সিয়া‘ম (রোযা-সংক্রান্ত অধ্যায়), ‘এয়াওমে আল-আশূরা’র রোযা’ অধ্যায়, ২:৭৯৫-৬ #১১৩০; আবু দাউদ প্রণীত ‘আল-সুনান: কিতাব আল-সওম (রোযা-সংক্রান্ত অধ্যায়), ‘এয়াওমে আল-আশূরা’র রোযা’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:৩২৬ #২৪৪৪; ইবনে মা‘জাহ রচিত কৃত ‘আল-সুনান: কিতাব আল-সিয়া‘ম (রোযা-সংক্রান্ত অধ্যায়), ‘এয়াওমে আল-আশূরা’র রোযা’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:৫৫২ #১৭৩৪; আহমদ ইবনে হাম্বল লিখিত ‘আল-মুসনাদ’, ১:২৯১ ও ৩৩৬ #২৬৪৪ ও ৩১১২; আবু এয়া‘লা প্রণীত ‘আল-মুসনাদ’, ৪:৪৪১ #২৫৬৭।

১৭. আল কুরআন: সূরা আ‘রাফ, ৭:১৫৭।

পরিশেষে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের মাস সমাগত হলে কোনো ঈমানদার মুসলমানের কাছে পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় নেয়ামত (আশীর্বাদ) আর কী-ই বা হতে পারে, যখন তিনি অনুভব করেন এর তুলনায় অন্য যে-কোনো সুখ একেবারেই অর্থহীন? প্রকৃত সুখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি প্রকাশের মাঝে নিহিত। আমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো এর চেয়ে কম তাৎপর্যপূর্ণ আশীর্বাদপ্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞতা ও খুশি প্রকাশ করতে বাধিত হয়েছিলেন, যে নেয়ামতগুলো ছিল কোনো বিশেষ স্থান বা কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে, এই অনন্ত, অফুরন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ রহমত তথা সর্বাধিক মহিমান্বিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরণীতলে শুভাগমন হচ্ছে সবার জন্যে (ঐশী) করুণা ও কল্যাণের অবিরাম উৎস। অতএব, মুসলমানদেরকে এ উপলক্ষে আবেগ ও খুশির বহিঃপ্রকাশের পাশাপাশি অসীম কৃতজ্ঞতার প্রতিভূ-ও হতে হবে।

আল-কুরআন অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় মানবজাতিকে তাদের প্রতি বর্ষিত আল্লাহ তা'আলার (খাস্) রহমত (করুণা), বরকত (আশীর্বাদ) ও দয়া তথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করার নির্দেশ দেয়, যিনি শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ আচ্ছন্নকারী অন্ধকার দূর করেন এবং হিংসা-বিদ্বেষ ও পশুত্বের দেয়াল যা মানুষকে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছিল, তা ভেঙ্গে চৌচির করে দেন। আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا.

—আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা (পরস্পরে) ছিলে শত্রু, তখন তিনি তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার বন্ধন সৃষ্টি করে দিলেন। আর তোমরা সে অনুগ্রহের কারণে পরস্পরে ভাই হলে।^{১৮}

১৮. আল কুরআন: সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৩।

এই ভগ্ন হৃদয়সমূহের জোড়া লাগানোর এবং বিশ্বমানবের সৌভ্রাতৃত্ব অর্জনের চমৎকার নজির ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই। অতএব, মহান আল্লাহর মনোনীত জনের ধরাধামে শুভাগমন উপলক্ষে আনন্দ উদযাপন ও আল্লাহর প্রতি ঋণী হওয়ার অনুভূতি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাটা অন্য যে-কোনো অর্জন বা প্রাপ্তির চেয়ে উম্মাহ'র জন্যে বেশি বাধ্যতামূলক হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও
ইসলামের বিভিন্ন নিদর্শন: সঠিক ঐতিহাসিক
দৃষ্টিকোণের আলোকে

আমাদের আকীদা-বিশ্বাস, ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ ও আধ্যাত্মিক জীবন যিকরের ধারণাকে ঘিরে আবর্তমান, যেটার অর্থ ‘স্মরণ করিয়ে দেয়া’, ‘স্মরণ করা’ এবং ‘স্মৃতিরক্ষামূলক কর্ম দ্বারা স্মরণীয় করে রাখা (বা উদযাপন করা)’। আমাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, লেনদেন, কথাবার্তা/ভাষণ, উপলব্ধি এবং আমাদের জীবনের সমস্ত বিষয়-ই সেই জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ যা আমরা অর্জন করেছি এবং নিজেদের মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করেছি। এভাবে আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি ধাপ আমাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত হয়েছে, আর এই স্মৃতি-ই আমাদেরকে জীবন চলার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শন করছে। উদাহরণস্বরূপ, কারো সাথে আমাদের সম্পর্কের বিষয়টি নির্ভর করে ওই ব্যক্তির সঙ্গে জড়িত আমাদের স্মৃতির উপর; আর এরই ভিত্তিতে আমাদের আচরণ-ব্যবহার ও আচরণ গড়ে ওঠে। স্মৃতিশক্তি ছাড়া কোনো বিষয় সম্পর্কেই বিচার-বিবেচনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়; এমন কি আমরা শত্রু হতে মিত্রকে আলাদাভাবে চিনতেও সক্ষম নই। এমতাবস্থায় আমাদের জীবন একদম এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত। অতএব, আমাদের সজ্ঞান সচেতনতা আমাদেরই অন্তর্নিহিত স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভরশীল।

১.১ আল-কুরআনের প্রদর্শিত হেদায়াত হিসেবে ‘যিকরের’ তাৎপর্য

মানবজাতির প্রতি দানকৃত আল-কুরআনের হেদায়াত (পথপ্রদর্শন)-এর ভিত্তিস্তম্ভ ‘স্মরণ’ করার (ঐশী) আজ্ঞার উপরই ভিত্তিশীল। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান রাখেন, তাঁকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলার অবতীর্ণ পূর্ববর্তী ও বর্তমান হেদায়াতগুলোতে একযোগে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ .

–আর তারা, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে তার (সবকিছুর) উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। আর তারা পরকালের প্রতিও (পূর্ণ) বিশ্বাস রাখে।^{১৯}

এখানে ‘স্মরণের’ ভিত্তিতে পূর্ববর্তী ধর্মীয় শাস্ত্রলিপিগুলোর স্বীকৃতিকে এবং তৎপরবর্তী পর্যায়ে ওই স্মৃতি নিজের সারা জীবনে সংরক্ষণ করাকে ঈমানের পূর্ণতা লাভের জন্যে অত্যাৱশ্যকীয় উপাদান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কেউ যখন কোনো কাজ সম্পন্ন করার ইচ্ছা করে, সে তখন তা করে তারই (মস্তিষ্কে) পৃষ্টিভূত তথ্য অনুসারে। ভালোবাসা, ভয়, বিনয় ও সমর্পণের মতো আবেগ আমাদেরই সংরক্ষিত স্মৃতির দ্বারা আকার-আকৃতি পায়। যদিও এগুলো অন্তরের সাথে জড়িত ভাবানুভূতি, তবুও সংঘটিত মানসিক প্রক্রিয়াগুলো না হলে এগুলোর অস্তিত্ব কোনোভাবেই থাকতো না। অতএব, স্মৃতিশক্তি হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার তরফ থেকে এক বড় নেয়ামত তথা আশীর্বাদ।

(মক্কার) মুশরিকদেরকে প্রকৃত বিশ্বাসের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হলে তারা আপন বৈশিষ্ট্যগত উত্তর দিতো, “আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মকে আঁকড়ে ধরতে পেরে আমরা সন্তুষ্ট।” আরেক কথায়, তারা নিজেদের শেকড় কেটে ফেলতে অনিচ্ছুক ছিল। নিম্নবর্ণিত আয়াতে এই ধরনের অবিশ্বাসীদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাদের পূর্বপুরুষরা ভুল পথ বেছে নেয়ার কারণেই লয়প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তাই তাদের পূর্ববর্তীদেরকে যে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল, সেই সত্যের দাওয়াত তাদের কবুল করা উচিত। তবে তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ফলশ্রুতিতে নিজেরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কুরআন মজীদ এ বিষয়ে ঘোষণা করে:

فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ.

–অতঃপর আমরা তাঁকে এবং তাঁর সাথে লোকদেরকে আমাদের অনুগ্রহ দ্বারা উদ্ধার করলাম এবং ওই লোকদের শিকড় কেটে দিলাম, যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। আর তারা কখনোই ঈমানদার ছিল না।^{২০}

এই আয়াতে করীমায় (মক্কার) অবিশ্বাসীদেরকে ‘স্মরণ করিয়ে’ দেয়া হয়েছে যে, তাদের পূর্বপুরুষরা ভুল পথ বেছে নিয়েছিল এবং ফলশ্রুতিতে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। অতএব, অবিশ্বাসীরা যেন অবতীর্ণ এই হেদায়াতকে গুরুত্বসহ গ্রহণ করে এবং পূর্ববর্তীদের মতো একই ভুল না করে বসে। অনুরূপভাবে মুসলমানবৃন্দও পূর্ববর্তী নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালাম-মণ্ডলীর প্রতি অবতীর্ণ ঐশী বাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য রয়েছেন, যেহেতু সেসব ওহী আল-কুরআনেরই অনুরূপ বার্তা বহন করেছিল। তাই কুরআন মজীদকে সত্য বলে স্বীকার করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, পূর্ববর্তী ওহীগুলোকে স্বীকার করাও তদনুরূপ।

১.২ পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর দ্বীন (ধর্ম)

আমাদের (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) পূর্ববর্তী পয়গম্বর আলাইহিমুস সালাম-বৃন্দকে স্মরণ করা এবং তাঁদের নবুওয়্যতে বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের ঈমানেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সঙ্গত কারণেই আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ইসলাম ধর্মকে ‘মিল্লাত-এ-ইবরাহীম’ (ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ধর্ম) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে—

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.

(১) আর কে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ধর্মাদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে ব্যতীত যে নিজেকে নির্বুদ্ধিতায় নিমজ্জিত করেছে? আর অবশ্যই আমি তাঁকে পৃথিবীতে(ও) মনোনীত করেছিলাম এবং

অবশ্যই তিনি পরকালে(ও) উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন নৈকট্যবানদের মধ্যে থাকবেন।^{২১}

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

- (২) আর (আহলে কিতাব) বলে, ‘ইহুদী অথবা খ্রিস্টান হও, তবে হেদায়াত পেয়ে যাবে’। বলে দিন, ‘(না) বরং আমরা তো ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর দ্বীন বেছে নিয়েছি, যিনি (সকল বাতিল হতে মুক্ত থেকে) কেবল আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট ছিলেন। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না’।^{২২}

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

- (৩) বলে দিন, ‘আল্লাহ সত্য বলেছেন, সুতরাং তোমরা ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর দ্বীনের অনুসরণ করো, যিনি ছিলেন সকল ভ্রান্তি থেকে বিমুক্ত, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।^{২৩}

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.

- (৪) আর দ্বীন অবলম্বনে তার চেয়ে উত্তম আর কে হতে পারে যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিমিত্তে সমর্পণ করে, সৎকর্মে নিয়োজিত থাকে এবং ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর দ্বীনের অনুসরণ করে, যিনি ছিলেন (আল্লাহর জন্যে) একনিষ্ঠ, সরলপথের অনুসারী? আর আল্লাহ ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-কে নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। (সুতরাং এ ব্যক্তিও হযরত

ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের সাথে আধ্যাত্মিকভাবে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় আল্লাহর বন্ধুরূপে পরিগণিত হবে)।^{২৪}

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

- (৫) বলে দিন, ‘নিশ্চয়ই আমাকে আমার প্রতিপালক সরল পথের দিকে হেদায়াত দান করেছেন। (এটি সরল পথের উপর) সুদৃঢ় দ্বীন (এবং এটিই) ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর মতাদর্শ যা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ এবং সকল মিথ্যা থেকে পৃথক। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।^{২৫}

ثُمَّ أُوحِيََا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

- (৬) অতঃপর (হে সম্মানিত হাবীব!) আমরা আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি, ‘আপনি ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর দ্বীনের অনুসরণ করুন, যা ছিল সকল বাতিল থেকে পৃথক। আর তিনি মুশরিকদের মধ্যে ছিলেন না।^{২৬}

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

- (৭) আর (পূর্ণ ভালোবাসা ও আনুগত্যের সাথে তাঁর দ্বীনের প্রসার ও প্রতিষ্ঠায়) আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো, যেভাবে সংগ্রাম করা সমীচীন। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন আর তিনি ধর্মের

২১. আল কুরআন: আল কুরআন: সূরা বাকারা, ২:১৩০।

২২. আল কুরআন: আল কুরআন: সূরা বাকারা, ২:১৩৫।

২৩. আল কুরআন: আল কুরআন: সূরা আলে ইমরান, ৩:৯৫।

২৪. আল কুরআন: আল কুরআন: সূরা নিসা, ৪:১২৫।

২৫. আল কুরআন: আল কুরআন: সূরা আন’আম, ৬:১৬১।

২৬. আল কুরআন: আল কুরআন: সূরা নাহল, ১৬:১২৩।

বিষয়ে তোমাদের উপর কোনো কষ্ট বা সংকট রাখেননি। (এটিই) তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর দ্বীন। তিনি (আল্লাহ) তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলমান, এর পূর্বে (কিতাব)ও আর এতেও (অর্থাৎ কুরআনেও), যাতে এ (শেষ যামানার) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের জন্যে সাক্ষী হন এবং তোমরা সাক্ষী হও মানবজাতির জন্যে। অতঃপর (এ মর্যাদায় সফলভাবে অধিষ্ঠিত থাকার জন্যে) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ (তা'আলার আলিঙ্গন)-কে মজবুতভাবে ধরে রাখো। তিনিই তোমাদের সাহায্য (ও কার্যসম্পাদনকারী)। অতঃপর তিনি কতোই না উত্তম কার্যসম্পাদনকারী এবং কতোই না উত্তম সাহায্যকারী।^{২৭}

আল-কুরআনের উপরোল্লিখিত আয়াতগুলো প্রত্যেককে পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর দ্বীনের উপর অটল, অবিচল থাকতে আদেশ করে। পয়গম্বর ইউসূফ আলাইহিস্ সালাম কয়েদখানায় তাঁর সাথী দুই জনের স্বপ্নগুলো ব্যাখ্যা করার আগে অনুরূপ ধর্মীয় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছিলেন:

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ.

-আর আমি তো আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুব (আলাইহিমুস্ সালাম)-এর ধর্মের অনুসরণ করি।^{২৮}

এই আয়াতে করীমায় পূর্ববর্তী পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালাম-বৃন্দের যিকর তথা তাঁদের এবং তাঁদের উম্মতদের বর্ণনা স্মরণ করাটা ধর্মের মৌলিক নীতিমালার একটি নীতি হিসেবে প্রণীত হয়েছে; আর এটা আশ্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম-মণ্ডলীর অনুশীলিত আচার-ও। আল-কুরআন ঘোষণা করে:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ.

২৭. আল কুরআন: সূরা হজ্জ, ২২:৭৮।

২৮. আল কুরআন: সূরা ইউসূফ, ১২:৩৮।

-(হে হাবীব!) নিশ্চয়ই আমরা আপনার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেছি, যেমন অবতীর্ণ করেছিলাম নূহ (আলাইহিস্ সালাম)-এর প্রতি এবং তাঁর পরবর্তীতে (অন্যান্য) নবীগণের প্রতি।^{২৯}

পূর্ববর্তী উম্মতদের পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালাম-মণ্ডলীর বর্ণনাগুলো স্মরণ করা এবং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর দ্বীন সম্পর্কে জানার বিষয়টি ঈমানদারদের অন্তর ও মস্তিষ্কে আলোকোজ্জ্বল করার একটি উৎস। এটা তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

'যিকর' (স্মরণ) একটি ব্যাপক বিষয়, যার জন্যে (আলাদা) একটা গোটা বই উৎসর্গ করা প্রয়োজন। স্মরণ (ও উদযাপন) প্রত্যেক মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে প্রভাব ফেলে থাকে, তা অনুধাবন করেই আল-কুরআন আমাদের মনোযোগ সেদিকে আকর্ষণ করে। এই বিষয়ে যিকর তথা স্মরণের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব শব্দ কুরআন মজীদে ব্যবহৃত হয়েছে, তা যাচাই করাটাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট হবে। 'যিকর' শব্দটি এই মহাগ্রন্থে আনুমানিক ২৬৭ বার উচ্চারিত হয়েছে, আর এর উদ্দিষ্ট অর্থ 'স্মরণ করা', 'স্মরণ করানো' এবং 'সংরক্ষণ করা'; এটা উপদেশ ও সতর্ক করার বেলায়ও ব্যবহৃত হয়েছে। খোদ আল-কুরআনকেই 'আল-যিকর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, 'আল-নিসইয়ান' শব্দটি কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে যিকরের বিপরীত শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো, 'ভুলে যাওয়া', 'ভুলে যাওয়ার কারণ হওয়া', 'কোনো কিছুকে তাৎপর্যহীন বলে অবহেলা করা', এবং 'কোনো কিছুকে পরিত্যাগ করা'।^{৩০}

আল্লাহ তা'আলা মানুষের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে যেসব (ঐশী) শিক্ষা যুগে যুগে প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলোর নির্যাস ছিল এক ও অভিন্ন; তথাপি মনুষ্য হাতের কারসাজিতে বিকৃতি সাধিত হয়ে সেগুলোর মর্মবাণী হারিয়ে গিয়েছিল। কুরআন মজীদ তাই নিজস্ব হেদায়াতকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে আপন বার্তাকে পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করেছে; এমনকি মহাগ্রন্থের অভ্যন্তরে বিদ্যমান আদেশ-নিষেধও ঘন ঘন পুনর্ব্যক্ত হয়েছে, যদিও ভিন্ন

২৯. আল কুরআন: সূরা নিসা, ৪:১৬৩।

৩০. ফারাহিদী কৃত 'কিতাবুল আইন', ৭:৩০৪-৫; ইবনে মানযুর প্রণীত 'লিসান আল-আরব', ১৫:৩২২-৩; ফারায়য আবাদী, 'আল-কামুস আল-মুহীত', ৪:৩৯৮।

দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে পাঠকের মস্তিষ্ক তাজা রাখাই উদ্দেশ্য। এ উপায়ে এর তাৎপর্য সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার উদ্দেশ্যটি সাধিত হয়, যার ফলে এর বিধান মেনে চলার ক্ষেত্রেও প্রত্যেককে সচেতন করে তোলা হয়।

এটা মনে রেখেই এবাদত-বন্দেগীর বিষয়গুলো কীভাবে নবুওয়্যতের প্রচেষ্টাসমূহের উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট, তা পরবর্তী অধ্যায়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা হবে। উপরন্তু, তাতে আরো ব্যাখ্যা করা হবে কীভাবে পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালাম-বৃন্দের জীবনে খুশি-আনন্দ ও দুঃখ-বেদনার ঘটনাগুলো আমাদের মাঝে মানবতা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধকে আবার ফিরিয়ে এনে থাকে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম বৃন্দের স্মরণ (যিকর):
পাঁচ ওয়াক্ত নামায

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভিত্তিতে ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফকে উদযাপন করে থাকেন। তাঁরা আপন আপন পন্থায় বিশ্বজগতের প্রতি (আল্লাহ তা'আলার) মহা করুণা এবং আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁদের ধর্মীয় আবেগপূর্ণ ভালোবাসা ও ভক্তি এই দিনে ব্যক্ত করে থাকেন। এধরনের ঘটনার উদযাপন এমন-ই একটি বিষয় যা ইসলামের নিদর্শন হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

ইসলাম ধর্মের ভিত্তিস্তম্ভ নিহিত রয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত নামায কায়েম করার মধ্যে। এটা প্রত্যেক মুসলমানের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য, আর ঈমানদারি এবং অবিশ্বাসের মাঝে পার্থক্যকারী উপাদান-ও। এসব প্রার্থনা মূলতঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরই এক স্মরণীয় উদযাপন, যা আশিয়া আলাইহিমুস্ সালাম-বৃন্দের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে পালন করা হয়েছিল। মহান আল্লাহ পাক এসব আমলকে এতোই মূল্যায়ন করেছিলেন যে, তিনি এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রার্থনাগুলোকে ঐশী আজ্ঞা দ্বারা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্যে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন।

ইমাম আল-তাহাবী (হিজরী ২২৯-৩৩১ সাল) পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আয়েশার একটি বক্তব্য বর্ণনা করেন তাঁরই রচিত 'শারহ মা'আনী আল-আসা'র' গ্রন্থে, যাঁতে তিনি উল্লেখ করেন:

১.৩ ফজরের নামায: পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-এর স্মরণে

إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا تَبَيَّنَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْفَجْرِ، صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، فَصَارَتْ الصُّبْحُ.

—ভোরে (ফজরের ওয়াক্তে) পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালামের তওবা যখন কবুল করা হয়, তখন তিনি দুই রাক'আত নামায (কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে) আদায় করেন; ফলে এটা ফজর ওয়াক্তের নামায হিসেবে পরিণত হয়।

১.৪ যোহরের নামায: পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর স্মরণে

وَفَدَى إِسْحَاقُ عِنْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَرْبَعًا، فَصَارَتْ الظُّهْرُ.

—পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম দুপুরে তাঁর পুত্র পয়গম্বর এসহাকু আলাইহিস্ সালামের জন্ম দ্বারা আশীর্বাদধন্য হলে চার রাক'আত নামায আদায় করেন; ফলে এটা যোহর ওয়াক্তের নামায হিসেবে পরিণত হয়।

১.৫ আসরের নামায: পয়গম্বর উযায়র আলাইহিস্ সালাম-এর স্মরণে

وَبُعِثَ عَزْرِي، فَقِيلَ لَهُ: كَمْ لَبِثْتَ؟ فَقَالَ: يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَصَارَتْ الْعَصْرُ.

—পয়গম্বর উযায়র আলাইহিস্ সালামকে এক 'শ বছর পরে পুনরুত্থিত করে জিজ্ঞেস করা হয়, 'কতকাল তুমি এই অবস্থায় ছিলে?' তিনি আরয় করেন, 'একদিন বা তার কিয়দংশ।' অতঃপর তিনি চার রাক'আত নামায (শোকরানা) আদায় করেন। এটাই 'আসর ওয়াক্তের নামায হিসেবে পরিণত হয়।

১.৬ মাগরিবের নামায: পয়গম্বর দাউদ আলাইহিস্ সালাম-এর স্মরণে

وَقَدْ قِيلَ: غُفِرَ لِعَزْرِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَغُفِرَ لِدَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ، فَقَامَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَجَاهَدَ فَجَلَسَ فِي الثَّالِثَةِ، فَصَارَتْ الْمَغْرِبُ ثَلَاثًا.

—বর্ণিত আছে যে, সূর্যাস্তের সময় সর্ব-পয়গম্বর হযরত উযায়র ও দাউদ আলাইহিমাস্ সালামের ঐশী ক্ষমা মঞ্জুর করা হয়। তাঁরা চার রাক'আত নামায আদায় করার নিয়ত করেছিলেন, কিন্তু (শারীরিক) দুর্বলতা বা ক্লান্তির কারণে তৃতীয় রাক'আত-শেষে বসে থাকেন (নামায পুরোপুরি

সম্পন্ন করতে অক্ষম হয়ে)। ফলে এটা মাগরিব ওয়াজের নামায হিসেবে পরিণত হয়, যা তিন রাক'আতবিশিষ্ট।

১.৭ 'এশার নামায: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণে

وَأَوَّلَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-এশা'র নামায, যেটা দিনের সর্বশেষ প্রার্থনা, সেটা যিনি সর্বপ্রথম আদায় করেন তিনি হলেন আমাদের মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।^{৩১}

এই দুই এবং চার রাক'আত নামায, যেগুলো সম্মানিত পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দ কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার দয়া ও করুণার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে আদায় করা হয়েছিল, সেগুলো তাঁদের নবুওয়্যত (প্রচার-প্রতিষ্ঠার) মিশন বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ স্মরণের আমলস্বরূপ বিবেচিত হয়েছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা এসব নামাযের মাধ্যমে সারাটা দিন আমাদেরকে তাঁরই নবী-রাসূল আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দের স্মৃতি নিয়মিতভাবে মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

একই প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে আবেদীন শা'মী (১২৪৪-১৩০৬ হিজরী) তাঁর রচিত 'রাদ্দ আল-মোহতার 'আলা দুর্ আল-মোখতার' গ্রন্থে লিখেন:

قِيلَ الصُّبْحُ صَلَاةُ آدَمَ، وَالظُّهْرُ لِذَاوُدَ، وَالْعَصْرُ لِسُلَيْمَانَ، وَالْمَغْرِبُ لِيَعْقُوبَ، وَالْعِشَاءُ لِيُونُسَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَجُمِعَتْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ.

-কথিত আছে, ফজরের নামায পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-এর; যোহর পয়গম্বর দাউদ আলাইহিস্ সালাম-এর; আসর পয়গম্বর সোলাইমান আলাইহিস্ সালাম-এর; মাগরিব পয়গম্বর এয়া'কুব আলাইহিস্ সালাম-

৩১. ইমাম আল-তাহাবী কৃত 'শারহ মা'আনী আল-আসার': কিতাব আস্ সালাহ (নামাযের বই), অধ্যায়: 'মধ্য প্রার্থনা তথা নামায', ১:২২৬ #১০১৪।

এর; আর 'এশা পয়গম্বর ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর। অতঃপর এসব নামাযের সবগুলো এই উম্মতের জন্যে একত্রিত করা হয়েছে।^{৩২}

এই পবিত্র মুহূর্তগুলো, যেগুলোতে আশিয়া আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দ তাঁদের প্রভু আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা, বিনয় ও সমর্পণের (আত্মিক) অবস্থায় ছিলেন, সেগুলোকে তিনি (বাধ্যতামূলক) এবাদত-বন্দেগী হিসেবে ঐশী বিধান জারি করেন; যে বিধান সর্বশেষ পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উম্মতের জন্যে আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও তাঁরই অসীম করুণা অর্জনের এক মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই প্রসিদ্ধ আশিয়া আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দের মকবুল তথা (আল্লাহর দরবারে) গৃহীত এসব এবাদত-বন্দেগী আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যস্থতায় এই উম্মতের প্রতি চিরকাল স্মরণ করার আমল হিসেবে মঞ্জুর করা হয়েছে। ধর্মীয় বিষয়াদিতে যিকর তথা স্মরণ করার গুরুত্বের ব্যাপারে এর চেয়ে আর বড় প্রমাণ কী হতে পারে এই মর্মে যে, ইসলামের বুনিয়াদি স্তম্ভগুলোর মধ্যে মৌলিক একটি স্তম্ভ, অর্থাৎ, পাঁচ ওয়াজ নামায-ই হচ্ছে পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালাম-বৃন্দের যিকর-তায়কেরা'র ব্যবহারিক এক বহিঃপ্রকাশ?

অতএব, পরিশেষে আমরা এ সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, যিকর-তায়কেরা'র আমল বা ঘটনা যেগুলো আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়েছে, সেগুলো কেবল অনুমতিপ্রাপ্ত-ই নয়, বরং সেগুলো ইসলামী চিন্তা-ভাবনা ও দর্শনেরই মৌলভিত্তি। মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদযাপন আল্লাহ তা'আলার মাহবুব (প্রেমাস্পদ) ও সেরা সৃষ্টি এবং আশিয়াকুল শিরোমণি হযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমনের স্মরণ বৈ কিছু নয়। এটা এমন-ই এক উদযাপনের নজির যা পুরোপুরি জায়েয এবং আল্লাহ তা'আলার ঐশী বিধানের সাথে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ।

৩২. ইবনে আবেদীন, রাদ্দ আল-মোহতার 'আলা দুর্ আল-মোখতার 'আলা তানভির আল-আবসার, ১:৩৫১।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-বৃন্দের স্মরণ (যিকর): হজ্জের বিভিন্ন রীতি ও প্রথা

ঈমানের ঘোষণা ও নামাযের পরে হজ্জ হলো ইসলাম ধর্মের তৃতীয় ভিত্তিস্তম্ভ। হজ্জের মৌলিক বাধ্যবাধকতা এবং এর প্রথাগুলো বাস্তবিকপক্ষে সর্ব-পয়গম্বর ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম এবং মা হাজেরা রাহিয়াল্লাহু আনহার জীবনে ঘটে যাওয়া শৌর্যবীর্যময় ঘটনাগুলোরই উদযাপন।

এই দুই আম্বিয়া আলাইহিমাস সালাম ও মা হাজেরা রাহিয়াল্লাহু আনহার অটল-অবিচল ভাব, নিরন্তর সাধনা ও ত্যাগের স্মৃতি বজায় রাখতে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এগুলোকে অত্যাবশ্যকীয় এবাদত-বন্দেগী হিসেবে আদেশ করেছেন। পৃথিবীজুড়ে কোটি কোটি মুসলমান এসব সাধনাকে স্মরণ করতে প্রতি বছর (হজ্জের মওসুমে) মক্কা মোয়াযযমায় সমবেত হন এবং এরই ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলার রেযামন্দি (সন্তুষ্টি) হাসিল করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আশীর্বাদধন্য প্রিয় বান্দাদের একনিষ্ঠ ও পরম ভালোবাসাপূর্ণ এই ভক্তিমূলক আমল (পুণ্যদায়ক কর্ম)-গুলোর স্মৃতিকে চিরস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করেছেন এবং তিনি ঘোষণা করেছেন যে, এগুলো তাঁরই নিদর্শন (আয়াত)।

মক্কা মোয়াযযমায় অবস্থিত পবিত্র কা'বা শরীফ মসজিদ চত্বরে প্রবেশ করলে (অন্তরে) ভক্তি ও প্রেম জাগ্রত হয় এবং অব্যাহত ধারায় অশ্রু বারে, যার ফলশ্রুতিতে অন্তরে প্রশান্তি অনুভূত হয়। এই পবিত্র স্থানে পদার্পণ করে আল্লাহর বান্দামণ্ডলী মহান প্রভুর ঘর তাওয়াফ (চারদিক প্রদক্ষিণ) করেন এবং ধর্মীয় আবেগসহ মানুষের ভিড় ঠেলে কালা পাথরের দিকে অগ্রসর হতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেন, যাতে সেটাকে স্পর্শ ও চুম্বন করা যায়। অতঃপর বান্দা 'সাঈ' (সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত হাঁটাহাঁটি) করতে যান। যিলহাজ্জ মাসের নবম দিনে প্রত্যেক হাজ্জী সাহেব/সাহেবা আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হন; সেখানে যোহর ও আসর ওয়াক্তের নামাযগুলো একত্রে পড়া হয়। মোযদালিফা নামের জায়গায় মাগরিব ও 'এশা ওয়াক্তের নামাযগুলো 'এশা'র সময় একত্রে পড়া হয়। অতঃপর মিনা'তে 'রামী' তথা কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয়, যা শেষ করে পশু কোরবানী দেয়া হয়।

এসব ধর্মীয় প্রথার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকলেও এগুলোর উদযাপন ধর্মীয় আবেগ ও ভক্তিরই প্রতিফলন। মানব মস্তিষ্ক হয়তো বারংবার এসব প্রথার যুক্তিসঙ্গত কারণ তালিশ করতে পারে, কিন্তু কোনো যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যাতেই সদুত্তর মেলে না। অপরদিকে, একই প্রশ্ন যদি কারো আবেগের সামনে উত্থাপন করা হয়, তবে এর উত্তরে হজ্জের এসব প্রথার পেছনে যুক্তি দেখানো হবে এই যে, এতে ভক্তি ও ভালোবাসারই এক গোপন ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের এই ভক্তিমূলক আচরণকে এতোখানি কবুল করেছেন যে, তিনি শেষ বিচার দিবস অবধি তাঁদের এই সাধনাকে অনুশীলনীয় এবাদত-বন্দেগী হিসেবে পালনের নির্দেশ জারি করেছেন। হজ্জের আকারে এই (আধ্যাত্মিক) সাধনার পুনঃপুনঃ অনুশীলন প্রকৃতপ্রস্তাবে আল্লাহ তা'আলার ওই সমস্ত আশীর্বাদধন্য পুণ্যবান বান্দাদেরকে স্মরণ করারই একটি রীতি। তাই হজ্জ হলো মূলতঃ (প্রিয় বান্দাদের) এক স্মৃতিচারণমূলক ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

আল্লাহর আশীর্বাদধন্য প্রিয় বান্দাদের (পুণ্যদায়ক) কর্ম, এবাদত-বন্দেগী ও কার্যকলাপের স্মৃতির প্রতি হজ্জের রীতিনীতি বাস্তবে কীভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন হতে পারে তা এই অধ্যায়ে প্রকাশ করা হবে। অনুরূপভাবে, পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ও মা হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁদের আমল (পুণ্যদায়ক কর্ম) এমনভাবে পালন করেছিলেন যার দরুন আল্লাহ তা'আলা তা সম্মানিত করেন এভাবে যে, সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতবৃন্দ তা হজ্জের রীতি হিসেবে আমল করবেন। হজ্জের এই প্রথা যেগুলো যিলহজ্জ মাসের ৮ম হতে ১৩তম দিবসের মধ্যে পালন করা হয়, সেগুলো সম্পর্কে নিচে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হলো:

১.৮ এহরাম: হজ্জে আশিয়া আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দের পরিধেয় বস্ত্রের স্মরণে

হজ্জ ও উমরাহ পালনের ক্ষেত্রে 'এহরাম' (বস্ত্র) বাঁধা হলো একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। কা'বা ঘর যে ব্যক্তি তাওয়াফ করবেন, তাঁর জন্যে এটা

পরিধান করা অত্যাবশ্যক। আল্লাহ পাকের আশিয়া আলাইহিমুস্ সালাম হজ্জের সময় যে বস্ত্র পরিধান করতেন, এই দুইখানি কাপড় ওই একই পরিচ্ছদ। আল্লাহ তা'আলা (তাঁদের) এই বসন এতোই পছন্দ করেছেন যে, তিনি হাজ্জী সাহেবদের জন্যে নিজেদের গতানুগতিক জামাকাপড় ছেড়ে ওই দুই ফালি কাপড় পরিধান করাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। এই একই দু টুকরো কাপড় গায়ে দিয়ে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থেকে আগত হাজ্জীবৃন্দ সত্তরজন পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালাম-এর নিজ নিজ নবুওয়্যাকালে এহরাম হিসেবে পরিধানকৃত বস্ত্রের ওই প্রথাটিই চর্চা করে থাকেন। নিচে বর্ণিত হাদীসগুলো এই বিষয়টিকে খোলাসা করেছে:

لَقَدْ مَرَّ بِالصَّخْرَةِ مِنَ الرُّوحَاءِ، سَبْعُونَ نَبِيًّا، مِنْهُمْ مُوسَى بْنُ اللَّهِ حَقًّا، عَلَيْهِمُ الْعِبَاءَةُ، يُؤْمُونَ بَيَّتَ اللَّهُ الْعَتِيقَ،

১. হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন, “সত্তরজন পয়গম্বর (আলাইহিমুস্ সালাম) আল-রাওহা (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী উপত্যকা)-এর পাথরগুলো পার হন; এঁদের মধ্যে ছিলেন পয়গম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম, যিনি একটি বস্ত্রাবৃত অবস্থায় ও খালি পায়ে আল্লাহ তা'আলার প্রাচীন ঘরে পৌঁছেন।”

২. পয়গম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর 'এহরাম' সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, যিনি এরশাদ ফরমান—

৩৩. ইমাম আবু ইয়া'লা কর্তৃক নিজ 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণিত, ১৩:২০১ ও ২৫৫ #৭২৩১ ও #৭২৭১; হযরত আনাস বিন মালেক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতেও ইমাম আবু ইয়া'লা প্রণীত 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে, ৭:২৬২ #৪২৭৫; ইমাম দায়লামী রচিত 'আল-ফেরদৌস বি-মা'সূর আল-খিতাব', ৩:৪৩৩ #৫৩২৮; আবু নুয়াইম লিখিত 'হিলইয়া' আল-আউলিয়া' ওয়া তাবাকাত আল-আসফিয়া', ১:২৬০; ইমাম আল-মুনযিরী নিজের কৃত 'আল-তারগীব ওয়াল-তারহীব মিন আল-হাদীস আল-শারীফ', ২:১১৮ #১৭৩৯ গ্রন্থে বলেন যে এই হাদীসের এসনাদ সম্পর্কে কোনো আপত্তি-ই উত্থাপিত হয়নি; ইমাম ইবনে আসাকির-ও এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেন নিজ 'তারীখ দিমাশক আল-কবীর' ২১:১৬৬ পৃষ্ঠকে; আর ইমাম আল-হায়সামী এটা বর্ণনা করেন আপন 'মজমা' আল-যাওয়াঈদ ওয়া মানবা'আ আল-ফাওয়াঈদ', ৩:২২০ কিতাবে।

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فِي هَذَا الْوَادِي مُحْرِمًا بَيْنَ قَطَوَائِيَّتَيْنِ.

—আমি যেন দেখলাম (পয়গম্বর) মুসা বিন ‘এমরা’ন আলাইহিস্ সালাম এই উপত্যকায় দুটি ‘ক্বাতওয়া’নী’ (সাদা) বস্ত্র পরেছিলেন।^{৩৪}

৩. ইমাম আযরাক্বী (জন্ম: ২২৩ হিজরী) সর্বপ্রথম মক্কা মোয়াযযমার একখানি ইতিহাসগ্রন্থ সংকলন করেন, যা ‘আখবার মক্কা ওয়া মা’ জা’য়া ফীহা মিন আল-আসা’র’ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি নিজস্ব এসনাদ-সহ বর্ণনা করেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা, যিনি বলেন:

لَقَدْ سَلَكَ فَجَّ الرُّوحَاءِ سَبْعُونَ نَبِيًّا حُجَّاجًا، عَلَيْهِمْ لِبَاسُ الصُّوفِ.

—সত্তরজন পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালাম হাজ্জী হয়ে আল-রাওহা’র গিরিপথ পেরিয়েছিলেন; তাঁরা পরেছিলেন ‘সূফ’ (পশমী বস্ত্র)।^{৩৫}

৪. হজ্জের অনুষ্ঠানে পয়গম্বর মুসা আলাইহিস্ সালাম-এর পরিচ্ছদ সম্পর্কে সর্ব-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শিষ্য ইমাম মুজাহিদ ইবনে জুবাইর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

حَجَّ مُوسَى النَّبِيُّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرٍ، فَمَرَّ بِالرُّوحَاءِ عَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قَطَوَائِيَّتَانِ، مُتَزَّرَ بِأَحَدِهِمَا مُرْتَدَّ بِالْأُخْرَى فَطَافَ بِالْبَيْتِ.

৩৪. ইমাম আবু ইয়া’লা প্রণীত ‘আল-মুসনা’দ’, ৯:২৭ #৫০৯৩; আল-তাবারানী কৃত ‘আল-মু’জাম আল-কবীর’, ১০:১৪২ #১০,২৫৫; আল-তাবারানী রচিত ‘আল-মু’জাম আল-আওসাত’, ৬:৩০৮ #৬৪৮৭; আবু নু’য়াইম লিখিত ‘হিলইয়া আল-আউলিয়া ওয়া তাবাক্বা’ত আল-আসফিয়া’, ৪:১৮৯; আল-মুনযিরী তাঁর প্রণীত ‘আল-তারগীব ওয়াল-তারহীব মিন আল-হাদীস আল-শরীফ’, ২:১১৮ #১৭৪০ গ্রন্থে বলেন যে আবু ইয়া’লা ও আল-তাবারানী এই হাদীসটি ‘হাসান’ সনদে বর্ণনা করেছেন; আল-হায়সামীও তাঁর কৃত ‘মজমা’ আল-যাওয়াঈদ ওয়া মানবা’আ আল-ফাওয়াঈদ’, ৩:২২১ পুস্তকে বিবৃত করেন যে আবু ইয়া’লা ও আল-তাবারানী ‘হাসান’ সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৩৫. ইমাম আযরাক্বী কৃত ‘আখবার মক্কা ওয়া মা’ জা’য়া ফীহা মিন আল-আসা’র’, ১:৭১-৭২।

—পয়গম্বর মুসা আলাইহিস্ সালাম একটি লাল উটের উপর চড়ে হজ্জ পালন করেন। তিনি আল-রাওহা (এলাকা) অতিক্রম করেন দুটি ‘ক্বাতওয়া’নী’ (সাদা) বস্ত্র গায়ে দিয়ে; এর একটি শরীরের নিম্নভাগ আচ্ছাদনকারী বস্ত্র ছিল, আর অপরটি তাঁর দেহ মোবারককে আবৃত করেছিল। তিনি (এ সময়) কা’বা শরীফকে তওয়াফ (অর্থাৎ, চারদিক প্রদক্ষিণ) করেন।^{৩৬}

৫. আরেকটি রেওয়ায়াত তথা বর্ণনায় সর্ব-পয়গম্বর হযরত হুদ ও সা’লেহ আলাইহিমাস্ সালামের এহরাম সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, কোনো এক হজ্জ (মওসুম)-এ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আসফান উপত্যকা অতিক্রম করার সময় জিজ্ঞেস করেন, ‘ওহে আবু বকর, এটা কোন্ উপত্যকা?’ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেন, ‘এটা আসফান উপত্যকা।’ এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান:

لَقَدْ مَرَّ بِهِ هُودٌ، وَصَالِحٌ عَلَى بَكَرَاتٍ حُمْرٍ حُطْمَهَا اللَّيْفُ، أَرْزَهُمُ الْعَبَاءُ، وَأَرْدَيْتُهُمُ التَّمَارُ، يُلْبُونَ يَحْجُونَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ.

—হুদ আলাইহিস্ সালাম ও সালেহ আলাইহিস্ সালাম এই উপত্যকা অতিক্রম করেছিলেন কম বয়সী লাল উটের পিঠে চড়ে, যেগুলোর গলার দড়ি ছিল খেজুর গাছের আঁশ দিয়ে তৈরি। তাঁদের (পয়গম্বরবৃন্দের) কোমরের (নিচের) কাপড় ছিল একটি আলখেল্লা, আর বহিরাবরণের বস্ত্র ছিল একখানি কালো ও সাদা ডোরাকাটা ডিলে জামা। আশ্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম পবিত্র কা’বা গৃহে হজ্জ পালনকালে তালবিয়া (অর্থাৎ, আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার বাক্যটি) পাঠ করছিলেন।^{৩৭}

৩৬. প্রাণ্ডুক্ত ইমাম আযরাক্বী কৃত ‘আখবার মক্কা ওয়া মা’ জা’য়া ফীহা মিন আল-আসা’র’, ১:৬৭।

৩৭. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল কৃত ‘আল-মুসনাদ’, ১:২৩২; আল-বায়হাক্বী নিজ ‘শুয়া’ব আল-ঈমান’, ৩:৪৪০ #৪০০৩ গ্রন্থে পয়গম্বর মুসা (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কেও অনুরূপ একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন; আল-মুনযিরী প্রণীত ‘আল-তারগীব ওয়াল-তারহীব মিন আল-হাদীস আল-শরীফ’, ২:১১৭ #১৭৩৭।

এসব হাদীস থেকে পরিদৃষ্ট হয় যে, হজ্জ পালনকালে পয়গম্বর আলাইহিমুস সালাম সাধারণ বস্ত্র পরিধান করতেন, আর তাঁরা তা পালন করতেন শুধুমাত্র মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের খাতিরেই। তাঁদের জামা ছিল দু'টুকরো কাপড়ের সমষ্টি। এগুলোর একটি তাঁদের পবিত্র শরীরের নিম্নভাগ এবং অপরটি তাঁদের দেহ মোবারককে আবৃত করতো।

আল্লাহ তা'আলার কাছে এই (দুই টুকরো) বস্ত্র এতোই পছন্দনীয় হয়েছিল যে, তিনি (এ উম্মতের) হাজ্জীদের পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে এটাকে বাধ্যতামূলক করে দেন। ফলে হজ্জ পালনকালে কারো প্রথা বা রীতিগত বস্ত্র পরিধান একেবারেই নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মাথার চুল কামানো অবস্থায় নামায আদায় করাটা ভ্রান্তি ও সুল্লাহ'র পরিপন্থী হিসেবে পরিগণিত হয়, কিন্তু হজ্জের বেলায় তা হয় না। 'এহরা'ম' অবস্থায় প্রত্যেক হাজ্জী সাহেব-ই আল্লাহর পবিত্র ঘর কা'বা শরীফের সামনে খালি মাথায় উপস্থিত হন। এরকম খালি মাথায় থাকাটা বিনীত ও সমর্পিত হওয়ার চিহ্ন বহন করে, আর আল্লাহ তা'আলার কাছেও এটা সবচেয়ে প্রশংসিত।

এর পাশাপাশি নখ ও চুল কাটা এবং গোঁফ ছাঁটাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে^{৩৮}, যাতে বাহ্যিকভাবে সকল ক্ষেত্রেই মহান আল্লাহ তা'আলার পয়গম্বর আলাইহিমুস সালামের প্রবর্তিত রীতিনীতি অনুযায়ী হজ্জ পালন করা যায়।

১.৯ তালবিয়া: পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কর্তৃক হজ্জের প্রতি আহ্বান ও তার উত্তরের স্মরণে

হজ্জ হোক বা উমরাহ, প্রত্যেক হাজ্জী সাহেব 'এহরা'ম' বেঁধে একান্ত নিষ্ঠা ও বিনয় সহকারে আল্লাহ তা'আলার কাছে নিম্নের বাক্যটি উচ্চারণ করে প্রার্থনা করেন:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالْتَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

৩৮. আল-কা'সানী কৃত 'বাদা'ঈ আল-সানা'ঈ ফী তারতীব আল-শারা'ঈ, ২:১৯৮।

—আমি হাজির, হে প্রভু, আমি হাজির! আপনার কোনো অংশীদার নেই। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা, আশীর্বাদ ও সার্বভৌমত্ব আপনারই মালিকানাধীন। আপনার কোনো অংশীদার নেই।^{৩৯}

হজ্জ ও উমরাহ'র সময় এই তালবিয়া পবিত্র (কা'বা) মসজিদে পাঠ করা হলেও খুব কম সংখ্যক মানুষ-ই এর উৎপত্তি সম্পর্কে জানেন। এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আদেশ পালনার্থে পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কা'বা ঘর নির্মাণ সুসম্পন্ন করার পর তাঁর আহ্বানের প্রতি প্রায় চার হাজার বছর যাবৎ সাড়া প্রদানেরই একটি রীতি। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বিবৃত হয়েছে:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.

—আর তুমি মানুষের মাঝে হজের কথা ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার নিকট হাযির হবে পদব্রজে এবং শীর্ণ উটে (আরোহণ করে), দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।^{৪০}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস তথা বাণীসমূহে বিবৃত হয় যে, পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আবু কুবাযস্ পর্বতশিখরে আরোহণ করেন এবং মনুষ্যকুলের প্রতি এই মর্মে আহ্বান জানান যে হজ্জের উদ্দেশ্যে খোদার ঘরে তাদের হাজির হওয়া উচিত।^{৪১}

৩৯. আল-বুখারী কর্তৃক নিজ সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত: কিতাবুল হজ্জ (হজ্জের বই), 'তালবিয়া' অধ্যায়, ২:৫৬১ #১৪৭৪; আল-বুখারী কৃত সহীহ গ্রন্থ: কিতাবুল লিবাস (পরিচ্ছদবিষয়ক বই), 'চুল কলপ/মেহেন্দ' অধ্যায়, ৫:২২১৩ #৫৫৭১; সহীহ মুসলিম: কিতাবুল হজ্জ, 'তালবিয়া ও এর বিবরণ' অধ্যায়, ২:৮৪১-৮৪২ #১১৮৪; আল-তিরমিযী প্রণীত 'আল-জামিউস সহীহ': কিতাবুল হজ্জ, 'তালবিয়া-সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ' অধ্যায়, ৩:১৮৭-১৮৮ #৮২৫-৮২৬; আবু দাউদ রচিত 'আল-সুনান': কিতাবুল মানাসিক (হজ্জের রীতিনীতি), 'তালবিয়া পালনের পদ্ধতি' শীর্ষক অধ্যায়, ২:১৬২ #১৮১২; আল-নাসাঈ লিখিত 'আল-সুনান': কিতাবুল মানাসিক আল-হজ্জ, 'তালবিয়া পালনের পদ্ধতি' শীর্ষক অধ্যায়, ৫:১৫৯-১৬০ #২৭৪৭-২৭৫০; ইবনে মাজাহ কৃত 'আল-সুনান': কিতাবুল মানাসিক, 'তালবিয়া' অধ্যায়, ২:৯৭৪ #২৯১৮।

৪০. আল কুরআন: সূরা হজ্জ, ২২:২৭।

৪১. ইবনে আবী হা'তিম কর্তৃক নিজ 'তাকসীর আল-কুরআন আল-'আযীম' ৮:২৪৮৭-২৪৮৮ গ্রন্থে বর্ণিত; ইবনে জাওযী কৃত 'যা'দ আল-মাসীর ফী 'ইলম আল-তাকসীর', ৫:৪২৩; ইমাম সুয়ুতী প্রণীত 'আল-দূর আল-মানসূর ফী আল-তাকসীর বি আল-মা'সূর', ৬:৩২;

স্থান-কালের উর্ধ্বে উঠে এই আহ্বানকে (পৃথিবীতে) মনুষ্য বসতির সর্বত্র পৌঁছে দেয়া হয়। বস্তুতঃ জন্মগ্রহণ করেননি আধ্যাত্মিক জগতের এমন সমস্ত আত্মা-ও এই আহ্বান শুনতে ও দেখতে পান; যিনি-ই এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলেন ‘আল্লাহুমা লাক্বায়েক’ (অর্থাৎ, আমি হাজির), তাঁকেই হজ্জ্ব করার সামর্থ্য মঞ্জুর করা হয় এবং মহান আল্লাহ তা‘আলার ঘরে হাজির হওয়ার অনুমতিও দেয়া হয়, যা নিম্নবর্ণিত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়:

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন হযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, যিনি বলেন,

لَمَّا بَنَى إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ أَدِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. قَالَ: فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ اخْتَذَ بَيْتًا وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَحْجُّهُ فَاسْتَجَابَ لَهُ مَا سَمِعَهُ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ أَكْمَةٍ أَوْ تُرَابٍ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ.

—হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) যখন কা‘বা ঘর নির্মাণ করেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রতি এ মর্মে ঐশী প্রত্যাদেশ দেন যেন তিনি মানবজাতিকে হজ্জ্বর দিকে আহ্বান জানান। হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) ঘোষণা করেন, ‘তোমাদের প্রভু (তাঁর) একখানি ঘর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যেন তোমরা তাতে হজ্জ্ব সম্পন্ন করো।’ এমন কোনো পাথর, গাছ, পাহাড় বা মাটি ছিল না যেটা এই আহ্বান শুনে বলেনি, ‘আমি হাজির, হে আল্লাহ, আমি হাজির!’^{৪২}

ইবনে ‘আজীবা রচিত ‘আল-বাহর আল-মাদীদ ফী তাফসীর আল-কুরআন আল-মাজীদ’, ৪:৪১০।

৪২. আল-হাকীম কর্তৃক নিজ ‘আল-মোস্তাদরাক ‘আলা আল-সহীহাইন’, ২:৬০১ #৪০২৬ গ্রন্থে বর্ণিত; আল-বায়হাকী কৃত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৫:১৭৬ #৯৬১৩; আল-বায়হাকী প্রণীত ‘শু‘আব আল-ঈমান, ৩:৪৩৯ #৩৯৯৮; আল-তাবারী রচিত ‘তারিখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলুক’, ১:১৫৬; মুজাহিদ লিখিত ‘আল-তাফসীর’, ২:৪২২; আল-জাসাস কৃত ‘আহকাম আল-কুরআন, ৫:৬৩; আল-তাবারী প্রণীত ‘জামে’ আল-বায়ান ফী তাফসীর আল-কুরআন’, ১৭:১৪৪; ইমাম সুযুতী রচিত ‘আল-দূর আল-মানসূর ফী আল-তাফসীর বি আল-মা‘সূর, ৬:৩২।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

لَمَّا فَرَعَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ قِيلَ لَهُ : {أَدِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} قَالَ : رَبِّ وَمَا يَبْلُغُ صَوْتِي ؟ قَالَ : أَدِّنْ وَعَلَى الْبَلَاءِ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، قَالَ : فَسَمِعَهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ يَحْجُونَ مِنْ أَقْصَى الْأَرْضِ يُلْبُونَ.

—পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম যখন কা‘বা ঘরের নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন করেন, তখন তাঁকে বলা হয়, ‘মানুষকে হজ্জ্বর দিকে আহ্বান করুন।’ তিনি আরম্ভ করেন, ‘হে আমার প্রভু, আমার কণ্ঠস্বর (অতাদূর) পৌঁছাবে না।’ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘উচ্চস্বরে আহ্বান করুন, আমি সমগ্র সৃষ্টিকে তা শোনাবো।’ অতঃপর পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম বলেন, ‘ওহে মানবকুল! মহান আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে হজ্জ্বর বিধান জারি করেছেন।’ বর্ণনাকারী (সাহাবী) আরো যোগ করেন, ‘এই ঘোষণা আসমান ও জমিনে অবস্থিত সকল সৃষ্টি-ই শুনতে পান। তোমরা কি দেখতে পাও না পৃথিবীর দূর-দূরান্ত হতে মানুষ (এ আহ্বানে সাড়া দিতে) কীভাবে তালবিয়া পাঠ করতে করতে এসে হাজির হন?’^{৪৩}

৪৩. ইবনে আবী শায়বা কর্তৃক নিজ ‘আল-মোসান্নাফ’, ৬:৩২৯ #৩১৮১৮ গ্রন্থে বর্ণিত; আল-হাকীম কৃত ‘আল-মোস্তাদরাক ‘আলা আল-সহীহাইন, ২:৪২১ #৩৪৬৪; আল-বায়হাকী প্রণীত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৫:১৭৬ #৯৬১৪; আল-মাক্দাসী রচিত ‘আল-আহাদীস আল-মুখতার’, ১০:২০-২১; আল-তাবারী তাঁর ‘জামে’ আল-বায়ান ফী তাফসীর আল-কুরআন’, ১৭:১৪৪ গ্রন্থে সাঈদ বিন জুবায়র হতেও এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেন; আল-সুযুতী লিখিত ‘আল-দূর আল-মানসূর ফী আল-তাফসীর বি আল-মা‘সূর’, ৬:৩২; ইমাম সুযুতী একই গ্রন্থের (দূররুল মানসূর) ৬:২৩৩-এ এই রওয়ায়ত সাঈদ বিন জুবায়র হতেও বর্ণনা করেন; আল-শওকানী কৃত ‘ফাতহুল কাদীর’, ৩:৪৫০; আলুসী প্রণীত ‘রুহ আল-মা‘আনী ফী তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম ওয়া আল-সাব’ আল-মাসানী’, ১৭:১৪৩।

৩. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. “আর তুমি মানুষের মাঝে হজের কথা ঘোষণা করে দাও^{৪৪}” কুরআন মজীদে এই আয়াতটি প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

قَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْحَجْرِ فَنَادَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُنْتُمْ عَلَيَّ كُفْرًا، فَأَسْمَعُ مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ فَأَجَابَ مَنْ أَمَّنَ مِمَّنْ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنْ يَحْجَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ.

—পয়গম্বর ইবরাহীম খলীলউল্লাহ আলাইহিস্ সালাম একটি পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, ‘ওহে মানবকুল! হজ্জ তোমাদের প্রতি ফরয করা হয়েছে।’ সকল পুরুষের ঔরসে ও নারীর গর্ভে যারা ছিলেন, তাঁদের সবাইকেই এই আহ্বান শোনানো হয়; আর অনাদিকাল হতে আল্লাহর জ্ঞাত সব মো’মেন বান্দা যাঁদের ভাগ্যে শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত হজ্জ নসীব করা হয়েছিল, তাঁরা এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলেন, ‘আমি হাজির, হে প্রভু, আমি হাজির।’^{৪৫}

৪. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী; তিনি বলেন,

لَمَّا فَرَعَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُنَادِيَ فِي الْحَجِّ، فَقَامَ عَلَى الْمَنَارِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ بَنَى لَكُمْ بَيْتًا فَحُجُّوهُ، وَأَجِيبُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَأَجَابُوهُ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ: أَجَبْنَاكَ أَجَبْنَاكَ، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، قَالَ: فُكِّلَ مَنْ حَجَّ الْيَوْمَ فَهُوَ مِمَّنْ أَجَابَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَدَرٍ مَا لَبَّى.

৪৪. আল কুরআন: সূরা হজ্জ, ২২:২৭।

৪৫. আল-তাবারী কর্তৃক নিজ ‘জামে’ আল-বয়া’ন ফী তাফসীর আল-কুরআন, ১৭:১৪৪; আস্-সুযুতী কৃত ‘আল-দূর আল-মানসূর ফী আল-তাফসীর বি আল-মা’সূর, ৬:৩৩; আল-তাবারী প্রণীত ‘তা’রীখ আল-উমাম ওয়া আল-মুলুক’, ১:১৫৭; আল-‘আসক্বালানী রচিত ‘ফাতহ আল-বারী’, ৬:৪০৬।

—হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম যখন কা’বা ঘরের নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন করেন, তখন আল্লাহ তা’আলা তাঁকে হজ্জের আহ্বান জানাতে নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় তিনি একটি উঁচু স্থানে উঠে উচ্চস্বরে বলেন, ‘ওহে মানবকুল! তোমাদের প্রভু তোমাদেরই জন্যে একটি ঘর নির্ধারণ করেছেন; অতএব, তোমরা হজ্জ পালন করো এবং আল্লাহর (আহ্বানের) প্রতি সাড়া দাও।’ সকল পুরুষের ঔরসে এবং নারীর গর্ভে যারা ছিলেন, তাঁরা উত্তর দেন, ‘আমরা উত্তর দিচ্ছি! আমরা উত্তর দিচ্ছি! আমি হাজির, হে প্রভু, আমি হাজির!’ হাদীসটির বর্ণনাকারী (সাহাবী) আরো যোগ করেন, যে কেউ আজকাল হজ্জ পালন করলে তিনি সেসকল (নেককার) বান্দার অন্তর্ভুক্ত, যিনি পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর আহ্বানে যতোবার তালবিয়া পাঠের ভিত্তিতে সাড়া দিয়েছিলেন।^{৪৬}

‘লাব্বায়েক’-এর এক মুহূর্তের এ আহ্বান সহস্র সহস্র বছর আগে জানানো হলেও এই ঐশী সুরের অনুরণন চারদিক থেকেই শোনা যাচ্ছে। হাজ্জীবন্দ এটা আবৃত্তি করার মাধ্যমে পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের সাথে সম্পর্কিত এ ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে অতীতের ঘটনার স্মৃতিচারণ করা দ্বীন ইসলামের শিক্ষার সাথে একদম সঙ্গতিপূর্ণ। অনুরূপভাবে, মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদযাপনের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনের স্মৃতিচারণ করি এবং তাঁর এ আবির্ভাবের প্রতি খুশি প্রকাশ করি। হযূরে পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সমাবেশে, তাঁর প্রশংসায় নাত/শের/কসীদা/পদ্য আবৃত্তির মাধ্যমে এবং অন্যান্য প্রশংসনীয় আমল দ্বারা স্মরণ করা হয়।

৪৬. আল-ফা’কাহী প্রণীত ‘আখবার মক্কা ফী ক্বাদীম আল-দাহর ওয়া হাদীসিহী’, ১:৪৪৬ #৯৭৩; এ হাদীস সংক্ষেপে মুজাহিদ বিন জুবায়র হতে নিম্নোক্ত বইগুলোতে উদ্ধৃত হয়েছে: ইবনে আবী শায়বা রচিত ‘আল-মুসান্নাফ’, ৬:৩৩০ #৩১,৮২৬; আল-তাবারী লিখিত ‘জামে’ আল-বয়া’ন ফী তাফসীর আল-কুরআন, ১৭:১৪৫; ইবনে আবদ আল-বার প্রণীত ‘আল-তামহীদ লিমা’ ফী আল-মুওয়াজ্জ মিন আল-মা’আনী ওয়া আল-আসা’নীদ’, ১৫:১৩১; আল-যায়লাঈ কৃত ‘নাসব আল-রা’য়া লি আহা’দীস আল-হেদা’য়া’, ৩:২৩।

১.১০ তওয়াফ: আশিয়া আলাইহিমুস্ সালামের সুন্নাহ (রীতিনীতি)- এর স্মরণে

কা'বা গৃহের চারপাশ সাতবার ঘুরে ঘুরে প্রদক্ষিণ করা তওয়াফ হিসেবে পরিচিত। এই তওয়াফ পালন করা পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালামেরই অনুশীলিত একটি রীতি (সুন্নাহ)। নিম্নবর্ণিত রওয়ায়াতগুলোতে এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে:

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَسَّسَ الْبَيْتَ، وَصَلَّى فِيهِ، وَطَافَ بِهِ آدَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—কা'বা ঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, এতে প্রার্থনা ও তওয়াফ যিনি সর্বপ্রথম করেন, তিনি হলেন পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম।^{৪৭}

২. ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিবৃত করেন যে, তাঁকে এ মর্মে জানানো হয়েছে, পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম ধরণীতলে প্রার্থনা করার মতো কোনো বেহেশতী পরিবেশ না পেয়ে দুঃখ ভরাক্রান্ত ছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা (ফেরেশতাকুলের মাধ্যমে) পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-এর জন্যে একটি পবিত্র মসজিদ বানিয়ে দেন এবং সেই স্থানে বসতি করতে তাঁকে আদেশ করেন। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং তিনি যেখানে বিশ্রাম নেন, সেখানে আল্লাহ তা'আলা পানির বর্ণা সৃষ্টি করে দেন।

فَأَقَامَ بِهَا يَعْبُدُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ عِنْدَ ذَلِكَ الْبَيْتِ، وَيَطُوفُ بِهِ، فَلَمْ تَزَلْ دَارُهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا.

—অতঃপর তিনি মক্কা শরীফ পৌঁছুলে সেখানে তিনি বসতি স্থাপন করে ওই কা'বা গৃহের পাশে আল্লাহর এবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হন এবং কা'বা গৃহ

৪৭. আল-আযরাকী প্রণীত 'আখবার মক্কা ওয়া মা' জা'য়া ফীহা মিন আল-আসা'র', ১:৩৬, ৪০; ইমাম সুয়ুতী রচিত 'আল-দুর আল-মানসূর ফী আল-তাকসীর বি আল-মা'সূর', ১:৩১৩।

তওয়াফ করেন। তাঁর বেসাল (পরলোকে আল্লাহর সাথে মিলনপ্রাপ্তি) না হওয়া পর্যন্ত এই স্থানই ছিল তাঁর আবাসস্থল।^{৪৮}

৩. খলীফা উমর আল-খাত্তাব রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হযরত কা'আব আল-আহবার রাঃদিয়াল্লাহু আনহু-কে আল্লাহ তা'আলার ঘরটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তরে বলেন, “আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে একটি হীরের মোড়কের ভেতরে কা'বা ঘরটি দুনিয়াতে নামিয়ে দেন এবং তাঁকে বলেন, ‘ওহে আদম! আমি আমার গৃহ তোমার সাথে পৃথিবীতে পাঠালাম। এটাকে তওয়াফ করতে হবে এবং এর পাশে এবাদত-বন্দেগীও করতে হবে, ঠিক যেমনটি করা হয় আমার ‘আরশে।’ ফেরেশতাকুল ওই ঘরে অবতীর্ণ হন এবং এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন করেন।

فَكَانَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَطُوفُ حَوْلَهُ، كَمَا يُطَافُ حَوْلَ الْعَرْشِ، وَيُصَلِّي عِنْدَهُ كَمَا يُصَلِّي عِنْدَ الْعَرْشِ.

—হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম এই কা'বা ঘরের তওয়াফ করতেন, যেমনভাবে 'আরশকে ঘিরে তা করা হয়। আর তিনি এর পাশে নামায-দোয়াও আদায় করতেন, যেমনটি তিনি 'আরশের পাশে প্রার্থনা করতেন।”^{৪৯}

৪. পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম ছাড়াও অসংখ্য আশিয়া আলাইহিমুস্ সালাম কা'বা ঘরের তওয়াফ করেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

حَجَّ خَمْسَةً وَسَبْعُونَ نَبِيًّا كُلُّهُمْ قَدْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ.

৪৮. আল-আযরাকী কৃত 'আখবার মক্কা ওয়া মা' জা'য়া ফীহা মিন আল-আসা'র', ১:৩৯; ইবনে আসাকির লিখিত 'তারীখ দিমাশকু আল-কবীর', ৭:৪২৫; আল-মাক্বদাসী প্রণীত 'আল-বাদ ওয়া আল-তারীখ', ৪:৮২।

৪৯. আল-আযরাকী রচিত প্রাগুক্ত 'আখবার মক্কা ওয়া মা' জা'য়া ফীহা মিন আল-আসা'র', ১:৩৯।

—পাঁচাত্তর জন পয়গম্বর (আলাইহিমুস সালাম) হজ্জ পালন করেন। এঁরা সবাই কা'বা ঘরকে তওয়াফ করেন।^{৫০}

কা'বা শরীফকে সাতবার তওয়াফ করাও পয়গম্বর আলাইহিমুস সালামেরই রীতি (সুন্নাহ)।

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাডিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন:

حَجَّ آدَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا.

—পয়গম্বর আদম আলাইহিস সালাম হজ্জ পালন করেন এবং কা'বা ঘরকে সাতবার প্রদক্ষিণ (তওয়াফ) করেন।^{৫১}

৬. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আবী সুলাইমান বলেন:

طَافَ آدَمُ سَبْعًا بِالْبَيْتِ حِينَ نَزَلَ.

—পয়গম্বর আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে অবতরণের পরে কা'বা ঘরকে সাতবার তওয়াফ করেন।^{৫২}

৭. ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসহাক সর্ব-পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর তওয়াফ প্রসঙ্গে লিখেন:

لَمَّا فَرَعَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ بَنَاءِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: طُفَّ بِهِ سَبْعًا، فَطَافَ بِهِ سَبْعًا هُوَ وَإِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

৫০. আল-আযরাকী কৃত প্রাণ্ডুক্ত 'আখবার মক্কা ওয়া মা' জা'য়া ফীহা মিন আল-আসা'র', ১:৬৭-৬৮; আল-ফা'কাহী প্রণীত 'আখবার মক্কা ফী ক্বাদীম আল-দাহর ওয়া হাদীসিহা', ৪:২৬৮ #২৫৯৯; আহমদ ইবনে হাম্বল রচিত 'আল-ইলাল ওয়া মা'রিফা আল-রিজাল', ৩:১৯৩ #৪৮৩১।

৫১. আল-আযরাকী কৃত প্রাণ্ডুক্ত 'আখবার মক্কা ওয়া মা' জা'য়া ফীহা মিন আল-আসা'র', ১:৪৫; আস্-সুয়ূতী লিখিত 'আল-দুর আল-মানসূর ফী আল-তাফসীর বি আল-মা'সূর', ১:৩২০।

৫২. আল-আযরাকী প্রণীত প্রাণ্ডুক্ত 'আখবার মক্কা ওয়া মা' জা'য়া ফীহা মিন আল-আসা'র', ১:৪৩।

—পয়গম্বর ইবরাহীম খলীলউল্লাহ আলাইহিস সালাম পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণ সুসম্পন্ন করার পর হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে আসেন এবং তাঁকে বলেন, 'এটাকে সাতবার তাওয়াফ করুন।' এমতাবস্থায় সর্ব-পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালাম কা'বা ঘরকে সাতবার তওয়াফ করেন।^{৫৩}

সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী আশিয়া আলাইহিমুস সালামের এই আচরিত প্রথাটিকে কা'বা শরীফের সাতবার তাওয়াফ দ্বারা সংরক্ষণ করেন।

৮. হযরত উমর ইবনে আল-খাত্তাব রাডিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا.

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মোয়াযযমায় প্রবেশ করে কা'বা গৃহকে সাতবার তাওয়াফ করেন।^{৫৪}

৯. হযরত জাবের ইবনে আব্দিল্লাহ রাডিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا.

—মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফে প্রবেশ করলে তিনি কা'বা ঘর সাতবার তওয়াফ করেন।^{৫৫}

৫৩. আল-আযরাকী লিখিত প্রাণ্ডুক্ত 'আখবার মক্কা ওয়া মা' জা'য়া ফীহা মিন আল-আসা'র', ১:৬৫; আল-কুরতুবী কৃত 'আল-জামে' লি-আহকা'ম আল-কুরআন, ২:১২৯।

৫৪. আল-বুখারী লিখিত 'সহীহ': কিতাবুল হাজ্জ, 'যে ব্যক্তি মাক্কা-এ-ইবরাহীমের পেছনে তাওয়াফ-পরবর্তী দুই রাক'আত নামায আদায় করেন' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৫৮৮ #১৫৪৭; আল-বুখারী কৃত 'সহীহ': কিতাবুল হাজ্জ, 'সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী সাঈ সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৫৯৩ #১৫৬৩; আল-বুখারী প্রণীত 'সহীহ': কিতাবুল হাজ্জ, 'উমরা-শেষে এহরাম খোলার সময়' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৬৩৬ #১৭০০; মুসলিম রচিত 'আল-সহীহ': কিতাবুল হাজ্জ, 'হজ্জে এহরাম বাঁধা ব্যক্তির প্রতি আরোপিত বাধ্যবাধকতা' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৯০৬ #১২৩৪।

৫৫. আল-তিরমিযী রচিত 'আল-জামে' আল-সহীহ': কিতাবুল হাজ্জ, 'আল-মারওয়ার আগে আল-সাফা'য় আরম্ভ করা প্রসঙ্গে বর্ণনাসমূহ' শীর্ষক অধ্যায়, ৩:২১৬ #৮৬২; আল-তিরমিযী কৃত 'আল-জামে' আল-সহীহ': আবওয়ার আল-তাফা'সীর, 'আল কুরআন: সূরা আল-বাক্বার' শীর্ষক অধ্যায়, ৫: ২১০ #২৯৬৭; আল-নাসাঈ প্রণীত 'আল-সুনান:

এসব রওয়াদাত হতে সহজে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, তাওয়াফ (সাতবার প্রদক্ষিণসহ) পালন করাটা পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দেই পদাঙ্ক অনুসরণ; এর পালনের মাধ্যমে আমরা পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দে পুনঃপুনঃ স্মৃতিচারণ করে থাকি।

১.১১ রামল: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা-এ কেরাম রাঈয়াল্লাহু আনহুম-এর দ্বারা অনুশীলিত তাওয়াফ-পদ্ধতির স্মরণে

তাওয়াফ পালন হজ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের একটি। পুরুষ হাজ্জীদের আদেশ করা হয়েছে যেন তাঁরা তাওয়াফ তথা প্রদক্ষিণের প্রথম তিনবার কিছুটা গর্বের সাথেই তা সম্পন্ন করেন। এর ইসলামী পারিভাষিক শব্দ হচ্ছে ‘রামল’। তবে সার্বিকভাবে বলা যায়, গর্বভরে হাঁটা ঔদ্ধত্যেরই একটি চিহ্ন এবং এটা আল্লাহ তা‘আলা পছন্দ করেন না; তবে হজ্জের সময় এর বিপরীত-ই ঘটে থাকে।^{৫৬} এতে নিহিত (ঐশী) জ্ঞান-প্রজ্ঞা এই

কিতাব মানাসিক আল-হাজ্জ, ‘তাওয়াফ-পরবর্তী দুই রাক‘আত নামাযশেষে বক্তব্য’ শীর্ষক অধ্যায়, ৫:২৩৫ #২৯৬১; ইবনে খুয়ায়মা লিখিত ‘আল-সহীহ’, ৪:১৭০ #২৬২০; এবং আল-তাবারানী রচিত ‘আল-মুজাম আল-সগীর’, ১:১২৬ #১৮৭।

৫৬. নোট: হা‘রিসা বিনতে ওয়াহাব আল-খুযাঈ (রাঈয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান, *أَلَا أُخِيرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ مَّضْطَئِفٍ*, এরশাদ ফরমান, *أَلَا أُخِيرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ مَّضْطَئِفٍ* “আমি কি তোমাদেরকে বৈহেশতী মানুষদের সম্পর্কে জানাবো না? তারা হলো যারা দুর্বল এবং দুর্বল বলে মনে করা হয়। কিন্তু যদি তারা আল্লাহর নামে কসম/শপথ করে, আল্লাহ তা‘আলা তা কার্যকর বা বাস্তবায়ন করে দেন। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের সম্পর্কে বলবো না? তারা হলো যারা অমার্জিত, উদ্ধত ও অহঙ্কারী।” [সূত্র: এ হাদীস বর্ণনা করেন আল-বুখারী তাঁর ‘সহীহ’: কিতাব আল-তাফসীর, আল কুরআন: সূরা নূন ওয়ালা ক্বালাম’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৮৭০ #৪৬৩৪ গ্রন্থে: আল-বুখারী প্রণীত ‘আল-সহীহ’: কিতাব আল-আদাব, ‘ঔদ্ধত্য’ শীর্ষক অধ্যায়, ৫:২২৫৫ #৫৭২৩; এবং মুসলিম কৃত ‘আল-সহীহ’: কিতাব আল-জান্নাহ ওয়া সিফা নান্দিমিহা ওয়া আহলিহা, ‘দাম্বিক জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং দুর্বল জান্নাতে প্রবেশ করবে’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:২১৯০ #২৮৫৩।]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঈয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমান, *يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَ الْكِبْرَاءِ رِثَائِي وَالْعِظْمَةُ لِزَارِي مَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا* “আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন: শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে আমারই ভূষণ এবং

যে, মদীনায় হিজরতের পরে মুসলমানবৃন্দ অবিরত অনেক সংগ্রামের ফলে দুর্বল ও ক্ষীণকায় হয়ে পড়েন। হৃদয়বিয়ার সন্ধি স্থাপিত হওয়ার এক বছর পর তাঁরা মক্কা মোয়াযযমায় উমরাহ হজ্জ পালন করতে ফেরত গেলে তাঁদের শরীরে এই দুর্বলতা দৃশ্যমান হয়। মক্কার কাফেরবর্গ (অবিশ্বাসী গোষ্ঠী) দেখতে পায় যে মুসলমানবৃন্দ তাওয়াফ পালনে ধীরগতিসম্পন্ন; আর তাই তারা মুসলমানদেরকে এ মর্মে ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ করে যে তাঁরা মক্কা ছেড়ে যাওয়ায় এতোই ক্ষীণকায় হয়েছেন, যার দরুন তাঁরা ঠিকভাবে হাঁটতেও পারছেন না। এমতাবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত সাহাবা-এ কেরাম রাঈয়াল্লাহু আনহুম-কে সাড়ম্বরে হাঁটতে নির্দেশ দেন, যাতে অবিশ্বাসীদের মস্তিষ্ক থেকে এই ধারণা দূর হয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের পরে যদিও কোনো অমুসলিম আর সেখানে অবশিষ্ট ছিল না, তবুও তাওয়াফের এ রীতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই একই রকমভাবে পালিত হয়ে আসছে।

ইমাম মুসলিম তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থের ‘কিতাবুল হজ্জ’ বইয়ের ‘এসতেহবা’ব আল-রামল ফী আল-তাওয়াফ ওয়া আল-উমরা ওয়া ফী আল-তাওয়াফ আল-আওয়াল মিন আল-হাজ্জ’ (উমরা’র তাওয়াফ ও হজ্জের প্রথম তাওয়াফে রামলের বাঞ্ছনীয়তা) শীর্ষক অধ্যায়ে এ বিষয়ে অনেক রওয়াদাতের উল্লেখ করেন, যা নিম্নে লিপিবদ্ধ হলো:

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঈয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর মহান সাহাবা-এ কেরাম রাঈয়াল্লাহু আনহুম মদীনা মোনাওয়ারায় এক মহামারী দেখা দিলে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁরা (হৃদয়বিয়ার সন্ধির এক বছর পর উমরা’র উদ্দেশ্যে) মক্কা মোয়াযযমায় উপস্থিত হওয়ার সময় (সেখানকার) মুশরিক নেতৃবর্গ তাদের অনুসারীদের বলে, ‘তোমাদের কাছে এমন এক জাতি

অহঙ্কার আমারই পরিধেয়। যে-কেউ এগুলোর কোনোটি আমার কাছ থেকে অপসারণ করতে চাইবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।” [সূত্র: এ হাদীস বর্ণনা করেন ইবনে আবী শায়বা নিজ ‘আল-মুসান্নাফ’, ৫:৩২৯ #২৬,৫৭৯ গ্রন্থে: আল-তাবারানী এটা হযরত আলী (ক:) হতে উদ্ধৃত করেন নিজ ‘আল-মুজাম আল-আওসাত’, ৩:৩৫২ #৩৩৮০ পৃষ্ঠক: আল-ক্বাদাঈ কৃত ‘মুসনাদ আল-শিহাব’, ২:৩৩১ #১৪৬৪; আল-বায়হাকী লিখিত ‘শু‘আব আল-ঈম্মান’, ৬:৩৮০ #৮১৫৭।]

আগমন করবে যারা রোগে দুর্বল হয়ে গিয়েছে।’ এতদশ্রবণে মক্কাবাসী মানুষ কালো পাথরের কাছে গিয়ে বসেন।

أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْسُحُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ أَنْ الْحَيِّ قَدْ وَهَنْتَهُمْ هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

—অতঃপর মুসলমানবৃন্দ সেখানে পৌঁছুলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে প্রথম তিন তওয়াফ সাড়ম্বরে পালন করতে নির্দেশ দেন এবং দুই কোণার (অর্থাৎ, ইয়েমেনী কোণা ও কালো পাথরের কোণা) মধ্যবর্তী স্থানে হাঁটতে বলেন, যাতে মুশরিকবর্গ তাঁদেরকে শক্ত-সামর্থ্যবান দেখতে পায়। (এ দৃশ্য দর্শনে) মুশরিকবর্গ বিস্ময়ভরে বলে, ‘তোমরা কি আমাদের এ কথা বিশ্বাস করতে বলো, যে এই মানুষগুলো রোগাক্রান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে গিয়েছে? সত্যি তারা ভীষণ বলবান এবং তোমরা যা দাবি করছো তা হতে (সম্পূর্ণ) মুক্ত!’^{৫৭}

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আরেকটি রওয়ায়াতে স্পষ্টভাবে বলেন,

إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ.

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা’বা ঘরের চারদিক দ্রুত হেঁটে প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করেন এবং আল-সাফা ও আল-মারওয়া’র

৫৭. ইমাম মুসলিম কৃত ‘আল-সহীহ’: কিতাবুল হজ্জ, ‘উমরা’র তাওয়াফ ও হজ্জের প্রথম তাওয়াফে রামলের বাঞ্ছনীয়তা’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:৯২৩ #১২৬৬; ইমাম বুখারী প্রণীত ‘আল-সহীহ’: কিতাবুল হজ্জ, ‘রামল যেভাবে সূচিত হয়’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:৫৮১ #১৫২৫; ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রচিত ‘আল-মুসনাদ’, ১:২৯৪; ইমাম বায়হাকী লিখিত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৫:৮২ #৯০৫৬।

মধ্যবর্তী স্থানে (জোরে) সাঈ করেন, যাতে তিনি তাঁর দৈহিক শক্তি মুশরিকদের দেখাতে সক্ষম হন।^{৫৮}

৩. আবু তোফায়ল আমির বিন ওয়া’সিলা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهَزَالِ وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ قَالَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا وَيَمْسُحُوا أَرْبَعًا.

—মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মোয়াযযমায় প্রবেশ করলে অবিশ্বাসীরা বলে, ‘মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীবৃন্দ ক্ষীণকায় হওয়ার দরুন কা’বা ঘরের তাওয়াফ করতে অক্ষম।’ মুশরিকবর্গ তাঁর প্রতি হিংসাবোধ করতে থাকে। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম-বৃন্দকে তওয়াফের প্রথম তিনবার রামল এবং পরবর্তী চারবার হাঁটতে নির্দেশ দেন।^{৫৯}

৫৮. আল-বুখারী কৃত ‘আল-সহীহ’: কিতাবুল হজ্জ, ‘সাফা ও মারওয়া’র মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ সম্পর্কে যা যা বর্ণিত’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:৫৯৪ #১৫৬২; মুসলিম প্রণীত ‘সহীহ’: কিতাবুল হজ্জ, ‘উমরা’র তাওয়াফ ও হজ্জের প্রথম তাওয়াফে রামলের বাঞ্ছনীয়তা’ অধ্যায়, ২:৯২৩ #১২৬৬; আল-তিরমিযী রচিত ‘আল-জামেউস সহীহ’: কিতাবুল হজ্জ, ‘সাফা ও মারওয়া’র মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ সম্পর্কে যা যা বর্ণিত’ শীর্ষক অধ্যায়, ৩:২১৭ #৮৬৩; আল-নাসাঈ লিখিত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ২:৪০৫ #৩৯৪১; আল-হুমায়দী কৃত ‘আল-মুসনাদ’, ১:২৩২ #৪৯৭; আল-বায়হাকী প্রণীত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৫:৮২ #৯০৫৭-৫৮।

৫৯. মুসলিম রচিত ‘সহীহ’: কিতাবুল হজ্জ, ‘উমরা’র তাওয়াফ ও হজ্জের প্রথম তাওয়াফে রামলের বাঞ্ছনীয়তা’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:৯২১-৯২২ #১২৬৪; ইবনে হিব্বান লিখিত ‘সহীহ’, ৯:১৫৪ #৩৮৪৫; আল-বায়হাকী প্রণীত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৫:৮২ #৯০৫৭-৯০৫৮।

১.১২ ইদতিবা': সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ

তাওয়াফ পালনকালে এহরাম-এর কাপড় ডান হাতের বগলের নিচে গোঁজা এবং এর উভয় প্রান্ত বাম কাঁধের উপরে স্থাপন করাকেই ইদতিবা' বলে।^{৬০}

আমরা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি যে, মহাসম্মানিত পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শারীরিক) শক্তি ও সম্মম-জাগানোর এক প্রদর্শনী দিতে নিজ মহান সাহাবা রাহিয়াল্লাহু আনহুমব্বন্দকে রামল পালন করতে আদেশ করেছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি তাওয়াফ পালনকালে এদতেবা' পালনেরও নির্দেশ দেন, যার নজির তিনিই সর্বপ্রথমে স্থাপন করেন (এবং সাহাবা রাহিয়াল্লাহু আনহুমব্বন্দকে এতে নেতৃত্ব দেন)। হজ্জ ও উমরা'র উদ্দেশ্যে যেসব হাজ্জী সাহেব সফর করেন, তাঁদের জন্যে এই প্রিয় সুন্নাহ'কে আঁকড়ে ধরা বাধ্যতামূলক। হাজ্জীবন্দ তাঁদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুশীলিত এই রীতির স্মারক উদযাপন করে থাকেন।

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাহিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْضِيَّتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ الْيُسْرَى.

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবা রাহিয়াল্লাহু আনহুমব্বন্দ 'জি'রা'না হতে উমরা পালন করতেন। তাঁরা কা'বা ঘরের চারদিকে রামল পালন করতেন এবং নিজেদের (এহরামের) কাপড় (ডান) হাতের বগলের নিচে গুঁজে অপর প্রান্ত বাম কাঁধের উপরে ছেড়ে দিতেন।^{৬১}

২. এয়া'লা বিন উমাইয়া রাহিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ.

৬০. ইবনে মানযুর রচিত 'লিসান আল-আরব', ৮:২১৬।

৬১. আবু দাউদ রচিত 'আল-সুনান': কিতাবুল মানাসিক (হজ্জের রীতিনীতিসম্পর্কিত বই), 'তাওয়াফ পালনকালে এদতেবা' শীর্ষক অধ্যায়, ২:১৭৭ #১৮৮৪; আহমদ বিন হাম্বল প্রণীত 'আল-মুসনাদ', ১:৩০৬; আল-তাবারানী কৃত 'আল-মুজাম আল-কবীর', ১২:৬২ #১২,৪৭৮; বায়হাকী লিখিত 'আল-সুনান আল-কুবরা', ৫:৭৯ #৯০৩৮-৯০৩৯; আল-মাকুদাসী রচিত 'আল-আহাদীস আল-মুখতা'রা, ১০:২০৭-২০৮ #২১৩-২১৫।

—মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবুজ (এহরামের) কাপড় পরা অবস্থায় এদতেবা' সহকারে তাওয়াফ পালন করেন।^{৬২}

৩. আল-তিবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এদতেবা'র অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা ব্যাখ্যাকালে বলেন,

إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ إِظْهَارًا لِلتَّشْجُعِ، كَالرَّمْلِ فِي الطَّوَافِ.

—এটা শ্রেফ সাহসের নিদর্শনস্বরূপ করা হয়েছিল, ঠিক যেমনটি করা হয়েছিল তাওয়াফের সময় রামল পালনের সময়।^{৬৩}

মক্কা মোয়াযযমায় কুফফার-বর্গের অস্তিত্বের সময়কাল হতে চৌদ্দ'শ বছর পরে আমাদের এই যুগেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবা রাহিয়াল্লাহু আনহুমব্বন্দেদের সুন্নাহ (রীতি)-এর অনুকরণে এদতেবা' পালন করা আমাদের জন্যে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের অন্তর ও মস্তিষ্ক (আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোয়) আলোকিত হয়, আর এতে আমরা ওই ধরনের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে আজো অটল, অবিচল থাকার প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা পাই।

১.১৩ কালো পাথর চুষন: আল্লাহর প্রিয় বান্দার অনুশীলিত প্রথার স্মরণে

আল-হাজর আল-আসওয়াদ তথা কালো পাথরকে পবিত্র মনে করার কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো, এটা জিবরাঈল ফেরেশতা আলাইহিস্

৬২. আবু দাউদ প্রণীত 'আল-সুনান': কিতাবুল মানাসিক, 'তাওয়াফ পালনকালে এদতেবা' শীর্ষক অধ্যায়, ২:১৭৭ #১৮৮৩; আল-তিরমিযী কৃত 'আল-জামে' আল-সহীহ': কিতাবুল হজ্জ, 'মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এদতেবা' সহকারে তাওয়াফ পালন সম্পর্কে যা যা বর্ণিত' শীর্ষক অধ্যায়, ৩:২১৪ #৮৫৯; ইবনে মা'জাহ রচিত 'আল-সুনান: কিতাবুল মানাসিক, 'এদতেবা' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৯৮৪ #২৯৫৪; আল-দারিমী লিখিত 'আল-সুনান, ২:৬৫ #১৮৪৩; আল-বায়হাকী প্রণীত 'আল-সুনান আল-কুবরা', ৫:৭৯ #৯০৩৫।

৬৩. আযীম আবাদী রচিত 'আওন আল-মাবুদ আলা' সুনানে আবী দাউদ', ৫:২৩৬; মুবারাকপুরী লিখিত 'তোহফা আল-আহওয়ায়ী ফী শারহে জামে' তিরমিযী', ৩:৫০৬।

সালাম বেহেশত থেকে নিয়ে এসেছিলেন।^{৬৪} সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার আদেশক্রমে পয়গম্বরবন্দ আলাইহিস্ সালাম এই কালো পাথরকে চুম্বন করতেন এবং এসতেসলা'ম তথা সন্ধ্যাষণ জানাতেন। সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পূর্বসূরী পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের সুন্যাহ তথা রীতি অনুসরণ করে নিজ পবিত্র হাত মোবারক দ্বারা কালো পাথরটিকে তার নির্ধারিত স্থানে বসিয়ে দেন এবং নিজের পবিত্র ঠোঁট দ্বারা চুম্বন করেন। এরই ফলশ্রুতিতে এটা হজ্জের একটি প্রথা পরিণত হয়। আজকে ঈমানদারবন্দ এই পাথরকে চুম্বন করার একমাত্র কারণ হচ্ছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে চুমো দিয়েছিলেন।

এই বাস্তবতা (খলীফা) হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বক্তব্য দ্বারা পরিস্ফুট হয়, যিনি একবার তাওয়াফ পালনকালে হাজরে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন,

إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

—আমি ভালো করেই জানি তুমি স্রেফ একটি পাথর। তুমি কারো উপকার বা ক্ষতি করতে অক্ষম। (খোদা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে চুম্বন করেছেন, এমনটি যদি আমি না দেখতাম, তাহলে কখনোই আমি এরকম করতাম না।^{৬৫}

৬৪. আল-আযরাকী কৃত 'আখবার মক্কা ওয়া মা' জা'য়া ফীহা' মিন আল-আসা'র, ১:৬২, ৬৪ এবং ৩২৫; ইবনে আবী শায়বা প্রণীত 'আল-মুসান্নাফ', ৩:২৭৫ #১৪,১৪৬; ইবনে আল-জা'আদ লিখিত 'আল-মুসনাদ', ১৪৮ পৃষ্ঠা #৯৪০; আল-ফা'কাহী রচিত 'আখবার মক্কা ফী ক্বাদীম আল-দাহর ওয়া হাদীসীহী', ১:৯১ #২৫; আল-হাযসামী কৃত 'মজমা' আল-যাওয়াঈদ ওয়া মানবা' আল-ফাওয়াঈদ', ৩:২৪২।

৬৫. আল-বুখারী প্রণীত 'সহীহ: কিতাব আল-হজ্জ', 'কালো পাথর সম্পর্কে যা উল্লেখিত হয়েছে' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৫৭৯ #১৫২০; আল-বুখারী কৃত 'আল-সহীহ: কিতাব আল-হজ্জ', 'হজ্জ ও উমরা'য় পালিত রামল' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৫৮২ #১৫২৮; আল-বুখারী রচিত 'সহীহ: কিতাব আল-হাজ্জ', কালো পাথর চুম্বন' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৫৮৩ #১৫৩২; মুসলিম লিখিত 'সহীহ: কিতাব আল-হজ্জ', 'তাওয়াফ পালনকালে কালো পাথর চুম্বনের বাঞ্ছনীয়তা' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৯২৫ #১২৭০; ইবনে মা'জাহ প্রণীত 'আল-সুনান: কিতাব

অপর এক বর্ণনায় হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

—তুমি নিতান্ত-ই একটি পাথর মাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে চুম্বন করেছেন, এমনটি না দেখলে আমি কখনো এরকম করতাম না।^{৬৬}

এই কথা বলার পর হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু কালো পাথরকে চুম্বন করতে অগ্রসর হন। ঘটনাটি এ বাস্তবতাকে পরিস্ফুট করে যে, মহান সাহাবা-এ কেলাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম কালো পাথরকে চুমো খেতেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণেরই উদ্দেশ্যে; এটা ছিল তাঁদের জন্যে (হযরত পাককে) স্মরণ করার খাতিরেই একটি অনুশীলিত রীতি। আর শেষ বিচার দিবস অবধি এই সুন্যাহ তথা রীতি বাকি বা অবশিষ্ট (মানে টিকে) থাকবে।

১.১৪ মাকামে ইবরাহীম: পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর স্মরণে

মাকাম (মর্যাদাপূর্ণ স্থান) বলতে (আরবী) ভাষাবিদ্যায় এমন এক স্থানকে বুঝানো হয়, যেখানে কারো পা স্থাপিত হয়েছে।^{৬৭} মাকাম-এ ইবরাহীম সম্পর্কে বিভিন্ন মত বিদ্যমান। উলামা ও মুফাস্সির-মণ্ডলী [সর্ব-হযরত জাবের ইবনে আব্দিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখের মতামতের ভিত্তিতে]

আল-মানাসিক', 'কালো পাথরের প্রতি সন্ধ্যাষণ' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৯৮১ #২৯৪৩; আল-নাসাঈ কৃত 'আল-সুনান আল-কুবরা', ২:৪০০ #৩৯১৮; আহমদ ইবনে হাম্বল রচিত 'আল-মুসনাদ', ১:৪৬ #৩২৫।

৬৬. ইমাম মালেক কৃত 'মোওয়াত্তা: কিতাব আল-হজ্জ', 'সন্ধ্যাষণের সময় হজরে আসওয়াদের কোণা চুম্বন' শীর্ষক অধ্যায়, ১:৩৬৭ #৮১৮; আহমদ ইবনে হাম্বল রচিত 'আল-মুসনাদ', ১:৫৩ #৩৮০।

৬৭. আল-ফারাহীদী কৃত 'কিতাব আল-আইন', ৫:২৩২; ফায়রুয আবাবাদী প্রণীত 'আল-ক্বামুস আল-মুহীত', ৪:১৭০; ইবনে মানযুর রচিত 'লিসান আল-আরব', ১২:৪৯৮; আল-যাবীদী লিখিত 'তাজ আল-উরুস' মিন জওয়া'হির আল-ক্বামুস', ১৭:৫৯২।

বিশ্বাস পোষণ করেন যে ‘মাক্কাম-এ ইবরাহীম’ হচ্ছে এই স্থানে অবস্থিত পাথরটির নাম। এখানে দুই রাক‘আত নামায আদায় করা হয়ে থাকে। এটাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মত।^{৬৮}

ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিজরী) বর্ণিত একটি হাদীসে উপরের বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ মর্মে যে, কা‘বা শরীফ নির্মাণের সময় পয়গম্বর ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম পাথরগুলো জড়ো করতে থাকেন, আর পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম দেয়ালগুলো দাঁড় করাতে থাকেন। দেয়ালগুলো যখন বেশ উঁচু হয়, তখন পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এই পাথরটির (মাক্কামে ইবরাহীম) উপর ওঠে দাঁড়ান, যাতে শীর্ষদেশে পৌঁছে ইমারতটির নির্মাণ সুসম্পন্ন করা যায়।^{৬৯}

অপর এক রওয়াযাতে বিবৃত হয় যে, পয়গম্বর ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম-এর আনা পাথরগুলো বহন করা যখনই পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর জন্যে কষ্টসাধ্য হতো, তৎক্ষণাৎ তিনি মাক্কামে ইবরাহীমের উপর ওঠে দাঁড়াতে এবং সেটা তাঁকে মাটি থেকে উপরে তুলে ইমারতটির চারপাশ ঘুরিয়ে আনতো, যতোক্ষণ না কা‘বা শরীফ নির্মাণ সুসম্পন্ন হয়।^{৭০}

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করেন,

৬৮. আল-তাবারী প্রণীত ‘জামেউল বয়া‘ন ফী তাফসীরিল কুরআ‘ন’, ১:৫৩৭; আল-কুরতুবী রচিত ‘আল-জামে’ লি-আহকা‘ম আল-কুরআ‘ন’, ২:১১২; আল-রা‘যী কৃত ‘আল-তাফসীর আল-কবীর’, ৪:৪৫; আল-আলুসী লিখিত ‘রুহুল মা‘আনী ফী তাফসীর আল-কুরআ‘ন ওয়া সাব’ আল-মাসা‘নী’, ১:৩৭৯; আল-আসকালানী প্রণীত ‘ফাতহুল বা‘রী’, ১:৪৯৯।

৬৯. আল-বুখারী রচিত ‘সহীহ: কিতাব আল-আম্মিয়া’, দ্রুত ফেরত যাওয়া: তাড়াতাড়ি হাট্টা’ শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১২৩৫ #৩১৮৪; আবদুর রাযযাক প্রণীত ‘আল-মুসান্নাফ’, ৫:১১০ #৯১০৭; আল-তাবারী কৃত ‘জামেউল বয়া‘ন ফী তাফসীরিল কুরআ‘ন’, ১:৫৫০; ইবনে কাসীর লিখিত ‘আল-তাফসীর আল-কুরআ‘ন আল-আযীম’, ১:১৭৮; আল-ক্বায়উয়ীনী রচিত ‘আল-তাদউয়ীন ফী আখবার র ক্বায়উয়ীন’, ১:১০৫।

৭০. আল-আযরাকী লিখিত ‘আখবার মক্কা ওয়া মা’ জা‘যা ফীহা’ মিন আল-আসা‘র’, ১:৫৮ ও ২:৩৩।

يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ أَخَذْتُ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.

—এয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি যদি মাক্কাম-এ ইবরাহীমকে সালাত বা নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করতেন!

অতঃপর আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হয়:

وَأَخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.

—তখন (নির্দেশ দিয়েছিলাম,) ‘ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর দাঁড়বার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো’।^{৭১}

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবিলম্বে মাক্কামে ইবরাহীমে নামায আদায় করে এই ঐশী আজ্ঞা পালন করেন।^{৭২}

হযরত জাবের ইবনে আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যখন কা‘বা শরীফের সামনে উপস্থিত হই, তিনি তখন তাওয়াফ (তিনবার রামল ও চারবার স্বাভাবিক গতিতে) পালন করেন। এর অব্যবহিত পরেই তিনি মাক্কাম-এ ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হন এবং “আর (বল্লাম,) وَأَخَذُوا مِنْ مَقَامِ

إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى—তখন (নির্দেশ দিয়েছিলাম,) ‘ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর দাঁড়বার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো’^{৭৩} কুরআন মজীদে এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি কা‘বা ও

৭১. আল কুরআন: সূরা বাকারা, ২:১২৫।

৭২. আল-বুখারী রচিত ‘সহীহ: কিতাব আল-তাফসীর’, “আল্লাহর বাণী— ‘ইবরাহীমের দাঁড়বার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো’” শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৬২৯ #৪২১৩; আল-তিরমিযী লিখিত ‘আল-জামে’ আল-সহীহ: আবওয়া‘ব আল-তাফসীর’, ‘আল কুরআন: সূরা আল-বাকারা’ শীর্ষক অধ্যায়, ৫:২০৬ #২৯৬০; ইবনে মা‘জাহ প্রণীত ‘আল-সুনান: কিতাব এক্বামা আল-সালা‘হ ওয়াল-সুন্না ফীহা’, ‘ক্বিবলা’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:৩২২ #১০০৮; আল-নাসাঈ কৃত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৬:২৮৯ #১০,৯৯৮; ইবনে হিব্বান লিখিত ‘আল-সহীহ’, ১৫:৩১৯ #৬৮৯৬; আহমদ ইবনে হাম্বল প্রণীত ‘আল-মুসনাদ’, ১:৩৬ #২৫০।

৭৩. আল কুরআন: সূরা বাকারা, ২:১২৫।

মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে দুই রাকআত নামায আদায় করেন।^{৭৪}

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম যে পাথরটির উপর দাঁড়িয়ে পবিত্র কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে এবাদতগাহ (উপাসনার স্থান) করার আদেশ দেন, যেহেতু এটা ছিল শীর্ষস্থানীয় সাহাবী (পুণ্যাত্মা) হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর (প্রাণের) আকাজ্জা। এই পাথরটি আশীর্বাদধন্য, কেননা এর পাশেই দাঁড়িয়ে মহানতম পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েন। শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত পৃথিবীতে যতো হাজ্জী সাহেবান কা'বা শরীফের তাওয়াফ করবেন, তাঁদের জন্যে মাকামে ইবরাহীমের পাশে দুই রাকআত নামায আদায় করা ওয়া'জিব (বাধ্যতামূলক)। আর এতে ব্যর্থ হলে তাওয়াফ পালন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অবশ্য কোনো স্থান সংকুলান না হলে অন্যত্র নামায পড়ার অনুমতি আছে, যদিও ওই মাকামের কাছে নামায পড়াটা প্রশংসনীয় বলে সাব্যস্ত হয়েছে।^{৭৫}

যেহেতু পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর পবিত্র পদচিহ্ন মাকামে ইবরাহীম পাথরটির উপর অঙ্কিত রয়েছে, সেহেতু কা'বা ঘর নির্মাণে তাঁর কর্মপ্রয়াসের স্মরণে মুসলমান সমাজ চিরকাল এটাকে শ্রদ্ধা করবেন এবং এর পাশে নফল নামায-ও আদায় করবেন।

১.১৫ সাফা ও মারওয়া'র সাঈ: হযরত মা হাজেরার সুন্নাহর স্মরণে

আল্লাহ তা'আলার পছন্দকৃত বান্দাদের এমন কিছু কাজ বিদ্যমান, যেগুলো কার্যতঃ এবাদত-বন্দেগীর মতো দেখায় না এবং এবাদতের নিয়তেও সেগুলো পালিত হয় না, কিন্তু মহান আল্লাহ পাক সেগুলোকে মহামূল্যবান

৭৪. মুসলিম রচিত 'সহীহ: কিতাব আল-হাজ্জ', 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হজ্জ' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৮৮৭ #১২১৮।

৭৫. আল-সারখাসী লিখিত 'কিতাব আল-মাবসূত', ৪:১২; আল-কা'সানী রচিত 'বাদাঈ আল-সানাঈ ফী তারতীব আল-শারাঈ', ২:১৪৮; আল-সামারকান্দী কৃত 'তোহফা আল-ফুকাহা', ১:৪০২; ইবনে নুজাইম প্রণীত 'আল-বাহর আলুরাইকু শারেহে কানয আল-দাকুইকু', ২:৩৫৬।

বিবেচনা করে সংরক্ষণ করেছেন এমনভাবে যে, তিনি সেগুলোকে একটি সামষ্টিক এবাদতের অংশ হিসেবেই ঘোষণা করেছেন।

এর একটি (উৎকৃষ্ট) উদাহরণ হলো মা হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘটনাটি, যেখানে তিনি তাঁর শিশুপুত্র পয়গম্বর ইসমাইল আলাইহিস্ সালাম-এর জন্যে পানির তালাশে মরিয়্যা হয়ে আল-সাফা' ও আল-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে ছুটোছুটি করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই কাজটিকে এতো-ই পছন্দ করেন যে, তিনি এ মর্মে আদেশ জারি করেন যেন হাজ্জী সাহেবান হজ্জের অঙ্গ হিসেবে ওই দুটো পাহাড়ের মাঝখানে একইভাবে দ্রুত চলাচল করেন। এর পরিভাষাগত শব্দ হচ্ছে সা'ঈ। হজ্জ ও উমরাহ উভয় ক্ষেত্রেই সা'ঈ ওয়া'জিব তথা অবশ্য কর্তব্য।

মনে রাখতে হবে যে, সাতবার সা'ঈ পালনকালে সুনির্দিষ্ট কোনো কুরআ'ন মজীদের আয়াত তেলাওয়াত কিংবা কোনো যিকর পাঠ নির্ধারণ করা হয়নি। যার যেমন ইচ্ছে সে মোতাবেক কুরআ'ন মজীদের যে-কোনো আয়াত তেলাওয়াত করার অনুমতি আছে; আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণও জায়েয। মুখস্থ কিছু জানা না থাকলেও আল্লাহ তা'আলার মহিমাপূর্ণ নামগুলো জপা কিংবা বিশ্বাসসংক্রান্ত কলেমা-বাক্য মুখে আওড়ানোই যথেষ্ট হবে। নতুবা শ্রেফ নিশ্চুপ থেকেও সা'ঈ সুসম্পন্ন করা বৈধ।

ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিজরী) ও অসংখ্য হাদীসশাস্ত্র বিশারদ এবং তাফসীরবিদ আল-সাফা ও আল-মারওয়া'র তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত বেশ কিছু আহাদিস ও রওয়ায়াত লিপিবদ্ধ করেছেন। এর একটি নমুনা নিম্নরূপ:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম মা হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও (তাঁর শিশুপুত্র) হযরত ইসমাইল আলাইহিস্ সালামকে সিরিয়া হতে মক্কা মোয়াযযমায় নিয়ে যান। ওই সময় নগরীটি বসতিহীন ছিল এবং পানির উৎস-ও দৃশ্যমান ছিল না। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে আল্লাহর ঘরের পাশে রেখে তাঁদের কাছে কিছু খেজুর ও পানি মওজুদ রেখে বিদায় নিতে গেলে মা হাজেরা রাদিয়াল্লাহু আনহা

বেদনাতন্ত্রে বলেন, ‘কোথায় যাচ্ছেন আপনি, আপনি কি আমাদেরকে এই বিরাণ মরু-উপত্যকায় রেখে চলে যাচ্ছেন?’ তিনি এই প্রশ্নটি বারংবার করতে থাকেন। কিন্তু হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর দিকে পেছন ফিরে তাকাননি। এমতাবস্থায় মা হাজেরা রাঈয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করেন, ‘মহান আল্লাহ তা’আলা আপনাকে আদেশ করার কারণেই কি আপনি আমাদেরকে এখানে ছেড়ে যাচ্ছেন?’ তিনি এর প্রতি হাঁ-সূচক উত্তর দেন। অতঃপর মা হাজেরা রাঈয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘এ-ই যদি অবস্থা হয়, তাহলে আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে পরিত্যাগ করবেন না।’

এরপর মা হাজেরা রাঈয়াল্লাহু আনহা ওই স্থানেই বসে থাকেন যতক্ষণ না হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তাঁর যাত্রায় দৃষ্টির বাইরে চলে যান। তিনি যখন ‘সানিয়া’ নামের একটি জায়গায় পৌঁছেন, তখন দুই হাত তুলে মোনাজাত করেন:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْنِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.

—হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমি আমার বংশধর (ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম)-কে (মক্কার) অনূর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট বসতি স্থাপন করিয়েছি; হে আমার রব! যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং তুমি মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ ভালোবাসায় অনুরাগী করে দিও। আর তাদেরকে (সকল প্রকার) ফলফলাদি দ্বারা রিযিক দান করো, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা আদায় করে।^{৭৬}

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঈয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

وَجَعَلْتُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا نَفَدَ مَا فِي السَّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا وَجَعَلْتُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى أَوْ قَالَ

يَتَلَبَّطُ فَاِنْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةً أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ فَوَجَدَتْ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيهَا فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْوَادِي رَفَعَتْ طَرْفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتْ الْوَادِي ثُمَّ أَتَتْ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

—মা হাজেরা (রাঈয়াল্লাহু আনহা) তাঁর শিশু পুত্রকে বুকের দুধ খাওয়াতে আরম্ভ করেন এবং পানির মওজুদ হতে পান করাতে থাকেন যতক্ষণ না পাত্রের জল ফুরিয়ে যায়। এরপর তিনি ও তাঁর শিশু তৃষগার্ত হন। মা হাজেরা (রাঈয়াল্লাহু আনহা) লক্ষ্য করেন যে তাঁর শিশুপুত্র বেজায় তৃষগার্ত হয়ে কাতরাচ্ছেন এবং এর দরুন মাটিতে পা দ্বারা আঘাত করছেন। তিনি শিশুর এই অবস্থা আর সহ্য করতে পারেননি। আল-সাফা ছিল সবচেয়ে কাছে অবস্থিত পাহাড়। তাই তিনি তাতে আরোহণ করে উপত্যকার ওপারে মানুষজনের খোঁজ করেন। কাউকে না পেয়ে তিনি এরপর উপত্যকা অতিক্রম করে আল-মারওয়া পাহাড়ে ওঠেন। এরকম তিনি সাতবার করেন।^{৭৭}

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঈয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান:

فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا.

—এই দুটো পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে মানুষের সা’ঈ করার কারণ এটাই।^{৭৮}

৭৭. আল-বুখারী রচিত ‘আল-সহীহ: কিতাব আল-আম্মিয়া’, “আল্লাহর বাণী ‘ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানস্বরূপ গ্রহণ করো’” শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১২২৮-১২২৯ #৩১৮৪; আল-নাসা’ঈ লিখিত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৫:১০০ #৮৩৭৯; আবদুর রাযযাক কৃত আল-মুসান্নাফ, ৫:১০৫-১০৬ #৯১০৭; আল-বায়হাকী প্রণীত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৫:১০০ #৮৩৭৯; আল-নাসা’ঈ লিখিত ‘ফাযা’ইলে সাহা’বা’, ১:৮২ #২৭৩; আল-কুরতুবী রচিত ‘আল-জামে’ লি-আহকা’ম আল-কুরআ’ন’, ৯:৩৬৮-৩৬৯; ইবনে কাসীর কৃত ‘আল-তাফসীর আল-কুরআ’ন আল-আযীম’, ১:১৭৭।

৭৮. প্রাগুক্ত।

মহান আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দিনীর ধার্মিকতা এতোই সযত্নে লালন করেন যে, তিনি একে তাঁর নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি এরশাদ ফরমান:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرُوءَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ.

—নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম।^{৭৯}

এই ঘটনা আনুমানিক চার হাজার বছর আগে ঘটেছিল। ওই উপত্যকা ও পাহাড়গুলো তাদের মৌলিক আকৃতিতে এখন আর বিরাজ করছে না। আর খোদা তা'আলার প্রিয় বান্দিনীর শঙ্কাও বর্তমানে অস্তিত্বশীল নেই। তথাপিও হাজ্জী সাহেবান আল্লাহ তা'আলার আদিষ্ট দুই পাহাড়ের মাঝে সা'ঈ পালন করে থাকেন। এসব কিছুই মা হাজেরা রাঈয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি অনুভূত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এবং তাঁরই অস্বস্তিকর ও পেরেশানি অবস্থার স্মরণার্থে করা হয়।

১.১৫.১ যমযম কূপ: নামের উৎপত্তির কারণ

পয়গম্বর ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম তীব্র তেষ্টাবোধের কারণে মাটিতে পা দ্বারা আঘাত করলে সেখান থেকে পানির নহর প্রবাহিত হয়। মা হাজেরা রাঈয়াল্লাহু আনহা এতো জোরে পানির স্রোত বইতে শুরু করায় আশঙ্কা করেন যে, হয়তো পয়গম্বর ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম-এর এতে ক্ষতি হতে পারে। তাই তিনি উচ্চস্বরে বলেন, 'যাম যাম' (খামো, খামো)! এমতাবস্থায় জলপ্রবাহের মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এ কারণেই অদ্যাবধি এই পানির উৎসকে যমযম নামে অভিহিত করা হয়।

সহস্র সহস্র বছর যাবৎ প্রবাহিত যমযম কূপের পানি হাজ্জী সাহেবানদের জন্যে এক ঐশী দান বটে। এই পানি ওয়ূ অবস্থায় ক্রিবলা তথা কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পান করাটা প্রথাসিদ্ধ; পয়গম্বর ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে এর সম্পৃক্ততার দরুন-ই এই বিশেষ বিধান

৭৯. আল কুরআন: সূরা বাকারা, ২:১৫৮।

জারি করা হয়।^{৮০} বস্তুতঃ যমযম হচ্ছে ধরণীর বুকে সেরা (পানীয়) জল, আর এতে অনেক রোগের আরোগ্য-ও রয়েছে নিহিত।

উপরোক্ত বিষয়গুলো প্রমাণ করে যে, দ্বীন-ইসলাম কেবল অতীতের ঘটনাবলী স্মরণ-ই করে না, বরঞ্চ বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সেগুলোর উদযাপনকে বাধ্যতামূলক-ও করে দেয়। মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ওই একই আঙ্গিক বা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে বা মূল্যায়ন করতে হবে। হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন বিশ্বজগতের জন্যে আল্লাহ তা'আলার করুণা, দয়া ও আশীর্বাদের সেরা উৎস। মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, যা দ্বারা তাঁর প্রতি প্রত্যেকের ভালোবাসা ও আনুগত্য সুদৃঢ় হয়, তা-ই এ উদযাপনের ভিত্তিমূল।

১.১৬ আরাফাত, মুযদালিফা ও মিনা: পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালামের স্মরণে

প্রতি যিলহজ্জ মাসের নবম দিবসে হাজ্জী সাহেবান আরাফাত ময়দানে অবস্থান করেন। লক্ষণীয় যে, সুনির্দিষ্ট কোনো এবাদত-বন্দেগীর আদেশ এখানে দেয়া হয়নি। আরাফাতে স্রেফ উপস্থিত থাকাটাই হজ্জের অবশ্য পালনীয় শর্ত পূরণের জন্যে যথেষ্ট। আরাফাত আমাদেরকে পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম ও মা হাওয়া রাঈয়াল্লাহু আনহা-এর পুনর্মিলিত হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেটা ৯ই যিলহাজ্জ তারিখে ঘটেছিল; ঠিক যেমনটি এক রেওয়াযাতে প্রমাণিত হয়—

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঈয়াল্লাহু আনহু বলেন:

৮০. আল-বুখারী রচিত 'আল-সহীহ: কিতাব আল-হজ্জ', 'যমযম সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়াদি' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৫৯০ #১৫৫৬; আল-বুখারী কৃত 'আল-সহীহ: কিতাব আল-আশরিবা', দাঁড়িয়ে পান করা' শীর্ষক অধ্যায়, ৫:২১৩০ #৫২৯৪; মুসলিম শ্রবীত 'আল-সহীহ: কিতাব আল-আশরিবা', দাঁড়িয়ে যমযমের পানি পান' শীর্ষক অধ্যায়, ৩: ১৬০১-১৬০২ #২০২৭; আল-আইনী লিখিত 'উমদাত আল-কা'রী শারহে সহীহ আল-বুখারী', ৯:২৭৭।

أُحْطِ أَدَمُ بِالْهِنْدِ وَحَوَاءُ بِجِدَّةَ فَجَاءَ فِي طَلِبِهَا حَتَّى أَتَى جَمْعًا فَارْزُلِفَتْ إِلَيْهِ
حَوَاءُ فَلِذَاكَ سُمِّيَتْ الْمَرْزَلِفَةُ وَاجْتَمَعَا بِجَمْعٍ فَلِذَاكَ سُمِّيَتْ جَمْعًا.

—পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম ভারতে অবতরণ করেন, আর মা হাওয়া রাহিয়াল্লাহু আনহা জেদায়। বাবা আদম আলাইহিস্ সালাম তাঁর স্ত্রীর খোঁজ করতে থাকেন যতোক্ষণ না তাঁরা অবশেষে একে অপরের দেখা পান। মা হাওয়া রাহিয়াল্লাহু আনহা তাঁর কাছে আসেন, যার দরুন তাঁকে ‘মুযদালিফা’ তথা ‘(বাবা আদমের) নিকটে গমনকারিনী’ নামে অভিহিত করা হয়। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে ‘আরাফাতে’ চিনতে পারেন, তাই এর নাম আরাফাত (অর্থাৎ, যেখানে একে অপরকে চিনতে পারেন)। তাঁরা জাম’-এ পুনর্মিলিত হন, সে মোতাবেক-ই এর নামকরণ হয়েছে (মানে পুনর্মিলনের স্থান)।^{৮১}

২. হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম ভারত উপমহাদেশের ‘নাওয়ায’ নামের এক পাহাড়ে অবতরণ করেন, আর মা হাওয়া রাহিয়াল্লাহু আনহাকে জেদায় প্রেরণ করা হয়। ইবনে সা’আদ (১৬৮-২৩০ হিজরী), আল-তাবারী (২৬৪-৩১০ হিজরী) ও ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৭ হিজরী) এই অভিমত পোষণ করেন যে, বাবা আদম আলাইহিস্ সালাম তাঁর স্ত্রীর সাথে আবার মিলিত হন আরাফাত নামের স্থানে, যার দরুন এই নামকরণ হয়েছে।^{৮২}

৩. আল-কুরতুবী (২৮৪-৩৮০ হিজরী) নিজ ‘আল-জামে’ লি-আহকা’ম আল-কুরআ’ন’ গ্রন্থে লিখেন:

৮১. আল-তাবারী লিখিত ‘তা’রীখ আল-উমাম ওয়াল-মুলুক’, ১:৭৯; ইবনে আল-আসীর কৃত ‘আল-কা’মিল ফী আল-তা’রীখ’, ১:৩৪; ইবনে সা’আদ প্রণীত ‘আল-তাবাকাত’ আল-কুবরা’, ১:৩৯; ইবনে আসা’কির রচিত ‘তা’রীখ দিমাশকু আল-কবীর’, ৬৯:১০৯।

৮২. আল-তাবারী প্রণীত ‘তা’রীখ আল-উমাম ওয়াল-মুলুক’, ১:৭৯; ইবনে সা’আদ কৃত ‘আল-তাবাকাত’ আল-কুবরা’, ১:৩৫-৩৬; আল-নববী রচিত ‘তাহযীব আল-আসমা’ ওয়াল-লুগাত’, ৩:২৩৭।

أَنَّ أَدَمَ لَمَّا هَیْطَ وَقَعَ بِالْهِنْدِ، وَحَوَاءُ بِجِدَّةَ، فَاجْتَمَعَا بَعْدَ طَوْلِ الطَّلَبِ بِعَرَفَاتِ يَوْمَ عَرَفَةٍ وَتَعَارَفَا، فَسَمِيَ الْيَوْمَ عَرَفَةً، وَالْمَوْضِعَ عَرَفَاتٍ، قَالَهُ الصَّحَّاحُ.

—পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম ভারত উপমহাদেশে অবতরণ করেন, আর মা হাওয়া (রাহিয়াল্লাহু আনহা) জেদায়। তাঁরা পরস্পর পরস্পরের সাক্ষাৎ পান আরাফা দিবসে আরাফাতেরই ময়দানে। অতএব, এই দিনটি আরাফা’ নামে পরিচিত হয়, আর স্থানটি খ্যাত হয় আরাফাত নামে। এটা আল-দাহহাকের বক্তব্য।^{৮৩}

৪. আল-মুযদালিফা নামকরণের ব্যাপারে ইবনে হাজর আল-আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হিজরী), এয়া’কূত আল-হামাভী (জন্ম:৬২৬ হিজরী) এবং আল-শওকানী (১১৭৩-১২৫০ হিজরী) লিখেন:

وَسُمِّيَتْ جَمْعًا لِأَنَّ أَدَمَ اجْتَمَعَ فِيهَا مَعَ حَوَاءَ وَارْزُلِفَ إِلَيْهَا أَيُّ دَنَا مِنْهَا.

—আল-মুযদালিফাকে ‘জাম’ হিসেবেও অভিহিত করা হয়, কেননা বাবা আদম আলাইহিস্ সালাম সেখানেই মা হাওয়া রাহিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে পুনরায় মিলিত হন এবং তাঁর সান্নিধ্য পান।^{৮৪}

৫. মিনা’ নামকরণ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাহিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

إِنَّمَا سُمِّيَتْ مِنَى لِأَنَّ جِبْرِيلَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَ أَدَمَ قَالَ لَهُ: تَمَنَ قَالَ: أَتَمَّتْ الْجَنَّةُ فَسُمِّيَتْ مِنَى لِأَنَّهَا مَنِيَّةُ أَدَمَ.

—মিনা’ নামকরণ হয় যখন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম হতে পৃথক হতে চান এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেন

৮৩. আল-কুরতুবী প্রণীত ‘আল-জামে’ লি-আহকা’ম আল-কুরআ’ন’, ২:৪১৫।

৮৪. আল-আসকালানী রচিত ‘ফাতহুল বা’রী’, ৩:৫২৩; এয়া’কূত আল-হামাভী কৃত ‘মু’জাম আল-বুলদান’, ৫:১২১; আল-শওকানী লিখিত ‘নায়ল আল-আওতা’র শারহ মুনতাক্বা’ আল-আখবার’, ১:৪২৩।

তিনি (বাবা আদম) কোনো কিছু কামনা করেন কি না। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম উত্তর দেন, ‘বেহেশত’। একারণেই এই স্থানকে ‘মিনা’ নামে ডাকা হয়— পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-এর আকাঙ্ক্ষার দরুন।^{৮৫}

‘রামী’ তথা পাথর নিক্ষেপের রীতির মতোই ‘সাঈঈ’ ও ‘তালবিয়া’ প্রথাগুলোও আল্লাহ তা‘আলার নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের সম্মানার্থে উদযাপিত আমল। অনুরূপভাবে, ‘আরাফাত’ ও ‘মুযদালিফা’ স্থানগুলোও সম্মানিত হয়েছে, যেহেতু বাবা আদম আলাইহিস্ সালাম ও মা হাওয়া রাঈয়াল্লাহু আনহা দীর্ঘকাল পরে সেখানে পুনরায় মিলিত হন। এখানে গুরুত্বারোপ করতে হবে যে, আক্ষরিক অর্থে ‘আরাফাত’ বলতে ‘চেনা’কে বুঝায়, আর ‘মুযদালিফা’ মানে ‘সান্নিধ্য’। মহান আল্লাহ তা‘আলা এই অতি গুরুত্বপূর্ণ পুনর্মিলনের স্মৃতি প্রতি বছর যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে কীভাবে সেখানে হাজ্জী সাহেবদের উপস্থিতিকে বাধ্যতামূলক করে দিয়ে পুনর্জাগরিত করেছেন, তা গভীরভাবে ভেবে দেখুন।

১.১৭ আরাফাত ও মুযদালিফায় আদায়কৃত নামাযের একত্রীকরণ: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ

মুসলমানব্দ আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা মোতাবেক সর্বদা নির্দিষ্ট ওয়াক্তের নামায যথাসময়ে আদায় করে থাকেন। কিন্তু (এর ব্যতিক্রমস্বরূপ) আরাফাতের ময়দানে হাজ্জী সাহেবান যোহর ও আসর ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়েন। এটা শুধু একারণেই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়েছিলেন; আর তাই হাজ্জী সাহেবদের প্রতি অনুরূপ রীতি পালনের (শরঈ) বিধান জারি করা হয়। একইভাবে, সূর্য ডুবার সাথে সাথে হাজ্জী সাহেবান মাগরিব ও এশা’র নামায-ও একত্রে পড়েন। তাঁরা সরাসরি নামায আদায় করেন না, বরং

৮৫. আল-আযরাকী রচিত ‘আখবা’র মক্কা ওয়া মা’ জা’য়া ফীহা’ মিন আল-আ’সার’, ২:১৮০; আল-নববী প্রণীত ‘তাহযীব আল-আসমা’ ওয়াল-লুগা’ত’, ৩:৩৩৩; আল-কুরতুবী কৃত ‘আল-জামে’ লি-আহকাম আল-কুরআ’ন’, ৩:৭।

মুযদালিফায় না পৌঁছানো পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করেন। এটা নিম্নের রওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত:

১. মুহাদ্দেসীনে কেরাম হযরত জাবের ইবনে আব্দিল্লাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু হতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ী হজ্জ সম্পর্কে একটি বিশদ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত ময়দানে এক আযান ও দুই একা’মত সহকারে যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করেছিলেন, আর মুযদালিফায় মাগরিব ও এ’শার নামাযের ক্ষেত্রেও একই রকম করা হয়েছিল।^{৮৬}

২. ইমাম জা’ফর আল-সা’দিক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর পিতা ইমাম বা’কির (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে বর্ণনা করেন:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَإِقَامَتَيْنِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا.

—হযর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত যোহর ও আসরের নামায এক আ’যান ও দুইটি একা’মত সহকারে (একত্রে) আদায় করেন। তিনি উভয়ের মাঝে আল্লাহ পাকের কোনো ‘তাসবীহ’ (প্রশংসা-বাক্য) পাঠ করেননি। অতঃপর তিনি এক আ’যান ও দুইটি একা’মত সহকারে মাগরিব ও এ’শার নামাযও (মুযদালিফায়) আদায় করেন এবং সেখানেও তিনি উভয়ের মাঝে কোনো তাসবীহ পাঠ করেননি।^{৮৭}

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঈয়াল্লাহু আনহু বলেন:

৮৬. মুসলিম রচিত ‘আল-সহীহ: কিতাব আল-হাজ্জ’, ‘মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হজ্জ’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:৮৮৬-৮৯২ #১২১৭; আবু দাউদ লিখিত ‘আল-সুনান: কিতাব আল-মানাসিক’, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হজ্জের বিবরণ’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:১৮৫ #১৯০৫।

৮৭. আবু দাউদ প্রণীত ‘আল-সুনান: কিতাব আল-মানাসিক’, ‘রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হজ্জের বিবরণ’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:১৮৬ #১৯০৬; আল-বায়হাকী কৃত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ১:৪০০ #১৭৪১।

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ.

—আমি কখনোই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নামায তার নির্দিষ্ট ওয়াক্ত ছাড়া পড়তে দেখিনি (মানে নামায তরক করেননি); ব্যতিক্রম শুধু (হজ্জের সময়) দুইটি নামায— মাগরিব ও এশা^{৮৮} একত্রে আদায়।^{৮৮}

কুরআন মজীদে যদিও নামায সুনির্দিষ্ট ওয়াক্ত অনুযায়ী আদায়ের লুকুম রয়েছে^{৮৯}, তবুও হজ্জের সময় আরাফাত ও মুযদালিফায় এই সাধারণ আদেশের ব্যতিক্রম করা হয়েছে। এটা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুশীলিত রীতির কারণেই হয়েছে।

১.১৮ পশু কুরবানি: পয়গম্বর ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম-এর স্মরণে

হজ্জের রীতি পালন করতে হাজ্জী সাহেববন্দ এবং পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর সন্নাহ'র (স্মারক) উদযাপন করতে বিশ্বব্যাপী মুসলমান সর্বসাধারণ ঈদুল আযহা'র দিন পশু কুরবানি দেন। এই কুরবানী মূলতঃ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম-কে আল্লাহ তা'আলার রেযামন্দির খাতিরে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকারই স্মৃতিচারণমূলক আমল বা নেক কাজ। (তাঁর) এই কুরবানির এতোখানি সযল্ল মূল্যায়ন হয়েছিল যে, এর ফলশ্রুতিতে প্রতি বছর হজ্জে হাজ্জী সাহেবদের একটি করে কুরবানি দিতে (খোদায়ী) নির্দেশ জারি করা হয়। শুধু হাজ্জী সাহেবান-ই নন, প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের প্রতিও আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্তে পশু কুরবানি দেয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়।

৮৮. মুসলিম রচিত 'আল-সহীহ: কিতাব আল-হজ্জ', 'মুযদালিফায় নাহর দিবসে অন্ধকার থাকতে ফজরের নামায আদায়ের বাঞ্ছনীয়তা' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৯৩৮ #১২৮৯; আল-বুখারী লিখিত 'আল-সহীহ: কিতাব আল-হজ্জ', 'জাম' (মুযদালিফা)-এ ফজরের নামায পড়ার সময়' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৯০৪ #১৫৯৮।

৮৯. আল কুরআন: সূরা নিসা, ৪:১০৩।

ইমাম হাসান আল-বসরী (২১-১১০ হিজরী) বলেন:

مَا فُدِيَ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا بِنَبِيٍّ مِنَ الْأَرْوَى هَبَطَ عَلَيْهِ مِنْ نَبِيٍّ، وَمَا يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ] لَذَبِيحَتِهِ فَقَطْ، وَلَكِنَّهُ الذَّبْحُ عَلَى دِينِهِ فَتِلْكَ السُّنَّةُ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَاعْلَمُوا أَنَّ الذَّبِيحَةَ تَذْفَعُ مِثْلَهُ السُّوءِ فَضَحُّوا عِبَادَ اللَّهِ.

—পয়গম্বর ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম-এর পরিবর্তে 'সাবীর' উপত্যকায় (মক্কা পাহাড়ে) একটি বড় ও হুস্তপুষ্ট মন্দা ভেড়া/দুধা কুরবানি দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এরশাদ ফরমান, “আমি তার (ইসমাঈল আলাইহিস্ সালামের) স্থলে উৎসর্গস্বরূপ একটি বড় (পশু) কুরবানি (গ্রহণ) করি” [আল-আযাত]। হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম-এর কুরবানির পরিবর্তে ভেড়া জবাইকেই এই (ঐশী) কুরবানি নির্দেশ করেছে। এতদসত্ত্বেও শেষ বিচার দিবস অবধি প্রতি বছর পশু কুরবানি দেয়ার জন্যে এই উম্মতকে আদেশ করা হয়েছে। (ইমাম হাসান আল-বসরী এরপর শোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন) ‘ওহে মানুষ, তোমাদের জানা উচিত যে এই কুরবানি ইন্তেকালপ্রাপ্তদেরকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে, আর তাই তোমাদেরও এই কুরবানি করা উচিত!’^{৯০}

এই আমল (পুণ্যদায়ক কর্ম) নিঃসন্দেহে সর্ব-পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ও ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম-এর মহা কুরবানিরই উদযাপন, যার দরগুন ঈমানদারবন্দ প্রত্যাশা অনুযায়ী এ দ্বীনের মর্মবাণী অন্তরে ধারণ করতে পারেন এবং ফলস্বরূপ আল্লাহ তা'আলার রেযামন্দির খাতিরে নিজেদের জান ও মাল সমর্পণ করতে প্রস্তুত থাকেন।

৯০. আল-তাবারী প্রণীত 'তারীখ আল-উমাম ওয়াল মুলুক', ১:১৬৭; আল-তাবারী কৃত 'জামে' আল-বয়া'ন ফী তাফসীর আল-কুরআন', ২৩:৮৭-৮৮; আল-ফা'কাহী রচিত 'আখবার মক্কা ক্বাদীম আল-দাহর ওয়া হাদীসিহী', ৫:১২৪।

১.১৮.১ কুরবানির পশু: আল্লাহর চিহ্নগুলোর একটি

সারা বিশ্বে যদিও পশু জবাই হয়ে থাকে, তবুও পয়গম্বর ইসমাইল আলাইহিস্ সালাম-এর স্মরণে পশু কুরবানি হওয়া একটি অনন্য ঘটনা। এগুলোকে আল্লাহ তা‘আলার ‘শ’আয়ের’ বা চিহ্ন বলা হয়েছে সুস্পষ্টভাবে। এরশাদ হয়েছে:

وَالْبُذْنُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ.

—আর আমরা কুরবানীর (উট ও গরু এসব) বৃহৎ প্রাণীকে তোমাদের জন্যে করেছি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম।^{৯১}

আজকে পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর এই সুনাত পশু কুরবানি দ্বারা পুনরায় উদযাপিত হচ্ছে। এটা একটা পুণ্যদায়ক কর্ম এবং আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।

১.১৯ কক্কর নিক্ষেপ প্রথা: পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর সুনাহ

হাভ্বী সাহেবান (হজ্জের অংশ হিসেবে) তিন দিন মিনা’তে অবস্থান করেন এবং তাঁরা সেখানে ‘জামরা’ত নামে পরিচিত স্তম্ভগুলোতে কক্কর নিক্ষেপ করেন। এই আমলটি পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর স্মৃতি রক্ষার্থে পালিত হয়।

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, যিনি এরশাদ ফরমান:

إِنَّ جِبْرِيلَ دَهَبَ بِإِبْرَاهِيمَ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاحَ ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاحَ ثُمَّ أَتَى الْجَمْرَةَ الْقُصْوَى فَعَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَسَاحَ.

৯১. আল কুরআন: সূরা হজ্জ, ২২:৩৬।

—হযরত জিবরীল আমীন আলাইহিস্ সালাম হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে ‘জামরা আল-‘আক্বাবা’য় নিয়ে গেলে সেখানে শয়তানের আবির্ভাব ঘটে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম সাতটি কক্কর তার দিকে ছুঁড়ে মারেন, যার দরুন শয়তান মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ‘জামরা আল-উসতা’য় অগ্রসর হলে শয়তান আবাবো (দ্বিতীয়বার) আবির্ভূত হয়। তিনি তার দিকে (পুনরায়) সাতটি কক্কর নিক্ষেপ করলে শয়তান পুনরায় মাটিতে পড়ে যায়। অতঃপর পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ‘জামরা আল-কুসওয়া’য় অগ্রসর হলে শয়তান আবাবো (তৃতীয়বারের মতো) আবির্ভূত হয়। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম পুনরায় সাতটি কক্কর তার দিকে নিক্ষেপ করেন, যার ফলে শয়তান মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।^{৯২}

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং বলেন:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُمِرَ بِالْمَنَاسِكِ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَسْعَى فَسَابَقَهُ فَسَبَقَهُ إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ دَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَعَرَضَ لَهُ شَيْطَانٌ قَالَ يُؤْتِسُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى دَهَبَ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ قَالَ قَدْ تَلَّهِ لِلْجَبِينِ قَالَ يُؤْتِسُ وَثُمَّ [تَلَّهِ لِلْجَبِينِ] وَعَلَى إِسْمَاعِيلَ فَمِيصُ أَبْيَضُ وَقَالَ يَا أَبَتِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي ثَوْبٌ تُكَفِّنُنِي فِيهِ غَيْرُهُ فَاخْلَعُهُ حَتَّى تُكَفِّنَنِي فِيهِ فَعَالَجَهُ لِيَخْلَعَهُ فَنُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ [أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا] فَالتَفَتَ إِبْرَاهِيمُ فَإِذَا هُوَ بِكَئِشٍ أَبْيَضٍ أَقْرَنَ أَغْيَنَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ رَأَيْنَا نَبِيْعَ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ الْكِبَائِشِ

৯২. আহমদ ইবনে হাম্বল রচিত ‘আল-মুসনাদ’, ১:৩০৬; আল-হাকিম কৃত ‘আল-মোসাদদরাক’, ১:৬৩৮ #১৭১৩; আল-বায়হাকী প্রণীত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৫:১৫৩ #৯৪৭৫; আল-মাকুদাসী লিখিত ‘আল-আহাদীস আল-মুখতার’, ১০:২৮৩ #২৯৬; আল-মুনযিরী রচিত ‘আল-তারগীব ওয়াল-তারহীব মিনাল-হাদীস আল-শরীফ’, ২:১৩৪ #১৮০৭; আল-হায়সামী কৃত ‘মজমা’ আল-যাওয়াঈদ ওয়া মানবা’ আল-ফাওয়াঈদ’, ৩:২৫৯।

قَالَ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ جَبْرِيلُ إِلَى الْجُمُرَةِ الْقُصْوَى فَعَرَّضَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ حَتَّى ذَهَبَ.

—হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে হজ্জের রীতিনীতি পালনের আদেশ দেয়া হলে পরে হযরত জিবরীল আলাইহিস্ সালাম তাঁকে ‘জামরা আল-আক্বাবা’য় নিয়ে যান। সেখানে শয়তানের আবির্ভাব ঘটে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তার দিকে (একে একে) সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করেন যতোক্ষণ না সে পালিয়ে যায়। ‘জামরা আল-উসতা’য়ও সে আবার দেখা দেয়, আর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তার দিকে আবার সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। [অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস রাঃদিয়াল্লাহু আনহু একটি কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করেন যা ঘোষণা করে, “এবং ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) তাঁকে কাত করে শায়িত করলেন^{৯৩}”]। হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম একটি সাদা রংয়ের জামা পরেছিলেন। তিনি বলেন, ‘বাবা, কাফনের কাপড় হিসেবে ব্যবহারের জন্যে আমার তো কোনো কাপড় নেই। অতএব, অনুগ্রহ করে এই জামাটি আমার শরীর থেকে অপসারণ করুন, যাতে আপনি এটা দিয়ে আমাকে দাফন-কাফন করতে পারেন।’ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম যেই তা সরাতে যাবেন, অমনি তিনি এক গায়েবী কণ্ঠস্বর শুনতে পান, যাতে বলা হয়, “হে ইবরাহীম! তুমি তো তোমার স্বপ্ন (কতোই না চমৎকারভাবে) বাস্তবিকই সত্যে রূপান্তরিত করে দেখালে^{৯৪}”। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ঘুরে তাকিয়ে দেখেন একটি সুন্দর, বড় চোখবিশিষ্ট সাদা মন্দা ভেড়া দাঁড়িয়ে আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃদিয়াল্লাহু আনহু (প্রসঙ্গতঃ) বলেন, “আমরা এধরনের ভেড়া/দুশ্বা একই জায়গায় বিক্রি করতাম।” অতঃপর তিনি আরো বলেন, “হযরত জিবরীল ফেরেশতা আলাইহিস্ সালাম পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-কে ‘জামরা আল-কুসওয়া’য় পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলে

৯৩. আল কুরআন: সূরা সফফাত, ৩৭:১০৩।

৯৪. আল কুরআন: সূরা সফফাত, ৩৭:১০৪, ১০৫।

সেখানে শয়তান আবির্ভূত হয়। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম তার দিকে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলে সে পালিয়ে যায়।^{৯৫}

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম শয়তানের দিকে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় যুগপৎভাবে আল্লাহর ‘তাকবীর’ (শ্রেষ্ঠত্ব) পাঠ করেছিলেন। এর প্রমাণস্বরূপ:

৪. হযরত মুজাহিদ ইবনে যুবায়র (বেসাল: ১০৪ হিজরী) বলেন,

حَرَجَ بِإِبْرَاهِيمَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَمَّا مَرَّ بِجُمُرَةِ الْعُقْبَةِ إِذَا بِإِبْلِيسَ عَلَيْهَا، فَقَالَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَبَّرَ وَارْمَهُ، فَارْتَفَعَ إِبْلِيسُ إِلَى الْجُمُرَةِ الْوُسْطَى، فَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: كَبَّرَ وَارْمَهُ، ثُمَّ ارْتَفَعَ إِبْلِيسُ إِلَى الْجُمُرَةِ الْقُصْوَى، فَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: كَبَّرَ وَارْمَهُ.

—পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম হযরত জিবরীল ফেরেশতা আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে অগ্রসর হন। ‘জামরা আল-আক্বাবা’ অতিক্রমকালে শয়তানের আবির্ভাব ঘটে। হযরত জিবরীল আলাইহিস্ সালাম বলেন, ‘আপনি তাকবীর পাঠ করে পাথর নিক্ষেপ করুন।’ শয়তান আবারো ‘জামরা আল-কুসওয়া’য় দেখা দিলে জিবরীল ফেরেশতা আলাইহিস্ সালাম আবারো পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-কে বলেন, ‘তাকবীর পাঠ করে তাকে পাথর নিক্ষেপ করুন।’^{৯৬}

শয়তানের দিকে কঙ্কর নিক্ষেপ করা শুধু পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এরই সুন্নাত নয়, বরঞ্চ এটা পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-এরও সুন্নাত।

৯৫. আহমদ ইবনে হাম্বল রচিত ‘আল-মুসনাদ’, ১:২৯৭; আল-তাবারানী কৃত ‘আল-মুজাম আল-কবীর’, ১০:২৬৮ #১০,৬২৮; আল-বায়হাকী প্রণীত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৫:১৫৩-১৫৪; আল-হায়সামী লিখিত ‘মজমা’ আল-যাওয়াঈদ ওয়া মানবা’ আল-ফাওয়াঈদ’, ৩:২৫৯; আল-তাবারী রচিত ‘জামে’ আল-বয়া’ন ফী তাফসীর আল-কুরআন’, ২৩:৮০; ইবনে কাসীর কৃত ‘আল-তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম’, ৪:১৬।

৯৬. আল-আযরাকী প্রণীত ‘আখবা’র মক্কা ওয়া মা’ জা’য়া ফীহা’ মিন আল-আ’সার’, ১:৬৮।

ইমাম আল-কালবী লিখেন:

إِنَّمَا سُمِّيَتْ الْجِمَارُ، الْجِمَارُ لِأَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَزِيءُ إِبْلِيسَ فَيَجْمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ.

—জিমা'র (কঙ্কর যে স্থানটিতে নিক্ষেপ করা হয়) নামকরণ হয়েছে, কেননা পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম ইবলীস শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করতেন যখনই সে তাঁর সামনে থেকে পালাতে থাকতো।^{৯৭}

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দার হাতে হাজার হাজার বছর আগে সংঘটিত এই কাজটি মহাপ্রভুর কাছে এতোই সম্ভব ছিল যে, তিনি এই উম্মতের প্রতি (হজ্জের রীতি হিসেবে) তা আবারো পালনের আদেশ জারি করেন। এটা হজ্জের প্রয়োজনীয় অংশ হয়ে যায়; যা ব্যতিরেকে হজ্জ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

এই আমল উদ্দেশ্য ও অর্থহীন নয়। কেননা, এটা আমাদেরকে তিনটি বিষয় শিক্ষা দেয়:

১. আশিয়া আলাইহিমুস্ সালামের সুন্নাতের ধারাবাহিকতা;
২. এ কাজের অনুকরণের ফলে আশিয়া আলাইহিমুস্ সালাম-এর প্রতি মহব্বত ও আনুগত্য প্রকাশ হয়;
৩. শয়তানের প্রতিনিধিত্বকারী স্তম্ভের দিকে কঙ্কর নিক্ষেপ করে মুসলমানবৃন্দ শয়তানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন।

এই পুরো আলোচনার সারমর্ম হচ্ছে, কোনো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার কথা স্মরণ করে আবেগের বহিঃপ্রকাশ কেবল শরীয়তে জায়েয-ই নয়, বরং এটা মহান আল্লাহ তা'আলার আরোপিত একটি রীতি-ও। এরই আলোকে মুসলমান সর্বসাধারণ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমন উপলক্ষে খুশি প্রকাশার্থে ধর্মীয় সভা-সমাবেশ/মাহফিলের আয়োজন করেন, তাহলে তা সম্পূর্ণ জায়েয বা বৈধ হবে।

৯৭. আল-আযরাফী রচিত প্রাণ্ডুক্ত 'আখবার মক্কা ওয়া মা' জা'য়া ফীহা' মিন আল-আসা'র', ২: ১৮১।

এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাদের আত্মিক বন্ধন সৃষ্টি করে থাকে এবং তাঁর প্রতি আমাদের এশুক-মহব্বত এবং বিশ্বাস-ও বৃদ্ধি করে বটে। প্রেমাস্পদকে স্মরণ করা এবং তাঁর মহব্বতে বিলীন হওয়া এমনই সব আহওয়াল (আধ্যাত্মিক অবস্থা), যা আল্লাহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যায়িত একটি বিষয়। খালেস নিয়তে তথা সৎ উদ্দেশ্যে পবিত্র কা'বায় হজ্জ গমন পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি আমাদের স্মৃতি জাগরুক রাখে, আর এরই ফলে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের ছোট-বড় সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন।^{৯৮} সে তুলনায় মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে মুসলমান-ব্যক্তি সালাত-সালাম পেশ করেন এবং হযূরে পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নিজ আত্মিক বন্ধন সৃষ্টি করেন, তাঁর জন্যে কী (ঐশী) পুরস্কার মঞ্জুর হতে পারে? বস্তুতঃ রাসূল-প্রেম ঈমানের সার তথা নির্যাস নয় কি?

بصطفى برسائل خويش را که دیں همه اوست
اگر به اوز سیدی، تمام بولجیبی است

১.১৯.১ একটি আপত্তি

অনেক মানুষ আছেন যারা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করেন না। তাদের আপত্তি হলো, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনের উদযাপন কোনো

৯৮. হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাণী উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন, 'من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه' 'যে কেউ হজ্জ পালন করলে, এবং কোনো অশোভনীয় আচরণ বা অপরাধ না করলে, সে তার মায়ে তাকে জন্ম দেয়ার দিনের মতোই নিষ্পাপ হয়ে যায়।' [এই হাদীসটি রওয়ায়াত করেছেন আল-বুখারী নিজ 'আল-সহীহ: কিতাব আল-হজ্জ', 'কুবুল হজ্জের গুণাবলী' শীর্ষক অধ্যায়, ২: ৫৫৩ #১৪৪৯ গ্রন্থে; ইবনে আল-জা'আদ তাঁর 'আল-মুনাদ', পৃষ্ঠা ১৪১ #৮৯৬ পৃষ্ঠকে; ইবনে মুনদাহ আপন 'আল-ঈমান', পৃষ্ঠা ৩৯২ #২৩০ বইয়ে; আল-মাকুদিসী তাঁর 'ফাদায়েল আল-আ'মাল', পৃষ্ঠা ৮১ #৩৪৭ কিতাবে; এবং আল-তাবারী নিজ 'জামে' আল-বয়া'ন ফী তাফসীর আল-কুরআ'ন', ২: ২৭৭ পৃষ্ঠকে।]

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কেননা, তাঁকে প্রেরণের (ঐশী) উদ্দেশ্য আমাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শন ও শরীয়তের জ্ঞান শিক্ষা দান ছাড়া কিছু নয়। তাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, তাঁরই শিক্ষার অনুসরণে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে আমাদের জীবন যাপন করা এবং অন্যদেরকেও একই রকম করতে বলা। এই আপত্তি উত্থাপনকারীদের মতে, মীলাদ উদযাপন শ্রেফ পণ্ড্রম এবং সময়েরও অপচয়।

১.১৯.২ আপত্তির প্রতি আমাদের জবাব

এ ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, মহানতম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তাঁর সুন্নাহ-রূপী হেদায়াতের আলো দ্বারা আমাদেরকে আশীর্বাদধন্য করতে (আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক) প্রেরিত হয়েছিলেন এবং দ্বীন-ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, সে কথা অস্বীকার করার জো নেই। এ বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য-ই নেই। হযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে আমাদের প্রতি। আর আমরাও আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ ও দয়ায় ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠার জন্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও ব্যবহারিকভাবে সংগ্রাম বা সাধনা করেছি। আমরা যে ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করছি, তা হচ্ছে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ব্যাপারে, আর এটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা বিষয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এবং তা অনুসরণ করার কোনো আলোচনাই এখানে নিহিত নেই, কেননা সেটা ধর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবে (ধর্মের) আরো অনেক দিক রয়েছে। ধর্মের মধ্যে শুধু আমল (নেক কাজ) অন্তর্ভুক্ত নয়, বরঞ্চ এতে এশকু-মহব্বত ও ভক্তির মতো আবেগ-ও বিদ্যমান। আর এই দিকটির সাথেই মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের বিষয়টি (গভীরভাবে) সম্পর্কিত।

মহান প্রভু আল্লাহ তা‘আলা তাঁরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমাদের মাঝে আবির্ভূত করে আপন সর্ববৃহৎ নেয়ামত (মানে

আশীর্বাদ) মানবসভ্যতার প্রতি মঞ্জুর করেছেন। যেদিনটিতে তাঁর বেলাদত (ধরাধামে শুভাগমন) হয়, সেদিনটি মহা আনন্দের এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও বটে। (খোদায়ী) আশীর্বাদরূপী বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাদের প্রতি তাঁরই করুণা ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন। এই কারণেই হযূরে পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত দিবস উদযাপন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মহামূল্যবান একটি কাজ। এটা এমন-ই এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা অবহেলা বা অবজ্ঞা করার মতো নয়।

আমাদের যুগ হতে হাজার হাজার বছর আগে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনা রয়েছে, যেগুলোতে (ঐশী) শিক্ষা বিদ্যমান। হজ্জের রীতিগুলোই ধরুন, প্রথম নজরে এর বিভিন্ন রীতির মধ্যে কোনো পারস্পরিক সম্পর্ক-ই (খুঁজে) পাওয়া যাবে না। দৃশ্যতঃ এগুলো বিচ্ছিন্ন বা পৃথক পৃথক ঘটনা, যেগুলো এখন অতীত। ব্যবহারিক অর্থে এসব ঘটনা আমাদের জন্যে কী শিক্ষা বহন করে? অতএব, এ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, ইসলাম ধর্ম উভয় বাস্তবতাকেই দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে: দ্বীন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে ঐশী বিধানের সাথে সম্পর্কিত ধর্মীয় শিক্ষার দিকগুলো যেমন দ্বীন-ইসলাম তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচনা করে, ঠিক তেমনি আবেগের দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে, যেটা আমাদের মন ও মগজে ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি জাগরুক রেখে আমাদেরই জীবনে ভূমিকা পালন করে থাকে। সার কথা হলো, ইসলাম ধর্ম অতীত ঘটনাবলীকে দেখে থাকে দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে: ব্যবহারিক বা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি এবং আবেগের দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত উপলক্ষে অন্তহীন খুশি প্রকাশ হচ্ছে এর ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। অর্থাৎ, এই ঘটনা আমাদের স্মৃতিপটে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে কখনোই বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। তাই মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভলগ্নে খুশি ও আনন্দের পরিবেশ বিরাজ করে। ওর প্রাপ্য সম্মান দেয়ার জন্যেই তা করা হয়।

এই বইয়ের পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলো হতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, হজ্জের রীতিগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা‘আলার প্রিয় ও আশীর্বাদধন্য বান্দাদের জীবনের সাথে জড়িত ঘটনাসংশ্লিষ্ট বিষয়। এসব ঘটনার স্মৃতি আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শনস্বরূপ সংরক্ষিত হয়েছে। এব্যাপারে যদি কোনো ভিন্নমত বা মতপার্থক্য না থাকে, তাহলে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের ব্যাপারেও কোনো আপত্তি আর থাকা উচিত নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আনন্দ ও বিষাদময় ঘটনার স্মরণে

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত (অর্থাৎ, ধরাধামে শুভাগমন) ইতিহাসের সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা। এই দিনেই বিশ্বজগতের প্রতি খোদার (অসীম) করুণা (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ধরণীতলকে নিজ তালিফ তথা শুভাগমন দ্বারা আশীর্বাদধন্য করেন। খুশি প্রকাশের জন্যে এর চেয়ে শ্রেয়তর দিন আর কোনোটাই হতে পারে না। সুখ ও হতাশা, শান্তি ও শঙ্কা, আশা ও নিরাশা হচ্ছে মানবজীবনের সেসব দিক, যেগুলো ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে প্রত্যেকের মন-মানসিকতাকে রূপায়ন করে থাকে। মহান আল্লাহ তাঁর নেয়ামত বর্ষণের মাধ্যমে অতীতকালের জাতিগুলোকে সুখ-শান্তির ঐশ্বর্য দ্বারা সমৃদ্ধ করেছিলেন, আবার তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য হওয়ার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যাপারেও তিনি তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন।

হেদায়াত তথা সত্য ও সঠিক পথের দিকে পরিচালিত হওয়ার বিষয়টি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ত। কোনো ব্যক্তির অন্তরে সত্যতারূপী বীজ যতোক্ষণ না বেড়ে ওঠে, ততোক্ষণ তার যাবতীয় কর্ম ফলদায়ক হবে না। কিন্তু যখন কেউ আধ্যাত্মিক হাল তথা অবস্থাগুলো অর্জন করেন এবং তাঁর মন ও মগজ আলোকিত হয়, তখন হেদায়াতের জ্যোতি তাঁর প্রতি বিচ্ছুরিত হয়; আর এই নূর তথা জ্যোতি দ্বারা তিনি জীবনের যাত্রাপথ লম্বা লম্বা কদমে পার হয়ে যান।

এসব অবস্থা হতে উপকার পেতে হলে প্রত্যেককে স্বীকার করতে হবে যে, এগুলোর উৎস তারই চেনা-জানাদের সাথে সম্পর্কিত। পয়গম্বর এয়া'কুব আলাইহিস্ সালাম পুত্রবিচ্ছেদের শোকে দৃষ্টিশক্তি হারান। আল্লাহ তাঁর আবার এই পয়গম্বর (ওই সময়) শোকে মুহাম্মান অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু যখন (তাঁর পুত্র) পয়গম্বর ইউসূফ আলাইহিস্ সালাম নিজের জামাটি আপন পিতার চোখের উপর রাখার জন্যে প্রেরণ করেন, তখন হযরত এয়া'কুব আলাইহিস্ সালাম-এর শোক পরিণত হয় সুখে এবং তাঁর দৃষ্টিশক্তিও ফিরে আসে। এমতাবস্থায় তাঁর অবস্থা ধৈর্য হতে কৃতজ্ঞতায় রূপ নেয়। অতএব, এটা পরিস্ফুট যে, এ ঘটনা চেনাজানার সম্পর্কের মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে। কেননা, জামাটি ছিল পয়গম্বর ইউসূফ আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে সম্পর্কিত।

অনুরূপভাবে, আমাদের জীবনেও এমন অনেক ঘটনা ঘটে থাকে, যা ওই ধরনের সম্পর্ককে ঘিরে আবর্তিত। আমাদের ঘরে বিভিন্ন জিনিস বিরাজমান, যেগুলো পূর্ববর্তী প্রজন্ম পরম্পরায় আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে; এধরনের জিনিসকে শিল্পকর্ম হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে, যেগুলোকে এমন কি স্পর্শ করলেও স্মৃতির রোমন্থন হয়। একইভাবে, আমাদের আনন্দ-বেদনার অনুভূতিগুলো-ও ওই ধরনের চেনাজানার সাথে সম্পর্কিত, আর এসব চেনাজানা হতেই আমাদের অন্তর্স্থিত (আত্মিক) অবস্থাগুলোর উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহাদিস তথা পবিত্র বাণীতে বহু বাস্তব ঘটনার বর্ণনা বিদ্যমান, যেগুলোতে মহানতম পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অনুশীলিত কর্ম দ্বারাই এই উন্মতকে আনন্দ ও বেদনাময় অবস্থাগুলোর স্মরণার্থে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর স্মৃতিচারণ শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা যদি গভীরভাবে এসব ঘটনা সম্পর্কে চিন্তা করি, তাহলে দেখতে পাবো যে, খুশিপূর্ণ ও বিষাদময় অবস্থাগুলো কোনো নির্দিষ্ট চেনাজানা কারোর সাথে সংশ্লিষ্টতারই ফসল, যা তাঁর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে উল্লেখিত এরকম কিছু ঘটনা নিচে দেয়া হলো:

২.১ পয়গম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর দিবসের স্মরণে

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মোনাওয়ারায় হিজরত করার পর সেখানে বসবাসরত ইহুদীদের তিনি ১০ই মহররম তারিখে তাদের রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তারা উত্তরে বলে, এই দিনে আল্লাহ তাঁর আলা ফেরাউনকে পানিতে ডুবিয়ে পয়গম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম-কে বিজয় দান করেন। ফেরাউনের দুঃশাসন ও অত্যাচার-নিপীড়ন হতে এ দিনেই ইসরাঈল জাতি মুক্তি লাভ করে। এই কারণে পয়গম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তাঁর আবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং দিনটিতে রোযা রাখেন। তাই আমরাও এ দিনে রোযা রাখি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের এই জবাব শুনে বলেন, আমি তোমাদের চেয়ে মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর বেশি ঘনিষ্ঠ (দুই জনই

আল্লাহর পয়গম্বর হওয়ার সূত্রে)। অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও ১০ই মহররম তারিখে নিজে রোযা রাখা আরম্ভ করেন এবং তাঁর সাহাবা রাহিয়াল্লাহু আনহুম-বৃন্দকেও অনুরূপ রোযা পালন করতে আদেশ দেন।^{৯৯}

এ থেকে পরিস্ফুট হয় যে, ইসরাঈল বংশ (তাদের) এই জাতীয় জীবনের ঘটনায় খুশি প্রকাশ করতে দিনটির স্মরণে রোযা রেখেছিল; আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও সেই ঘটনার ব্যাপারে তাঁর খুশি প্রকাশার্থে একইভাবে রোযা রেখে দিনটিকে স্মরণ করেন।

২.২ পয়গম্বর নূহ আলাইহিস্ সালাম-এর দিবসের স্মরণে

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিজরী) ও হাফেয ইবনে হাজর আল-আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হিজরী) ‘ইয়াওমে আশুরা’ (আশুরা দিবস) সম্পর্কে হযরত আবু হোরাইরা রাহিয়াল্লাহু আনহু হতে এ মর্মে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করেন যে, ওই দিনটিতে আল্লাহ তা‘আলা পয়গম্বর নূহ আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর সাথীদের প্রতিও নিজ অনুগ্রহ বর্ষণ করেন; কেননা ওই দিনেই তাঁরা কিস্তি থেকে ‘জুদী’ পর্বতশৃঙ্গে অবতরণ করেন। এরপর থেকে পয়গম্বর নূহ আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর সাথীবৃন্দ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং দিনটি পরবর্তী প্রজন্মগুলোর দ্বারা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ দিবস হিসেবে পালিত হতে

৯৯. আল-বুখারী রচিত ‘আল-সহীহ: কিতাব আল-সওম’, ‘এয়াওমে আশুরার রোযা’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:৭০৪ #১৯০০; আল-বুখারী কৃত ‘আল-সহীহ: কিতাব আল-আম্বিয়া’, ‘আল্লাহর কালাম: মুসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর সংবাদ তোমাদের কাছে পৌঁছেছে কি?’ শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১২৪৪ #৩২১৬; আল-বুখারী লিখিত ‘আল-সহীহ: কিতাব ফাযা’য়েল আল-সাহাবা’, ‘মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় এলে ইহুদীদের তাঁর কাছে আগমন’ শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১৪৩৪ #৩৭২৭; মুসলিম প্রণীত ‘আল-সহীহ: কিতাব আল-সিয়া’ম’, ‘এয়াওমে আশুরার রোযা’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:৭৯৫-৭৯৬ #১১৩০; আবু দাউদ রচিত ‘আল-সুনান: কিতাব আল-সওম’, ‘এয়াওমে আশুরার রোযা’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:৩২৬ #২৪৪৪; ইবনে মা’জাহ কৃত ‘আল-সুনান: কিতাব আল-সিয়া’ম’, ‘এয়াওমে আশুরার রোযা’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:৫৫২ #১৭৩৪; আহমদ ইবনে হাম্বল লিখিত ‘আল-মুসনাদ’, ১:২৯১ ও ৩৩৬ #২৬৪৪ ও ৩১১২; আবু এয়ালা রচিত ‘আল-মুসনাদ’, ৪:৪৪১ #২৫৬৭।

থাকে। এই দিনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও রোযা রাখেন এবং তাঁর সাহাবা-এ কেরাম রাহিয়াল্লাহু আনহুম-কেও রোযা রাখার নির্দেশ দেন।^{১০০}

২.৩ ইসলাম-ধর্মের পূর্ণতাপ্রাপ্তির দিবস: খুশি উদযাপনের দিন (ঈদ)

হযরত কা’আব আল-আহবার রাহিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি খলীফা হযরত উমর বিন আল-খাত্তাব রাহিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেন, আমি এমন এক জাতি সম্পর্কে জানি যাদের প্রতি এই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে তারা ওই দিনটিকে (মানে আয়াত নাযেলের দিনটিকে) ঈদ হিসেবে উদযাপন করতো।

হযরত উমর ফারুক রাহিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করেন, ‘সেটা কোন্ আয়াত?’ হযরত কা’আব রাহিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

—আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দীন (হিসেবে, অর্থাৎ পরিপূর্ণ জীবনবিধানরূপে) মনোনীত করেছি।^{১০১}

অতঃপর হযরত উমর রাহিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

إِنِّي لَأَعْرِفُ فِي أَيِّ يَوْمٍ أُنْزِلَتْ [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ] يَوْمَ جُمُعَةٍ، يَوْمَ عَرَفَةَ، وَهُمَا لَنَا عِيدَانِ.

১০০. আহমদ ইবনে হাম্বল কৃত ‘আল-মুসনাদ’, ২:৩৫৯-৩৬০ #৮৭০২; আল-আসকালানী রচিত ‘ফাতহুল বারী’, ৪:২৪৭।

১০১. আল কুরআন: সূরা মায়েদা, ৫:৩।

—এই আয়াতটি (‘আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম’) যেদিন নাযেল হয় সেদিনটি সম্পর্কে আমি জানি: সেদিনটি ছিল ‘আরাফা এবং শুক্রবার; আর উভয়-ই (ইতোমধ্যে) আমাদের জন্যে ঈদের দিনে পরিণত হয়েছে।’^{১০২}

এখানে হযরত কা’আব রাদিয়াল্লাহু আনহু-ই তাঁর ভাবনাকে ভাষায় প্রকাশ করেন এ মর্মে যে, এই সুসংবাদ প্রাপ্তির দিনটিকে ঈদের দিন হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। আর হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও তা অনুমোদন এবং এর সত্যতা প্রতিপাদন করেন। এ দৃষ্টান্ত থেকে এটা শেখা যায় যে, আমাদের (অর্থাৎ, মুসলমানদের) জাতীয় ও সম্প্রদায়গত জীবনে এমন কিছু ঘটনা আছে, যেগুলোর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব থাকায় সেগুলোকে ঈদের মতো করে উদযাপন করা উচিত। এ কাজটি কুরআন ও সুন্নাহর নীতির পরিপন্থী নয়। বরঞ্চ তা একটি (শরীয়ত)-সমর্থিত পুণ্যদায়ক আমল, যেটা জাতীয় ও সম্প্রদায়গত দৃষ্টিকোণ হতে গুরুত্বপূর্ণ।^{১০৩}

২.৪ আল-হিজর অতিক্রমকালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ

নবম হিজরী সালে তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময় মুসলমান বাহিনী দুটো কুয়ো অতিক্রম করেন, যেগুলো ইতিপূর্বে সামূদ গোত্রের মালিকানাধীন ছিল। এই স্থানটি সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন যে পয়গম্বর সালেহ আলাইহিস্ সালাম-এর জাতি এখানেই একটি মাদী উটকে হত্যা করেছিল, যার ফলে আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে শাস্তি দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম-বন্দকে দুটো কুয়োর মধ্যে গুধু একটি হতে

পানি সংগ্রহের অনুমতি দেন, যাতে তাঁদের চাহিদা মেটে; অপর কুয়োটি হতে পানি সংগ্রহ করতে তিনি তাঁদের বারণ করেন।

যে কুয়োটি হতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুণ্যাত্মা সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম-বন্দকে পানি সংগ্রহের নির্দেশ দেন, সেটা থেকেই ওই উটনী ইতিপূর্বে জলপান করতো। তার জন্যে পানি পানের দিন (আলাদাভাবে) বরাদ্দ থাকলেও সামূদ গোত্রের লোকেরা এটা বরদাশত করতে অক্ষম হয়ে উটনীকে পেশীতন্ত্র কেটে হত্যা করে।

(হযরত সালেহ আলাইহিস্ সালামের) ওই উটনীকে হত্যার এ ঘটনাটি ঘটেছিল বহু শতাব্দী আগে, আর নিঃসন্দেহে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাবন্দ রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহুমের সময়কাল নাগাদ সেই কুয়োটিরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। এই কুয়োটি পয়গম্বর সালেহ আলাইহিস্ সালাম-এর উটনীর সাথে সম্পর্কিত ছিল, আর এর আশীর্বাদসূত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাবন্দ রাদিয়াল্লাহু আনহুম-কে এটা থেকে পানি সংগ্রহ করতে বলেন। পক্ষান্তরে, সামূদ গোত্রের লোকেরা অপর যে কুয়োটির পানি ব্যবহার করতো, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সাহাবামণ্ডলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম-কে সেটার পানি ব্যবহার করতে বারণ করেন। কেননা, সামূদ গোত্র এরই সূত্রে আল্লাহর শাস্তির সতর্ক-বার্তা শুনতে পেয়েছিল। তাদের ওই বিশ্বাসঘাতকতার (উটনীকে হত্যা) দরুন আল্লাহ পাক তাদেরকে শাস্তি দেন এবং ফলশ্রুতিতে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ বিষয়টি স্মরণে রেখেই হযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা-এ কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম-কে ওই কুয়োর পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেন।

এই নিষেধাজ্ঞা জারির আগে পুণ্যবান সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম-বন্দের একটি দল নিজেদের অজ্ঞাতসারে ‘সামূদ’ গোত্রের ওই কুয়ো থেকে পানি ব্যবহার করেছিলেন। এই নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে শোনার পর তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয় করেন এই মর্মে যে, তাঁরা নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে না জেনেই ইতিমধ্যে ওই পানি ব্যবহার করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে ওই পানি এবং তা দ্বারা

১০২. কআল-তাবারানী রচিত ‘আল-মু’জাম আল-আওসাত’, ১:২৫৩ #৮৩০; আল-আসকালানী কৃত ‘ফাতহুল বারী’, ১:১০৫ #৪৫; ইবনে কাসীর প্রণীত ‘আল-তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম’, ২:১৪।

১০৩. [বিঃদ্র: খুশি উদযাপনের ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে এই বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় দেখুন]

রান্নাকৃত সমস্ত খাবার ফেলে দিয়ে উটনীর সাথে সম্পর্কিত কুয়ো হতে সংগৃহীত পানি ব্যবহার করতে নির্দেশ দেন।

এই ঘটনা সম্পর্কে আরো বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় নিম্নের হাদীসগুলোতে:

২.৪.১ আল-হিজরে অবস্থিত সামুদের কুয়ো হতে পানি পানে নিষেধাজ্ঞা

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ الْحِجْرَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَشْرَبُوا مِنْ بَيْرِهَا وَلَا يَسْتَقُوا مِنْهَا فَقَالُوا قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ الْعَجِينَ وَيَهْرِيقُوا ذَلِكَ الْمَاءَ.

—তাবুক জিহাদের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-হিজর এলাকায় যাত্রাবিরতি করেন এবং তাঁর সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম-বন্দকে সেখানকার কুয়ো হতে পানি পান বা সংগ্রহ করতে নিষেধ করেন। (কতিপয় সাহাবী) আরয় করেন, ‘আমরা তা দিয়ে আটার খামির বানিয়েছি এবং (জম্বুর চামড়ানির্মিত) আমাদের পানির থলেগুলো-ও পূর্ণ করেছি।’ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে আটার কাই ছুঁড়ে ফেলতে বলেন এবং কুয়ের পানিও ফেলে দিতে আদেশ করেন।^{১০৪}

২.৪.২ পয়গম্বর সালেহ আলাইহিস্ সালাম-এর মাদী উটের সাথে সংশ্লিষ্ট কুয়ো হতে জলপান সম্পর্কিত আদেশ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, (সামুদ গোত্রের অধ্যুষিত) আল-হিজর এলাকায় হযরত পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সাথে গমনকারী কিছু মানুষ সেখানকার কুয়ো থেকে পানি সংগ্রহ করে তা দ্বারা আটার কাই বানান এবং নিজেদের পানির থলেগুলো পূর্ণ করেন।

فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَهْرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بَيْرِهَا وَأَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبَيْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرُدُّهَا النَّاقَةُ.

—মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাবন্দ রাযিয়াল্লাহু আনহুম-কে ওই কুয়ের পানি ফেলে দিতে বলেন এবং আটার কাই তাঁদের উটগুলোকে খেতে দিতে আদেশ করেন। আর তিনি (পয়গম্বর সালেহ আলাইহিস্ সালামের) উটনী যে কুয়ো থেকে পানি পান করতো, তা হতে পানি সংগ্রহ করতে বলেন।^{১০৫}

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তাবুকের যুদ্ধের বছর মুসলিম সেনাবাহিনী ‘সামুদ’ গোত্রের বসতির ধ্বংসাবশেষের পাশে তাঁবু ফেলেন। তাঁরা নিজেদের পাত্র সেখানকার কুয়ের পানি দ্বারা পূর্ণ করেন এবং আটার কাই বানান, আর গোশত-ও রান্না করেন।

فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْرَاقُوا الْقُدُورَ وَعَلَفُوا الْعَجِينَ الْإِبِلَ ثُمَّ ارْتَحَلَ بِهِمْ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ عَلَى الْبَيْرِ الَّتِي كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا النَّاقَةُ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ عَذَّبُوا قَالَ إِنِّي أَخَشَى أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ.

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ সম্পর্কে জানতে পেরে) তাঁদেরকে ওই পানি ফেলে দিতে বলেন; আর তাঁরাও পানি ফেলে দেন

১০৪. আল-বুখারী প্রণীত ‘আল-সহীহ: কিতাব আল-আমিয়া’, ‘আল্লাহর বাণী: আর সামুদের প্রতি তাদের ভাই সালেহ’ শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১২৩৬-১২৩৭ #৩১৯৮; আল-কুরতুবী কৃত ‘আল-জামে’ লি-আহকা’মিল কুরআন, ১০:৪৬; আল-বাগ্বভী রচিত ‘মু’আলিমুত তানযীল’, ২:১৭৮; ইবনে হাযম লিখিত ‘আল-মুহাল্লা’, ১:২২০; আল-আসকালানী প্রণীত ‘তাগলীক আল-তা’লীক’, ৪:১৯।

১০৫. আল-বুখারী কৃত ‘আল-সহীহ: কিতাব আল-আমিয়া’, ‘আল্লাহর বাণী: আর সামুদের প্রতি তাদের ভাই সালেহ’ শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১২৩৭ #৩১৯৯; মুসলিম রচিত ‘আল-সহীহ: কিতাব আল-যুহদ’, ‘নিজেদের (আত্মার) প্রতি যুলুমকারীদের বসতিতে প্রবেশ কোরো না’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:২২৮৬ #২৯৮১; ইবনে হিব্বান লিখিত ‘আল-সহীহ, ১৪:৮২ #৬২০২; আল-বায়হাকী প্রণীত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ১:২৩৫ #১০৫০; আল-কুরতুবী কৃত ‘আল-জামে’ লি-আহকা’ম আল-কুরআন, ১০:৪৬।

এবং আটা নিজেদের উটগুলোকে খাওয়ান। অতঃপর হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে (পয়গম্বর সালেহ আলাইহিস সালামের) ওই উটনী যে কুয়ো হতে জলপান করতো, সেখানে নিয়ে যান। তিনি তাঁদেরকে (সামূদ গোত্রের) শান্তিপ্ৰাপ্ত সেসব লোকের বসতভিটায় প্রবেশ করতে নিষেধ করে বলেন, ‘আমি আশঙ্কা করি যে তাদেরকে যে শান্তি আক্রান্ত করেছে, তা তোমাদেরকেও আক্রান্ত করতে পারে। অতএব, ওদের ঘরে প্রবেশ করো না।’^{১০৬}

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে কুয়োর ওই পানি স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহারের অনুযোগী ছিল না, বরং সুপেয় জল ছিল। কিন্তু (পয়গম্বর সালেহ আলাইহিস সালামের) উটনী হত্যার দায়ে (ঐশী) শান্তিপ্ৰাপ্ত গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত হওয়ার একমাত্র কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবা রাহিয়াল্লাহু আনহুম-বন্দকে তা ব্যবহার করতে বারণ করেন। এরই বিপরীতে অপর কুয়োটি পয়গম্বর সালেহ আলাইহিস সালাম-এর উটনীর সাথে সম্পর্কিত ছিল। আর এই সম্পর্কের সূত্রেই কুয়োটিকে সম্মান দেয়া হয় এবং সেটাকে (ঐশী) করুণা ও আশীর্বাদের উৎস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।^{১০৭}

২.৪.৩ পয়গম্বর সালেহ আলাইহিস সালাম-এর মাদী উটের স্মরণে

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করে যে, কোনো নবী আলাইহিস সালাম বা রাসূল আলাইহিস সালাম-এর সাথে সম্পর্কিত আশীর্বাদ স্থায়ী প্রভাব ফেলে। সেগুলোকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং সেগুলো হতে বরকত তথা আশীর্বাদ গ্রহণ করা এমনই এক শিক্ষা যা স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদান করেছেন। এখানে বিশেষভাবে

১০৬. আহমদ ইবনে হাম্বল রচিত ‘আল-মুসনাদ’, ২:১১৭ #৫৯৮৪; ইবনে হিব্বান প্রণীত ‘আল-সহীহ’, ১৪:৮৩ #৬২০৩;

ইমাম আহমদ (রাহিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনা সর্ব-ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর আরোপিত শর্ত পূরণ করেছে।

১০৭. বঙ্গানুবাদের জরুরি জ্ঞাতব্য: লা’নতপ্রাপ্ত তথা অভিশপ্ত গোষ্ঠীর সাথে ওঠা-বসা, নামায-সমাজ ইত্যাদি বজায় রাখাও মুসলমানদের জন্যে এই দলিলে নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। এব্যাপারে উদাসীনতা পতনের কারণ হবে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, আলোচ্য কুয়োটি সে-ই কুয়ো, যেটা থেকে পয়গম্বর সালেহ আলাইহিস সালাম-এর মাদী উটটি পানি পান করতো; কিন্তু পয়গম্বর সালেহ আলাইহিস সালাম তা থেকে পানি পান করেছিলেন বলে উল্লেখিত হয়নি।

অতঃপর সহস্র সহস্র বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, আর আল্লাহ-ই ভালো জানেন ওই সময় হতে পানির কতোটুকু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, অথবা উটনীর পানকৃত জল এখনো আগের মতোই আছে কি না। তবে একমাত্র নিশ্চিত বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তা‘আলার আশিয়া আলাইহিমুস সালাম-বৃন্দের মধ্যে একজনের মালিকানাধীন উটনীর সাথে কুয়োটির সংশ্লিষ্টতা। এই সংশ্লিষ্টতাকে এতোই উচ্চমর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে যে, দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলেও কুয়োর পানিকে শ্রদ্ধা করা হয়েছে এবং এর আশীর্বাদ-ও বহাল আছে।

২.৪.৪ সামূদের প্রতি বিধানকৃত শান্তি স্মরণকালে দুঃখ প্রকাশ

সামূদ গোত্র কর্তৃক পৃথিবীর বুকে সর্বশেষ হাঁটার সময় হতে এ যাবৎ দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে। এখন তাদের আর লেশচিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট নেই। যে বদ-নসিব তাদের আক্রান্ত করেছিল, তা-ও বর্তমানে দূর-অতীত। তথাপি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুণ্যবান সাহাবাবৃন্দ রাহিয়াল্লাহু আনহুম-কে তাদের বসতভিটায় প্রবেশ করতে বারণ করেছিলেন এবং আরো আদেশ করেছিলেন যেন তাঁরা ওই ধ্বংসাবশেষ অতিক্রমের সময় দুঃখভারাক্রান্ত চিন্তে ও অশ্রুসজল নয়নে তা পার হন, যাতে মনে হয় শান্তি এখনো তাদের উপর চলমান।

১. হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাহিয়াল্লাহু আনহু উদ্ধৃত করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান:

لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِأَكْيَنَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ.

—যারা নিজেদের (আত্মার) প্রতি যুলুম করেছিল, তাদের বসতিতে অশ্রুসিক্ত (ও বেদনার্ত) অবস্থা ছাড়া প্রবেশ কোরো না, যাতে তোমাদের প্রতিও অনুরূপ শাস্তি এসে পড়ে।^{১০৮}

এই হতভাগ্য সম্প্রদায়ের ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ছিল এ মর্মে যে, দুঃখভারাক্রান্ত চিন্তে ও অশ্রুসিক্ত নয়নে তাদের ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করতে হবে। সর্বাধিক করুণাময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুণ্যবান সাহাবাবুন্দের (রাহিয়াল্লাহু আনহুম) মাধ্যমে এই উম্মতকে এটা শিক্ষা দিয়েছেন যেন আমরা যখন ধ্বংস হয়ে যাওয়া জাতিগোষ্ঠীগুলোর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কথা স্মরণ করবো, তখন আল্লাহর প্রতি এমন বিনয় প্রকাশ করবো যাতে ওই জাতিগোষ্ঠী যেভাবে খোদায়ী শাস্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল সেভাবে আমরাও আক্রান্ত না হই। যদিও দৃশ্যতঃ (সাহাবা-মণ্ডলীর মাঝে) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত উপস্থিতি এধরনের (আযাবের) ঘটনা রহিত করার অসীলস্বরূপ, তবু তাঁদেরকেও দুঃখ-বেদনাময় ভাবাপ্লুত হতে বলা হয়েছে। এই হাদীস হতে আমরা এ শিক্ষা-ই পেয়েছি।

এই বিষয়টি অন্তর ও আত্মার অনুভূতি এবং আবেগের সাথে সম্পৃক্ত। ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উপরে বর্ণিত এ হাদীসটি তাঁর ‘আল-সহীহ’ গ্রন্থের ‘কিতাব আল-রাফা’য়েকু’ (আত্ম-অস্বীকৃতি ও অন্তর কোমলকরণ) শীর্ষক অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেন। ইমাম সাহেব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) চেয়েছেন এই বার্তা পৌঁছে দিতে যে, বিষয়টি ওইসব আমল (পুণ্যদায়ক কাজ) ও অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিত, যেগুলো কারো অন্তর ও আত্মার উপর আধ্যাত্মিক প্রভাব ফেলে। এধরনের ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করার মাধ্যমে কারো অন্তস্তলে বিশেষ এক অনুভূতি বা আবেগ সৃষ্টি হয়, যার ফলে সে আধ্যাত্মিক পর্যায়ে তার জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে।

১০৮. আল-বুখারী রচিত ‘আল-সহীহ: কিতাব আল-আম্মিয়া’, ‘আল্লাহর বাণী: আর সামুদের প্রতি তাদের ভাই সালেহ’ শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১২৩৭ #৩২০০-৩২০১; মুসলিম কৃত ‘আল-সহীহ: কিতাব আল-যুহদ’, ‘যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে তাদের বসতিতে প্রবেশ কোরো না’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:২২৮৫-২২৮৬ #২৯৮০; আহমদ ইবনে হাম্বল প্রণীত ‘আল-মুসনাদ’, ২:৯৬; ইবনে হিব্বান কৃত ‘আল-সহীহ’, ১৪:৮০ #৬১৯৯; আল-রুইয়্যা’নী রচিত ‘আল-মুসনাদ’, ২:৪০৭ #১৪০৯।

কারো আত্মার মনস্তাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক উপকার যদি এতে নিহিত না থাকতো, তাহলে সর্বাধিক দয়াশীল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন তাঁর সাহাবায়ে কেরাম রাহিয়াল্লাহু আনহুমকে পুনরায় ওই অভিজ্ঞতা অর্জনে নির্দেশনা দানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন? তাঁদের আত্মিক হাল তথা অবস্থার পরিশুদ্ধি বা উন্নতিতে প্রভাব ফেলে না এমন কোনো কাজ করতে তো তিনি তাঁদেরকে আদেশ দিতে পারতেন না। তিনি তাঁদেরকে এটা করতে নির্দেশ দেয়ার বাস্তবতা-ই প্রমাণ করে যে, এসব অবস্থা ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রভাব ফেলে থাকে।

২. হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাহিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, যিনি এরশাদ ফরমান:

لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ.

—এসব (খোদায়ী) শাস্তিপ্রাপ্ত লোকদের বসতিতে অশ্রুসিক্ত অবস্থা ছাড়া প্রবেশ কোরো না। অশ্রুসজল না হতে পারলে তাতে প্রবেশ কোরো না, যাতে অনুরূপ অভিসম্পাত তোমাদের উপর এসে না পড়ে।^{১০৯}

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবা-এ কেরাম রাহিয়াল্লাহু আনহুম-কে সামুদ গোত্রের লোকদের বসতিভিটায় প্রবেশ করতে এমনভাবে নিষেধ করেন যেন তারা এখনো সেখানে জীবিতাবস্থায় আছে। এটা একারণে যে, (হযরত সালেহ আলাইহিস্ সালামের) মাদী উটকে হত্যা করার অপরাধে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করেন। যদিও এ ঘটনা দীর্ঘকাল আগে ঘটেছিল, তবুও সর্বাধিক দয়াবান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই এখানে খোদায়ী প্রতিবিধানের

১০৯. আল-বুখারী লিখিত ‘আল-সহীহ: কিতাব আল-মাসা’জিদ’, ‘শাস্তির এলাকায় নামায’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:১৬৭ #৪২৩; আল-বুখারী কৃত ‘আল-সহীহ: কিতাব আল-মাগা’যী’, ‘আল-হিজর এলাকায় মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিবির স্থাপন’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৬০৯ #৪১৫৮; মুসলিম রচিত ‘আল-সহীহ: কিতাব আল-যুহদ’, ‘যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে তাদের বসতিতে প্রবেশ কোরো না’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:২২৮৫ #২৯৮০; আল-বায়হাকী প্রণীত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ২:৪৫১; আবদ বিন হুমায়দ লিখিত ‘আল-মুসনাদ’, ১:২৫৫ #৭৯৮।

কথা স্মরণ করানোর জন্যে এবং প্রত্যেকের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় সৃষ্টির লক্ষ্যে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

মহাসম্মানিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুণ্যবান সাহাবা রাহিয়াল্লাহু আনহুম-মণ্ডলীকে আদেশ করেন যেন তাঁদের চোখের সামনে আল্লাহর শাস্তি ভেসে ওঠে, যাতে ওই ধ্বংসাবশেষ অতিক্রমকালে তাঁদের অন্তরে আল্লাহর শাস্তি পতিত হওয়ার ভীতির দরুন তাঁদের কান্না আসে। আর এটা তাঁরা না করতে পারলে তাঁদেরকে ওই উপত্যকায় প্রবেশ করতেই বারণ করা হয়। কতিপয় সাহাবা রাহিয়াল্লাহু আনহুম হযর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করেন এই মর্মে যে, তাঁরা যদি বেদনায় অশ্রুসজল না হতে পারেন, তাহলে তাঁরা কী করবেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাহিয়াল্লাহু আনহু সাহাবামণ্ডলী রাহিয়াল্লাহু আনহুম-এর এই আর্জির পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তর বর্ণনা করেন এভাবে:

فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا حَشِيَّةً أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ.

—তোমরা কাঁদতে না পারলে কান্নাকাটি করার চেষ্টা করো এ আশঙ্কায় যে তাদের প্রতি পতিত শাস্তি তোমাদের প্রতিও পতিত হতে পারে।^{১১০}

কান্নাকাটি করা শ্রেয়তর; কিন্তু কেউ তা না পারলে তার উচিত যে ব্যক্তি এটা পেরেছে, তাকে অনুকরণ করা। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা‘আলার শাস্তির কথা চিন্তা করে মানুষ যেন খোদাভীরতা অর্জন করে, এবং এরই ফলে মহান প্রভুর প্রতি বিনয়ী হয় এবং তাঁরই আশ্রয় প্রার্থনা করে। এই ঘটনা বহুকাল আগে ঘটেছিল এবং এর মুহূর্তগুলোও অতিবাহিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুতঃপবিত্র সাহাবাবৃন্দ রাহিয়াল্লাহু আনহুম-কে সাথে নিয়ে এই ঘটনার স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে একে জীবন্ত করে রেখেছেন।

১১০. ইবনে কাসীর রচিত ‘আল-বেদা’য়া ওয়াল-নেহা’য়া, ১:১৩৮; ইবনে কাসীর কৃত ‘আল-তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম’, ২:৫৫৭; আল-আসক্বালানী প্রণীত ‘ফাতহুল বা‘রী’, ৬:৩৮০।

২.৪.৫ আল-হিজর অতিক্রমকালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজস্ব আমল

সামুদ গোত্রের বসতি অতিক্রমকালে সৃষ্টিকুল শিরোমণি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চলার গতি বাড়িয়ে দেন, আর আপন চাদর দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত করেন এমনভাবে যেন (খোদায়ী) শাস্তি বুঝি ওই সময়েও পতিত হচ্ছিল।

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাহিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন:

ثُمَّ تَقَنَعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ.

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সওয়ারের জন্তর উপর বসা অবস্থাতেই আপন চাদর দ্বারা নিজেকে আবৃত করেন।^{১১১}

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাহিয়াল্লাহু আনহু আরো বর্ণনা করেন:

لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجْرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ثُمَّ قَنَعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَارَ الْوَادِي.

—মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-হিজর অতিক্রম করার সময় বলেন, “যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে, তাদের বসতিতে তোমরা প্রবেশ করো না, যাতে তোমাদের উপরও ওই শাস্তি পতিত হয়। বরঞ্চ তোমরা তাদেরকে অতিক্রম করো কান্নারত অবস্থায়।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শির মোবারক ঢেকে দ্রুতবেগে সেই স্থান পার হয়ে যান।^{১১২}

১১১. আল-বুখারী প্রণীত ‘আল-সহীহ: কিতাব আল-আম্মিয়া’, ‘আল্লাহর বাণী: আর সামুদের প্রতি তাদের ভাই সালেহ’ শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১২৩৭ #৩২০০; আহমদ ইবনে হাম্বল কৃত ‘আল-মুসনাদ’, ২:৬৬; আল-নাসাঈ রচিত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৬:৩৭৩ #১১,২৭০; ইবনে মুবারক লিখিত ‘আল-যুহদ’, পৃষ্ঠা নং ৫৪৩ #১৫৫৬।

১১২. আল-বুখারী রচিত ‘আল-সহীহ: কিতাব আল-মাগাযী’, ‘আল-হিজরে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সেনাশিবির’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৬০৯ #৪১৫৭; মুসলিম কৃত ‘আল-সহীহ: কিতাব আল-যুহদ’, ‘যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক উক্ত উপত্যকা দ্রুত অতিক্রম করার সময় নিজ শির মোবারককে ঢেকে রাখা এবং এর পাশাপাশি তাঁর পুণ্যবান সাহাবাবন্দ রাহিয়াল্লাহু আনহুম-কে কান্নারত অবস্থায় এলাকাটি পার হতে বলাটা এমন এক আমল, যাঁতে নিহিত রয়েছে আমাদের জন্যে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা।

২.৪.৫.১ বিবেচনাযোগ্য বিষয়াবলী

এসব হাদীসের আলোকে নিম্নের সিদ্ধান্তগুলো নেয়া যায়:

প্রথমতঃ আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সর্বসেরা আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতি-ই আল্লাহ তা‘আলার করুণার এক উৎস এবং তাঁর গযব (রোষ/অসন্তুষ্টি) ও আযাব (শাস্তি) নিরোধক। অতএব, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা-এ কেরাম রাহিয়াল্লাহু আনহুম-এর মাঝে স্বশরীরে উপস্থিত থাকা অবস্থায় শাস্তি পতিত হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। উপরন্তু, ওই সেনা অভিযানে শরীক হয়েছিলেন হযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যবান সাহাবীবন্দ রাহিয়াল্লাহু আনহুম, যাঁদের মধ্যে একজনও বে-ঈমান ছিলেন না, আল্লাহ মাফ করুন। ইতিহাসজুড়ে এর চেয়ে শ্রেয়তর সঙ্গি-সাথী পৃথিবীর বুকে আর কেউই ছিলেন না। এরকম মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলা শাস্তির বিধান করবেন, এ কথা কি চিন্তাও করা যায়?

ওই সময় সামূদ গোত্রের লোকেরা, যারা মাদী উটের পেশীতন্ত্র কেটে হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ করেছিল, তারা আর জীবিত ছিল না। এতদসত্ত্বেও সবচেয়ে দয়াবান মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্রপুত্র সাহাবা রাহিয়াল্লাহু আনহুম-বন্দকে এ মর্মে উপদেশ দেন যেন তাঁরা শাস্তি পতিত হওয়ার ঘটনাটি কল্পনা করেন এবং তাঁদের অন্তর ও

তাদের বসতিতে প্রবেশ করো না’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:২২৮৬ #২৯৮০; আবদুর রাযযাকু প্রণীত ‘আল-মুসান্নাফ’, ১:৪১৫ #১৬২৪; আল-বায়হাকী লিখিত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ২:৪৫১।

মস্তিষ্কে এর ভয় ও আশঙ্কার অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেন। এর ফলে প্রত্যেক সাহাবী রাহিয়াল্লাহু আনহু-ই প্রচুর কান্নাকাটি করেন এবং এই বিবেকের দংশন অনুভব করেন যে শাস্তি প্রকৃতপক্ষে তৎক্ষণাৎ পতিত হতে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই সেনা অভিযানে মহান সাহাবা রাহিয়াল্লাহু আনহুম-বন্দ একা ছিলেন না, বরং তাঁদের সাথে উপস্থিত ছিলেন সৃষ্টিকুল শিরোমণি, মহাসম্মানিত পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ ফরমান:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ.

—আর (প্রকৃত কথা হলো,) আল্লাহর এ শান নয় যে, তিনি তাদেরকে এ অবস্থায় শাস্তি দেবেন যখন (হে সম্মানিত হাবীব!) আপনিও তাদের মাঝে (বিদ্যমান) আছেন।^{১১৩}

খোশ-খবরীর (মানে ঐশী সুসংবাদের) ব্যাপারে ওয়াকেফহাল থাকা সত্ত্বেও পুণ্যবান সাহাবা-এ কেরাম রাহিয়াল্লাহু আনহুম ‘সামূদ’ গোত্রের (করুণ) পরিণতি সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন এবং আল্লাহ-ভীতির (তাকুওয়ার) কারণে তাঁর প্রতি সমর্পিত হন। এটা অনুশীলন করে তাঁরা বাস্তবায়ন করেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাসমূহ এবং পূরণ করেন দীন-ইসলামের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত, যথা— (ঐশীদানের) আনন্দঘন মুহূর্তে খুশি ও দুঃখ-বেদনার সময় শোক প্রকাশ। অন্তর ও মস্তিষ্কে মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রত্যেকের উচিত ঘটনা হতে প্রত্যাশিত আবেগগুলোর রোমন্থন করা। কারো অন্তরে এ ধরনের আবেগ ও অনুভূতি গড়ে তোলার জন্যে একটি জায়গা বানিয়ে রাখা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, কোনো কিছু স্বাভাবিকভাবে অনুভব করা আর কোনো কিছুর জন্যে অনুভূতি সৃষ্টি করার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিরাজমান। কোনো ব্যক্তির যখন বিশ্বাস অটল-অবিচল এবং তার চেনা-জানার সম্পর্ক-ও সুদৃঢ়, তখন তার আবেগ বৃদ্ধি পায় প্রেরণার ভিত্তিতে। কেউ এটা অর্জন করতে পারেন শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিজের গোলামির প্রকৃত মর্ম উপলব্ধির মাধ্যমেই। কোনো দুঃখ-বেদনার

ঘটনায় শোকের কারণে কারো অশ্রু প্রয়াসহীনভাবে গড়িয়ে পড়ে; আর খুশির ঘটনার মুহূর্তে উৎফুল্লচিত্তের কারণে কেউ স্বাভাবিকভাবেই স্মিতহাস্য করেন। এ উপায়ে অতীত ঘটনাবলীর স্মৃতিচারণ করাটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যের সাথে একদম সঙ্গতিপূর্ণ, আর এ বিষয়টি হাদীসগুলো হতে সপ্রমাণিত।

সবশেষে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হলো, পরম দয়াবান মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু তাঁর মহান সাহাবা রাঃদিয়াল্লাহু আনহুমকে কান্নারত অবস্থায় উপত্যকাটি অতিক্রম করতে বলেই ক্ষান্ত হননি, বরঞ্চ তিনি নিজেও তা অতিক্রমের সময় কাপড় দ্বারা আপন শির মোবারককে আবৃত করেছিলেন এবং তাঁর সওয়ারকৃত উট দ্রুতবেগে ছুটিয়েছিলেন। এটা (দেখে) কারো কাছে এমন মনে হতে পারতো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধ্বংসের মুখোমুখি (সামুদের) এসব লোকজন হতে বহু দূরে সরে যেতে চেয়েছিলেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম (আচরণ) করার কী প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, যদিও বাস্তবতা ছিল এ ঘটনা বহু হাজার বছর আগে ঘটেছিল? আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাকাম এমন-ই যে তিনি যেখানে যেতেন, সেখানেই রহমত (আশীর্বাদ) নাযেল হতো, আর শান্তি নিবারণ হতো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং হচ্ছেন (খোদায়ী) করুণার পরমোৎকর্ষের মূর্ত রূপ এবং মানবজাতির সুপারিশকারী ত্রাতা। যাঁর খাতিরে আল্লাহ তা‘আলা নিজের আরোপিত শাস্তি ফিরিয়ে নেন, তিনি কীভাবে ওই শান্তির ভয়ে মুহাম্মান থাকবেন? এ ধরনের চিন্তা করাটাও অসম্ভব। এমনকি সবচেয়ে দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তিও এভাবে চিন্তা করবেন না। অতএব, হুযূর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ওই হালত তথা (মানসিক) অবস্থায় উপত্যকাটি ছেড়ে যান, তাহলে স্রেফ উন্মাতকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই তিনি তা করেছিলেন।

২.৫ হস্তীবাহিনীর লোকদের প্রতি অবতীর্ণ শান্তির স্মরণ এবং মুহাসসির উপত্যকা দ্রুত অতিক্রম

মুহাসসির উপত্যকা কোথায় অবস্থিত, এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। একটি মত হলো, স্থানটি মুযদালিফা’র কাছে।^{১১৪} ফযল ইবনে আব্বাস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর ভাষ্য মোতাবেক আরেকটি মত হলো তা মিনা’য় অবস্থিত।^{১১৫} শায়খ আবদুল হক মোহাদিসে দেহেলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই দুটো মতের মধ্যে সমন্বয় করে বলেন যে, মুহাসসির উপত্যকা প্রকৃতপক্ষে মিনা’ ও মুযদালিফা’র মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।^{১১৬} মুযদালিফা’র আশপাশ এলাকাটিতে হাজ্জী সাহেববন্দ অবস্থান করলেও মুহাসসির উপত্যকাটি ওই এলাকার বাইরে হওয়ায় সেখানে অবস্থান করতে তাঁদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।^{১১৭}

যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ সূর্যোদয়ের প্রাক মুহূর্তে (ফজরের দুই রাক‘আত নামায পড়ার সময়ে) হাজ্জী সাহেববন্দ তালবিয়্যা পাঠ করতে করতে মিনা’র উদ্দেশ্যে মুযদালিফা ত্যাগ করেন; আর যখন তাঁরা মুহাসসির উপত্যকায় পৌঁছেন, তখন তাঁদেরকে আল্লাহর শান্তি হতে

১১৪. এয়া’কুত আল-হামাভী কৃত ‘মু’জাম আল-বুলদান’, ১:৪৪৯।

১১৫. মুসলিম রচিত ‘আল-সহীহ: কিতাব আল-হাজ্জ’, ‘হাজ্জীর পাঠকৃত তালবিয়্যার সময়কাল’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:৯৩১ #১২৮২; আল-নাসাঈ প্রণীত ‘আল-সুনান: কিতাব আল-মানাসিক আল-হাজ্জ’, ‘আরাফা হতে সফরের সময় শাস্তি থাকার নির্দেশ’ শীর্ষক অধ্যায়, ৫:২৮৫ #৩০২০; আল-নাসাঈ লিখিত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ২:৪৩৪ #৪০৫৬; আহমদ ইবনে হাম্বল কৃত ‘আল-মুসনাদ’, ১:২১০ #১৭৯৬; আল-বায়হাকী রচিত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৫:১২৭ #৯৩১৬।

১১৬. শায়খ আবদুল হক দেহেলভী প্রণীত ‘আশয়াত আল-লুম’আত শরহে মিশকা’ত আল-মাসাবিহ’, ২:৩৪৫।

১১৭. আহমদ ইবনে হাম্বল কৃত ‘আল-মুসনাদ’, ৪:৮২ #১৬,৭৯৭; ইবনে হিব্বান রচিত ‘আল-সহীহ’, ৯:১৬৬ #৩৮৫৪; আল-শায়বানী প্রণীত ‘কিতাব আল-মাবসূত’, ২:৪২২; ইবনে আবী শায়বা লিখিত ‘আল-মুসান্নাফ’, ৩:২৪৬ #১৩৮৮৪-১৩৮৮৫; আল-দায়লামী রচিত ‘আল-ফেরদৌস বি-মা’সূর আল-খিতাব’, ৩:৪৪ #৪১১৩; আল-বায়হাকী কৃত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৯:২৯৫ #১৯,০২১; আল-তাবারানী প্রণীত ‘আল-মু’জাম আল-কবীর’, ২:১৩৮ #১৫৮৩; আল-হায়সামী লিখিত ‘মজমা’ আল-যাওয়াঈদ ওয়া মানবা’ আল-ফাওয়াঈদ’, ৩:২৫১; আল-হায়সামী কৃত ‘মজমা’ আল-যাওয়াঈদ ওয়া মানবা’ আল-ফাওয়াঈদ’, ৪:২৫।

বাঁচতে তাঁরই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে করতে দ্রুতবেগে সে স্থান অতিক্রম করতে হয়।^{১১৮}

কেন এটা এরকম? এ কারণে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনের আগে বাদশাহ আবরাহা এক হস্তীবাহিনীসহ কা'বা শরীফ ধ্বংস করার ইচ্ছা করেছিল। তার অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সে মুহাসসির উপত্যকায় পৌঁছুলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার গযব (রোষ) তার উপর অবতীর্ণ হয়। এক ঝাঁক (আবাবীল) পাখি উপর থেকে কঙ্কর নিক্ষেপ করে তাকে এবং তার হস্তীবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।^{১১৯} এই ঘটনাটি কুরআনে করীমের সূরা ফীল, অর্থাৎ, হস্তী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে এভাবে:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۚ
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۖ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۖ فَجَعَلَهُمْ
كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ.

—আপনি কি দেখেননি, আপনার প্রতিপালক হস্তীবাহিনীর সাথে কেমন আচরণ করেছিলেন? তিনি কি তাদের ছলনা এবং কূট-কৌশলকে বিফল ও নিষ্ক্রিয় করে দেননি? আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে (চতুর্দিক থেকে) ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেছিলেন, যেগুলো তাদের উপর প্রস্তর-কংকর নিক্ষেপ করছিল। অতঃপর (আল্লাহ) তাদেরকে ভক্ষিত ভূমির মতো (ধ্বংস) করে দিলেন।^{১২০}

১১৮. ওয়াহবা আল-যুহায়লী রচিত ‘আল-ফিকহ আল-ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ’, ৩:২১৬৮।

১১৯. ইবনে হিশাম প্রণীত ‘আল-সীরা আল-নাবাউইয়া’, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৭; ইবনে আসীর কৃত ‘আল-কা'মিল ফী আল-তা'রীখ’, ১:৪৪২-৪৪৭; আল-সুহায়লী রচিত ‘আল-রওদ আল-উনুফ ফী তাফসীর আল-সীরা আল-নাবাউইয়া লি-ইবনে হিশাম’, ১:১১৭-১২৬; ইবনে আল-ওয়াদী লিখিত ‘তাতিম্মা আল-মুখতাসার ফী আখবার আল-বশর’, ১:৯২; ইবনে কাসীর প্রণীত ‘আল-বেদা'য়া ওয়া আল-নেহা'য়া’, ২:১০১-১১০; আল-কসতলা'নী কৃত ‘আল-মাওয়া'হিব আল-লাদুন্নিয়া’, ১:৯৯-১০৪; আস্-সালেহী রচিত ‘সুবুল আল-হুদা’ ওয়া আল-রাশাদ ফী সীরা খায়র আল-এবাদ’, ১:২১৭-২২২; আয-যুরকানী লিখিত ‘শরহ আল-মাওয়া'হিব আল-লাদুন্নিয়া’, ১:১৫৬-১৬৬।

১২০. আল কুরআন: সূরা ফীল, ১০৫:১-৫।

এ কারণেই হজ্জ পালনকালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুণ্যবান সাহাবা-এ কেরাম রাহিয়াল্লাহু আনহুম-কে মুহাসসির উপত্যকাটি তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে আদেশ করেন। তাঁদের আচরণ ছিল শঙ্কর, যেন এই বুঝি শাস্তি এসে পড়বে; যে শাস্তি প্রকৃতপক্ষে বহু বছর আগেই আবরাহা ও তার হস্তীবাহিনীর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুতঃপবিত্র সাহাবাবন্দ রাহিয়াল্লাহু আনহুম-কে তাঁদের নিজেদের মধ্যে আল্লাহভীতির এক অনুভূতি/হাল জাগিয়ে তুলতে বলেন। তিনি নিজেও একই কাজ করেন, আর উপত্যকাটি ত্বরিত অতিক্রম করেন।

মুহাসসির উপত্যকা পার হওয়ার সময় হযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাল/অবস্থা হযরত আলী (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বর্ণনা করেন এভাবে:

ثُمَّ أَفَاضَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ فَقَرَعَ نَاقَتَهُ فَخَبَّتْ حَتَّى جَاوَزَ الْوَادِي
فَوَقَفَ.

—তিনি মুহাসসির উপত্যকা পর্যন্ত গমন করলে তাঁর উটের লাগাম আপন পবিত্র হাতে নেন, আর উটটি দ্রুত উপত্যকা পার হয়ে যায়। অতঃপর তিনি থামেন।^{১২১}

শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেসে দেহেলভী (৯৫৮-১০৫২ হিজরী) লিখেন:

مستحب است شتاب رفتن ازین وادی، و اگر پیاده است تیز رود، و اگر سوار است تیز راند.

পদব্রজে হোক, বা সওয়ারে হোক, এই উপত্যকাটি দ্রুত পার হওয়া মুস্তাহাব (প্রশংসনীয় আমল)।^{১২২}

১২১. আল-তিরমিযী প্রণীত ‘আল-জামে’ আল-সহীহ: কিতাব আল-হাজ্জ’, ‘গোটা আরাফা দাঁড়াবার জায়গা মর্মে যাবতীয় বর্ণনা’ শীর্ষক অধ্যায়, ৩:২৩২ #৮৮৫; আহমদ ইবনে হাম্বল কৃত ‘আল-মুসনাদ’, ১:৭৫ #৫৬২; ইবনে খুযাইমা রচিত ‘আল-সহীহ’, ৪:২৭২ #২৮৬১; আল-বায়হার লিখিত ‘আল-বাহর আল-মুখার’, ২:১৬৫ #৫৩২; আবু এয়া'লা' প্রণীত ‘আল-মুসনাদ’, ১:২৬৪ #৩১২।

১২২. আবদুল হক দেহেলভী রচিত ‘আশ'আত আল-লোম'আত শরহে মিশকা'ত আল-মাসাবীহ’, ২:৩২৪।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন তাঁর সাহাবাবৃন্দকে (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) উপত্যকাটি দ্রুতবেগে অতিক্রম করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন? এখন তো আর (আবাবীল) পাখির ঝাঁক বা কঙ্করবৃষ্টির অস্তিত্বই নেই। এর উত্তর হচ্ছে, এটা এমনই এক আমল (অনুশীলন), যা থেকে আমরা উপদেশ ও সতর্কবাণী এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতিসাধন সংক্রান্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। উপত্যকাটিতে তাড়াতাড়ি পার হওয়ার এই ব্যাপারটি শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত অনুশীলনীয় একটি সুন্যাহতে পরিণত হয়েছে, আর হাঙ্গুলীদেরকে এই স্থানটি ত্বরিত অতিক্রমের হুকুম দেয়া হয়েছে।

এর পেছনে একটি উদ্দেশ্যই নিহিত আর তা হলো, অতীত ঘটনাবলী প্রত্যেকের অন্তরে স্মরণীয় হয়ে থাকা এবং মস্তিষ্কে সেগুলোকে দৃঢ়ভাবে গেঁথে রাখা। উপরোক্ত হাদীসগুলো এর সত্যতা প্রতিপাদন করে; এধরনের ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বীন-ইসলামের শিক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

২.৬ হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক ব্যক্ত অনুতাপ

কারো দ্বারা স্মৃতি রোমন্থনে আনন্দ-বেদনার আবেগ-অনুভূতি লাভ করা একেবারেই স্বাভাবিক; তাদের চেহারাতেই ওই অভিব্যক্তি দৃশ্যমান হয়। কোনো আনন্দঘন মুহূর্ত দেখা দিলে মানুষের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে; কিন্তু দুঃখবেদনায় চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে। এই সূত্রে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে:

১. হযরত আবদুর রাহমান বিন আবী লায়লা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

أَمَّا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْفَجْرِ، فَقَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ بَكَى حَتَّى سَالَتْ دُمُوعُهُ، ثُمَّ رَكَعَ.

—হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফজরের নামাযে আমাদের ইমাম হন। তিনি সূরা ইউসুফ তেলাওয়াত করছিলেন যখন নিম্নের আয়াতে পৌঁছেন “আর তাঁর নয়নযুগল শোক-সন্তাপে শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছিল, কিন্তু তিনি তাঁর দুঃখ চেপে রেখেছিলেন।” এসময় হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে থাকেন অঝোর ধারায়। এরপর তিনি রুকু (দাঁড়িয়ে নত) অবস্থায় গমন করেন।^{১২৩}

ইবনে আবযী বলেন,

صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ [وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ] وَقَعَ عَلَيْهِ الْبُكَاءُ فَرَكَعَ.

—আমি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইমামতিতে নামায পড়ছিলাম। তিনি সূরা ইউসুফ তেলাওয়াত করছিলেন যখন নিম্নের আয়াতে উপনীত হন “আর তাঁর নয়নযুগল শোক-সন্তাপে শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছিল, কিন্তু তিনি তাঁর দুঃখ চেপে রেখেছিলেন।” এমতাবস্থায় হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কান্নায় আপ্ত হয়ে পড়েন; অতঃপর তিনি রুকুতে যান।^{১২৪}

এই হাদীসগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পয়গম্বর এয়াকুব আলাইহিস্ সালাম-এর কষ্টে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহাদীসে এবং কুরআন মজীদে তাফসীরগুলোতে এমন অসংখ্য নজির আছে, যা প্রমাণ করে যে ঈমানদারীর নির্যাস মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে নিহিত— এই হালত বা আত্মিক/ আধ্যাত্মিক অবস্থার ধারণা প্রত্যেক ঈমানদারকে এর মিষ্টস্বাদের আশীর্বাদ এনে দেয়। এমনকি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনাও মূলতঃ কোনো ঈমানদারের অন্তরসংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্য; হযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ-ও তাঁরই প্রতি ঈমানদারের অন্তরের মহব্বত হতে সৃষ্ট। তাঁর আশীর্বাদধন্য বেলাদত

১২৩. আল-শায়বানী লিখিত ‘কিতাব আল-হুজ্জা ‘আলা’ আহল আল-মাদীনা’, ১:১১৩ ও ১১৫-১১৬; আল-তাহাবী প্রণীত ‘শারহ মা‘আনী আল-আসা‘র’: কিতাব আল-সালা‘ত’, ‘ফজর ওয়াক্তের সময়’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:২৩৩ #১০৫১।

১২৪. ইবনে কুদামা রচিত ‘আল-মুগ্বনী’, ১:৩৩৫।

(ধরাধামে শুভাগমন)-কে আল-কুরআনে মানবজাতির জন্যে আল্লাহ তা‘আলার সর্বশ্রেষ্ঠ রহমত (করণা) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।^{১২৫} এই রহমতের প্রতি কীভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই শুভাগমনকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা কীভাবে দেয়া যায়? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে ঈমানদারের পরম এশকু-মহব্বত কীভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে? এসব প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে একটি (সিদ্ধান্তের) দিকেই নিয়ে যায়, আর তা হচ্ছে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করা। এই শুভক্ষেণে আমরা সভা-সমাবেশের আয়োজন করি এবং ছয় পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসায় আবেগাপ্ত হই; আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ-ই তাঁর আনুগত্যে আমরা নিয়ে থাকি।

এই আলোচনার সারমর্ম হলো, অতীত ঘটনাবলীর প্রতি আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশ এবং নিজের মধ্যে ওই অবস্থা সৃষ্টি করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ’রই আওতায় পড়ে। যদিও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত শরীফের পরে চৌদ্দশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তবুও ধরাধামে তাঁর আশীর্বাদধন্য শুভাগমনকে স্মরণ করে আমরা আমাদের খুশি প্রকাশ করে থাকি। মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালনের ক্ষেত্রে যে কারণে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করি তা হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং অতীতে সংঘটিত ঘটনাবলীর ব্যাপারে তাঁর সাহাবা-এ কেরাম রাহিয়াল্লাহু আনহুম-কে সেগুলো স্মরণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন এবং ওইসব ঘটনার অভিজ্ঞতা নিজেদের (অন্তরের) মধ্যে পুনরায় জীবন্ত করে তুলতে বলেছিলেন। তাই এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবা-এ কেরাম রাহিয়াল্লাহু আনহুম-এর সুন্নাহও বটে।

এই ধূলির ধরায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন আল্লাহ তা‘আলার সর্বসেরা রহমত তথা করুণা; এ এক মহা অনুগ্রহ ও ঐশীদান। এই উম্মতের জন্যে এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লগ্ন। মা আমেনা রাহিয়াল্লাহু আনহা যে আনন্দ ও আবেগের কম্পনভাব অনুভব করেছিলেন,

প্রত্যেক মুসলমান-ব্যক্তিকেও অনুরূপ খুশি ও উৎফুল্লচিত্ত হওয়া চাই। মহাসম্মানিত পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদযাপনের মাধ্যমে এই চৌদ্দশ বছরের (ঐতিহ্যবাহী) ঘটনার স্মৃতি অন্তরে জাগরুক রাখা আমাদের জন্যে তাই অবশ্য কর্তব্য হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম-এর মীলাদের স্মরণ: একটি কুরআনী বিশ্লেষণ

ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন নিদর্শন বা চিহ্ন, যেগুলো মুসলিম উম্মাহ'র (মানে সমাজের) প্রতি এবাদত-বন্দেগীর আকারে বাধ্যতামূলক হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা একখানা বিশ্লেষণ পেশ করেছি। যদি আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দের জীবন এবাদতের মাধ্যমে স্মরণ করা যায়, তাহলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদধন্য শুভাগমনকে কেন উদযাপনের মাধ্যমে স্মরণ করা যাবে না? কুরআন মজীদে গভীর অধ্যয়ন দ্বারা প্রতীয়মান হবে যে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের বেলাদত (ধরাধামে শুভাগমন)-কে ঘিরে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর বর্ণনা দেয়া একটি ঐশী প্রথা। এই অধ্যায়ে আমরা আলোকপাত করবো আল-কুরআন কীভাবে পয়গম্বর (আলাইহিমুস্ সালাম)-বৃন্দের বেলাদতের কথা উল্লেখ করেছে।

৩.১ মীলাদের পটভূমি

আরবদের মাঝে ইমামবৃন্দ ও হাদীসশাস্ত্রবিদমণ্ডলী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত-বিষয়ে অনেক বইপত্র লিখেছেন। তাঁদের প্রচলিত ভাষায় এধরনের সাহিত্য 'মীলাদ', 'মাওয়া'লীদ' বা 'মওলুদ' হিসেবে বহুল পরিচিত। আরব বিশ্বে রবিউল আউয়াল মাসে সর্বত্র প্রসারলাভকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানবৃন্দের একটি ঐতিহ্য বিদ্যমান, যা'তে মীলাদ পাঠের জন্যে তাঁরা সভা-সমাবেশের আয়োজন করেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদপূর্ণ বেলাদতকে ঘিরে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উল্লেখ-ও করেন। ইমামমণ্ডলী ও হাদীসবেত্তাবৃন্দের লেখা মওলুদ শরীফ মদীনা মোনাওয়ারা, মক্কা মোয়াযযমা, সিরিয়া, মিসর, ইরাক, ওমান, জর্দান, আরব আমিরাতে, কুয়েত, লিবিয়া ও মরক্কো ছাড়াও পৃথিবীর সবদেশে পাঠ করা হয়। উর্দুভাষীদের মাঝে এটা 'মীলা'দ-না'মা' হিসেবে পরিচিত।

৩.২ আখিয়া আলাইহিমুস্ সালাম-বৃন্দের স্মরণ: এক ঐশী-প্রথার চর্চা

কতিপয় ‘আধুনিকতাবাদী’ এ মর্মে ধারণা লালন করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদপূর্ণ বেলাদত এখন অতীত একটি ঘটনা, তাই এর উদযাপনের কী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? তাদের দৃষ্টিতে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও সুন্দর আচার-আচরণকেই স্মরণ করা উচিত। বস্তুতঃ এধরনের মানসিকতা আল-কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি বা দর্শনের সম্পূর্ণ খেলাফ। তাই এই বিভ্রান্তি যাতে দূর হয়ে যায়, সেজন্যে এ বিষয়টির সমাধান জরুরি।

আল-কুরআন ও হাদীস শরীফের (সূক্ষ্ম) বিশ্লেষণ আমাদেরকে জ্ঞাত করে যে, আল্লাহ তা‘আলার প্রিয় ও মনোনীত বান্দাদেরকে স্মরণ করা কেবল এবাদত-ই নয়, বরং এটা স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলারই সুন্নাহ তথা অনুশীলিত রীতি। কুরআন মজীদে মহান প্রভু তাঁর বিশেষ ও পছন্দকৃত বান্দাদের কথা উল্লেখ করেন এবং বহুবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা তেলাওয়াত করেন। অতএব, এই দলিলের ভিত্তিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদপূর্ণ বেলাদত-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘটনার বিস্তারিত স্মৃতিচারণ আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুশীলিত রীতির আওতায় পড়ে।

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বর্ণনা উল্লেখ করা এতোই বড় নেয়ামতের উৎস যে, এর বাস্তবতা আমাদের সবার চোখের সামনে প্রকাশ্যে উপস্থিত। কুরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে পয়গম্বরবন্দ (আলাইহিমুস্ সালাম) ও তাঁদের উম্মতের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালামবন্দ ও সৎকর্মশীলদের (অর্থাৎ আউলিয়া কেরামের) স্মরণকে আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য করার দৃষ্টান্ত-ও পবিত্র গ্রন্থে বিরল নয়।

১. আল্লাহ তা‘আলা সূরা আল-আনআমে পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এরশাদ ফরমান:

وَأَسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

–আর (আমরা) ইসমাইল, আল-ইয়াসা’, ইউনুস এবং লূত (আলাইহিমুস্ সালামকেও হেদায়াতের মাধ্যমে মর্যাদাবান করেছিলাম। আর আমরা তাঁদের সবাইকে (তাঁদের সময়ে) সারা জাহানের অধিবাসীদের উপর মর্যাদা দিয়েছিলাম। আর তাঁদের পূর্বপুরুষ, সন্তান-সন্ততি এবং তাঁদের ভাইদের মধ্য থেকেও (কতিপয়কে অনুরূপ মর্যাদা দিয়েছিলাম); আর আমরা তাঁদেরকে (আমাদের বিশেষ কৃপা ও মহত্বের জন্যে) নির্বাচিত করেছিলাম এবং তাঁদেরকে সরলপথের দিকে হেদায়াত দান করেছিলাম।^{১২৬}

২. কুরআন মজীদে ১৪তম অধ্যায়টির (সূরার) শিরোনাম আল্লাহ তা‘আলার ঘনিষ্ঠ বন্ধু পয়গম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের নামে করা হয়েছে। এই সূরায় তাঁর দুই ছেলে সর্ব-পয়গম্বর ইসমাইল আলাইহিস্ সালাম ও ইসহাক আলাইহিস্ সালাম-কে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ.

–সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে, যিনি আমাকে বার্ধক্যে ইসমাইল এবং ইসহাক (আলাইহিমাস সালাম, দুই সন্তান) দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক দোয়া শ্রবণকারী।^{১২৭}

৩. সূরা মরিয়ম আল্লাহর আশীর্বাদধন্য বান্দাদের বর্ণনা দ্বারা পরিপূর্ণ; এতে পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালাম-বৃন্দের স্মরণে কোনো ছেদ-ই পড়েনি। এই সূরা আল্লাহ তা‘আলা আরম্ভ করেন পয়গম্বর যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম-এর দোয়া দ্বারা—

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا، إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.

–এ আলোচনা আপনার প্রতিপালকের রহমতের (যা তিনি) তাঁর (মনোনীত) বান্দা যাকারিয়া (আলাইহিস্ সালাম)-এর প্রতি (করেছেন),

১২৬. আল কুরআন: সূরা আন‘আম, ৬:৮৬-৮৭।

১২৭. আল কুরআন: সূরা ইবরাহীম, ১৪:৩৯।

যখন তিনি তাঁর প্রতিপালককে (বিনম্রভাবে) নিভৃতে আহবান করেছিলেন।^{১২৮}

৪. আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ ফরমান:

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا.

—আর আমার বিশেষ সান্নিধ্য থেকে (তাঁকে দান করেছিলাম) হৃদয়ের কোমলতা, পবিত্রতা ও ধর্মনিষ্ঠতা। আর তিনি ছিলেন পরহেযগার।^{১২৯}

৫. আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেন:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًّا.

—আর (হে সম্মানিত হাবীব! কুরআন মাজীদ) কিতাবে মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)-এর বর্ণনা করুন, যখন তিনি তাঁর পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে (ইবাদতের জন্যে নিরালায়) পূর্বদিকের গৃহে অবস্থান নিলেন।^{১৩০}

৬. আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ ফরমান:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا.

—আর আপনি কিতাবে (অর্থাৎ কুরআন মাজীদে) ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর কথা বর্ণনা করুন; নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী।^{১৩১}

৭. আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا.

১২৮. আল কুরআন: সূরা মরিয়ম, ১৯:২-৩।

১২৯. আল কুরআন: সূরা মরিয়ম, ১৯:১৩।

১৩০. আল কুরআন: সূরা মরিয়ম, ১৯:১৬।

১৩১. আল কুরআন: সূরা মরিয়ম, ১৯:৪১।

—আর (এ) কিতাবে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর বর্ণনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন (প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে মুক্ত) বিশুদ্ধচিত্ত এবং ছিলেন রেসালাতের অধিকারী নবী।^{১৩২}

৮. আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ ফরমান:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.

—আর আপনি (এ) কিতাবে বর্ণনা করুন ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-এর কথা; নিশ্চয়ই তিনি (তাঁর) অঙ্গীকারে ছিলেন সত্যশ্রয়ী এবং ছিলেন রেসালাতের অধিকারী নবী। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে ছিলেন সন্তোষভাজনের স্তরে সমাসীন।^{১৩৩}

৯. আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেন:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.

—আর (এ) কিতাবে আলোচনা করুন ইদরিস (আলাইহিস সালাম)-এর কথা; নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী। আর আমরা তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছিলাম সমুচ্চ স্থানে।^{১৩৪}

১০. অনুরূপভাবে, সূরা আম্বিয়াও পয়গম্বর আলাইহিমুস সালামবৃন্দের বর্ণনা দ্বারা পরিপূর্ণ। পঞ্চাশ ও তৎপরবর্তী আয়াতগুলোতে ধারাবাহিক বর্ণনা রয়েছে, যার শুরু হয়েছে নিম্নের কথা দ্বারা; এরশাদ করা হচ্ছে—

وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٍ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ.

—এ (কুরআন) কল্যাণময় উপদেশ, যা আমরা অবতীর্ণ করেছি। তোমরা কি একে অস্বীকার করো?^{১৩৫}

১৩২. আল কুরআন: সূরা মরিয়ম, ১৯:৫১।

১৩৩. আল কুরআন: সূরা মরিয়ম, ১৯:৫৪-৫৫।

১৩৪. আল কুরআন: সূরা মরিয়ম, ১৯:৫৬-৫৭।

১১. ‘সবচেয়ে বরকতময় যিকর (স্মরণ)’ শিরোনামে নিম্নের আয়াতটি পয়গম্বর আলাইহিস্ সালামবৃন্দের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর কথা উল্লেখ করেছে এভাবে:

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ.

—আর আমরা তো পূর্ব থেকেই ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-কে তাঁর (মর্যাদা অনুসারে) উপলব্ধি ও হেদায়াত দান করেছিলাম, আর আমরা (সম্মতি ও উপযুক্ততা বিবেচনায়) তাঁর সম্পর্কে ছিলাম সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত।^{১৩৬}

১২. বিস্তারিত একটি বিবরণের পরে সর্ব-পয়গম্বর লুত আলাইহিস্ সালাম, ইসহাক্ আলাইহিস্ সালাম ও এয়া'কুব আলাইহিস্ সালাম-এর কথাও স্মরণ করা হয়েছে এতে। এর শেষ হয়েছে এই বলে:

وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ.

—আর আমরা তাঁদের সকলকে করেছিলাম সৎকর্মপরায়ণ।^{১৩৭}

১৩. অতঃপর ওই সূরার ৭৩ নং আয়াতে উক্ত পয়গম্বর আলাইহিস্ সালাম-বৃন্দের মক্কা তথা মর্যাদার আরো বর্ণনা দেয়া হয়েছে:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ.

—আর আমরা তাদেরকে করেছিলাম (মানবজাতির) নেতা, তাঁরা (মানুষকে) আমাদের নির্দেশে হেদায়াত দান করতো। আর আমরা তাঁদেরকে কল্যাণকর কাজ ও নামায কায়েম করার এবং যাকাত আদায়ের (বিধান) প্রত্যাশা করেছিলাম। আর তাঁরা সবাই ছিলেন আমাদের নিবেদিতপ্রাণ ইবাদতকারী।^{১৩৮}

১৩৫. আল কুরআন: সূরা আশিয়া, ২১:৫০।

১৩৬. আল কুরআন: সূরা আশিয়া, ২১:৫১।

১৩৭. আল কুরআন: সূরা আশিয়া, ২১:৭২।

১৩৮. আল কুরআন: সূরা আশিয়া, ২১:৭৩।

১৪. উক্ত সূরার ৭৬-৮৪ আয়াতগুলোতে সর্ব-পয়গম্বর নূহ আলাইহিস্ সালাম, দা'উদ আলাইহিস্ সালাম, সুলাইমান আলাইহিস্ সালাম ও আইয়ুব আলাইহিস্ সালাম-এর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই স্মরণের পরিসমাপ্তি হয় পয়গম্বর আইয়ুব আলাইহিস্ সালাম-এর উল্লেখ দ্বারা এরশাদ হচ্ছে—

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ.

—সুতরাং আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাঁর যতো দুঃখ-কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলাম। আর আমরা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাদের সাথে তাদের মতো আরো কিছু। এ ছিল আমাদের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং ইবাদতকারীদের জন্যে উপদেশ (যে, আল্লাহ ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার কেমন পুরস্কার দিয়ে থাকেন)।^{১৩৯}

১৫. এর পরবর্তী আয়াতে করীমাতেই সর্ব-পয়গম্বর ইসমাঈল আলাইহিস্ সালাম, ইদরীস্ আলাইহিস্ সালাম ও যুল-কিফল আলাইহিস্ সালাম-এর কথা উল্লেখিত হয়েছে:

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ.

—আর ইসমাঈল, ইদরীস ও জুল-কিফল (আলাইহিস্ সালামকেও স্মরণ করুন)। তাঁরা সকলে ছিলেন ধৈর্যশীল। আর আমরা তাঁদেরকে আমাদের অনুগ্রহে প্রবেশ করেছিলাম। নিশ্চয়ই তাঁরা নেককারবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত।^{১৪০}

১৬. অতঃপর উক্ত সূরার ৮৭-৯০ আয়াতগুলোতে সর্ব-পয়গম্বর ইউনুস (যূনুস খেতাবে পরিচিত), যাকারিয়া ও ইয়াহইয়ার (সবার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক) কথা উল্লেখ করা হয়েছে; এই যিকরের পরিসমাপ্তি ঘটেছে তাঁদের আধ্যাত্মিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে:

১৩৯. আল কুরআন: সূরা আশিয়া, ২১:৮৪।

১৪০. আল কুরআন: সূরা আশিয়া, ২১:৮৫-৮৬।

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ.

—নিশ্চয়ই তাঁরা (সকলে) পুণ্যকাজ (সম্পাদন) করতে দ্রুত অগ্রসর হতেন। আর আমাদেরকে উদ্দীপনা ও আগ্রহ এবং ভীতি ও ভয়ের (অবস্থার) সাথে ডাকতেন এবং আমাদের সমীপে অতি নিবেদিত প্রাণে বিনয়ান্বিত হতেন।^{১৪১}

১৭. আল্লাহ তা‘আলা এরপর তাঁরই আশীর্বাদধন্য ও প্রিয় এসব বান্দার কথা স্মরণ করার উদ্দেশ্যটুকু ব্যাখ্যা করে এরশাদ ফরমান:

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ.

—নিশ্চয় এ (কুরআন) অঙ্গনে ইবাদতকারীদের জন্যে (উদ্দেশ্য হাসিলের নিমিত্তে) নিশ্চিত এবং পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে।^{১৪২}

১৮. এই পুরো সূরাটি-ই আল্লাহর সম্মানিত বান্দাদের নিরবচ্ছিন্ন এক যিকর তথা স্মরণ, কিন্তু এর চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে যখন শাহেনশাহ-এ মাহবুবীন (প্রিয়বান্দাদের মহারাজ) ও বিশ্বজগতের জন্যে আল্লাহ তা‘আলার পরম করুণা (রহমত) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলার নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের এই স্মরণের সমাপ্তি হয়েছে নিম্নের এই ভাষ্য দ্বারা এরশাদ হচ্ছে—

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

—আর (হে মহিমামণ্ডিত রাসূল!) আমরা তো আপনাকে বিশ্বজগতের জন্যে রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।^{১৪৩}

১৯. এরপর আর কোনো পয়গম্বর আলাইহিস্ সালাম-এর ব্যাপারে উল্লেখ নেই, কেননা মহব্বতের এই স্মৃতিচারণ তার চূড়ান্ত পরিণতি পেয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিকর-তায়কেরা’র পরে

১৪১. আল কুরআন: সূরা আশিয়া, ২১:৯০।

১৪২. আল কুরআন: সূরা আশিয়া, ২১:১০৬।

১৪৩. আল কুরআন: সূরা আশিয়া, ২১:১০৭।

অধ্যায়টির পরিসমাপ্তি ঘটেছে মহান আল্লাহ তা‘আলার যিকর (স্মরণ) দিয়ে; এরশাদ হয়েছে:

قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.

—(আমাদের হাবীব) আরয করলেন, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! (আমাদের মাঝে) মতো সহকারে ফায়সালা করে দাও। আর আমাদের প্রতিপালক সীমাহীন অনুগ্রহকারী, তাঁর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা হয় সেসব (হৃদয় বিদারক) বিষয়ের যা (হে কাফেরেরা!) তোমরা বর্ণনা করো’।^{১৪৪}

২০. সূরা সা‘আদ-এ আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ ফরমান:

وَإِذْ كُنَّا إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ.

—আর (আরো) স্মরণ করুন ইসমাইল, আল-ইয়াস’ এবং যুল-কিফল (আলাইহিমুস্ সালাম)-কে। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন পছন্দীয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।^{১৪৫}

এই পাঁচটি অধ্যায় হতে মাত্র কয়েকটি আয়াত-ই (এখানে) নির্বাচন করা হয়েছে; নতুবা আল্লাহ তা‘আলা তাঁরই প্রিয় বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন এমন উদ্ধৃতি কুরআন মজীদে ভরপুর। এসব উদ্ধৃত অংশে প্রিয় বান্দাদের আধ্যাত্মিক সাধনা ও প্রচেষ্টাকে স্মরণ করা হয়েছে; এই নেয়ামত-প্রাপ্ত (মানে আশীর্বাদধন্য) বান্দাদের উচ্চারিত দোয়া/প্রার্থনা-বাক্য ও সেগুলোর বর্ণনাপ্রসঙ্গ এবং ধরন সবই বর্ণিত হয়েছে। উপরন্তু, তাঁরা যে ঐশী অনুগ্রহ ও দান পেয়েছেন তার পাশাপাশি তাঁদের দৃঢ়তা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। সংক্ষেপে, তাঁদের জীবনের কোনো দিক-ই বাদ দেয়া হয়নি, আর প্রত্যেককে বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে এসব যিকর-তায়কিরা শুধু তাঁদের জন্যেই সুনির্দিষ্ট, যাঁরা আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্যে অটল, অবিচল।

কেউ আল্লাহ তা‘আলার রেযামন্দি (সন্তুষ্টি) ও নৈকট্যলাভের মাধ্যম হিসেবে এবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্যকে গ্রহণ করতে চাইলে এই যিকর-

১৪৪. আল কুরআন: সূরা আশিয়া, ২১:১১২।

১৪৫. আল কুরআন: সূরা সোয়াদ, ৩৮:৪৮।

তায়কিরাকে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এই কারণেই মহান সাহাবাবুন্দের (রাঃদিয়াল্লাহু আনহুম) সময়কাল হতে অদ্যাবধি, প্রতিটি যুগেই, সৃষ্টিকুল শিরোমণি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনবৃত্তান্তের যিকর-তায়কিরা ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য হয়েছে। ইমামবন্দ, মুহাদ্দেসীন ও আল্লাহ তা'আলার সকল পুণ্যবান বন্ধু (আউলিয়া) নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিকর-তায়কেরায় সমাবেশের আয়োজন করেছেন; আর প্রতিটি যুগেই এই ঐশী প্রথা সম্পর্কে শত শত গ্রন্থ লেখা কিংবা সংকলন করা হয়েছে।

কুরআন মজীদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালামবুন্দের বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনের বর্ণনাগুলো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই করেছেন। এক্ষেত্রে মীলাদের স্মরণ বা স্মৃতিচারণ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলারই সুন্নাহ (রীতি)।

৩.৩ আশিয়া আলাইহিমুস্ সালাম-এর মীলাদের তাৎপর্য

মহব্বতের কেউ জন্মগ্রহণ করলে তা যে-কোনো ব্যক্তির জন্যেই খুশির উপলক্ষ হয়। এ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, জন্মদিনের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। অধিকন্তু, এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায় তখন-ই, যখন উপলক্ষটি কোনো পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালাম-এর বেলাদতের সাথে সম্পর্কিত হয়। আশিয়া আলাইহিমুস্ সালামবুন্দের বেলাদত (ধরাধামে শুভাগমন) নিজে থেকেই আল্লাহ তা'আলার সেরা আশীর্বাদগুলোর অন্যতম। কোনো জাতির পয়গম্বরের (আলাইহিমুস্ সালাম) বেলাদতের মাধ্যমে সে জাতিকে অন্যান্য সব নেয়ামত দান করা হয়। বিশেষ করে সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন হেদায়াত ও ঐশীবাণী প্রাপ্তির দ্বার। তাঁর মাধ্যমেই আমরা কুরআন মজীদ ও রমজান মাস পেয়েছি। বস্তুতঃ আমরা যতো রহমত-বরকত-নেয়ামত লাভ করেছি, তা রবিউল আউয়াল মাসের সেই আলোকিত ও আশীর্বাদপূর্ণ ভোরের বদৌলতেই পেয়েছি, যে শুভলগ্নে আমাদের মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধূলির ধরায় শুভাগমন করেন। তাই তাঁর বেলাদতে খুশি হওয়া এবং তা উদযাপন করা

তাঁরই প্রতি ঈমানের লক্ষণ, আর এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কারো ব্যক্তিগত আন্তরিক অনুভূতিরই প্রতিফলন বা বহিঃপ্রকাশ।

আল-কুরআন কয়েকজন পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালাম-এর বেলাদতের কথা উল্লেখকালে ওই দিনগুলোর তাৎপর্য ও উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করে।

১. পয়গম্বর এয়াহইয়া আলাইহিমুস্ সালাম-এর বেলাদত প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান:

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.

-আর শান্তি বর্ষিত হোক ইয়াহইয়ার প্রতি, যেদিন তিনি জন্মাভ করেছেন, যেদিন তাঁর মৃত্যু হবে এবং যেদিন তাঁকে জীবিত পুনরুত্থিত করা হবে।^{১৪৬}

২. কুরআন মজীদে পয়গম্বর ঈসা আলাইহিমুস্ সালাম-এর কথাও উদ্ধৃত হয়েছে:

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.

-আর আমার প্রতি শান্তি, যেদিন আমি জন্মাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমাকে জীবিত উত্থিত করা হবে।^{১৪৭}

৩. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা শপথ করছেন এই বলে:

لَا أُفْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۖ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۖ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۚ

-আমি শপথ করছি এ (মক্কা) নগরীর, (হে মহিমাম্বিত হাবীব) এ জন্যে যে, আপনি এ নগরীর অধিবাসী। (হে আমার মহিমাম্বিত হাবীব!) শপথ

১৪৬. আল কুরআন: সূরা মরিয়ম, ১৯:১৫।

১৪৭. আল কুরআন: সূরা মরিয়ম, ১৯:৩৩।

(আপনার) পিতা (আদম অথবা ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম)-এর এবং শপথ (তাদের), যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন।^{১৪৮}

কোনো পয়গম্বর আলাইহিস্ সালামের বেলাদতের বিশেষ তাৎপর্য যদি কুরআন ও সুন্নাহ'তে না-ই থাকতো, তাহলে এই দিনকে কেন দোয়া প্রার্থনা ও শপথের জন্যে আলাদাভাবে বেছে নেয়া হয়েছে? এটা স্পষ্ট যে এই দিনটি তাৎপর্যময়, যেমনটি আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন। নিচে আল-কুরআনে প্রদত্ত কিছু সংখ্যক আশিয়া আলাইহিস্ সালাম-এর মীলাদের বর্ণনা পেশ করা হলো:

৩.৩.১ পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-এর মীলাদ

আল্লাহ তা'আলার আশীর্বাদধন্য বান্দাদের মধ্যে মানবজাতির পিতা পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-এর সৃষ্টিসম্পর্কিত বর্ণনা কুরআনে সর্বপ্রথম দেয়া হয়েছে এভাবে:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.

-আর (স্মরণ করুন সে সময়ের কথা) যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, 'আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই'।^{১৪৯}

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-এর সৃষ্টিও আগে তাঁর মীলাদ সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন, নিম্নের আয়াতগুলোতে তা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-কে যখন তাঁর মানবাকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়, ফেরেশতাকুলকে আদেশ করা হয় তাঁর প্রতি সেজদা করতে; কিন্তু ইবলীস (শয়তান) বেয়াদবি করলে তাকে আল্লাহর দরবার থেকে বের করে দেয়া হয়। পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-এর সৃষ্টির পূর্ণ বর্ণনা রয়েছে নিচে:

১৪৮. আল কুরআন: সূরা বালাদ, ৯০:১-৩।

১৪৯. আল কুরআন: সূরা বাকারা, ২:৩০।

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.

-আর (সে ঘটনার কথা স্মরণ করুন) যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, 'আমি অতি পুরনো (এবং) কালো গন্ধময়, ঠনঠনে কাঁদা মাটি থেকে এক মানব অবয়ব সৃষ্টি করবো। অতঃপর যখন আমি এর (বাহ্যিক) গঠনকে পরিপূর্ণরূপে যথাযথ অবস্থায় নিয়ে আসবো এবং এতে (এ মানব অবয়বের অভ্যন্তরে) আমার (নূরানী) রূহ ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা তার প্রতি সেজদায় লুটিয়ে পড়বে'। অতঃপর (এ মানব অবয়বের অভ্যন্তরে আল্লাহর নূরের দ্যুতি জ্বলে উঠতেই) ফেরেশতাবৃন্দ সকলেই সেজদা করলো, ইবলীস ব্যতীত, সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করলো।^{১৫০}

কুরআন মজীদে অসংখ্য স্থানে পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সৃষ্টির বিষয়ে নয়, বরঞ্চ তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক; যেমন বেহেশতে তাঁর আবাস, তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে ফেরেশতাদের ভাবনা, অভিশপ্ত শয়তানের আপত্তি ও পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-কে সেজদা করার ক্ষেত্রে শয়তানের ব্যর্থতা, এসব-ই বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ সৃষ্টিসংক্রান্ত যতোগুলো আয়াত রয়েছে, সবগুলোই পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে সংশ্লিষ্ট; এটাই তাঁর মীলাদ বা মওলুদ হিসেবে জ্ঞাত।

৩.৩.২ পয়গম্বর মুসা আলাইহিস্ সালাম-এর মীলাদ

পয়গম্বর মুসা আলাইহিস্ সালাম হচ্ছেন সেই মহান পয়গম্বর, যাকে খোদা দাবিদার নিষ্ঠুর ও স্বেচ্ছাচারী শাসক ফেরাউনের মোকাবেলা করার জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পাঠিয়ে বনু

১৫০. আল কুরআন: সূরা হিজর, ১৫:২৮-৩১।

ইসরাঈল জাতিকে ফেরাউনের অত্যাচার-নিপীড়ন ও বিশ্বাসঘাতকতা হতে রক্ষা করেছিলেন; এরই ফলশ্রুতিতে ফেরাউন পানিতে ডুবে মরে এবং (খোদার) উপদেশের এক (স্মারক) চিহ্নে সে পরিণত হয়; আর মানবতার জন্যেও এক শিক্ষা হয়ে থাকে। ফেরাউনের গণকবর্গ তাকে জানায় যে, সহসা এক শিশুর জন্ম হতে যাচ্ছে যিনি তার সিংহাসন উল্টে ফেলবেন। ফলে ফেরাউন এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তার অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। সে পুত্র-শিশুদের হত্যা করতে বলে, আর মেয়ে-শিশুদের জীবিত ছেড়ে দেয়। এমনি এক পরিস্থিতিতে পয়গম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর বেলাদত হয়, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক উল্লেখিত হয়েছে কুরআন মজীদে বিভিন্ন আয়াতে করীমায়।

সূরা আল-কাসাস আরম্ভ হয় এই ঘটনার বর্ণনা দ্বারা, যেটা ৫০টি আয়াতের সমষ্টি। প্রথম পাঁচটি আয়াত হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কীয় বর্ণনাসম্বলিত। নিচে প্রথম ১৪টি আয়াত উদ্ধৃত হলো, যেগুলো তাঁর বেলাদত হতে যৌবনকাল পর্যন্ত বর্ণনা দেয়, যা দ্বারা এই বাস্তবতা ফুটে ওঠেছে যে আশিয়া আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দের মীলাদকে স্মরণ করা আল্লাহ তা'আলারই সুন্যাহ। এরশাদ হয়েছে:

طَسْمَ، تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ، تَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَّبِعُ أَبنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، وَنُكَسِّبَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقَاهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، وَقَالَتْ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِعًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.

-ত্বোয়া- সী-ন মী-ম (প্রকৃত অর্থ আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামই অধিক অবগত)। এগুলো আলোকোজ্জ্বল কিতাবের আয়াতসমূহ। (হে সম্মানিত হাবীব!) আমরা আপনার নিকট মূসা (আলাইহিস্ সালাম) এবং ফেরাউনের প্রকৃত অবস্থা এসব লোকদের জন্যে কিছু পাঠ করে শুনাচ্ছি যারা ঈমান এনেছে। নিশ্চিত ফেরাউন পৃথিবীতে অবাধ্য ও অহঙ্কারী (নিষ্ঠুর স্বৈরশাসক) হয়ে গিয়েছিল। আর সে নিজ (রাজত্বের) বাসিন্দাদের (বিভিন্ন) দলে (ও উপদলে) বিভক্ত করে রেখেছিল। এদের মধ্যে এক দলকে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে) সে দুর্বল করে দিয়েছিল; সে তাদের পুত্রদেরকে (অনাগত শক্তিকে বিনাশের লক্ষ্যে) হত্যা করতো এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত ছেড়ে দিতো (যাতে পুরুষ ব্যতীত নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের মাঝে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে)। নিশ্চয়ই সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্যতম। আর আমরা আনুকূল্য করতে চেয়েছিলাম তাদের প্রতি যাদেরকে পৃথিবীতে (অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে নির্যাতন ও শোষণের মাধ্যমে) দুর্বল করা হয়েছিল এবং তাদেরকে (নির্যাতিত সম্প্রদায়ের) পথপ্রদর্শক ও নেতা নির্ধারণ করি এবং তাদেরকে (রাজকীয় সিংহাসনের) উত্তরাধিকারী বানাই। আর আমরা তাদেরকে রাজ্যে রাজ-ক্ষমতা প্রদান করি এবং ফেরাউন, হামান এবং উভয়ের বাহিনীকে এরূপ (বিপ্লব) প্রদর্শন করি যার কারণে তারা ভীত হয়ে পড়ে। আর আমরা মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর জননীর অন্তরে ইঙ্গিত নির্দেশ করেছিলাম, 'তাকে দুধ পান করাতে থাকো। অতঃপর যখন তুমি তাঁর (জীবনের) আশঙ্কা করবে তখন তাঁকে নদীতে ভাসিয়ে দাও। আর (এ অবস্থায়) ভীতসন্ত্রস্ত হবে না, ব্যথিতও হবে না।

অবশ্যই আমরা তাঁকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেবো এবং তাঁকে করবো রাসূলবৃন্দের একজন’। অতঃপর ফেরাউন-পরিবার তাঁকে (নদ থেকে) উঠিয়ে নিল যাতে তিনি (আল্লাহর ইচ্ছায়) তাদের শত্রু এবং দুশ্চিন্তা (উদ্বেককারী) হন। নিঃসন্দেহে ফেরাউন, হামান এবং তাদের পুরো বাহিনী দৃষ্টিসম্পাদনকারী। আর ফেরাউনের স্ত্রী (মূসা আলাইহিস সালামকে দেখে) বললেন, ‘(এ শিশু) আমার এবং তোমার চোখের শীতলতা। তাঁকে হত্যা কোরো না, সম্ভবত সে আমাদের উপকার করতে পারে অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি’। প্রকৃতপক্ষে এরা (এ পরিকল্পনার পরিণতি সম্পর্কে) ছিল অনবগত। আর মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর মায়ের অন্তর (ধৈর্য) শূন্য হয়ে গেল। তিনি (নিজের অধৈর্যের কারণে) এ গোপন বিষয় প্রায় প্রকাশ করেই দিতেন যদি না আমরা তার অন্তরে ধৈর্য এবং প্রশান্তি সুদৃঢ় করতাম; যাতে তিনি (আল্লাহর অঙ্গীকারের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন। আর (মূসা আলাইহিস সালামের মাতা) তাঁর বোনকে বললেন, ‘(তাঁর অবস্থা অবগত হওয়ার জন্যে) তাঁর পশ্চাতে গমন করো; সুতরাং সে তাঁকে দূর থেকে দেখতে লাগলো, কিন্তু তারা ছিল (সম্পূর্ণরূপে) অনবগত। আর আমরা পূর্ব হতেই মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে ধাত্রীস্নান্য পানে বিরত রেখেছিলাম; সুতরাং (মূসা আলাইহিস সালামের বোন) বললো, ‘আমি কি তোমাদের এমন গৃহের অধিবাসীর সন্ধান দেবো যারা তোমাদের জন্যে ঐকে (এ বাচ্চাকে) লালন-পালন করবে এবং তারা তাঁর কল্যাণকামী(ও) হবে?’ অতঃপর আমরা মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে (এভাবে) তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম যাতে তাঁর চক্ষু শীতল হয় এবং যাতে তিনি ব্যথিত না হন। আর যাতে তিনি (নিশ্চিতভাবে) জানতে পারেন যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। আর যখন মূসা (আলাইহিস সালাম) যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং পূর্ণ (বয়সে) পৌঁছলেন তখন আমরা তাঁকে (নবুয়্যতের) নির্দেশ, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা দান করলাম। আর আমরা নেক্কারদেরকে এভাবে পুরস্কৃত করে থাকি।^{১৫১}

এই ১৪টি আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর উল্লেখ করেছেন: পয়গম্বর মূসা আলাইহিস সালাম-এর বেলাদতের পূর্ববর্তী

ঘটনাবলী, তাঁর বেলাদতের মুহূর্ত, আল্লাহরই আদেশে তাঁকে একটি ঝুড়িতে/পাত্রে রাখা, ফেরাউনের পরিবারে তাঁকে নিয়ে যাওয়া এবং অবশেষে তাঁকে তাঁর মায়ের জিম্মায় রেখে দুধপান করে পূর্ণ যৌবনে উপনীত করা। এটাই হচ্ছে পয়গম্বর মূসা আলাইহিস সালাম-এর মীলাদ।

৩.৩.৩ মরিয়ম আলাইহিস সালাম-এর মীলাদ

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা তাঁর পাক কালামে হযরত মরিয়ম (আলাইহাস সালাম)-এর মীলাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যিনি কোনো নবী ছিলেন না, বরং একজন পুণ্যবতী মহিলা, ওলী/দরবেশ ছিলেন, আর ছিলেন মনোনীত পয়গম্বর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর মহান মাতা। তাঁর মীলাদের বর্ণনা প্রদানের আগে আল্লাহ তা‘আলা প্রথমে তাঁর কতিপয় পয়গম্বর আলাইহিমুস সালাম ও তাঁদের কুলীন বংশধরদের কথা উল্লেখ করেন; তিনি এরশাদ ফরমান:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

-অবশ্যই আল্লাহ (সম্মানীয় মর্যাদায়) মনোনীত করেছেন আদম (আলাইহিস সালাম)-কে, নূহ (আলাইহিস সালাম)-কে, ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধরকে এবং ইমরান (আলাইহিস সালাম)-এর বংশধরকে, বিশ্ব জাহানের অধিবাসীদের উপরে। তারা একই বংশজাত, একে অপরের বংশধর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক অবগত।^{১৫২}

এই ভূমিকার পরে মরিয়ম আলাইহাস সালাম-এর মীলাদের সূচনা হয়েছে। কেউ কেউ হয়তো আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন যে কুরআন মজীদ যেহেতু শ্রেফ অতীত ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়েছে, সেহেতু এটাকে কীভাবে মীলাদ বলে দাবি করা যায়? যারা এই আপত্তি তোলেন, তাঁদের বুঝা উচিত যে শিক্ষা ও হেদায়াত তথা সঠিক পথের দিক-নির্দেশনার উদ্দেশ্যে যেসব

বিষয়, সেগুলোর সীমিত পরিসর; অর্থাৎ, কেবল বিষয়বস্তুর সাথে যেসব বিষয় প্রাসঙ্গিক, সেগুলোরই উল্লেখ প্রয়োজনীয়; পক্ষান্তরে, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো কুরআনী শিক্ষার অংশ হিসেবে গঠিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন-ই নেই। নিম্নের আয়াতগুলো মরিয়ম আলাইহাস্ সালাম-এর মীলাদের কথা স্মরণ করে; এগুলো কোনো বিশেষ শিক্ষা বা হেদায়াত দানের জন্যে উপস্থাপিত হয়নি, বরঞ্চ এগুলো স্রেফ তাঁরই বেলাদতের ঘটনা স্মরণ করার উদ্দেশ্যে বর্ণিত। আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ ফরমান:

إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

—আর (স্মরণ করুন) যখন ইমরানের স্ত্রী আর্জি পেশ করলেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার উদরে যা রয়েছে, তাকে আমি (অন্যান্য দায়-দায়িত্ব থেকে) মুক্ত করে একান্ত তোমারই জন্যে মান্নত করছি, সুতরাং তুমি আমার পক্ষ থেকে (এ নয়রানা) কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সম্যক অবগত’। অতঃপর যখন তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন তখন আর্জি পেশ করলেন, ‘মাওলা! আমি তো কন্যা প্রসব করেছি’। অথচ তিনি যা প্রসব করেছিলেন আল্লাহ তা‘আলা অবগত ছিলেন। (তিনি বললেন, ‘আর কোন পুত্রসন্তান (যা আমি কামনা করেছিলাম) কখনো এ কন্যাসন্তানের মতো (হবার) নয়, (যা আল্লাহ দান করেছেন), আর আমি তাঁর নাম রেখেছি মারইয়াম (যার অর্থ ইবাদতকারিনী)। আর নিশ্চয় আমি তাঁকে এবং তাঁর বংশধরকে বিতাড়িত শয়তানের (অনিষ্ট) থেকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি।^{১৫৩}

এটাই আল্লাহ তা‘আলার প্রদত্ত মরিয়ম আলাইহাস্ সালাম-এর বেলাদতের চমৎকার বর্ণনা। পয়গম্বর যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম-এর সেবাযত্নে বেড়ে ওঠা তাঁর শৈশবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে নিম্নের আয়াতগুলোতে। ওই

সময়কালে আল্লাহ তা‘আলার বর্ষিত নেয়ামত ও তাঁরই প্রদত্ত বে-মওসুমি ফল-ফলাদির বর্ণনা-ও এসব আয়াতে হয়েছে বিধৃত। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম মরিয়ম আলাইহাস্ সালাম-এর বসতভিটার অসীলা (দোহাই) দিয়ে আল্লাহর কাছে সন্তানপ্রাপ্তির জন্যে দোয়া করেন, যার দরুন আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে (পুত্র) পয়গম্বর এয়াহইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর খোশ-খবরী (সুসংবাদ) দেন। এরশাদ হয়েছে:

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لِكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

—অতঃপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে (অর্থাৎ মারইয়ামকে) উত্তমরূপেই গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করলেন। আর দেখাশুনার জন্যে তাঁকে যাকারিয়া (আলাইহিস্ সালাম)-এর তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। যখনই যাকারিয়া (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর ইবাদতস্থলে প্রবেশ করতেন, তখনই তিনি তাঁর নিকট (নিত্য-নতুন) খাদ্যসামগ্রী বিদ্যমান পেতেন। তিনি বললেন, ‘হে মারইয়াম! এগুলো তোমার কাছে কোথা থেকে আসে?’ তিনি বললেন, ‘এ (রিযিক) আল্লাহর নিকট থেকে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অগণিত রিযিক দান করেন।’^{১৫৪}

উপরোক্ত আয়াতগুলো মরিয়ম আলাইহাস্ সালাম-এর শৈশবকাল ও বেড়ে ওঠার সাথে সম্পৃক্ত। তবে এখানেই এর শেষ নয়; সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা আরো ব্যাখ্যা করেন এমন ছোটখাটো বিষয়ও, যেখানে বিবৃত হয় মরিয়ম আলাইহাস্ সালাম-এর সেবা-যত্নের দায়দায়িত্ব নেয়ার প্রশ্নে ধর্মীয় নেতৃবর্গ কীভাবে তর্কবিতর্ক করেছিল। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন:

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، ذَٰلِكَ مِنْ

أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرِيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ.

—আর যখন ফেরেশতারা বলেছিল, ‘হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন, তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং তোমাকে আজ বিশ্ব জগতের নারীদের উর্ধ্বে মহিমান্বিত করেছেন। হে মারইয়াম! তুমি অতিশয় বিনয়ের সাথে তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করো, সেজদা করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।’ (হে প্রিয়তম!) এগুলো অদৃশ্যের সংবাদ, যা আমরা আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করছি। কিন্তু আপনি (সে সময়) তাদের নিকট ছিলেন না যখন তারা (লটারীর মাধ্যমে) তাদের কলম নিষ্ক্ষেপ করছিল যে, তাদের মধ্যে কে মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)-এর তত্ত্বাবধান করবে; আর আপনি সে সময়ও তাদের নিকট ছিলেন না যখন তারা পরস্পরে ঝগড়া করছিল।^{১৫৫}

এই হলো মরিয়ম আলাইহাস সালাম-এর মীলাদ, যা’তে দৃশ্যতঃ ছোটখাটো বর্ণনা-ও প্রদান করা হয়েছে, যেমন— ধর্মীয় নেতৃবর্গ কর্তৃক নিজেদের কলম ছুঁড়ে মারা, লটারী করা এবং পারস্পরিক তর্কবিতর্ক করা। এসব বিবরণের কোনোটির সাথেই শিক্ষা বা হেদায়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদপূর্ণ বেলাদতের বর্ণনা ও উন্নত বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে উল্লেখ এমনই এক মাধ্যম যা দ্বারা ঈমানকে নিখুঁত করা হয় এবং পূর্ণতা দেয়া হয়। আর এর মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ তা’আলার সুন্নাহ’কে আঁকড়ে ধরতে সক্ষম হই। মানুষেরা যদি এ কথা বুঝতে পারতো একজন পুণ্যবতী, দরবেশ মহিলার মীলাদের কথা কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মীলাদের কথা উল্লেখ কেন নয়? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদের উল্লেখ করা কোনোক্রমেই বেদআত (নব্য প্রথা) নয়; বরঞ্চ এটা প্রকৃত ঈমানদারির বহিঃপ্রকাশ এবং তওহীদ তথা একত্ববাদের মূল বৈশিষ্ট্য।

৩.৩.৪ পয়গম্বর ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম-এর মীলাদ

সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক পয়গম্বর ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম-এর মীলাদ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। পয়গম্বর যাকারিয়া আলাইহিস সালাম যখন মরিয়ম আলাইহাস সালাম-এর যত্র নিচ্ছিলেন, তখন তিনি মরিয়ম আলাইহাস সালাম-এর বসতিভিটায় ওই (বরকতময়) স্থানকে অসীলা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। এ সম্পর্কে মহান প্রভু এরশাদ ফরমান:

هَٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، قَالَ رَبِّ أَىُّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.

—সেখানেই যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) স্বীয় প্রতিপালকের নিকট দোয়া করলেন। তিনি আর্জি পেশ করলেন, ‘হে মাওলা! আমাকে তোমার পক্ষ থেকে পবিত্র বংশধর দান করো। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। তিনি খাস কামরায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন (অথবা দোয়া করছিলেন), তখন ফেরেশতাবৃন্দ তাঁকে ডাকলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে (সন্তান) ইয়াহইয়া (আলাইহিস সালাম)-এর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যিনি হবেন আল্লাহর বাণীর (অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালামের) সত্যায়নকারী, নেতা এবং নারীদের (আসক্তি) থেকে মুক্ত এবং (আমাদের) বিশিষ্ট পুণ্যবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত নবী’। (যাকারিয়া আলাইহিস সালাম) আর্জি পেশ করলেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! কীভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে, যখন আমাকে বার্ষিক্য পেয়ে বসেছে এবং আমার স্ত্রী(ও) বন্ধ্যা?’ তিনি বললেন, ‘এরূপেই, আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন’। আর্জি পেশ করলেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্যে কোনো নিদর্শন নির্ধারণ করে দিন’। বললেন, তোমার নিদর্শন এ যে, তিন দিন তুমি মানুষের সাথে ইশারা-ইঙ্গিত ব্যতীত কথা বলতে

পারবে না। আর নিজ প্রতিপালককে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে। ১৫৬

এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে পয়গম্বর ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর তখনো বেলাদত তথা ধরণীতলে আবির্ভাব ঘটেনি। শুধু পয়গম্বর যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম-এর দোয়া কবুল হয়েছিলমাত্র। এমনকি তাঁর বেলাদতের আগেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। অধিকন্তু, সূরা মরিয়মে পয়গম্বর ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর বেলাদতের কথা পুরোপুরি উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে প্রথম আয়াতটি তাঁর মীলাদের বর্ণনা দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে:

كَمِيعَصٍ، ذَكَرَ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا.

-কাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ। (প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই অধিক অবগত।) এ আলোচনা আপনার প্রতিপালকের রহমতের (যা তিনি) তাঁর (মনোনীত) বান্দা যাকারিয়া (আলাইহিস্ সালাম)-এর প্রতি করেছেন। ১৫৭

এসব আয়াতে জানা যায় যে, কোনো পয়গম্বরের (আলাইহিস্ সালাম) বেলাদতকে স্মরণ করাটা কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলার করুণা হিসেবে ব্যক্ত হয়েছে। পয়গম্বর ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর মীলাদের স্মরণ যদি আল্লাহর রহমত তথা করুণারই স্মরণ হয়, তাহলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদের স্মরণ-ও কেন আল্লাহর রহমতের স্মরণ হতে পারবে না? সমগ্র বিশ্বজগতের জন্যে খোদার রহমত হিসেবে যিনি প্রেরিত হয়েছেন, তাঁর থেকে সেরা আর কী রহমত হতে পারে? অতএব, যৌক্তিকভাবে বলতে গেলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদের স্মরণ প্রকৃতপ্রস্তাবে আল্লাহ তা'আলারই রহমতের স্মরণ বটে।

আল-কুরআন পয়গম্বর ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর মীলাদকে খোদার রহমত বলে উল্লেখ করেছে নিম্নবর্ণিত কারণে; এরশাদ হয়েছে:

১৫৬. আল কুরআন: সূরা আলে ইমরান, ৩:৩৮-৪১।

১৫৭. আল কুরআন: সূরা মরিয়ম, ১৯:১-২।

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا، فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.

-যখন তিনি তাঁর প্রতিপালককে (বিনম্রভাবে) নিভৃত আস্থান করেছেন, তিনি আরয় করলেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্তি দুর্বল হয়ে তখন পড়েছে এবং বার্ষিক্যের কারণে (আমার) মস্তক অগ্নিশিখার মতো শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে গিয়েছে। আর হে আমার প্রতিপালক! তোমার কাছে প্রার্থনা করে কখনো আমি বঞ্চিত হইনি। আর আমার (মৃত্যুর) পর আমার (বেদীন) স্বগোষ্ঠীয়দেরকে নিয়ে আমি আশঙ্কা করছি (তারা দীনকে নষ্ট করে দেবে); আমার স্ত্রী(ও) বন্ধ্যা, সুতরাং তুমি তোমার (বিশেষ) সান্নিধ্য থেকে আমাকে এক উত্তরাধিকারী (সন্তান) দান করো, যে আমার উত্তরাধিকারী হবে (ঐশী অনুগ্রহে) এবং (নবুয়্যতের ধারাবাহিকতায়) উত্তরাধিকারী হবে ইয়াকুব (আলাইহিস্ সালাম)-এর বংশধরদের। আর হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাকে অধিকারী কোরো তোমার সন্তোষভাজনের’। (এরশাদ হলো,) ‘হে যাকারিয়া! নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে ইয়াহইয়া (আলাইহিস্ সালাম); এ নাম তাঁর পূর্বে আমরা কাউকেই দেইনি। (যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম) আরয় করলেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! কীভাবে

আমার পুত্র হতে পারে যখন আমার স্ত্রী বন্ধা এবং আমি নিজে (প্রচণ্ড দুর্বলতায়) বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি?’ বললেন, ‘(আশ্চর্য হলো না,) এরূপই হবে’। তোমার প্রতিপালক ইরশাদ করেছেন, ‘এ আমার জন্যে সহজ এবং নিশ্চয়ই আমি এর পূর্বে তোমাকে(ও) সৃষ্টি করেছি যখন তুমি (একেবারেই) কিছুই ছিলে না’। (যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম) আরয করলেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোনো নিদর্শন দাও’। ইরশাদ হলো, ‘তোমার নিদর্শন এ যে, তুমি সুস্থ অবস্থায়ও তিন রাত (ও দিন) কারো সাথে কথা বলবে না’। অতএব (যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম) ইবাদত খানা থেকে বের হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট আগমন করলেন, অতঃপর তাদেরকে ইঙ্গিতে সকাল-সন্ধ্যা (আল্লাহর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বললেন। ‘হে ইয়াহইয়া! (আমাদের) কিতাব (তাওরাত) দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরো’, আমরা তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম প্রজ্ঞা ও (নবুয়্যতের) অন্তর্দৃষ্টি, আর আমার বিশেষ সান্নিধ্য থেকে (তাকে দান করেছিলাম) হৃদয়ের কোমলতা, পবিত্রতা ও ধর্মনিষ্ঠতা। আর তিনি ছিলেন পরহেয়গার। আর তাঁর পিতা-মাতার প্রতি ছিলেন অনুগত (ও কর্তব্যনিষ্ঠ) এবং (সাধারণ বাচ্চাদের মতো) কখনো অবাধ্য ও নাফরমান ছিলেন না।^{১৫৮}

সূরার এই প্রাথমিক আয়াতগুলো সম্পূর্ণভাবে পয়গম্বর ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর মীলাদের স্মরণেই নির্দিষ্ট হয়েছে, যেখানে তাঁর বেলাদতের কথা উল্লেখিত হয়েছে এবং তাঁরই জন্যে পয়গম্বর যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম-এর কৃত দোয়ার ব্যাপারেও উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা পয়গম্বর ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর বেলাদতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন; আর যখন পয়গম্বর যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম তাঁর বিস্ময়ের কথা ব্যক্ত করেন, তখন আল্লাহ পাক নিজ কুদরত তথা সর্বশক্তিমান হওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। সংক্ষেপে, আল্লাহ তা‘আলা ও পয়গম্বর যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম-এর মাঝে যে বাক্যালাপ হয়েছিল, তার সম্পূর্ণ বর্ণনা কুরআন মজীদে বিবৃত হয়েছে। অতঃপর পয়গম্বর ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর আধ্যাত্মিক মাকাম (স্তর)-এর কিছু দিক এবং তাঁরই জীবনের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য

সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ বেলাদত ও জীবনের ঘটনাবলী উল্লেখের পরে এই বর্ণনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে তাঁর বেলাদত, বেসালপ্রাপ্তি ও শেষ বিচার দিবসে পুনরুত্থানের প্রতি শান্তি বর্ষণের মাধ্যমে। আল-কুরআনে এসব ঘটনা স্মরণ করার উদ্দেশ্য হলো, আমাদের মস্তিষ্কে পয়গম্বর ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর মীলাদের তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। এটাই হচ্ছে কুরআনে বর্ণিত পয়গম্বর ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর মীলাদ।

৩.৩.৫ পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর মীলাদ

কুরআন মজীদে মরিয়ম আলাইহাস্ সালাম-এর মীলাদের উল্লেখের পরপরই তাঁর পুত্র পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর মীলাদের কথা উল্লেখিত হয়েছে। একটি গোটা উদ্ধৃতি তাঁর মীলাদের প্রতি উৎসর্গিত হয়েছে, যেখানে তাঁর মহান মাতাকে তাঁরই বেলাদতের আগে তাঁর ধরাধামে আবির্ভাবের সুখবর দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে:

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وَكَلَّمَهُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسَّسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

—যখন ফেরেশতারা বললো, ‘হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে নিজের পক্ষ থেকে একটি (বিশেষ) বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হবে ‘মারইয়াম তনয় মাসীহ্ ঈসা’ (আলাইহিস্ সালাম), তিনি হবেন (উভয় জাহান) ইহকালে ও পরকালে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এবং আল্লাহর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের মধ্যে গণ্য হবেন। আর তিনি মানুষের সাথে (একইভাবে) কথা বলবেন দোলনায় এবং পূর্ণ বয়সে এবং তিনি গণ্য হবেন (আল্লাহর) সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বান্দাদের মধ্যে’। (মারইয়াম আলাইহাস্

সালাম) আর্জি পেশ করলেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! কীভাবে আমার পুত্রসন্তান হবে, আমাকে তো কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি?’ তিনি বললেন, ‘এভাবেই, আল্লাহ যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন’। যখন তিনি কিছু (সম্পাদনের) সিদ্ধান্ত নেন, তখন একে কেবল বলেন, ‘হও’, তখন তা হয়ে যায়।^{১৫৯}

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর মীলাদ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার পরে আরো ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, ফেরেশতা জিবরীল আমীন আলাইহিস্ সালাম কীভাবে মরিয়ম আলাইহিস্ সালাম-এর মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন, আর তিনি কীভাবে এরপর সন্তানসম্ভবা হন। সন্তান প্রসবকালে মরিয়ম আলাইহাস্ সালাম যে ব্যথা অনুভব করেন, এমন কি তা-ও বর্ণিত হয়েছে। আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রসববেদনা উপশমে কীভাবে পানির নহর সৃষ্টি করেন এবং (তাজা) খেজুর সরবরাহ করেন, তারও উল্লেখ রয়েছে। পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর বেলাদতের মুহূর্তগুলো, পরবর্তীকালে সংঘটিত ঘটনাবলী (যা‘তে মরিয়মকে দোষারোপ ও সমালোচনা করা হয়) এবং দোলনায় অবস্থানকারী পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর প্রদত্ত জবাব, এসব-ই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কুরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন এভাবে:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا، قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، وَهَرَيَّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا

جَنِيًّا، فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، يَا أَخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَعِيًّا، فَأُشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ، مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

-আর (হে সম্মানিত হাবীব! কুরআন মাজীদ) কিতাবে মারইয়াম (আলাইহাস্ সালাম)-এর বর্ণনা করুন, যখন তিনি তাঁর পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে (ইবাদতের জন্যে নিরালায়) পূর্বদিকের গৃহে অবস্থান নিলেন। অতঃপর তিনি তাদের থেকে (অর্থাৎ পরিবার-পরিজন এবং অন্যান্য মানুষ থেকে) আড়াল হবার জন্যে পর্দা করলেন (যাতে চিরন্তন স্বর্গীয় সৌন্দর্য স্থায়ী পর্দা তুলে দেন); তখন আমরা তাঁর নিকট আমাদের রূহ (অর্থাৎ ফেরেশতা জিবরাঈলকে) প্রেরণ করলাম। অতঃপর তিনি তাঁর সামনে পূর্ণ মানবাকৃতিতে আবির্ভূত হলেন। (মারইয়াম আলাইহাস্ সালাম) বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট থেকে পরম করুণাময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদি তুমি (আল্লাহকে) ভয় করো’। (জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম) বললেন, ‘আমি তো কেবল তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত, (আমি এ জন্যে এসেছি যে,) আমি তোমাকে এক পবিত্র পুত্রসন্তান দান করবো’। (মারইয়াম আলাইহাস্ সালাম) বললেন, ‘কীভাবে আমার পুত্রসন্তান হবে যখন কোনো মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই?’ (জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম) বললেন, ‘(আশ্চর্য হয়ো না) এরূপেই হবে, তোমার প্রতিপালক বলেছেন: এ (কাজ) আমার জন্যে সহজ এবং (তা এ জন্যে হবে) যাতে আমরা তাঁকে মানুষের জন্যে নিদর্শন করতে

পারি, আর তিনি আমাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। আর এ তো (পূর্ব থেকেই) স্থিরীকৃত বিষয়। অতঃপর মারইয়াম তাঁকে ধারণ করলেন এবং (লোকালয় থেকে) আড়াল হয়ে দূরবর্তী এক স্থানে চলে গেলেন। অতঃপর প্রসব বেদনা তাকে এক খজুর বৃক্ষতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলো। তিনি (উদ্ভিগ্ন অবস্থায়) বলতে লাগলেন, ‘হায় আফসোস! আমি যদি এর পূর্বেই মরে যেতাম এবং সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে যেতাম!’ অতঃপর (জীবরাঙ্গিল অথবা স্বয়ং ঈসা আলাইহিমাস সালাম) তাঁর নিম্নদিক থেকে তাকে আহবান করলেন, ‘চিন্তিত হয়ো না, তোমার প্রতিপালক তোমার পাদদেশে এক শ্রোতধারা সৃষ্টি করেছেন (অথবা উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন মানুষকে সৃষ্টি করে তোমার নিচে শুইয়ে দিয়েছেন)। আর খেজুর কাণ্ডকে তোমার দিকে নাড়া দাও, এটি তোমাকে সুপক্ক তাজা খেজুর দেবে। সুতরাং তুমি খাও এবং পান করো এবং (নিজের সুন্দর, কমণীয় সন্তানকে দেখে) চক্ষু শীতল করো। অতঃপর যদি তুমি কোনও মানুষকে দেখো তবে (ইশরায়) বলে দিও, ‘আমি পরম করুণাময় (আল্লাহ)-এর উদ্দেশ্যে (নিশুপ থাকার) রোযা মান্নাত করেছি; সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলবো না। অতঃপর তিনি তাঁকে (কোলে) নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট আসলেন। তারা বলতে লাগলো, ‘হে মারইয়াম! অবশ্যই তুমি অদ্ভুত কিছু নিয়ে উপস্থিত হয়েছো! হে হারুনের বোন! না তোমার পিতা খারাপ মানুষ ছিলেন আর না তোমার মাতা ছিলেন ব্যভিচারিণী’। তখন মারইয়াম সন্তানের দিকে ইশারা করলেন। তারা বলতে লাগলো, ‘আমরা কীভাবে তার সাথে কথা বলবো, যে (এখনো) দোলনার গুঁশু?’ (শিশু নিজে নিজে) বলে উঠলেন, ‘অবশ্যই আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আর আমি যেখানেই থাকিনা কেন তিনি আমাকে আপাদমস্তক কল্যাণময় করেছেন। আর যতদিন আমি জীবিত থাকি, তিনি আমাকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন। আর (আমাকে) করেছেন নিজ মাতার প্রতি সদাচরণকারী, আর আমাকে উদ্ধত ও হতভাগা করেননি। আর আমার প্রতি শান্তি, যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমাকে জীবিত উত্থিত করা হবে।’ এরূপই মারইয়াম-তনয় ঈসা (আলাইহিস সালাম)। (এটিই) সত্য বিষয়, যে বিষয়ে এরা সন্দেহ পোষণ করে। আল্লাহর শান এ নয় যে, তিনি (কাউকে নিজের) পুত্র হিসেবে গ্রহণ

করবেন; তিনি (এ থেকে) পুতঃপবিত্র। যখন তিনি কোনো কিছু স্থির করেন তখন একে কেবল এ নির্দেশই দেন যে, ‘হও’, অতঃপর তা হয়ে যায়।^{১৬০}

৩.৩.৬ মনোনীত জন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আশিয়া আলাইহিমুস সালাম-বৃন্দের মীলাদের কথা উল্লেখিত হয়েছে; এসব ঘটনার বর্ণনা প্রদানকারী হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা। কুরআন মজীদ কর্তৃক পয়গম্বর আলাইহিমুস সালামবৃন্দের বেলাদত তথা ধরণীতলে শুভাগমনকে ঘিরে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা প্রদান, আশিয়া আলাইহিমুস সালামবৃন্দের মো‘জেযা তথা অলৌকিকত্ব ও আশীর্বাদের বর্ণনা দান এবং তাঁদের প্রতি বর্ষিত আল্লাহর নেয়ামতের উল্লেখকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা দেখানো যে, এটা আল্লাহ তা‘আলারই সূন্বাহ; আর এসব আয়াত বারংবার তেলাওয়াত করার পক্ষেই আল-কুরআনের (দৃঢ়) অবস্থান। হয়তো এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আল-কুরআনে অন্যান্য আশিয়া আলাইহিমুস সালামবৃন্দের মীলাদের উল্লেখ করা হয়েছে সত্য, কিন্তু আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ সম্পর্কে কি কোনো উল্লেখ এতে রয়েছে? এর উত্তর অবশ্যই হ্যাঁ-সূচক: সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদপূর্ণ মীলাদের উল্লেখ কুরআন মজীদে বিধৃত হয়েছে।

কুরআন পাকের গভীর অধ্যয়নে সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠবে যে, পয়গম্বর আলাইহিমুস সালামবৃন্দের বেলাদতের উল্লেখ দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের মান-মর্যাদাকে সুখ্যাতি দিয়েছেন। কেউ যদি কুরআনকে নিয়ে গবেষণা ও বিশ্লেষণ করেন, তাহলে তিনি দেখতে পাবেন যে অন্যান্য আশিয়া আলাইহিমুস সালামবৃন্দের মীলাদ শ্রেফ তাঁদের বেলাদতকে ঘিরে ঘটে যাওয়া ঘটনারই বর্ণনামাত্র। অথচ অপরদিকে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা বিশেষভাবে পৃথক করা হয়েছে। আল্লাহ

তা'আলা শুধু তাঁর বেলাদতের শহরের (মানে মক্কার) শপথ-ই নেননি, বরঞ্চ তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের নামেও কসম করেছেন। এরশাদ হয়েছে:

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۖ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۖ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۚ

—আমি শপথ করছি এ (মক্কা) নগরীর, (হে মহিমাম্বিত হাবীব) এ জন্মে যে, আপনি এ নগরীর অধিবাসী। (হে আমার মহিমাম্বিত হাবীব!) শপথ (আপনার) পিতা (আদম অথবা ইবরাহীম আলাইহিমাস্ সালাম)-এর এবং শপথ (তাঁদের), যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন।^{১৬১}

মক্কায় অবস্থিত রয়েছে আল্লাহর ঘর, হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর), তাওয়াফ করার স্থান, মুলতায়াম, মাক্কা'ম-এ-ইবরাহীম, যমযম কূপ, আল-সা'ফা ও আল-মারওয়া; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এগুলোর কোনোটারই কসম কাটেননি। বরঞ্চ তিনি মক্কা শহরের শপথ করেছেন, কেননা এতে তাঁর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বসতিস্থান রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতৃপুরুষদের শপথ করেছেন। এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো, আল্লাহ তা'আলা কারোরই বেলাদতের ক্ষেত্রে শপথ নেননি, ব্যতিক্রম শুধু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের বেলায়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরণ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ .

—এভাবে আমরা তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে (আমাদের) রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন, তোমাদেরকে (প্রবৃত্তি ও হৃদয়ের দিক থেকে) পবিত্র করেন এবং তোমাদের শিক্ষা দেন কিতাব, হিকমত ও বুদ্ধিমত্তা। আর তোমাদেরকে

শিক্ষাদেন (মা'রিফাত ও হাকীকতের গুঢ় রহস্যের) সেসব বিষয় যা তোমরা জানতে না।^{১৬২}

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ...

—নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুসলমানদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্য থেকে (মহিমার অধিকারী) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামকে) প্রেরণ করেছেন...।^{১৬৩}

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ...

—হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সত্য সহকারে আগমন করেছেন। সুতরাং তোমরা (তাঁর প্রতি) নিজেদের কল্যাণের জন্য ঈমান আনো।^{১৬৪}

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ.

—হে আহলে কিতাব! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আগমন করেছেন আমাদের (এ) রাসূল যিনি তোমাদের নিকট কিতাবের অনেক বিষয় (সুস্পষ্টরূপে) বর্ণনা করেন, যা তোমরা গোপন করতে এবং (তোমাদের) অনেক অমতোও উপেক্ষা করে থাকেন। নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছেন এক নূর (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম) এবং এক সমুজ্জল গ্রন্থ (অর্থাৎ কুরআন মাজীদ)।^{১৬৫}

১৬২. আল কুরআন: সূরা বাকারা, ২:১৫১।

১৬৩. আল কুরআন: সূরা আলে ইমরান, ৩:১৬৪।

১৬৪. আল কুরআন: সূরা নিসা, ৪:১৭০।

১৬৫. আল কুরআন: সূরা মায়দা, ৫:১৫।

১৬১. আল কুরআন: সূরা বালাদ, ৯০:১-৩।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

-হে আহলে কিতাব! নিশ্চয়ই রাসূলবৃন্দের (ধারাবাহিক) আগমনের বিরতির পর তোমাদের নিকট আগম করেছেন আমাদের (সর্বশেষ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), যিনি তোমাদের নিকট (আমাদের বিধিবিধান) সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন; কারণ তোমরা (অজুহাত পেশ করার মাধ্যমে এ কথা) বলতে, ‘আমাদের নিকট না কোনো সুসংবাদদাতা আগমন করেছেন, আর না কোনো সতর্ককারী। (এখন তোমাদের এ অজুহাতও শেষ হয়ে গেল, কেননা) নিঃসন্দেহে তোমাদের নিকট (সর্বশেষ) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী(ও) আগমন করেছেন। আর আল্লাহ সকল কিছু উপর ক্ষমতাবান।^{১৬৬}

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ.

-অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে (একজন সম্মানিত) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমন করেছেন। তোমাদের ভোগান্তি এবং কষ্টে পতিত হওয়া তাঁর জন্যে খুবই কষ্টদায়ক। (হে লোকসকল!) তিনি তোমাদের (কল্যাণ এবং হিদায়াতের) খুবই আকাঙ্ক্ষী এবং উদগ্রীব। (আর) মুমিনদের জন্যে চূড়ান্ত(ই) দয়র্দ, সীমাহীন অনুগ্রহশীল।^{১৬৭}

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

-আর (হে মহিমান্বিত রাসূল!) আমরা তো আপনাকে বিশ্বজগতের জন্যে রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।^{১৬৮}

১৬৬. আল কুরআন: সূরা মায়দা, ৫:১৯।

১৬৭. আল কুরআন: সূরা তাওবা, ৯:১২৮।

১৬৮. আল কুরআন: সূরা আশিয়া, ২১:১০৭।

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

-তিনিই সেই সত্তা, যিনি উম্মীদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে একজন (সম্মানিত) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের নিকট আবৃত্তি করেন তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাদেরকে (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে) পরিশুদ্ধ করেন, আর তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। বস্তুত তারা তাঁর (সাদর আগমনের) পূর্বে ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।^{১৬৯}

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا...

-নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের প্রতি এক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরণ করেছি...।^{১৭০}

উপরের আয়াতগুলোতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমন সম্পর্কে উল্লেখ আছে, আর এটা মূলতঃ তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ বেলাদতেরই যিকর-তায়কেরা (স্মরণ)। কেউ যদি গভীরভাবে এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করেন, তাহলে বুঝা যাবে যে আল্লাহ তা’আলা তাঁর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেলাদতের কথা উল্লেখ করেছেন গোটা মানবতাকে উদ্দেশ্যে করেই; ঈমানদারদের পাশাপাশি আহলে কেতাব (ইহুদী/খৃষ্টান), অবিশ্বাসী ও মুশরিকদেরও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেককেই সচেতন করা হয়েছে যে আল্লাহর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুভাগমন করতে যাচ্ছেন; তাঁর এই শুভাগমনকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্যে (আল্লাহর) করুণা ও আশীর্বাদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের যিকর তথা স্মরণকে এতো উচ্চমর্যাদা দিয়েছেন যে, কেউই আর এটাকে হাঙ্কা ব্যাপার হিসেবে নিতে পারবে না।

১৬৯. আল কুরআন: সূরা জুমু’আহ, ৬২:২।

১৭০. আল কুরআন: সূরা মুযাম্মিল, ৭৩:১৫।

আল্লাহ তা'আলা এসব আয়াতে করীমার মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীকে শিক্ষা দিয়েছেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদপূর্ণ বেলাদতের স্মরণ অনাগত প্রজন্মগুলোর জন্যে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এরই আলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের যিকর-তায়কেরার প্রয়োজনীয়তাকে যে মানসিকতা হয়ে প্রতিপন্ন করে, তাকে আশিয়া আলাইহিমুস্ সালাম-এর মীলাদের উল্লেখকারী ডজনকে ডজন আয়াতের প্রত্যাখ্যানকারী হিসেবে সাব্যস্ত করা যায়। আমরা যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর মীলাদের পরিপ্রেক্ষিতে স্মরণ করি, তখন আমরা আল্লাহরই সুন্নাহকে অনুকরণ-অনুসরণ করে থাকি এবং ফলশ্রুতিতে তাঁরই আদেশ মেনে চলি। এসব আয়াত, যেগুলোতে আল্লাহর আশীর্বাদধন্য বান্দাদের বেলাদতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো কেউ সযত্নে অধ্যয়ন করলে জানা যাবে যে সেসব ঘটনায় কোনো বিশেষ শিক্ষা বা পথপ্রদর্শনমূলক বার্তা নিহিত নেই (যা আমাদের জীবনে সরাসরি বাস্তবায়ন করা যায়); বরঞ্চ সেগুলো বর্ণনা মাত্র, যার উদ্দেশ্য হলো (শ্রেফ) আশিয়া আলাইহিমুস্ সালাম-এর মীলাদকেই স্মরণ করা।

৩.৪ আশিয়া আলাইহিমুস্ সালামের মীলাদ হতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদের ধারাবাহিকতা

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাঁর আশীর্বাদধন্য প্রিয় বান্দাদের মীলাদের স্মরণকে এতো উচ্চমর্যাদা দিয়েছেন যে এমনকি এসব প্রিয় বান্দার মনে যে সকল চিন্তার উদ্বেক হয়েছিল, সেগুলোরও তিনি উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, কেউ পয়গম্বর ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর মীলাদ সম্পর্কে অধ্যয়ন করলে দেখতে পাবেন যে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম মরিয়ম আলাইহাস্ সালাম-এর মঠরূপী আবাসস্থলে প্রবেশ করার পর সেখানে বে-মওসুমি ফল-ফলাদির খোঁজ পেয়ে তিনি সন্তানপ্রাপ্তির আশায় দোয়া করেছিলেন। আর যখন তাঁকে একজন সৎ ও মতোপরায়ণ পুত্রসন্তান-প্রাপ্তির খোশখবরি দেয়া হয়েছিল, তখন নিজের বার্ধক্য ও তাঁরই স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের কারণে কীভাবে সন্তান লাভ হবে সে সম্পর্কে তাঁর মনে এক

চিন্তার উদ্বেক হয়। এরই ফলে তিনি আল্লাহ তা'আলাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন-ও করেন। কুরআন মজীদে এই ঘটনা ও এর প্রতি (খোদার) জবাব-ও উল্লেখিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে, পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর মীলাদের অধ্যয়ন-ও ঈমানকে দারুণভাবে সতেজ করে তোলে এবং চিন্তার খোরাক যোগায়। প্রদত্ত কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনা পাঠের পর কেউ শ্রেফ থমকে একথা চিন্তা করবেন যে, এসব বর্ণনা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা কী হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মরিয়ম আলাইহাস্ সালাম-এর অনুভূত প্রসববেদনা ও এই শঙ্কাবোধের বহিঃপ্রকাশ যে এর আগে যদি তাঁর মৃত্যু হতো এবং তিনি বিস্মৃত হতেন। পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর বেলাদতের সময় ফেরেশতা জিবরীল আলাইহিস্ সালাম-এর উপস্থিতি হতে আরম্ভ করে প্রতিটি খুঁটিনাটি বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এসব বর্ণনা প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে সচেতন করে তুলেছেন এ মর্মে যে, আল-কুরআনে যেভাবে পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দের মীলাদের পূর্ণ বৃত্তান্ত দেয়া হয়েছে, ঠিক তেমনি তাঁর সর্বাধিক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদের সময় যখন আগমন করবে তখন একই উপায়ে সেটারও স্মরণ করতে হবে। পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-এর ঔরস হতে পিতা আবদুল্লাহ'র ঔরস হয়ে মা আমেনা'র কোলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী বেলাদত তথা জ্যোতির্ময় শুভাগমন ও তৎপরবর্তী পর্যায়ে (দুধ-মা) হালিমা আল-সা'দিয়া কর্তৃক লালন-পালন পর্যন্ত সমস্ত বর্ণনা-ই প্রত্যেকের স্মরণ করা উচিত। এসব বর্ণনা এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রত্যক্ষকৃত সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়, নেয়ামত তথা আশীর্বাদ ও মো'জেয়া (অলৌকিকত্ব)-এর কথা উল্লেখিত হয়, কিছুই যাতে বাদ না পড়ে। এটা মহান আল্লাহ তা'আলার সুন্নাত (রীতিনীতি) এবং এর পক্ষেই আল-কুরআনের অবস্থান। অন্যান্য পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দের মীলাদের কথা ঐশী কালাম (বাণী)-এর সূত্রে আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই প্রকাশ করেছেন; আর স্পষ্টতঃ আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদের স্মরণ অনাগত প্রজন্মগুলোই করবেন, যেহেতু তাঁর পরে অন্য কোনো নবী আর

আসবেন না। এই কারণেই তাঁর যিকর-তায়কেরা (স্মরণ) এ উম্মতকেই করতে হবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ হচ্ছে ওইসব ঘটনার যিকর-তায়কেরা (স্মরণ) যা তাঁর ধরাধামে শুভাগমনের আগে এবং ওই শুভক্ষণে ঘটেছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর (জ্যোতি) কীভাবে পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-এর ঔরস হতে পুণ্যবান পুরুষদের ঔরস ও মতোনিষ্ঠ নারীদের গর্ভে স্থানান্তরিত হয়ে (তাঁর বাবা) আব্দুল্লাহর ঔরসে পৌঁছে, এটা তারই উল্লেখ; আর তাঁরই বেলাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলা কীভাবে মানবজাতির প্রতি নিজের অসংখ্য রহমত-বরকত-নেয়ামত (আশীর্বাদ) বর্ষণ করেছেন, সেটারও স্মরণ বটে। সারা বছর ধরেই হযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে না'ত-পদ্য-কসীদা পাঠ করা হয়, কিন্তু পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস এলেই এই মহব্বত ও ভক্তিশ্রদ্ধা নতুন প্রাণস্পন্দন পায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানে বিশেষ মাহফিল ও মজলিশের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে কিছু মানুষ হযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোরম অলকগুচ্ছ ও গণ্ডদেশ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন, আবার অনেকে রোমন্থন করেন হৃদয়ে উষ্ণতা ছড়ানো তাঁর স্মিত হাসি এবং মক্কার রাস্তায় রাস্তায় তাঁরই পদচারণাকে; কেউ কেউ সবুজ গুচ্ছের শান-শওকত নিয়ে আলোচনা করেন, আর কেউ কেউ তাঁর পবিত্র রওয়া শরীফের স্বর্ণের ঘের এবং মদীনা নগরীর রাস্তা ও সেগুলোর সৌন্দর্য সম্পর্কে বর্ণনা দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান মাতা আমিনা ও দুধ-মা হালিমা রাঈয়াল্লাহু আনহুমার স্মৃতি চৌদ্দ'শ বছর আগেকার মক্কার দৃশ্যগুলোকে আবার স্মৃতিপটে ভাস্বর করে। এই মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তিমূলক না'ত-শে'র-কসীদা গাওয়া হয়, আর তাঁকে স্মরণ-ও করা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের কথা যখন উল্লেখ করা হয়, তখন ঈমানদারবৃন্দ এসব আবেগময় কাব্য শুনে তাঁদের অন্তরে সুপ্ত নবীপ্রেমের জাগরণ অনুভব করেন।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা দেখিয়েছি কীভাবে আল-কুরআন অন্যান্য পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালাম-বৃন্দের মীলাদের উল্লেখ করেছে। এই

পৃষ্ঠাগুলো সেসব লোককে খণ্ডন করে, যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতকে ঘিরে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর স্মৃতিচারণের গুরুত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে থাকে। এসব কুরআনের আয়াত পাঠ করেও যদি কেউ এখনো মনে করে যে, এগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই, তাহলে এ ধরনের লোক আল-কুরআনের প্রকাশ্য আয়াতেরই প্রতি আপত্তি উত্থাপন করছে, আর এটা শুধু তার নিজস্ব জ্ঞানের অভাব ও ভুল উপলব্ধিরই পরিচায়ক হবে। এই কুরআনী বিশ্লেষণ দ্বারা এ বিষয়টি উপলব্ধি করা জরুরি যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদের উদযাপন প্রকৃতপ্রস্তাবে আল্লাহ তা'আলারই একটি সুন্নাহ বা রীতি; আর শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি গভীর প্রেম-ভালোবাসা যাঁরা অন্তরে রাখবেন, তাঁরা এটাকে (মানে মীলাদকে) গ্রহণ বা ধারণ করবেন।

প্রশ্ন জাগে, তাহলে এই স্মরণ কীভাবে করা উচিত? উত্তরটাও স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা-ই ব্যাখ্যা করেছেন। হযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমনের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনাগুলোর স্মরণ দ্বারা আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার সুন্নাহকেই মেনে চলি, কেননা তিনি-ই অন্যান্য আশিয়া আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দের মীলাদের কথা উল্লেখ করেছেন (তাঁর পাক কেতাবে)। আমরা এ-ও ব্যাখ্যা করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা যখন কুরআন মজীদে পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালাম-বৃন্দের মীলাদের কথা উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি খুঁটিনাটি বিষয়ের বর্ণনাও উপেক্ষা করেননি। এভাবে আল্লাহর এই রীতির কথা স্মরণে রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিকর-তায়কেরা করার সময় আমাদের উচিত হবে তাঁর সৃষ্টি, তাঁর নূর হওয়ার বিষয় এবং তাঁর বেলাদত সম্পর্কে আলোচনা করা; তাঁর উচ্চবংশীয় মর্যাদা, তাঁর অনুপম বৈশিষ্ট্যাবলী এবং ধূলির ধরায় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনকে ঘিরে ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনাগুলোর উল্লেখও আমাদের করা উচিত হবে।

মীলাদের উপলক্ষ পেলেই আমরা পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম হতে আরম্ভ করে সর্ব-পয়গম্বর ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম ও ইসমাইল আলাইহিস্ সালাম হয়ে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাবা) আব্দুল্লাহ রাঈয়াল্লাহু আনহু-কে স্মরণ করি। অতঃপর আমরা বর্ণনা

করি কীভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা আমিনা রাঈয়াল্লাহু আনহার কোলে এলেন এবং দুধ-মা হালিমা রাঈয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক লালিত-পালিত হলেন, যাতে এই যিকর-তায়কেরার আনন্দ আমাদের অন্তরে শান্তি বয়ে আনে এবং আমাদের মস্তিষ্কে চিরস্থায়ীভাবে এর গুণগত প্রভাব পড়ে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদের অনুষ্ঠানগুলোতে তাঁরই নবুয়্যতের স্মরণ করা হয়। অতএব, এসব মাহফিল, অনুষ্ঠান করাকে না-জায়েয বলা চরম ভ্রান্তি, আল্লাহ মাফ করুন। মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদযাপন জায়েয তথা অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়ার পক্ষে কুরআন-হাদীসের প্রামাণিক দলিলাদি এবং এর গঠনের উপাদানসমূহ পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিধৃত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর্থনে
আল-কুরআনের দলিল

তাকদীর তথা ভাগ্য (নিয়তি) কিছু বস্তুকে অন্যান্য বস্তুর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু দিন ও স্থান অন্যান্য দিন ও স্থানের চেয়ে বিভিন্ন দিক দিয়ে উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন। অনুরূপভাবে, আল্লাহ তা‘আলা কিছু পুণ্যাত্মকে অন্যান্য মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, ঠিক যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক কতিপয় পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালামকে অন্যদের চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা দান। তিনি এরশাদ ফরমান:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

—এ রাসূলবৃন্দ (যাদেরকে আমরা প্রেরণ করেছি), আমরা তাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি।^{১৭১}

একইভাবে, মহান আল্লাহ তা‘আলা কিছু মুহূর্ত, দিন ও মাসকে অন্যান্য মুহূর্ত, দিন ও মাসের চেয়ে বেশি পছন্দ করেছেন। রমযান মাসের উৎকর্ষের কারণে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কুরআন মজীদে এরশাদ ফরমান:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ

—রমজান মাস (সে মাস) যা‘তে অবতীর্ণ হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্যে হেদায়াত এবং (যা‘তে রয়েছে) পথপ্রদর্শনকারী এবং (সত্য-মিথ্যার) পার্থক্যকারী সকল সুস্পষ্ট নির্দেশনা।^{১৭২}

এই আশীর্বাদপূর্ণ মাসে একটি রাত আছে (লাইলাতুল ক্বদর), যেটা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সুবাদে অন্যান্য রাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে। এরশাদ হয়েছে:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

—নিশ্চয়ই আমরা এ (পবিত্র কুরআন) অবতীর্ণ করেছি ক্বদরের রজনীতে।^{১৭৩}

১৭১. আল কুরআন: সূরা বাকারা, ২:২৫৩।

১৭২. আল কুরআন: সূরা বাকারা, ২:১৮৫।

একই পন্থায় অন্যান্য পবিত্র স্থান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা‘আলা মক্কা নগরীর শপথ করেছেন, যার দরুন এটা অন্যান্য নগরীর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে। এর কারণ হলো, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (প্রকাশ্য) জীবনের বেশির ভাগ সময়-ই এখানে কাটিয়েছিলেন। এরশাদ হয়েছে:

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ

—আমি শপথ করছি এ (মক্কা) নগরীর, (হে মহিমান্বিত হাবীব) এ জন্যে যে, আপনি এ নগরীর অধিবাসী।^{১৭৪}

অনুরূপভাবে, ইসলাম ও ঈমানের পরে মানবজাতির মাঝে সম্মান ও গুণগত শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া তথা খোদাতীর্থতা ও পুণ্য। আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

—নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত, যে সর্বাধিক পরহেযগার।^{১৭৫}

সংক্ষেপে, কুরআন মজীদে এমন অনেক আয়াত বিদ্যমান, যেখানে আল্লাহ তা‘আলা বিভিন্ন বিষয়ের/জিনিসের পবিত্রতা সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন এবং সেগুলোর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ-ও ব্যাখ্যা করেছেন। লাইলাতুল ক্বদর যেমন হাজার মাসের চেয়ে উত্তম, ঠিক তেমনি রবিউল আউয়াল মাস-ও একইভাবে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; কেননা যিনি কুরআন মজীদ আমাদের মাঝে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি এই মাসেই ধরাধামে শুভাগমন করেছিলেন। এটাই সেই বরকতময় মাস, যা‘তে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সর্বাধিক প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঈমানদারবৃন্দের মাঝে প্রেরণ করে তাদের প্রতি আপন রহমত বর্ষণ করেছেন। অতএব, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদধন্য বেলাদতের সূত্রে রবিউল

১৭৩. আল কুরআন: সূরা ক্বদর, ৯৭:১।

১৭৪. সূলা বালাদ, ৯০:১-২।

১৭৫. আল কুরআন: সূরা হুজরাত, ৪৯:১৩।

আউয়াল মাস অন্যান্য মাসের চেয়ে সেরা হয়েছে। এটাকে তাঁর মীলাদের মাস বলাটাই বেশি যথাযোগ্য হবে।

৪.১ কুরআন নাযেলের উদযাপন হতে দলিল

আল-কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী, আর এটা তাঁরই একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে একত্ববাচক গুণের ধারক। এর নাযেল তথা প্রকাশ হওয়াটা মানবজাতির জন্যে এক বড় আশীর্বাদ; এরই হেদায়াতের আলো দ্বারা মনুষ্যকুলকে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে পরিত্রাণ দেয়া হয়েছে এবং মান-মর্যাদাও মঞ্জুর করা হয়েছে। এই কুরআন আমাদের মাঝে নাযেল হয়েছে এক বিশেষ (তথা অনুপম) সিদ্ধপুরুষের (পুণ্যাত্মার) মাধ্যমে। এর নূর (জ্যোতি)-কে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন এক (মহান) নূর (জ্যোতির্ময় সত্তা)। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ.

—নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছেন এক নূর (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং এক সমুজ্জ্বল গ্রন্থ (অর্থাৎ কুরআন মাজীদ)।^{১৭৬}

কুরআন মজীদে জ্ঞান দ্বারা মানবকুলকে অশেষ, অফুরন্ত (খোদায়ী) রহমত-বরকত-নেয়ামতের গ্রহীতা করা হয়েছে। তাহলে সেই মহান সিদ্ধপুরুষের মাহাত্ম্য কী হতে পারে, যাঁর প্রতি কুরআন নাযেল হয়েছিল? ওই পুণ্যাত্মার মকাম কী হতে পারে, যাঁর শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান-প্রজ্ঞার বিশাল রত্নভাণ্ডার ও হেদায়াতের উৎসকে মানবজাতির প্রতি মঞ্জুর করা হয়েছিল; যাঁর অন্তরে আল্লাহ তা'আলার কালাম (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ হয়েছিল, এবং যাঁর সুন্দরতম আচরণের মাধ্যমে তাঁকে এর (আল-কুরআনের) শিক্ষক ঘোষণা করা হয়েছিল? তাঁর উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে কে-ই বা উপলব্ধি করতে সক্ষম? সত্য বটে, কুরআন মজীদ সামগ্রিকভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই মনোরম যিকর-তায়কেরা

তথা স্মরণের একটি সংকলন। তাঁরই নিখুঁত চরিত্র, সর্বোত্তম গুণাবলী ও সৃষ্টিকুলের মাঝে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার যিকর এটা। কবি ইকবাল কী সুন্দর লিখেছেন:

زقرآن پیش خود آئینه آویز ♦ دگرگون گشته از خویش بگزیز

—ওহে ঈমানদার, উত্তম চরিত্র গঠনে তুমি পাঠ করো আল-কুরআন,

এরই দর্পণে যাঁর চেহারা দেখো তাঁকে করো অন্বেষণ, দিয়ে মন-প্রাণ।^{১৭৭}

অতএব, আমাদেরকে এই মহা আশীর্বাদের জন্যে কৃতজ্ঞ হতে হবে; এতে বিশ্বাসী হওয়ার এবং এর প্রতি মহব্বত রাখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অত্যাবশ্যক বিষয়গুলোর একটা হচ্ছে এটা। তবু এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদি আমরা যাঁর মধ্যস্থতায় এই আশীর্বাদের গ্রহীতা হতে পেরেছি তাঁরই মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব মূল্যায়ন করতে সক্ষম না হই। এই কারণেই যে রাতে আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলার চূড়ান্ত বিধি-বিধানের নীতি-নৈতিকতা ও শিক্ষাসমূহকে উদযাপন ও স্মরণ করার জন্যে আমরা সে রাতে মাহফিলের আয়োজন করে থাকি। এমতাবস্থায় কুরআন মজীদ যে মহান ও পবিত্র সত্তার আশীর্বাদে আমরা লাভ করেছি, তাঁর বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনের রাতটি কেন একইভাবে উদযাপন করবো না? তাঁর আশীর্বাদধন্য বেলাদতের রাতটি উদযাপন করা উচিত, কেননা এর পক্ষে যুক্তি আরো জোরালো এবং এর গুরুত্ব-ও বেশি।

৪.১.১ লাইলাতুল কদরের রাত ও বেলাদত শরীফের রাতের মধ্যকার তুলনা

কুরআন মজীদ, যে ঐশীগ্রন্থটিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণীয় দৃষ্টান্তপূর্ণ নৈতিক চরিত্র উল্লেখিত হয়েছে এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে ঐশীভাবে উন্মোচিত হয়, পবিত্র রমযান মাসের কোনো একটি রাত এক হাজার

মাসের চেয়েও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন। এটাই পবিত্র লায়লাতুল কদরের রাত (ভাগ্য রজনী), যে রাতে ‘লওহ আল-মাহফূয’ নিম্নের আসমানে অবতরণ করেছিল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা এ রাতকে শেষ বিচার দিবস অবধি সব মানুষের জন্যে মর্যাদাপূর্ণ মক্কা তথা স্তর/পর্যায় অর্জনের অসীলা বা মাধ্যম বানিয়েছেন; আর এ রাতকে সকল রাতের মধ্যমণি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআন নাযেলের বেলায় এটা যদি সত্য হয়, তাহলে তাঁর বেলায় কী বলা যায়, যাঁর খাতিরে সমস্ত সৃষ্টিকুল অস্তিত্বশীল হয়েছে, যিনি গোটা বিশ্বজগতকে চিরস্থায়ী ভালোবাসা ও করুণা দ্বারা আলোকিত করেছেন এবং যাঁর অধিকারে (খোদ) আল-কুরআন? আল্লাহর দৃষ্টিতে তাঁর বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনের রাতটির মর্যাদা কী হতে পারে? তা কী হতে পারে, এব্যাপারে মানব মস্তিষ্ক ধারণা করতেও অপারগ।

লায়লাতুল কদরের মর্যাদা এই কারণে যে, এ রাতে কুরআন নাযেল হয়েছে এবং ফেরেশতাবৃন্দ-ও অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না হলে ওহী-ও (নাযেল) হতো না, আর লায়লাতুল কদর-ও হতো না; এমনকি সমগ্র সৃষ্টিকুল-ও অস্তিত্ব পেতো না। বাস্তবিকপক্ষে, এসব নেয়ামত (আশীর্বাদ) আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের কারণেই এসেছে। অতএব, তাঁর বেলাদতের রাতকে যদি আমরা লায়লাতুল কদরের রাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলি, তাহলে অতিরঞ্জন হবে না। কদরের রাতকে এক সহস্র মাসের চেয়ে শ্রেয়তর ঘোষণা করে আল্লাহ পাক এটার গুণের একটি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের রাতের বৈশিষ্ট্য ধারণারও অতীত। তবে একথা মনে রাখা উচিত যে, যদিও তাঁর বেলাদতের রাতের বৈশিষ্ট্য শ্রেষ্ঠতর, তবুও প্রত্যেকের লায়লাতুল কদরের রাতে এবাদত-বন্দেগী বেশি করা উচিত; কেননা এ রাতে এবাদত-বন্দেগীর জন্যে বরাদ্দ সওয়াবের পরিমাণ বেশি, আর এটা কুরআন ও হাদীস দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত।

বিশেষ কয়েকটি রাতের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে ইমামবৃন্দ ও মুহাদ্দিসমন্ডলী আলোচনা করেছেন, যেমন— শা‘বান মাসের ১৫ তারিখের রাত, লায়লাতুল কদর, ঈদুল ফিতর ও ইয়াওমে আরাফা’র রাতগুলো এবং মহানবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের রাত। এঁদের মধ্যে অনেকেই লায়লাতুল কদরের রাতের চেয়ে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন। ইমাম কসতলানী (৯২৩-৮৫১ হিজরী), শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দীসে দেহেলভী (৯৫৮-১০৫২ হিজরী), ইমাম যুরকানী মালেকী (১০৫৫-১১২২ হিজরী), ইমাম ইউসূফ নাবহানী (বেসাল: ১৩৫০ হিজরী) প্রমুখ একথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

১. ইমাম কসতলানী এ সম্পর্কে লিখেন:

إِذَا قُلْنَا بِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَدَ لَيْلًا، فَأَيُّمَا أَفْضَلُ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَوْ لَيْلَةُ مَوْلَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَجِيبُ: بِأَنَّ لَيْلَةَ مَوْلَاهُ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ وَجْهِ ثَلَاثَةٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ لَيْلَةَ الْمَوْلِدِ لَيْلَةُ ظُهُورِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ مُعْطَاةٌ لَهُ، وَمَا شَرَفَ بِظُهُورِ ذَاتِ الْمُشْرِفِ مِنْ أَجْلِهِ أَشْرَفُ مِمَّا شَرَفَ بِسَبَبِ مَا أُعْطِيَهُ، وَلَا نَزَاعَ فِي ذَلِكَ، فَكَانَتْ لَيْلَةُ الْمَوْلِدِ بِهَذَا الْإِغْتِيَارِ أَفْضَلُ.

الثَّانِي: أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ شَرَفَتْ بِزُورِ الْمَلَائِكَةِ فِيهَا، وَلَيْلَةُ الْمَوْلِدِ شَرَفَتْ بِظُهُورِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا. وَمِنْ شَرَفَتْ بِهِ لَيْلَةُ الْمَوْلِدِ أَفْضَلُ مِمَّنْ شَرَفَتْ بِهِمْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، عَلَى الْأَصَحِّ الْمُرْتَضَى، فَتَكُونُ لَيْلَةُ الْمَوْلِدِ أَفْضَلُ.

الثَّالِثُ: أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَقَعَ التَّفْضِيلُ فِيهَا عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْلَةُ الْمَوْلِدِ الشَّرِيفِ وَقَعَ التَّفْضِيلُ فِيهَا عَلَى سَائِرِ الْمَوْجُودَاتِ، فَهُوَ الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فَعَمَّتْ بِهِ النِّعْمَةُ عَلَى جَمِيعِ

الْخَلَائِقِ، فَكَانَتْ لَيْلَةُ الْمَوْلِدِ أَعَمَّ نَفْعًا، فَكَانَتْ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِهَذَا الْإِعْتِبَارِ.

—মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত প্রশ্নে এ মর্মে বলা হয় যে, দুটি রাতের কোন রাতটি শ্রেষ্ঠতর, কদরের রজনী, না মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাত। (এ প্রসঙ্গে) আমার উত্তর হলো, কদরের রাতের চেয়ে তাঁর বেলাদতের রাত শ্রেষ্ঠ তিনটি ক্ষেত্রে:

প্রথমত: হযর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের রাত হচ্ছে তাঁরই মহিমাম্বিত আবির্ভাবের রাত, অথচ কদরের রাত তাঁকে প্রদানকৃত। ওই রাত, যা নিজ উচ্চমর্যাদার কারণ তথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকাশ (বেলাদত) দ্বারা সম্মানিত হয়েছে, তা সেই রাত অপেক্ষা শ্রেয়তর হবে, যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কারণে প্রদত্ত সূত্রে সম্মানিত হয়েছে। আর এবিষয়ে কোনো ধরনের মতপার্থক্য-ই নেই। অতএব, এক্ষেত্রে তাঁর বেলাদতের রাত শ্রেষ্ঠতর।

দ্বিতীয়ত: কদরের রাত সম্মানিত, কেননা ফেরেশতাবৃন্দ ওই রাতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন; অপরদিকে, মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাত সম্মানিত, কেননা এটা ধরাধামে তাঁরই শুভাগমনের রাত। যেহেতু তিনি ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, সেহেতু মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাত কদরের রাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও (অধিকাংশ সুন্নী উলামার) সমর্থিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তাঁর মীলাদের রাত-ই শ্রেষ্ঠতর।

তৃতীয়ত: কদরের রাতের যে ফযীলত, তা (খাসভাবে) উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যেই। পক্ষান্তরে, তাঁর বেলাদতের রাতে যে ফযীলতপ্রাপ্তি হয়েছে, তা সকল অস্তিত্বশীল প্রাণি/বস্তুর জন্যে। তাঁকেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক সারা বিশ্বজগতের জন্যে আপন করুণাস্বরূপ প্রেরণ করেন; ফলে এ আশীর্বাদে অন্তর্ভুক্ত সমগ্র সৃষ্টিকুল, আর তাঁর মীলাদের রাতটিও এ বৃহত্তর

কল্যাণ ধারণ করে আছে। অতএব, এক্ষেত্রেও এই রাত কদরের রাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর।^{১৭৮}

২. ইমাম আল-তাহাবী (২৩৯-৩২১ হিজরী) কতিপয় শাফেঈ জ্ঞানবিশারদের মতামত উদ্ধৃত করেন:

أَنَّ أَفْضَلَ اللَّيَالِي لَيْلَةُ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ثُمَّ لَيْلَةُ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ، ثُمَّ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، ثُمَّ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، ثُمَّ لَيْلَةُ الْاَعِيدِ.

—সর্বশ্রেষ্ঠ রজনী হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের রাত, এরপর কদরের রাত; অতঃপর তাঁর মে'রাজে গমনের রাত, এরপর 'আরাফাতের (ময়দানের) রাত; অতঃপর (প্রতি) শুক্রবারের রাত, এরপর ১৫ই শা'বানের (মানে শবে বরাতের) রাত; আর এরপর হলো ঈদের রাত।^{১৭৯}

৩. ইমাম ইউসূফ নাবহানী (বেসাল: ১৩৫০ হিজরী) তাঁর সুবিখ্যাত সেরা গ্রন্থ 'আল-আনওয়ারুল মুহাম্মদিয়া ফীল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়া'র ২৮ পৃষ্ঠায় লিখেন:

وَلَيْلَةُ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের রাত কদরের রাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

১৭৮. আল-কসতলানী প্রণীত 'আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া বিল-মিনাহিল মুহাম্মদিয়া', ১:১৪৫; শায়খ আবদুল হক্ক দেহলভী কৃত 'মা' সাবাতা মিনাল-সুন্নাহ ফী আইয়া'মিল সানা', ৫৯-৬০ পৃষ্ঠা; আল-যুরকানী রচিত 'শরহে মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া', ১:২৫৫-২৫৬; ইমাম আল-নাবহানী লিখিত 'জওয়াহিরুল বিহার ফী ফাযা'ইলিল নাবী-ইল-মুখতার', ৩:৪২৪।

১৭৯. ইমাম ইবনে আবেদীন কৃত 'রাব্দুল মোহতার 'আলা দুর্ আল-মোখতার 'আলা তানউইর আল-আবসার', ২:৫১১; আল-শিরওয়ানী প্রণীত 'হাশীয়া 'আলা তোহফাত আল-মোহতাজ বি-শারহে আল-মিনহাজ', ২:৪০৫; আল-নাবহানী রচিত 'জওয়াহির আল-বিহার ফী ফাদাঈল আল-নাবী আল-মোখতার', ৩:৪২৬।

৪. মুহাম্মদ আবদুল হাই ফারাসী মহল্লী লাখনাভী (১২৬৪-১৩০৪ হিজরী) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের রাত সেরা, না কদরের রাত সেরা, এই প্রশ্নের জবাবে লিখেন:

অন্যান্য রাতের চেয়ে লায়লাতুল কদরের শ্রেষ্ঠত্ব ধর্মশাস্ত্রলিপিতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অনেক উপায়েও প্রমাণিত। যেমন—

(ক) এই রাতে রুহ ও ফেরেশতামণ্ডলী জমিনে নেমে আসেন;

(খ) সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত আল্লাহর তাজাল্লী (বিশেষ প্রকাশ) নিম্ন আসমাণে অবতীর্ণ হয়;

(৩) এই রাতে আল-লওহ আল-মাহফূয (সংরক্ষিত লিপি) হতে নিম্ন আসমাণে আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। এসব বৈশিষ্ট্যের সূত্রে উম্মতে মুহাম্মদীকে এ সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, এই রাতটি এক হাজার মাসের এবাদত-বন্দেগী হতেও উত্তম। আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ ফরমান:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

—কদরের রজনী (মর্যাদায় ও কল্যাণে এবং প্রতিদানে ও পুরস্কারে) হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।^{১৮০}

এ রাতে জাগ্রত থাকা (ও এবাদত করা)‘র প্রতি হাদীস শরীফে তাগিদ দেয়া হয়েছে। কতিপয় মুহাদ্দেসীন (হাদিসশাস্ত্রবিদ) লায়লাতুল কদরের চেয়ে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেছেন; তাঁদের মত এটা নয় যে, এবাদতের ক্ষেত্রে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাত কদরের রাতের সমকক্ষ, কেননা সওয়াব (পুরস্কার) ও শাস্তির বিষয়গুলো শুধু আল-নস আল-ক্বাতেঈ তথা সুস্পষ্ট প্রামাণ্য দলিল দ্বারাই নির্ধারণ করা সম্ভব। বরঞ্চ তাঁর সম্মানিত বেলাদতের রাত কদরের রাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার ভিত্তি আল্লাহর দৃষ্টিতে এর আপন (অনুপম) বৈশিষ্ট্যেরই সুবাদে।^{১৮১}

১৮০. আল কুরআন: সূরা কদর, ৯৭:৩।

১৮১. আব্দুল হাই লাখনাভী কৃত ‘মাজমু‘আ আল-ফাতাওয়া’, ১:৮৬-৮৭।

লায়লাতুল কদরের উৎকর্ষ হচ্ছে এই রাতে কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হওয়ার পাশাপাশি ফেরেশতামণ্ডলীও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অপরদিকে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তা মোবারক এতোই অনুপম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যে তাঁরই প্রতি কুরআন নাযেল হয়; আর প্রতি সকালে সত্তার হাজার ফেরেশতা তাঁর পবিত্র রওয়া পাক নিরন্তর যোয়ারত, এর তওয়াফ এবং তাঁর প্রতি দরুদ-সালাম পাঠ করে থাকেন; অপর সত্তার হাজার ফেরেশতা একই কাজ করেন সন্ধ্যায়। এই রীতির অনুশীলন শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং যে ফেরেশতা একবার এরকম যোয়ারত করতে সক্ষম হবেন, তিনি আর দ্বিতীয়বার তা করার সুযোগ পাবেন না।^{১৮২} ফেরেশতামণ্ডলী অবতীর্ণ হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বিনয়ী খাদেমের মতো প্রবেশ করে থাকেন। তাঁদের অবতীর্ণ হওয়াতে লায়লাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে; পক্ষান্তরে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে গুভাগমনের রাতের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা অসম্ভব ব্যাপার এবং তা কল্পনারও অতীত! মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই রাতের খাতিরে অসংখ্য, অগণিত রাত উৎসর্গিত হোক!

১৮২. ইবনে মুবারক প্রণীত ‘আল-যুহদ’, ৫৫৮ পৃষ্ঠা #১৬০০; আল-দারিমী রচিত ‘আল-সুনান’, ১:৫৭ #৯৪; আল-কুরতুবী লিখিত ‘আল-তায়কিরাত ফী উমূর আহওয়াল আল-মাওতা ওয়া উমূর আল-আখিরা’, ‘মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রওয়া হতে পুনরুত্থান’ শীর্ষক অধ্যায়, ২১৩-২১৪ পৃষ্ঠা; আল-নায্জার কৃত ‘আল-রাদ্দ ‘আলা মান এয়াকুল আল-কুরআন মাখলুক’, ৬৩ পৃষ্ঠা #৮৯; ইবনে হিব্বান রচিত ‘আল-আযামা’, ৩:১০১৮-১০১৯ #৫৩৭; আল-আযদী প্রণীত ‘ফযল আল-সালাত ‘আলা আল-নাবী’, ৯২ পৃষ্ঠা #১০১; আল-বায়হাকী লিখিত ‘শুআব আল-ঈমান’, ৩:৪৯২-৪৯৩ #৪১৭০; আবু নু‘আইম কৃত ‘হিলইয়া আল-আউলিয়া ওয়া তাবাক্বাত আল-আসফিয়া’, ৫:৩৯০; ইবনে জাওযী রচিত ‘আল-ওয়াফা’ বি-আহওয়াল আল-মুস্তফা’, ৮৩৩ পৃষ্ঠা #১৫৭৮; ইবনে আল-কাইয়্যেম আল-জাওযিয়া প্রণীত ‘জালা’ আল-আফহাম ফী আল-সালাত ওয়া আল-সালাম ‘আলা খায়র আল-আনাম’, ৬৮ পৃষ্ঠা #১২৯; আল-সামহূদী লিখিত ‘ওয়াফা’ আল-ওয়াফা’ বি-আখবার দার আল-মুস্তফা’, ২:৫৫৯; ইমাম কসতলানী কৃত ‘আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া বি-মিনাহ আল-মুহাম্মাদিয়া’, ৪:৬২৫; ইমাম আস-সুয়ূতী রচিত ‘কেফায়া আল-তালেব আল-লাবীব ফী খাসা‘য়েস আল-হাবীব’, ২:৩৭৬; আস-সালেহী প্রণীত ‘সুবুল আল-হুদা ওয়া আল-রাশাদ ফী সীরা খায়র আল-‘এবাদ’, ১২:৪৫২-৪৫৩; আল-যুরকানী লিখিত ‘শরহে মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া বি আল-মিনাহ আল-মুহাম্মাদিয়া’, ১২:২৮৩-২৮৪।

এখানে মনে রাখার মতো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, লায়লাতুল কুদরের ফযীলত কেবলমাত্র ঈমানদার মুসলমানদের জন্যেই খাস (সুনির্দিষ্ট); কিন্তু মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রেফ ঈমানদারদের জন্যে নির্দিষ্ট নয়, বরঞ্চ তা সমগ্র মানবজাতির জন্যেই বরাদ্দ।

৪.২ কোনো নেয়ামত লাভের উদযাপন হতে দলিল

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা পূর্ববর্তী জাতিগুলোর প্রতিও তাঁর রহমত-বরকত (আশীর্বাদ) বর্ষণ করেছেন, আর তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তারাও ওই নেয়ামত-প্রাপ্তির দিনগুলোকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করেছে। এই দৃষ্টান্তের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলো তাদের ঐতিহ্য ও প্রথা অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিবসসমূহ উদযাপন করতো; এটা এমন এক অনুশীলিত রীতি যা কুরআন মজীদ সমর্থন করেছে।^{১৮৩} যদি পূর্ববর্তী জাতিগুলো ছোটখাটো আশীর্বাদপ্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে, তাহলে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ রহমত-বরকত-নেয়ামতপ্রাপ্তিতে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমাদের জন্যে আরো বেশি জরুরি নয় কি? আল্লাহ পাক স্বয়ং এটা করতে আমাদের প্রতি নির্দেশ দেন নিম্নবর্ণিত আয়াতে করীমায়:

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا.

—আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা (পরস্পরে) ছিলে শত্রু তখন তিনি তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার বন্ধন

১৮৩. মরিয়ম-তনয় ঈসা আরয করলেন, رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ‘হে আল্লাহ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে আসমান থেকে (নিয়ামতের) দস্তরখানা অবতীর্ণ করুন, যা (অবতীর্ণ হওয়ার দিন) আমাদের জন্যে (ও) এবং আমাদের পরবর্তীদের জন্যে (ও); আর (এ দস্তরখানা) হবে আপনার পক্ষ থেকে নিদর্শন; কুরআন মাজীদ, ৫:১১৪।

সৃষ্টি করে দিলেন। আর তোমরা সে অনুগ্রহের কারণে পরস্পরে ভাই হলে।^{১৮৪}

এটা দয়া ও অনুগ্রহের কী চমৎকার এক নিদর্শন যে আল্লাহ পাক তাঁরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত মানুষদের অন্তরগুলোকে একতাবদ্ধ করেছেন। যাঁরা ইতিপূর্বে নিজেদের ভাইদের রক্তপিপাসু ছিলেন, তাঁরাই এখন হয়েছেন ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ। বস্তুতঃ মানবজাতির মাঝে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুবাদে এই আশীর্বাদপ্রাপ্তি হয়েছে; তাঁর খোদ সত্তা মোবারক-ই এই নেয়ামতের উৎস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই জগতে শুভাগমন এবং তাঁর প্রতি শ্রেফ ঈমান এনে যাঁরা নিজেদের যুদ্ধদেহী মনোভাব ও আচরণ হতে পরিশুদ্ধ হওয়ার দরুন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন, তা আমাদের প্রতিও বাধ্যবাধকতা আরোপ করে যে আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত (ধরাধামে শুভাগমন) উপলক্ষে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি কৃতজ্ঞতার মূর্ত প্রকাশ হই।

৪.৩ মুক্তি লাভের উদযাপন হতে দলিল

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আমল বা পুণ্যদায়ক কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার আশীর্বাদকে স্মরণ করা শুধু হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের প্রতি আরোপিত বাধ্যবাধকতা-ই নয়, বরঞ্চ এর বাধ্যবাধকতা পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও আরোপ করা হয়েছিল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা বনী ইসরাঈল বংশের প্রতি আদেশ করেন:

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ.

—হে (বনী ইসরাঈল!) ইয়াকুবের সন্তানেরা! স্মরণ করো আমার অনুগ্রহের কথা, যা আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছিলাম, আরো এ যে,

আমি তোমাদেরকে (সে যুগে) সকল মানুষের উপর মর্যাদা দান করেছিলাম।^{১৮৫}

অনুরূপভাবে, অন্য আয়াতেও আল্লাহ তা‘আলা বনী ইসরাঈল বংশের প্রতি বর্ষিত তাঁর আশীর্বাদের কথা স্মরণ করেন:

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ...

—আর (স্মরণ করো সে সময়ের কথা) যখন আমরা তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ফেরাউনের সম্প্রদায় থেকে যারা তোমাদেরকে দুঃসহ কঠিন শাস্তি দিত...।^{১৮৬}

উপরোক্ত কুর‘আনের আয়াতগুলো থেকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে কোনো জাতির স্বাধীনতা বা মুক্তিলাভ হচ্ছে এক মহা নেয়ামত/আশীর্বাদ। বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভের জন্যে বনী ইসরাঈল বংশকে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ দেয়া হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে আমাদের মুক্তি ও পাকিস্তান নামের একটি নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন-ও আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে এক মহা অনুগ্রহ ছিল। প্রতি বছর ১৪ই আগস্ট তারিখে আমাদের স্বাধীনতা দিবস যখন আমরা উদযাপন করি, তখন আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আদেশটির আলোকে এই আশীর্বাদকে স্মরণ করা আমাদের প্রতি বাধ্যতামূলক হয়। [নোট: লেখক একজন পাকিস্তানী]

একইভাবে, আল-কুর‘আনের এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতি বছর জাতীয় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ও বিভিন্ন উপায়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা স্রেফ কোনো পার্থিব বা রাজনৈতিক বিষয় নয়, বরং এটা একটা ধর্মীয় বিষয়-ও; এটা গ্রহণ করার বা মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা‘আলারই আদেশ হতে বিচ্যুত হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। প্রতিটি যুগে, শতাব্দীতে এবং শাসনামলে এক-একটি বৈশ্বিক সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল বা আছে; আর প্রত্যেক দেশ, জাতি ও গোত্রেরই রয়েছে নিজ নিজ ইতিহাস-ঐতিহ্য যা তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বা খুশির দিন হিসেবে উদযাপন করে

১৮৫. আল কুরআন: সূরা বাকারা, ২:৪৭।

১৮৬. আল কুরআন: সূরা বাকারা, ২:৪৯।

থাকে। পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ বা স্থান নেই যার ধর্মীয় বা জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ কোনো উৎসব নেই। ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, এমন কি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রথার অনুশীলনকারী ধর্মনিরপেক্ষ জাতিগুলোর পর্যন্ত নানা উৎসবের দিন রয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা মুসলমান জাতির প্রতি আদেশ করেছেন যেন আমরা তাঁর দিবসগুলো (আইয়াম আল্লাহ) পালন করি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাত মোবারক তথা পবিত্র সত্তা আমাদের হেদায়াত তথা সঠিক পথপ্রদর্শনের মূল আলোকবর্তিকা; আর তিনি আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও উৎসমূল। আজকের একশিলাবিশিষ্ট (মানে একটিমাত্র ধারার) বৈশ্বিক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করা আমাদের ইসলামী পরিচয় বিকাশের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

৪.৩.১ সভ্যতা জারি থাকার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয়

উপরে উদ্ধৃত খোদায়ী আশীর্বাদের স্মরণ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলোতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে কিতাবুল্লাহ কোনো সুনির্দিষ্ট ঘটনাকে উদ্দেশ্য করে। তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার এই রহমত-বরকত-নেয়ামতকে সবসময়-ই স্মরণ করতে হবে; আর এ কাজে যেন কেউ আশীর্বাদটি সম্পর্কে বিস্মৃত না হন এবং নিরন্তর আল্লাহ তা‘আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অধিকন্তু, সারা বছর ওই রহমত স্মরণে রেখে বার্ষিকী পালনের সময় হয়ে এলে পরে কারো খুশির মাত্রা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ার ব্যাপারটি সর্বজন স্বীকৃত এক বাস্তবতা। ঘটনার প্রকৃত দিন-ক্ষণ সুনির্দিষ্টভাবে স্মরণ ও যথাযথভাবে উদযাপন মানব প্রকৃতির অপরিহার্য অংশ হওয়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয়তা-ও বটে। কোনো (খোদায়ী) আশীর্বাদ উপলক্ষে কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় খুশি প্রকাশ করাটা জরুরি, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম ওই আশীর্বাদ সম্পর্কে ওয়াকফহাল থাকে এবং ওই দিনটির তাৎপর্য সম্পর্কেও থাকে অবগত। কোনো সভ্যতা কর্তৃক আপন সভাকে এবং সংস্কৃতিকে ইতিহাসের পাতায় বিস্মৃতি হতে সংরক্ষণ করার এটাই একমাত্র উপায়।

মহান প্রভু আল্লাহ তা‘আলার রহমত-বরকত-নেয়ামতপ্রাপ্তিতে তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ হতে অক্ষম হলে এবং অনাগত প্রজন্মের কাছে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য ও প্রথা পৌঁছে দিতে অপারগ হলে তারা এ আশীর্বাদের ব্যাপারে অমনোযোগী বা অযত্নবান হতে বেশি দেরি হবে না; আর তাদের দৃষ্টিতে আশীর্বাদপ্রাপ্তির ওই দিনটির তাৎপর্য-ও তখন অবহেলিত হবে। অতএব, এই ঐশী আজ্ঞা এ শর্তারোপ করে যে সারা বছর-ই আল্লাহ তা‘আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা চাই; কিন্তু যখন ওই সুনির্দিষ্ট দিন (মুক্তির দিবস) আগমন করে তখন আনুষ্ঠানিক উদযাপন দ্বারা খুশি প্রকাশের লক্ষ্যে বিশেষ প্রস্তুতি-ও গ্রহণ করা চাই, যাতে পরবর্তী প্রজন্মগুলো সে দিনটির গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারে।

এই আলোচনার আলোকে প্রশ্ন ওঠে যে, কারো মুক্তি উপলক্ষে (আল্লাহর প্রতি) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যদি আল-কুরআনে সাবোত তথা প্রমাণিত হয়, তাহলে বিশ্বজগৎ সৃষ্টির একমাত্র কারণ ও উপলক্ষ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত (ধরাধামে শুভাগমন) দিবসে খুশি প্রকাশ কেন অনুমতিপ্রাপ্ত হবে না? কেননা, প্রকৃতপক্ষে তাঁর মধ্যস্থতাহতেই তো বাকি সব রহমত-বরকত-নেয়ামত অর্জিত হয়েছিল।

৪.৪ কোনো খোদায়ী আশীর্বাদ লাভে খুশি প্রকাশ করা আশ্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দের সুন্নাহ

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলার কাছে পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর নিজের জাতির জন্যে আসমান হতে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা মঞ্জুর করার আবেদন জানানোর সময় আরয করেন:

اللَّهُمَّ! رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ.

—‘হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে আসমান থেকে (নিয়ামতের) দস্তরখানা অবতীর্ণ করো, যা (অবতীর্ণ হওয়ার দিন) আমাদের জন্যে হবে ঈদ-উৎসব, আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্যে(ও) এবং

আমাদের পরবর্তীদের জন্যে(ও); আর (এ দস্তরখানা) হবে তোমার পক্ষ থেকে নিদর্শন।^{১৮৭}

উপরের আয়াতটিতে কুরআন মজীদ এই পয়গম্বরের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছে যে, আল্লাহ তা‘আলার আশীর্বাদ যেসব দিনে বর্ষিত হয় সেগুলো ঈদ হিসেবে উদযাপন করা উচিত; এটাই খোদায়ী আশীর্বাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রশংসনীয় উপায়। ‘আমাদের পূর্ববর্তী’ ও ‘আমাদের পরবর্তীদের জন্যে’ বাক্যগুলো ইঙ্গিত করে যে ওই আশীর্বাদপ্রাপ্তির পর ওই কওম বা জাতির অন্তর্গত প্রাথমিক যুগে মানুষেরা আসবেন এবং পরবর্তী যুগগুলোতেও মানুষেরা আসবেন; এমতাবস্থায় যারা পূর্ববর্তী যুগে আগমন করবেন তাঁদের ঈদ হিসেবে তা উদযাপন করা উচিত, আর পরবর্তী যুগে যারা আসবেন, তাঁদেরও অনুরূপ করা উচিত।

৪.৪.১ বিবেচনাযোগ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

উক্ত আয়াতটিতে ‘আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের’ বাক্যগুলোতে ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ‘আমাদের’ বিদ্যমান, যা ইঙ্গিত করে যে এই আশীর্বাদটি কেবল তাঁরাই মূল্যায়ন করবেন যারা ‘আমাদের’ মধ্য হতে (আবির্ভূত হবেন)। কিন্তু যারা ‘আমাদের’ মধ্য হতে নয়, তাদের এই উদযাপনে অংশীদার হওয়ার কোনো (সঙ্গত) কারণ-ই নেই। এখানে আল-কুরআন মানুষের মাঝে একটি মানদণ্ড/মাপকাঠি স্থাপন করেছে। সেই ঘটনা ছিল পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস্ সালামের কওম বা জাতির, আর এখন হচ্ছে মহানবী হযরতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। এই একই মানদণ্ড বা মাপকাঠি আমাদের প্রতিও আরোপ করা হয়েছে এ মর্মে যে, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের দিনকে ধারণকারী রবিউল আউয়াল মাস আগমন করে, ওই সময় কারা এই মহা আশীর্বাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে সাক্ষ্য বহন করে, আর কারা তা করে না, এটা আমাদের প্রত্যক্ষ করা উচিত। মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে কেউ ক্ষুদ্র বোধ

করলে বা তাতে সন্দেহ পোষণ করলে সেটা ঈমানী ঘাটতির স্পষ্ট আলামত/লক্ষণ; যার জন্যে আল্লাহ তা‘আলার কাছে তওবা করা উচিত। তা এ কারণে যে এটা এমনই এক বিপজ্জনক ব্যাধি যা পরিহার করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য, যদি কেউ নিজের ধর্মকে হেফাযত করতে চান। কেউ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালোবাসার এবং তাঁর উম্মত হওয়ার দাবিদার কীভাবে হতে পারে যদি তাঁরই মীলাদ-দিবসে খুশি প্রকাশ না করে?

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে (শরঈ) প্রামাণ্য দলিল দাবি করা এবং এ বিষয়টির অবৈধতা প্রমাণ করার জন্যে তর্ক-বিতর্ক করা ঈমানের পূর্বশর্ত সৃষ্টিকূলশ্রেষ্ঠ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শনকে রহিত করে দেয়। বস্তুতঃ ভালোবাসার কোনো দলিলের প্রয়োজন-ই নেই। তাঁর বেলাদতের মাস রবিউল আউয়াল শরীফ যখন আগমন করে, তখন ঈমানদারের হওয়া চাই উৎফুল্ল চিত্ত এবং এর প্রতি আগ্রহান্বিত। এমতাবস্থায় তাঁর খুশির মোকাবেলায় অন্যান্য সব আনন্দ-ফুর্তি অর্থহীন হয়ে যায়। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতে খুশি হওয়াতেই প্রকৃত সুখ নিহিত। ঈমানদার ব্যক্তির অনুভব করা উচিত যে, এই দিনটির চেয়ে বেশি আনন্দঘন আর কোনো দিন-ই হতে পারে না, আর তিনি এই বিশ্বজগতে এর চেয়ে বেশি খুশি কল্পনা করতেও অক্ষম।

৪.৫ মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের পক্ষে খোদায়ী আদেশ

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলার করুণা ও আশীর্বাদ লাভের জন্যে কেউ কৃতজ্ঞ হওয়ার গৃহীত একটি পন্থা হচ্ছে নিজের (অনুভূত) সুখ ও আনন্দ প্রকাশ্যে ঘোষণা করা। আর মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বড় নেয়ামত কী হতে পারে? এটা এতোই বড় আশীর্বাদ যে, স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা-ই এ উপলক্ষে আমাদেরকে উৎফুল্লচিত্ত হতে আদেশ করেছেন। তিনি এরশাদ ফরমান:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

—বলে দিন, ‘(এ সবকিছু) আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর রহমতের কারণে (যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে)। কাজেই মুসলমানদের উচিত এতে আনন্দ উদযাপন করা। তা (সমস্ত ধন-সম্পদ) থেকে উৎকৃষ্টতর যা তারা জমা করে রাখে।^{১৬৮}

এই আয়াতে করীমায় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে জানাচ্ছেন যে তাঁর সাহাবা-এ কেরাম রাহিয়াল্লাহু আনহুমের এবং তাঁদের পরবর্তী সময়ে সমগ্র উম্মতের এবিষয়টি অবগত হওয়া উচিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো আল্লাহ তা‘আলার যে রহমত-বরকত-নেয়ামত আবির্ভূত হয়েছে, তা যথাসাধ্য খুশি ও আনন্দের সাথে উদযাপন করা উচিত। আশীর্বাদটি লাভ করা হয়েছে সম্প্রদায়গতভাবে, আর তাই এটা (মুসলিম) সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্মিলিতভাবে উদযাপিত হওয়াই বিধিবদ্ধ। যেহেতু ঐশী আজ্জাটি খুশি প্রকাশের, সেহেতু আশীর্বাদপ্রাপ্তির দিনটিকে কেবল পালন করা যায় ঈদ হিসেবে উদযাপনের মাধ্যমেই, অথবা কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন দ্বারাই। অতএব, এই আয়াতটি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করে যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ-দিবসকে মুসলমানদের আনন্দ-খুশি উদযাপনের দিন তথা ঈদ হিসেবে পালন করা উচিত। এতদসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিম্নে তালিকাভুক্ত করা হলো:

৪.৫.১ ‘কুল’ (বলুন) শব্দটির মধ্যে লুকায়িত কুর‘আনী দর্শন

কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক নির্দিষ্ট কিছু মানুষের দলকে সম্বোধন করেছেন; যেমন মনুষ্যজাতিকে সম্বোধনের সময় তিনি বলেন, “ওহে মানবকুল”; ঈমানদারবৃন্দকে সম্বোধনের সময় তিনি বলেন, “হে ঈমানদার সকল, যারা বিশ্বাস করো”; আর অন্যান্য জায়গায় আদেশ জারির সময় তিনি আরোপ করেন ‘বলুন’ (কুল) শব্দটি। ‘বলুন’ আদেশটি দ্বারা আল্লাহ

তা‘আলা তাঁরই প্রিয় ও সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যস্থতায় আপন বিধান ঘোষণা করেছেন। ‘বলুন’ শব্দটি অনুজ্ঞাসূচক সংশ্লেষ। কুরআনী বচনগুলোর মধ্যে একটি এই যে, ‘বলুন’ শব্দটি যেখানেই ব্যবহৃত হয়েছে, তা ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বাস্তবতার ইঙ্গিত বহন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ তা‘আলা আপন পবিত্র সত্তার ঐশী একত্ব ব্যাখ্যা করতে তাঁর প্রভুত্বের ঘোষণা দিয়েছেন:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ-

-(হে মহাসম্মানিত রাসূল!) বলে দিন, তিনি আল্লাহ, যিনি এক-অদ্বিতীয়।^{১৮৯}

অনুরূপভাবে, আনুগত্য ও সেবার উদ্দেশ্য (যা হচ্ছে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন), এবং তা অর্জনের মাধ্যম ব্যাখ্যা করতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবেদারির পক্ষে একটি আজ্ঞা জারি করা হয়েছে:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ.

-(হে হাবীব!) বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে (তাঁর) প্রিয়তররূপে গ্রহণ করবেন।^{১৯০}

একইভাবে, প্রকৃত আনুগত্য/সেবা ব্যক্ত করার জন্যে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে প্রত্যেকের জীবন, মরণ, এবাদত-বন্দেগী ও কোরবানীর দর্শনের রূপরেখা প্রদানের খাতিরে কুরআন মজীদ ঘোষণা করে:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

-বলে দিন, নিশ্চয়ই আমার নামায, হজ্জ, কুরবানী (-সহ সকল ইবাদত), জীবন ও মৃত্যু আল্লাহরই জন্যে, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।^{১৯১}

আল-কুরআনের এই রীতির দর্শন অনুযায়ী নিম্নের বিষয়গুলো বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে:

১৮৯. আল কুরআন: সূরা ইখলাস, ১১২:১।

১৯০. আল কুরআন: সূরা আলে ইমরান, ৩:৩১।

১৯১. আল কুরআন: সূরা আন‘আম, ৬:১৬২।

৪.৫.১.১ আল্লাহতে বিশ্বাসের আগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অপরিহার্যতা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ হতে হুবহু উচ্চারিত কুরআন মজীদ যে আল্লাহ তা‘আলারই বাণী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা‘আলার ভালোবাসা ও সান্নিধ্য লাভ, আর ইসলামের মৌলিক মতাদর্শ (আক্বীদা-বিশ্বাস) ও অনুশীলনীয় কর্মের (আমলের) রূপরেখা প্রদান করতে আল-কুরআন মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে ‘কুল’ (‘বলুন’) শব্দটিকে, যা সারমর্মে বুঝায় ‘হে মাহবুব! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন।’ এথেকে আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহর ঐশী একত্বে ও তাঁর আনুগত্যে কোনো ব্যক্তির বিশ্বাস প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যস্থতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এই ঘোষণাটি হওয়াই যথাযথ। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, কারো দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান স্থাপন তার দ্বারা আল্লাহর প্রতি ঈমান স্থাপনের আগে আসবে।

কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলায় বিশ্বাস করলে সে কখনোই ঈমানদার হবে না। ইসলামে দাখিল হতে হলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলায় বিশ্বাস স্থাপন করাটা অবশ্য কর্তব্য। সর্বশক্তিমান আল্লাহর একত্ব দৃঢ়ভাবে ঘোষণার যে-কোনো দাবির পাশাপাশি রেসালাতে অস্বীকার করাটা নিজে নিজেই অবিশ্বাস বা কুফর হবে। তাই ‘বলুন’ শব্দটি এই দর্শন ব্যক্ত করে যে আল্লাহ তা‘আলার ঐশী একত্বে বিশ্বাস অর্জন করার একমাত্র মাধ্যম হলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; এ মধ্যস্থতা ছাড়া আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভ করার কোনো সম্ভাবনা-ই নেই।

بمصطفى برسائل خويش را که در این همه اوست

اگر به او نرسیدی، تمام بولهبی است

—ধর্মের সারমর্ম আর কিছু নয় কেবল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজ্ঞার প্রতি আত্মসমর্পণ;

তাঁর দোরগোড়ায় উপনীত না হতে পারলে অবশ্যম্ভাবী হবে আমাদের অধঃপতন।^{১৯২}

৪.৫.১.২ ‘কুল’ (বলুন) শব্দটির ব্যবহার দ্বারা খোদায়ী আজ্ঞার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বৃদ্ধি

মহান আল্লাহ তা‘আলার বাণী মানবজাতির কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। কোনো বিশেষ আজ্ঞার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের প্রয়োজন হওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু দিক আছে। এই উদ্দেশ্যেই ‘বলুন’ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্তৃত্বের ইঙ্গিত বহন করে। নিঃসন্দেহে আল-কুরআনে ‘বলুন’ শব্দটির ব্যবহারে অনেক হেকমত তথা জ্ঞান রয়েছে; যেমন— “আপনি বলুন, ‘আল্লাহরই অনুগ্রহ ও তাঁরই দয়া (মুসলমানদের প্রতি, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল করে প্রেরণের কারণে বর্ষিত হয়েছে), সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত।” —শীর্ষক আয়াতটি নিয়ে আমরা যদি ভাবি, তাহলে তা থেকে অনেক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবো। আল্লাহ তা‘আলা ‘বলুন’ শব্দটি ছাড়াই এ আয়াতটি নাযেল করতে পারতেন, যথা— “হে মানবকুল! আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁরই দয়ায় তোমরা আনন্দ প্রকাশ করো।” কিন্তু তিনি তা করেননি, বরঞ্চ তিনি এরশাদ ফরমান, “হে মাহবুব! আপনারই পবিত্র জবান মোবারক দ্বারা তাদের জানিয়ে দিন যে আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ ও দয়াপ্রাপ্তিতে তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত।”

এমতাবস্থায় মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়: এই নেয়ামত/বরকত/আশীর্বাদ যিনি মঞ্জুর করেছেন তিনি স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা, আর যাদের এতে খুশি

প্রকাশ করার কথা তারা তাঁরই বান্দা। তাহলে আল্লাহ পাক কেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবান মোবারক দ্বারা নিজের ঈমানদার বান্দাদের আপন রহমত/আশীর্বাদ উদযাপন করার আদেশ করেছেন? তিনি তো নিজেই তাদেরকে নির্দেশ দিতে পারতেন, যেমনটি তিনি আপন নেয়ামতের স্মরণ করিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে। এই প্রশ্নের উত্তর খোদ আয়াতটিতেই বিধৃত হয়েছে; অর্থাৎ, এর দ্বারা ঈমানদার মুসলমানদের দেখানো হয়েছে যে তারা এসব রহমত/আশীর্বাদ লাভ করেছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহাসম্মানিত সত্তা মোবারকের মাধ্যমে এবং তাঁরই আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হওয়ার দরুন।

৪.৫.২ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা

সূরা ইউনূসের ৫৮ আয়াতে দুটি ব্যাপারে খুশি উদযাপন করার কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো: আল্লাহ তা‘আলার ফযল/অনুগ্রহ ও তাঁরই রহমত/দয়া। এখানে ‘অনুগ্রহ’ ও ‘দয়া’ শব্দগুলো কেন আলাদাভাবে উল্লেখিত হয়েছে, আর এগুলোর মানেই বা কী?

আল-কুরআনের বাচনশৈলীগুলোর মধ্যে একটি এই যে, ‘ফযল’ (অনুগ্রহ) ও ‘রহমত’ (দয়া/করুণা) শব্দগুলো যখন উল্লেখিত হয়, তখন সেগুলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক সত্তাকে উদ্দেশ্য করে, যার আরো প্রামাণিক দলিল পরবর্তী পর্যায়ে পেশ করা হবে। কিন্তু প্রথমে ‘ফযল’ ও ‘রাহমা’ শব্দগুলো দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে, তা-ই আমরা দেখি।

৪.৫.২.১ একটি কৌতূহলোদ্দীপক বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়

এই আয়াতটিতে দুটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে:

১) আল্লাহর অনুগ্রহ (ফযল);

২) আল্লাহর দয়া/করুণা (রাহমা)।

এই দুটি শব্দের মাঝে ‘ওয়াও’ (এবং) অপ্রধান পদটি বিদ্যমান, যা সংযোজক অব্যয় পদ হিসেবে ব্যবহৃত। আরবী ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, ‘ফযল’ ও ‘রাহমা’ শব্দগুলো পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেটা ইঙ্গিত করে যে সেগুলো দুটি আলাদা বিষয়। তাই উভয় শব্দকে উদ্দেশ্য করার পদ্ধতি হিসেবে ‘যা-লিকা’ (‘ওই’) শীর্ষক নির্দেশাত্মক সর্বনামটি দ্বি-বচনে ব্যবহার করা উচিত ছিল; কিন্তু এখানে তা না করে এক-বচনই ব্যবহার করা হয়েছে। (ব্যাকরণের) এই নিয়ম গৃহীত হলে আয়াতটি হতো নিম্নরূপ: “সেগুলোর (মানে ফযল/অনুগ্রহ ও রাহমা/দয়ার) উপর মুসলমানদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত।” অথচ এভাবে প্রকাশিত না হওয়ার দরুন আয়াতটি বরঞ্চ ঘোষণা করে: “সেটার (অর্থাৎ, এক-বচনে) উপর মুসলমানদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত।”

আরবী ভাষায় ‘যা-লিকা’ (‘ওই’) শব্দটি এক-বচনে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়; কিন্তু আমরা দ্বি-বচন বা বহু-বচন ব্যবহার করতে চাইলে যথাক্রমে ‘যা-নিকা’ ও ‘উলাইকা’ শীর্ষক নির্দেশাত্মক সর্বনামদ্বয় প্রয়োগ করে থাকি। এই নিয়ম স্মরণে রেখে আমরা যদি আয়াতখানির দিকে ফিরে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো যে ‘যা-লিকা’ শীর্ষক এক-বচনের নির্দেশাত্মক সর্বনামটি-ই ‘ফযল’ ও ‘রাহমা’ শব্দ দুটোর জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে।

এই বাচনশৈলীর পেছনে কী হেকমত তথা ঐশী জ্ঞান লুকায়িত আছে? আল-কুরআন কি এর নীতিমালা পরিবর্তন করেছে? না, আসলে তা নয়। আমাদেরকে এখানে স্বীকার করতে হবে যে আয়াতটিতে এক-বচনের নির্দেশাত্মক সর্বনামটি ব্যবহৃত হয়েছে একারণে যে ‘ফযল’ ও ‘রাহমা’ শব্দ দুটো শুধু একজনকেই উদ্দেশ্য করেছে। কুরআন মজীদে এই বাচনশৈলী হতে নিম্নের বিষয়টি যথাযথভাবে উপলব্ধ হওয়া উচিত যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা তাঁরই ‘ফযল’ ও ‘রাহমা’-কে মূলতঃ একজন মহান সত্তার মাঝে সন্নিবেশিত করেছেন; আর এই মহা সম্মানিত সত্তার খাতিরেই আমাদেরকে আনন্দ প্রকাশের জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে।

৪.৫.২.২ কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর/ ব্যাখ্যা

উপরে উল্লেখিত আয়াতে করীমার আলোকে যদি আমরা অন্যান্য কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করি (এটা তাফসীর আল-কুরআন বিল-কুরআন নামে পরিচিত), তাহলে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলার ‘ফযল’ (অনুগ্রহ) ও ‘রাহমা’ (দয়া/করুণা) হলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ‘রাহমা’ শব্দটির ব্যাখ্যা সূরা আশ্বিয়া’তে পাওয়া যায়, যেখানে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ‘রাহমাতুল্লিল্ আলামীন’ (বিশ্বজগতের জন্যে ঐশী করুণা) লকুব/উপাধিটি দান করেন।

১. কুরআন মজীদে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্পষ্টভাবে ঐশী দয়া/করুণা বলা হয়েছে:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

-আর (হে মহিমাম্বিত রাসূল!) আমরা তো আপনাকে বিশ্বজগতের জন্যে রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।^{১৯৩}

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সমস্ত সৃষ্টিকুলের জন্যে (খোদায়ী) পরম করুণার মূর্তরূপ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা’তে শুধু এই বিশ্বজগতই নয়, বরং অন্যান্য আলম/জগতও অন্তর্ভুক্ত। তাঁর পবিত্র জাত (সত্তা) মোবারকই খোদায়ী করুণার মূর্ত প্রকাশ, যাঁকে বিশ্বমানবতার হেদায়াত তথা সঠিক পথপ্রাপ্তি ও কল্যাণে প্রেরণ করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এ জগতে আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ ও দয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

২. বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ ও করুণা ঘোষণা করে আল-কুরআনের অন্যত্র এরশাদ হয়েছে:

فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

—সুতরাং যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না হতো, তবে তোমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেতে।^{১৯৪}

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই যে আল্লাহর ‘ফযল’ (অনুগ্রহ) ও ‘রহমত’ (করুণা) তা নিম্নের আয়াতে করীমায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا.

—যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর রহমত না হতো তবে অবশ্যই অল্পসংখ্যক ব্যতীত তোমরা (সকলে) শয়তানের অনুসরণ শুরু করতে।^{১৯৫}

এই আয়াতে করীমায় আল্লাহ তা‘আলা ঈমানদার মুসলমানদেরকে সার্বিকভাবে এবং সাহাবা-এ কেরাম রাহিয়াল্লাহু আনহুমকে সুনির্দিষ্টভাবে সম্বোধন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (ধরাধামে) শুভাগমন ও রাসূল হিসেবে প্রেরণকে আপন আশীর্বাদ হিসেবে ঘোষণা করার পাশাপাশি আল্লাহ পাক বিবৃত করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সৃষ্ট) না হলে অধিকাংশ মানুষ শয়তানের অনুসারী হতো, যার ফলশ্রুতিতে তারা কুফরী (অবিশ্বাস) ও শেরক (অংশীবাদ)-এর শিকারে পরিণত হতো। এটা স্রেফ আল্লাহ তা‘আলার এক মহা অনুগ্রহ যে তিনি তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সঠিক পথপ্রাপ্তির উৎসমূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যার দরুন শয়তানের ধূর্তচাল ও ধোঁকা হতে তিনি তাদেরকে রক্ষা করেছেন।

৪. অপর এক আয়াতে করীমায় আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

১৯৪. আল কুরআন: সূরা বাকারা, ২:৬৪।

১৯৫. আল কুরআন: সূরা নিসা, ৪:৮৩।

—নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুসলমানদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্য থেকে (মহিমার অধিকারী) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম)-কে প্রেরণ করেছেন; যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। যদিও ইতিপূর্বে তারা ছিল সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত।^{১৯৬}

মনোনীত এই পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরণের আগে গোটা মানবজাতি গোমরাহী ও অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে ছিল। ঠিক এমন-ই এক পরিস্থিতিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মানবের মাঝে প্রেরণ করা হয়। কুরআন তেলাওয়াত (পাঠ) এবং এর শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিয়ে মনুষ্য সভ্যতাকে মানসিক দাসত্ব, অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার বন্দিদশা হতে মুক্তি দেয়া হয়; আর ঈমানের জ্যোতি তাদের অন্তরে স্থাপন করা হয়, যার দরুন তাদের আত্মাগুলো নুবুওয়্যতের শিক্ষা দ্বারা জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে এবং এতে তারা মানসিক শান্তিও অর্জন করে। এটা এমন-ই এক বিশাল অনুগ্রহ ছিল যে আল্লাহ তা‘আলা এটাকে তাঁর সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ বলে অভিহিত করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ এতো বড় নেয়ামত যে “মুসলমানদের সেটার জন্যে আনন্দ প্রকাশ করা উচিত” শীর্ষক আয়াতটি এবিষয়টিকে পূর্ণ সমর্থন দেয়; ফলে ঈমানদার মুসলমানবৃন্দ যতোই খুশি প্রকাশ করুন না কেন, তা যথেষ্ট হবে না। এই খুশি স্রেফ অনুভব করা উচিত নয়, বরঞ্চ এটা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করাও একান্ত প্রয়োজন।

৫. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা উপরোক্ত গুণাবলী সম্পর্কে ঘোষণা করেন:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ○

—তিনিই সেই সত্তা, যিনি উম্মীঈনদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে একজন (সম্মানিত) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম)-কে

১৯৬. আল কুরআন: সূরা আলে ইমরান, ৩:১৬৪।

প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের নিকট আবৃত্তি করেন তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাদেরকে (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে) পরিশুদ্ধ করেন, আর তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। বস্তুত তারা তাঁর (সাদর আগমনের) পূর্বে ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।^{১৯৭}

এই আয়াতটি আমাদের জানায় যে আমাদেরই সবচেয়ে সম্মানিত মালিক-মোখতার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সেই পয়গম্বর, যিনি মানবজাতির কাছে আল্লাহ তা‘আলার ওহী পাঠ করে তাদেরকে পথভ্রষ্টতা ও অবিশ্বাসের আবর্জনা হতে পবিত্র করেছেন। আর তিনি-ই তাদের অন্তঃস্থ সত্তাগুলোকে অভ্যন্তরীণ অশুচি হতে পুতঃপবিত্র করেছেন এবং তাদেরকে জ্ঞান-প্রজ্ঞার আলো দ্বারাও উদ্ভাসিত করেছেন, যার দরুন তারা আল্লাহ তা‘আলার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তাঁরই হেদায়াত তথা সত্য পথপ্রাপ্তির মহা পুরস্কার লাভ করেছেন। নচেৎ ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমন নিঃসন্দেহে খোদায়ী হেদায়াতের জ্যোতির বহিঃপ্রকাশ এবং এটা আল্লাহর আশীর্বাদ ও করুণা-ও। এ জন্যেই ঈমানদারদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক।

৬. এর পরবর্তী আয়াতে করীমায় আল্লাহ পাক শেষ বিচার দিবস অবধি সকল অনাগত প্রজন্মকে এই আশীর্বাদের আওতায় নিয়ে এসেছেন:

وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

—আর তাদের মধ্যে অন্যান্যদের জন্যেও (পরিশুদ্ধি ও শিক্ষার জন্যে প্রেরণ করেছেন এ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে), যারা এখনো এদের সাথে মিলিত হয়নি (অর্থাৎ তাদের পরে আগমন করে বর্তমান সময়ে যারা বিদ্যমান)। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। তা আল্লাহরই অনুগ্রহ (অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

ওয়াসাল্লামের আগমন এবং তাঁর অনুগ্রহ ও হেদায়াত), যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।^{১৯৮}

সূরা জুম‘আ‘র উপরে উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রথমে একজন পয়গম্বর হিসেবে বর্ণনা করেন এবং তারপর তাঁকে আপন আশীর্বাদ হিসেবে বিভূষিত করেন। এসব আয়াতে করীমা থেকে এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় যে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সৃষ্টিকুলের জন্যে পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ করেছেন: কোনো স্থান-কাল-পাত্রকেই এর ব্যতিক্রম করা হয়নি।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ দ্বারা যাঁরা আশীর্বাদধন্য হন, তাঁদেরকে এই উম্মতের প্রথম প্রজন্ম সাব্যস্ত করা হয়। আর তাঁদের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুভাগমন করেন (মানে তাঁর বেলাদত হয়)। সূরা জুম‘আর ৩য় আয়াতে ‘তাদের মধ্য থেকে অন্যান্যদের’ উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সকল মানুষ হলেন তাঁরাই, যাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাহেরী জিন্দেগীর পরে আগমন করবেন। এতে অন্তর্ভুক্ত আছেন অন্য জাতীয়তা ও সভ্যতার সকল মানুষ যাঁরা ইসলামে দাখিল হবেন এবং উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদস্য হবেন, ঠিক যেমনটি ওই আয়াতে করীমায় ঘোষিত হয়েছে, “যারা (অর্থাৎ, বর্তমান যে পরবর্তী প্রজন্ম) ওই পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হয়নি।” যেহেতু তাঁরা হযর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ভিন্ন এক যুগে আবির্ভূত হয়েছেন, সেহেতু তাঁদেরকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে গণনা করা হয়েছে, যাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি দেখা-সাক্ষাৎ পাননি।

সূরা ইউনুসের ৫৮নং আয়াতের আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ার আগে সূরা আল-জুম‘আর ৪নং আয়াতে বিধৃত মর্মবাণী সর্বপ্রথমে যথাযথভাবে উপলব্ধ হওয়া প্রয়োজন। এই আয়াতটির তাফসীর নিম্নরূপ:

৪.৫.২.২.১ “এবং আল্লাহই সবচেয়ে বেশি ফযল তথা অনুগ্রহশীল” মর্মে আয়াতটির অর্থ

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা যিনি সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা, তিনি সব ধরনের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাঁর অনুগ্রহে তিনি-ই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, আর তাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে সমস্ত কিছুর উপর। এখানে সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক যে বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, আল্লাহ পাক এই ‘ফযল’ তথা অনুগ্রহের মালিক; কিন্তু তিনি নিজে সেই ফযল/অনুগ্রহ নন। উদাহরণস্বরূপ, কোনো নির্দিষ্ট বাড়ি ও তা কার মালিকানাধীন জানার জন্যে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে বলা হবে অমুক এ বাড়ির মালিক। আরবী ব্যাকরণে এটা ‘আল-এযাফত’ (ষষ্ঠী বিভক্তি) হিসেবে পরিচিত, যা সম্বন্ধ নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয় এবং যার সমষ্টি হচ্ছে একটি সম্বন্ধকৃত বিশেষ্য পদ ‘মোযাফ’ ও একটি সম্বন্ধকারক বিশেষ্য পদ ‘মোযাফ ইলাইহ্’। যদিও এগুলো একত্রে আসে, তবুও মূলতঃ একে অপর হতে এরা আলাদা। যথা-বইয়ের মালিক; মালিক ও মালিকানাধীন বস্তু এখানে পরস্পর হতে পৃথক; কখনোই এরা এক হতে পারে না। আরেকটি উদাহরণ হলো ‘আল্লাহর রাসূল’: এখানে ‘রাসূল’ বিশেষ্য পদটি সম্বন্ধকৃত, আর ‘আল্লাহ’ বিশেষ্য পদটি সম্বন্ধকারক। অতএব, এই নিয়ম অনুসারে রাসূল যেমন আল্লাহ হতে পারেন না, তেমনি আল্লাহ-ও রাসূল হতে পারেন না।

এই বিষয়টি উপলব্ধি করার পর চলুন আমরা আলোচ্য আয়াতটির দিকে আবার ফিরে তাকাই এবং উপরোক্ত (ব্যাকরণগত) নিয়মটি তাতে প্রয়োগ করি। আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ ফরমান: “এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ” এখানে ‘অনুগ্রহের অধিকারী’ শব্দগুলো ষষ্ঠী বিভক্তি। (আরবী) ব্যাকরণগতভাবে সম্বন্ধকৃত বিশেষ্য ও সম্বন্ধকারক বিশেষ্য সর্বদা একে অপর হতে ভিন্ন। অতএব, ‘ফযল’ (অনুগ্রহ) ও তার ‘মালিক’ দুটি আলাদা আলাদা বিষয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ হলেন ওই অনুগ্রহের মালিক; কিন্তু তিনি স্বয়ং ওই অনুগ্রহ নন। কেননা অনুগ্রহ সেই জিনিস যা আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক দানকৃত।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং সেই অনুগ্রহ না হলে সেই অনুগ্রহটি কে? এর উত্তর হলো, সেই অনুগ্রহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সম্মানিত জাত তথা সত্তা মোবারক, যাঁকে আল্লাহ তা‘আলা সমগ্র মানবজাতির জন্যে আপন রাহমা/করণা ও হেদায়াত/পথপ্রদর্শনস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। এই বিষয়টি আরো খোলাসা করতে নিচে কয়েকজন বরণ্য ও কর্তৃত্বসম্পন্ন তাফসীরকার উলামার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সংকলন পেশ করা হলো।

৪.৫.২.২.২ বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থগুলোতে ‘ফযল’ শব্দটির অর্থ

সূরা জুম‘আর ৪র্থ আয়াত অবতীর্ণ হয় করুণার নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদপূর্ণ শুভাগমন উপলক্ষে। তাঁর বরকতময় আবির্ভাব সমগ্র মানবজাতির খাতিরে হয়েছিল, আর আল্লাহ তা‘আলা এটাকে আশীর্বাদ হিসেবে ঘোষণা করেন। কেউ এই আশীর্বাদের মূর্ত প্রকাশ দেখতে চাইলে তাঁর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখতে হবে। এই বিষয়টি কুরআন মজীদে বিস্তারিত বলা হয়েছে। আলোচ্য এ আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু প্রধান প্রধান তাফসীরের একটি সংকলন নিচে পেশ করা হলো:

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (বেসাল: ৬৮ হিজরী) বিবৃত করেন যে মহা অনুগ্রহের অর্থ:

[وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ] الْمَنْ [الْعَظِيمِ] بِالْإِسْلَامِ وَالنَّبُوَّةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُقَالُ بِالْإِسْلَامِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَيُقَالُ بِالرُّسُولِ وَالْكِتَابِ عَلَى خَلْقِهِ.

-(এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল)-আয়াতটি এমন এক আশীর্বাদকে উদ্দেশ্য করে, যেটা দ্বীন-ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দানকৃত নুবুওয়াত। এ কথাও বলা হয়েছে যে তা ঈমানদারবৃন্দের প্রতি দানকৃত দ্বীন-ইসলাম। আর এ-ও বলা হয়েছে যে এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সৃষ্টিকুলকে প্রদত্ত আল-কুরআন।^{১৯৯}

২. আল-যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হিজরী) লিখেন:

[ذَٰلِكَ] الْفَضْلُ الَّذِي أَعْطَاهُ مُحَمَّدًا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ نَبِيَّ أَنْبَاءِ عَصْرِهِ، وَنَبِيَّ أَنْبَاءِ الْعُصُورِ الْغَوَابِرِ هُوَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

—(সেই) আশীর্বাদ যেটা আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন, যিনি তাঁর জমানার (মানে শেষ বিচার দিবস অবধি সময়ের) মানুষের নবী এবং পূর্ববর্তী জমানার মানুষেরও; সেটাই হচ্ছে ‘আল্লাহর আশীর্বাদ। তিনি যাকে পছন্দ করেন তাঁকে দান করেন’।^{২০০}

৩. আল-তাবরাসী (জন্ম: ৫৪৮ হিজরী) বলেন:

[وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ] ذُو الْأَمْنِ الْعَظِيمِ عَلَى خَلْقِهِ بِبَعْثِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—(এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের মাধ্যমে তিনি সৃষ্টিকুলের প্রতি মহা আশীর্বাদের (যিনি) মালিক।^{২০১}

অর্থাৎ, মানবজাতির মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে সর্ববৃহৎ আশীর্বাদ এবং এটা তাঁর এক অনুগ্রহ-ও।

৪. ইবনে আল-জাওয়ী (৫১০-৫৭৯ হিজরী) বলেন:

[وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ] بِإِرسَالِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—(এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করে।^{২০২}

২০০. মো‘তামেলী মতবাদী আল-যামাখশারী কৃত ‘আল-কাশশাফ ‘আন হাক্বায়েকু গাওয়া‘মিদ আল-তানযীল ওয়া ‘উয়ুন আল-আক্বা‘উয়ীল ফী উজুব আল-তা‘উয়ীল’, ৪:৫৩০।

২০১. আল-তাবরাসী রচিত ‘মজমা‘আ আল-বয়া‘ন ফী তাফসীর আল-কুরআন, ১০:৪২৯।

২০২. ইবনে জাওয়ী লিখিত ‘যা‘দ আল-মাসীর ফী ‘ইলম আল-তাফসীর’, ৮:২৬০।

অর্থাৎ, মানবজাতির মাঝে আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক তাঁর সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ এক মহা আশীর্বাদ এবং পুরস্কার-ও।

৫. ইমাম নাসাফী (জন্ম: ৭১০ হিজরী) বিবৃত করেন:

[ذَٰلِكَ] الْفَضْلُ الَّذِي أَعْطَاهُ مُحَمَّدًا... وَهُوَ أَنْ يَكُونَ نَبِيَّ أَنْبَاءِ عَصْرِهِ، وَنَبِيَّ أَنْبَاءِ الْعُصُورِ الْغَوَابِرِ.

—(সেই) আশীর্বাদ যেটা আল্লাহ তা‘আলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন, তিনি তাঁর সময়কার (শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত সময়ের) মানুষের নবী এবং পূর্ববর্তী সময়কালের (মানুষেরও) নবী।^{২০৩}

সবচেয়ে করুণাশীল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদপূর্ণ প্রেরণ গোটা মানবজাতিকে আপন করুণার ছায়ায় ঢেকে রেখেছে; যাঁরা তাঁর আগে অতিক্রান্ত হয়েছেন এবং যাঁরা শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত আগমন করতে থাকবেন সবাই এর আওতাধীন। এটাই হলো নিম্নের আয়াতের ব্যাখ্যা—“ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ”—“সেটাই আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে পছন্দ করেন তাকে দান করেন”^{২০৪}—যার মধ্যে ইমাম নাসাফী দুটো অর্থ-ই তুলে ধরেছেন। “(যারা ওই পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত হয়নি) আল্লাহর এই বাণীতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন পরবর্তী যুগে আগমনকারী মানুষ, যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেননি; মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের প্রতিও একজন প্রেরিত পয়গম্বর, আর তাঁর ধরাধামে শুভাগমন উপলক্ষে তাঁদেরকেও ‘আনন্দ প্রকাশ’ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

৬. ইমাম আল-খায়েন (৬৭৮-৭৪১ হিজরী) ‘মহা অনুগ্রহ’ বলতে কী বুঝানো হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন:

২০৩. আল-নাসাফী কৃত ‘মাদা‘রিক আল-তানযীল ওয়া হাক্বায়েকু আল-তাউয়ীল, ৫:১৯৮।

২০৪. আল কুরআন: সূরা মায়দা, ৫:৫৪।

أَيُّ عَالِي خَلْقِهِ حَيْثُ أَرْسَلَ فِيهِمْ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—যা সৃষ্টিকুলের প্রতি আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাদের মাঝে রাসূল হিসেবে প্রেরণের দ্বারা হয়েছে।^{২০৫}

৭. আবু হাইয়ান আন্দালুসী (৬৮২-৭৪৯ হিজরী) ব্যক্ত করেন:

و [ذَلِكَ] إِيَّاهُ إِلَى بَعْثِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

—(সেটা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে (নবী হিসেবে) প্রেরণের প্রতি ইঙ্গিত করে।^{২০৬}

৮. ইবনে কাসীর (৭০১-৭৭৪ হিজরী) ব্যাখ্যা করে:

يَعْنِي مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الثَّبُوتِ الْعَظِيمَةِ، وَمَا خَصَّ بِهِ أُمَّتَهُ مِنْ بَعْثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—অর্থাৎ, (এটা তাই) যা আল্লাহ তা‘আলা হযরত পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রকাশ্য নুবুওয়্যাত হিসেবে দান করেছেন এবং তাঁকে প্রেরণের মাধ্যমে তাঁরই উম্মতের প্রতি যে গুণাবলী মঞ্জুর করেছেন।^{২০৭}

অতএব, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদপূর্ণ শুভাগমন ও তাঁর রেসালাত উভয়ই আল্লাহ তা‘আলার মহা অনুগ্রহ।

৯. ইমাম সুয়ুতী (৮৪৯-৯১১ হিজরী) বলেন:

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ [الَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ ذَكَرَ مَعَهُ].

—“আল্লাহরই অনুগ্রহ; যাকে চান দান করেন”—এ আয়াতটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে এবং তাঁদেরকেও তা করে, তাঁর সাথে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।^{২০৮}

২০৫. আল-খায়েন রচিত ‘লুবা’ব আল-তা‘উয়ীল ফী মা‘আনী আল-তানযীল’, ৪:২৬৫।

২০৬. আবু হাইয়ান প্রণীত ‘তাকসীর আল-বাহর আল-মুহীত’, ৮:২৬৫।

২০৭. ‘সাল্লাফী’ মতবাদী ইবনে কাসীর লিখিত ‘তাকসীর আল-কুরআন আল-আযীম’, ৪:৩৬৪।

২০৮. আস্-সুয়ুতী কৃত ‘তাকসীর আল-জালালাইন’, ৫৫৩ পৃষ্ঠা।

১০. আল-আলুসী (১২১৭-১২৭০ হিজরী) বিবৃত করেন:

[ذَلِكَ] إِيَّاهُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَسُولًا فِي الْأُمِّيِّينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مُعَلِّمًا مَرْكَبًا وَمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْبُعْدِ لِلتَّعْظِيمِ أَيُّ ذَاكَ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ.

—(সেটা) ইশারা করে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার দিকে, যেমন— তাঁর মহাসম্মানিত রাসূল হওয়াটা উম্মী মানুষদের মাঝে এবং তাদের পরবর্তীদের মাঝেও; জ্ঞানদাতা ও পবিত্রকারী হিসেবে। এতে নিহিত দূরত্বের অর্থ সম্মানের উদ্দেশ্যেই কৃত, যথা— ‘সেই মহা অনুগ্রহ’।^{২০৯}

১১. আহমদ মোস্তফা আল-মারাগী (১৩০০-১৩৭২ হিজরী) মন্তব্য করেন:

أَيُّ وَإِرْسَالُ هَذَا الرَّسُولِ إِلَى الْبَشَرِ مُرَكَّبًا مُطَهَّرًا لَهُمْ، هَادِيًا مُعَلِّمًا، فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ، وَإِحْسَانٌ مِنْهُ إِلَى عِبَادِهِ.

—মানবজাতির প্রতি তাদেরকে পবিত্রকারী ও জ্ঞানদাতা এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে এই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করাটা আল্লাহ তা‘আলার এক আশীর্বাদ, আর তাঁরই বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহের এক নিদর্শন-ও।^{২১০}

১২. আল-তানতালুয়ী আল-জওহারী (মৃ: ১৩৫৯ হিজরী), সমসাময়িককালের (ফ্রী-মেইসন হিসেবে) পরিচিত মিসরীয় তাফসীরবিদ, ব্যাখ্যা করে:

[وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ] فَإِذَا كَانَ مُحَمَّدٌ قَدْ أُرْسِلَتْهُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الْأُمِّيُّونَ وَإِلَى مَنْ يَأْتِي بَعْدَكُمْ.

২০৯. মাহমুদ আল-আলুসী রচিত ‘রুহ আল-মা‘আনী ফী তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম ওয়াল-সাব’ আল-মাসানী’, ২৮:৯৪-৯৫।

২১০. ফ্রী-মেইসন আহমদ আল-মারাগী লিখিত ‘তাকসীর আল-কুরআন আল-করীম’, ১০/২৮:৯৬।

–(এবং আল্লাহ তা‘আলা মহা অনুগ্রহশীল) মানে ‘ওহে উম্মী মানুষ, তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের পরবর্তীদের প্রতি যখন আমি (খোদা) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করেছি, তখন তা তোমাদের প্রতি আশীর্বাদ হয়ে গিয়েছে’।^{২১১}

উপরের তাফসীরগুলো হতে এটা স্পষ্ট যে মহাসম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যতিক্রম ছাড়াই সবার জন্যে আশীর্বাদ বলা হয়েছে। যেহেতু আন-নস্ আল-ক্বাতেঈ তথা সুস্পষ্ট শরঈ দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপন অনুগ্রহ ও করুণা বলে সম্বোধন করেছেন, সেহেতু ‘মুসলমানদের সেটার উপর আনন্দ প্রকাশ করা উচিত’ মর্মে খোদায়ী আদেশ পালনার্থে খুশি উদযাপন করাটা ঐশী আজ্ঞা ও কুরআনী শিক্ষার সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

৪.৫.২.২.৩ বিখ্যাত তাফসীরগুলোতে ‘ফযল’ ও ‘রহমত’ (করুণা) শব্দগুলোর অর্থ

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে সূরা আল-জুম‘আ’র আয়াতগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এক্ষেপে আমরা সূরা আল-ইউনুসের ৫৮নং আয়াতটি বিশ্লেষণ করবো, যাতে আল-কুরআনের কিছু মনোনীত তাফসীরের আলোকে ‘ফযল’ ও ‘রাহমা’ শব্দগুলোর অর্থ আরো ভালোভাবে বুঝা যায়:

১. ইবনে আল-জাওযী (৫১০-৫৭৯ হিজরী) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন:

أَنَّ فَضْلَ اللَّهِ: الْعِلْمُ، وَرَحْمَتُهُ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَوَاهُ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

–‘আল্লাহর ফযল (অনুগ্রহ) হচ্ছে জ্ঞান (অর্থাৎ, আল-কুরআন) এবং রাহমা (করুণা) হচ্ছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’ আল-দাহহাক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে এটা বর্ণনা করেন।^{২১২}

২. আবু হাইয়্যা‘ন আল-আন্দালুসী (৬৮২-৭৪৯ হিজরী) বর্ণনা করেন:

وقال ابن عباس فيما روي الضحاك عنه: الفضل: العلم، والرحمة: محمد صلي الله عليه وسلم.

–আল-দাহহাক উদ্ধৃত করেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে, যিনি বলেন: ‘ফযল বলতে উদ্দেশ্য করা হয়েছে জ্ঞান (মানে আল-কুরআন)-কে, আর রাহমা (করুণা) হলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’^{২১৩}

৩. ইমাম সুযূতী (৮৪৯-৯১১ হিজরী)-ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে উদ্ধৃত করে বলেন:

وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْآيَةِ، قَالَ: فَضْلُ اللَّهِ: الْعِلْمُ، وَرَحْمَتُهُ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ].

–আবু আল-শায়খ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে এই আয়াতটিতে ‘আল্লাহর ফযল’ বলতে জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে, আর তাঁরই ‘রাহমা’ বলতে উদ্দেশ্য করা হয়েছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে (যেমনটি এরশাদ হয়েছে- আর (হে মহিমাম্বিত রাসূল!) আমরা তো আপনাকে বিশ্বজগতের জন্যে রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি’।^{২১৪}

২১২. ইবনে জাওযী লিখিত ‘যা‘দ আল-মাসীর ফী ‘ইলম আল-তাফসীর’, ৪:৪০।

২১৩. আবু হাইয়্যা‘ন প্রণীত ‘তাফসীর আল-বাহর আল-মুহীত’, ৫:১৭১।

২১৪. ইমাম সুযূতী রচিত ‘আল-দূর আল-মানসূর ফী আল-তাফসীর বি আল-মা‘সূর’, ৪:৩৩০; আল কুরআন: সূরা আশ্বিয়া, ২১:১০৭।

২১১. আল-তানতাইয়ী আল-জওহারী প্রণীত ‘আল-জাওয়া‘হির ফী তাফসীর আল-কুরআন আল-কা‘রীম’, ২৪:১৭৫।

৪. মাহমুদ আলুসী (১২১৭-১২৭০ হিজরী) বলেন:

وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ فَضْلَ اللَّهِ. أَلْعَلُّمُ،
وَالرَّحْمَتُ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَخْرَجَ الْخَطِيبُ وَابْنُ عَسَاكِرُ عَنْهُ
تَفْسِيرُ الْفَضْلِ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

—আবু আল-শায়খ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: ‘আল্লাহর ‘ফযল’ (অনুগ্রহ) হচ্ছে জ্ঞান (মানে আল-কুরআন) এবং তাঁরই ‘রাহমা’ (করণা) হচ্ছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পক্ষান্তরে, আল-খতীব ও ইবনে আসা’কির উভয়-ই হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে ‘ফযল’ শব্দটি দ্বারাও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।^{২১৫}

উপরে উদ্ধৃত তাফসীরগুলো হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ‘ফযল’ তথা ‘অনুগ্রহ’ শব্দটিকে জ্ঞান হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, আর এখানে ‘জ্ঞান’ বলতে বুঝায় কুরআন মজীদ। নিচের আয়াতটি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করে:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.

—এবং (হে হাবীব!) তিনি আপনাকে যেসব বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন যা আপনি জানতেন না। আর আপনার প্রতি রয়েছে আল্লাহর মহা অনুগ্রহ।^{২১৬}

এই আয়াতে করীমায় উদ্ধৃত ‘ফযল’ (অনুগ্রহ)-এর অর্থ যদি জ্ঞান অথবা কুরআন মজীদ হয়েও থাকে, তথাপিও এর গভীর অন্তর্নিহিত অর্থের উপলব্ধি দ্বারা আমরা দেখতে পাই যে এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কেই উদ্দেশ্য করেছে। কেননা (একমাত্র) তাঁরই মধ্যস্থতায় আমরা কুরআন মজীদ লাভ করেছি। এই উম্মতের তাফসীর

২১৫. মাহমুদ আলুসী কৃত ‘রুহ আল-মা’আনী ফী তাফসীর আল-কুরআন আল-‘আযীম ওয়া আল-সাব’ আল-মাসা’নী, ১১:১৪১।

২১৬. আল কুরআন: সূরা নিসা, ৪:১১৩।

বিশারদমণ্ডলীর ইমাম ও মহান সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের অন্তরগুলোকে আলোকিত করেছেন এ জ্ঞান দ্বারা যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই আল্লাহ তা‘আলার ‘ফযল’ (অনুগ্রহ) ও ‘রাহমা’ (করণা)। একই আয়াতে “মুসলমানদের সেটার জন্যে আনন্দ প্রকাশ করা উচিত”—বাক্যটি মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে খুশি প্রকাশের উপলব্ধি আমাদের মধ্যে জাগ্রত করে; আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ ও করণাপ্রাপ্তিতে খুশি প্রকাশের এটা মাধ্যমবিশেষ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে দেখলে কোনো বুদ্ধিমান মুসলমান-ই এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন না। উপরের আয়াতে করীমার গূঢ় রহস্যগুলো এই তাফসীরটি উন্মোচন করেছে এবং মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদযাপনের আকারে আল্লাহ তা‘আলার কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুগ্রহ ও করণার প্রতি খুশি প্রকাশ করাটা যে আল্লাহরই আদেশ, সে বিষয়টিও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

আল-তাবরাসী (জন্ম: ৫৪৮ হিজরী) বলেন:

وَمَعْنِي الْآيَةِ قُلْ لَهُؤُلَاءِ الْفَرْحَيْنِ بِالدُّنْيَا الْمُعْتَدَيْنِ بِهَا الْجَامِعَيْنِ لَهَا إِذَا
فَرَحْتُمْ بِشَيْءٍ فَافْرَحُوا بِفَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتِهِ لَكُمْ يَنْزَالُ هَذَا الْقُرْآنُ
وَأَرْسَالِ مُحَمَّدٍ إِلَيْكُمْ فَإِنَّكُمْ تَحْصِلُونَ بِهِمَا نَعِيمًا دَائِمًا مُقِيمًا هُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ عَنْ قَتَادَةَ وَجَاهِدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ
الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: [فَضْلُ اللَّهِ] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—এই আয়াতটির মানে হলো, ‘(হে রাসূল), ওইসব মানুষ যারা দুনিয়া নিয়ে আনন্দে মেতে আছে এবং একে অপরের সাথে সেটা নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে আর সেটা (-র ফসল) সঞ্চয় করছে, তাদেরকে বলুন যে তোমাদের যদি আনন্দ করতেই হয়, তাহলে তোমাদের মাঝে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ ও কুরআন মজীদ নাযেলের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা যে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও করণা করেছেন, সেটার খাতিরে তোমরা খুশি প্রকাশ করো। (আর এটা তোমরা করলে) উভয়েরই মাধ্যমে তোমরা চিরস্থায়ী ও অনন্ত (খোদায়ী) আশীর্বাদ লাভ

করবে, যা তোমাদের জন্যে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া হতে শ্রেষ্ঠতর হবে। ক্বাতাদা ও মুজাহিদ দুজনই বর্ণনা করেন হযরত আবু জা'ফর আল-বাক্ফের রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বক্তব্য: আল্লাহর ফযল (অনুগ্রহ) হলেন হযরতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।^{২১৭}

উপরের তাফসীরে প্রদত্ত ব্যাখ্যা হতে অনুধাবন করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার আশীর্বাদগুলোর মধ্যে সেরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল-কুরআন। এর মানে এই দুইয়ের ক্ষেত্রেই কেবল খুশি প্রকাশ করা যথাবিহিত। কেউ যদি কোনো কিছু উদযাপন করতে চান, তাহলে তাঁকে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত/মীলাদ দিবস পালন করতে দেয়া হোক; কেননা এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দিবস আর নেই।

৪.৫.২.২.৪ মৌ: আশরাফ আলী থানবীর দৃষ্টিভঙ্গি

এখানে পাশ্চটীকা হিসেবে দেওবন্দী (কওমী) মতবাদের অতি পরিচিত আলেম মৌ: আশরাফ আলী থানভীর (১২৮০-১৩৬২ হিজরী) এতদসংক্রান্ত অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য হবে। ইতিপূর্বে যেমনটি বলা হয়েছিল যে 'ফযল' ও 'রাহমা' শব্দগুলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উদ্দেশ্য করেছে, ঠিক একইভাবে থানভী-ও নিজ 'মীলাদ আল-নাবী' পুস্তকে ব্যক্ত করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ ও পরম নিখুঁত অনুগ্রহ।^{২১৮}

২১৭. আল-তাবরাসী লিখিত 'মজমা' আল-বয়ান ফী তাফসীর আল-কুরআন, ৫:১৭৭-১৭৮।

২১৮. জরুরি নোট: আশরাফ আলী থানভী আলোচ্য আয়াতের মূল অর্থ কুরআনের আলোকে গৃহীত বলে ঘোষণা দিয়ে এর ব্যাখ্যা বলেন: এক্ষণে আমরা 'ফযল' (অনুগ্রহ) ও 'রাহমা' (করুণা) শব্দ দুটির দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে, তা আল-কুরআনের অন্যান্য আয়াতে খুঁজে দেখবো। এটা জ্ঞাত হওয়া জরুরি যে এ দুটি শব্দ কুরআন মজীদে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কখনো কখনো উভয় শব্দ একই অর্থবোধক হয়; আবার কখনো কখনো দুটি আলাদা অর্থ জ্ঞাপন করে। তাই আল্লাহ তা'আলা একটি আয়াতে করীমায় এরশাদ ফরমান, فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ "অতঃপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ (ফযল) ও করুণা (রাহমা) তোমাদের প্রতি না হতো, তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের

এটার কারণ এ থেকে বুঝা যায় যে, 'দালা'লা আল-নস' তথা প্রামাণিক দলিল- 'ফযল' ও 'রাহমা' শব্দগুলো দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা করুণার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুশি প্রকাশের উপলক্ষ করার জন্যে ঈমানদারদের প্রতি আদেশ জারি করেছেন, যে পয়গম্বর

অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে" (আল-কুরআন, ২:৬৪)। অধিকাংশ তাফসীরবিদ উলামার মতে, এখানে 'ফযল' ও 'রাহমা' শব্দগুলো মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আশীর্বাদধন্য পবিত্র সত্তাকে উদ্দেশ্য করেছে। আরেকটি আয়াতে এরশাদ হয়েছে, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا قَلِيلًا "এবং যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ (ফযল) ও করুণা (রাহমা) না হতো, তবে অবশ্যই তোমরা শয়তানের অনুসরণ আরম্ভ করত, অল্প সংখ্যক মানুষ ব্যতিরেকে" (আল-কুরআন, ৪:৮৩)। এক্ষেত্রেও সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরবিদ উলামা মত প্রকাশ করেন যে এতে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কতিপয় আয়াতে 'ফযল' বলতে দুনিয়াবী আশীর্বাদকে বোঝানো হয়েছে, আর 'রাহমা' বলতে বোঝানো হয়েছে ধর্মীয় আশীর্বাদকে। সুতরাং সমস্ত তাফসীর-শাস্ত্র বিশারদের মতানুযায়ী, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়াবী তথা পার্থিব আশীর্বাদ এবং এর পাশাপাশি দ্বীনী তথা ধর্মীয় আশীর্বাদ-ও। আশরাফ আলী থানভী আরো বলেন: এই আয়াতে করীমার প্রসঙ্গের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে এটা আল-কুরআনকে উদ্দেশ্য করে। তবে আমরা যদি এটাকে সাধারণ অর্থে নেই, তাহলে কুরআন মজীদকে অধিকতর যথাযথ উদ্দেশ্যগুলোর কোনো একটি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ, 'ফযল' ও 'রাহমা' বলতে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আশীর্বাদপূর্ণ শুভাগমনকে বোঝাবে। এই উপলব্ধি অনুযায়ী, সকল (খোদায়ী) আশীর্বাদ, চাই তা হোক দুনিয়াবী বা হোক ধর্মীয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আল-কুরআন-ও, সবই এ বিষয়ের আওতায় পড়ে। এটা এ কারণে যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আশীর্বাদধন্য সত্তা মোবারক হলেন অন্যান্য সকল আশীর্বাদের উৎসমূল এবং সকল (ঐশী) অনুগ্রহ ও করুণার নির্যাস। অতএব, এটাই সবচেয়ে সামগ্রিক ব্যাখ্যা; আর এই তাফসীরের ভিত্তিতে এ আয়াতখানির সারমর্ম হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নূর তথা জ্যোতির অস্তিত্ব-ই হোক কিংবা তাঁর জিসমানী (শারীরিক) বেলাদত-ই হোক, প্রত্যেক ব্যক্তিরই আপন আপন খুশি এ ব্যাপারে প্রকাশ করা উচিত। কেননা তিনি সকল আশীর্বাদের মাধ্যম বা কারণ। (অন্যান্য সাধারণ আশীর্বাদ ব্যতিরেকে) সবচেয়ে উত্তম আশীর্বাদ হচ্ছে ঈমান তথা ধর্মীয় বিশ্বাস, যেটাও নিশ্চিতভাবে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ই আমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। পরিশেষে, সমস্ত তথ্য বিবেচনায় নিলে দেখা যায় যে 'ফযল' ও 'রাহমা' মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এরই সত্তা মোবারক। তাই তাঁর আশীর্বাদধন্য সত্তার অস্তিত্বের ব্যাপারে পর্যাণ্ড আনন্দ প্রকাশ করা কারো পক্ষেই সম্ভবপর নয়। (আশরাফ আলী থানভী, খুতবায় মীলাদুন্নাবী, পৃ. ৬৩-৬৫)

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সকল পার্শ্ব ও ধর্মীয় আশীর্বাদের উৎস বটে। কেউ আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ ও করুণার বাহ্যিক প্রকাশ দেখতে চাইলে তাঁকে অবশ্যই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে, যাঁকে মহাপ্রভুর আশীর্বাদ ও দয়ার পরমোৎকর্ষের মূর্তরূপ করা হয়েছে। অতএব, আল্লাহ তা‘আলার আশীর্বাদ ও করুণাকে একটি সত্তার মাঝেই সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যিনি ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল স্থান ও কালের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন।

এই (খোদায়ী) আজ্ঞা হতে এটা বুঝা যায় যে, এ আয়াতখানি ঈমানদারবৃন্দের কাছে আনন্দ উদযাপন দাবি করেছে; আর তাই এটা সকল মুসলমানেরই প্রতি প্রযোজ্য। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিমাপূর্ণ বেলাদত (ধরাধামে শুভাগমন) উপলক্ষে মুসলমানদের খুশি প্রকাশ করা উচিত; আর শরীয়ত-নির্ধারিত সীমারেখা মেনে যতোখানি আশীর্বাদ/নেয়ামত উদযাপন করা যায়, সবই অনুমতিপ্রাপ্ত হবে।

৪.৫.৩ আমরা কেন ‘ফযল’ ও ‘রাহমত’-প্রাপ্তি উদযাপন করবো তার বর্ণনা

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা কেন সূরা ইউনুসের ৫৮ নং আয়াতে তাঁর ‘ফযল’ ও ‘রাহমা’-প্রাপ্তিতে আমাদেরকে খুশি/আনন্দ উদযাপন করতে আদেশ করেছেন? এর কারণ-ই বা কী, যার উপর ভিত্তি করে তিনি এই আশীর্বাদপ্রাপ্তিতে আমাদেরকে খুশি প্রকাশ করতে দেখতে চান? এটা জানার আগে এ কথা উপলব্ধি করা জরুরি যে ‘ফযল’ ও ‘রাহমা’ শব্দ দুটি একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে ব্যক্ত হয়েছে। বিভিন্ন আয়াতে করীমায় কুরআন মজীদ এ বিষয়টির পটভূমি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছে, যা ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা মুসলমান সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেন যে, তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমনের কল্যাণরূপী তাঁরই ‘ফযল’ ও ‘রাহমা’ না হলে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ-ই শয়তানকে মেনে বিচ্যুত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতাম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-কে মানবজাতির মাঝে প্রেরণ করা না হলে কে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তির অন্ধকার এবং কুফর (অবিশ্বাস) ও শেরক (অংশীবাদ)-এর শৃঙ্খল হতে বাঁচাতেন, আর খোদায়ী সত্য ও হেদায়াতের আলোয় পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতেন? আমাদের এই মহান পথপ্রদর্শক না হলে মনুষ্যজাতি নৈরাজ্য, নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার-নিপীড়নের গভীর গর্তে পতিত হতো, আর মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করাও সম্ভব হতো না।

আল্লাহ তা‘আলার হেদায়াতের জ্যোতি মানবজাতির মাঝে যিনি নিয়ে এসেছেন, সেই মহাসম্মানিত (পবিত্র) সত্তার ধরণীতলে শুভাগমন উপলক্ষে আমাদের খুশি প্রকাশ করার জন্যে ঐশী আদেশ জারি করা হয়েছে। আমাদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণের ফলাফল-ই হচ্ছে তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ আবির্ভাব। এ উপলক্ষে আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করা তাই ঈমানদারির পূর্বশর্ত এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অন্তরের ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ।

৪.৫.৪ আয়াতটিতে (ঐশী আজ্ঞা) সীমিতকরণসূচক শব্দার্থ ব্যবহারের উদ্দেশ্য

‘ফাবিয়া-লিকা ফালএয়াফরাহু’ (فَبِذَا لَكَ فَلْيَفْرَحُوا) (“মুসলমানদের সেটার জন্যে আনন্দ প্রকাশ করা উচিত”), এই কুরআনের আয়াতটিতে সীমিতকরণসূচক শব্দার্থের প্রয়োগটি বিশেষ গুরুত্বসহ বিবেচনার দাবি রাখে। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (৫৪৩-৬০৬ হিজরী) এর ব্যাখ্যায় বলেন:

قَوْلُهُ [فَبِذَا لَكَ فَلْيَفْرَحُوا] يَفِيدُ الْحُصْرَ، يَغْنِي يَحِبُّ أَنَّ لَا يَفْرَحُ الْإِنْسَانُ إِلَّا بِذَلِكَ.

—(মুসলমানদের সেটার জন্যে আনন্দ প্রকাশ করা উচিত), আল্লাহ তা‘আলার এই কথায় সীমিতকরণের (তথা নির্দিষ্টকরণের) প্রয়োগ বিদ্যমান; অর্থাৎ, এটা জরুরি যে মানুষেরা খুশি প্রকাশ না করেন, এ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে।^{২১৯}

এই আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলেন যে, শরীয়তে জায়েয এমন খুশি-ই শুধু নয়, বরঞ্চ শরীয়তে শর্তারোপকৃত খুশি-ও এতে (এ ঐশী আজায়) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিবৃত হয়েছে যে আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ ও করুণা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উদযাপিত হওয়া উচিত।

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ তা‘আলা নিষেধ করেছেন সেসব আনন্দ-উৎসবের উদযাপন, যাতে প্রদর্শনী বিদ্যমান। পার্থিব আশীর্বাদের ক্ষেত্রে আনন্দের কোনো রকম প্রদর্শনী, যার উদযাপন গ্রহণযোগ্য মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা পছন্দ করেন না। তিনি পাক কালামে ঘোষণা করেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ.

—নিশ্চয়ই আল্লাহ উল্লসিতদের পছন্দ করেন না।^{২২০}

তবে মহান প্রভুর অনুগ্রহ ও করুণার প্রশ্ন উঠলে তিনি এর ব্যতিক্রম করেন। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সর্বাঙ্গকরণে খুশি প্রকাশ ও আনন্দ উদযাপন করা উচিত। ‘তা তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়’— আল্লাহ তা‘আলার এই পাক কালামে আমরা দেখতে পাই যাঁরা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন উপলক্ষে মোমবাতি জ্বালিয়ে, জশনে জুলূস ও সভা-সমাবেশের আয়োজন করে, এবং খাবার বিতরণ করে (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করতে) আনন্দ ও সুখানুভূতি প্রকাশের জন্যে এসব রীতিকে একটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা‘আলারই পছন্দনীয় আমল পালন করেন; আর এ উপলক্ষে কৃত ব্যয় তাঁদের সমস্ত সম্ভোগত ধনসম্পদ ও মালামাল হতেও উত্তম। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের মাস সমাগত হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতের প্রতি সকল দিক হতে উৎসাহ দেখা দেয়, আর এরই ফলে (ধর্মীয়) উদ্দীপনা বিরাজ করে। এই আশীর্বাদধন্য দিনটির জন্যে যদি দুনিয়ার সমস্ত আনন্দ-ফুর্তি কুরবানিও দিতে হয়, তবুও তা যথেষ্ট হবে না। এর অনুমতি কুরআন মজীদ হতে প্রমাণিত। আল্লাহ

তা‘আলা শুধু এর উদযাপনকেই বিধিবদ্ধ করেননি, বরঞ্চ নিচের আলোচনায় আমরা (আরো) দেখতে পাবো যে এই মহা আশীর্বাদের উদযাপন আমাদের প্রতি আদিষ্টও হয়েছে।

৪.৫.৫ আয়াতোল্লিখিত ‘ফাবিয়ালিকা’ (সেটারই মধ্যে) কথাটি ব্যবহারের গূঢ়রহস্য

এই প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমরা ‘সেটা’ নির্দেশাত্মক সর্বনামটি প্রয়োগের ব্যাপারে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছিলাম। এখানে আরো কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ ফরমান:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا.

—বলে দিন, ‘(এ সবকিছু) আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর রহমতের কারণে (যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে)। কাজেই মুসলমানদের উচিত আনন্দ উদযাপন করা। তা (সমস্ত ধন-সম্পদ) থেকে উৎকৃষ্টতর যা তারা জমা করে রাখে’।^{২২১}

উপরের আয়াতটিতে যদি নির্দেশাত্মক সর্বনামটি বাদও দেয়া হতো, তাতেও এর অর্থ বুঝা যেতো। কিন্তু এর প্রয়োগের দ্বারা তাগিদ যুক্ত করা হয়েছে, যাতে আমাদের মনোযোগ অন্য দিকে সরে না যায়। অধিকন্তু, এতে আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, কারো দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাটা কেবল নামায, রোযা ও দান-সদকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এগুলো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আদায়ের গ্রহণযোগ্য পন্থাও বটে। কিন্তু এ মহা আশীর্বাদের আবির্ভাব, যাঁর মাধ্যমে আমরা (বাকি) সব আশীর্বাদ লাভ করেছি, এটা এতোই বড় উপলক্ষ যে এতে সভা-সমাবেশ, আলোকসজ্জা, জশনে জুলূস ও গরিবদের মাঝে খাদ্য বিতরণের আয়োজনের মাধ্যমে এর উদযাপনকে প্রশংসনীয় করা হয়েছে। এ যেন আল্লাহ তা‘আলা চান আমরা নিজেদের খুশি ও সুখানুভূতি প্রকাশ এমনভাবে করি, যাতে আমাদের উদযাপন প্রমাণ

করে তাঁরই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমাদের মাঝে প্রেরণের কারণে আমরা তাঁর (আল্লাহর) প্রতি কৃতজ্ঞ।

৪.৫.৬ ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে (ঐশীদানের প্রতি) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

এটা সাধারণত দেখা যায় যে কারো কোনো শিশু জন্মালে কিংবা (কোনো দেশের) স্বাধীনতা অর্জিত হলে ওই উপলক্ষটি মহা জাঁকজমকের সাথে উদযাপন করা হয়। এই উদযাপন ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় পর্যায়েই হয়ে থাকে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহাসম্মানিত বেলাদত তথা ধরনীতলে শুভাগমন দিবস যখন সমাগত হয়, তখন আমাদের এ উপলক্ষে অনুভূত খুশি ও সুখ যেন অন্যান্য সকল আনন্দ-ফুর্তিকে ছাপিয়ে যায়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত দিবস উদযাপনের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় সমাবেশ ও জশনে জুলূসের আয়োজন করতে প্রত্যেকেরই অর্থব্যয় হয়, এটা স্পষ্ট। কেউ কেউ এতে আপত্তি করেন এই বলে যে, এতে কোনো ফায়দা/উপকার নেই; এ অর্থ গরিব ও দুঃস্থদের দান করলে ভালো হতো নয় কি? কিম্বা কোনো মসজিদ বা মাদ্রাসায়? আমরা এই নেতিবাচক মনোভাবের জবাব দিতে চাই এই বলে, উপরোক্ত খাতগুলোতে সেগুলোর নিজস্ব গুরুত্বানুসারে অর্থব্যয় করা একদম সঠিক; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা উম্মতের সামাজিক সুখ-শান্তির প্রতি অধিকতর অগ্রাধিকার দিয়ে এ নেতিবাচক মনোভাবকে নাকচ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁরই খাতিরে দান-সদকাহ করতে আমাদের নিষেধ করেননি বটে, তবে স্রেফ কিছু দান-সদকাহ'র খাতে এ অর্থব্যয় করা উচিত বলে কারোরই পিছটান দেয়া উচিত নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা এই ধারণাকে রদ করেছেন এই বলে, “মুসলমানদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত।” অতঃপর এ কথাকে আরো স্পষ্টভাবে বুঝাতে গিয়ে বলেছেন, ‘তা তাদের সমস্ত (সম্পত্তি) ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়’। অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত উপলক্ষে অর্থব্যয় করা অন্যান্য উদ্দেশ্যে অর্থ সঞ্চয়ের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর।

৪.৫.৭ এই আয়াতে পাকে অনেক তাগিদমূলক শব্দের প্রয়োগ

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের আদেশসম্বলিত আয়াতটিতে প্রাপ্ত তাগিদের সংখ্যা প্রসঙ্গে বলতে হয়, খুব কম সংখ্যক আয়াতে করীমা-ই ওরকম তাগিদের সংখ্যা নিয়ে নাযেল হয়েছে। আলোচ্য এই আয়াতটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে লক্ষ্য করলে আমরা তাতে দশটি তাগিদ দেখতে পাবো:

(১) কুল: ‘বলুন’ শব্দটি দিয়ে আয়াতটির সূচনা করে তাগিদ দেয়া হয়েছে; এটা শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণের একটি মাধ্যম।

(২) বি-ফাদলিল্লাহ (মানে ‘আল্লাহরই অনুগ্রহ’): প্রশ্ন ওঠে যে এই অনুগ্রহটি কী? মস্তিষ্কে এ চিন্তার উদ্বেক করে শ্রোতা উত্তর প্রত্যাশা করেন। এটা তাগিদ সৃষ্টির আরেকটি মাধ্যম।

(৩) ওয়া বি-রাহমাতিহী (‘এবং তাঁরই করুণা’): এটা তৃতীয় তাগিদ যা দ্বারা করুণাটি কী মর্মে শ্রোতার মনে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে।

(৪) ‘ফযল’ তথা অনুগ্রহের পরে ‘রাহমা’ (করুণা) শব্দটির উল্লেখ-ও একটি তাগিদ।

(৫) ‘ফা’ (অতঃপর) শব্দটির হেকমত: ‘বি-যালিকা’ (সেটার জন্যে) কথার আগে (‘ফা’) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যা আরবী ব্যাকরণগত তাগিদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

(৬) ‘বি-যালিকা’ (সেটার জন্যে): ‘অনুগ্রহ’ ও ‘করুণা’ শব্দগুলোর পরে দূর নির্দেশাত্মক সর্বনামটির ব্যবহারও তাগিদের খাতিরেই করা হয়েছে।

(৭) ‘ফা’ল-এয়াফরাহূ’ বাক্যে ‘ফা’ শব্দটি (অতঃপর মুসলমানদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত) যুক্ত হয়েছে তাগিদের জন্যে।

(৮) ‘ফা’ল-এয়াফরাহূ’ (অতঃপর মুসলমানদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত) বাক্যে ‘লাম’ অক্ষরটিও তাগিদের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে।

(৯) ‘হয়া খায়র’ (অপেক্ষা শ্রেয়): এই সর্বনাম-ও তাগিদেরই জন্যে।

(১০) ‘মিস্মা এয়াজমা’উন’ (তাদের সঞ্চিত ধনসম্পদ হতে): এটাও তাগিদ দেয়ার জন্যে প্রয়োগকৃত।

উপরের এ আয়াতে করীমায় আল্লাহ তা’আলা দশটি তাগিদ প্রদান করেছেন, যা দ্বারা তিনি তাঁর ‘ফযল’ (অনুগ্রহ) ও ‘রাহমা’ (করুণা)-প্রাপ্তির প্রতি আমাদেরকে খুশি প্রকাশ করতে আদেশ করেছেন। সাধারণত কোনো ভাষণে বা বক্তব্যে এতোগুলো তাগিদ ব্যবহার করাটা ওই সাধারণ বক্তব্যের প্রতিনিধিত্ব করে না। কিন্তু যেহেতু খোদায়ী এই আদেশটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্কিত, সেহেতু এর শোভা আরো বর্ধনের উদ্দেশ্যে এতোগুলো তাগিদ প্রদান করা হয়েছে, যাতে করে কোনো অস্বীকৃতির সম্ভাবনা না থাকে। এতোগুলো তাগিদের পরে বক্তব্যের শেষে এই খুশি প্রকাশকে মুসলমানদের সঞ্চিত ধনসম্পদের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর বলাতে এর তাৎপর্য যে কতোটুকু, সে সম্পর্কে স্পষ্ট বুঝা যায়।

এসব তাগিদের পুনরাবৃত্তির দ্বারা কী প্রভাব সৃষ্টি করা হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর বোধগম্য হবে একটি উদাহরণে: কোনো পিতা তাঁর সন্তানকে কোনো কাজ করার আদেশ দিতে চাইলে তিনি শুধু বলেন, ‘অমুক কাজটি করো।’ সন্তান বুদ্ধিমান হলে এই আদেশ-ই যথেষ্ট হবে। কিন্তু এমন পিতা পাওয়া অসাধারণ/অস্বাভাবিক নয় যিনি তাঁর সন্তানকে বলেন, ‘বৎস, আমি তোমাকে অমুক কাজটি করতে বলছি।’ ওই সন্তান যখন এ কথা শোনে, তখন-ই সে বুঝতে পারে যে তার বাবা তাকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করতে আদেশ করেছেন; এটা এই আদেশে নিহিত অতিরিক্ত তাগিদের কারণেই হয়েছে। উপরন্তু, কখনো কখনো পিতা তাঁর আদেশকে আরো বেশি তাগিদপূর্ণ করতে পারেন এ কথা বলে, ‘বৎস, শোনো। আমি সুনির্দিষ্টভাবে তোমাকে জরুরিভিত্তিতে অমুক কাজটি করার জন্যে আদেশ করছি।’ এই আদেশটিতে অনেকগুলো তাগিদ থাকায় বুঝা যায়, সন্তানটির পক্ষে তার পিতার আদেশ না মেনে গত্যস্তর নেই।

প্রথম আদেশটিতে ওই সন্তানের জন্যে তার পিতার আদেশ অমান্য করাটা অশ্রদ্ধাশীলতার পরিচায়ক হবে; কিন্তু যখন তার পিতা নিজের আদেশে অতিরিক্ত তাগিদ যোগ করেন, তখন তিনি যেন বলেন, ‘আমি চাই তুমি

শুধু অমুক কাজটি-ই করো।’ সন্তান এটা জেনেও তার বাবাকে অমান্য করলে সে সত্যি বড় এক হতভাগা বটে। আমাদের এই উদাহরণ পেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করা। নচেৎ বিশ্বজগতের মহান প্রভু ও রক্ষাকর্তার সাথে কোনো পিতার তুলনা কীভাবে চলতে পারে? (মানে চলতে পারে না)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা’আলা তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আদেশ করেন: “হে মাহবুব! আমার পক্ষ থেকে তাদের বলুন, আল্লাহর সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তারা যে ‘ফযল’ ও ‘রাহমা’ লাভ করেছে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে জোর তাগিদসহ তা উদযাপিত হওয়া উচিত।” মীলাদুল্লবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুশি উদযাপনে আল্লাহ তা’আলা একমাত্র যে মানদণ্ড স্থাপন করেছেন, তা হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহরই বান্দা ও রাসূল হিসেবে স্বীকার করা; এই নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন না করে কেউ যতোই খুশি প্রকাশ ও উদযাপন করুন না কেন, তা কখনোই যথেষ্ট হবে না। আর তা হবেই বা কীভাবে, যখন আল্লাহ তা’আলা নিজেই এর উদযাপনের কোনো সীমারেখা বেঁধে দেননি?

মহান আল্লাহ তা’আলা তাঁর আজ্ঞাতে এ ইঙ্গিত করেছেন যে (মীলাদুল্লবীতে) খুশি প্রকাশের দ্বারা অর্জিত পুরস্কারের পরিমাণ অনুমানেরও অতীত। আর পরকালীন জীবনের জন্যে যা-ই প্রস্তুতি নেয়া হোক না কেন, তা আল্লাহর দৃষ্টিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমন উপলক্ষে খুশি উদযাপনে অর্জিত পুরস্কারের মতো নয়। আল্লাহ তা’আলা এরশাদ ফরমান,

هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

—তা (সমস্ত ধন-সম্পদ) থেকে উৎকৃষ্টতর যা তারা জমা করে রাখে।^{২২২}

এটা স্পষ্ট যে এই (খোদায়ী) অনুগ্রহ ও করুণার আবির্ভাবে কেউ নিজের খুশির অনুভূতি প্রকাশ না করলে তার এবাদত-বন্দেগী ও ধর্মীয় সাধনা-ই আল্লাহ তা’আলার কাছে গণ্য হবে না; প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের বেলাদত উপলক্ষে খুশি হওয়াটা (যা ঈমানদারির চিহ্ন/লক্ষণ বটে) অধিকতর বিবেচ্য হবে। নিশ্চয় ওইসব আমল পালন করা বাধ্যতামূলক, কিন্তু ওর সাথে সাথে আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরনীতলে শুভাগমনের ব্যাপারে খুশি থাকাও একান্ত আবশ্যিক হবে।

৪.৫.৮ “তা তাদের সমস্ত (সঞ্চিত) ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়” মর্মে আয়াতটির তাফসীর (ব্যাখ্যা)

এই আয়াতটির সাধারণ অর্থ হলো, আল্লাহ তা‘আলার ‘ফয়ল’ (অনুগ্রহ) ও ‘রাহমা’ (করুণা)-প্রাপ্তিতে খুশি হওয়াটা আমাদের যাবতীয় সঞ্চয় হতে শ্রেয়তর। এখানে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, কী কী জিনিস সঞ্চয় করা যায়? নিম্নোল্লিখিত দুটি বস্তু সঞ্চয় করা সম্ভব:

১. পার্থিব জীবনের সাথে সম্পর্কিত অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় ও বিভিন্ন উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব; এবং

২. পারলৌকিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত নেক আমল তথা পুণ্যদায়ক কর্মের অনুশীলন, যেমন নামায-রোযা, দান-সদকাহ ও হজ্জ।

তবে কুরআন মজীদ এ দুটোর কোনোটাকেই নির্দিষ্ট করেনি, কেননা (আয়াতে ব্যবহৃত) আরবী ‘মা’ (যা) শব্দটি ‘আম’ তথা সার্বিক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে, যা‘তে আমাদের সঞ্চিত/সংগৃহীত যাবতীয় বস্তু-ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; অর্থাৎ, এটা পার্থিব ও পরলৌকিক উভয় জীবনের বেলাতেই প্রযোজ্য।

এই দুটো বিষয়কে মাথায় রেখে উপরের আয়াতটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এভাবে: ওহে মানবকুল! তোমরা জমি-জিরাত ও বাড়িঘর কিনে এ দুনিয়ার ধনসম্পদ আহরণ করলে কিংবা সোনা-রূপা জমিয়ে থাকলে সেটা আমার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরনীতলে শুভাগমনের প্রতি তোমাদেরই ব্যক্ত খুশির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর নয়। আর যদি তোমরা পরলৌকিক জীবনে সাফল্য লাভের জন্যে নফল এবাদত-বন্দেগী ও রোযা পালনের মাধ্যমে সাধনা করো এ উদ্দেশ্যে যে তোমাদের নেকীর পাল্লা

ভারী হবে, তাহলে এমন কি সেটাও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ তথা ধরাধামে শুভাগমন উদযাপনের মাধ্যমে তোমাদের প্রদর্শিত কৃতজ্ঞতার চেয়ে শ্রেয়তর নয়; কেননা তোমরা তাঁর বেলাদত উপলক্ষে খুশি প্রকাশ না করলে তোমরা তোমাদের (যাবতীয়) নেক আমলের প্রতি সেগুলোর প্রাপ্য হক্ক/অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে না; এটা এ কারণে যে তাঁর ধরাধামে শুভাগমনের দরুনই প্রথমতঃ তোমরা ওই নেক আমলগুলো পেয়েছো। কুরআন মজীদ ও প্রতিটি পুণ্যকর্ম, হোক তা নামায-রোযা ও দান-সদকাহ, কিংবা তোমাদের ইসলাম ধর্ম ও ঈমানদারি, সবই তাঁর পবিত্র সত্তার বদৌলতে এসেছে।

হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে এই তাবৎ বিষয়াদি যিনি মঞ্জুর করেছেন, তিনি স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা; কিন্তু এসব প্রাপ্তির অসীলা তাঁরই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতএব, যাঁর মাধ্যমে এসব আশীর্বাদ আমাদের প্রতি মঞ্জুর হয়েছে, সেই মহান সত্তার প্রতি খুশি প্রকাশ করা আল্লাহ তা‘আলারই প্রতি শুকরিয়া আদায় করা ছাড়া কিছু নয়; আর এই (পুণ্যদায়ক) কাজটি অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশি বেশি পালন করা উচিত।

৪.৬ খোদায়ী মহা অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের নিদর্শন-ই মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদযাপন

বিশ্বজগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতির প্রতি অসীম ও অব্যবহিত ঐশী দান ও আশীর্বাদ মঞ্জুর করেছেন। তিনি আমাদেরকে খাদ্য, পানীয়, সৌন্দর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা আশীর্বাদধন্য করেছেন। রাত ও দিনের নিয়ম-ও তিনি আমাদের জন্যে জারি করেছেন। আমাদের আশপাশের দুনিয়াকে আমাদেরই কল্যাণে শাসন করার অনুমতি তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন। তাঁর করুণা ও ক্ষমাশীলতা, এ গুণগুলোর কারণে তিনি মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীবের মর্যাদা দান করেছেন; আর তিনি মানুষকে সর্বসেরা উপাদান ও আকৃতিতে গড়েছেন। তিনি আমাদেরকে পরিবার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক-ও মঞ্জুর করেছেন। আমরা অবগত নই এমন নেয়ামত/আশীর্বাদ-ও বিদ্যমান; অথচ এতোসব সত্ত্বেও তিনি আমাদের প্রতি রহমত-বরকত বর্ষণের বিষয়ে কোনো রকম

বড়াই করেননি। এটা এ কারণে যে, তিনি হলেন সবচেয়ে উদার; আর কেউ তাঁর প্রতি ঈমান আনুক বা না-ই আনুক, তথাপিও তিনি আমাদের প্রতি তাঁর রহমত-বরকত-নেয়ামত-আশীর্বাদ বর্ষণ করে চলেছেন। তিনি তা আমাদের প্রতি অবিরত দয়া করছেন, কিন্তু সে ব্যাপারে দম্ব করছেন না। তবে মানবজাতির জন্যে আল্লাহ তা‘আলার এমন একটি আশীর্বাদ রয়েছে, তাঁর নেয়ামতগুলোর মধ্যে যেটা সম্পর্কে তিনি শুধু উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি, বরঞ্চ তা স্মরণ-ও করেছেন এবং (আরবী) ‘লা’ম’ ও ‘ক্বাদ’ তাগিদসূচক শব্দ দুটো ব্যবহারের দ্বারা তাতে জোরও দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ ফরমান:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ.

—নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুসলমানদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্য থেকে (মহিমার অধিকারী) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামকে) প্রেরণ করেছেন।^{২২৩}

এই আয়াতে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে আল্লাহ তা‘আলা (যেন) বলছেন, “ওহে মানবকুল! এটা তোমাদের প্রতি আমার সেরা আশীর্বাদ যে আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টিকে তোমাদেরই মধ্য হতে আবির্ভূত (বেলাদত) করেছি। তাঁরই মাধ্যমে তোমাদের ভাগ্য ফিরেছে, পথভ্রষ্টতার অন্ধকার হতে তোমরা হেদায়াতের আলোতে এসে সম্মানিত হয়েছো। অতএব, তোমাদের জন্যে উচিত যে এর থেকে বড় নেয়ামত আর কখনোই হয়নি। আমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাঁর ওয়াস্তে (অথবা খাতিরে) সমগ্র সৃষ্টিজগৎ অস্তিত্বশীল হয়েছে, আমি যখন তাঁকে তোমাদের মাঝে প্রেরণ করেছি, তখন বিশ্বজগতের প্রভু হিসেবে তোমাদের প্রতি আমার এ আশীর্বাদকে স্মরণ করিয়ে দেয়াটা গুরুত্বপূর্ণ; যাতে তোমরা অকৃতজ্ঞ হয়ে আবার না ভাবো, এটা বুঝি অন্য যে-কোনো ঐশী দানের মতোই আরেকটি নেয়ামত।”

এই আশীর্বাদকে স্মরণ করে উম্মতের স্বার্থের প্রতি খেয়াল রাখা হয়েছে। আল্-কুরআন প্রত্যেক একত্ববাদীর কাছে এ কথা স্পষ্ট করেছে যে আল্লাহ

তা‘আলার সর্বসেরা রহমতের ব্যাপারে তাদের নীরব থাকা উচিত নয়; বরঞ্চ উদযাপনের মাধ্যমে খুশি ও সুখানুভূতি প্রকাশ করে এই আশীর্বাদের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত।

৪.৭ ঐশী করুণা ও আশীর্বাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কেন জরুরি?

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা যে নেয়ামত/আশীর্বাদ বর্ষণ করেন, তার প্রতি কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা গোলামি বা খেদমতগারির একটি চিহ্ন। কুরআন মজীদে খোদায়ী রহমত-বরকতপ্রাপ্তির প্রতি শুকরিয়া আদায়ের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত আরেকটি হেকমত তথা সূক্ষ্ম জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ ফরমান:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

—যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করো তবে আমি অবশ্যই তোমাদের উপর (অনুগ্রহ) বর্ধিত করবো আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠিন।^{২২৪}

উপরে উল্লেখিত আয়াতে করীমা অনুযায়ী, খোদায়ী কোনো আশীর্বাদপ্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আরো অধিক নেয়ামত লাভের মাধ্যমবিশেষ। অর্থাৎ, বান্দা শোকরগুজার তথা কৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তা‘আলা আরো আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। তবে অকৃতজ্ঞতা এমনই ঘণিত কর্ম যে, আল্লাহ তা‘আলা এর দায়ে দুষ্ট অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে চরম শাস্তি দেবেন বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। এই কারণেই অন্যান্য ঐশী দানের যোগ্য হওয়ার খাতিরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমনে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রত্যেকের জন্যে একান্তভাবে জরুরি।

৪.৮ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিভিন্ন প্রচলিত পদ্ধতি

এই পরিচ্ছেদ শেষ করার আগে আমরা আল-কুরআনের আলোকে আল্লাহ তা‘আলার নেয়ামত/আশীর্বাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিভিন্ন পদ্ধতি বা পস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের এ আশীর্বাদ লাভের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নিম্নবর্ণিত যে-কোনো উপায়ে করা সম্ভব:

৪.৮.১ খোদায়ী নেয়ামতের স্মরণ ও উল্লেখ (যিকর-তায়কেরা)

কুরআন মজীদে বর্ণিত আল্লাহ তা‘আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি পদ্ধতি হচ্ছে তাঁরই নেয়ামতের স্মরণ। সূরা বাকারায় এরশাদ হয়েছে:

يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ.

—হে (বনী ইসরাঈল!) ইয়াকুবের সন্তানরা! স্মরণ করো আমার অনুগ্রহের কথা, যা আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছিলাম।^{২২৫}

সূরা আলে এমরা’নে আল্লাহ তা‘আলা মনুষ্যকুলকে সম্বোধন করে বলেন:

وَإِذْكُرُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا.

—আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা (পরস্পরে) ছিলে শত্রু তখন তিনি তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার বন্ধন সৃষ্টি করে দিলেন। আর তোমরা সে অনুগ্রহের কারণে পরস্পরে ভাই হলে।^{২২৬}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদত/মীলাদ (ধরণীতলে আবির্ভাব), তাঁর সৌন্দর্য ও হায়াতে তাইয়েবা, গুণাবলী ও মো’জেযা (অলৌকিকত্ব) এবং তাঁরই অনুপম বৈশিষ্ট্যাবলীকে স্মরণ করা

২২৫. আল কুরআন: সূরা বাকার, ২:৪৭।

২২৬. আল কুরআন: সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৩।

আল্লাহ তা‘আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি অন্যতম মাধ্যম। এই মহিমাম্বিত আশীর্বাদকে স্মরণ করে আমরা কেবল নিজেদেরকেই লাভবান করছি; কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিকর-তায়কেরা সর্বদা-ই আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক পালিত হচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্তে পালিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিকর/ স্মরণকে অনুরূপ স্মরণে অতিক্রান্ত পূর্ববর্তী মুহূর্তের চেয়ে অধিকতর মর্যাদা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ ফরমান:

وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ

—আর আপনার জন্যে তো (প্রতিটি) পরবর্তী মুহূর্ত পূর্ববর্তীর চেয়ে উত্তম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব এবং উচ্চ মর্যাদার কারণ)।^{২২৭}

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.

—আর আমরা আপনার স্মরণকে (আমার সাথে সংযুক্ত করে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বত্র) সমুচ্চ করেছি।^{২২৮}

এ থেকে আমরা দেখতে পাই যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিকর-তায়কেরা (স্মরণ) দ্বারা আমরাই লাভবান হচ্ছি, অন্য কারো লাভের জন্যে এটা নয়। তাঁর বেলাদত শরীফ উপলক্ষে আল্লাহ তা‘আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের পরকালীন জীবনের উন্নতিরই একটি অসীলা বা মাধ্যম। ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব (১২৭২-১৩৪০ হিজরী) কী সুন্দর বলেছেন তাঁর কবিতায়:

ورفعنا لك ذكرك كما هي سايه تجرير ♦ بول بالاسه ترا ذكره اونچا تيرا

—‘ওয়া রাফা’না লাকা যিকরাক’-এর ছায়ায় আপনি আচ্ছাদিত,

কেননা, আপনারই (পবিত্র) বাণী ও স্মরণকে করা হয়েছে উন্নীত।^{২২৯}

২২৭. আল কুরআন: সূরা ছোয়াহা, ৯৩:৪।

২২৮. আল কুরআন: সূরা ইনশিরাহ, ৯৪:৪।

২২৯. ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রচিত ‘হাদা’য়েকু বখশিশ’, ১:১৮।

৪.৮.২ এবাদত ও বন্দেগী

আল্লাহ তা‘আলার এবাদত ও বন্দেগী/গোলামি করাও (তাঁর প্রতি) কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি মাধ্যম। এ রকম কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সেরা মাধ্যমগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো, নামায, রোযা, হজ্জ ও (গরিবের) প্রাপ্য যাকাত।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পছন্দ হিসেবে গরিব-দুস্থকে দান-সদকাহ করা এবং এতিম ও অভাবীদের দেখ-ভাল করাও প্রশংসনীয় আমল হিসেবে পরিগণিত।

৪.৮.৩ প্রাপ্ত আশীর্বাদের ঘোষণা প্রদান

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আরেকটি পছন্দ হলো আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক আমাদের প্রতি বর্ষিত আশীর্বাদের ব্যাপারে খুশি প্রকাশ করে তার বেশি বেশি উল্লেখ করা এবং অন্যদেরকেও তা জানানো। কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

—আর আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহের আলোচনা করুন (উত্তমরূপে)।^{২৩০}

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় আল্লাহ তা‘আলার নেয়ামত স্মরণ করার পক্ষে একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল; অর্থাৎ, নেয়ামত অন্তরে স্মরণ করতে হবে এবং জিহ্বা দ্বারা ঘোষণা/উল্লেখ করতে হবে। তবে এই স্মরণটি অন্য কারো জন্যে ছিল না, বরং স্রেফ আল্লাহ তা‘আলার জন্যে ছিল। কিন্তু উপরোক্ত আয়াতে করীমায় নেয়ামতটি ঘোষণা করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যার মানে তা অন্যদেরও জানানো উচিত। অতএব, এই দুইয়ের (স্মরণ ও আশীর্বাদের ঘোষণার) মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য হলো এই যে, পূর্ববর্তীটি স্রেফ আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত, অপরদিকে পরবর্তীটি সৃষ্টিকুলের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ ফরমান:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ.

—সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদেরকে স্মরণে রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করো, আর কখনো আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না।^{২৩১}

এখানে স্মরণ করার সহজ মানে হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলাকে স্মরণ করা উচিত; অপরদিকে স্বীকার/ঘোষণা করার মানে কিন্তু স্রেফ স্মরণ নয়, বরং তা এমনভাবে প্রকাশ করা যাতে সৃষ্টিকুল-ও এ সম্পর্কে সচেতন হয়; আর এই ঐশী আজ্ঞার আওতায় যাতে যতো সম্ভব বেশি সংখ্যক মানুষকে আনা যায়।

‘নেয়ামতের ঘোষণা’ প্রদানের সবচেয়ে বড় হেকমত তথা ঐশী জ্ঞান-প্রজ্ঞা হলো, অন্যরাও যাতে এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে পূর্ববর্তীটির সাথে পরবর্তীটির আরেকটি পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তীটি একাকী পালন করা যায়; পক্ষান্তরে পরবর্তীটির জন্যে ধর্মীয় সভা-সমাবেশের প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ এই প্রকাশ্য নেয়ামতের শোকরগুজারি (তথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করার জন্যে বড় বড় সভা-সমাবেশের আয়োজন করা উচিত, যাতে যতো বেশি সম্ভব মানুষকে এর সাথে সম্পৃক্ত করা যায়।

৪.৮.৩.১ এই আশীর্বাদের ঘোষণা আমরা কীভাবে দেবো?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনের মতো এমন মহা আশীর্বাদপ্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁর উম্মতের দ্বারা তা ঘোষণা করার দায়িত্ব পালন একটি লক্ষণীয় বিষয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর গুণাবলী ও মহৎ চরিত্র, তাঁর শুভাগমন, সৌন্দর্য ও সদাচারের প্রশংসাসূচক কবিতা আবৃত্তি এবং তাঁর প্রতি সালাত-সালাম পাঠের মাধ্যমেই এটা করা হয়ে থাকে। আর এগুলোর সবই وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

رَبِّكَ فَحَدِّثْ - ‘এবং আপন রবের নেয়ামতের খুব চর্চা করুন’-
আয়াতটির তাফসীরের আওতায় পড়ে; উপরন্তু, এই নেয়ামত/আশীর্বাদকে
স্মরণ করার আরো অনেক পন্থা বিদ্যমান। কেউ যদি একটু চিন্তা করতেন,
তাহলে উপলব্ধি করতে পারতেন যে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের সমস্ত সভা-সমাবেশ/মাহফিল-ই সাধারণভাবে এরকম
(যিকর তথা স্মরণের) বিষয়, আর এসব মাহফিলে এগুলো (বিশেষ)
তাৎপর্য বহন করে।

মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
মীলাদ শরীফ আমরা কীভাবে পালন করবো? তাঁর যিকর-তায়কেরা’র
সীমারেখা-ই বা কতোটুকু? তাঁর প্রশংসা ও গুণের বন্দনা আমাদের কীভাবে
করা উচিত? এসব প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাঁরই শানে
রচিত ইমাম শরফউদ্দীন বুসারী (৬০৮-৬৯৬ হিজরী)-এর কাব্যে:

دَعَا مَا أَدْعُهُ النَّاصِرِي فِي نَبِيِّهِمْ وَأَحْكَمُ بِمَا شِئْتُ مَدْحًا فِيهِ
فَأَنْتَ إِلَيَّ ذَاتِهِ مَا شِئْتُ مِنْ وَأَنْسَبُ إِلَيَّ قَدْرِهِ مَا شِئْتُ مِنْ عَظَمِهِ
فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُغْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِقَمِ

-খৃষ্টানবর্গ তাদের পয়গম্বর সম্পর্কে যে (খোদায়ী) দাবি করেছে, তা
ছাড়া,

অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে যেমনে চাও,
উত্তম পন্থায় প্রশংসা করো।

তাঁর সভা মোবারকের প্রতি যে সম্মান ও মাহাত্ম্য দিতে চাও, কোরো
তেমনে বন্দনা।

কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব সীমাহীন, কারো
মুখে করা সম্ভব নয় তা বর্ণনা।

উপরের এই কবিতার ভিত্তিতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
শানে যতো কবিতা আবৃত্তি করা হয়, সবগুলোই প্রশংসনীয় বলে সাব্যস্ত
হবে - যতোক্ষণ তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা’আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখবে। (অর্থাৎ, আল্লাহ
তা’আলা স্রষ্টা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন তাঁরই
সৃষ্ট বান্দা, এটা ঈমানের একটা শর্ত)।

৪.৮.৪ ঈদ-উৎসব হিসেবে পালন

খোদা তা’আলার আশীর্বাদকে স্মরণ ও উল্লেখ করার পাশাপাশি তাঁর প্রতি
আপন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তা প্রদর্শনের আরেকটি মাধ্যম হলো ঈদ
উদযাপন করে খুশি প্রকাশ। পূর্ববর্তী জাতিগুলোও এভাবে নিজেদের
কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল (ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে)। আর এটা
পয়গম্বর আলাইহিমুস সালাম-বৃন্দেরও আচরিত প্রথা, যাঁরা এরকম বিশেষ
আশীর্বাদ অবতীর্ণ হওয়ার দিনগুলোকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করতেন।
পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস সালাম সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা’আলার কাছে
আরয় করেন:

رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا.

-হে আল্লাহ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে আসমান থেকে
(নিয়ামতের) দস্তরখানা অবতীর্ণ করো, যা (অবতীর্ণ হওয়ার দিন)
আমাদের জন্যে হবে ঈদ-উৎসব, আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্যে(ও) এবং
আমাদের পরবর্তীদের জন্যে(ও); আর (এ দস্তরখানা) হবে তোমার পক্ষ
থেকে নিদর্শন, এবং আমাদেরকে রিযিক দান করো, আর তুমিই সবচেয়ে
উত্তম রিযিকদাতা।^{২৩৩}

এখানে স্মর্তব্য যে, খাদ্য-খাঞ্চর মতো এরকম একটি সময়গত বা
সময়সীমায় আবদ্ধ আশীর্বাদপ্রাপ্তি সত্ত্বেও পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস সালাম
এটাকে ঈদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আরো কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার

হচ্ছে এই যে, খৃষ্টান সমাজ অদ্যাবধি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই আশীর্বাদপ্রাপ্তির দিবস রোববারকে সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন।

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি সকল সৃষ্টির সেরা, তাঁকে রাসূল হিসেবে জগতে প্রেরণের সাথে একটি খাদ্য-খাঞ্চগপ্রাপ্তি কীভাবে তুলনীয় হতে পারে? খাদ্য-খাঞ্চগ ছিল একটি ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত, আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমন একটি চিরস্থায়ী নেয়ামত/আশীর্বাদ। রহমতুললিল্ আলামীন তথা বিশ্বজগতের জন্যে খোদার করুণা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন চিরকালের জন্যে এক আশীর্বাদ; তা ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অতএব, এ দুই আশীর্বাদের মধ্যে তুলনা কীভাবে চলতে পারে? একটু জিরিয়ে নিচের প্রশ্নটি নিজেদের প্রতি পেশ করলে তা আমাদের চিন্তার খোরাক হবে: আমরা কি এই নেয়ামতের প্রতি এর প্রাপ্য কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে পেরেছি?

মূল বিবেচ্য বিষয় হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদপূর্ণ বেলাদত তথা ধরনীতলে শুভাগমনের সাথে খাদ্য-খাঞ্চগর তুলনা না করা। আমাদের মনোযোগ পাওয়ার যোগ্য ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে (সবার সামনে) তুলে ধরাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। খৃষ্টান জাতি ঘনঘন প্রতি রোববার তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকেন, যেহেতু এই দিনেই খাদ্য-খাঞ্চগটি তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। আল-কুরআনে উল্লেখিত খাদ্য-খাঞ্চগর মতো নানা নেয়ামত লাভ করে পূর্ববর্তী জাতিগুলো আল্লাহ তা‘আলার রেযামন্দি তথা সন্তুষ্টি অনুযায়ী এবং তাদের পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দের আচরিত সুন্নাহ তথা রীতির সাথে সঙ্গতি রেখে খুশি উদযাপন করতো। সুতরাং আশিয়া আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দ যদি কোনো সামগ্রিক আশীর্বাদপ্রাপ্তির দিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈদ উদযাপন হিসেবে গ্রহণ করার মধ্যে কী-ই বা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ধরায় শুভাগমন এমনই এক মহা আশীর্বাদ, যার সূত্রে আমরা অন্যান্য সব আশীর্বাদ লাভ করেছি। এমতাবস্থায় আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতে আমরা কেন খুশি প্রকাশ করতে পারবো না?

এই অধ্যায়ে প্রদত্ত বিস্তারিত বর্ণনা দ্বারা এ কথা নিজে থেকেই স্পষ্ট যে, মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদযাপন আল-কুরআন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত (সাবেত)। এর প্রতি কোনো রকম আপত্তি উত্থাপন কুরআনী শিক্ষায় নিজের অজ্ঞতাই প্রকাশ করবে। এই বিষয়ের বৈধতার ব্যাপারে মতভেদ না করে এবং একে বিতর্কের বিষয় না বানিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত শরীফের প্রতি স্রেফ খুশি প্রকাশ করা এবং এরই ফলশ্রুতিতে আল্লাহর নেয়ামতের ভাগিদার হওয়া প্রত্যেকের জন্যে বিহিত কর্তব্য-কর্ম।

পঞ্চম অধ্যায়

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর্থনে হাদীসের দলিল

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আল্-কুরআন ও এর তাফসীরের আলোকে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ও উদযাপন সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে এর অনুমতি/বৈধতা হাদীস দ্বারা প্রমাণ করা হবে: সবচেয়ে সদয় ও করুণাশীল পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদপূর্ণ বেলাদত তথা ধরণীতলে শুভাগমনের প্রতি আনন্দ-উৎসব প্রকাশ করার শরঈ বৈধতার একটি বিশ্লেষণ এতে উপস্থাপন করা হবে।

৫.১ ‘ইয়াওমে আশুরা’ (মহররমের ১০ তারিখ) পালনের দলিল

সবচেয়ে সম্মানিত পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহ তা‘আলার ফযল (অনুগ্রহ) ও রাহমা (করুণা); মানবজাতির প্রতি তিনি-ই আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াশীলতার নিদর্শন। তাই সেরা এই আশীর্বাদের জন্যে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এ উম্মতের জন্যে এক বাধ্যবাধকতা বটে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক তাদেরকেই ভালোবাসেন, যারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ, আর পালিত এ রীতিটি পয়গম্বর আলাইহিমুস সালামবন্দের সুন্নাহ-ও।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বহু পন্থা রয়েছে: ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেউ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারেন নফল এবাদত-বন্দেগী ও দান-সদকাহ করে; কিন্তু সম্প্রদায়গত পর্যায়ে, যেখানে (আল্লাহর) কোনো নেয়ামত একটি জাতির প্রতি বর্ষিত হয়েছে, সেখানে সামষ্টিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত শরীফ ও রাসূল হিসেবে তাঁর প্রেরণ সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যেই হয়েছে, সেহেতু এই ব্যাপক আকারের আশীর্বাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সামষ্টিক পর্যায়ে করাটা একান্ত জরুরি। আর সম্প্রদায়গত প্রকৃতির যে-কোনো কাজ, সেই সমাজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই হবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ দিবস সংস্কৃতিগত ভিত্তিতে উদযাপন করা হয়, ঈদ উৎসবের মতোই। এই শুভক্ষণ পালন পূর্ববর্তী জাতিগুলোর আচরিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আমলের উপর দৃঢ়ভাবে

প্রতিষ্ঠিত এবং তা প্রমাণিতও। নিম্নে ‘ইয়াওমে আশূরা’-সম্পর্কিত হাদীসগুলো বর্ণনা করা হলো, যেগুলো মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের বৈধতা বা অনুমতি প্রমাণের পক্ষে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৫.১.১ হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের দিবসটি উদযাপন

‘ইয়াওমে আশূরা’ (আশূরা দিবস) হচ্ছে সেই দিনটি, যেদিন ফেরাউনের বিরুদ্ধে পয়গম্বর মূসা আলাইহিস্ সালামকে বিজয় দান করা হয়েছিল। এ দিনটিতেই বনু ইসরাঈল জাতিকে ফেরাউনের জুলুম-অত্যাচার ও নিপীড়ন হতে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। তাই এটা ছিল হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর বিজয় দিবস এবং বনু ইসরাঈলের মুক্তি দিবস। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই দিনে পয়গম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম রোযা রাখতেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মোনাওয়ারায় হিজরত করেন, তখন তিনি দেখতে পান সেখানকার ইহুদীরা ওই দিনটিতে রোযা পালন করছেন। তিনি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা জবাবে তাঁকে উপরে প্রদত্ত তথ্য প্রদান করেন। এ কথা শুনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, “তোমাদের চেয়ে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের উপর আমার (পয়গম্বর হিসেবে) আরো বড় হক্ক রয়েছে।” এরই ফলশ্রুতিতে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের প্রতি বর্ষিত আল্লাহ তা‘আলার নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিদর্শনস্বরূপ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই দিন রোযা রাখেন এবং তাঁর সকল মহান সাহাবা-এ কেলাম রাহিয়াল্লাহু আনহুমকেও রোযা রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। ‘ইয়াওমে আশূরা’র রোযার পক্ষে নিচে কিছু হাদীস পেশ করা হলো:

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাহিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায়ে এলে দেখতে পান ইহুদীরা রোযা পালন করছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, “এটা কী?” তাঁরা জবাব দেন, “এটা আশীর্বাদদায়ক এক দিবস; এমনই এক দিন, যখন আল্লাহ তা‘আলা বনু ইসরাঈল জাতিকে তাঁদের শত্রু হতে রক্ষা করেন। এই দিনটিতে তাই পয়গম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম রোযা রেখেছিলেন। (এতদশ্রবণে) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের চেয়ে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর উপর আমার (পয়গম্বর হিসেবে) আরো বড় হক্ক/অধিকার রয়েছে। অতঃপর তিনি ওই দিনটিতে রোযা রাখেন, আর (সবাইকে) রোযা রাখতে নির্দেশ দেন।^{২৩৪}

২. হাদীস শরীফের আরেকটি এসনাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাহিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন:

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْفَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ ثُمَّ أَمَرَ بِصَوْمِهِ.

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায়ে গমন করলে তিনি ইহুদীদেরকে ‘ইয়াওমে আশূরা’র দিনে রোযা রাখতে দেখেন। তাঁদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তাঁরা জবাব দেন, ‘এই দিনে আল্লাহ তা‘আলা পয়গম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম ও বনু ইসরাঈলকে ফেরাউনের

২৩৪. আল-বুখারী বর্ণিত ‘সহীহ’: কিতাব আল-সওম (রোযা-বিষয়ক বই), ‘এয়াওমে আশূরার রোযা’ অধ্যায়, ২:৭০৪ #১৯০০; আহমদ ইবনে হাম্বল প্রণীত ‘মুসনাদ’ ১:২৯১ #২৬৪৪; আবু এয়ালা কৃত ‘মুসনাদ’, ৪:৪৪১ #২৫৬৭; ইবনে কাসীর রচিত ‘তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম’, ১:৯২।

উপর বিজয় দেন। তাই আমরা দিনটির সম্মানার্থে রোযা রেখে থাকি।’ এমতাবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর উপর তোমাদের চেয়ে আমাদের হক্ক আরো বেশি।’ অতঃপর তিনি এই দিনে রোযা রাখার আদেশ দান করেন।^{২৩৫}

৩. হাদীসের আরেকটি বর্ণনায় ইহুদীদের উত্তর ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ নিম্নবর্ণিতভাবে বিধৃত হয়েছে:

فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَتَنَحَّنُ نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

—ইহুদীরা উত্তর দেয়, ‘এটা মহান দিবস। এই দিনে আল্লাহ তা’আলা মূসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর জাতিকে মুক্তি দেন এবং ফেরাউন ও তার লোকদেরকে পানিতে ডুবিয়ে দেন। তাই এ দিনে পয়গম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রোযা রাখেন, আর আমরাও তা পালন করি।’ এমতাবস্থায় (খোদায়ী) আশীর্বাদধন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘পয়গম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি আমাদের হক্ক (অধিকার) তোমাদের চেয়ে বেশি।’ অতঃপর তিনি ওই দিন রোযা রাখেন এবং রোযা রাখতে আদেশ করেন।^{২৩৬}

২৩৫. আল-বুখারী বর্ণিত ‘সহীহ’: ‘কিতাব আল-ফাদা’ইল আল-সাহা’বা’ (সাহাবাবুদ্দের গুণাবলী সংক্রান্ত বই), ‘মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মদীনায়া আগমন উপলক্ষে ইহুদীদের দ্বারা সাক্ষাৎপ্রার্থী হওয়া’ শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১৪৩৪ #৩৭২৭; সহীহ মুসলিম: ‘কিতাব আল-সিয়া’ম’ (রোযা বিষয়ক বই), ‘আশুরা দিবসের রোযা’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:৭৯৫ #১১৩০; আবু দাউদ কৃত ‘সুনান’: ‘কিতাব আল-সওম’ (রোযা বিষয়ক বই), ‘আশুরা দিবসের রোযা’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:৩২৬ #২৪৪৪।

২৩৬. সহীহ মুসলিম: ‘কিতাব আল-সিয়া’ম’ (রোযা-সম্পর্কিত পুস্তক), ‘এয়াওমে আশুরা দিবসের রোযা’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:৭৯৬ #১১৩০; সহীহ বুখারী: ‘কিতাব আল-আম্মিয়া’ (পয়গম্বরবৃন্দ সংক্রান্ত পুস্তক), ‘আল্লাহর বাণী: মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর সংবাদ পৌঁছেছে কি?’ শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১২৪৪ #৩২১৬; ইবনে মা’জাহ কৃত আল-সুনান: ‘কিতাব আল-সিয়া’ম’ (রোযা-বিষয়ক পুস্তক), ‘এয়াওমে আশুরা’র রোযা’ শীর্ষক

উপরে উল্লেখিত হাদীসগুলো হতে বুঝা যায়, বনু ইসরাঈল জাতি ফেরাউনের অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, যার দরুন তাদের নিজেদের ধর্ম পালন করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে পয়গম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর অধ্যবসায়ে অবশেষে সেদিনের উদয় হয়, যেদিনটিতে বনু ইসরাঈল দাসত্বশৃঙ্খল হতে মুক্তি পেতে সক্ষম হন এবং যার ফলশ্রুতিতে ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই উপায়ে বনু ইসরাঈল সম্প্রদায় জুলুম-নিপীড়ন হতে মুক্তি লাভ করেন এবং আল্লাহ তা’আলা কর্তৃক বিজয় লাভের আশীর্বাদ দ্বারা ধন্য হন। ফলে পয়গম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ওই দিন রোযা রাখেন, আর ইসরাঈল বংশও রোযা রেখে দিনটিকে পালন করেন; আর অদ্যাবধিও এই দিনটি মুক্তি ও স্বাধীনতার দিবস হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পয়গম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতার সূত্রে এই দিনটিতে রোযা রেখে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, আর তিনি মুসলমানদেরকেও তা পালনের নির্দেশ দেন। ইমাম তাহাবী (২২৯-৩২১ হিজরী) বিবৃত করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরাউনের উপর হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে আধিপত্য বিস্তার করতে দেয়ার কারণে আল্লাহ তা’আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই যে রোযা রেখেছিলেন, তা (এ দলিলে) সুস্পষ্ট।^{২৩৭}

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয় যে, ইহুদী জাতিগোষ্ঠী যদি তাদের পয়গম্বরের আলাইহিস্ সালাম প্রাপ্ত বিজয় ও মুক্তির দিনটি উদযাপন করতে পারেন, তাহলে মুসলমান জাতি কেন তাঁদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরণীতলে শুভাগমন দিবসটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারবেন না? পুতঃপবিত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি আশ্বিনাকুল প্রধান, তাঁকে মানুষের মাঝে প্রেরণ করা হয় আল্লাহ তা’আলার অনুগ্রহ ও করুণা হিসেবে; তাঁরই মাধ্যমে

অধ্যায়, ১:৫৫২ #১৭৩৪; আহমদ ইবনে হাম্বল প্রণীত ‘আল-মুসনাদ’, ১:৩৩৬ #৩১১২।

২৩৭. আল-তাহাবী প্রণীত ‘শরহে মা’আনী আল-আসা’র’: ‘কিতাব আল-সওম’ (রোযা সংক্রান্ত পুস্তক), ‘আশুরা দিবসের রোযা’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:১৩২ #৩২০৯।

মানব সভ্যতা অসাম্য ও অন্যায়ের নাগপাশ হতে মুক্তি লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

—এবং তাদের থেকে তাদের (নাফরমানীর কারণে চাপিয়ে দেয়া) ভারী বোঝা ও (বন্দিত্বের) শৃঙ্খল অপসারণ করেন (এবং তাদেরকে মুক্তির নিয়ামতের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান করেন)।^{২৩৮}

সবচেয়ে দয়াবান পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমন ছিল এমন-ই এক অসীলা, যা দ্বারা মানবজাতি অমতো-অবিচার হতে মুক্তি লাভ করে। তাঁর বেলাদত ছিল এমন-ই এক শুভক্ষণ, যা'তে গোটা সৃষ্টিকূল এর উদযাপনে জড়িত হয়ে পড়ে। একজন ঈমানদারের জন্যে এটা তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুখের বিষয়; এটা উম্মতের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ-ও বটে। এই দিনটি (আমাদের) সমস্ত শ্রদ্ধা ও মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য, আর এরই বিপরীতে আমাদেরকেও কৃতজ্ঞতার মূর্তপ্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই দিনটিকে হৃদয়-জুড়ে ভালোবাসা ও ভক্তিসহকারে এর প্রাপ্য সম্মান দেয়ার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সর্ব প্রকারের অনুমতিপ্রাপ্ত পছন্দ অবলম্বন করা একান্তভাবে উচিত।

৫.১.২ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ওই দিবসটি পালন মুসা আলাইহিস্ সালামের সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতার কারণেই

উপরে উদ্ধৃত হাদীসগুলো থেকে আরেকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় এই মর্মে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আশূরা দিবস’কে স্মরণার্থে উদযাপন করেছিলেন পয়গম্বর মুসা আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে তাঁর (আত্মিক) সংশ্লিষ্টতার খাতিরে। এর থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে-কোনো (ধর্মীয়) তাৎপর্যপূর্ণ দিনকে স্মরণার্থে উদযাপন করাটা আপনাপনি-ই মনোনীত পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্যাহ (রীতিনীতি)। একজন ঈমানদারের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত দিবস (ঈদে মীলাদুন্নবী)-এর চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ দিন আর কোনটি হতে পারে? অতএব, ঈদে মীলাদুন্নবী দিবস (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপন করা সুনাতেরই আওতায় পড়ে, আর তা পালন করে মুসলমান সাধারণ মনোনীত পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকেন।

৫.১.৩ ইহুদীদের ‘ইয়াওমে আশূরা’কে ঈদ উৎসব হিসেবে পালন

কিছু কিছু মানুষের মনে এই আপত্তি দেখা দিতে পারে যে, ইহুদী জাতি তাদের স্বাধীনতা দিবস ‘ইয়াওমে আশূরা’কে রোযা রেখে স্মরণ করতেন, অথচ মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অপর দিকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করা হয়; কেননা এই দিনে কেউই তো রোযা রাখেন না।

এই আপত্তির জবাব হলো, কোনো আশীর্বাদের উপলক্ষকে খুশির দিন হিসেবে উদযাপন করা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্যাহ। যতোক্ষণ তা শরীয়তের নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থাকবে, ততোক্ষণ তা যে-কোনো উপায়ে বা পন্থায় উদযাপন করা যাবে। ইহুদী জাতির আশূরা দিবসে রোযা রাখার মানে এই নয় যে অন্যান্য সব পন্থায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বাস্তবতা এতে নাকচ হয়ে যাবে, কেননা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্রেফ রোযা পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উপরন্তু, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম রোযা রাখা মর্মে উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি এসব উৎস (মানে দলিল) হতে গ্রহণ করা যায় না। বাস্তবতা হচ্ছে ইহুদী জাতি খুশির এই উপলক্ষে অতিরিক্ত পুণ্যদায়ক কর্মের অনুশীলন (তথা আমল) হিসেবেই রোযা রাখতেন।

ইসলাম-পূর্ববর্তী যুগে আরবদের মাঝেও ‘ইয়াওমে আশূরা’ উদযাপিত হতো, কিন্তু তাদের উদযাপনের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন; এই বিষয়টি পরে ব্যাখ্যা করা হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মোনাওয়ারায় বসবাস আরম্ভ করেন, তখন তিনি দেখতে পান ইহুদীরা ‘ইয়াওমে আশূরা’য় রোযা রাখার পাশাপাশি দিনটিকে ঈদ হিসেবেও উদযাপন করতেন। এটা নিচের হাদীসটি দ্বারা সপ্রমাণিত:

১. ইমাম আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিজরী) বর্ণনা করেন হযরত আবু মুসা আল-আশআরী রাঃিয়াল্লাহু আনহু হতে; তিনি বলেন:

كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُومُوهُ أَنْتُمْ.

—ইহুদী সম্প্রদায় ‘ইয়াওমে আশূরা’ (আশূরা দিবস)–কে ঈদ হিসেবে বিবেচনা করতেন। (এমতাবস্থায় মুসলমানদের প্রতি আদেশ দিয়ে) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘এই দিনে তোমাদের রোযা রাখা উচিত’।^{২৩৯}

২. ইমাম মুসলিম (২০৬-২৬১ হিজরী)–ও হযরত আবু মুসা আশআরী রাঃিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন:

كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظَّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوهُ أَنْتُمْ.

—আশূরার দিবসকে ইহুদী সম্প্রদায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন; আর তাঁরা এটাকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। (তাই মুসলমানদের প্রতি আদেশ দিয়ে) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “এই দিনে তোমাদের রোযা রাখা উচিত।”^{২৪০}

ইমাম তাহাবী (২২৯-৩২১ হিজরী) উপরে উদ্ধৃত হাদীসের প্রসঙ্গে বলেন যে, ‘ইয়াওমে আশূরা’ উপলক্ষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মুসলমানদেরকে রোযা রাখার নির্দেশ দানের একমাত্র কারণ ছিল এই যে, ওই দিনটিতে ইহুদী সম্প্রদায় রোযা পালন করতেন।

২৩৯. আল-বুখারী, সহীহ: কিতাব আল-সওম (রোযা-বিষয়ক পুস্তক), ‘এয়াওমে আশূরা’র রোযা’ অধ্যায়, ২:৭০৪-৭০৫ #১৯০১।

২৪০. মুসলিম, সহীহ: ‘কিতাব আল-সিয়াম’ (রোযা-সংক্রান্ত পুস্তক), ‘আশূরা দিবসের রোযা’ অধ্যায়, ২:৭৯৬ #১১৩১; আল-নাসাঈ কৃত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ২:১৫৯ #২৮৪৮; আল-তাহাবী রচিত ‘শরহে মাআনী আল-আসার’: ‘কিতাব আল-সওম’ (রোযা-সম্পর্কিত অধ্যায়), ‘এয়াওমে আশূরার রোযা’ অধ্যায়, ২:১৩৩ #৩২১৭; আল-বায়হাকী প্রণীত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৪:২৮৯ #৮১৯৭।

৩. ইমাম মুসলিম (২০৬-২৬১ হিজরী) আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন হযরত আবু মুসা আল-আশআরী রাঃিয়াল্লাহু আনহু হতে, যা’তে বিবৃত হয়:

كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَتَّخِذُونَهُ عِيدًا وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُومُوهُ أَنْتُمْ.

—খায়বার অঞ্চলের বাসিন্দাবর্গ ‘ইয়াওমে আশূরা’কে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করে রোযা রাখতেন। তাঁরা তাঁদের মহিলাদেরকে অলঙ্কার ও (ধর্মীয়) চিহ্নসম্বলিত বস্ত্র দ্বারা সাজতে দিতেন। এমতাবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে) বলেন, ‘তোমাদের এ দিনে রোযা রাখা উচিত’।^{২৪১}

সর্ব-ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহিমার বর্ণিত এসব হাদীস থেকে আমরা নিচের সিদ্ধান্তগুলো নিতে পারি:

১. ‘ইয়াওমে আশূরা’ ইহুদীদের জন্যে ছিল এক বিজয় দিবস। দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁরা এটাকে নিজেদের সম্প্রদায়গত পর্যায়ে ঈদ হিসেবে উদযাপন করে আসছিলেন।

২. ইহুদীবর্গ এই দিনটিকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। রোযা পালনের দ্বারা অতিরিক্ত আমল করে তাঁরা নিজেদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

৩. এই দিনটিকে স্রেফ রোযা পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি, বরঞ্চ এটা ছিল উদযাপনের কেবল একটি দিক।

৪. সাযুজ্য দেখিয়ে কেউ যদি আপত্তি উত্থাপন করেন এ কথা বলে যে, রোযা না রেখে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করার

২৪১. ইমাম মুসলিম রচিত ‘সহীহ’ গ্রন্থ: ‘কিতাব আল-সিয়াম’ (রোযা-বিষয়ক পুস্তক), ‘আশূরা দিবসের রোযা’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:৭৯৬ #১১৩১; আবু নু’আইম কৃত ‘আল-মুসনাদ আল-মুসতাখরাজ ‘আলা সহীহ আল-ইমাম মুসলিম’, ৩:২১২ #২৫৭৫; আল-ইসমাঈলী প্রণীত ‘মু’জাম শুইউখ আবী বকর আল-ইসমাঈলী’, ৩:৭২২ #৩৩৭; আল-আসকালানী লিখিত ‘ফাতহুল বারী’, ৪:২৪৮।

কোনো অনুমতি নেই, তাহলে এই ধরনের আপত্তি সঠিক হবে না। কেননা এ সিদ্ধান্ত (উদ্ধৃত) হাদীসগুলো থেকে নেয়া সম্ভব নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিমধ্যে জানতেন ইহুদী জাতি ‘ইয়াওমে আশূরা’কে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। একারণে তিনি কখনোই এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেননি; বরঞ্চ তিনি তাঁদেরকে কেন তাঁরা রোযা পালন করছেন সে ব্যাপারেই জিজ্ঞেস করেন। তাঁরা উত্তরে বলেন যে এটা শ্রদ্ধাস্বরূপ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও নিদর্শনস্বরূপ। আর এই উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশূরা দিবসে রোযা রাখেন এবং তাঁর সাহাবা-এ কেরাম রাধিয়াল্লাহু আনহুম-কেও অনুরূপ আমল পালন করার নির্দেশ দান করেন।

৫.১.৪ মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে ইমাম আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর প্রামাণিক দলিল

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হিজরী) উপরে উদ্ধৃত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে ‘ইয়াওমে আশূরা’র শরঈ বৈধতা সম্পর্কে বেশ গভীর গবেষণা করেছেন এবং তা থেকে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন জায়েয হওয়ার বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইমাম জালালউদ্দীন সুয়ূতী (৮৪৯-৯১১ হিজরী) ইমাম আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর ওই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেন নিচে:

وَقَدْ سُلِّ شَيْخُ الْإِسْلَامِ حَافِظُ الْعَصْرِ أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ حَجَرٍ عَنْ عَمَلِ الْمَوْلَى، فَأَجَابَ بِمَا نَصَّهُ: قَالَ: وَقَدْ ظَهَرَ لِي تَحْرِيجُهَا عَلَى أَصْلٍ ثَابِتٍ وَهُوَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: هُوَ يَوْمٌ أَغْرَقَ اللَّهُ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَنَجَّى مُوسَى فَنَحْنُ نَصُومُهُ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى، فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فِعْلُ الشُّكْرِ لِلَّهِ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ إِسْدَاءِ نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ، وَيُعَادُ ذَلِكَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ، وَالشُّكْرُ لِلَّهِ يَحْصُلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كَالسُّجُودِ

وَالصَّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْتَّلَاوَةُ، وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَكْثَرُ مِنَ التَّعَمُّةِ بِزُرُوزِ هَذَا النَّبِيِّ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ؟

-এই যুগের হাফেয, শায়খুল ইসলাম আবুল ফযল ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে মীলাদের অনুশীলন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, আর তিনি জবাবে বলেন: মীলাদের যে একটি প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি আছে, তা আমি জানতে পেরেছি; আর তা সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়। (ওগুলোর বর্ণনা মতে) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মোনাওয়ারায় প্রবেশ করেন এবং তিনি ইহুদীদেরকে ‘ইয়াওমে আশূরা’য় রোযা রাখতে দেখেন। তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা উত্তরে বলেন, ‘এই দিনটিতে আল্লাহ তা’আলা ফেরাউনকে পানিতে ডুবিয়ে মারেন এবং পয়গম্বর মুসা আলাইহিস্ সালাম-কে রক্ষা করেন। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আমরা এই দিনে রোযা পালন করে থাকি।’

কোনো নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহ তা’আলা কর্তৃক বর্ষিত আশীর্বাদ অথবা দুঃখকষ্ট হতে তাঁর প্রদত্ত সুরক্ষাপ্রাপ্তি উপলক্ষে সর্বশক্তিমান প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের রীতি ও প্রতি বছর তা স্মরণার্থে পালন এই দলিলে বৈধ সাব্যস্ত হয়।

আল্লাহ তা’আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা বিভিন্ন ধরনের এবাদত-বন্দেগী দ্বারা প্রকাশ করা যায়, যার মধ্যে রয়েছে, সেজদা (নামায), রোযা, দান-সদকাহ ও কুরআন তেলাওয়াত। অতঃপর রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ধরণীতলে শুভাগমন দিবসের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর খোদায়ী আশীর্বাদের উপলক্ষ আর কী হতে পারে?^{২৪২}

২৪২. ইমাম সুয়ূতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত ‘হুসন আল-মাকুসিদ ফী আমল আল-মওলিদ’, ৬৩ পৃষ্ঠা;

খ) ইমাম সুয়ূতী প্রণীত ‘আল-হাওয়া লিল-ফাতাওয়াঈ’, ২০৫-২০৬ পৃষ্ঠা; আস-সালেহী রচিত ‘সুবুল আল-হুদা’ ওয়াল-রাশাদ ফী সীরায়ে খায়র আল-এবাদ’, ১:৩৬৬; আল-যুরকানী লিখিত ‘শরহে মাওয়া’হিব আল-লাদুন্নিয়া বিল-মিনাহ আল-মুহাম্মাদীয়া’, ১:২৬৩; শায়খ আহমদ যাইনী দাহলান মক্কী কৃত ‘আল-সীরা আল-নববীয়া’, ১:৫৪; ইমাম নাবহানী প্রণীত ‘হুজাত আল্লাহ ‘আলাল আলামীন ফী মো’জিয়াতে সাইয়েদ আল-মুরসালীন’, ২৩৭ পৃষ্ঠা।

ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের ভিত্তিস্বরূপ সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসগুলোকেই তাঁর উত্তরে পেশ করেছেন। এসব হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের আচরিত প্রথাকে সমর্থন করেছেন, যা দ্বারা তাঁদের প্রতি বর্ষিত আশীর্বাদের উপলক্ষে তাঁরা কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ উৎসব পালনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে খুশি প্রকাশ করতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদনের ফলে এ প্রথাটি সূনাহ'র মর্যাদা পেয়েছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন এই ধরাধামে শুভাগমন করেন, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর দিবস আর কী-ই বা হতে পারে? এমতাবস্থায় মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করা যাবে না কেন? ইমাম জালালউদ্দীন সুয়ুতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন, যা তাঁরই ফতোয়াসমূহের সংকলন 'আল-হা'ওয়ী লিল-ফাতাওয়া'ঈ শীর্ষক গ্রন্থের ২০৫-২০৬ পৃষ্ঠাগুলোতে বিদ্যমান। ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আশূরা'র রোযাকে দালিলিক প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন; যদিও পয়গম্বর মুসা আলাইহিস্ সালাম-কে প্রদত্ত বিজয় বহুকাল আগেকার ঘটনা ছিল, তথাপিও আশূরা দিবসকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপলক্ষ হিসেবে বছরের অন্যান্য দিন হতে আলাদাভাবে বেছে নেয়া হয়েছে। এ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি না ঘটলেও ওই দিনের মহত্ব বারবার প্রকাশ পায়; ঠিক যেমনটি জানা যায় মহানবী (দঃ)-এর বেলাদত দিবস প্রতি সোমবারে আবু লাহাবের আযাব (শাস্তি) লাঘব হয়। [কেননা ওই দিন খুশি হয়ে সে আঙ্গুলের ইশারায় হযূরের বেলাদতের সুসংবাদ বহনকারিনী দাসী সোয়াইবিয়াকে মুক্ত করে দিয়েছিল]।

রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার আগে 'ইয়াওমে আশূরা'র রোযা মুসলমানদের জন্যে ফরয ছিল।^{২৪৩} রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পর

২৪৩. আল-তাহাবী কৃত 'শরহে মা'আনী আল-আসার: কিতাব আল-সওম (রোযা-বিষয়ক পুস্তক), 'এয়াওমে আশূরা'র রোযা অধ্যায়', ২:১২৯-১৩২; আল-আঈনী প্রণীত 'উমদাত আল-কারী শরহে সহীহ আল-বুখারী', ১১:১২০।

এই বিধান রহিত করা হয়।^{২৪৪} কিছু মানুষের মনে হয়তো এই বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে যে, ইয়াওমে আশূরা পালনের আদেশ রহিত হয়ে যাওয়ার দরুন বর্তমানে এর ফযীলত/পুণ্য নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এর জবাব হলো, রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পরে অন্য কোনো মাসে রোযা রাখার বাধ্যবাধকতা আর অবশিষ্ট ছিল না। এতদসত্ত্বেও আশূরা'র রোযা পালনের অনুমতি বহাল আছে। এটা একারণে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশূরা'র রোযার বাধ্যবাধকতা রহিত করার পর এ কথা বলেননি, “আমাদের আর এরপর থেকে পয়গম্বর মুসা আলাইহিস্ সালাম-এর উপর কোনো হক বা অধিকার নেই।” অথচ এর বিপরীতে ওই রোযা বাধ্যতামূলক করার সময় তিনি ঘোষণা করেছিলেন, “তোমাদের (মানে ইহুদীদের) চেয়ে পয়গম্বর মুসা আলাইহিস্ সালাম-এর উপর আমাদের আরো বেশি হক (তথা অধিকার) রয়েছে।”

আশূরা'র রোযা রহিতকরণ সত্ত্বেও এর ফযীলত সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস পাওয়া যায়। এই দিনে রোযা পালন এর রহিতকরণের আগে পুণ্যদায়ক ছিল, আর এটার ফযীলত এর রহিতকরণের পরও জারি আছে। অধিকন্তু এটা একটা গৃহীত বিষয় যে, ফযীলত কখনো রহিত হয় না। এই কারণেই ইয়াওমে আশূরা'র রহিতকরণ ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী'র (৭৭৩-৮৫২ হিজরী) নেয়া সিদ্ধান্তের উপর কোনো প্রভাবই ফেলে না।

আমাদের যদি (যুক্তির খাতিরে) গ্রহণ করতেও হয় যে আশূরা'র রোযার ফযীলত রহিত হয়ে গিয়েছে, তবুও সেটা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে পেশকৃত আমাদের প্রামাণ্য দলিলের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না। কেননা নিশ্চিতভাবে যাঁরা ওই দিন সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন, তাঁরাই (প্রকৃতপ্রস্তাবে) পয়গম্বর মুসা আলাইহিস্ সালাম-এর উপর সর্বাধিক হকের দাবিদার ব্যক্তিবৃন্দ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

২৪৪. ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত মা আয়েশা (রাঃ)র আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এয়াওমে আশূরা'র রোযা পালনের আদেশ দেন। (কিন্তু) যখন রমযান মাসের রোযা পালন বাধ্যতামূলক করা হয়, তখন এয়াওমে আশূরা'র রোযা পালন করা বা না করা প্রত্যেকের নিজ নিজ পছন্দের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। (ইমাম বুখারী রচিত 'সহীহ': কিতাব আল-সওম, 'এয়াওমে আশূরা'র রোযা' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৭০৪ #১৮৯৭-১৮৯৮)।

ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আশুরা'র দিন রোযা রাখার কারণ ছিল তিনি এই বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন যে, কোনো পয়গম্বর আলাইহিস্ সালাম-এর বিজয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অনুমতি যদি বহাল থাকে, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত দিবসে কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অনুমতি থাকবে না? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহৎ প্রকৃতির কারণে তিনি তাঁর বেলাদত দিবসে রোযা রেখে তা উদযাপন করতে তাঁর উম্মতকে প্রকাশ্যে নির্দেশ দেননি; এর পরিবর্তে তিনি প্রতি সোমবার (আপন বেলাদত দিবসে) দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রোযা রেখেছেন; আর তিনি এমনকি তা প্রকাশও করেননি, যতোক্ষণ না কেউ তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

৫.২ পয়গম্বর নূহ আলাইহিস্ সালামের দিবস উদযাপনের পক্ষে দালিলিক প্রমাণ

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিজরী) ও হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিজরী) হযরত আবু হোরাযরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেন এই মর্মে যে, ‘ইয়াওমে আশুরা’ (১০ই মহররম) ওই দিবস, যা’তে আল্লাহ তা’আলা পয়গম্বর নূহ আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর জাতির প্রতি আপন করুণা ও আশীর্বাদ বর্ষণ করেন; এটা ছিল এমন-ই এক দিন যখন তাঁরা আল-জুদী পর্বতে (الجودي) নিরাপদে অবতরণ করেন। পয়গম্বর নূহ আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর উম্মত এই দিনটিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিবস হিসেবে উদযাপন করেন, আর তাঁদের উত্তরসূরীরাও এটাকে সম্মান প্রদর্শন করেন।

হযরত আবু হোরাযরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, সবচেয়ে করুণাশীল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইহুদীদেরকে ‘ইয়াওমে আশুরা’ তে তাঁদের রোযা পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তখন তাঁরা বনু ইসরাঈল বংশের মুক্তি ও ফেরাউনের সলিল সমাধির কথা উল্লেখ করার পর বলেন:

وَهَذَا يَوْمٌ اسْتَوَتْ فِيهِ السَّفِينَةُ عَلَى الْجُودِيِّ، فَصَامَهُ نُوحٌ وَمُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى

—অধিকন্তু, এই দিনে নূহ আলাইহিস্ সালাম’র কিস্তি নিরাপদে জুদী পর্বতে ভিড়ে। তাই সর্ব-পয়গম্বর নূহ আলাইহিস্ সালাম ও মূসা আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে এদিনটিতে রোযা রাখতেন।

এমতাবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى وَأَحَقُّ بِصَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ.

—পয়গম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর উপর আমার হক্ক (অধিকার) আরো বেশি, আর তাই এই দিনে রোযা রাখার হক্ক-ও আমারই সবচেয়ে বেশি।^{২৪৫}

অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহান সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম-বৃন্দকেও রোযা পালনের নির্দেশ দেন।

মানবজাতির দ্বিতীয় পিতা পয়গম্বর নূহ আলাইহিস্ সালাম তাঁর উম্মতকে সাথে নিয়ে রক্ষা পাওয়ার ফলে মনুষ্যকুল পৃথিবীতে টিকে যায়। তাঁর উম্মত ওই দিনটি উদযাপন করেন এবং আল্লাহর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ হন। এ থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, ঈমানদারবৃন্দ যেসব ঘটনায় (খোদাপ্রদত্ত) নিরাপত্তা ও মুক্তি লাভ করেন, সেগুলোতে সামষ্টিক পর্যায়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হবে। এটা ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এভাবেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদপূর্ণ বেলাদত তথা ধরণীতলে শুভাগমন দিবস ঈমানদারদের জন্যে শেষ বিচার দিবস অবধি ঈদ হিসেবে বরণীয় হবে।

২৪৫. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল কৃত ‘আল-মুসনাদ’, ২:৩৫৯-৩৬০ #৮৭০২; আল-আসক্বালানী প্রণীত ‘ফাতহুল বারী’, ৪:২৪৭।

৫.৩ কা'বা শরীফের আচ্ছাদন পরিবর্তন দিবস পালনের প্রামাণ্য দলিল

জাহেলীয়া তথা অজ্ঞতার যুগে কুরাইশ গোত্র আশুরা দিবসে রোযা পালন করতো, আর তারা দিনটিকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করতো। সর্বাধিক করুণার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও মদীনা মোনাওয়ারায় হিজরত করার আগে রোযা রেখে এদিনটি উদযাপন করতেন। তাঁদের এটা পালনের কারণ ছিল এই যে, এদিনেই কা'বা শরীফকে সর্বপ্রথম আচ্ছাদন দেয়া হয়েছিল। এটাই ছিল সুনির্দিষ্ট পটভূমি যার জন্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মোনাওয়ারায় হিজরতের পরে ইহুদীদেরকে তাদের রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞেস করেন।

১. ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ঈমানদারদের মা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথা বর্ণনা করেন, যিনি বলেন:

كَانَ يَوْمٌ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ.

—কুরাইশ গোত্র অজ্ঞতার যুগে আশুরা দিবসের রোযা পালন করতো; আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও সেদিন রোযা রাখতেন।^{২৪৬}

অজ্ঞতার যুগে কা'বা শরীফ যখন সর্বপ্রথম আচ্ছাদিত হয়, সেদিনটি ছিল ১০ই মহররম। সে সময় হতে মক্কাবাসী প্রতি বছর ওই দিনে রোযা পালন করতেন, আর তাঁরা দিনটিকে ঈদ হিসেবেও উদযাপন করতেন। তাদের এই আচরিত প্রথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত শরীফের পরেও জারি থাকে, আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও কা'বা শরীফের আচ্ছাদনের সে দিনটিতে নিয়মিত রোযা রাখতেন।

২৪৬. আল-বুখারী রচিত 'সহীহ': 'কিতাব আল-সওম' (রোযার পুস্তক), 'এয়াওমে আশুরা'র রোযা' অধ্যায়, ২:৭০৪ #১৮৯৮; আল-বুখারী প্রণীত 'সহীহ': 'কিতাব আল-মানাক্বিব' (সৎ গুণাবলীর বই), 'অজ্ঞতার যুগ' অধ্যায়, ৩:১৩৯৩ #৩৬১৯; মুসলিম কৃত 'আল-সহীহ': 'কিতাব আল-সিয়াম' (রোযার পুস্তক), 'আশুরা দিবসের রোযা' অধ্যায়, ২:৭৮২ #১১২৫; আল-তিরমিযী লিখিত 'আল-জামেউস্ সহীহ': 'কিতাব আল-সওম' (রোযার পুস্তক), 'আশুরা দিবসের রোযা পালনসম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ' অধ্যায়, ৩:১২৭ #৭৫৩।

২. ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে আরেকটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন, যা'তে তিনি বলেন:

كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفَرَّضَ رَمَضَانُ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرَفِيهِ الْكَعْبَةُ فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيُصِمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ.

—রমযান মাসের রোযা ফরয হবার আগে তারা (আরব জাতি) আশুরা'র রোযা রাখতো। কেননা এই দিনে কা'বা শরীফের উপর বস্ত্রের আচ্ছাদন দেয়া হতো। রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, 'কেউ আশুরা'র রোযা রাখতে চাইলে রাখতে পারে, আর কেউ ছেড়ে দিতে চাইলে তাও সে করতে পারে'।^{২৪৭}

ইমাম ইবনে হাজার আল-আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হিজরী) এই হাদীস সম্পর্কে নিজ ভাষ্যে বলেন:

فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانُوا يُعَظِّمُونَ الْكَعْبَةَ قَدِيمًا بِالسُّتُورِ وَيَقُومُونَ بِهَا.

—এটা বুঝা যায় যে আইয়ামে জাহেলীয়া তথা অজ্ঞতার যুগেও তারা স্মরণাভীতকাল হতে কা'বা শরীফকে (বস্ত্র দ্বারা) আচ্ছাদন করে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতো। এটা তাদের প্রতিষ্ঠিত একটি আচার ছিল।^{২৪৮}

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর বইয়ের আরেক জায়গায় অপর একটি কারণ প্রদর্শন করেন:

২৪৭. আল-বুখারী কৃত 'সহীহ': কিতাবুল হজ্জ, 'আল্লাহর কালাম: আল্লাহ কা'বাকে পবিত্র গৃহ বানিয়েছেন' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৫৭৮ #১৫১৫; আল-তাবারানী রচিত 'আল-মু'জাম আল-আওসাত', ৭:২৭৮ #৭৪৯৫; আল-বায়হাকী প্রণীত 'আল-সুনান আল-কুবরা', ৫:১৫৯ #৯৫১৩; ইবনে আবদ আল-বার লিখিত 'আল-তামহীদ লিমা ফী আল-মুওয়াজ্জাত মিন আল-মা'আনী ওয়া আল-আসানীদ', ৭:২০৪।

২৪৮. আল-আসকালানী রচিত 'ফাতহুল বারী', ৩:৪৫৫।

أَمَّا صِيَامُ قُرَيْشٍ لِعَاشُورَاءَ فَلَعَلَّهُمْ تَلْقَوُهُ مِنَ الشَّرْعِ السَّالِفِ وَلِهَذَا كَانُوا يُعَظِّمُونَهُ بِكَسْوَةِ الْكَعْبَةِ فِيهِ.

—কুরাইশ গোত্র কর্তৃক আশুরার রোযা রাখার ব্যাপারটি এ-ও হতে পারে যে, তারা পূর্ববর্তী শরীয়ত হতে এটা পেয়েছিল, আর একারণেই তারা সে দিনটিতে কা'বা শরীফকে আচ্ছাদন করে এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতো।^{২৪৯}

ইমাম তাবারানী (২৬০-৩৬০ হিজরী) কা'বা শরীফের উপর বস্ত্রের আচ্ছাদন দেয়ার ব্যাপারে নিজ 'আল-মু'জাম আল-কবীর' (৫:১৩৮ #৪৮-৭৬) গ্রন্থে হযরত য়াদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন:

لَيْسَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ بِالْيَوْمِ الَّذِي يَقُولُهُ النَّاسُ، إِنَّمَا كَانَ يَوْمَ فِيهِ الْكَعْبَةُ وَكَانَ يَدُورُ فِي السَّنَةِ.

—ইয়াওমে আশুরা এমন দিন নয় যেমনটি মানুষেরা ধারণা করেন। এটা কেবল ওই দিন-ই, যা'তে কা'বা শরীফের আচ্ছাদন দেয়া হয়; আর এ দিনটি সারা বছর ঘুরে ঘুরে আসতো।^{২৫০}

কা'বা শরীফের আচ্ছাদনের দিনটিকে সম্মান করা কিছু মানুষের জন্যে বিভ্রান্তির উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা বলেন, কা'বাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করা হলে ওর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কী দরকার? তাঁদের এই বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা মহাসম্মানিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদা এই দিনটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। অনুরূপভাবে, আরো কিছু মানুষের সন্দেহ (বাতিক) রয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (দুনিয়াতে) প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকে কুরআন-সুন্নাহ শিক্ষাদান, উপরন্তু তাঁর বেলাদত তথা ধরাধামে গুণাগমন

দিবস বহুদিন আগের ঘটনা; প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পূর্ণ করেছেন দেখে তাঁর মীলাদ উদযাপনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? তাঁর সুন্নাহ'কে আঁকড়ে ধরা এবং তাঁর শিক্ষাকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করাই কি যথেষ্ট নয়?

এই প্রশ্ন ও এ জাতীয় অন্যান্য প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে সকল ঈমানদারের পক্ষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত মর্যাদা ও গুণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া একান্ত জরুরি; মানবজাতির মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য, তাঁর নিখুঁত অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত এবং কুরআন নাযেল ইত্যাদি বিষয়ে আগে উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ; ইসলামী সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে ধাপে ধাপে তার উন্নয়ন সম্পর্কে সমঝদারিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

যেদিনটিতে কা'বাকে আচ্ছাদিত করা হয়, তা বছর ঘুরে আপনাআপনি ফিরে ফিরে আসে। আরব জাতি কা'বা শরীফের খাতিরেই ওই দিনটিকে সম্মান প্রদর্শন করতেন। আর এটা পরবর্তীকালে স্বাধীন একটা উদযাপনেও পরিণত হয়। এ কারণেই মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনটি, যদিও বহু শতাব্দী আগে তা ঘটেছিল, তবুও তা প্রতিবার বছর ঘুরে এলে (আমাদের) শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য; এই দিনটিকে শ্রদ্ধা করা এবং এতে খুশি প্রকাশ করা একদম অপরিহার্য। এমন কি আবু লাহাবও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত-লগ্নে খুশি হয়ে (বার্তা বহনকারিনী) তার দাসী সোয়াইবিয়াকে (আঙ্গুলের ইশারায়) মুক্ত করে দিয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে প্রতি সোমবার তার (পারলৌকিক) শাস্তি লাঘব হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং দুনিয়াবী হায়াতে থাকাকালীন তাঁর মীলাদ দিবসকে উদযাপন করতেন। অতএব, মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদযাপন শুধু জায়েয তথা অনুমতিপ্রাপ্ত-ই নয়, বরং তা মনোনীত পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ হিসেবেও সুপ্রতিষ্ঠিত।

২৪৯. প্রাগুক্ত 'ফাতহুল বারী', ৪:২৪৬।

২৫০. আল-হায়তামী কৃত 'মজমাউল যওয়াঈদ ওয়া মানবা'আ আল-ফাওয়াঈদ', ৩:১৮৭; আল-আসকালানী প্রণীত 'ফাতহুল বারী', ৪:২৪৮; এবং আল-আসকালানী রচিত 'ফাতহুল বারী', ৭:২৭৬।

৫.৪ ইসলামের পূর্ণতাপ্রাপ্তি দিবসকে ঈদ হিসেবে উদযাপনের দলিল

সূরা মা'ইদা'র ৩য় আয়াতটি— “আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম”— নাযেল হওয়ার পর ইহুদীরা এটাকে মুসলমানদের সাথে একটি আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করেন। নিম্নবর্ণিত হাদীস শরীফে খলীফা হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু ও জনৈক ইহুদীর মধ্যকার আলাপের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যেটা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের বৈধতা/অনুমতির পক্ষে প্রামাণ্য দলিলস্বরূপ:

১. ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিজরী) বর্ণনা করেন খলীফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা, যিনি বলেন যে জনৈক ইহুদী ব্যক্তি তাঁর কাছে আরয করেন,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةُ فِي كِتَابِكُمْ تَفَرَّعُوهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَا تَخْذَنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ أَيْ آيَةٍ قَالَ [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا] قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

—হে আমিরুল মো'মেনীন! আপনাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে আপনাদেরই পঠিত এমন একটি আয়াত আছে, যা আমাদের, অর্থাৎ, ইহুদীদের প্রতি অবতীর্ণ হলে আমরা সেটাকে (মানে আয়াতটি নাযেলের ওই দিনটিকে) ঈদ উৎসবের দিন হিসেবে পালন করতাম।' হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করেন, ‘সেটা কোন্ আয়াত?’ ইহুদী উত্তর দেন, ‘আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন (তথা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান) মনোনীত করলাম।’ খলীফা উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘নিশ্চয়, আমরা ওই দিনটি সম্পর্কে জানি এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আয়াতটি কোথায় নাযেল

হয়েছিল, তাও জানি; তিনি সে সময় আরাফাতে দণ্ডায়মান ছিলেন, আর দিনটি ছিল শুক্রবার।’^{২৫১}

এখানে উল্লেখযোগ্য হলো এই যে, দ্বীন-ইসলামের পূর্ণতা দানের ঘোষণাসম্বলিত আয়াতটি ইহুদীদের প্রতি অবতীর্ণ হলে তাঁরা ওই দিনটিকে ঈদ উৎসব হিসেবে পালন করতেন বলে ইহুদী ব্যক্তিটি মন্তব্য করেছিলেন। তাঁদের একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে মুসলমানবৃন্দ বুঝি ওই দিনটিকে অন্য যে-কোনো দিনের মতোই মনে করতেন। এর প্রতি উত্তরটি এরকম-ই হওয়া উচিত ছিল; তবে খলীফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পরিবর্তে বলেন:

قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ.

—নিশ্চয়, আমরা ওই দিনটি সম্পর্কে জানি এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আয়াতটি কোথায় নাযেল হয়েছিল, তাও জানি।

সেদিনটি ছিল শুক্রবার, আর উপলক্ষ ছিল হজ্জের উদ্দেশ্যে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিতি। দৃশ্যতঃ প্রশ্ন ও উত্তরের মাঝে কোনো সামঞ্জস্য নেই; কিন্তু বাস্তবে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উত্তরটি পুরোপুরিভাবে প্রশ্ন অনুযায়ী প্রদত্ত হয়েছে। ‘আরাফাত’ ও শুক্রবারের কথা উল্লেখ করে তিনি ইঙ্গিতে সম্পূর্ণ উত্তর দিয়েছেন এ মর্মে যে, উভয় দিন-ই মুসলমানদের

২৫১. আল-বুখারী প্রণীত ‘সহীহ’: ‘কিতাবুল ঈমান’ (বিশ্বাসবিষয়ক পুস্তক), ‘ঈমানের হাস-বুদ্ধি’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:২৫ #৪৫; আল-বুখারী কৃত ‘সহীহ’: ‘কিতাব আল-মাগাযী’ (গযওয়া/ধর্মযুদ্ধবিষয়ক পুস্তক), ‘বিদায়ী হজ্জ’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৬০০ #৪১৪৫; আল-বুখারী রচিত ‘সহীহ’: ‘কিতাব আল-তাফসীর আল-কুরআন’ (কুরআন ব্যাখ্যামূলক পুস্তক), ‘আল্লাহর বাণী: আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৬৮৩ #৪৩৩০; আল-বুখারী লিখিত ‘সহীহ’: ‘কিতাব আল-এ'তেসাম বি আল-কিতাব ওয়া আল-সুনাহ’ (কুরআন ও সুনাহ'র অনুসরণবিষয়ক পুস্তক), ৬:২৬৫৩ #৬৮৪০; সহীহ মুসলিম শরীফ: ‘কিতাব আল-তাফসীর’ (তাফসীর-সম্পর্কিত পুস্তক), ৪:২৩১৩ #৩০১৭; আল-তিরমিযী কৃত ‘আল-জামেউন্ সহীহ’: ‘আবওয়াব আল-তাফসীর আল-কুরআন’ (কুরআনের তাফসীরের অধ্যায়গুলো), ‘আল কুরআন: সূরা মা'ইদা হতে’ শীর্ষক অধ্যায়, ৫:২৫০ #৩০৪৩; আল-নাসাঈ প্রণীত ‘আল-সুনান’: ‘কিতাব আল-ঈমান’ (বিশ্বাসসম্পর্কিত পুস্তক), ‘ঈমানের বুদ্ধি’ শীর্ষক অধ্যায়, ৮:১১৪ #৫০১২।

জন্যে ঈদস্বরূপ; অর্থাৎ, এই দিনটি সাপ্তাহিক (মানে শুক্রবার) ও বার্ষিক (মানে আরাফাত) পর্যায়ে ঈদ হিসেবে উদযাপিত হয়ে থাকে। একারণেই ওই ইহুদী ব্যক্তি নিশ্চুপ হয়ে যান এবং তাঁর প্রশ্নটি আর দ্বিতীয়বার করেননি, কেননা খলীফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রশ্নের সম্পূর্ণ জবাব দিয়েছিলেন।

খলীফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এই উত্তরের প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিজরী) বলেন:

عِنْدِي أَنَّ هَذِهِ الرَّوَايَةَ اُكْتُفِيَ فِيهَا بِالْإِشَارَةِ.

—আমার দৃষ্টিতে এই বর্ণনাটি ইশারা দ্বারা যথেষ্ট (বলে সপ্রমাণিত)।^{২৫২}

২. হযরত কা'আব আল-আহবার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) -এর বর্ণনাগুলোর একটিতে তিনি খলীফা হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথাকে আরো খোলাসা করেছেন। তিনি বিবৃত করেন যে, তিনি খলীফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, তিনি এমন এক জাতিকে চেনেন যারা এই আয়াতটি (উপরোক্ত আয়াত 'আল-এয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনা'কুম') তাঁদের প্রতি নাযেল হলে (নাযেলের) ওই দিনটিকে ঈদ হিসেবে উদযাপন করতেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করেন, “সেটা কোন্ আয়াত?” হযরত কা'আব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উত্তর দেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

—আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন (হিসেবে, অর্থাৎ পরিপূর্ণ জীবনবিধানরূপে) মনোনীত করেছি।^{২৫৩}

এমতাবস্থায় খলীফা হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেন:

২৫২. আল-আসক্বালানী কৃত ‘ফাতহুল বারী’, ১:১০৫ #৪৫।

২৫৩. আল কুরআন: সূরা মায়েদা, ৫:৩।

إِنِّي لَأَعْرِفُ فِي أَيِّ يَوْمٍ أُنْزِلْتُ: [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ], يَوْمَ جَمْعَةٍ وَيَوْمَ عَرَفَةٍ، وَهُمَا لَنَا عِيدَانِ.

—নিশ্চয় আমি জানি এই আয়াতটি ('আল-এয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনা'কুম') কোন্ দিন অবতীর্ণ হয়েছিলো; সেদিন ছিলো শুক্রবার এবং আরাফাতের দিবস; আর ওই দুটো দিন-ই আমাদের জন্যে ঈদের দিন।^{২৫৪}

উপরের বর্ণনা হতে হয়তো প্রমাণ করা যেতে পারে যে, ওই ইহুদীর দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক ছিলো। কেননা খলীফা উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু তা নিশ্চিত করেছিলেন। অন্যথা তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করতেন এ কথা বলে যে, আমাদের শরীয়তে ঈদের দিনগুলো নির্ধারিত আছে; একারণেই আমরা এটাকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। কিন্তু খলীফা তা বলেননি। বরঞ্চ তিনি ওই ইহুদীকে বলেন যে, তোমাদের প্রতি এটা নাযেল হলে তোমরা ঈদ হিসেবে গ্রহণ করতে বটে, কিন্তু আমরা (মুসলমান সমাজ) এটাকে দুইটি ঈদের দিনের মতো গ্রহণ করেছি: আরাফাতের দিবস ও শুক্রবার (জুম'আহ)।

৩. এই অভিমতের পক্ষে আরেকটি ঘটনা আছে, যা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বেলায় ঘটেছিলো। হযরত আম্মার ইবনে আবী আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তেলাওয়াত করেন উপরের আয়াতটি الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا [‘আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন (তথা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান) মনোনীত করলাম।’], আর একজন ইহুদী এসে তাঁকে বলেন,

২৫৪. আল-তাবারানী কৃত ‘আল-মু'জাম আল-আওসাত’, ১:২৫৩ #৮৩০; আল-আসক্বালানী প্রণীত ‘ফাতহুল বারী’, ১:১০৫ #৪৫; ইবনে কাসীর রচিত ‘তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম’, ২:১৪।

لَوْ أَنزَلَتْ هَذِهِ عَلَيْنَا لَأُتَّخِذَتْ يَوْمُهَا عِيدًا.

—এই আয়াতখানি যদি আমাদের প্রতি নাযেল হতো, তাহলে আমরা এর নাযেলের দিনকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করতাম।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেন,

فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمٍ عِيدَيْنِ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ.

—এটা দুটো ঈদের দিনে নাযেল হয়েছিলো: জুম'আহ (শুক্রবার) ও আরাফাতের দিবসে।^{২৫৫}

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ওই ইহুদীর অভিমত প্রত্যাখ্যান করেননি, বরঞ্চ তিনি তা সমর্থন করেছেন এ কথা বলে যে, আয়াতখানি শুক্রবার ও আরাফাত দিবসে নাযেল হয়েছিলো; আর এই দুটো দিন-ই মুসলমানদের কাছে এক-একটি ঈদের দিন।

এসব হাদীস এই ধারণাটি সমর্থন করে যে, কোনো নেয়ামত তথা আশীর্বাদ অবতীর্ণ হওয়ার দিনকে উদযাপন করা জায়েয বা অনুমতিপ্রাপ্ত। তাই দ্বীন-ইসলামের পূর্ণতা দেয়ার দিনটিকে যেমনভাবে ঈদ হিসেবে (হাদিসগুলোতে) ঘোষণা করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে রাহমাতুল্লিল আলামীন তথা জগতসমূহের জন্যে খোদায়ী করুণা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমন দিবস ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও ঈদের দিন (হিসেবে সাব্যস্ত) হয়েছে। মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদযাপন ঈমানেরই মিস্তিষাদ বটে। এই বাস্তবতা কেউ উপলব্ধি করার আগে এটা অনুধাবন করা বাধ্যতামূলক যে, ঈমানদারির ভিজিগেন্ডা-ই হচ্ছে মহানবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এশকু-মহব্বত/ ভালোবাসা। এ কেমন ব্যাপার যে, আপনারা ঈমানদারির দাবি করেন, অথচ আপনাদের ঈমানের হাল-অবস্থা আপনাদেরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতে আপনাদেরকে খুশি প্রকাশের অনুমতি দেয় না?

আলোচ্য সূরা মায়ের আয়াতখানি সবচেয়ে সদয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়। আর এটা খোশ-খবরী নিয়েই এসেছিলো। যেদিন এ আয়াত নাযেল হয়, সেদিনটিকে দুটো ঈদের দিন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়: জুম'আহ বা শুক্রবারের ঈদ ও আরাফাত দিবসের ঈদ। অতএব, ঈমানদারবৃন্দের জন্যে এই বিষয়টি উপলব্ধি করা মোটেও দুষ্কর নয় যে, সর্বশেষ পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিনটিতে ধরণীতলে শুভাগমন করেন, সেদিনটি বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সভা-সমাবেশ/মাহফিল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খুশি প্রকাশ করেন এবং আল্লাহ তা'আলার এই নেয়ামতের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করেন; কেননা এই দিনে খুশি প্রকাশ করা ঈমানেরই লক্ষণ। অধিকাংশ মুসলমান-ই এই দিনকে ধারাবাহিকভাবে সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন, আর ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফে তাঁরা এর সম্মানার্থে মাহফিল-ও অনুষ্ঠান করেন।

কেউ কেউ আপত্তি উত্থাপন করেন এই বলে যে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ছাড়া অন্য কোনো দিনের প্রতি ঈদ শব্দটি আরোপ করা জায়েয নয়। তাঁদের এ আপত্তিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য দ্বারা খণ্ডন করা যায়; তিনি বলেন:

فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمٍ عِيدَيْنِ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ.

—এটা দুটো ঈদের দিনে অবতীর্ণ হয়: শুক্রবার ও আরাফাত দিবসে।

কেউ কেউ আবার হয়তো বলতে পারেন যে, আরাফাত দিবস তো ঈদুল আযহারই দিন। এর প্রতি আমাদের জবাব হলো, সর্ব-হযরত খলীফা উমর ফারুক ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা দু'জনই শুক্রবারকে ঈদের দিন বলে ঘোষণা করেছেন। সবচেয়ে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাহাবাবৃন্দের মতে জুম'আ দিবস যদি ঈদ হতে পারে, তাহলে মীলাদুন্নবী

২৫৫. তিরমিযী লিখিত 'আল-জামেউস্ সহীহ': 'কিতাব আল-তাফসীর আল-কুরআন' (কুরআন ব্যাখ্যামূলক পুস্তক), 'আল কুরআন: সূরা মা-ইদা হতে' অধ্যায়, ৫:২৫০ #৩০৪৪; আল-তাবারানী কৃত 'আল-মু'জাম আল-কবীর', ১২:১৮৪ #১২,৮৩৫; আল-তাবারী প্রণীত 'জামেউল বয়ান ফী তাফসীর আল-কুরআন', ৬:৮২; আল-মারক্বী রচিত 'তা'যীম কুদর আল-সালাহ', ১:৩৫২ #৩৫৪; ইবনে কাসীর লিখিত 'তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম', ২:১৪; ইবনে মুসা আল-হানাতী প্রণীত 'মু'তাসার আল-মুখতাসার', ২:১৬৯।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিবস কেন ঈদ হবে না? বস্তুতঃ তাঁর মীলাদ দিবস হলো সকল ঈদের সেরা, কেননা আমরা কুরআন মজীদ ও খোদায়ী হেদায়াত তথা পথপ্রদর্শনের আশীর্বাদ লাভ করেছি (শুধুমাত্র) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদপূর্ণ জাত/ সন্তা মোবারকের মাধ্যমেই।

৫.৫ জুম'আ দিবসের মাহাত্ম্য: পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালামের সৃষ্টি হয় এদিনে

জুম'আহ দিবস আপন বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সুবাদে সপ্তাহের প্রধান দিন (সাইয়েদ আল-আইয়াম) হিসেবে অভিহিত হয়েছে। এই দিনে গোসল করা, নতুন বস্ত্র পরিধান করা এবং সুগন্ধি মাখা সুন্নাত। মুসলমানদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মস্থল ছেড়ে মসজিদে জামায়াতে নামায পড়তে যেতে হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতদেরকে এই দিবসে তাঁর প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণের জন্যে আদেশ করেছেন।

হযরত আওস ইবনে আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান:

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبُصٌ وَفِيهِ التَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ.

—তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সেরা দিন হলো জুম'আ তথা শুক্রবার; এদিন পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-কে সৃষ্টি করা হয়, আর এই এক-ই দিন তিনি বেসালপ্রাপ্ত হন; এই দিন (পুনরুত্থানের জন্যে) শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং বজ্রাঘাত করবে। অতএব, এই দিনে তোমরা আমার প্রতি ঘন ঘন সালাত-সালাম পেশ করো। কেননা তোমাদের প্রেরিত সালাত-সালাম আমার কাছে পৌঁছনো হবে।^{২৫৬}

২৫৬. আবু দাউদ রচিত 'আল-সুনান': কিতাব আস্ সালাহ (নামায/দুআ'র বই); 'জুম'আ/শুক্রবারের শ্রেষ্ঠত্ব', 'জামাআতে নামাযের দিন' এবং 'শুক্রবারের রাত'-বিষয়ক অধ্যায়, ১:২৭৫ #১০৪৭; আবু দাউদ প্রণীত 'আল-সুনান', 'আবওয়াব আল-বিতর'

জুম'আ হচ্ছে ঈদের দিন। অনেক মুহাদ্দিস আলেম এ কথা তাঁদের বইপত্রে উল্লেখ করেছেন:

১. ইমাম ইবনে মাজাহ (২০৯-২৭৩ হিজরী) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন:

إِنَّ هَذَا يَوْمٌ عِيدٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِنْ كَانَ طَيِّبٌ فَلْيَمْسَسْ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ.

—নিশ্চয় এই দিনটি (জুম'আহ) ঈদ দিবস। আল্লাহ এটা মুসলমানদের জন্যে (ঈদ) করেছেন। যে ব্যক্তি জুম'আর (নামাযের) জামায়াতে যায়, সে যেনো গোসল করে, আর সম্ভব হলে কিছু সুগন্ধি ব্যবহার করে; তবে মিসওয়াক তোমাদের জন্যে বাধ্যতামূলক।^{২৫৭}

২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হযরত আবু হোরায়ারা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

(বিতরের অধ্যায়গুলো), 'তওবা-সম্পর্কিত' অধ্যায়, ২:৮৮ #১৫৩১; ইবনে মাজাহ কৃত 'আল-সুনান: কিতাব আল-একুমা আল-সালাহ ওয়া সুন্না ফীহা (নামায ক্বায়েম-বিষয়ক বই ও তাতে নিহিত সুন্নাত), 'শুক্রবারের শ্রেষ্ঠত্ব' অধ্যায়, ১:৩৪৫ #১০৮৫; আল-নাসাঈ রচিত 'আল-সুনান: কিতাব আল-জুম'আ' (শুক্রবার সংক্রান্ত বই), 'শুক্রবার দিনগুলোতে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি অত্যধিক সালাত-সালাম পেশ' শীর্ষক অধ্যায়, ৩:৯১ #১৩৭৫; আল-নাসাঈ লিখিত 'আল-সুনান আল-কুবরা', 'শুক্রবারে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি অত্যধিক সালাওয়াৎ পাঠের নির্দেশ' শীর্ষক অধ্যায়, ১:৫১৯ #১৬৬৬; আল-দারিমী প্রণীত 'আল-সুনান', ১:৪৪৫ #১৫৭২; ইবনে আবী শায়বা কৃত 'আল-মুসান্নাফ', ২:২৫৩ #৮৬৯৭; আল-তাবারানী রচিত 'আল-মু'জাম আল-কবীর', ১:২১৬ #৫৮৯; আল-বায়হাকী লিখিত 'আল-সুনান আল-কুবরা', ৩:২৪৮ #৫৭৮৯; আল-বায়হাকী প্রণীত 'আল-সুনান আল-সুগরা', ১:৩৭২ #৬৩৪; আল-হায়তামী রচিত 'মাওয়ারিদ আল-যাম'আন ইলা যাওয়াঈদ ইবনে হিব্বান', ১:১৪৬ #৫৫০।

২৫৭. ইবনে মাজাহ কৃত 'আল-সুনান: কিতাব একুমা আল-সালাহ' (নামায ক্বায়েম-সম্পর্কিত বই), 'জুম'আ'র দিনের শোভা বর্ধন' শীর্ষক অধ্যায়, ১:৩৪৯ #১০৯৮; আল-তাবারানী প্রণীত 'আল-মু'জাম আল-আওসাত', ৭:২৩০ #৭৩৫৫; আল-মুনযিরী লিখিত 'আল-তারগীব ওয়াল তারহীব মিন আল-হাদীস আল-শরীফ', ১:২৮৬ #১০৫৮।

إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ عِيدٌ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.

—জুম‘আর দিন হচ্ছে ঈদের দিন। অতএব, তোমাদের ঈদ দিবসকে রোযা রাখার দিন কোরো না, কেবল ওর আগের দিন বা পরের দিন রোযা রাখতে পারো।^{২৫৮}

৩. ইমাম ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হিজরী) বর্ণনা করেন আবু আওবার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর কথা, যিনি বলেন:

كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ نَهَيْتَ النَّاسَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ: مَا نَهَيْتُ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ عِيدٌ إِلَّا أَنْ تَصِلُوهُ بِأَيَّامٍ.

—আমি হযরত আবু হুরায়রা রাঈয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে বসেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আগমন করেন এবং বলেন, ‘আপনি জুম‘আর দিনগুলোতে রোযা রাখাকে নিষেধ করেছেন।’ তিনি উত্তর দেন, ‘আমি মানুষকে জুম‘আর দিন রোযা রাখা হতে নিষেধ করিনি, কিন্তু আমি হযরত পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: শুক্রবার দিনগুলোতে রোযা রেখো না, কেননা তা ঈদের দিন; তবে তা (অন্যান্য) দিনের সাথে মিলিয়ে রাখতে পারো।’^{২৫৯}

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, জুম‘আ দিবসের এতো উচ্চমর্যাদা কেন? কেন-ই বা একে সপ্তাহের প্রধান দিন অভিহিত করা হয়েছে? এর উত্তর উপরের

হাদীসগুলোতে বিদ্যমান। জুম‘আ দিবসের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ ব্যাখ্যা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান:

فِيهِ خُلِقَ آدَمُ.

—এই দিনে পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করা হয়।

শুক্রবার দিনটিতে মানবজাতির আদি পিতা পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-কে সৃষ্টি করা হয়। এটা তাঁরই মীলাদ/মীলাদের দিন, আর একে ঈদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যদি পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-এর মীলাদের দিন শুক্রবার হওয়ার দরুন সেটাকে সম্মান করা যায়, তাহলে সর্বশেষ পয়গম্বর হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদকে কেন সম্মান করা যাবে না? কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম-এর মীলাদ উদযাপিত হয় একারণে যে, তাঁকে বিশেষ উপায়ে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, কিন্তু আমাদের এ আলোচনার উপর এর কোনো প্রভাব পড়বে না। এটা এ কারণে যে, হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে শুক্রবার দিন সৃষ্টি করা হয়েছিলো। যার ফলে ওই দিনটি সপ্তাহের প্রধান দিবসে পরিণত হয়। যেহেতু ওই দিনটি ছিলো প্রথম পয়গম্বর ও মানবজাতির আদি পিতা আলাইহিস্ সালাম-এর সৃষ্টির দিন। এরই ভিত্তিতে বলা চলে যেদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরণীতলে শুভাগমন হয়, সেদিনটি হলো সকল ঈদের সেরা ঈদ। কেননা এই দিনেই জগতসমূহের প্রতি আল্লাহর অশেষ করুণা এবং সকল পয়গম্বরের সেরা পয়গম্বর ধরাধামে শুভাগমন করেন।

৫.৫.১ জুম‘আ দিবস: (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি) সালাত ও সালাম প্রেরণের দিন

জুম‘আ তথা শুক্রবারের জন্যে নেয়া প্রস্তুতি মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে নেয়া প্রস্তুতিরই অনুরূপ; যেমন গোসল করা, সুগন্ধি মাখা এবং জামাআতে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বা কর্মস্থল ত্যাগ করে মসজিদে গমন। হাদীসের বইপত্রে এগুলো ছাড়াও অন্যান্য

২৫৮. ইমাম আহমদ রচিত ‘আল-মুসনাদ’, ২:৩০৩ ও ৫৩২ #৮০১২ ও ১০,৯০৩; ইবনে খুযায়মা কৃত ‘আল-সহীহ’, ৩:৩১৫ ও ৩১৮ #২১৬১ ও ২১৬৬; ইবনে রাহওয়াইহ প্রণীত ‘আল-মুসনাদ’, ১:৪৫১ #৫২৪; আল-হাকিম লিখিত ‘আল-মুসতাদরাক’, ১:৬০৩ #১৫৯৫।

২৫৯. ইবনে হিব্বান রচিত ‘আল-সহীহ’, ৮:৩৭৫ #৩৬১০।

আরো কিছু প্রস্তুতির উল্লেখ আছে। এসব অতিরিক্ত প্রস্তুতি মূলতঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত; যথা- তাঁর প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণ। এই দিনটিকে পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-এর মীলাদ দিবস হওয়ার কারণেই বেছে নেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে যেমনটি বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান:

فَاكْثُرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ.

-অতএব, তোমরা এই দিনে আমার প্রতি বেশি বেশি বা ঘন ঘন সালাত-সালাম প্রেরণ করো।

এটাই হচ্ছে নবীপ্রেমিকদের প্রার্থনা সঙ্গীত; যাঁদের অন্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা আছে, তাঁরা এই দিনে জমায়েত হয়ে সমবেতভাবে দুআ-দুরুদ পাঠ করেন। এই দিনে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে; সালাত-সালাম পাঠের হালাক্বা/ মজলিশ বসে। একদিকে এ দিনটিকে পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-এর মীলাদের দিবস বলে তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়, অপরদিকে এটা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণের দিন হিসেবেও ধার্য করা হয়। আর এক দিনেই দু'জন পয়গম্বরের (আলাইহিমাস্ সালাম) প্রতি খুশি প্রকাশ করা হয়।

উপরে উদ্ধৃত একই হাদীসে সাহাবা-এ কেরাম রাঈয়াল্লাহু আনহুম জিজ্ঞেস করেন:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمَتْ؟

-হে আল্লাহর রাসূল, আমরা যে সালাত-সালাম আপনার প্রতি প্রেরণ করবো তা কীভাবে আপনার কাছে পেশ হবে। যখন আপনিই বেসালপ্রাপ্ত? এই প্রশ্নের জবাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَام.

-নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরবৃন্দের দেহ মোবারককে মাটির জন্যে হারাম করেছেন” (মানে মাটি গ্রাস করতে অক্ষম)।^{২৬০}

এ বর্ণনায় বুঝা যায়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহৎ সাহাবা রাঈয়াল্লাহু আনহুম-বৃন্দকে জানিয়েছেন যে, এ পৃথিবীতে তাঁর প্রকাশ্য জিন্দেগীর পরও তিনি (আপন রওয়া পাকে) সশরীরে (এক রুহানী/ আধ্যাত্মিক হায়াতে) জীবিত থাকবেন। অতএব, জুম'আ দিবসে ঘন ঘন বা বেশি বেশি তাঁর প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণের চর্চা গড়ে তোলা প্রত্যেকের জন্যে (অতীব) গুরুত্বপূর্ণ।

৫.৬ পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর জন্মস্থানের গুরুত্ব ও এর যেয়ারত

হযরত আনাস বিন মালেক রাঈয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ রজনীতে (উর্ধ্বাকাশে) ভ্রমণকালে হযরত জিবরাঈল ফেরেশতা আলাইহিস্ সালাম বেথলেহেম (বাইতে লাহাম) নামের জায়গায় থামেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বোররাক্ব হতে অবতরণ করে নামায পড়ার জন্যে অনুরোধ করেন। নামায শেষ হলে জিবরাঈল আমীন আলাইহিস্ সালাম তাঁকে বলেন:

২৬০. ইমাম আবু দাউদ রচিত 'আল-সুনান': 'কিতাব আল-সালাত (দরুদের বই)', 'জুমআ দিবসের মাহাত্ম্য ও জুমআ'র রাত' শীর্ষক অধ্যায়, ১:২৭৫ #১০৪৭; আবু দাউদ কৃত 'আল-সুনান': আবওয়াব আল-বিতর' (বিতরের অধ্যায়গুলো), 'অনুতাপ' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৮৮ #১৫৩১; ইবনে মাজাহ প্রণীত 'আল-সুনান': কিতাব এক্বামা আল-সালাহ ওয়া সুননা ফীহা' (সালাত ক্বায়েম ও তাতে নিহিত সুননাহ), 'জুমআ দিবসের মাহাত্ম্য' শীর্ষক অধ্যায়, ১:৩৪৫ #১০৮৫; আল-নাসাঈ লিখিত 'আল-সুনান': 'কিতাব আল-জুমআ' (জুমআ দিবসের পুস্তক), 'গুফ্বারে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ঘনঘন/ বেশি বেশি সালাত-সালাম প্রেরণ' শীর্ষক অধ্যায়, ৩:৯১ #১৩৭৫; আল-নাসাঈ রচিত 'আল-সুনান আল-কুবরা': 'জুমআ দিবসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি বেশি বেশি সালাত-সালাম প্রেরণের আদেশ' শীর্ষক অধ্যায়, ১:৫১৯ #১৬৬৬; আল-দারিমী কৃত 'আল-সুনান', ১:৪৪৫ #১৫৭২; ইবনে আবী শায়বা প্রণীত 'আল-মুসান্নাফ', ২:২৫৩ #৮৬৯৭; আল-তাবারানী লিখিত 'আল-মুজাম আল-কবীর', ১:২১৬ #৫৮৯; আল-বায়হাক্বী রচিত 'আল-সুনান আল-কুবরা', ৩:২৪৮ #৫৭৮৯; আল-বায়হাক্বী কৃত 'আল-সুনান আল-সুগরা', ১:৩৭২ #৬৩৪; আল-হায়তামী প্রণীত 'মাওয়ারিদ আল-যাম'আন ইলা যাওয়াঈদ ইবনে হিব্বান', ১:১৪৬ #৫৫০।

أَتَذَرِي أَنِّي صَلَّيْتُ صَلَّيْتُ بِبَيْتِ لَحْمٍ حَيْثُ وَلِدَ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ.

—আপনি কি জানেন কোথায় নামায পড়েছেন? আপনি ‘বাইতে লাহাম’ স্থানে নামায পড়েছেন, যেখানে পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর বেলাদত হয়েছিলো।^{২৬১}

এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, জুম’আ (শুক্রবার) যেমন পয়গম্বর আদম আলাইহিস্ সালাম-এর সৃষ্টির দিন হিসেবে সম্মান লাভ করেছে, তেমনি বেথলেহেমকেও সম্মানিত করা হয়েছে পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর জন্মস্থান হিসেবে। পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দের বেলাদতের সময় ও স্থান উভয়কেই করা হয়েছে সম্মানিত। হযরত ঈসা নবী আলাইহিস্ সালাম-এর বেলাদত (পয়দায়েশ) যেখানে হয়, সেই জায়গায় আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়েন, যেটা কোনো পয়গম্বর আলাইহিস্ সালাম-এর বেলাদতের স্থানকে সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব সাব্যস্ত করে। এই কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেকু-মণ্ডলী তাঁর বেলাদত স্থান যেয়ারত করে থাকেন। এমন এক সময় ছিলো যখন মক্কাবাসী মুসলমানবৃন্দ মীলাদ উদযাপনের উদ্দেশ্যে ওই পবিত্র স্থান হতে জুলুস-মিছিল বা শোভাযাত্রা বের করতেন। উপরন্তু, কোনো পয়গম্বর আলাইহিস্ সালাম-এর বেলাদত-স্থান যদি আশীর্বাদধন্য হতে পারে, যা উপরোক্ত হাদীস দ্বারা সাবিত/প্রমাণিত, তাহলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরণীতলে শুভাগমনের সন্ধিক্ষণ কেন আশীর্বাদধন্য হবে না?

২৬১. নাসাঈ কৃত ‘আল-সুনান’: কিতাব আল-সালাহ (নামাযের বই), ‘নামাযের বাধ্যবাধকতা’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:২২২ #৪৫০; আল-তাবারানী প্রণীত ‘মুসনাদ আল-শা’মিয়ান’, ১:১৯৪ #৩৪১।

নিম্নের সংকলনগুলোতে এই বর্ণনা এসেছে শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) হতে: আল-বায়হার রচিত ‘আল-বাহর আল-যুখার’ (আল-মুসনাদ), ৮:৪১০ #৩৪৮৪; আল-তাবারানী লিখিত ‘আল-মু’জাম আল-কবীর, ৭:২৮৩ #৭১৪২; আল-হায়তামী প্রণীত ‘মজমাউল যওয়াঈদ ওয়া মানবা’আ আল-ফওয়াঈদ’, ১:৭৩; আল-আসকালানী কৃত ‘ফাতহুল বারী’, ৭:১৯৯।

৫.৭ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বেলাদত-দিবস উদযাপন করেন রোযা পালনের মাধ্যমে

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈধতার ব্যাপারে এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাঁর নিজের মীলাদ দিবস উদযাপনের পক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট আদেশ বা দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন? এর উত্তর হ্যাঁ-সূচক হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা’আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নিজেই খুশি প্রকাশ করতেন; আর তিনি তাঁর মহান সাহাবাবৃন্দ রাঃদিয়াল্লাহু আনহুমকে একই রকম করতে উৎসাহিত করতেন। নিচের রওয়ায়াতটি অনুযায়ী সাবিত হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মীলাদের সময় রোযা রাখতেন।

ইমাম মুসলিম (২০৬-২৬১ হিজরী) বর্ণনা করেন আবু কাতাদা রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে এই মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সোমবার দিন তাঁর রোযা রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وَلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ.

—ওই দিনটিতে আমার বেলাদত (ধরাধামে শুভাগমন) হয়েছিলো এবং ওই দিনেই (নবী হিসেবে) আমার প্রতি ওহী নাযেল হয়।^{২৬২}

সোমবার দিনটির বিশেষত্ব এই কারণে যে, এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদধন্য বেলাদত দিবস। শরীয়তে এই দিনটির বিশেষ গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বিরাজমান। হযর পূর নূর সাল্লাল্লাহু

২৬২. সহীহ মুসলিম: ‘কিতাব আল-সিয়া’ম’ (রোযা-সম্পর্কিত পুস্তক), ‘প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার কাম্যাত’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:৮১৯ #১১৬২; আল-বায়হাকী কৃত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৪:২৮৬ #৩৮,১৮২।

নিম্নের বর্ণনায় এই কথা বিদ্যমান: ‘ওই দিনে আমার প্রতি নবুওয়্যাত অবতীর্ণ হয়’: আল-নাসাঈ প্রণীত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ২:১৪৬ #২৭৭৭; আহমদ ইবনে হাম্বল রচিত ‘আল-মুসনাদ’, ৫:২৯৬-২৯৭ #২২,৫৯০-২২,৫৯৪; আবদুর রাযযাক লিখিত ‘আল-মুসনাদ’, ৪:২৯৬ #৭৮৬৫; আবু এয়া’লা কৃত ‘মুসনাদ’, ১:১৩৪ #১৪৪; আল-বায়হাকী প্রণীত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৪:৩০০ #৮২৫৯।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এই দিনে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ (নফল) রোযা রেখেছিলেন; আর এর দরুন এই আমল বা অনুশীলিত কর্মটি তাঁর উম্মতের জন্যে সুন্নাহ'র মর্যাদা পেয়েছে। এমনকি আজো এই সুন্নাহ পালনের জন্যে সারা বিশ্বজুড়ে মো'মেন মুসলমানবৃন্দ সোমবার দিন রোযা রেখে থাকেন।

দ্বীন-ইসলামে জন্ম দিবস উদযাপনের বিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান; যারা দাবি করেন যে, ইসলাম ধর্মে জন্মদিনের কোনো তাৎপর্য নেই, তারা শরীয়তের শিক্ষাসমূহের ব্যাপারে একেবারেই অনবধান। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, “ওই দিন-ই আমার বেলাদত (ধরাধামে শুভাগমন) হয়েছিলো।” আর এ কথা বলে তিনি ইসলামে মীলাদ উদযাপনের একটি স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। একইভাবে কুরআনেও পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দের মীলাদ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে, যা ইতিপূর্বকার অধ্যায়গুলোতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা তাঁর পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দের বেলাদত দিবসকে উচ্চপর্যায়ে মূল্যায়ন করেন। আমরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ সবচেয়ে উঁচু স্তরে অধিষ্ঠিত। এই দিনটি উদযাপনের বিভিন্ন পন্থা বিদ্যমান, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। উপরে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত একটি উপায় হলো রোযা রাখা; তবে অন্যান্য পদ্ধতিও রয়েছে, যেমন- দান-সদকাহ ও খাদ্য বিতরণ। কোনো নেয়ামত/ আশীর্বাদপ্রাপ্তির খাতিরে আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বকার অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

৫.৮ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বেলাদত-দিবস উদযাপন করেন পশু কুরবানীর মাধ্যমে

আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বেলাদত দিবস নিজেই পালন করেন। তিনি তাঁর মীলাদের উপলক্ষে একটি পশু কুরবানী করেছিলেন এবং মেহমান খাইয়েছিলেন।

১. ইমাম বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হিজরী) হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, যিনি বলেন:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النَّبَاِ.

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুবুওয়্যত ঘোষণার পর নিজের জন্যে একটি আক্কীকাহ পালন করেন।^{২৬৩}

২. জিয়া' আল-মাকুদিসী (৫৬৯-৬৪৩ হিজরী) বর্ণনা করেন হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা, যিনি বলেন:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا بَعَثَ نَبِيًّا.

-মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পয়গম্বর হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পর নিজের জন্যে আক্কীকা পালন করেন।^{২৬৪}

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন:

لَمَّا وَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بِكَبْشٍ.

-যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমন হয়, তখন আবদুল মুত্তালিব তাঁর পক্ষ হয়ে একটি মন্দা ভেড়া কুরবানী করেন।^{২৬৫}

২৬৩. আল-বায়হাকী প্রণীত 'আল-সুনান আল-কুবরা', ৯:৩০০ #৪৩; আল-মাকুদিসী কৃত 'আল-আহাদীস আল-মুখতার', ৫:২০৫ #১৮৩৩; আল-নবী রচিত 'তাহযীব আল-আসমা' ওয়াল-লুগাত', ২:৫৫৭ #৯৬২; আল-আসকালানী লিখিত 'ফাতহুল বারী', ৯:৫৯৫; আল-আসকালানী প্রণীত 'তাহযীব আত তাহযীব', ৫:৩৪০ #৬৬১; আল-মিযযী কৃত 'তাহযীব আল-কামাল ফী আসমা' আল-রিজাল', ১৬:৩২ #৩৫২৩।

২৬৪. আল-মাকুদিসী লিখিত 'আল-আহাদীস আল-মুখতার', ৫:২০৫ #১৮৩২; আল-তাবারানী রচিত 'আল-মু'জাম আল-আওসাত', ১:২৯৮ #৯৯৪; আল-রুওয়াতী কৃত 'মুসনাদ আল-সাহাবা', ২:৩৮৬ #১৩৭১।

২৬৫. ইবনে আসাকির রচিত 'তারীখে দিমশক আল-কবীর', ৩:৩২; আল-হালাবী লিখিত 'ইনসান আল-উয়ুন ফী সীরা আল-আমীন আল-মা'মুন', ১:১২৮; আল-সুয়ুতী প্রণীত 'কিফা'য়াত আল-তা'লিহ আল-লাবীব ফী খাসা'ইস আল-হাবীব', ১:১৩৪।

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃদিয়াল্লাহু আনহু আরো বর্ণনা করেন:

أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ جَعَلَ لَهُ مَادَّةً يَوْمَ سَابِعَةٍ.

—হযর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (আকীক্বার) খাতিরে আবদুল মুত্তালিব সপ্তম দিবসে এক মেজবান খানার বন্দোবস্ত করেন।^{২৬৬}

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরনীতলে শুভাগমনের সপ্তম দিবসে তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক তাঁর পক্ষে আকীক্বা পালনের ব্যাপারে উলামাবৃন্দের মাঝে কোনো মতপার্থক্য নেই। হাদীসের আলোকে আকীক্বা হলো শিশুর মুক্তির একটি মাধ্যম। তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আকীক্বা-ই চল্লিশ বছর পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছিলেন? সামরা বিন জুনদুব রাঃদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান:

الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ.

—কোনো শিশু তার আকীক্বা দ্বারাই মুক্তি লাভ করে। (তাই) তার পক্ষে সপ্তম দিবসে একটি কুরবানী দেয়া উচিত।^{২৬৭}

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নুবুওয়্যত প্রকাশের পর কোন্ আকীক্বা পালন করেছিলেন? যেহেতু আকীক্বা দু বার পালন করা হয় না, সেহেতু এক্ষেত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বেলাদত উপলক্ষে খুশি প্রকাশের উদ্দেশ্যে

২৬৬. ইবনে আবদ আল-বার্ কৃত ‘আল-তামহীদ লিমা ফীল মুওয়াত্তা মিনাল মা’আনী ওয়াল-আসানীদ’, ২১:৬১; ইবনে আবদ আল-বার রচিত ‘আল-ইত্তিআব ফী মা’রিফা আল-আসহাব’, ১:৫১; ইবনে হিব্বান প্রণীত ‘আল-সিকাত’, ১:৪২; আল-কুরত্বী লিখিত ‘আল-জামে’ লি-আহকামিল কুরআন’, ২:১০০; এবং ইবনে আল-ক্বাইয়্যেম কৃত ‘যা’দ আল-মা’আদ ফী হুদা’ খায়র আল-‘এবাদ’, ১:৮১।

২৬৭. আল-তিরমিযী রচিত ‘আল-জামে’ আল-সহীহ: কিতাব আল-আদা’হী’ (পশু কুরবানী পুস্তক), ‘আকীক্বা’ অধ্যায়, ৪:১০১ #১৫২২; আবু দাউদ কৃত ‘আল-সুনান’: কিতাব আল-দাহা’ইয়্যা (পশু কুরবানীর বই), ‘আকীক্বা’ অধ্যায়, ৩:১০৬ #২৮০৭; ইবনে মা’জাহ লিখিত ‘আল-সুনান’: ‘কিতাব আল-যাবা’ইহ্ (পশু জবাই-সংক্রান্ত পুস্তক), ‘আকীক্বা’ অধ্যায়, ২:১০৫৬ #৩১৬৫।

একটি পশু কুরবানী করেন; সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্যে তিনি একটি মেজবান খাওয়ানোর আয়োজন করেন। কিছু লোক হয়তো বলতে পারেন, এটা ছিলো শ্রেফ একখানি আকীক্বা যা তিনি পালন করেছিলেন। আমাদের যদি এটাকে আকীক্বা হিসেবে ধরতেই হয়, তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়: আকীক্বা মানে কী? বস্তুতঃ এই আকীক্বা আপনাআপনি-ই কোনো শিশুর জন্মোপলক্ষে খুশি প্রকাশ ও (আল্লাহর প্রতি) শোকরিয়া/কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকে বুঝায়। এটাকে কেউ যে নামে ডাকতে চান ডাকতে পারেন, তবে বিষয়বস্তু একই থাকবে; অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তির জন্মোপলক্ষে খুশি প্রকাশ করা।

ইমাম জালালউদ্দীন সুয়ূতী (৮৪৯-৯১১ হিজরী) তাঁর লেখা ‘হসনু আল-মাকসিদ ফী ‘আমল আল-মীলাদ’ পুস্তকের ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠায় হাফেয ইবনে হাজর আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিজরী) প্রদত্ত প্রামাণ্য দলিলের সমর্থনে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈধতার পক্ষে নিজস্ব একটি মজবুত দলিল পেশ করেন; তিনি লিখেন:

وَقَدْ ظَهَرَ لِي تَحَرُّيْهِ عَلَى أَصْلِ آخَرٍ، وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النَّبُوَّةِ «مَعَ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ أَنَّ جَدَّهُ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ عَقَّ عَنْهُ فِي سَابِعٍ وَلَادَتِهِ، وَالْعَقِيقَةُ لَا تُعَادُ مَرَّةً ثَانِيَةً، فَيَحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِظْهَارُ الشُّكْرِ عَلَى إِجَادِ اللَّهِ إِيَّاهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَتَشْرِيْعٌ لِأُمَّتِهِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي عَلَى نَفْسِهِ لِذَلِكَ، فَيُسْتَحَبُّ لَنَا أَيْضًا إِظْهَارُ الشُّكْرِ بِمَوْلِدِهِ بِالْاجْتِمَاعِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ وَجُوهِ الْقُرْبَاتِ وَإِظْهَارِ الْمَسَرَاتِ،

—(এর উদযাপনের) আরেকটি ভিত্তি আলোতে এসেছে, যা বর্ণনা করেছেন ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সাহাবী হযরত আনাস রাঃদিয়াল্লাহু আনহু হতে; তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নুবুওয়্যত ঘোষণা করার পরে নিজের জন্যে একটি আকীক্বা করেন, যদিও (বাস্তব) ঘটনা হলো তাঁর দাদা ‘আবদুল মুত্তালিব তাঁরই বেলাদত তথা

ধরনীতলে শুভাগমনের সপ্তম দিবসে তাঁর পক্ষে একটি আকীক্বা পালন করেছিলেন। আকীক্বা দ্বিতীয়বার পালন করা হয় না। এ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিশ্বজগতের জন্যে খোদায়ী রহমত/করণা ও উম্মতের জন্যে মহাসম্মান হিসেবে প্রেরণের খাতিরে তিনি আল্লাহ তা‘আলার প্রতি কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশস্বরূপ ওই আমলটি পালন করেন। অতএব, আমাদের জন্যে এটা প্রশংসনীয় হবে যে আমরা-ও নিজেদের কৃতজ্ঞতা ও খুশি প্রকাশের উদ্দেশ্যে সমবেত হই, খাদ্য বিতরণ করি এবং অনুরূপ ভক্তিমূলক/পুণ্যদায়ক কাজ করি।^{২৬৮}

ইমাম জালালউদ্দীন সুয়ূতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) স্বয়ং এই প্রশ্নটি অন্তরে পোষণ করেন এবং এর উত্তরে বলেন যে, বাস্তবে এটা কোনো আকীক্বা ছিলো না। এমনকি মূল লিপিতেও যদি এ কথা বিবৃত হয় যে আকীক্বা পালিত হয়েছিলো, তবুও আমাদের বুঝতে হবে যে, শব্দটির পারিভাষিক অর্থ এতে উহ্য নেই। এর সহজ মানে হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করতে একটি পশু কুরবানী করা হয়েছিলো। এটার কারণ ছিলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা আবদুল মুত্তালিব ইতিমধ্যেই তাঁর নাতির বেলাদতের সপ্তম দিবসে আকীক্বা করেছিলেন। ইমাম জালালউদ্দীন সুয়ূতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর কথার সপক্ষে যুক্তিস্বরূপ বিবৃত করেন যে, আকীক্বা জীবনে স্রেফ একবারই পালন করা হয়, দু বার নয়।

কেউ হয়তো আপত্তি করতে পারেন এ কথা বলে, ‘আমরা যদি ধরেও নেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা তাঁর পক্ষে আকীক্বা পালন করেছিলেন, তথাপিও আমরা তা গ্রহণ করতে পারি না; কেননা তা আইয়ামে জাহেলীয়াত তথা অন্ধকার যুগে পালিত হয়েছিলো। এই কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দ্বিতীয় দফা পালন করেন।’ বস্তুতঃ এই

২৬৮. আস্-সুয়ূতী প্রণীত ‘হুসনু আল-মাকসিদ ফী ‘আমল আল-মওলিদ’, ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা; আস্-সুয়ূতী কৃত ‘আল-হাউয়ী লি আল-ফাতাওয়া’, ২০৬ পৃষ্ঠা; আস-সালেহী রচিত ‘সুবুল আল-হুদা ওয়া আল-রাশাদ ফী সীরা খায়র আল-‘এবাদ’, ১:৩৬৭; আল-যুরকানী লিখিত ‘শরহে আল-মাওয়াহিব আল-লাদুনিয়া বি আল-মিনাহ আল-মুহাম্মাদীয়া’, ১:২৬৩-২৬৪; আল-নাবাহানী প্রণীত ‘হুজাত আল্লাহ ‘আলাল আলামীন ফী মুজযাত সাইয়েদ আল-মুরসালীন’, ২৩৭ পৃষ্ঠা।

আপত্তির কোনো বৈধ ভিত্তি নেই। যদি তা বৈধ হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর স্ত্রী হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়েও বৈধ নয় বলে আমাদের স্বীকার করতে হতো। এই বিয়ের মহরানা আবু তালেব পরিশোধ করেন। আকীক্বা স্রেফ দান-সদকাহ’রই একটি আমল, অপর দিকে বিয়ে হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী দু জনের মাঝে একটি চুক্তিনামা। এই আপত্তি যদি সঠিক হতো, তাহলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মধ্যকার বৈবাহিক চুক্তিনামাও পুনরায় নবায়ন করতে হতো, আর এর পাশাপাশি মহরানাও নির্ধারণ করতে হতো। এই আপত্তি অগ্রাহ্য করার কারণ হলো, অন্ধকার যুগে ঘটে যাওয়া যে-কোনো অনুমতিপ্রাপ্ত কাজ শরীয়তে গৃহীত। শরীয়তের বিধি-নিষেধ বলবৎ হয় কেবল তা প্রকাশ হওয়ার পরই। “(এই আদেশের) আগে যা হয়ে গিয়েছে (তা মাফ)” মর্মে সূরা নিসা’র (২২নং) আয়াত অনুযায়ী, ইসলাম ধর্মে অন্ধকার যুগের যে-কোনো ভুল কাজকে ক্ষমা করা হয়েছে। এধরনের প্রত্যেকটি পাপ/ভুল হতে আলাদাভাবে তাওবা (অনুতাপ প্রকাশ) করার কোনো প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে, ওই সময় সংঘটিত সকল প্রশংসনীয় কাজ, যেমন বিয়ে-শাদী, আকীক্বা, শপথ ইত্যাদি বহাল আছে এবং সেগুলো বাতিল হয়নি। একারণেই ইমাম সুয়ূতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বিবৃত করেন যে, শরীয়তে কোনো বৈধ প্রয়োজনীয়তা না থাকার দরুন আকীক্বা দু বার করার দরকার নেই। অতএব, এই গোটা আলোচনা থেকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নুবুওয়্যত ঘোষণার পর নিজের বেলাদত উপলক্ষে খুশি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি পশু কুরবানী করেছিলেন।

৫.৯ মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এ খুশী প্রকাশে কাফিরের শাস্তি লাঘব হওয়া

উপরে পেশকৃত প্রামাণিক দলিল হতে এটা স্পষ্ট যে, মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করা আল্লাহ তা‘আলা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর মহৎ সাহাবাবুন্দ রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর সুনাত। এই কারণে মুহাদ্দেসীনে কেরাম রহমাতুল্লাহি আলাইহিম ও

আউলিয়া-দরবেশ রহমাতুল্লাহি আলাইহিমবন্দ এটার গুণাবলী ও ফায়দাগুলোর উপর আলোকপাত করেছেন, যেমনটি সীরাহ ও ইতিহাসের বিভিন্ন বইপত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিজরী) তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থের ‘কিতাব আল-নিকা’হ’ অধ্যায়ে একটি বিখ্যাত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তবে এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনার আগে কোনো অবিশ্বাসী পরকালে তার কর্মফলের দ্বারা উপকার পায় না মর্মে কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের (উলামাদের) এজমা’ তথা ঐকমত্য হতে গৃহীত একটি মূলনীতিকে প্রতিষ্ঠা করা জরুরি হবে: অর্থাৎ, তার সৎকর্মের কোনো প্রতিদান নেই, আর তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। তার সৎকর্মের প্রতিদান এ জগতেই সে পাবে।^{২৬৯}

২৬৯. ইমাম আসকালানী প্রণীত ‘ফাতহুল বারী’, ৯:১৪৫; আল-আইনী কৃত ‘উমদাত আল-কুরারী শরহে সহীহ আল-বুখারী’, ২০:৯৫।

১. এ সম্পর্কে আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে: **مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، وَأُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا** (আল-বাক্বা: ২০)। অর্থ: **যারা দুনিয়ায় জীবন ও সৌন্দর্য (ও সাজসজ্জা) অন্বেষণ করে, আমরা তাদের আমলের পুরোপুরি প্রতিদান এ দুনিয়াতেই দিয়ে দেই এবং তাদেরকে এতে (এ দুনিয়ার দানে) কিছুই কমাবো না। এরা এসব লোক যাদের জন্যে পরকালে (জাহান্নামের) আগুন ব্যতীত (প্রাপ্ত অংশ) কিছুই নেই। আর এসব (আমল তাদের পরকালীন প্রতিদানের হিসাব থেকে) নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে, যা তারা দুনিয়াতে করেছিল। আর সে (সব)-গুলো বাতিল ও অকেজো হয়ে গিয়েছে, যা তারা করতো। (কেননা তাদের হিসাব পূর্ণ প্রতিদানের সাথে দুনিয়াতেই চুকিয়ে দেয়া হয়েছে, আর পরকালের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট নেই)। (আল কুরআন: সূরা হূদ, ১১:১৫-১৬)।**

২. অন্যত্র এরশাদ হয়েছে: **وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُتُوءًا حَسْبَاهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ** (আল-আরাক: ৮১)। অর্থ: **যারা কফর করে, তাদের আমল বিরাণ ভূমির মরীচিকাসম, যাকে পিপাসার্ত লোক পানি মনে করে, অবশেষে যখন সে এর নিকট আসে তখন তাতে কিছু(ই) পায় না। (এভাবে সে পরকালে) আল্লাহকে নিজের নিকট পাবে, কিন্তু আল্লাহ তার পূর্ণ হিসাব (দুনিয়াতেই) চুকিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ শীঘ্রই হিসাব নিবেন। (আল কুরআন: সূরা নূর- ২৪:৩৯)।**

৩. আরো এরশাদ হয়েছে: **وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ اللَّهُ بِهِمْ ذَلِكَ لَكُنَّ عَالًا بَدَارًا لِّلْآخِرَةِ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ اللَّهُ بِهِمْ ذَلِكَ لَكُنَّ عَالًا بَدَارًا لِّلْآخِرَةِ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ اللَّهُ بِهِمْ ذَلِكَ لَكُنَّ عَالًا بَدَارًا لِّلْآخِرَةِ** (আল-আরাক: ৮১)। অর্থ: **আরো এরশাদ হয়েছে: (আবার) সেসব আমলমুখী হবো যা তারা (নিজেদের ধারণা অনুযায়ী জীবনে) সম্পাদন করেছে। অতঃপর আমরা তাকে পরিণত করবো ছড়ানো বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায়। (আল কুরআন: সূরা ফুরকান, ২৫:২৩)।**

পরকালে প্রতিদানের সুবিধা শ্রেফ মুসলমানদেরই প্রাপ্য হবে, কেননা তাঁরাই আল্লাহ তা’আলার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন করেছেন (মানে ঈমান এনেছেন)।

পরকালে নেক আমলের জন্য প্রতিদান পাবে শুধু ঈমানদার মুসলমানরাই। কারণ, আল্লাহর কাছ থেকে আমলের প্রতিদান পাওয়ার কারণ হচ্ছে ঈমান।^{২৭০}

চলুন, এবার আমরা ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর সেই রওয়াযাত বা বর্ণনার দিকে দৃষ্টিপাত করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাদের মধ্যে একজন, আবু লাহাব, যে অবিশ্বাসী হিসেবে মারা গিয়েছিলো, তার কথা এতে উল্লেখিত আছে। আবু লাহাব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমন উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করেছিলো; আর এরই ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা’আলা তাকে পরলোকে ফায়দা দান করেন, যদিও সে দ্বীন-ইসলামের সবচেয়ে বড় একজন শত্রু ছিলো। এই ব্যক্তি এমন-ই চরমভাবে লানত/অভিসম্পাতপ্রাপ্ত যে কুরআন মজীদে একটি (গোটা) সূরা তারই সম্পর্কে নাযেল হয়েছে:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۚ سَيَصْلَىٰ نَارًا ۖ ذَاتَ لَهَبٍ ۚ

২৭০. এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে: **يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ** (আল-আরাক: ৮১)। অর্থ: **যারা ঈমানদারদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। (আল কুরআন: সূরা আলে ইমরান, ৩:১৭১-১৭২)।**

২. অন্যত্র এরশাদ হয়েছে: **وَلَا تُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، وَلَٰجَرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ** (আল-আরাক: ৮১)। অর্থ: **আমরা নেককারদের প্রতিদান নষ্ট করি না। আর অবশ্যই পরকালের প্রতিদান সেসব লোকদের জন্যে উত্তম যারা ঈমান আনয়ন করে এবং খোদাতীতির পথে পদার্পণকারী। (আল কুরআন: সূরা ইউসুফ, ১২:৫৬-৫৭)।**

৩. আরো এরশাদ হয়েছে: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۚ** (আল-আরাক: ৮১)। অর্থ: **নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, অবশ্যই আমরা তার আমল বিনষ্ট করি না, যে সৎকর্ম করে। (আল কুরআন: সূরা কাহাফ, ১৮:৩০)।**

৪. আরো এরশাদ হয়েছে: **وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ** (আল-আরাক: ৮১)। অর্থ: **উত্তম পরিণতি পরহেযগারদের জন্যেই। (আল কুরআন: সূরা আ’রাফ, ৭:১২৮/ আল কুরআন: সূরা ক্বাসাস, ২৮:৮৩)। এবং ‘পরকালের শুভ-পরিণাম খোদাতীফদেরই’।**

—ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হস্ত এবং সে ধ্বংস হোক (সে, যে আমাদের হাবীবের দিকে আঙ্গুলি বাড়ানোর চেষ্টা করেছে)! তার (উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত) সম্পদ এবং তার অর্জিত সম্পত্তি কোন কাজে আসেনি। অচিরেই সে প্রবেশ করবে প্রজ্জ্বলিত লেলিহান অগ্নিতে।^{২৭১}

এই বিখ্যাত ঘটনাটি ঘটেছিলো হযরত আবু লাহাবের এক দাসী মা আমিনা^{২৭২}র ডেলিভারীর সময় তাঁর খেদমতে ছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত শরীফ হলে পরে সুওয়াইবিয়া দৌড়ে আবু লাহাবের কাছে তার ভাতিজার বেলাদতের সুখবরটি পৌঁছে দিতে যান। এই খোশ-খবরী শুনে আবু লাহাব আনন্দে আপ্ত হয়ে এবং তার দুই আঙ্গুলের ইশারায় সুওয়াইবিয়াকে (দাসত্ব থেকে) মুক্ত করে দেয়।

দ্বীন-ইসলাম (ইসলাম ধর্ম) গ্রহণ না করে আবু লাহাব মারা যাওয়ার পরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস রাডিয়াল্লাহু আনহু তাকে স্বপ্নে দেখেন এবং তার অবস্থা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করেন। সে উত্তর দেয় যে, রাত-দিন তাকে শাস্তি পেতে হয়। তবে সোমবার দিনগুলোতে তার শাস্তি লাঘব হয় এবং তার আঙ্গুলগুলো হতে তার জন্যে স্বস্তিদায়ক পানি নির্গত হয়। সোমবার দিনগুলোতে শাস্তি লাঘবের কারণ হলো, ওই দিন তার ভাতিজা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরণীতলে শুভাগমনের সুসংবাদ শুনে সে আনন্দিত হয়ে ওই সুখবর বয়ে আনা দাসী সুওয়াইবিয়াকে দুই আঙ্গুলের ইশারায় মুক্ত করে দিয়েছিলো।

এই ঘটনা বর্ণনা করেন হযরত যাইনাব বিনতে আবী সালামা রাডিয়াল্লাহু আনহা, আর অনেক মুহাদ্দেসীন উলামা এটা রওয়ায়াত করেন। ইমাম বুখারী রাডিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ‘আল-সহীহ’ পুস্তকে বর্ণনা করেন:

فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حَبِيَّةٍ قَالَتْ لَهُ مَاذَا لَقِيتَ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَيِّ سَقِيئَةٍ فِي هَذِهِ بَعَثَاقِي تُؤَيَّبَةُ.

—আবু লাহাব যখন মারা যায়, তখন তার পরিবারসদস্যদের কেউ কেউ তাকে (স্বপ্নে) কঠিন মসীবতে দেখতে পান। তারা তাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘তোমার কী পরিণতি হয়েছে?’ আবু লাহাব উত্তর দেয়, ‘তোমাদের ছেড়ে আসার পর আমার কোনো ভালাই হয়নি, স্রেফ (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত উপলক্ষে আনন্দিত হওয়ার সূত্রে আঙ্গুলের ইশারায়) সুয়াইবিয়াকে মুক্ত করে দেয়ার কর্মের দরুন আমার তেষ্ঠা (পানি দ্বারা) মেটানো হয়’।^{২৭২}

উপরের রওয়ায়াত/বর্ণনাটি যদিও ‘মুরসাল’ (নিচে ‘নোট’ দেখুন), তবুও এটা গৃহীত; কেননা এর বর্ণনাকারী ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিজরী) নিজ ‘সহীহ’ গ্রন্থে এটা লিপিবদ্ধ করেছেন। আর অনেক মুহাদ্দেসীন উলামা এর উপর নির্ভর করেছেন, যা এর নির্ভরযোগ্যতার সাক্ষ্য বহন করছে। উপরন্তু, এই বর্ণনাটি হালাল (বৈধ) বা হারাম (অবৈধ)-সম্পর্কিত নয়; বরঞ্চ এর বিষয়বস্তু ধর্মীয় ফযীলত তথা পুণ্য-সংক্রান্ত। পুণ্য-সংক্রান্ত বিষয়গুলো নির্ধারণের মানদণ্ড হতে হালাল-হারাম বিষয়গুলো প্রমাণের

২৭২. আল-বুখারী প্রণীত ‘সহীহ বুখারী’: ‘কিতাব আল-নিকাহ’ (বিয়ে-শাদীর পুস্তক), ‘এবং আপনার লালন-পালনকারিনী মায়েরা’ শীর্ষক অধ্যায়, ৫:১৯৬১ #৪৮১৩; আবদুর রায়যাকু কৃত ‘আল-মুসান্নাফ’, ৭:৪৭৮ #১৩,৯৫৫; আবদুর রায়যাকু লিখিত ‘আল-মুসান্নাফ’, ৯:২৬ #১৬,৩৫০; আল-মারুফী রচিত ‘আল-সুন্নাহ’, ৮২ পৃষ্ঠা #২৯০; আল-বায়হাকী প্রণীত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৭:১৬২ #১৩,৭০১; আল-বায়হাকী রচিত ‘শু’আব আল-ঈমান’, ১:২৬১ #২৮১; আল-বায়হাকী লিখিত ‘দালায়েল আল-নবুওয়া ওয়া মা’রেফা আহওয়াল সাহেব আল-শরীয়া’(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), ১:১৪৯; ইবনে সাআদ কৃত ‘আল-তাবাকাত আল-কুবরা’, ১:১০৮; ইবনে আবী দুনইয়া নিজ প্রণীত ‘কিতাব আল-মানা’মাত’, ১৫৪ পৃষ্ঠা, #২৬৩ পুস্তকে ‘হাসান’ এসনাদে এটা বর্ণনা করেন; আল-বাগাবী রচিত ‘শরহে সুন্নাহ’ ৯:৭৬ #২২৮২; ইবনে জাওযী লিখিত ‘সাফওয়া আল-সাফওয়া’, ১:৬২; আল-সুহায়লী কৃত ‘আল-রওদ আল-উনুফ ফী তাফসীর আল সীরা’ আল-নববীয়া লি ইবনে হিশাম’, ৩:৯৮-৯৯; আল-যায়লাঈ প্রণীত ‘নসব আল-রা’য়া লি-আহাদীস আল-হিদায়া’, ৩:১৬৮; ইবনে আসা’কির রচিত ‘তারীখে দিমশক আল-কবীর’ ৬৭:১৭১-৭২; ইবনে কাসীর লিখিত ‘আল-বেদায়া ওয়াল-নেহায়া’, ২:২২৯-২৩০; আল-আসকালানী কৃত ‘ফাতহুল বারী’, ৯:১৪৫; আল-আইনী প্রণীত ‘উমদাত আল-কুরী শরহে সহীহ আল-বুখারী’, ২০:৯৫; আল-শায়বানী রচিত ‘হাদায়েক আল-আনওয়ার’, ১:১০৪; আল-আমিরী লিখিত ‘শরহে বাহজাত আল-মাহাফিল’, ১:৪১; আনওয়ার শাহ কাশমিরী কৃত ‘ফায়দ আল-বারী আলা সহীহ আল-বুখারী’, ৪:২৭৮।

জন্যে প্রয়োজনীয় মানদণ্ডের পার্থক্য সম্পর্কে উলামাবৃন্দ সম্যক অবগত।^{২৭৩}

এই রওয়ানাত (মানে আবু লাহাবের ঘটনার বর্ণনা)-কে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের পক্ষে দলিল হিসেবে যেসকল

২৭৩. নোট: উসূলে হাদীস তথা হাদীস-মৌলনীতিবিষয়ক শাস্ত্রে ‘মুরসাল’ হচ্ছে এমন হাদীস যার সনদ (পরম্পরা) তাবেঈ তথা সাহাবাবৃন্দের পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত ফেরত পৌঁছেছে; কিন্তু এই সনদে সাহাবাবৃন্দের নামের উল্লেখ নেই (আল-যাহাবী রচিত ‘আল-মু’ক্বিয়া, ৩৮ পৃষ্ঠা; ইবনে কাসীর প্রণীত ‘আল-বায়েস্ আল-হাসীস’, ৪৮ পৃষ্ঠা; ইবনে হাজার আসক্বালানী কৃত ‘শরহে নুখবা আল-ফিকর’, ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা; এবং আল-সাখাভী লিখিত ‘আল-গায়্যা ফী শরহে আল-হেদায়া’, ১:২৭২)। এব্যাপারে সিদ্ধান্ত হলো, কোনো কর্তৃত্বশীল তাবেঈর কাছে ফেরত গিয়ে যদি বর্ণনার সনদ শেষ হয়, তাহলে তা দলিল হিসেবে গৃহীত হবে (আল-যাহাবী, ‘আল-মু’ক্বিয়া’, ৩৯ পৃষ্ঠা)। মযহাবের তিন ইমাম, যথা সর্ব-ইমাম আবু হানীফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), মালেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ও আহমদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এবং মুহাদ্দেসীন উলামাবৃন্দের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী মুরসাল হাদীস গৃহীত হওয়ার শর্ত এই যে, যিনি এটা সাহাবী (রাঈয়াল্লাহু আনহু)-এর নাম বাদ দিয়ে বর্ণনা করেন, তাঁকে নির্ভরযোগ্য হতে হবে এবং যাঁর (অর্থাৎ, যে সাহাবীর) কাছ থেকে তিনি এটা গ্রহণ করেছেন, তাঁকেও নির্ভরযোগ্য হতে হবে (আল-সাখাভী, ‘আল-গায়্যা ফী শরহে আল-হেদায়া’, ১:২৭৩; ইবনে কাসীর, ‘আল-বায়েস্ আল-হাসীস’, ৪৮ পৃষ্ঠা; এবং আবদুল হক্ক মুহাদ্দিসে দেহেলভী, ‘মুক্বাদ্দেমা ফী উসূলিল হাদীস’, ৪২-৪৩ পৃষ্ঠা)। তাঁদের (মুহাদ্দেসীনের) প্রমাণ হচ্ছে কোনো তাবেঈর সম্পৃক্ততা এখানে নিশ্চিত হওয়াটা, আর তাবেঈ একথা বলবেন না, ‘রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন’, কিংবা ‘মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করেছেন’, অথবা ‘হযূরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিতিতে এই ঘটনা ঘটেছিলো’, যতোক্ষণ না তাঁরা (মুহাদ্দেসীন) এটা কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর কাছ থেকে প্রাপ্ত হন। ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর ‘নুযহা আল-নযর বি-শরহে নুখবা আল-ফিকর’ (৩৭ পৃষ্ঠা) গ্রন্থে লেখেন: “ইমাম আহমদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর একটি বক্তব্য এবং মালেকী ও হানাফী মযহাবের (অন্তর্ভুক্ত) ইমামমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক এটা নিঃশর্তভাবে গৃহীত। ইমাম শাফেঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর দৃষ্টিতে তা যদি অন্য আরেকটি সনদে সমর্থিত হয় সেটা সংযুক্ত হোক বা মুরসালই হোক তাহলে তা গৃহীত হবে।” মোল্লা আলী ক্বারী (ইন্তেক্বাল: ১০১৪ হিজরী) নিজ ‘শরহে শরহে নুখবা আল-ফিকর’ পুস্তকে বলেন: “ইবনে জরীর তাবারী বর্ণনা করেন যে তাবেঈদের মাঝে এটা গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে এজমা’ তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে বা ২০০ হিজরী পর্যন্ত তাঁদের পরবর্তী সময়ে আগত ইমামবৃন্দের কাছ থেকেও এর অগ্রহণযোগ্যতার পক্ষে কোনো বর্ণনা নেই। আর তাঁরা হলেন সেরা প্রজন্মসমূহ, যাঁদের ধার্মিকতা সম্পর্কে (স্বয়ং) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ই সাক্ষ্য দিয়েছেন।”।

উলামা-এ-কেরাম গ্রহণ করেছেন, নিম্নে তাঁদের ফতোয়াসমূহের একটি সংকলন পেশ করা হলো:

১. হাফেয শামস উদ্দীন মুহাম্মদ বিন আদিল্লাহ আল-জাযারী (জন্ম: ৬৬০ হিজরী) যিনি ‘উরফ আল-তা’রীফ বিল-মীলাদ আল-শরীফ’ গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি লিখেন:

فَإِذَا كَانَ أَبُو لَهَبٍ الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ جُوزِيَ فِي النَّارِ بِفَرْجِهِ لَيْلَةً مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ، فَمَا حَالَ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِّدِ مِنْ أَمَّةٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُرُّ بِمَوْلِيهِ وَيَبْذُلُ مَا نَصَلَ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي حُبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لَعَمْرِي إِنَّمَا يَكُونُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَنْ يُدْخِلَهُ بِفَضْلِهِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ.

-অবিশ্বাসী আবু লাহাব যার শাস্তির বর্ণনায় কুরআন মজীদে (সূরা) নায়েল/অবতীর্ণ হয়েছে, সে যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত শরীফের রাতে খুশি প্রকাশের কারণে স্বস্তি পেতে পারে, তাহলে ওই মুসলিমের কী অবস্থা হবে যিনি আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনকারী ও উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদস্য হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত শরীফে খুশি প্রকাশ করেন এবং তাঁরই মহব্বতে আপন সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করেন? আমার জীবনের শপথ, তাঁর পুরস্কার রয়েছে পরম করুণাময় আল্লাহরই তরফ থেকে, আর তিনি আল্লাহরই অনুগ্রহে বেহেশতের বাগানে প্রবেশ করবেন।^{২৭৪}

২৭৪. আস-সুয়ূতী, ‘আল-হাওয়া লিল-ফাতাওয়া’, ২০৬ পৃষ্ঠা; আস-সুয়ূতী, ‘হুসনু আল-মাক্বসিদ ফী আমল আল-মওলিদ’, ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা; আল-কসতলানী, ‘আল-মাওয়াহিব আল-লাদুনিয়া বিল-মিনাহ আল-মুহাম্মদিয়া’, ১:১৪৭; আল-যুফ্বানী, ‘শরহ আল-মাওয়াহিব আল-লাদুনিয়া বিল-মিনাহ আল-মুহাম্মদিয়া’, ১:২৬০-২৬১; আস-সালেহী, ‘সুবুল আল-হুদা ওয়াল-রাশাদ ফী সীরাত খায়র আল-এবাদ’, ১:৩৬৬-৩৬৭; আল-নাবহানী, ‘হুজ্জাত আল্লাহ আলাল-আলামীন ফী মু’জাযাত সাঈয়েদ আল-মুরসালীন’, ২৩৭-২৩৮ পৃষ্ঠা।

২. হাফেয শামস উদ্দীন মুহাম্মদ বিন নাসির উদ্দীন আল-দিমাশকী (৭৭৭-৮৪২ হিজরী) নিজ ‘মওরিদ আল-সাদী ফী মীলাদ আল-হাদী’ গ্রন্থে লিখেন:

قَدْ صَحَّ أَنَّ أَبَا لَهَبٍ يُخَفِّفُ عَنْهُ عَذَابَ النَّارِ فِي مِثْلِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ لِإِعْتَاقِهِ
تُؤْيِيَةُ سُورًا بِمِثْلِ الدَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—এটা সঠিক যে, আবু লাহাবের জন্যে দোযখের শাস্তি সোমবার দিনগুলোতে লাঘব করা হয়। কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত শরীফ উপলক্ষে খুশি হয়ে (ওই দিন) সে সুওয়াইবিয়াকে মুক্ত করে দিয়েছিলো।

এরপর লেখক এব্যাপারে কিছু দ্বিচরণ (কবিতা) বর্ণনা করেন:

إِذَا كَانَ هَذَا كَافِرٌ جَاءَ دُمُهُ وَتَبَّتْ يَدَاهُ فِي الْجَحِيمِ خُلْدًا
أَيُّ أَنَّهُ فِي يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ دَائِمًا يُخَفِّفُ عَنْهُ لِلْسُّورِ بِأَحْمَدًا
فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي طَوَّلَ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مَوْحَدًا

—এই অবিশ্বাসী, যার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ ভরসনাপূর্ণ ঐশীবাণী, জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত যার দুই পাণি, খুশি প্রকাশের ফলে নিরন্তর সোমবারে যার লাঘব হয় শাস্তি, তাহলে মহানবীর ওই গোলামের ভাগ্যে মঞ্জুর কতোই না স্বস্তি, মাহবুবের প্রতি সন্তুষ্টিসহ যাঁর হয়েছে বিশ্বাসীর বেসালপ্রাপ্তি।

৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দীসে দেহেলভী (৯৫৮-১০৫২ হিজরী) এই রওয়াযাতের ব্যাপারে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করতে লিখেন:

—এই বর্ণনা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের বৈধতা ও তাতে সর্বাঙ্গিক প্রয়াসের পক্ষে একটি (উৎকৃষ্ট) দলিল। আবু লাহাব, যার উদ্দেশ্যে নিন্দাসূচক কুরআনের একখানি সূরা নাযেল হয়েছে, তার যদি (হুযূরের বেলাদত উপলক্ষে খুশি প্রকাশার্থে) দাসীকে মুক্ত করে দেয়ার কারণে শাস্তি লাঘব হতে পারে, তবে ওই মুসলমান যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ উপলক্ষে খুশি হন এবং আপন সম্পদ ব্যয় করেন, তাঁর কী (শানদার) অবস্থা হবে? আর হ্যাঁ, অবৈধ নাচ-গানের (বা বর্তমানের ব্যান্ড সঙ্গীতের) মতো বেদআত (নতুন উদ্ভাবিত প্রথা) ও অন্যান্য হারাম কর্মকাণ্ড বর্জন করতে হবে; নতুবা এর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হবে।^{২৭৫}

৪. আবদুল হাই ফারাসী মহল্লী লাখনৌভী (১২৬৪-১৩০৪ হিজরী) লিখেন:

—অতএব, আবু লাহাবের মতো অবিশ্বাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করে যদি কম শাস্তি পেতে পারে, তাহলে যে মুসলমান হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদে খুশি প্রকাশ করেন এবং তাঁরই মহব্বতে নিজের সম্পদ ব্যয় করেন, তিনি কি কোনো পুরস্কার পাবেন না? একথা-ই ইবনে জাওয়াযী (৫১০-৫৭৯ হিজরী) ও আবদুল হক দেহেলভী (৯৫৮-১০৫২ হিজরী) লেখেছেন।^{২৭৬}

৫. রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী (মৃত্যু: ১৩৪১ হিজরী) লিখেন:

—আবু লাহাবের মতো দগ্ধিত অবিশ্বাসী যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদপূর্ণ বেলাদত/মীলাদ উপলক্ষে খুশি প্রকাশের কারণে কম শাস্তি পেতে পারে, তাহলে যে মুসলমান ওই উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করেন এবং (হুযূরের প্রতি) আপন মহব্বতের খাতিরে নিজ সম্পদ থেকে সামর্থ্যানুযায়ী ব্যয় করেন, তিনি কি কোনো পুরস্কার লাভ করবেন না?^{২৭৭}

সুওয়াইবিয়া’র মুক্তির এই ঘটনাটিকে দালিলিক প্রমাণ হিসেবে পেশ হতে এটা স্পষ্ট যে, এই রওয়াযাত/বর্ণনা সহীহ তথা নির্ভরযোগ্য বা বিশ্বস্ত। মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈধতার পক্ষে এটা একটা (অকাট্য) প্রমাণ্য দলিল-ও বটে।

২৭৫. আবদুল হক দেহেলভী, ‘মাদারিজ আল-নবুওয়া’, ২:১৯।

২৭৬. আবদুল হাই লাখনৌভী, ‘মজমু’আয়ে ফাতাওয়া’, ২:২৮২।

২৭৭. লুধিয়ানভী, ‘আহসান আল-ফাতাওয়া’, ১:৩৪৭-৩৪৮।

৫.৯.১ কেন এক কাফেরের শাস্তি লাঘব করা হয়েছে?

উপরে উপস্থাপিত বর্ণনা হতে এ প্রশ্নের উত্তর হতে পারে: কুরআন, হাদীস ও উম্মতের এজমা' তথা ঐকমত্য স্পষ্টভাবে যেখানে ব্যক্ত করেছে যে, কোনো অবিশ্বাসীরই (নেক) কর্ম পরলোকে পুরস্কৃত হবার নয়, সেখানে আবু লাহাবের শাস্তি লাঘব করা হয়েছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর হলো, কর্মটি যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সুনির্দিষ্টভাবে জড়িত, সেহেতু এটাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে: আবু লাহাব প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত (ধরাধামে শুভাগমন) উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করতেই দাসী সুয়াইবিয়াকে মুক্ত করে দিয়েছিলো; একারণেই আল্লাহ তা'আলা পরকালে শাস্তি লাঘব করে তার প্রতি দয়া করেছেন। এটা স্পষ্ট যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জড়িত কোনো উত্তম কর্ম কোনো অবিশ্বাসী সম্পাদন করলে তা পুরস্কারবিহীন রবে না।

প্রতি সোমবার আবু লাহাবের শাস্তি লাঘব হওয়াটা তার দ্বারা স্রেফ সুয়াইবিয়াকে মুক্ত করার কারণে হয়নি, বরঞ্চ তা একমাত্র তার দ্বারা হযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত উপলক্ষে খুশি প্রকাশের সুবাদেই হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা এটা দেখেন না যে, কে (নেক) কর্মটি করেছে, বরং দেখেন কার জন্যে করা হয়েছে। ওই কর্মটি আবু লাহাবের মতো অবিশ্বাসী করেছে, সেটা দেখার বিষয় নয়, বরঞ্চ আল্লাহ তা'আলার মহব্বত কেবলমাত্র তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই জন্যে (সুনির্দিষ্ট)।

এই বিষয়টিকে আরো প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যে মুহাদ্দীস তথা হাদীসশাস্ত্রের উলামাদের খোলাসা বয়ান নিচে পেশ করা হলো:

১. ইমাম আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হিজরী) নিজ 'শু'আব আল-ঈমান' গ্রন্থে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে খাস তথা সুনির্দিষ্ট এই বিষয়টি সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেন যে, এমনকি একজন অবিশ্বাসীও হযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আপন খেদমতের মাধ্যমে লাভবান হতে পারেন:

وَهَذَا أَيْضًا لِأَنَّ الْإِحْسَانَ كَانَ مَرْجِعُهُ إِلَى صَاحِبِ الثُّبُوتِ فَلَمْ يُضَيَّعْ.

—এবং উপরন্তু এই এহসান তথা দয়া/অনুগ্রহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে হওয়ার কারণে এটা বিফলে যায়নি।^{২৭৮}

২. ইমাম আল-বাগাভী (৪৩৬-৫১৬ হিজরী) লিখেন:

هَذَا خَاصٌّ لَهُ إِكْرَامًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই জন্যে সুনির্দিষ্ট; তাঁরই মহাসম্মানের খাতিরে কৃত।^{২৭৯}

৩. ইমাম সুহায়লী (৫০৮-৫৮১ হিজরী) একই মত পোষণ করে বলেন: আবু লাহাব বিবৃত করেছিলো,

قَالَ: مَا لَقِيتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً، غَيْرَ أَنِّي شَفِيتُ فِي مِثْلِ هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى التَّفَرَّةِ بَيْنَ السَّبَابَةِ وَالْإِبْهَامِ، بِعِتْقِي تَوْبَتَهُ، وَفِي غَيْرِ الْبُخَارِيِّ إِنَّ الَّذِي رَأَى مِنْ أَهْلِهِ هُوَ أَخُوهُ الْعَبَّاسُ، قَالَ: مَكَثْتُ حَوْلًا بَعْدَ مَوْتِ أَبِي لَهَبٍ لَا أَرَاهُ فِي نَوْمٍ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي شَرِّ حَالٍ، فَقَالَ: مَا لَقِيتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً إِلَّا أَنَّ الْعَذَابَ يُخَفَّفُ عَنِّي كُلَّ يَوْمٍ اثْنَيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَكَانَتْ تَوْبَتُهُ قَدْ بَشَّرَتْهُ بِمَوْلَاهُ، فَقَالَتْ لَهُ: أَشَعَرْتُ أَنَّ أَمَنَةً وَلَدْتُ غُلَامًا لِأَخِيكَ عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقُلْ لَهَا: إِذْهَبِي، فَأَنْتِ حِرَّةٌ، فَتَفَعُّهُ ذَلِكَ.

—‘তোমাদেরকে ছেড়ে আসার পর আমি কোনো স্বস্তি পাইনি, স্রেফ এ থেকে তেষ্ঠা মেটোনো ব্যতিরেকে’ সে একথা বলার সময় নিজের তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুলের মাঝখানটা দেখিয়েছিলো; সে আরো বলে, ‘এটা সুয়াইবিয়াকে মুক্ত করার কারণে হয়েছে।’ সহীহ আল-বুখারী ছাড়া অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত, তার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি তারই ভাই হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বর্ণনা করেন,

২৭৮. আল-বায়হাকী, ‘শু’আবুল ঈমান’, ১:২৬১ #২৮১।

২৭৯. আল-বাগাভী, ‘শরহে সুন্নাহ’, ৯:৭৬।

“পুরো একটি বছর অতিক্রান্ত হলেও আমি আবু লাহাবকে স্বপ্নে দেখিনি। অতঃপর আমি তাকে মসীবতে দেখতে পাই। সে বলে, ‘তোমাদের ছেড়ে আসার পর আমি কোনো স্বপ্তি পাইনি, শুধু সোমবার দিনগুলোতেই আমার শাস্তি লাঘব করা হয়।’ এটা এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবারে ধরণীতলে শুভাগমন করেন। সুয়াইবিয়া আবু লাহাবকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের সুসংবাদ এনে দেন একথা বলে, ‘আপনি কি জানেন আপনার ভ্রাতা আবদুল্লাহ’র ঔরসে এক পুত্র সন্তানের মা হয়েছেন আমিনা রাদিয়াল্লাহু আনহা?’ একথা শুনে আবু লাহাব তাকে বলে, ‘যাও, তুমি মুক্ত!’ এটাই (অর্থাৎ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেলাদতে খুশির এই অভিব্যক্তিটি) তার উপকারে আসে।^{২৮০}

৪. শীর্ষস্থানীয় তাফসীরকারক ইমাম আল-কুরতুবী (বেসাল: ৬৭১ হিজরী) লিখেন:

هَذَا التَّخْفِيفُ خَاصٌّ بِهَذَا وَبِمَنْ وَرَدَ النَّصُّ فِيهِ.

—এই (শাস্তি) লাঘব এক্ষেত্রেই খাস্ তথা সুনির্দিষ্টকৃত এবং তাদের ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট হবে যাদের কথা ধর্মশাস্ত্রলিপিতে উল্লেখিত হয়েছে।^{২৮১}

৫. সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকারী ইমাম আল-কিরমানী (৭১৭-৭৮৬ হিজরী) লিখেন:

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ الصَّالِحَ وَالْخَيْرُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالرُّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْصُوصًا مِنْ ذَلِكَ.

—মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট (কোনো অবিশ্বাসীর কৃত) নেক কর্মের সেই ক্ষেত্রবিশেষে সুনির্দিষ্ট (মানে খাস্) হওয়াটা সম্ভব।^{২৮২}

২৮০. আল-সুহায়লী, ‘আল-রওদ আল-উনুফ ফী তাফসীর আল-সীরাত আল-নববীয়া লি-ইবনে হিশাম’ম’, ৩:৯৮-৯৯।

২৮১. আল-আইনী, ‘উমদাত আল-কুরী শরহে সহীহ আল-বুখারী’, ২০:৯৫।

২৮২. আল-কিরমানী, ‘আল-কাওয়া’কিব আল-দারারী ফী শরহে সহীহ আল-বুখারী’, ১৯:৭৯।

৬. সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকারী ইমাম বদর উদ্দীন আল-আইনী (৭৬২-৮৫৫ হিজরী) লিখেন:

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْصُوصًا مِنْ ذَلِكَ.

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত যা-ই কিছু করা হোক না কেন, তা ওই ক্ষেত্রে খাস্ বা সুনির্দিষ্ট হওয়াটা সম্ভব।^{২৮৩}

৭. ইমাম জালালউদ্দীন সুয়ূতী (৮৪৯-৯১১ হিজরী) নিজ ‘হুসন আল-মাক্বসিদ ফী ‘আমল আল-মীলাদ’ ও ‘আল-হাউঈ লিল-ফাতা’ওয়া’ গ্রন্থ দুটোতে সুস্পষ্টভাবে এই অবস্থানের পক্ষ সমর্থন করেছেন।

৮. ইমাম আবদুর রাহমান বিন দাবী আল-শায়বানী (৮৬৬-৯৪৪ হিজরী) লিখেন:

فَتَخْفِيفُ الْعَذَابِ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ كَرَامَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—আবু লাহাবের শাস্তি লাঘব শ্রেফ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান-মানের ওয়াস্তে করা হয়েছিলো।^{২৮৪}

এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হতে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এমনকি আবু লাহাবের মতো কটর অবিশ্বাসী-ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত উপলক্ষে প্রকাশিত তার উদ্দেশ্যবিহীন খুশির কারণে পরলোকে শেষ বিচার দিবস অবধি পুরস্কৃত হয়েছে। যা একমাত্র সর্বোচ্চ মর্যাদাবান পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণেই কোনো অবিশ্বাসীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

২৮৩. আল-আইনী, ‘উমদাত আল-কুরী শরহে সহীহ আল-বুখারী’, ২০:৯৫।

২৮৪. আল-শায়বানী, ‘হাদা’য়েকু আল-আনওয়া’র’, ১:১৩৪।

৫.৯.২ একটি আপত্তি ও তার জবাব

উপরে উদ্ধৃত (আবু লাহাবের) বিবরণের ব্যাপারে কিছু লোক আপত্তি উত্থাপন করে বলে যে, এ ঘটনা স্বপ্নে ঘটেছিলো, আর ওই স্বপ্ন দেখার সময় হযরত আব্বাস রাঃরাঃ আনহু (তখনো) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি; অতএব, এটা ইসলামী শরীয়তে কেন বৈধতার ভিত্তি পারে? এই আপত্তির জবাব নিম্নরূপ:

প্রথমতঃ আমরা যখন মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের পক্ষে এই ঘটনাকে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করি, তখন আমরা আবু লাহাবের বক্তব্যকে আমাদের (বক্তব্যের) ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করি না, বরং আমাদের ভিত্তি হচ্ছে হযরত আব্বাস রাঃরাঃ আনহু-এর কথা বা বাণী।

দ্বিতীয়তঃ যদিও হযরত আব্বাস রাঃরাঃ আনহু-এর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিলো, তবুও এটাকে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা-ই নেই। কেননা হযরত আব্বাস রাঃরাঃ আনহু যখন এ ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন তিনি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, আর এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত-ই নেই। তিনি এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী বা সাথী হিসেবেই বর্ণনা করেন। সুতরাং এই রওয়ায়াত তথা বর্ণনার উপর নির্ভর করা যায়।

তৃতীয়তঃ এবং সর্বোপরি, ইমাম বুখারী'র (১৯৪-২৫৬ হিজরী) মতো (উচ্চপর্যায়ের) মুহাদ্দীস-আলেম তাঁর 'আল-সহীহ' গ্রন্থে এই বর্ণনাকে উদ্ধৃত করার দরুন এর চেয়ে উত্তম কর্তৃত্বসম্পন্ন ও গ্রহণযোগ্য প্রামাণ্য দলিল আর কী-ই বা হতে পারে? ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর মতানুসারে যদি এই রওয়ায়াত নির্ভরযোগ্য না হতো, তাহলে কেন তিনি এটাকে তাঁরই সহীহ হাদীসের সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করলেন? তিনি তো সরাসরি তা নাকচ করে দিতে পারতেন। ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ছাড়াও তাঁর শিক্ষক ইমাম আবদুর রাযযাক বিন হাম্মাম আল-সান'আনী (১২৬-২১১ হিজরী) এই রওয়ায়াত উদ্ধৃত করেন। ইমাম মারওয়াযী (২০২-২৯৪ হিজরী) 'আল-সুন্নাহ' গ্রন্থে এটা বর্ণনা করেন; ইমাম বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হিজরী) তাঁর তিনটি সংকলনে এটা বর্ণনা করেন: (ক) 'আল-সুনান আল-

কুবরা', (খ) 'শু'আব আল-ঈমান' ও (গ) 'দালায়েল আল-নুবুওয়ায়া ওয়া মা'রেফা আহওয়াল সা'হেব আল-শরীআ'; ইবনে কাসীর (৭০১-৭৭৪ হিজরী) এটাকে নিজ 'আল-বেদায়া ওয়াল-নেহায়া' গ্রন্থে উদ্ধৃত করে; ইবনে সা'আদ (১৬৮-২৩০ হিজরী) 'আল-তাবাকাত আল-কুবরা' পুস্তকে এটা বর্ণনা করেন; ইমাম আল-বাগাভী (৪৩৬-৫১২ হিজরী) এই বর্ণনা তাঁর 'শরহে আল-সুন্নাহ' কেতাবে উদ্ধৃত করেন; ইবনে জাওয়াযী (৫১০-৫৭৯ হিজরী) নিজ 'সাফওয়া আল-সাফওয়া' পুস্তকে এর উল্লেখ করেন; আল-সুহায়লী (৫০৮-৫৮১ হিজরী) 'আল-রওদ আল-উনুফ ফী তাফসীর আল-সীরা'হ আল-নববীয়া লি ইবনে হিশাম' গ্রন্থে এটা বর্ণনা করেন; এবং ইবনে আসা'কির (৪৯৯-৫৭১ হিজরী) 'তা'রীখ দিমাশক আল-কবীর' কিতাবে এর উল্লেখ করেন। এই বর্ণনা যদি সহীহ তথা বিশুদ্ধ/নির্ভরযোগ্য না হতো, আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদত/ধরাধামে শুভাগমন উপলক্ষে আবু লাহাবের প্রকাশিত খুশির কারণে তার (পারলৌকিক) শাস্তি লাঘব না হতো, তাহলে উপরোল্লিখিত উলামামণ্ডলী ও ধর্মীয় কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দ তাঁদের বইপত্রে (কখনোই) এটা বর্ণনা করতেন না। ইসলামী জ্ঞান বিশারদবৃন্দ শুধু এই রওয়ায়াত গ্রহণ-ই করেননি, বরং তাঁরা এর জ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পেশ করে এর উপর নির্ভরও করেছিলেন, যা আর বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রাখে না।

মোদ্দা কথা হলো, আমাদের দৃষ্টিতে এই বর্ণনা যে, হযরত আব্বাস রাঃরাঃ আনহু প্রদান করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তা লিপিবদ্ধ করেছেন আর অনেক মুহাদ্দীস-আলেম গ্রহণ করে নিয়েছেন, এটাই এর বিশুদ্ধতার ও নির্ভরযোগ্যতার প্রামাণ্য দলিল হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। এ থেকে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

৫.৯.৩ একটি সতর্কতামূলক উপদেশ

উপরে উল্লেখিত (আবু লাহাবের) ঘটনা হতে বাস্তবতা যা বেরিয়ে এসেছে তা হলো, কোনো কর্ম (তা এক মিনিটের জন্যে হলেও) যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতিরে করা হয়, তাহলে তা আল্লাহ

পাকের দৃষ্টিতে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, এমনকি যদি তা কোনো অবিশ্বাসী দ্বারাও সংঘটিত হয়ে থাকে। অপরদিকে, ঈমানদারবৃন্দকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এই মর্মে যে, এমনকি তাঁরা যদি সারা জীবন নেক তথা পুণ্যদায়ক আমল/কর্ম সম্পন্ন করেও থাকেন অথচ মহাসম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে সামান্যতম অশ্রদ্ধা প্রদর্শন বা বেয়াদবি করেন, তাহলে তাঁদের সমস্ত নেক-কর্ম শূন্যে পরিণত হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ.

—হে ঈমানদারবর্গ! তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর সম্মানিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কণ্ঠস্বরের উপর উঁচু কোরো না এবং তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরেও কথা বোলো না যে রূপ উচ্চস্বরে তোমরা একে অপরের সাথে কথা বোলো।^{২৮৫}

এই আয়াতে করীমায় আসহাব-এ-কেরাম রাহিয়াল্লাহু আনহুমবৃন্দকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেনো তাঁরা তাঁদের গলার স্বরকে নিচু রাখেন; আর একে অপরের সাথে তাঁরা যখন কথা বলেন, তখন যেনো তাঁদের কণ্ঠস্বর মহাসম্মানিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধুর কণ্ঠস্বরের চেয়ে উচ্চ আওয়াজের না হয়। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা-ই এখানে মহৎ সাহাবা-এ কেরাম রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমকে তাঁর মাহবুব তথা প্রেমাস্পদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা শিক্ষা দিচ্ছেন। আয়াতটি আরো ব্যক্ত করে যে, কেউ হুযূরে পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিজ আচরণে সতর্ক না হলে তার নিজের সতর্কবাণী মনে রাখা বাঞ্ছনীয়:

أَنْ تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

—(অন্যথায়) এতে তোমাদের (ঈমানসহ) সমস্ত আমলই নিষ্ফল হয়ে যাবে, অথচ তোমরা টেরও পাবে না (যে, তোমাদের ঈমান ও আমল ধ্বংস হয়ে গিয়েছে)।^{২৮৬}

এখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার একত্ব যেমন প্রত্যাখ্যাত হয়নি, তেমনি হয়নি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্যাহ-ও। আখেরাতে, নামায, রোযা, দান-সদকাহ কিংবা হজ্জ হতেও ঘটেনি বিচ্যুতি। এই সতর্কবাণী শ্রেফ মহাসম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কণ্ঠস্বর হতে কারোর নিজ গলার স্বর উঁচু করার একটিমাত্র (বেয়াদবিমূলক) কাজের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ঘাটতি থাকলে যে-কারো নেক আমল বরবাদ হয়ে যাবে।

এই আলোচনার আলোকে এটা জ্ঞাত হওয়া উচিত যে, একদিকে লক্ষ লক্ষ নেক আমল থাকা সত্ত্বেও অপরদিকে যদি সর্বাধিক সম্মানিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ন্যূনতম পরিমাণ বেয়াদবিমূলক কাজ-ও সংঘটিত হয়, তবে আখেরাতে জীবনে ওই গোস্তাখ ব্যক্তি সমস্ত নেক আমলের পুরস্কার হতে বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে, ইসলামের শত্রু ও আল্লাহর একত্ব অস্বীকারকারী কোনো অবিশ্বাসী সবচেয়ে মর্যাদাবান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদপূর্ণ বেলাদত তথা ধরণীতলে শুভাগমনের সম্মানে শ্রেফ একটি কর্ম সংঘটন করলে তাকে এই কাজের জন্যে আত্মার পাপমোচনমূলক জগতে এবং আখেরাতে পুরস্কৃত করা হবে। ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বলেন:

ثابت هو أنه جملة فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

—একথা প্রতিষ্ঠিত যে, সকল ফরয-কর্তব্য (মূলের) অনুষঙ্গ,

সব মূলের মূল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই প্রতি গোলামিপূর্ণ সঙ্গ।^{২৮৭}

কোনো মুসলমান-ব্যক্তির রেয়াযত-সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এশকু-মহব্বতের উপরই ভিত্তিশীল। তাঁর প্রতি অন্তরে কোনো ভালোবাসা না থাকলে সমস্ত নেক আমল পুরস্কারের অযোগ্য বলে আল্লাহ তা‘আলার কাছে বিবেচিত হবে। এই কারণেই আশেকু-ভক্ত পুণ্যাত্মাব্দ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবারে নিজেদের আর্জি পেশ করেন এই বলে:

ای کریمی که آرزو خانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری
دوستان را کجائی محروم تو که بادشمن این نظر داری

—হে মহত্ত্বের প্রতীক, আপনার বদান্যতা এতো বিশাল,
কেউই তৃষ্ণার্ত রয় না হতে আপনার দরাজ দিল,
আপনার আশীর্বাদপূর্ণ নজর হতে কীভাবে আশেকু রয় বঞ্চিত,
যবে এমন কি শত্রুকেও আপনি রাখেন না গরিবিতে অধঃপতিত।^{২৮৮}

এই অধ্যায় হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদযাপন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কর্ম দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনকে স্মরণ করা শরীয়ত-বিরোধী কোনো বিষয় নয়; বরঞ্চ তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়। বস্তুতঃ এটা ইসলাম ধর্মের একটি আবশ্যিক দাবি। এর আশীর্বাদ হতে এমনকি অবিশ্বাসীরাও বঞ্চিত নয়। অতএব, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত উপলক্ষে উম্মতের কোনো পাপী সদস্য যদি খুশি প্রকাশ করেন, তাহলে কীভাবে এটা হতে পারে যে ওই কাজের জন্যে আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে পুরস্কৃত করবেন না?

ষষ্ঠ অধ্যায়

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের
ব্যাপারে মুহাদ্দেসীন-এ-কেরাম ও ইমামবন্দের
দৃষ্টিভঙ্গি

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের পক্ষে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক বিস্তারিত প্রামাণ্য দলিলাদি পেশের পর এই অধ্যায়ে আমরা এতদসংক্রান্ত বিষয়ের সমর্থনে মতামত প্রকাশকারী ইমামবৃন্দের দলিলগুলো উপস্থাপন করবো। বিভিন্ন ইসলামী দেশ ও সময়কালের সাথে সম্পৃক্ত তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করা হবে।

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অনুশীলিত প্রথা ইসলামে সাম্প্রতিক সংযোজন (বেদআত) কিংবা ভারত উপমহাদেশীয় মুসলমানদের দ্বারাই প্রবর্তিত বলাটা একেবারেই ভুল ও বাস্তবতার পরিপন্থী। মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু পাকিস্তান বা ভারতের মুসলমানদের অনুশীলিত রীতি নয়, বেদআতও নয় কিংবা সমসাময়িককালের মুসলমান সমাজ এই প্রথার প্রবর্তক নন; বরং এটি এমন আনন্দঘন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যা মক্কা মোয়াযযমা ও মদীনা মোনাওয়ারাসহ গোটা আরব জাহান শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ পালন করে আসছে। ইসলামী বিশ্বের অনারব অংশেও এই প্রথা পরবর্তীকালে চালু হয়।

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের পক্ষে নেতৃস্থানীয় ইমাম ও হাদীসবেত্তাবৃন্দের অভিমত ও শরঈ সিদ্ধান্ত নিচে দেয়া হলো:

৬.১ হুজ্জাতুদ্দীন ইমাম মুহাম্মদ বিন যুফার আল-মাক্কী (৪৯৭-৫৬৫ হিজরী)

হুজ্জাতুদ্দীন ইমাম আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দিল্লাহ বিন যুফার আল-মাক্কী (১১০৪-১১৭০ খৃষ্টাব্দ)। তাঁর বর্ণনা ‘আদ-দুররুল মুনতায়িম’ পুস্তকে উদ্ধৃত হয়েছে যে,

وَقَدْ عَمِلَ الْمُجَبُّونَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحًا بِمَوْلِدِهِ الْوَلَائِمِ، فَمَنْ ذَلِكَ مَا عَمِلَهُ بِالْقَاهِرَةِ الْمُعَزِّيَّةِ مِنَ الْوَلَائِمِ الْكِبَارِ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ قُفْلٍ قَدْ دَسَّ اللَّهُ تَعَالَى سَرَّهُ، شَيْخٌ شَيْخُنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ

بْنِ الثُّعْمَانِ، وَعَمِلَ ذَلِكَ قَبْلَ جَمَالِ الدِّينِ الْعَجَمِيِّ الْهَمْدَانِيِّ وَمِمَّنْ عَمِلَ ذَلِكَ عَلَى قَدَرٍ وَسَعَةٍ يُوسُفُ الْحَجَّارِ بِمَضَرَ وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَرِّضُ يُوسُفَ الْمَذْكُورَ عَلَى عَمَلٍ ذَلِكَ.

—মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরণীতলে শুভাগমনের খুশি প্রকাশার্থে তাঁরই আশেক-ভক্তবৃন্দ বড় বড় ভোজের আয়োজন করেন। এসবের মধ্যে কায়রো নগরীতে অবিস্বাস্য বড় এক ভোজের আয়োজন যিনি করেন, তিনি হচ্ছেন শায়খ আবুল হাসান, যিনি ইবনে কুফুল নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তাঁর (আধ্যাত্মিক) রহস্যকে পবিত্রতা দান করেন। তিনি আমাদের শিক্ষক আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ বিন নুমানের শিক্ষক। তাঁর আগে মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন জামালুদ্দীন আজামী হামাযানী। মিসরের ইউসুফ হাজ্জারও এই অনুষ্ঠান পালনে সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করতেন; বস্তুতঃ তিনি (স্বপ্নে) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেন, তিনি তাঁকে এই পুণ্যদায়ক কর্ম জারি রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন।^{২৮৯}

৬.২ শায়খ মুঈনুদ্দীন উমর বিন মুহাম্মদ আল-মাল্লা (জন্ম: ৫৭০ হিজরী)

শায়খ মুঈনুদ্দীন আবু হাফস ‘উমর বিন হাফস বিন খিদার ইরবিলী মুসিলী, যিনি ‘আল-মাল্লা’ উপাধিতে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। মসুল নগরীর অধিবাসীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, আশেক-ভক্ত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দক্ষ জ্ঞানী আলেম। বিবৃত আছে:

كَانَ أَوَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْمَوْصِلِ الشَّيْخُ عَمْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَلَأَ أَحَدُ الصَّالِحِينَ الْمَشْهُورَيْنِ وَبِهِ افْتَدَى فِي ذَلِكَ صَاحِبُ إِرْبِلٍ وَغَيْرُهُمْ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

—মসুল নগরীতে প্রথম যে ব্যক্তি মীলাদ শরীফের মাহফিলের আয়োজন করেন, তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত পুণ্যাত্মা শায়খ উমর বিন মুহাম্মদ মাল্লা।

অনুরূপভাবে ইরবিলের শাসকসহ অন্যান্যরাও তাঁর অনুসরণ করেন।
আল্লাহর করুণা তাঁদের সবার প্রতি বর্ষিত হোক (আমীন)।^{২৯০}

৬.৩ ইবনে আল-জাওযী (৫১০-৫৭৯ হিজরী)

বহু গ্রন্থপ্রণেতা আল্লামা জামাল উদ্দীন আবুল ফারাজ আবদুর রহমান বিন আলী ইবনে জাওযী (১১১৬-১২০১ খৃষ্টাব্দ) মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ে দুটি গ্রন্থ সংকলন করেন:

(১) بَيَانُ الْمِيلَادِ النَّبَوِيِّ (১)

(২) مَوْلِدُ الْعُرُسِ মাওলিদুল উরুস।

ইবনে জাওযী তাঁর ‘বয়ানুল মীলাদিন নববী’ গ্রন্থে লিখেন,

لَا زَالَ أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَالْمِصْرَ وَالْيَمَنَ وَالشَّامَ وَسَائِرِ بِلَادِ الْعَرَبِ
مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ يَحْتَفِلُونَ بِمَجْلِسِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ هَلَالِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَيَهْتَمُّونَ إِهْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَي
السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَتَأَلَّوْنَ بِذَلِكَ أَجْرًا
جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا.

—রবিউল আউয়াল মাসের আগমনীবার্তা নিয়ে নতুন চাঁদ উদিত হলে হারামাঈন শরীফাইন (মক্কা ও মদীনা)’র পাশাপাশি মিসর, ইয়েমেন, শাম (সিরিয়া) এবং আরব দেশের পূর্ব হতে পশ্চিমের সকল মানুষ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমনের খুশি প্রকাশার্থে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহফিল উদযাপন অব্যাহত রাখেন। তাঁরা (তাঁরই শানে) সাধ্যমতো ধর্মীয় সঙ্গীত (সেমা-কাউয়ালী) ও

২৯০. আবু শামা : আল বায়েস আলা ইনকারিল বিদআ ওয়াল হাওয়াদিস, ২৪ পৃষ্ঠা; সালেহী : সুবুলুল হুদা ওয়াল রশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ, ১:৩৬৫।

মীলাদ শরীফ পাঠের প্রয়াস পান; আর এরই ফলশ্রুতিতে তাঁরা আশীর্বাদপূর্ণ পুরস্কার ও মহাবিজয় অর্জন করবেন।^{২৯১}

ইবনে জাওযী তাঁর ‘মাওলিদুল উরুস’ গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

وَجُعِلَ لِمَنْ فَرِحَ بِمَوْلِدِهِ حِجَابًا مِنَ النَّارِ وَسِتْرًا، وَمَنْ أَنْفَقَ فِي مَوْلِدِهِ دِرْهَمًا
كَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، وَأَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ
بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشْرًا،

فَيَا بُشْرَى لَكُمْ أُمَّةٌ مُحَمَّدٍ لَقَدْ نِلْتُمْ خَيْرًا كَثِيرًا فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. فَيَا
سَعِيدٌ مَنْ يَعْمَلُ لِأَحْمَدَ مَوْلَدًا فَيَلْقَى الْهَنَاءَ وَالْعِزَّ وَالْخَيْرَ وَالْفَخْرَ، وَيُدْخُلُ
جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَتَبَجَّجْنَ دُرٌّ تَحْتَهَا خَلَعٌ حَصْرًا.

—যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ উপলক্ষে খুশি হন, তিনি জাহান্নামের আগুন হতে (রহমতের) চাদর দ্বারা আবৃত। মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালনের উদ্দেশ্যে যিনি এক দিরহাম ব্যয় করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্যে সুপারিশ করবেন, আর আল্লাহ তা’আলাও তাঁর ব্যয়িত প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে দশ দিরহাম প্রদান করবেন। হে উম্মতে মুহাম্মদী! তোমাদের জন্যে সুসংবাদ। নিশ্চয় তোমরা উভয় জগতের কল্যাণ অর্জন করেছো। সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যিনি আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ উপলক্ষে কোনো আমল করেন। আর এরই ফলশ্রুতিতে তিনি কল্যাণ, মর্যাদা, আশীর্বাদ ও গৌরব অর্জন করেন। তিনি বেহেশতের বাগানে মুক্তোর মুকুট ও সবুজ আলখেলা পরে প্রবেশ করবেন।^{২৯২}

ইরবিলের বাদশাহ মুযাফফর আবু সাঈদ কাওকাবরী কর্তৃক মীলাদ শরীফ উদযাপন ও তাতে অঢেল ব্যয় প্রসঙ্গে ইবনে জাওযী বলেন:

২৯১. ইবনে জাওযী, বয়ানুল মীলাদিন নববী, ৫৮ পৃষ্ঠা।

২৯২. ইবনে জাওযী : মাওলিদুল উরুস, ১১ পৃষ্ঠা।

لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ إِلَّا رِغَامَ الشَّيْطَانِ وَإِدْعَامَ أَهْلِ الْإِيمَانِ.

—এই পুণ্যময় কাজ (মীলাদ অনুষ্ঠান) শয়তানকে ক্ষুদ্ধ করে এবং ঈমানদারদের উৎফুল্ল করে।^{২৯৩}

উদ্দেশ্য হলো, মীলাদের মজলিশগুলো শয়তানের জন্যে লাঞ্ছনা, অপমান ও পরাজয় বয়ে আনে, আর অপরদিকে বিশ্বাসীদেরকে করে সুসংহত।

৬.৪ আবু আল-খাতাব বিন দিহইয়া আল-কালবী (৫৪৪-৬৩৩ হিজরী)

মহাবিচারক আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আবী বকর বিন খিলকান স্বীয় ‘ওফিয়াতুল আ’ইয়ান ওয়া আন্বায়িয যামান’ গ্রন্থে (৩:৪৪৮-৪৫০) হাফেয আবুল খাতাব বিন দিহইয়া কালবী (৫৪৪-৬৩৩ হি.) সম্পর্কে উল্লেখ করেন:

كَانَ مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ وَمَشَاهِيرِ الْفُضَلَاءِ، قَدِمَ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَدَخَلَ الشَّامَ وَالْعِرَاقَ وَاجْتَارَ بِإِرْبِلَ سَنَةً أَرْبَعَ وَسِتِّمِائَةً، فَوَجَدَ مَلِكَهَا الْمُعَظَّمُ مُظَفَّرَ الدِّينِ بَنَ زَيْنِ الدِّينِ يَعْتَنِي بِالْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ، فَعَمِلَ لَهُ كِتَابَ التَّنْوِيرِ فِي مَوْلِدِ الْبَشِيرِ الْتَذِيرِ، وَقَرَأَهُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ، فَأَجَازَهُ بِأَلْفٍ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَدْ سَمِعْنَاهُ عَلَى السُّلْطَانِ فِي سَنَةِ مَجَالِسٍ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَسِتِّمِائَةً.

—তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ হক্কানী উলামা ও পুণ্যাত্মাদের একজন। তিনি ৬০৪ হিজরী সালে মাগরিব তথা পশ্চিমাঞ্চল হতে সফর করে সিরিয়া ও ইরাক এলাকায় প্রবেশ করে ইরবিল অতিক্রম করেন। সেখানে তিনি দেখতে পান ইরবিলের শাসক সুলতান মুযাফ্ফারুদ্দীন বিন যাইনুদ্দীন মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে ব্যাপক প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি বাদশাহর উদ্দেশ্যে ‘আত-তানভীর ফী মাওলিদিল বাশীরিন্ নাযীর’ (সুসংবাদ প্রদান ও সতর্ককারীর বেলাদতে বিচ্ছুরিত নূরের জ্যোতি) শীর্ষক একটি পুস্তক রচনা

করেন। বাদশাহর উপস্থিতিতে তিনি তা পাঠ করে শোনান, আর (ফলশ্রুতিতে) তাঁকে এক হাজার দিনার পুরস্কার দেয়া হয়। আমরা ৬২৫ হিজরী সালে ছয়টি আলাদা আলাদা সমাবেশে বাদশাহর কাছ থেকে এই ঘটনার বর্ণনা শুনেছিলাম।^{২৯৪}

৬.৫ শামস আল-দীন আল-জাযারী (বেসাল: ৬৬০ হিজরী)

কুরআন মজীদেদ শীর্ষস্থানীয় ক্বারী শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আয-জাযারী আশ-শাফেঈ (জন্ম: ১২৬২ খৃষ্টাব্দ) নিজ ‘উরফুত তা’রীফ বিল-মাওলিদিশ্ শরীফ’ শীর্ষক সংক্ষিপ্তসারমূলক পুস্তকে লিখেন:

قَدْ رُؤِيَ أَبُو لَهَبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي النَّوْمِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا حَالُكَ، فَقَالَ: فِي النَّارِ، إِلَّا أَنَّهُ يُخَفَّفُ عَنِّي كُلَّ لَيْلَةٍ اثْنَيْنِ وَأَمْصُ مِنْ بَيْنِ أَصْبُعَيْ مَاءٍ بِقَدْرِ هَذَا وَأَشَارَ لِرَأْسِ أَصْبُعِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ بِإِعْتَاقِي لِثَوْبَةٍ عِنْدَمَا بَشَّرْتَنِي بِوَلَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِإِرْصَاعِهَا لَهُ.

فَإِذَا كَانَ أَبُو لَهَبٍ الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِذَمِّهِ جُوزِي فِي النَّارِ بِفَرْجِهِ لَيْلَةً مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ، فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِّدِ مِنْ أَمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرُّ بِمَوْلِدِهِ وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ فُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لَعَمْرِي إِنَّمَا يَكُونُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَنْ يُدْخِلَهُ بِفَضْلِهِ جَنَّاتِ التَّعِيمِ.

—মৃত্যুর পর স্বপ্নে আবু লাহাবকে দেখানো হলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, ‘তোমার কী পরিণতি?’ সে বলে, ‘আমি জাহান্নামের আগুনে জ্বলছি। তবে প্রতি সোমবার আমার শাস্তি লাঘব করা হয় এবং আমি আগুনের আগা

হতে পানি পান করতে সক্ষম হই (এসময় সে তার তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুল দুটো দেখায়)। আর এটা এ কারণে যে, আমি দাসী সুয়াইবিয়াকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম, যখনই সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের সুসংবাদ আমার কাছে নিয়ে এসেছিলো। মুক্তির ফলে সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধ পান করিয়েছিলো।

এ-ই যদি হয় আবু লাহাবের অবস্থা, যে অবিশ্বাসীকে আল-কুরআনে অভিসম্পাত দেয়া হয়েছে অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের রাতে খুশি হওয়ার ফলে তার শাস্তি লাঘব করা হয়েছে। এমতাবস্থায় ওই মুসলমানের মর্যাদা কতোটুকু উচ্চ হবে, যিনি আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত, তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেলাদতে খুশি হন এবং ইশক-মহব্বতের কারণে সাধ্য মতো ব্যয় করেন? আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) তাঁকে নিজ বিশাল নেয়ামতের ভাণ্ডার ও সুখ-শান্তির বেহেশত দান করবেন!^{২৯৫}

লেখক আরো যোগ করেন:

مِنْ خَوَاصِّهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِّ وَيُشْرَى عَاجِلُهُ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ.

—মীলাদুন্নবী মাহফিল উদযাপনের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, যে বছর মীলাদুন্নবী উদযাপন করা হয়, ওই বছরটি নিরাপদ ও শান্তিতে অতিবাহিত হয় এবং ভালো উদ্দেশ্য ও মনোবাসনা পূরণের সুসংবাদ পাওয়া যায়।^{২৯৬}

২৯৫. সুয়ুতী : আল-হাভী লিল-ফাতওয়া, ২০৬ পৃষ্ঠা; হুসনুল মাকাসিদ ফী আমালিল-মাওলিদ, ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা; কসতলানী: আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া বিল-মিনাহিল মুহাম্মদীয়া, ১:১৪৭; যুরকানী: শরহি মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়া বিল-মিনাহিল মুহাম্মদীয়া, ১:২৬০-২৬১; সালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রি ইবাদ, ১:৩৬৬-৩৬৭; নাবহানী: হুজ্জাতুল্লাহি আলাল-আলামীন ফী মু'জিয়াতি সায়েদিল মুরসালীন, ২৩৭-২৩৮ পৃষ্ঠা।

২৯৬. সালেহী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খায়রি ইবাদ, ১:৩৬৫-৩৬৬।

৬.৬ ইমাম আবু শামা (৫৯৯-৬৬৫ হিজরী)

‘সহীহ মুসলিম শরীফ’-এর ব্যাখ্যাকারী ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৭ হি./ ১২৩৩-১২৭৮ খৃ.)’র শায়খ ইমাম আবু শামা আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল (১২০২-১২৬৭ খৃষ্টাব্দ)। তিনি তাঁর ‘আল-বায়েস আলা ইনকারিল বিদ’য়ি ওয়াল-হাওয়াদিস’ পুস্তকে লিখেন:

وَمِنْ أَحْسَنِ مَا ابْتَدَعَ فِي زَمَانِنَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا كَانَ يَفْعَلُ بِمَدِينَةِ إِرْبِلَ جَبَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ عَامٍ فِي الْيَوْمِ الْمُوَافِقِ لِيَوْمِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالْمَعْرُوفِ وَأَظْهَارِ الزَّيْنَةِ وَالسُّرُورِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِحْسَانِ إِلَى الْفُقَرَاءِ مُشْعِرَ بِمُحَبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْظِيمِهِ وَجَلَالَتِهِ فِي قَلْبِ فَاعِلِهِ وَشُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا مَنَّ بِهِ مِنْ إِيجَادِ رَسُولِهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى جَمِيعِ الْمُرْسَلِينَ.

—এবং আমাদের যুগে এরূপ (বেদআতে হাসানা) উত্তম বিষয়গুলোর মধ্য হতে উত্তম বেদআতের সূচনা হয় ইরবিল শহর থেকে। আল্লাত তাআলা এই শহরকে নিরাপদ ও হিফাজত করবেন। ওই বরকতমণ্ডিত শহরে প্রতি বছর মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন উপলক্ষে আনন্দ ও খুশি প্রকাশার্থে দান-সদকাসহ ভালো কাজের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। সেখানে হযুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। প্রস্তুতি হয় আনন্দ প্রকাশকারীদের অসীম ভালোবাসা ও সম্মানের দৃষ্টান্ত। আর তথায় বিদ্যমান থাকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জালালত ও আযমতের ধ্যান-ধারণা। বলা হয়েছে, সেখানে তাঁরা তাঁদের প্রভুর শুকরিয়া আদায় করতে থাকেন এবং বলেন, তিনি (আল্লাহ) আমাদের অত্যন্ত ভালোবেসে ও দয়া করে তাঁর হাবীব

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁদের নিকট পাঠিয়েছেন, যিনি সমস্ত জাহানের রহমত ও সকল নবী-রাসূলদের চেয়ে মর্যাদাবান।^{২৯৭}

ইরবিলের বাদশাহ মুযাফফর আবু সাঈদ কাওকাবুরী কর্তৃক মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন ও এই উপলক্ষে তাঁর বিপুল ব্যয় সম্পর্কে আবু শামা বলেন:

مِثْلُ هَذَا الْحَسَنِ يُنْدَبُ إِلَيْهِ وَيُشْكُرُ فَاعِلُهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ.

—এই উত্তম কাজ মুস্তাহাব এবং এর অনুশীলনকারী গৃহীত ও প্রশংসিত জন।^{২৯৮}

৬.৭ ইমাম সদর আল-দীন মাওহুব বিন উমর আল-জাযারী (বেসাল: ৬৬৫ হিজরী)

মিসরের শীর্ষস্থানীয় ফকীহ ইমাম সদরুদ্দীন মাওহুব বিন উমর আল-জাযারী আল-শাফেঈ বলেন,

هَذِهِ بِدْعَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا وَلَا تَكْرَهُ الْبِدْعَ إِلَّا إِذَا رَاعَمَتِ السُّنَّةُ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَرَاعَمَهَا فَلَا تَكْرَهُ، وَيُثَابُ الْإِنْسَانُ بِحَسَبِ قَصْدِهِ فِي إِظْهَارِ السُّرُورِ وَالْفَرَجِ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: هَذَا بِدْعَةٌ، وَلَكِنَّهَا بِدْعَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ بَلْ إِنْ كَانَ يُعَلِّمُ أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنْ نَفْسَ الْمَسْئُولِ تَطِيبُ بِمَا يُعْطِيهِ فَالْسُّؤَالُ لِذَلِكَ مُبَاحٌ أَرْجُو أَنْ لَا يَنْتَهِيَ إِلَى الْكَرَاهَةِ.

২৯৭. আবু শামা: আল-বায়েস আলা ইনকারিল বিদ'য়ি ওয়াল-হাওয়াদিস, ২৩-২৪ পৃষ্ঠা; সালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ, ১:৩৬৫; হালাবী: ইনসানুল উয়ুন ফী সীরাতিল আমীন আল-মামুন, ১:৮৪; আহমদ ইবনে যাইনী দাহলান মক্কী : সীরাতুন নবববীয়া, ১:৫৩; নাবহানী: হুজ্জাতুল্লাহি আলাল-আলামীন ফী মু'জিয়াতি সাইয়েদিল মুরসালীন, ২৩৩ পৃষ্ঠা।

২৯৮. সালেহী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ, ১:৩৬৩।

—এটি বিদআত কিন্তু এতে দোষের কিছু নেই। সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া পর্যন্ত বেদআতসমূহকে দৃষ্ণীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। অধিকন্তু, ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী মীলাদ উদযাপনের ক্ষেত্রে আনন্দ প্রকাশের তারতম্য অনুযায়ী প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জিত হয়।

অন্যত্র বলা হয়েছে, এটি বেদআত; তবে নির্দোষ বেদআত। এতদসত্ত্বেও মানুষের কাছে (এর ব্যয় নির্বাহের খাতে) টাকা চাওয়ার কোনো অনুমতি নেই, যদি না নিশ্চিতভাবে জানা যায়, যার কাছে অর্থ চাওয়া হয়েছে তিনি খুশি মনে স্বেচ্ছায় তা দান করতে আগ্রহী। এরকম মানুষের কাছে অর্থ চাওয়া জায়েয, আর আমি আশা করবো তা 'কারাহা' তথা মন্দের পর্যায়ে যেন না পৌঁছে।^{২৯৯}

৬.৮ ইমাম যাহীর আল-দীন জা'ফর আল-তায়মানাতী (বেসাল: ৬৮২ হিজরী)

ইমাম যাহীরুদ্দীন জাফর বিন ইয়াহইয়া বিন জাফর আল-তায়মানাতী আশ-শাফেঈ (বেসাল: ১২৮৩ খৃষ্টাব্দ) বলেন:

هَذَا الْفِعْلُ لَمْ يَقَعْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مَعَ تَعْظِيمِهِمْ وَحُبِّهِمْ لَهُ إِعْظَامًا وَحُبَّةً لَا يَبْلُغُ جَمْعَنَا الْوَاحِدُ مِنْهُمْ وَلَا ذُرَّةً مِنْهُ، وَهِيَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ إِذَا قَصَدَ فَاعِلُهَا جَمْعَ الصَّالِحِينَ وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَهَذَا الْقَدْرُ يُثَابُ عَلَيْهِ بِهَذَا الشَّرْطِ فِي كُلِّ وَقْتٍ،

—মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি পরম ভক্তি শ্রদ্ধা ও ইশক-মহব্বত থাকা সত্ত্বেও পুণ্যবান সালফে সালেহীনের প্রাথমিক যুগে মীলাদ মাহফিলের প্রথা বা রীতি চালু ছিলো না। আমাদের কেউই, এমনকি আমরা সবাই একত্রিত হলেও, কখনোই তাঁদের স্রেফ একজনের ইশক-

২৯৯. সালেহী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ, ১:৩৬৫-৩৬৬।

মহব্বত, ভক্তি-শ্রদ্ধারও সমকক্ষ হবো না, এমনকি (তাঁদের ইশক ও ভক্তির তুলনায়) এক অণুকণার সমান ওজনও হবে না। এটা উত্তম বেদআত হবে, যদি উদযাপনকারী ব্যক্তির নিয়ত হয় মানুষদেরকে একত্রিত করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণ ও গরিব-দুঃস্থ, ফকীর, মিসকীনদের মাঝে খাদ্য বিতরণ। এই বিবরণের সাথে খাপ খেলে এবং এসব শর্ত পূরণ করলেই তো সর্বদা এটা কল্যাণ বয়ে আনবে।^{৩০০}

৬.৯ ইবনে তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হিজরী)

মুফতী তকী উদ্দীন আহমদ বিন আবদুল হালীম বিন আবদুস সালাম বিন তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮ খৃষ্টাব্দ) নিজ ‘ইকুতিদায়িস সিরাতিল মুস্তাক্বীম লি-মুখালাফাতে আসহাবিল জাহীম’ পুস্তকে লিখেন—

وَكَذَلِكَ مَا يُحَدِّثُهُ بَعْضُ النَّاسِ، إِمَّا مَضَاهَاةً لِلنَّصَارَى فِي مِيلَادِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِمَّا مُحَبَّةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْظِيمًا. وَاللَّهُ قَدْ يُثَبِّتُهُمْ عَلَى هَذِهِ الْمُحَبَّةِ وَالْإِحْتِهَادِ، لَا عَلَى الْبِدْعِ مِنَ اتِّخَاذِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدًا.

—অনুরূপভাবে, কিছু মানুষের দ্বারা যা প্রবর্তিত হয়েছে, খৃষ্টানদের যীশু খৃষ্টের জন্মদিন পালনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাস্বরূপ হোক কিংবা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ইশক-মহব্বতের নিদর্শনস্বরূপই হোক, আল্লাহ তা‘আলা হয়তো তাদের এই মহব্বত ও উদ্যমের খাতিরে (তাদেরকে) পুরস্কৃত করবেন। (কিন্তু) মীলাদুন্নবীকে আনন্দোৎসব হিসেবে গ্রহণের বেদআতের খাতিরে নয়।^{৩০১}

উক্ত পুস্তকের অন্য অংশে লেখক আরো বলেন:

৩০০. সালেহী : প্রাগুক্ত, ১:৩৬৪।

৩০১. ইবনে তাইমিয়া : ইকুতিদাউস সিরাতিল মুস্তাক্বীম লি-মুখালাফাতে আসহাবিল জাহীম, ৪০৪ পৃষ্ঠা।

فَتَعْظِيمُ الْمَوْلِدِ، وَاتِّخَاذُهُ مَوْسِمًا، قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ لِحُسْنِ قَصْدِهِ، وَتَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا قَدَّمْتُهُ لَكَ أَنَّهُ يُحَسِّنُ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ، مَا يَسْتَفِيدُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُسَدِّدِ.

—অতএব, মীলাদ শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও একে উদযাপনের মৌসুম হিসেবে গ্রহণ করা, যেমনটি অনেকে অনুশীলন করে থাকেন, তাতে নিয়তের বিশুদ্ধতা ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে নিহিত রয়েছে মহা পুরস্কার। ইতিপূর্বে যেমনটি বলা হয়েছে, কিছু লোক হয়তো সেসব বিষয়কে উত্তম বলে বিবেচনা করতে পারেন, যেগুলোকে ঈমানদারবৃন্দ দৃষ্ণীয় হিসেবে দেখেন।^{৩০২}

৬.১০ ইমাম আবু আদিল্লাহ বিন আলহাজ্জ আল-মালেকী (বেসাল: ৭৩৭ হিজরী)

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফযীলত সম্পর্কে ইমাম আবু আদিল্লাহ বিন আলহাজ্জ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল-মালেকী (জন্ম: ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দ) নিজ ‘আল-মাদখাল ইলা তানমিয়াতিল আমল বি-তাহসীনি নিইয়াতি ওয়াত-তানবিয়াতি আলা কাসীরি মিনাল বিদ‘য়িল মুহাদ্দিসা ওয়াল-‘আওয়াঈদ আল-মুনতাহালা’ গ্রন্থে লিখেন:

أَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى فَضِيلَةِ هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ بِقَوْلِهِ لِلْسَّائِلِ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ: [ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ].

فَتَشْرِيفُ هَذَا الْيَوْمِ مُتَضَمِّنٌ لِتَشْرِيفِ هَذَا الشَّهْرِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ، فَيَنْبَغِي أَنْ نَحْتَرِمَهُ حَقَّ الْإِحْتِرَامِ وَنُقْضِلَهُ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ الْأَشْهُرَ الْفَاضِلَةَ وَهَذَا مِنْهَا؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: [أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ] [آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لَوَائِي].

৩০২. ইবনে তাইমিয়ার প্রাগুক্ত ‘একুতেদা’ আল-সিরা‘ত আল-মুস্তাক্বীম শীর্ষক পুস্তক, ৪০৬ পৃষ্ঠা।

وَفَضِيلَةُ الْأُزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ بِمَا خَصَّهَا اللَّهُ بِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي تُفْعَلُ فِيهَا لِمَا قَدْ عَلِمَ أَنَّ الْأَمْكِنَةَ وَالْأُزْمِنَةَ لَا تَشْرُفُ لِذَاتِهَا، وَإِنَّمَا يَحْصُلُ لَهَا التَّشْرِيفُ بِمَا خُصَّتْ بِهِ مِنَ الْمَعَانِي، فَانْظُرْ إِلَى مَا خَصَّ اللَّهُ بِهِ هَذَا الشَّهْرَ الشَّرِيفَ وَيَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، أَلَا تَرَى أَنَّ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ فِيهِ فَضْلٌ عَظِيمٌ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ فِيهِ،

فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي إِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّهْرُ الْكَرِيمُ أَنْ يُكْرَمَ وَيُعَظَّمُ وَيُحْتَرَمَ الْاِحْتِرَامَ اللَّائِقَ بِهِ اتِّبَاعًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَوْنِهِ كَانَ يَخْصُ الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةَ بِرِيَادَةِ فِعْلِ الْبِرِّ فِيهَا وَكَثْرَةِ الْحَيَرَاتِ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْوَدَ النَّاسِ بِالْحَيَرِ وَكَانَ أَحْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، فَنَمْتَلِ تَعْظِيمَ الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ بِمَا امْتَثَلَهُ عَلَى قَدْرِ اسْتِطَاعَتِنَا.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ ائْتَرَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ مَا ائْتَرَمَهُ مِمَّا قَدْ عَلِمَ وَلَمْ يَلْتَزِمْ فِي هَذَا الشَّهْرِ مَا ائْتَرَمَهُ فِي غَيْرِهِ. فَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَا عَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ الْكَرِيمَةِ أَنَّهُ يُرِيدُ التَّخْفِيفَ عَنْ أُمَّتِهِ سِيمَا فِيمَا كَانَ يَخْصُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ،

أَلَا تَرَى إِلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. حَرَّمَ الْمَدِينَةَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَشْرَعْ فِي قَتْلِ صَبِيهِ وَلَا شَجَرِهِ الْجَزَاءِ تَخْفِيفًا عَلَى أُمَّتِهِ وَرَحْمَةً بِهِمْ، فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى مَا هُوَ مِنْ جِهَتِهِ وَإِنْ كَانَ فَاضِلًا فِي نَفْسِهِ فَيَتْرَكُهُ لِلتَّخْفِيفِ عَنْهُمْ،

—মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবার দিন রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞাসাকারীর প্রতি উত্তর দেয়ার সময় তিনি এই চমৎকার

বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মাসের বাড়তি গুণ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, “এই (সোমবার) দিনে আমার বেলাদত (তথা ধরাধামে শুভাগমন) হয়েছে।” এই দিনটির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তাঁর বেলাদতের মাসটিও। তাই এটাকে সবচেয়ে উচ্চমর্যাদা দেয়া ও এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য; আর এর পাশাপাশি আল্লাহ তা‘আলা যেভাবে পবিত্র মাসগুলোকে পছন্দ করেছেন, ঠিক সেভাবে এই মাসকেও আমাদের পছন্দ করা উচিত। কেননা এই মাসটি সেসব মাসেরই একটি, যেমনটি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান: “আমি বনু আদম তথা আদম-সন্তানের সাইয়েদ বা সরদার। আর এটা কোনো ফখর বা দস্ত নয়। হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর পরবর্তীরা (সবাই) আমার পতাকাতলে (অবস্থিত)।”

বিভিন্ন স্থান ও সময়ের সাথে সম্পৃক্ত ফযীলতগুলো ওই ইবাদত-বন্দেগীর কারণে হয়, যা ওই (স্থান ও সময়ে) পালন করা হয়। এসব স্থান ও সময়ের নিজস্ব সহজাত কোনো মাহাত্ম্য নেই; বরং এগুলোর মাহাত্ম্য কেবল এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ওই সব বিশেষ পছন্দের সূত্রেই প্রতিষ্ঠিত। এমতাবস্থায় এ (রবিউল আউয়াল) মাস ও সোমবারের জন্যে আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট মাহাত্ম্যগুলো বিবেচনা করুন। আপনি কি সোমবারে রোযা রাখার মহা ফযীলতকে দেখতে পান না, যা শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দিনে ধরণীতলে শুভাগমন কেন্দ্র করে হয়েছিল?

এ মাস (রবিউল আউয়াল) এলে উপরে উল্লেখিত প্রামাণ্য দলিলের ভিত্তিতে একে সম্মান প্রদর্শন, মহিমা বর্ধন ও পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা আবশ্যিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা তেমনভাবে উচিত, যেমনটি সুনির্দিষ্ট ফযীলতসম্পন্ন সময় কিংবা স্থানগুলোতে পুণ্যদায়ক কর্ম পালন ও প্রচুর দান-সদকাহ করা হয়। আপনি কি বিবেচনা করেননি (বুখারী শরীফের উদ্ধৃত), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিবৃতি, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মাঝে সবচেয়ে মহানুভব ও উদার, আর তিনি রমযান মাসে সর্বাধিক বদান্যতা প্রদর্শন করতেন”? অতএব, আমাদেরও উচিত হবে আমাদের সাধ্যানুসারে এ মাসের মহিমা বৃদ্ধির চেষ্টা করা, ঠিক

যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিমাপূর্ণ ক্ষণগুলোতে করতেন।

কেউ হয়তো কূটতর্ক করতে পারে এ কথা বলে যে, “এসব মহিমাপূর্ণ সময়ে পালিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যদায়ক আমল সবাই জানেন, কিন্তু তিনি যেভাবে অন্যান্য মাসে সুনির্দিষ্ট আমল পালন করেছিলেন, সেভাবে এই (রবিউল আউয়াল) মাসে কোনো সুনির্দিষ্ট আমল পালন করেননি।” এর জবাবে আমরা বলি, এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে জ্ঞাত উম্মতের প্রতি তাঁরই সদাশয় যত্ন ও স্বস্তিদানের আকাজ্জিক কারণে হয়েছে; বিশেষ করে এটা সেসব বিষয়ের ক্ষেত্রেই হয়েছে, যেগুলো তাঁর আপন জাত তথা সত্তার সাথে সম্পর্কিত। এর উদাহরণ ও বিষয়বস্তু হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মোনাওয়ারাকে হারাম তথা অলঙ্ঘনীয় (স্থান) ঘোষণা করেন, যেভাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম মক্কা মোয়াযযমাকে অলঙ্ঘনীয় (স্থান) ঘোষণা করেছিলেন, তখন হযর পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশু শিকার অথবা গাছের ডালপালা কাটার দায়ে শাস্তি বিধান করেননি। এটা তাঁর উম্মতের প্রতি করুণাস্বরূপ, আর তাঁদের উপর হতে বোঝা হাক্ক করার খাতিরেই করা হয়েছে। উম্মতের উপর থেকে বোঝা সহজ করার জন্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সাথে সম্পর্কিত আদেশগুলো ছেড়ে দিতেন, এমনকি যদি তা পুণ্যদায়কও হতো।^{৩০৩}

ইবনুল হাজ্জ মালেকী আরো লিখেন:

فَإِنَّ قَالَ قَائِلٌ: مَا الْحِكْمَةُ فِي كَوْنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خُصَّ مَوْلَاهُ الْكَرِيمُ بِشَهْرِ رَجَبِ الْأَوَّلِ وَبِیَوْمِ الْإِثْنَيْنِ مِنْهُ عَلَي الصَّحِيحِ وَالْمَشْهُورِ عِنْدَ

৩০৩. ইবনে আল-হাজ্জ কৃত ‘আল-মাদখাল ইলা’ তানমিয়া আল-‘আমল বি তাহসীন আল-নিহায়া’ত ওয়াল-তানবীহ ‘আলা কাসীর মিনাল-বিদ’ আল-মুহদিসা ওয়াল-‘আওয়াঈদ আল-মুনতাহালা’, ২:২-৪; আস্-সুয়ুতী প্রণীত ‘হুসন আল-মাকসিদ ফী ‘আমল আল-মওলিদ’, ৫৭-৫৯ পৃষ্ঠা; আস্-সুয়ুতী রচিত ‘আল-হা’ওয়া লিল-ফাতা’ওয়া’, ২০৩-২০৪ পৃষ্ঠা; আস্-সালেহী লিখিত সুবুলুল হদা ওয়ার রশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ, ১:৩৭১-৩৭২।

أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ وَفِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَاخْتَصَّ بِفَضَائِلٍ عَدِيدَةٍ، وَلَا فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ هَا الْحُرْمَةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَا فِي لَيْلَتِهَا؟

فَالْجَوَابُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: الْأَوَّلُ: مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَفِي ذَلِكَ تَنْبِيهُ عَظِيمٌ، وَهُوَ أَنَّ خَلْقَ الْأَقْوَاتِ وَالْأَرْزَاقِ وَالْفَوَاكِهِ وَالْخَيْرَاتِ الَّتِي يَمْتَدُّ بِهَا بَنُو آدَمَ وَيَتَدَاوُونَ وَتَنْشَرُ صُدُورُهُمْ لِرُؤُوسِهَا وَتَطْبُوبُ بِهَا نُفُوسُهُمْ وَتُسَكِّنُ بِهَا خَوَاطِرُهُمْ عِنْدَ رُؤُوسِهَا لَا طَمَئِنَّا نَفْسُهُمْ بِتَحْصِيلِ مَا يَتَّقِي حَيَاتِهِمْ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ حِكْمَةِ الْحَكِيمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَوْجُودُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الشَّهْرِ فِي هَذَا الْيَوْمِ قُرَّةَ عَيْنٍ بِسَبَبِ مَا وَجَدَ مِنَ الْخَيْرِ الْعَظِيمِ وَالْبَرَكَةِ الشَّامِلَةِ لِأُمَّتِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ طُهُورَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي شَهْرِ رَجَبٍ فِيهِ إِشَارَةٌ ظَاهِرَةٌ لِمَنْ تُفْطِنُ إِلَيْهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِشْتِقَاقِ لَفْظِهِ رَجَبٍ إِذْ أَنَّ فِيهِ تَفَاوُلًا حَسَنًا بِبَشَارَتِهِ لِأُمَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالثَّقَائِلُ لَهُ أَصْلُ إِشَارٍ إِلَيْهِ عَلَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ. وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّفْطِيُّ: لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ أَسْمِهِ نَصِيبٌ.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ فَصْلَ الرَّجَبِ أَعَدَّلَ الْفُضُولَ وَأَحْسَنَهَا.

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ قَدْ شَاءَ الْحَكِيمُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَتَشَرَّفَ بِهِ الْأَمْكَانُ لَا هُوَ تَتَشَرَّفَ بِهَا بَلْ يَحْصُلُ لِلزَّمَانِ وَالْمَكَانِ

الذي يباشر عليه الصلاة والسلام الفضيلة العظيمة والمزيد علي ما سواه من حسنه إلا ما اتستثني من ذلك لأجل زيادة الأعمال فيها وغير ذلك، فَلَوْ وَلَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا لَكَانَ قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ يَنْتَشِرُ بِهَا.

—কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, রবিউল আউয়াল মাসের সোমবারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন হওয়ার পেছনে হেকমত তথা (ঐশী) প্রজ্ঞা কী? কেন তাঁকে কুর'আন নাযিল হওয়া রমযান মাস ও তাতে আবির্ভূত কদরের রাতে (লাইলাতুল কদর), কিংবা অন্যান্য পবিত্র মাসে অথবা শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাতে বা শুক্রবার কিংবা শুক্রবার রাতে ধরাধামে পাঠানো হয়নি?

এর প্রত্যুত্তর চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেয়া যায়:

প্রথমত: একটি হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, মহান ঈশ্বা আল্লাহ পাক সোমবার দিন সমস্ত গাছ-গাছালি সৃষ্টি করেন। এটা এক মহা ইশারা ধারণ করে; কেননা এতে পরিদৃষ্ট হয় যে সোমবারে রিযিক, খাদ্য-ফসল, ফল-ফলাদি ও (অনুরূপ) অন্যান্য সকল উত্তম বস্তু সৃষ্টি করা হয়। এগুলো দ্বারাই আদম-সন্তান তথা মনুষ্যকুল বেঁচে থাকে এবং (জীবনকে) উপভোগ করে। রবিউল আউয়াল মাসের এই দিনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদপূর্ণ বেলাদত হওয়াটা চোখের শীতলতা ও স্বস্তি বটে; আর তাঁর শুভাগমন দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীকে খায়র তথা কল্যাণের প্রাচুর্য ও মহা বরকত দান করা হয়।

দ্বিতীয়ত: আমরা যদি শব্দতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হতে আরবী 'রবীঈ' শব্দটি বিবেচনা করি, তাহলে (দেখতে পাবো) এতে নিহিত রয়েছে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও শুভ লক্ষণ। আবু আবদির রহমান সাকলী বলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নামের কিছু অংশের ভাগিদার হন।' এই মাসের শুভ লক্ষণ হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে তাঁর মঙ্গলজনক শুভাগমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিলো।

তৃতীয়ত: বসন্তকাল (আর-রবীঈ) হচ্ছে সব মৌসুমের মধ্যে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ এবং সেরা ঋতু; আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র (ঐশী) বিধান হচ্ছে সবচেয়ে মতোপূর্ণ এবং ঐশী বিধানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ।

চতুর্থতঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা আপন মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরণীতলে শুভাগমনের দিন-ক্ষণকে সম্মানিত করতে চেয়েছিলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত (অন্য) সময়গুলোতে শুভাগমন করলে কেউ হয়তো এই ভুল ধারণা পোষণ করতে পারতো যে, তিনি ওই সময়ে শুভাগমন করায় সম্মানিত হয়েছেন।^{৩০৪}

৬.১১ ইমাম শামস আল-দীন আল-যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হিজরী)

ইমাম শামস আল-দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন উসমান আয-যাহাবী (১২৭৪-১৩৪৮ খৃষ্টাব্দ) মুসলিম জাহানের সেরা ইতিহাসবিদ ও মুহাদ্দীস উলামাদের একজন হিসেবে প্রশংসিত। তিনি 'তাজরীদুল উসূল ফী আহাদীসির রাসূল', 'মীযানুল ইতিদাল ফী নাকদির রিজাল', 'আল-মুশতাবা ফী আসমায়ির রিজাল' ও 'তাবাকাতুল হুফায' ইত্যাদির মতো বেশ কিছু সংখ্যক বই সংকলন করে হাদীস-শাস্ত্রের মূলনীতি (উসূলে হাদীস) ও 'ইলমুর রিজাল' তথা জীবনী মূল্যায়ন বিদ্যার ক্ষেত্রে বড় অবদান রেখেছেন। তাঁর লেখা জনপ্রিয় ইতিহাসগ্রন্থ হচ্ছে 'তারীখুল ইসলাম ওয়াল ওয়াফিয়াত আল-মাশাহীর ওয়াল-আলাম'। ইলমুর রিজাল শাস্ত্রে তাঁর লেখা 'সিয়্যারু আলামিন নুবালা' একটি চমৎকার গ্রন্থ, যা'তে লেখক হাদীসের রাবী তথা বর্ণনাকারীদের জীবনীর পরিপ্রেক্ষিত তুলে

৩০৪. ইবনে আল-হজ্জ, 'আল-মাদখাল ইলা' তানমিয়া আল-'আমল বি তাহসীন আল-নিহিয়া'ত ওয়াল-তানবীহ 'আলা কাসীর মিনাল-বিদ' আল-মুহদিয়া ওয়াল-'আওয়াঈদ আল-মুনতাহালা', ২:২৬-২৯; আস্-সুয়ূতী, 'হুসনু আল-মাকুসিদ ফী আমল আল-মওলিদ', ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা; আস্-সুয়ূতী, আল-হাওয়ায়ী লিল-ফাতা'ওয়া', ২০৭ পৃষ্ঠা; আল-নাবহানী, 'হুজ্জাত-আল্লাহ 'আলাল-'আলামীন ফী মু'জেযাত-এ-সাইয়েদ আল-মুরসালীন', ২৩৮ পৃষ্ঠা।

ধরেছেন; এই পুস্তকটি পণ্ডিতদের মাঝে এক বিশেষ আসন অধিকার করে আছে।

ইমাম যাহাবী তাঁর লেখনীতে সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর ভগ্নিপতি ইরবিল রাজ্যের সুলতান মুযাফফার উদ্দীন আবু সাঈদ কাওকাবুরী (বেসাল: ৬৩০ হি.) সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশংসাসূচক বর্ণনা প্রদান করেন। বাদশাহ কাওকাবুরী ছিলেন অতিশয় উদার ও অতিথিপরায়ণ, যিনি মরণ-ব্যাদ্ধিগ্রস্ত ও অন্ধদের জন্যে চারটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন; আর সেগুলো তিনি প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার পরিদর্শন করতে যেতেন। তিনি অভিভাবকহীন বিধবা নারী, এতিম-অনাথ শিশুদের জন্যেও গৃহ নির্মাণ করেন, আর তিনি নিয়মিতভাবে অসুস্থদের দেখতে যেতেন। সুলতান কাওকাবুরী হানাফী ও শাফেঈ মযহাবের শিক্ষার্থীদের জন্যে আলাদা আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সূফীদের জন্যে বসবাসের খানেকাহ তৈরি করেন। ইমাম যাহাবী লিখেন যে, এই সুলতান আক্বীদা-বিশ্বাসে সুন্নী ছিলেন, আর নির্মল আত্মাবিশিষ্ট ধার্মিক ছিলেন। ইমাম সাহেব নিজের ‘সিয়্যারু আলামিন নুবালা’ এবং ‘তারীখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফিয়াতুল মাশাহীর ওয়াল আলাম’ উভয় পুস্তকেই এর বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেন।

সুলতান কাওকাবুরী কর্তৃক মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন সম্পর্কে ইমাম যাহাবী তাঁর বিবরণে বলেন:

وَأَمَّا احْتِفَالُهُ بِالْمَوْلِدِ فَيَقْصُرُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ؛ كَانَ الْخَلْقُ يَقْصِدُونَهُ مِنَ الْعِرَاقِ وَالْحِزْبَةِ وَتُنْصَبُ قِيَابٌ خَشَبَ لَهُ وَلَأَمْرَائِهِ وَتُرْزَنُ، وَفِيهَا جَوْقُ الْمَغَانِي وَاللَّعِبِ، وَيَنْزِلُ كُلُّ يَوْمٍ الْعَصْرَ فَيَقِفُ عَلَى كُلِّ قُبَّةٍ وَيَتَفَرَّجُ، وَيَعْمَلُ ذَلِكَ أَيَّامًا، وَيُخْرِجُ مِنَ الْبَقْرِ وَالْإِبِلِ الْغَنَمَ شَيْنًا كَثِيرًا فَتَنْحَرُ وَتُطْبَخُ الْأَلْوَانُ، وَيَعْمَلُ عِدَّةٌ خَلْعٌ لِلصُّوفِيَّةِ، وَيَتَكَلَّمُ الْوَعَاظُ فِي الْمِيدَانِ، فَيُنْفِقُ أَمْوَالًا جَزِيلَةً. وَقَدْ جَمَعَ لَهُ ابْنُ دِحْيَةَ كِتَابَ الْمَوْلِدِ، فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ. وَكَانَ مُتَوَاضِعًا خَيْرًا، سُنِّيًّا، يُحِبُّ الْفُقَهَاءَ وَالْمُحَدِّثِينَ، ... وَقَالَ سِبْطُ الْجَوْزِيِّ: كَانَ مُظَفَّرَ الدِّينِ يُنْفِقُ فِي السَّنَةِ عَلَى الْمَوْلِدِ ثَلَاثَ مِائَةِ أَلْفِ دِينَارٍ، وَعَلَى

الْحَائِقَاءُ مَائَتِي أَلْفِ دِينَارٍ، ... وَقَالَ: قَالَ مَنْ حَضَرَ الْمَوْلِدَ مَرَّةً: عَدَدْتُ عَلَى سِمَاطِهِ مِائَةَ فَرَسٍ فَشَلِمَيْشَ، وَخَمْسَةَ أَلْفٍ رَأْسَ مَشْوِيِّ، وَعَشْرَةَ أَلْفٍ دَجَاجَةٍ، وَمِائَةَ أَلْفِ زُبْدِيَّةٍ، وَثَلَاثِينَ أَلْفَ صَحْنٍ حَلَوَاءٍ.

—সুলতানের মীলাদুন্নবী মাহফিল উদযাপন মুখে বর্ণনাতীত! ইরাক ও আরব উপদ্বীপ হতে মানুষেরা তাঁর উৎসব আয়োজনে শরীক হবার জন্যে যাত্রা করতেন, তিনি বিশাল সংখ্যক গরু, উট ও ভেড়া, ছাগল, দুগ্ধ (মীলাদুন্নবী উপলক্ষে) কুরবানী করতেন এবং বিভিন্ন ধরনের রান্নার আয়োজন করতেন। সূফীসাধক ও দরবেশমণ্ডলীকে উঁচু মর্যাদার ভূষণ দ্বারা সম্মানিত করতেন। শহরের প্রধান প্রধান চত্বরে বজ্রাদের বয়ান করার সুযোগ করে দেয়া হতো, আর সুলতান (এ আয়োজনে) বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মীলাদ সম্পর্কে ইবনে দিহইয়া একখানি বই লিখেন, যার পুরস্কারস্বরূপ সুলতান তাঁকে এক হাজার দিনার এনাম দেন। সুলতান মুযাফফার শাহ ছিলেন বিনয়ী ও প্রকৃত সুন্নী, যিনি দুঃখী-গরিবসহ মুহাদ্দীসদেরকে মহব্বত করতেন। সিবত আল-জাওয়ী বলেন, ‘মীলাদুন্নবী মাহফিল উদযাপন বাবদ সুলতান মুযাফফার শাহের বাৎসরিক ব্যয় হতো তিন লক্ষ দিনার; আর তিনি দুই লক্ষ দিনার খরচ করতেন সূফীদের জন্যে খানেকাহ নির্মাণ বাবদ। সুলতান মুযাফফার শাহের আয়োজিত মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী জনৈক ব্যক্তি উল্লেখ করেন, রাজকীয় দস্তুরখানে এক লক্ষ মাটির পানপাত্র, পাঁচ হাজার ছাগলের মাথা, দশ হাজার মোরগ, এক লক্ষ প্লেটভর্তি শুকনো ফল ও ত্রিশ হাজার প্লেটভর্তি মিষ্টি পরিবেশিত হতো’।^{৩০৫}

৩০৫. যাহাবী : সিয়্যারু আলামিন নুবালা, ১৬:২৭৪-২৭৫; যাহাবী: তারীখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফিয়াতিল মাশাহীর ওয়াল-আলাম’ (৬২১-৬৩০ হিজরী), ৪৫:৪০২-৪০৫।

৬.১২ ইমাম কামাল উদ্দীন আল-আদফাভী (৬৮৫-৭৪৮ হিজরী)

ইমাম কামাল উদ্দীন আবুল ফাদল জা'ফার বিন সালাব বিন জা'ফার আল-আদফাভী (১২৮৬-১৩৪৭ খৃষ্টাব্দ) নিজের লেখা 'আত-তালীউস্ সাঈদ আল-জামী লি-আসমায়ি নুজাবাস্ সাঈদ' পুস্তকে লিখেন:

حَكَى لَنَا صَاحِبُنَا الْعَدْلُ نَاصِرُ الدِّينِ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعِمَادِ أَنَّ أَبَا الطَّيِّبِ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ السَّبْئِيَّ الْمَالِكِيَّ نَزِيلَ قُوصَ، أَحَدَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، كَانَ يَجُورُ بِالْمَكْتَبِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي فِيهِ وَلِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ: يَا فَقِيهَهُ، هَذَا يَوْمٌ سُرُورٍ أَصْرَفَ الصَّبْيَانَ، فَيَصْرِفُنَا،

وَهَذَا مِنْهُ دَلِيلٌ عَلَى تَقْرِيرِهِ وَعَدَمِ انْكَارِهِ، وَهَذَا الرَّجُلُ كَانَ فَقِيهًا مَالِكِيًّا مُتَفَنًّا فِي غُلُومٍ، مُتَوَرِّعًا، أَخَذَ عَنْهُ أَبُو حَيَّانٍ وَغَيْرُهُ، وَمَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَتِسْمِائَةً.

—আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু নাসির উদ্দীন মাহমুদ বিন 'ইমাদ আমাদেরকে জানান যে, আবুল তাইয়্যাব মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম সাবতী মালেকী, যিনি ফুস্ নগরীর অধিবাসী ও অন্যতম নেককার আলেম ছিলেন, তিনি মকতব অতিক্রমের সময় বলতেন, 'ওহে আলেম! আজ খুশির দিন; শিশুদের বেরোতে দাও।' এমতাবস্থায় তাঁকে (নাসিরুদ্দীন 'ইমাদকে) বেরোতে দেয়া হতো।

এটা তাঁর কাছ থেকে (অকাট্য) প্রমাণ যে, তিনি মীলাদুন্নবী উদযাপনকে গ্রহণ করতেন এবং এর সমালোচনা করতেন না; আর তিনি ছিলেন বিভিন্ন বিদ্যাশাস্ত্রে পারদর্শী মালেকী মযহাবের ফকীহ ও নীতিপরায়ণ ব্যক্তি। (পণ্ডিত) আবু হাইয়ান ও অন্যান্যরা তাঁর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ৬৯৫ হিজরী সালে তিনি বেসালপ্রাপ্ত হন।^{৩০৬}

৩০৬. আস্-সুয়ুতী, 'হুসন আল-মাকুসিদ ফী 'আমল আল-মওলিদ', ৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা; আস্-সুয়ুতী, 'আল-হা'ওয়ী লিল-ফাতা'ওয়া', ২০৬ পৃষ্ঠা; আন্-নাবহানী: 'হুজাত-আল্লাহ 'আলা'ল-আলামীন ফী মু'জেযাত-এ-সাইয়্যেদিল-মুরসালীন', ২৩৮ পৃষ্ঠা।

৬.১৩ ইমাম তকী উদ্দীন আবুল হাসান আস্-সুবকী (৬৮৩-৭৫৬ হিজরী)

ইমাম তকী উদ্দীন আবুল হাসান আলী বিন আবদুল কাফী আস্-সুবকী (১২৮৪-১৩৫৫ খৃষ্টাব্দ) সম্পর্কে শায়খ ইসমাঈল হক্কী (১০৬৩-১১৩৭ হিজরী) নিম্নের বক্তব্য পেশ করেন:

وَقَدْ اجْتَمَعَ عِنْدَ الْإِمَامِ تَقِي الدِّينِ السُّبْكِيِّ جَمْعٌ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ، فَأَنْشَدَ مُنْشَدُ قَوْلِ الصَّرَصَرِيِّ فِي مَدْحِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

قَلِيلٌ لِمَدْحِ الْمُصْطَفَى الْخَطِّ بِالذَّهَبِ عَلَى وَرَقٍ مِنْ خَطِّ أَحْسَنُ مِنْ كُتُبِ

وَأَنْ تَنْهَضَ الْأَشْرَافُ عِنْدَ سَمَاعِهِ قِيَامًا صُفُوفًا أَوْ جُثَيًّا عَلَى الرُّكْبِ

—ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র সমসাময়িক উলামাবৃন্দের একটি বড় দল তাঁরই সদারতে সমবেত হতেন (মীলাদের মজলিশে)। আস্-সারসারীল হাসলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র রচিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসাসূচক কবিতা কোনো আবৃত্তিকার পাঠ করে শোনাতেন:

—মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় অপরিপূর্ণ,
স্বর্ণ, যা সুন্দরতম লিপিবিন্যাস কাগজে অঙ্কিত।
গণ্যমান্য সবাই তাঁর কথা হলে শ্রুত,
তাঁর প্রতি অভিবাদন করেন ব্যক্ত,
হয়ে সারিবদ্ধ বা হাঁটু গেড়ে অবনত।^{৩০৭}

৬.১৪ ইমাম ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (৭০১-৭৭৪ হিজরী)

হাফেয ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর (১৩০১-১৩৭৩ খৃষ্টাব্দ) প্রসিদ্ধ কুরআনুল করীমের ব্যাখ্যাকারী (মুফাসসির), হাদীস-শাস্ত্রজ্ঞ (মুহাদ্দীস), ইতিহাসবিদ ও ফকীহ (ইসলামী বিধানশাস্ত্রজ্ঞ) ছিলেন। তাঁর লেখা 'তাফসীরু কুরআনিল আযীম' শীর্ষক গ্রন্থটি কুরআন-ব্যাখ্যাশাস্ত্রে

৩০৭. ইসমাঈল হক্কী: 'তাফসীরে রুহুল বয়ান', ৯:৫৬; আল-হালাবী প্রণীত 'ইনসান আল-উয়ুন ফী সীরাতিল-আমীন আল-মা'মুন', ১:৮৪।

অতীব পাণ্ডিত্যপূর্ণ। ‘জামেউল মাসানীদ ওয়াস সুনান’ শীর্ষক পুস্তকে তিনি বিপুল পরিমাণ হাদীস শরীফ উদ্ধৃত করেন। ইতিহাস বিদ্যায় তার লেখা ‘আল-বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া’ গ্রন্থটি বিখ্যাত ও চমৎকার। এই বইটিতে তিনি ইরবিলের রাজা মোযাফফার আবু সাঈদ শাহের মীলাদুন্নবী উৎসব উদযাপনের বিস্তারিত এক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়াও ইবনে কাসীর একটি পুস্তিকা রচনা করেন, যার শিরোনাম ‘যিকরু মাওলিদি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া রাঈহী’। ইবনে কাসীর লিখেন:

أَوَّلُ مَا أَرْضَعَتْهُ ثَوْبَةُ مَوْلَاهُ عَمَّهُ أَبِي لَهَبٍ، وَكَانَتْ قَدْ بَشَّرَتْ عَمَّهُ بِمَيْلَادِهِ فَأَعْتَقَهَا عِنْدَ ذَلِكَ، وَلِهَذَا لَمَّا رَأَاهُ أَخُوهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَعْدَ مَا مَاتَ، وَرَوَاهُ فِي شَرِّ حَالَةٍ، فَقَالَ لَهُ: مَا لَقِيتُ؟ فَقَالَ: لَمْ أَلِقْ بَعْدَكُمْ خَيْرًا، غَيْرَ أَبِي رَقِيتُ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الثَّقَرَةِ الَّتِي فِي الْأَبْهَامِ، بَعَاتِقِي ثَوْبَةً. وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

فَلَمَّا كَانَتْ مَوْلَاةُ قَدْ سَقَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَبَنٍ عَادَ نَفَعَ ذَلِكَ عَلَيَّ عَمَّهُ أَبِي لَهَبٍ. فَسَقَى بِسَبَبِ ذَلِكَ، مَعَ أَنَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذِمَّتِهِ سُورَةَ فِي الْقُرْآنِ تَامَةً.

—মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেবায় প্রথম যে মহিলা করেন, তিনি (হুযরুর চাচা) আবু লাহাবের মুক্তিপ্রাপ্ত দাসী সোয়াইবা। তিনিই আবু লাহাবের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমনের সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে আবু লাহাব খুশি হয়ে তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলো। তার ভাই হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাঈহায়ালাহু আনহু তার মৃত্যুর পর তাকে (স্বপ্নে) সন্ধটাপন্ন দেখতে পান; তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, ‘তোমার কী হয়েছে?’ আবু লাহাব বলে, ‘আমি জাহান্নামের আগুনে আছি। তবে প্রতি সোমবারের রাতে আমার শাস্তি লাঘব করা হয় এবং আমি এ আঙ্গুলগুলোর ডগা হতে পানি পান করতে সক্ষম হই (সে তার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল

দুটো দেখিয়ে বলেছিলো এ কথা)। আর এটা সোয়াইবাকে মুক্ত করার কারণেই হয়েছে, যেহেতু সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের খোশ-খবর আমার কাছে নিয়ে এসেছিলো।’ এই হাদীসের সূত্র সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) গ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

যেহেতু দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেয়া এই মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুকের দুধ পান করিয়েছিলেন, সেহেতু ওই সেবার উপকার তাঁর চাচা আবু লাহাবের কাছে প্রতিদান হিসেবে মঞ্জুর করা হয়েছিলো, যদিও আল-কুরআনের একটি গোটা সূরা তার প্রতি অভিশাপস্বরূপ অবতীর্ণ হয়েছিলো।^{৩০৮}

৬.১৪.১ সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর ভগ্নিপতি আবু সাঈদ আল-মুযাফফর কর্তৃক উদযাপিত মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ক্রুসেড-বিজয়ী সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী (৫৩২-৫৮৯ হিজরী/ ১১৩৮-১১৯৩ খৃষ্টাব্দ)’র ভগ্নিপতি ছিলেন বাদশাহ আবু সাঈদ মোযাফফর (ইস্কেকাল: ৬৩০ হিজরী)। সুলতানের আপন বোন রাবীয়া খাতুন ছিলেন তাঁর স্ত্রী। সুলতান সালাহ উদ্দীন বাদশাহকে খুব পছন্দ করতেন। এই দু’জন নিজেদের অন্তরাত্মা দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ইসলামের প্রভূত সেবা করেন। বাদশাহ মোযাফফর শাহ ধার্মিক, নেককার ও মহানুভব ছিলেন। বাদশাহর সুউচ্চ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক হাল-অবস্থা এবং এর পাশাপাশি ইসলামের প্রতি তাঁর খেদমত দেখে সুলতান সালাহ উদ্দীন তাঁর সাথে আপন বোনকে বিয়ে দেন।

সুলতান সালাহ উদ্দীনের জবানিতে আবু সাঈদ মোযাফফর শাহের বর্ণনা এভাবে দেয়ার পর ইবনে কাসীর বাদশাহের উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা দেয়ার জন্যে একটি প্যারাগ্রাফ লিখেন, যাতে তিনি বাদশাহের জীবনী ও তাঁর অন্তরের সততা, ধার্মিকতা ও প্রকৃতি তুলে ধরেন। বাদশাহ কর্তৃক মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের একটি দীর্ঘ বর্ণনা তিনি তাতে লিপিবদ্ধ করেন। এই পবিত্র দিন উপলক্ষে আনন্দ-খুশি,

৩০৮. ইবনে কাসীর : যিকরু মাওলিদি রাসূলিল্লাহি ওয়া রাঈহীহি, ২৮:২৯।

সুখ-শান্তি প্রকাশার্থে বাদশাহের প্রচেষ্টা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার একটি চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। ইবনে কাসীর লিখেন:

الْمَلِكُ الْمُظَفَّرُ أَبُو سَعِيدٍ كَوَكْبَرِي ابْنُ زَيْنِ الدِّينِ عَلِيٍّ بْنِ تَبَكْتَكِينَ أَحَدُ الْأَجَوَادِ وَالسَّادَاتِ الْكُبَرَاءِ وَالْمُلُوكِ الْأَمْجَادِ، لَهُ آثَارٌ حَسَنَةٌ وَقَدْ عَمَرَ الْجَامِعَ الْمُظَفَّرِي بِسَفْحٍ فَاسِيُونٍ، وَكَانَ قَدْ هَمَّ بِسِيَاقَةِ الْمَاءِ إِلَيْهِ مِنْ مَاءِ بَرَزَةٍ فَمَنَعَهُ الْمُعَظَّمُ مِنْ ذَلِكَ، وَاعْتَلَّ بِأَنَّهُ قَدْ يَمُرُّ عَلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ بِالسُّفُوحِ، وَكَانَ يَعْمَلُ الْمَوْلِدَ الشَّرِيفَ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَيَحْتَفِلُ بِهِ اخْتِفَالًا هَائِلًا، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ شَهْمًا شَجَاعًا فَاتِكًا بَطْلًا عَاقِلًا عَادِلًا رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَكْرَمَ مَثْوَاهُ.

وَقَدْ صَنَفَ الشَّيْخُ أَبُو الْخَطَّابِ ابْنُ دِحْيَةَ لَهُ مُجَلَّدًا فِي الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ سَمَاهُ: التَّنْوِيرُ فِي مَوْلِدِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ، فَأَجَارَهُ عَلَى ذَلِكَ بِأَلْفٍ دِينَارٍ، وَقَدْ طَلَتْ مُدَّتُهُ فِي الْمُلْكِ فِي زَمَانِ الدَّوْلَةِ الصَّلَاحِيَّةِ، وَقَدْ كَانَ مُحَاصِرُ عَكَّا وَإِلَى هَذِهِ السَّنَةِ مُحَمُّودَ السَّيْرَةِ وَالسَّرِيرَةِ، قَالَ السَّبْطُ: حَكَى بَعْضُ مَنْ حَضَرَ سِمَاطَ الْمُظَفَّرِ فِي بَعْضِ الْمَوَالِدِ كَانَ يَمُدُّ فِي ذَلِكَ السِّمَاطِ خَمْسَةَ آلَافٍ رَأْسَ مَشْوِيِّ، وَعَشْرَةَ آلَافٍ دَجَاجَةٍ، وَمِائَةَ أَلْفٍ زُبْدِيَّةٍ، وَثَلَاثِينَ أَلْفَ صَحْنٍ حَلْوَى،

—বাদশাহ মোযাফফর শাহ, তাঁর নাম আবু সাঈদ কাওকাবুরী বিন যাইনুল আবেদীন আলী বিন বাকতগীন; তিনি মহানুভব ও জ্যেষ্ঠ বাদশাহদের একজন। তিনি অনেক ভালো কাজ রেখে গিয়েছেন এবং কাসইয়ুন পর্বতের উপরে আল-মোজাফফর জামে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। কোনো এক পর্যায়ে তিনি বারঘা হতে পানি প্রণালী দ্বারা মসজিদকে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আল-মু'আযযাম তাঁকে এ থেকে নিবৃত্ত করেন; কেননা এটা পর্বত চূড়ায় অবস্থিত মুসলমানদের কবরস্থানের উপর দিয়ে অতিক্রম করার সম্ভাবনা ছিলো।

পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে বাদশাহ মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন এবং তাতে মহা জাঁকজমকের সাথে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ অন্তরের, সাহসী, বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত ব্যক্তি। আল্লাহ পাক যেনো তাঁর প্রতি আপন করুণা বর্ষণ করেন এবং আখেরাতে তাঁকে রফে' মানযিলাত (উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ আবাসস্থল) মঞ্জুর করেন।

শায়খ আবুল খাত্তাব বিন দিহইয়া বাদশাহের উদ্দেশ্যে একটি বই লিখেছিলেন, যেটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ তথা ধরাধামে শুভাগমন দিবস উদযাপন উপলক্ষে ব্যবহৃত হতো। এর শিরোনাম ছিলো ‘আত-তানভীর ফী মাওলিদিল বাশীরিন্ নাযীর’। মোযাফফর শাহ এই গ্রন্থটির জন্যে ইবনে দিহইয়াকে এক হাজার দিনার দান করেন। বাদশাহ (সিরিয়ার) সালাহীয়া নগরীতে ক্ষমতাসীন ছিলেন, যতোদিন না আক্কা নগরী অবরুদ্ধ হয় এবং ক্রুসেডার গোষ্ঠীর অবরোধে আক্কায় তিনি ইস্তেকাল করেন (৬৩০ হিজরী); আর এই পুস্তকটি তাঁর সাথে ছিলো ওই পুরোটুকু সময়ই। তিনি ছিলেন প্রশংসনীয় চরিত্র ও ধার্মিকতার অধিকারী।

সিবত ইবনে জাওয়াযী বলেন, মোযাফফর শাহের উদযাপিত মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী জনৈক ব্যক্তি উল্লেখ করেন যে, শাহী খাবার টেবিলে পাঁচ হাজার ছাগলের মাথা, দশ হাজার মোরগ, এক লাখ মাটির পাত্রভর্তি দুধ ও ত্রিশ হাজার প্লেটভর্তি মিষ্টি থাকতো।^{৩০৯}

ইবনে কাসীরের নিম্নোক্ত বক্তব্যটি সম্পর্কে ভাবুন:

وَكَانَ يَحْضُرُ عِنْدَهُ فِي الْمَوْلِدِ أَعْيَانُ الْعُلَمَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ فَيَخْلَعُ عَلَيْهِمْ وَيُطْلِقُ لَهُمْ وَيَعْمَلُ لِلصُّوفِيَّةِ سَمَاعًا مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الْفَجْرِ، وَيَرْقُصُ بِنَفْسِهِ مَعَهُمْ، وَكَانَتْ لَهُ دَارٌ ضَيْفَانِيَّةٌ لِلْوَافِدِينَ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ، وَكَانَتْ صَدَقَاتُهُ

৩০৯. ইবনে কাসীর, ‘আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়া’, ৯:১৮; মুহিবী, ‘খুলাসা আল-আসার ফী আ’এয়া’ন আল-ক্বার্ন আল-হা’দী ‘আসহার’, ৩:২৩৩; আস-সুয়ুতী, ‘হসন আল-মাকুসিদ ফী ‘আমলিল মওলিদ’, ৪২-৪৪ পৃষ্ঠা; আস-সুয়ুতী, ‘আল-হা’উয়ী লিল-ফাতা’ওয়া’, ২০০ পৃষ্ঠা; আহমদ বিন যাইনী দাহলান, ‘আল-সীরাত আল-নববীয়া’, ১:৫৩-৫৪।

فِي جَمِيعِ الْقُرْبِ وَالطَّاعَاتِ عَلَى الْحَرَمَيْنِ وَعَنْيَهُمَا، وَيَتَّفَكَ مِنَ الْفِرْنَجِ فِي كُلِّ سَنَةٍ خَلْقًا مِنَ الْأَسَارَى، حَتَّى قِيلَ إِنَّ جُمْلَةً مِّنْ اسْتَفَكَةٍ مِنْ أَيْدِيهِمْ سِتُّونَ أَلْفَ أُسِيرٍ، قَالَتْ زَوْجَتُهُ رَبِيعَةُ خَائُونٌ بِنْتُ أُيُوبَ وَكَانَ قَدْ رَوَّجَهُ إِيَّاهَا أَخُوهَا صَلاَحُ الدِّينِ، لَمَّا كَانَ مَعَهُ عَلَى عَكَا قَالَتْ: كَانَ قَمِيصُهُ لَا يُسَاوِي خَمْسَةَ دِرَاهِمٍ فَعَاتَبْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ: لُبْسِي ثَوْبًا بِخَمْسَةِ وَأَتَصَدَّقُ بِالْبَاقِي خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَلْبَسَ ثَوْبًا مُثَمَّنًا وَأَدْعِ الْفَقِيرَ الْمُسْكِينَ، وَكَانَ يَصْرِفُ عَلَى الْمَوْلِدِ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثِمِائَةَ أَلْفٍ دِينَارٍ، وَعَلَى دَارِ الصِّيَافَةِ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِائَةَ أَلْفٍ دِينَارٍ. وَعَلَى الْحَرَمَيْنِ وَالْمِيَاهِ بِدَرْبِ الْحِجَازِ ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِينَارٍ سِوَى صَدَقَاتِ السَّرِّ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَكَانَتْ وَقَاتُهُ بِقَلْعَةِ إِرْبِلَ، وَأَوْصَى أَنْ يُحْمَلَ إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ يَتَّفَقْ فُدِّنَ بِمَشْهَدٍ عَلِيٍّ.

—প্রখ্যাত হক্কানী আলেম ও সূফীবন্দ এই মীলাদুল্লবী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন; আর বাদশাহ মোযাফফার শাহ তাঁদেরকে রাজকীয় সম্মানসূচক জুব্বা উপহার দিতেন। তিনি সূফীদের সমাবেশে সেমা^{৩১০} তথা আধ্যাত্মিক গানের মাহফিলসমূহ আয়োজন করতেন, যা যোহরের নামাযের পর হতে আসরের নামাযের আগ পর্যন্ত চলতো; আর তিনিও সূফীমণ্ডলীর সাথে ওয়াজদ তথা হালে মগ্ন হতেন। বিভিন্ন রাজ্য হতে আগত প্রতিনিধি দলের জন্যে তিনি একটি মেহমানখানা রেখেছিলেন, আর নানা পেশার মানুষেরা বিভিন্ন এলাকা থেকে সেখানে আসতেন। তিনি উত্তম কাজে ও তাআত তথা ধর্মীয় আনুগত্যমূলক কর্মে বিপুল পরিমাণ দান-সদকা করতেন; এভাবে তিনি হারামাঈন শরীফাইন ও অন্যান্য পবিত্র স্থানের জন্যে দান-সদকা করতেন এবং প্রতি বছর বিশাল সংখ্যক ‘ফারান্জ’ (খৃষ্টান ক্রুসেডার) বন্দিদের মুক্ত করে দিতেন। কথিত আছে যে, তিনি সর্বমোট ষাট হাজার বন্দিকে মুক্ত করেন।

বাদশাহর স্ত্রী রাবী‘আ খাতুন বিনতে আইয়ুব (যাঁর ভাই সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী তাঁকে বাদশাহের সাথে আক্কা নগরীতে বিয়ে দিয়েছিলেন) বিবৃত করেন, বাদশাহর আলখেল্লা পাঁচ দিরহামের বেশি দামি ছিলো না।

আমি তাঁর জামা-কাপড়ের পছন্দ নিয়ে সমালোচনা করলে তিনি আমায় বলেন, ‘আমার জামাতে পাঁচ দিরহাম ব্যয় করে বাকি অর্থ দান-সদকাহ করা আমার কাছে দামি কাপড় পরে দরিদ্র ও বঞ্চেয়া ক্ষুদ্র মানুষকে অবহেলা করার চেয়ে অধিক প্রিয়’। মীলাদুল্লবী বাবদ তাঁর বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াতে তিন লাখ দিনার, আর তিনি অতিথিশালার রক্ষণাবেক্ষণে প্রতি বছর ব্যয় করতেন দুই লাখ দিনার। পবিত্র হারামাঈন শরীফাইনের জন্যে এবং হেজাজ অঞ্চলে অবস্থিত সমস্ত পানি সেচ কেন্দ্রগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে তিনি বাৎসরিক আরো ব্যয় করতেন ত্রিশ হাজার দিনার। আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে, এসব ব্যয়ের কোনোটাতেই মোযাফফার শাহের গোপন দান অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। তিনি ইরবিলের দুর্গে ইন্তেকাল করেন এবং এই মর্মে অসীয়াত করে যান যেনো তাঁকে দাফনের জন্যে মক্কা মোযাযযমায় নেয়া হয়; কিন্তু তা সম্ভব না হওয়ায় মাশাদ আলীতে তাঁকে দাফন করা হয়।^{৩১০}

মীলাদুল্লবী অনুষ্ঠান উদযাপনে বাদশাহ তিন লাখ দিনার ব্যয় করতেন। স্পষ্টতঃ ইবনে কাসীর এই বিপুল ব্যয়কে অনুমোদন করেছিলেন। কেননা তিনি এর সমালোচনায় একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। মনে রাখবেন যে (তখনকার) এক দিনার সমান বর্তমানের আনুমানিক দু’বৃটিশ পাউন্ড স্টারলিং; সে অনুযায়ী মীলাদুল্লবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপন উপলক্ষে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ছয় লাখ বৃটিশ পাউন্ড স্টারলিং। অধিকন্তু, আমরা প্রায় ৮০০ বছর আগের প্রেক্ষাপটে ছয় লাখ বৃটিশ পাউন্ডের কথা বলছি। এই পরিমাণ অর্থ যদি বর্তমান মানদণ্ডে আমাদের তুলনা দিতে হতো, তাহলে এ কথা বলা যেতো যে, এক দিনার সমান কম করে হলেও স্বর্ণের এক আউন্স (প্রায় আধ ছটাক)-এর এক-চতুর্থাংশ; এটা আমাদের সময়কার চার হাজার পাকিস্তানী রুপী হবে। অনুরূপভাবে, এক দিনার সমান বর্তমানের চল্লিশ বৃটিশ পাউন্ড স্টারলিং হবে। অতএব, চল্লিশ পাউন্ডকে তিন লক্ষ পাউন্ড দ্বারা গুণ দেয়া হলে তা বারো লক্ষ পাউন্ড স্টারলিংয়ের সমান হবে। তবে এটা শ্রেফ একটা হিসেব মাত্র।

৩১০. ইবনে কাসীর, ‘আল-বেদায়া ওয়ান্ নেহায়া’, ৯:১৮; আস্-সুয়ুতী, ‘হুসন আল-মাকুসিদ ফী আমলিল-মওলিদ’, ৪৪ পৃষ্ঠা; আস্-সুয়ুতী, আল-হা‘উয়ী লিল-ফাতা‘ওয়া’, ২০০ পৃষ্ঠা; আল-সা‘রেহী, সুবুল হদা ওয়ার রশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ, ১:৩৬২-৩৬৩; আন-নাবহানী, হুজ্জাতুল্লা‘হি ‘আলা‘ল ‘আলামীন ফী মো‘জেযাতে সাইয়েদিল মুরসালীন’, ২৩৬ পৃষ্ঠা।

৬.১৫ ইমাম বুরহান উদ্দীন বিন জামা'আ (৭২৫-৭৯০ হিজরী)

বুরহান উদ্দীন আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন আবদুর রহীম বিন ইবরাহীম বিন জামা'আ আশ্-শাফেঈ (১৩২৫-১৩৮৮ খৃষ্টাব্দ) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ বিচারক ও মুফাস্সির। তিনি কিতাবুল্লাহ শরীফের একটি দশ খণ্ডবিশিষ্ট তাফসীরগ্রন্থ লিখেছিলেন। মীলাদুন্নবী সংক্রান্ত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করতে গিয়ে মোল্লা আলী ক্বারী (ইন্তেকাল: ১০১৪ হিজরী) নিজ 'আল-মাওরিদুর রাভী ফী মাওলিদিন নববী ওয়া নাসাবিহিত তাহির' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন:

فَقَدْ اتَّصَلَ بِنَا أَنَّ الزَّاهِدَ الْفُذَوَةَ الْمُعَمَّرَ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحِيمِ
بْنِ إِبْرَاهِيمَ جَمَاعَةً لَّمَّا كَانَ بِالْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى سَاكِنًا أَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَأَكْمَلَ
الشَّحِيحَةِ، كَانَ يَعْمَلُ طَعَامًا فِي الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ، وَيُطْعِمُ النَّاسَ، وَيَقُولُ: لَوْ
تَمَكَّنْتُ عَمَلْتُ بِطَوْلِ الشَّهْرِ كُلِّ يَوْمٍ مَوْلِدًا.

—আমাদের কাছে (এ তথ্য) এসেছে যে, যুহদ তথা দুনিয়ার মোহত্যাগী ও পুণ্যবানের জ্বলন্ত নিদর্শন আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন আবদুর রহীম বিন ইবরাহীম বিন জামা'আ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনা নগরীতে আগমন করতেন, তখন তিনি মীলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষে খাবার তৈরি করতেন এবং ঘোষণা করতেন, 'আমার যদি সামর্থ্য থাকতো, তাহলে আমি মাসের প্রতিটি দিনই মীলাদুন্নবী মাহফিলের আয়োজন করতাম।'^{৩১১}

৬.১৬ যাইন উদ্দীন ইবনে রজব আল-হাম্বলী (৭৩৬-৭৯৫ হিজরী)

আল্লামা যাইন উদ্দীন আবদুর রহমান বিন আহমদ ইবনে রাজাব আল-হাম্বলী (১৩৩৬-১৩৯৩ খৃষ্টাব্দ) হাম্বলী মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ও ইসলামী গবেষক, যিনি অনেক বই লিখেছেন। তাঁর রচিত 'লাতায়েফ আল-মা'আরিফ ফী-মা লি-মাওয়া'সিমিল আম মিনাল ওয়াযায়েফ' শীর্ষক পুস্তকে তিনি বিভিন্ন

৩১১. মোল্লা আলী ক্বারী, 'আল-মওরিদ আল-রাওয়ী ফী মওলিদিন নববী ওয়া নাসাবিহি আল-তা'হির', ১৭ পৃষ্ঠা।

ইসলামী মাস এবং সেগুলোর ফযীলত তথা উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে, আর সেগুলোতে যেসব এবাদত ও নেক আমল পালন করা উচিত সে সম্পর্কেও বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের জন্যে তিনি ওই বইয়ে তিনটি অধ্যায় সংরক্ষণ করেন। দুটি অধ্যায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদত তথা ধরণীতলে শুভাগমন ও নবুওয়্যতের সূচনা নিয়ে ব্যাপ্ত; অপরদিকে, তৃতীয় অধ্যায়টি তাঁর যাহেরী বা বাহ্যিক তিরোধান তথা বেসালপ্রাপ্তি সম্পর্কে আলোকপাত করে। রবিউল আউয়াল অধ্যায়টিতে লেখক এই মাসে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা-সংক্রান্ত বেশ কিছু হাদীস সংকলন করেন এবং এগুলোতে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-সম্পর্কিত হাদীসগুলো অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বিবৃত করেন:

خَرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ فِي أُمِّ الْكِتَابِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجِدٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَوْفَ أُتْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ، أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبِشَارَةِ عَيْسَى قَوْمَهُ، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَتْ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ، وَكَذَلِكَ أُمَمَاتُ الْمُؤْمِنِينَ يَرَيْنَ.

—ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উদ্ধৃত করেন হযরত ইরবাদ ইবনে সারিয়া রাদ্দিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনাটি, যাতে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী উদ্ধৃত করেন, 'নিশ্চয় আমি তখনো লাওহে মাহফুজে খাতেমুল আশ্বিয়ার সীল-মোহরপ্রাপ্ত (নবী) ছিলাম যখন আদম আলাইহিস্ সালামের কায়া মাটি ছিলো। আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলছি যে, আমি হলাম আমার পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের দু'আর ফল^{৩১২}; হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক তাঁর জাতিকে প্রদত্ত (আগাম) সুসংবাদের পরিপূর্ণতা^{৩১৩}; আর আমার মহীয়সী মায়ের দেখা (অলৌকিক) স্বপ্নের বাস্তবায়ন। তিনি তাতে তাঁর পবিত্র শরীর মোবারক থেকে বিচ্ছুরিত এমন প্রভা দেখতে পেয়েছিলেন, যা

৩১২. আল কুরআন: সূরা বাকারা, ২:১২৯।

৩১৩. আল কুরআন: সূরা সফ, ৬১:৬।

সিরিয়ার প্রাসাদগুলো পর্যন্ত আলোকিত করেছিলো। বস্তুতঃ আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মাতাবুন্দ এ ধরনের স্বপ্ন দেখেছেন।^{৩১৪}

অতঃপর লেখক এতে^{৩১৫} বেশ কিছু হাদীসের উল্লেখ করেন, যার দরুন স্পষ্ট হয় যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের সময়কার রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাবলীর বর্ণনাগুলো গ্রহণযোগ্য, সম্মানিত ও চমৎকার বিষয়।

৬.১৭ ইমাম ওলী উদ্দীন আবু যুর'আ আল-ইরাকী (৭৬২-৮২৬ হিজরী)

ওলী উদ্দীন আবু যুর'আ আহমদ বিন আবদুর রহীম বিন হুসাইন আল-ইরাকী (১৩৬১-১৪২৩ খৃষ্টাব্দ) হাদীস ও ফিক্হ-শাস্ত্রের প্রখ্যাত আলেম। একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় এ মর্মে যে, মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদযাপন মোস্তাহাব (প্রশংসনীয়), না বর্জনীয়; নাকি এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত অন্য কোনো ফতোয়া বিদ্যমান। তিনি উত্তর দেন:

إِطْعَامُ الطَّعَامِ مُسْتَحَبٌّ فِي كُلِّ وَقْتٍ، فَكَيْفَ إِذَا أَنْصَمَ لِدَالِكَ السُّرُورِ بِظُهُورِ نُورِ التَّبَوُّةِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الشَّرِيفِ، وَلَا نَعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ السَّلَفِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ بِدْعَةٍ كَوْنِهِ مَكْرُوهًا، فَكَمْ مِنْ بِدْعَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ بَلْ وَاجِبَةٍ.

—অন্যদের খাদ্য দান করা সর্বদাই মোস্তাহাব; অতএব, এর সাথে যদি নবুওয়্যতের নূর তথা জ্যোতির আলোকে এই (রবিউল আউয়াল) মাসে খুশি প্রকাশ করা হয়, তাহলে তা হবে আরো আশীর্বাদময়। এটা প্রাথমিক

৩১৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রণীত ‘আল-মুসনাদ’, ৪:১২৭-১২৮ #১৭,১৯০-১৭১৯১ ও ১৭,২০৩; ইবনে হিব্বান কৃত ‘সহীহ’, ১৪:৩১২ #৬,৪০৪; আল-হাকিম লিখিত ‘আল-মোস্তাদরাক’, ২:৬৫৬ #৪১৭৪; আল-তাবারানী রচিত ‘আল-মুজাম আল-কবীর’ ১৮:২৫৩ #৬৩১; আল-তাবারানী প্রণীত ‘মুসনাদ আল-শামিয়ান’, ২:৩৪০ #১৪৫৫; ইবনে সাআদ কৃত ‘আল-তাবাকাত আল-কুবরা’, ১:১৪৯; আল-হায়তামী লিখিত ‘মাওয়াযির আল-যাম’আন ইলা’ যাওয়াইদে ইবনে হিব্বান’, ৫১২ পৃষ্ঠা #২০৯৩; আল-হায়তামী রচিত ‘মজমাউল যাওয়াঈদ ওয়া মানবাআ’ আল-ফাওয়াঈদ’, ৮:২২৩; আল-‘আসকালানী প্রণীত ‘ফাতহুল বা’রী’, ৬:৫৮৩; ইবনে কাসীর কৃত ‘আল-বেদা’য়া ওয়াল-নেহা’য়া’, ২:৩২১।

৩১৫. ইবনে রাজাব হাম্বলী রচিত ‘লাতায়েফ আল-মাআরিফ ফীমা’ লি-মাওয়াসিম আল-‘আম মিন আল-ওয়ায়ায়েফ’, ১৫৮-২১৬ পৃষ্ঠা।

যুগের ‘সলাফে সালেহীন’ কর্তৃক অনুশীলিত হয়েছে কি না, তা আমরা জানি না ঠিক; তবে এটা নতুন প্রচলন (বেদআত) হওয়ার বাস্তবতা এই নয় যে একে অপছন্দনীয় হতেই হবে। কেননা কতো বেদআত যে মোস্তাহাব, এমন কি বাধ্যতামূলকও (তার কোনো ইয়ত্তা নেই)!^{৩১৬}

৬.১৮ হাফেজ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আদ-দামেস্কী (৭৭৭-৮৪২ হিজরী)

হাফেজ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন নাসির উদ্দীন দামেস্কী তাঁর রচিত ‘মওরুদুস সাদী ফী মাওলিদিল হাদী’ পুস্তকে লিখেন:

وَقَدْ صَحَّ أَنَّ أَبَاهُ يُخَفِّفُ عَنْهُ عَذَابُ النَّارِ فِي مِثْلِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ، لِإِعْتَاقِهِ تَوْبَةَ سُورًا بِمِيلَادِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত উপলক্ষে খুশি হয়ে সুয়াইবিয়াকে মুক্ত করার ফলে আবু লাহাবের (পরকালীন) শাস্তি যে প্রতি সোমবার লাঘব করা হয়, তা নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় এসেছে।

إِذَا كَانَ هَذَا كَافِرًا جَاءَ دَمُهُ وَتَبَّتْ يَدَاهُ فِي الْجَحِيمِ مُخَلَّدًا
أَنَّهُ فِي يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ دَائِمًا يُخَفِّفُ عَنْهُ لِلسُّرُورِ بِأَحْمَدَا
فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي طَوَّلَ عُمُرُهُ ... بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحَّدًا

—এই অবিশ্বাসী, যার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ ভরসনাপূর্ণ ঐশীবাণী, জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত যার দুই পাণি; খুশি প্রকাশের ফলে নিরন্তর সোমবারে যার লাঘব হয় শাস্তি, তাহলে মহানবীর ওই গোলামের ভাগ্যে মঞ্জুর কতোই না স্বস্তি; মাহবুবের প্রতি সন্তুষ্টিসহ হয়েছে যাঁর বিশ্বাসীর বেসালপ্রাপ্তি।^{৩১৭}

৩১৬. আলী বিন ইবরাহীম, ‘তামনীফ আল-আযান বি-আসরা’র আল-আযান’, ১৩৬ পৃষ্ঠা।

৩১৭. ইমাম সুয়ুতী, ভসনুল মাকাসিদ ফী আমালিল-মাওলিদ, ৬৬ পৃষ্ঠা; ইমাম সুয়ুতী, ‘আল-হাওয়াযী লিল-ফাতাওয়া’, ২০৬ পৃষ্ঠা; আস-সালেহী, ‘সুবুল আল-হুদা’ ওয়াল-রাশাদ ফী সীরাতে খায়রিল ‘এবাদ’, ১:৩৬৭; আহমদ যাইনী দাহলান মক্কী, ‘আল-সীরাতে আল-নববীয়া’, ১:৫৪; আন-নাবহানী, ‘হজ্জাত-আল্লাহি ‘আলা’ল ‘আলামীন ফী মো’জেযাতে সাইয়েদিল মুরসালীন’, ২৩৮ পৃষ্ঠা।

৬.১৯ হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হিজরী)

সহীহ বুখারী হাদীসগ্রন্থের ব্যাখ্যাকারী হাফেজ শিহাব উদ্দীন আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজর আসকালানী (১৩৭২-১৪৪৯ খৃষ্টাব্দ) মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের বৈধতার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করেছেন। এই দিনটিকে স্মরণ করার অনুমতির একটি দলিল তিনি উপস্থাপন করেন, যা ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (৮৪৯-৯১১ হিজরী) উদ্ধৃত করেন এভাবে যে,

وَقَدْ سِئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ حَافِظُ الْعَصْرِ أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ حَجَرَ عَنْ عَمِلِ الْمَوْلِدِ، فَأَجَابَ بِمَا نَصَّهُ: قَالَ: وَقَدْ ظَهَرَ لِي تَحَرُّيْهَا عَلَى أَصْلِ ثَابِتٍ وَهُوَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: هُوَ يَوْمٌ أَعْرَقَ اللَّهُ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَنَجَّى مُوسَى فَنَحْنُ نَصُومُهُ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى، فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فِعْلُ الشُّكْرِ لِلَّهِ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ إِسْدَاءِ نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ، وَيُعَادُ ذَلِكَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ،

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ يَحْصُلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كَالسُّجُودِ وَالصَّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالتَّلَاوَةِ، وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمُ مِنَ النِّعْمَةِ بِرُؤُوسِ هَذَا النَّبِيِّ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ؟

وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُتَحَرَّى الْيَوْمُ بِعَيْنِهِ حَتَّى يُطَابِقَ قِصَّةَ مُوسَى فِي يَوْمٍ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ لَمْ يَلَاحِظْ ذَلِكَ لَا يُبَالِي بِعَمَلِ الْمَوْلِدِ فِي أَيِّ يَوْمٍ مِنَ الشَّهْرِ، بَلْ تَوَسَّعَ قَوْمٌ فَتَقَلَّوْهُ إِلَى يَوْمٍ مِنَ السَّنَةِ، وَفِيهِ مَا فِيهِ. فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِأَصْلِ عَمَلِ الْمَوْلِدِ.

وَأَمَّا مَا يُعْمَلُ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى مَا يُفْهِمُ الشُّكْرَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ التَّلَاوَةِ وَالْإِطْعَامِ وَالصَّدَقَةِ وَإِنْشَادِ شَيْءٍ مِنَ الْمَدَائِحِ النَّبَوِيَّةِ وَالرُّهُدِيَّةِ الْمُحَرَّكَةِ لِلْقُلُوبِ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرِ وَالْعَمَلِ لِلْآخِرَةِ.

—হাদীসশাস্ত্র বিশারদ ও তাঁর যুগের শায়খুল ইসলাম (ইমাম) আবুল ফযল ইবনে হাজর আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে মীলাদ শরীফ উদযাপন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি উত্তর দেন:

মীলাদ শরীফের ভিত্তি হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি এমন একখানি শরঈ দলীল, যা আমি প্রাপ্ত হয়েছি। এটা সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বিদ্যমান। এই হাদীসে বিবৃত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মোনাওয়ারায় এসে দেখেন ইহুদী জাতিগোষ্ঠী আশুরার দিন রোযা রাখছেন। তিনি এ ব্যাপারে তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা উত্তর দেন, ‘এই দিনটিতে আল্লাহ তা‘আলা ফিরাউনকে (পানিতে) ডুবিয়ে মারেন এবং হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে রক্ষা করেন। এ কারণে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আমরা এই দিনটিতে রোযা রাখছি।’ এই দলিলে কোনো বিশেষ দিনে আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামত বা বিপদমুক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বৈধতার প্রমাণ মেলে এবং প্রতি বছর (একই দিন) ওই কৃতজ্ঞতার পুনঃপুন বহিঃপ্রকাশের পক্ষেও প্রমাণ পাওয়া যায়।

আল্লাহর প্রতি শোকরিয়া আদায় বিভিন্ন এবাদত দ্বারা করা যায়; যেমন— নামায, সিজদা, রোযা, দান-সদকাহ কিংবা কুরআন তিলাওয়াত করা। উপরন্তু, এই দিনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনের রহমতের চেয়ে বড় খোদায়ী রহমত, নেয়ামত, আশীর্বাদ আর কী হতে পারে?

এই দলিলের ভিত্তিতে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের উপাখ্যান যাতে আশুরার দিনের সাথে মিলে যায়, সেই লক্ষ্যে চেষ্টা বা সাধনা করা জরুরি।

তবে কেউ এর (মীলাদ দিবসের) উপর আমল না করলে সারা (রবিউল আউয়াল) মাসের যে-কোনো দিন মীলাদুন্নবী উদযাপনে কোনো ক্ষতি

নেই। বস্তুতঃ কেউ কেউ এই বিষয়টিকে পুরোপুরি এমনভাবে উল্লুভ করে দিয়েছেন যে, বছরের যে-কোনো দিনে তা উদযাপিত হতে পারে। মীলাদের আমলের ভিত্তি সম্পর্কে এটাই বলা যায়।

আর মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে যা অনুশীলিত হওয়া জরুরি, তা হলো এমন সব পুণ্যদায়ক কর্ম, যেগুলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশক বলে বিবেচিত। যেমন— ইতিপূর্বে উল্লেখিত আমলগুলো: কুরআন তিলাওয়াত, আতিথেয়তা, দান-সদকাহ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কবিতা আবৃত্তি কিংবা এমন পদ্য আবৃত্তি, যা মানুষের অন্তরকে সততা ও কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে এবং পরকালের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয় ইত্যাদি।^{৩১৮}

৬.২০ ইমাম শামসুদ্দীন আস্-সাখাভী (৮৩১-৯০২ হিজরী)

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের পক্ষে ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান সাখাভী (১৪২৮-১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ) একটি ফতোয়া জারি করেন, যাতে তিনি বিবৃত করেন:

وَأَنَّمَا حَدَّثَ بَعْدَ، ثُمَّ لَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ فِي سَائِرِ الْأَقْطَارِ وَالْمَدَنِ الْكِبَارِ يَحْتَفِلُونَ فِي شَهْرِ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَمَلِ الْوَلَائِمِ الْبَدِيعَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْأُمُورِ الْبَهْجَةِ الرَّفِيعَةِ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيْلِيهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيَظْهَرُونَ السُّرُورَ وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلُّ فَضْلٍ عَمِيمٍ. أَنْتَهَى.

৩১৮. আস্-সুযুতী, হুসনুল মাকাসিদ ফী আমালিল-মাওলিদ, ৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা; আস্-সুযুতী, 'আল-হা'ওয়ী লিল-ফাতা'ওয়া', ২০৫-২০৬ পৃষ্ঠা; আস্-সালেহী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ, ১:৩৬৬; আয-যুরকানী মালেকী, 'শরহ আল-মাওয়া'হিব আল-লাদুন্নিয়া বিল-মিনাহ আল-মুহাম্মাদীয়া', ১:২৬৩; আহমদ যাইনী দাহলা'ন মক্কী, 'আল-সীরাত আল-নববীয়া', ১:৫৪;

চ) আন-নাবহানী, 'হুজ্জাত-আল্লাহ'হ 'আলা'ল-আলামীন ফী মো'জেয়া'তে সাইয়েদিল মুরসালীন', ২৩৭ পৃষ্ঠা।

وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْحَيْرِ بْنِ الْجَزَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى شَيْخُ الْقُرَاءِ: مِنْ حَوَاصِّهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةً بِنَيْلِ الْبَغِيَّةِ وَالْمَرَامِ.

—(মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহফিল উদযাপন) পুণ্যাত্মাদের প্রথম তিনটি প্রজন্ম (কুর'ানে সালাসাহ) হতে বর্ণিত হয়নি সত্য; এটা নেক উদ্দেশ্য ও একনিষ্ঠার সাথে পরবর্তীকালে প্রবর্তিত হয়। ইসলামের অনুসারীরা বিভিন্ন দেশ ও শহরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের মাসটিতে বড় বড় মেজবান, খানাপিনা ও সমাবেশের আয়োজন করে থাকেন। মীলাদুন্নবীর রাতগুলোতে মুসলমান সম্প্রদায় দান-সদকাহ ও খুশি প্রকাশ করেন, আর বেশি বেশি পুণ্যদায়ক কর্মের অনুশীলনও করে থাকেন। বস্তুতঃ তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমন-স্থানের নৈকট্য হতে ফায়দা গ্রহণ করেন, আর এর আশীর্বাদে তাঁদের উপর প্রতিটি মহা নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশও ঘটে। এই বিষয়টি পরীক্ষিত ও সত্য, যেমনটি ইমাম শামসুদ্দীন জাযারী বর্ণনা করেন, 'এটা সারা বছরের নিরাপত্তা ও শান্তি উৎস এবং এর ফলশ্রুতিতে দ্রুত মনোবাসনা পূরণের সুসংবাদ পাওয়া যায়।'^{৩১৯}

৬.২১ ইমাম জালাল উদ্দীন সুযুতী (৮৪৯-৯১১ হিজরী)

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ে বিস্তারিত মতামত প্রকাশকারী মহান লেখক ও গবেষকবৃন্দের মধ্যে ইমাম জালাল উদ্দীন আবদুর রহমান বিন আবী বকর সুযুতী (১৪৪৫-১৫০৫ খৃষ্টাব্দ)-কে অন্যতম একজন বলে স্বীকার করা হয়। এ সম্পর্কে আমরা তাঁর গবেষণাকর্ম 'হুসনুল মাকাসিদ ফী আমালিল মীলাদ' গ্রন্থটির উদ্ধৃতি পেশ

৩১৯. মোল্লা আলী ক্বারী, 'আল-মওরিদ আল-রাওয়ী ফী মওলিদ আল-নববী ওয়া নাসাবিহি আল-তা'হির', ১২-১৩ পৃষ্ঠা; আস্-সালেহী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ, ১:৩৬২; আল-হালাবী, 'এনসা'ন আল-'উযুন ফী সীরাতিল আমীন আল-মা'মুন', ১:৮৪; ইসমা'ঈল হাক্কী, 'তাফসীর রুহ আল-বয়া'ন', ৯:৫৬-৫৭; আহমদ বিন যাইনী দাহলা'ন মক্কী, 'আল-সীরাত আল-নববীয়া', ১:৫৩; আন-নাবহানী, 'হুজ্জাত-আল্লাহ'হ 'আলা'ল-আলামীন ফী মো'জেয়া'তে সাইয়েদ আল-মুরসালীন', ২৩৩ পৃষ্ঠা।

করবো। এটা তাঁরই আরেকটা প্রধান গবেষণাকর্ম ‘আল-হাভী লিল-ফাতওয়া’ শীর্ষক পুস্তকের উদ্ধৃতি। শ্রদ্ধেয় লেখক মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে কুরআন-হাদীসের দলিলাদি ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি উপস্থাপনের পাশাপাশি ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, বিধানিক এবং আইনী বিষয়াদিও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। এ কাজে তিনি অন্যান্য অসংখ্য আলোচকের রায়ও উদ্ধৃত করেন।

নিচে ওই পুস্তক হতে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ধৃতি দেয়া হলো:

د. أَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِي هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرَوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَأِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَقَعَ فِي مَوْلِدِهِ مِنَ الْآيَاتِ، ثُمَّ يَمْدُّ لَهُمْ سِمَاطُ يَأْكُلُونَهُ وَيَنْصَرِفُونَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ - هُوَ مِنَ الْبَدْعِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ قَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِظْهَارِ الْفَرَجِ وَالْإِسْتِشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيفِ.

১. মীলাদুন্নবী উদযাপনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (ধর্মীয়) জন-সমাবেশ, কুরআন তিলাওয়াত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐশী মিশনের নানা পূর্বাভাস ও ধরণীতলে শুভাগমনের সময়কার বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা ও তবারুকের ব্যবস্থা ইত্যাদি। আমার দৃষ্টিতে এটা একটা উত্তম বেদআত তথা নতুন প্রচলন, যা পুরস্কারযোগ্য। কেননা এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান-মান সম্মুখতকরণ ও তাঁরই পবিত্র বেলাদতে খুশির বহিঃপ্রকাশ বৈ কিছু নয়।^{৩২০}

২. إِنَّ وَلَادَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمُ التَّعَمُّعِ عَلَيْنَا، وَوَفَاتُهُ أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ لَنَا، وَالشَّرِيعَةُ حَثَّتْ عَلَى إِظْهَارِ شُكْرِ التَّعَمُّعِ وَالصَّبْرِ وَالسُّكُونِ

৩২০. আস্-সুয়ূতী, ‘হুসন আল-মাকুসিদ ফী আমালিল-মওলিদ’, ৪১ পৃষ্ঠা; আস্-সুয়ূতী, ‘আল-হা’উয়ী লিল-ফাতা’উয়ী’, ১৯৯ পৃষ্ঠা; আস্-সালেহী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ, ১:৩৬৭; আন-নাবহানী, ‘হুজ্জাত-আল্লাহ ‘আলা’ল-‘আলামীন ফী মো’জিয়া’তে সাইয়্যেদিল মুরসালীন’, ২৩৬ পৃষ্ঠা।

وَالَكُمْ عِنْدَ الْمَصَائِبِ، وَقَدْ أَمَرَ الشَّرْعُ بِالْعَقِيقَةِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ، وَهِيَ إِظْهَارُ شُكْرِ وَفَرَجٍ بِالْمَوْلُودِ، وَلَمْ يَأْمُرْ عِنْدَ الْمَوْتِ بِدَبْحٍ وَلَا بِغَيْرِهِ بَلْ نَهَى عَنِ التِّيَاخَةِ وَإِظْهَارِ الْجَزَعِ، فَدَلَّتْ قَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ عَلَى أَنَّهُ يَحْسُنُ فِي هَذَا الشَّهْرِ إِظْهَارُ الْفَرَجِ بِوِلَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ إِظْهَارِ الْحُزْنِ فِيهِ بِوَفَاتِهِ،

২. নিশ্চয় আপনার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ধরাধামে শুভাগমন আমাদের জন্য বড় নেয়ামত; আর বেসালপ্রাপ্তি সবচেয়ে মারাত্মক দুর্ভোগ। শরীয়ত আমাদেরকে আশীর্বাদপ্রাপ্তির সময় কৃতজ্ঞ ও দুর্ভোগে ধৈর্যধারণ করে শান্ত থেকে তা ভুলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। কোনো শিশুর জন্মকালে ‘আকীকা’ পালনের বিধান দেয়া হয়েছে এবং সেটা ওই নবজাতকের খাতিরে কৃতজ্ঞতা ও খুশি প্রকাশের উদ্দেশ্যেই করা হয়; কিন্তু কোনো শিশুর ইস্তেকাল হলে পশু কুরবানী বা অনুরূপ কিছু করার বিধান দেয়া হয়নি। বস্তুতঃ (ঐশী বিধানের প্রতি) অসন্তোষ প্রকাশক বিলাপ ও কান্নাকাটির নিষেধমূলক বিধান জারি করা হয়েছে। অতএব, শরীয়তের নীতিমালা ইঙ্গিত করে যে, এই (রবিউল আউয়াল) মাসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ নিয়ে খুশি প্রকাশ করা প্রশংসনীয় কাজ; আর তাঁর বেসালপ্রাপ্তিতে শোক প্রকাশ করা প্রশংসনীয় মর্মে কোনো ইশারাও এতে নিহিত নেই।^{৩২১}

و. وَقَدْ ظَهَرَ لِي تَخَرُّجُهُ عَلَى أَصْلِ آخَرٍ، وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ النَّبِيُّ عَنْ أَنَسٍ [أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ الثُّبُوءِ] مَعَ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ أَنَّ جَدَّهُ عَبْدَ الْمَطْلَبِ عَقَّ عَنْهُ فِي سَابِعِ وَلَادَتِهِ، وَالْعَقِيقَةُ لَا تُعَادُ مَرَّةً ثَانِيَةً، فَيَحْتَمِلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِظْهَارًا لِلشُّكْرِ عَلَى إِجَادِ اللَّهِ إِيَّاهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَتَشْرِيعًا لِأُمَّتِهِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي عَلَى نَفْسِهِ

৩২১. আস্-সুয়ূতী, ‘হুসন আল-মাকুসিদ ফী আমালিল মওলিদ’, ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা; আস্-সুয়ূতী, ‘আল-হা’উয়ী লিল-ফাতা’ওয়া’, ২০৩ পৃষ্ঠা।

لِذَلِكَ، فَيُسْتَحَبُّ لَنَا أَيْضًا إِظْهَارُ الشُّكْرِ بِمَوْلِدِهِ بِالِاجْتِمَاعِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ وَخَوِّ ذَالِكَ مِنْ وَجْهِ الْقُرْبَاتِ وَإِظْهَارِ الْمَسَرَّاتِ،

৩. আমার (সুযুতীর) সামনে আরেকটি মৌলিক বিধান প্রকাশ পেয়েছে, যা দ্বারা আমরা মীলাদের ভিত্তি সাব্যস্ত করতে পারি। এটা ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে গৃহীত একটি বর্ণনা, যাতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নুবুওয়াত ঘোষণার পর নিজের ‘আকীকা অনুষ্ঠান’ উদযাপন করেছিলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরনীতলে শুভাগমনের সপ্তম দিবসে তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর আকীকা পালন করেন। অথচ আকীকা দ্বিতীয়বার পালন করা যায় না; তাই এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে বিশৃঙ্খলতার জন্যে রহমত (করুণা) হিসেবে সৃষ্টি করার কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে এবং তাঁরই উম্মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে তিনি নিজের আকীকা (দ্বিতীয়বার) পালন করেছিলেন। অতএব, আমাদের জন্যেও তাঁর মীলাদ উপলক্ষে (দ্বিতীয়) ভাইদের সাথে সমবেত হওয়া, অন্যদের জন্যে খানাপিনা তথা মেজবানের ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন ধরনের নেক আমল পালন ও খুশি প্রকাশ করা মোস্তাহাব তথা প্রশংসনীয় কাজ।^{৩২২}

৬.২২ ইমাম শিহাব উদ্দীন আবুল আব্বাস কাসতালানী (৮৫১-৯২৩ হিজরী)

ইমাম শিহাব উদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ বিন আবী বকর কাসতালানী (১৪৪৮-১৫১৭ খৃষ্টাব্দ), যিনি ‘এরশাদুস সারী লি-শরহি সহীহিল বুখারী’ শীর্ষক (বিখ্যাত) গ্রন্থপ্রণেতা, তিনি মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে লিখেন:

৩২২. আস্-সুযুতী, ভুসনুল মাকাসিদ ফী আমালিল-মাওলিদ, ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা; আস্-সুযুতী, ‘আল-হাওয়ায়ী লিল-ফাতাওয়ায়ী’, ২০৬ পৃষ্ঠা; আস্-সালেহী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ, ১:৩৬৭; আয-যুরকানী, ‘শরহ আল-মাওয়াযিব আল-লাদুন্নিয়া বিল-মিনাহে আল-মুহাম্মাদীয়া’, ১:২৬৩-২৬৪; আন-নাবহানী, ‘হজ্জাত আল্লাহ ‘আলাল-‘আলামীন ফী মো‘জেযাতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন’, ২৩৭ পৃষ্ঠা।

قَدْ رُؤِيَ أَبُو هَبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي النَّوْمِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا حَالُكَ، فَقَالَ: فِي النَّارِ، إِلَّا أَنَّهُ يُخَفَّفُ عَنِّي كُلَّ لَيْلَةٍ اثْنَيْنِ وَأَمُصُّ مِنْ بَيْنِ أُصْبُعَيْ مَاءٍ يَقْدَرُ هَذَا وَأَشَارَ لِرَأْسِ أُصْبُعِهِ وَأَنَّ ذَالِكَ بِإِعْتَاقِي لِثُوبَةِ عِنْدَمَا بَشَّرْتَنِي بِوَلَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَارِضَاعِهَا لَهُ.

قَالَ ابْنُ الْحَزْرِيِّ: فَإِذَا كَانَ هَذَا أَبُو هَبٍ الْكَافِرِ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِدَمِهِ جَوَزِي فِي النَّارِ بِفَرْجِهِ لَيْلَةً مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ، فَمَا حَالَ الْمُسْلِمِ الْمُوحَّدِ مِنْ أَمْنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي يَسَّرَ بِمَوْلِدِهِ، وَيُبَدِّلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتِهِ فِي حُبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِعُمْرِي! إِنَّمَا يَكُونُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَنْ يَدْخُلَهُ بِفَضْلِهِ الْعَمِيمِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ.

وَلَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَخْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيْلَائِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ. وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ، وَيُظْهِرُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلِّ فَضْلِ عَمِيمٍ.

وَمِمَّا جَرَّبَ مِنْ خَوَاصِّهِ أَنَّهُ أَمَانَ فِي ذَالِكَ الْعَامِ، وَنُشِرَى عَاجِلَةً بَنَيْلِ الْبَغْيَةِ وَالْمَرَامِ، فَرَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا آتَخَذَ لَيْلَى شَهْرِ مَوْلِدِهِ الْمُبَارَكِ أَعْيَادًا، لِيَكُونَ أَشَدَّ عِلَّةً عَلَى مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَاعِيًا دَاءً.

—আবু লাহাবের মৃত্যুর পরে তাকে স্বপ্নে দেখা যায়। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, ‘তোমার ব্যাপারে কী ফায়সালা হয়েছে?’ সে উত্তর দেয়, ‘আমি জাহান্নামের আগুনে জ্বলছি। তবে প্রতি সোমবার রাতে আমার শাস্তি লাঘব করা হয় এবং আমি আমার আগুলের ডগা থেকে পানি পান করতে পারি (এই সময় সে নিজের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দুটো দেখায়)। এটা এ কারণে যে, আমি (আঙ্গুলের ইশারায়) আমার দাসী সোওয়াইবা যখন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলো, তখন তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম। আর এরই ফলশ্রুতিতে সে তাঁকে দুধ পান করানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছিলো।’

ইবনে জায়ারী বলেন, কুরআনে তিরস্কৃত অবিশ্বাসী আবু লাহাবের ক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের সময় আনন্দ অনুভবের কারণে যদি তাকে জাহান্নামের আগুনেও পুরস্কৃত করা হয়, তাহলে আল্লাহ তা‘আলায় বিশ্বাসী ওই মুসলমানের বেলায় আপনারা কী বলবেন, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত ও তাঁর পবিত্র মীলাদ উপলক্ষে খুশি হন এবং তাঁরই প্রতি মহব্বতের নিদর্শনস্বরূপ মীলাদ উদযাপনে আপন সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থব্যয় করেন? নিশ্চয় মহা দয়াময় আল্লাহর তরফ থেকে ওই মুসলমানের পুরস্কার হলো এই যে, আল্লাহ তা‘আলা নিজ নেয়ামত হতে তাঁকে দান করবেন এবং (চির) সুখ-শান্তির বেহেশতে তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দেবেন!

ইসলামের অনুসারীবৃন্দ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরণীতলে শুভাগমনের মাসে উন্নত খাবারের আয়োজন ও (মীলাদ) মাহফিল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন অব্যাহত রেখেছেন। এর (রবিউল আউয়ালের) রাতগুলোতে তাঁরা দান-সদকাহ ও খুশি প্রকাশ করেন এবং নেক আমল তথা পুণ্যদায়ক কর্ম চর্চা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদতের বর্ণনা তাঁরা কাব্যাকারে আবৃত্তি করার প্রতি আগ্রহও দেখান; আর এরই আশীর্বাদে প্রতিটি মহা নেয়ামত তাঁদের উপর বর্ষিত হতে দেখা যায়।

মীলাদুন্নবী উদযাপনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, সারা বছর এটা নিরাপত্তার উৎস হয়েছে এবং অন্বেষণকৃত প্রতিটি উত্তম বিষয়ে আগাম সুসংবাদ বয়ে এনেছে। যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতগুলোকে বার্ষিক উদযাপন হিসেবে নিয়েছেন, এই নিয়ত

তাঁর অসুস্থ অন্তরের জন্যে মোক্ষম ওষুধ হিসেবে ত্রিাশীল হয়েছে, তাঁর প্রতি আল্লাহ তা‘আলার করুণা বর্ষিত হোক।^{৩২৩}

উপরে প্রদত্ত ইমাম কসতলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, পুণ্যাত্মা পূর্বসূরীবৃন্দ সর্বদাই পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসকে ধর্মীয় সমাবেশের আয়োজন, দান-সদকাহ ও বেশি বেশি নেক আমল পালনের মাধ্যমে উদযাপন করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁদের দ্বারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলার করুণা, দয়া ও আশীর্বাদ লাভের বেলায় এটা ছিলো একটা অসীলা বা মাধ্যম।

৬.২৩ ইমাম নাসির উদ্দীন ইবনে তাব্বাখ

শায়খ নাসীর উদ্দীন ইবনে তাব্বাখ বলেন,

لَيْسَ هَذَا مِنَ السَّنَنِ وَلَكِنْ إِذَا أَنْفَقَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَأَظْهَرَ السُّرُورَ فَرَحًا بِدُخُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُجُودِ وَاتَّخَذَ السَّمَاعَ الْحَالِيَّ عَنِ اجْتِمَاعِ الْمَرْذَانِ وَإِنْشَادَ مَا يَثِيرُ نَارَ الشَّهْوَةِ مِنَ الْعَشَقِيَّاتِ وَالْمُشَوَّاتِ لِلشَّهَوَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ كَالْقَدْ وَالْحَدَّ وَالْعَيْنَ وَالْحَاجِبِ، وَإِنْشَادَ مَا يُشَوِّقُ إِلَى الْآخِرَةِ وَيَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا فَهَذَا اجْتِمَاعٌ حُسْنٍ يُثَابُ قَاصِدُ ذَلِكَ وَفَاعِلُهُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّ سُؤَالَ النَّاسِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ بِذَلِكَ فَقَطْ بِذُنُونِ ضَرُورَةٍ وَحَاجَةٍ سُؤَالَ مَكْرُورٍ، وَاجْتِمَاعُ الصُّلَحَاءِ فَقَطْ لِيَأْكُلُوا ذَلِكَ الطَّعَامَ وَيَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى وَيُصَلُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَاعَفَ لَهُمُ الْقُرْبَاتِ وَالْمُتَوَبَّاتِ.

৩২৩. আল-কসতলা‘নী কৃত ‘আল-মাওয়া‘হিব আল-লাদুন্নিয়া বিল-মিনাহ আল-মুহাম্মাদীয়া’, ১:১৪৭-১৪৮; আয-যুরকানী প্রণীত ‘শরহে মাওয়া‘হিব আল-লাদুন্নিয়া বিল-মিনাহ আল-মুহাম্মাদীয়া’, ১:২৬০-২৬৩; আন-নাবহানী রচিত ‘হুজ্জাত-আল্লাহ ‘আলাল-‘আলামীন ফী মু‘জেযাত-সাইয়েদিল-মুরসালীন’, ২৩৩-২৩৪।

—এটা (মূলত) সুন্নাহর অনুশীলন হতে (নিঃসৃত) না হলেও কেউ যদি এই দিনে অর্থ ব্যয় করেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমন উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করেন, আর দুনিয়ার মোহ সৃষ্টিকারী মাহফিলগুলো না শোনে, বরং আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং পুণ্য সংঘটন ও পার্থিব মোহ বর্জনে উৎসাহ দেয় এমন মাহফিলগুলো শোনে, তাহলে ওই সমাবেশ উত্তম (বলে বিবেচিত হবে)। আর যে ব্যক্তি তাতে নেক নিয়ত বা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অংশগ্রহণ করবেন তিনি পুরস্কৃত হবেন। এখানে যে একটিমাত্র বিষয় উল্লেখযোগ্য তা হলো, প্রয়োজন বা চাহিদা ছাড়া মানুষের সাহায্য চাওয়া মকরুহ (অপছন্দনীয়)। শুধু পুণ্যবানদেরকে খানাপিনায় দাওয়াত করা, আল্লাহর যিকর-তায়কেরা পালন করা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণ করার মধ্যেই তাঁদের জন্য সাওয়াবের বহুগুণ বৃদ্ধি নিহিত রয়েছে।^{৩২৪}

৬.২৪ ইমাম জামাল উদ্দীন বিন আবদুর রহমান আল-কাত্তানী

ইমাম জামাল উদ্দীন বিন আবদুর রহমান বিন আবদুল মালেক কাত্তানী লিখেন:

مَوْلِدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبْجَلٌ مُكْرَّمٌ، قَدَسَ يَوْمٌ وَلَادَتِهِ وَشَرَفَ وَعَظَمَ، وَكَانَ وُجُودُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبْدَأَ سَبَبِ التَّجَاةِ لِمَنْ اتَّبَعَهُ وَتَقْلِيلُ حَظِّ جَهَنَّمَ لِمَنْ أَعَدَّ لَهَا، لِفَرَجِهِ بَوْلَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَّتْ بَرَكَاتُهُ عَلَى مَنْ اهْتَدَى بِهِ، فَشَابَهُ هَذَا الْيَوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا تُسْعَرُ فِيهِ جَهَنَّمَ، هَكَذَا وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْ الْمُنَاسِبِ إِظْهَارُ السُّرُورِ وَإِنْفَاقُ الْمَيْسُورِ وَإِجَابَةُ مَنْ دَعَاهُ رَبُّ الْوَلِيْمَةِ لِلْحُضُورِ.

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ-দিবস উদযাপন করা সম্মানিত ও প্রশংসিত, আর এটা তাঁর ধরাধামে শুভাগমন দিবসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি মাধ্যমও। তাঁকে যাঁরা অনুসরণ করেন, তাঁদের নাজাতের উসীলা তাঁরই অস্তিত্ব এবং (তাঁর মীলাদের প্রতি খুশি প্রকাশকারী) জাহান্নামের অধিবাসীদের (সংখ্যা) হ্রাস করার বেলায়ও তিনি মাধ্যম। এই কারণেই (ওই দিনটিতে) খুশি প্রকাশ ও সম্পদ ব্যয় করা যথোচিত; আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদ তাঁদের জন্যেই পূর্ণতা পায়, যাঁরা তাঁর হেদায়াত তথা প্রদর্শিত সঠিক পথের অনুসরণ করেন। এই দিনটি শুক্রবারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যে শুক্রবারে জাহান্নামের আগুনে ইন্ধন দেয়া হয় না, ঠিক যেমনটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক (হাদীসে) বর্ণিত হয়েছে; আর তাই প্রত্যেকের উচিত (এ উপলক্ষে) খুশি প্রকাশ করা ও নিজের সাধ্যমতো অর্থব্যয় করা এবং কেউ মীলাদ মাহফিলে দাওয়াত করলে ওয়ালীমার দাওয়াত যেভাবে গ্রহণ করা হয় সেভাবেই তা গ্রহণ করা।^{৩২৫}

৬.২৫ ইমাম ইউসুফ বিন আলী বিন যুরাইক আশ-শামী

আল্লামা ইবনে যুফার বর্ণনা করেন, ইউসুফ বিন আলী বিন যুরাইক শামী (মিসরীয় বংশোদ্ভূত এবং মিসরের হাজ্জার শহরে জন্মগ্রহণ করেন) নিজ গৃহে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুষ্ঠান পালন করতেন। ইবনে যুফার (আরো) বলেন,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ مِنْدُ عِشْرَيْنَ سَنَةً وَكَانَ لِي أَحٌ فِي اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ لَهُ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الْحَجَّارُ فَرَأَيْتُ كَأَنِّي وَأَبَا بَكْرٍ هَذَا بَيْنَ يَدَيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسَيْنِ، فَأَمْسَكَ أَبُو بَكْرٍ لِحْيَةَ نَفْسِهِ وَفَرَّقَهَا يَصْفَيْنِ وَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا لَمْ أَفْهَمْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجِيبًا لَهُ: لَوْلَا هَذَا لَكَانَتْ هَذِهِ فِي النَّارِ. وَدَارُ إِلَيَّ وَقَالَ:

لَا ضَرَبَتَكَ. وَكَانَ بِيَدِهِ فَضِيْبٌ فَقُلْتُ: لِأَيِّ شَيْءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: حَتَّى لَا تُبْطِلَ الْمَوْلِدَ وَلَا السُّنَنُ. قَالَ يُوسُفُ: فَعَمِلْتُهُ مِنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَى الْآنِ. قَالَ: وَسَمِعْتُ يُوسُفَ الْمَذْكُورَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الْحَجَّارَ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا النَّشَّارَ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ يَقُولُ لِي: قُلْ لَهُ لَا يَبْطُلُهُ. يَعْنِي الْمَوْلِدَ مَا عَلَيْكَ مِنْ أَكْلٍ وَمِمَّنْ لَمْ يَأْكُلْ. قَالَ: وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُحَمَّدٍ التُّعْمَانِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّيْخَ أَبَا مُوسَى الرَّزْهُوْنِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ فَذَكَرْتُ لَهُ مَا يَقُولُهُ الْفُقَهَاءُ فِي عَمَلِ الْوَلَائِمِ فِي الْمَوْلِدِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [مَنْ فَرَحَ بِنَا فَرِحْنَا بِهِ].

—আমি বিশ বছর আগে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখি। ওই সময় আমার এক দ্বীনী ভাই ছিলেন, যাকে আমি আল্লাহর খাতিরে মহব্বত করতাম; তাঁর নাম ছিলো শায়খ আবু বকর হাজ্জার। উক্ত স্বপ্নে দেখি, তিনি এবং আমি যেনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেই উপবিষ্ট। আবু বকর নিজের দাড়ি ধরে দু'ভাগ করেন এবং হৃয়র পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে অবোধগম্য কথা বলতে থাকেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, ‘এটা যদি না হতো, তাহলে তা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতো।’ এরপর তিনি আমার দিকে ফিরে বলেন, ‘আমি নিশ্চয় তোমাকে আঘাত করবো’, ওই সময় তাঁর হাত মোবারকে একখানি লাঠি ছিলো। আমি আরয় করি, ‘কেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম?’ তিনি উত্তর দেন, ‘যাতে মীলাদ (অনুষ্ঠান) ও সূনাহ বন্ধ করা না হয়।’ এই কারণেই আমি আজ বিশ বছর যাবৎ মীলাদ মাহফিল উদযাপন করে আসছি।

(ইবনে যুফার) বলেন, এছাড়া আমি শায়খ ইউসুফ, আমার দ্বীনী ভাই আবু বকর হাজ্জার এবং মনসূর নাশ্শার প্রত্যেককে বলতে শুনেছি, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখি যিনি আমায় বলেন,

তাকে বলো, সে যেনো মীলাদ অনুষ্ঠান বন্ধ না করে; কেউ খেলো কি খেলো না, তা দেখার দায়িত্ব তার নয়। আমি আমার শায়খ আবু আবদিল্লাহ বিন আবী মুহাম্মদ নু’মান ও শায়খ আবু মূসা যারহুনীকেও বলতে শুনেছি, ‘আমি এক স্বপ্নে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাই এবং তাঁকে মীলাদ উপলক্ষে মেজবান ও খানাপিনা আয়োজনের রীতির ব্যাপারে ফকীহদের সিদ্ধান্তগুলো সম্পর্কে অবহিত করি। তিনি আমাকে বলেন, যে কেউ আমাদের ব্যাপারে খুশি হলে আমরাও তার ব্যাপারে খুশি হবো।’^{৩২৬}

৬.২৬ ইমাম মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী আশ্-শামী (বেসাল: ৯৪২ হিজরী)

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বিন আলী বিন ইউসুফ সালেহী শামী (বেসাল: ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দ) হচ্ছেন ‘সুবুলুল হুদা ওয়ার-রশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ’ শীর্ষক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপূর্ব ও প্রসিদ্ধ জীবনীগ্রন্থের রচয়িতা। ওই বইয়ের প্রথম অধ্যায়টি তিনি মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়ে উৎসর্গ করেন। তিনি এই বিষয়ে আলেমবৃন্দের বক্তব্য বিবৃতি উদ্ধৃত করেন এবং তাঁদের দ্বারা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালনের রীতি ও পদ্ধতির বর্ণনা দেন। এই অধ্যায়ে উক্ত বইটি হতে বহু উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

৬.২৭ ইমাম ইবনে হাজার হায়তামী আল-মক্কী (৯০৯-৯৭৩ হিজরী)

আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজার হায়তামী আল-মক্কী (১৫০৩-১৫৬৬ খৃষ্টাব্দ)–কে মীলাদ ও যিকরের মজলিশগুলো সুনন নাকি বেদআত, সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। ইমাম সাহেব উত্তর দেন:

الْمَوْلِدُ وَالْأَذْكَارُ الَّتِي تَفْعَلُ غِنْدَنَا أَكْثَرُهَا مُشْتَمِلٌ عَلَى خَيْرٍ كَصَدَقَةٍ وَذِكْرِ
وَصَلَاةٍ وَسَلَامٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَدَحِهِ،

—আমাদের এখানে অনুষ্ঠিত অধিকাংশ মীলাদ অনুষ্ঠান ও যিকরের মাহফিল দান-সদকাহ, যিকর-তায়কেরা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত-সালাম পেশের মতো নেক আমল তথা পুণ্যদায়ক কর্মের সমষ্টি।^{৩২৭}

ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী মীলাদ শরীফের ‘মাওলিদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ শিরোনামের একটি পুস্তক লিখেছেন, যা’তে তিনি বলেন,

أَوَّلُ مَنْ أَرْضَعَتْهُ ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةَ عَمِّهِ أَبِي هَبٍ، أَعْتَقَهَا لَمَّا بَشَّرَتْهُ بِوَلَادَتِهِ فَحَقَّقَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ عَذَابِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ اثْنَيْنِ جَزَاءً لِفَرْجِهِ فِيهَا بِمَوْلِدِهِ صَلِّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধপানকারিণী প্রথম মহিলা ছিলেন সুওয়াইবা, যিনি হুযুরের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাচা আবু লাহাবের কাছ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দাসী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরণীতলে শুভাগমনের সুসংবাদ তিনি আবু লাহাবের কাছে বয়ে আনার কারণে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। এরই ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা’আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ দিবসে (সোমবারে) খুশি প্রকাশের পুরস্কারস্বরূপ আবু লাহাবের শাস্তি লাঘব করেন।^{৩২৮}

৬.২৮ ইমাম মুহাম্মদ বিন জারুল্লাহ বিন যাহিরা হানাফী (বেসাল: ৯৮৬ হিজরী)

জামাল উদ্দীন মুহাম্মদ জারুল্লাহ বিন মুহাম্মদ নূর উদ্দীন বিন যাহীরা কুরাইশী হানাফী (বেসাল: ১৫৮৭ হিজরী) নিজ ‘আল-জামেউল্ লাতীফ ফী ফাদলি মক্কা ওয়া আহলিহা ওয়া বিনা’য়িল বায়তিশ শরীফ’ শীর্ষক গ্রন্থে

মীলাদুন্নবী উদযাপনে মক্কাবাসীদের আচরিত প্রথাগুলোর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। তিনি লিখেন:

وَجَرَتْ الْعَادَةُ بِكَمَّةٍ لَيْلَةِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ عَامٍ أَنَّ قَاصِي مَكَّةَ الشَّافِعِيَّ بَثْنِيًا لَزِيَارَةَ هَذَا الْمَحَلِّ الشَّرِيفِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِي جَمْعٍ عَظِيمٍ، مِنْهُمْ الثَّلَاثَةُ الْقَضَاءُ وَأَكْثَرُ الْأَعْيَانِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْفُضَلَاءِ، وَذَوِي الْبُيُوتِ بِفَوَانِيسَ كَثِيرَةٍ وَشُمُوعَ عَظِيمَةٍ وَزِحَامٍ عَظِيمٍ، وَيَدْعِي فِيهِ السُّلْطَانُ وَالْأَمِيرُ مَكَّةَ، وَلِلْقَاضِي الشَّافِعِيِّ بَعْدَ تَقْدِيمِ خُطْبَةٍ مُنَاسِبَةٍ لِلْمَقَامِ، ثُمَّ يَعُودُ مِنْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَبِيلَ الْعِشَاءِ، وَيَجْلِسُ خَلْفَ مَقَامِ الْحَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِزَاءِ قُبَّةِ الْفَرَاشِينَ، وَيَدْعُو الدَّاعِي لِمَنْ ذَكَرَ آتِنَا بِحُضُورِ الْقَضَاءِ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ. ثُمَّ يَصْلُونَ الْعِشَاءَ وَيَنْصَرِفُونَ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى أَوَّلِ مَنْ سَنَّ ذَلِكَ، سَأَلْتُ مُؤَرِّجِي الْعَصْرِ فَلَمْ أَجِدْ عَنْدهُمْ عِلْمًا بِذَلِكَ.

—মক্কা শরীফে পালিত একটি প্রথা হলো, প্রতি বছর ১২ই রবিউল আউয়াল রাতে মক্কা নগরীর শাফেঈ মযহাবের কাজী (বিচারক) মাগরিবের নামাযের পরে বিশাল মিছিল (জুলুস) সহকারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদের স্থানটি যেয়ারত করতে যান; ওই মিছিলে আরো অন্তর্ভুক্ত থাকেন (হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মযহাবের) অন্য তিনজন কাজী, বিখ্যাত ফকীহবৃন্দ, পুণ্যবান মুসলমান, অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ, সাধারণ জনতা। শোভা বর্ধক অনেক অনেক ঝাড়বাতি ও বড় বড় প্রদীপ থাকে উক্ত জুলুসে। এই সমাবেশে প্রথমে সুলতানের জন্যে, তারপর মক্কার আমীরের জন্যে দুআ করা করা হয়; আর শাফেঈ কাজী দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ধর্মীয় ওয়াজ-নসীহত করেন এবং পরবর্তীতে তাঁরা সবাই বায়তুল্লাহ শরীফে ইশার নামাযের জন্যে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তাঁরা মাকামে ইবরাহীমের পেছনে ও ফারানিশ গুম্বুজকে সামনে নিয়ে বসেন। আমাদের উল্লেখিত ঘোষক (শাফেঈ কাজী) কাজীবৃন্দের ও অধিকাংশ ফকীহর উপস্থিতি কামনা করে আস্থান জানান, আর এরপর তাঁরা সবাই ইশার ওয়াক্জিয়া নামায পড়েন এবং প্রস্থান

৩২৭. আল-হায়তামী মক্কী, ‘আল-ফাতাওয়া আল-হাদীসিয়া’, ২০২ পৃষ্ঠা।

৩২৮. আল-হায়তামী, ‘মওলিদ আন নবী’, ২৭ পৃষ্ঠা।

করেন। এই আচরিত প্রথার প্রবর্তককে আমি খুঁজে পাইনি; আর আমি যখন এই সময়কার ইতিহাসবিদদের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাই, আমি তাঁদের কাছেও কোনো উত্তর খুঁজে পাইনি।^{৩২৯}

৬.২৯ আল্লামা কুতুবুদ্দীন আল-হানাফী (বেসাল: ৯৮৮ হিজরী)

কুতুব উদ্দীন হানাফী তাঁর রচিত ‘কিতাবুল ই’লাম বি-আ’লামি বায়তিল্লাহিল হারাম ফী তারীখি মক্কাতাল মুশাররাফা’ পুস্তকে মক্কাবাসীদের আচরিত প্রথা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। মক্কা মুয়াযযমার অধিবাসীবৃন্দ যে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু শতাব্দী যাবৎ পালন করে আসছেন, তা ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেন:

يَزَارُ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَكِّيَّ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ عَامٍ، فَيَجْتَمِعُ الْفُقَهَاءُ وَالْأَعْيَانُ عَلَى نِظَامِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْقُضَاةِ الْأَرْبَعَةِ بِمَكَّةَ الْمُشْرِفَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِالشُّمُوعِ الْكَثِيرَةِ وَالْمُفَرَّغَاتِ وَالْفَوَانِيسِ وَالْمَشَاغِلِ وَجَمِيعِ الْمَشَائِخِ مِنْ طَوَائِفِهِمْ بِالْأَعْلَامِ الْكَثِيرَةِ وَيُخْرِجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى سَوْقِ اللَّيْلِ وَيَمَشُونَ فِيهِ إِلَى مَحَلِّ الْمَوْلِدِ الشَّرِيفِ بِإِزْحَامٍ وَيَحْطُبُ فِيهِ شَخْصٌ وَيَدْعُو لِلسُّلْطَنَةِ الشَّرِيفِ، ثُمَّ يَعُودُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَيَجْلِسُونَ صُفُوفًا فِي وَسْطِ الْمَسْجِدِ مِنْ جِهَةِ الْبَابِ الشَّرِيفِ خَلْفَ مَقَامِ الشَّافِعِيَّةِ وَيَقُفُ رَئِيسُ زَمَرَمَ بَيْنَ يَدَيْ نَاطِرِ الْحَرَمِ الشَّرِيفِ وَالْقُضَاةِ وَيَدْعُو لِلسُّلْطَانِ وَيَلْبَسُهُ النَّاطِرُ خُلْعَةً وَيَلْبَسُ شَيْخُ الْفَرَاشِينَ خُلْعَةً. ثُمَّ يُؤَدُّنَ لِلْعِشَاءِ وَيُصَلِّي النَّاسُ عَلَى عَادَتِهِمْ، ثُمَّ يَمْشِي الْفُقَهَاءُ مَعَ نَاطِرِ الْحَرَمِ إِلَى الْبَابِ الَّذِي يُخْرُجُ مِنْهُ

৩২৯. ইবনে যাহীরা, ‘আল-জা’মেউল লাতিফ ফী ফাদলি মক্কা ওয়া আহলিহা’ ওয়া বিনা’ আল-বায়ত আল-শরীফ’, ২০১-২০২ পৃষ্ঠা।

مِنَ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَتَفَرَّقُونَ. وَهَذِهِ مِنْ أَعْظَمِ مَوَاقِبِ نَاطِرِ الْحَرَمِ الشَّرِيفِ بِمَكَّةَ الْمُشْرِفَةِ وَيَأْتِي النَّاسُ مِنَ الْبَدْرِ وَالْحَضَرِ وَأَهْلِ جَدَّةٍ، وَسُكَّانِ الْأَوْدِيَّةِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَيَفْرَحُونَ بِهَا.

—প্রতি বছর ১২ই রবিউল আউয়াল রাতে (১১ তারিখ দিবাগত রাত) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমন স্থানটি যোয়ারত করা হয়; আর ফকীহমণ্ডলী, পবিত্র মসজিদুল হারামের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনরত বিশিষ্টজনেরা এবং পবিত্র মক্কার চারজন কাজী (বিচারক) সবাই মাগরিবের নামাযের পরে সমবেত হন, আর এসময় তাঁরা বিপুল সংখ্যক মোমবাতি, হারিকেন ও মশাল বহন করেন; উপরন্তু, মাশায়েখবৃন্দ তাঁদের মুরীদানসহ সেখানে আসেন, আরো আসেন ঘোষকবৃন্দ। তাঁরা মসজিদে হারাম ত্যাগ করে ‘সূকাল লাইল’র উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, যেখানে তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত-স্থানের দিকে হাঁটতে থাকেন; এসময় পবিত্র ওই স্থানটি জনাকীর্ণ থাকে। উপস্থিতদের মধ্যে কেউ একজন মহান খেলাফতের জন্যে দুআ করেন। অতঃপর তাঁরা পবিত্র মসজিদে ফিরে এসে আল-বা’ব আশ-শরীফের দিকে মুখ করে মসজিদের মাঝখানে সারিবদ্ধ হয়ে বসে পড়েন। এরপর বিচারকমণ্ডলী সুলতান ও (কা’বা শরীফের) তত্ত্বাবধায়ককে আহ্বান করেন এবং (কিসওয়ার) এক টুকরো বস্ত্র দ্বারা তাঁকে আবৃত করেন; আর এর পরপরই আযান দেয়া হয় এবং মানুষেরা সাধারণতঃ যেভাবে ইশার নামায পড়ে থাকেন, সেভাবেই সালাত আদায় করেন। নামায শেষে ফকীহমণ্ডলী মসজিদের তত্ত্বাবধায়কের সাথে হেঁটে তাঁর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যে যার পথে চলে যান। মক্কা শরীফের পবিত্র মসজিদের তত্ত্বাবধায়কদের জন্যে এটা সেরা সম্মানগুলোর একটা। প্রত্যন্ত গ্রাম ও শহরাঞ্চলের পাশাপাশি জেদ্দা নগরী ও বিভিন্ন উপত্যকার মানুষ এই রাতে এখানে সমবেত হন এবং এতে (আত্মিক) প্রশান্তি লাভ করেন।^{৩৩০}

৩৩০. কুতুব আল-দ্বীন আল-হানাফী, ‘কিতাব আল-এ’লাম বি-আ’লামি বায়ত আল্লাহ আল-হারাম ফী তারীখ মক্কা আল-মুশাররাফা’, ৩৫৫-৩৫৬ পৃষ্ঠা।

৬.৩০ মোল্লা আলী ক্বারী (ইন্তেকাল: ১০১৪ হিজরী) কৃত গবেষণা

প্রখ্যাত হানাফী মাযহাবের মুহাদ্দীস ও ফকীহ, ‘শরহুশ শিফা’ ও ‘মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতুল মাসাবীহ’ গ্রন্থগুলোর মতো মূল্যবান কিতাবের রচয়িতা মোল্লা আলী বিন সুলতান হারাভী কারী (ইন্তেকাল: ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ) সাহেবও মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক পুস্তক লিখেছেন, যার নাম ‘আল-মাওরুদুর রাভী ফী মাওলিদিন নবী ওয়া নাসাবিহিত তাহির’। তিনি এতে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের বৈধতা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং আরব ও অনারব বিশ্বে অনুষ্ঠিত এই মাহফিলের বিস্তারিত ইতিহাস তুলে ধরেন। মোল্লা আলী কারী লিখেন:

وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ إِشْعَارَ بَدَاكَ وَإِيمَاءَ إِلَى تَعْظِيمِ وَقْتِ حَاجَتِهِ إِلَيَّ هُنَاكَ. قَالَ: وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْتَصِّرَ فِيهِ عَلَيَّ مَا يَفْهَمُ الشُّكْرَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ نَحْوِ مَا ذَكَرَ، وَأَمَّا مَا يَتَّبَعُهُ مِنَ السَّمَاءِ وَاللَّهُوِ وَغَيْرُهُمَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مُبَاحًا بِحَيْثُ يُعَيَّنُ عَلَى السَّرُورِ بِدَاكَ الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ بِالْحَقِّقَةِ، وَمَا كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا فَيَمْنَعُ، وَكَذَا مَا كَانَ فِيهِ خِلَافٌ، بَلْ نَحْسَنُ فِي أَيَّامِ الشَّهْرِ كُلِّهَا وَلِيَالِيهِ يُعْنِي كَمَا جَاءَ عَنِ ابْنِ جَمَاعَةَ تَمْنِيَهُ فَقَدْ اتَّصَلَ بِنَا أَنَّ الرَّاهِدَ الْقُدْوَةَ الْمُعَمَّرَ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَمَاعَةَ لَمَّا كَانَ بِالْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى سَاكِنِهَا أَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَأَكْمَلَ التَّحِيَّةِ كَانَ يَعْمَلُ طَعَامًا فِي الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ وَيُطْعِمُ النَّاسَ وَيَقُولُ: لَوْ تَمَكَّنْتُ عَمَلْتُ بِطَوْلِ الشَّهْرِ كُلِّ يَوْمٍ مَوْلِدًا.

قُلْتُ: وَأَنَا لَمَّا عَجَزْتُ عَنِ الصِّيَافَةِ الصُّورِيَّةِ كَتَبْتُ هَذِهِ الْأُورَاقَ لِتَصِيرَ صِيَافَةً مَعْنَوِيَّةً نُورِيَّةً مُسْتَمَرَّةً عَلَى صَفَحَاتِ الدَّهْرِ غَيْرَ مُخْتَصَّةٍ بِالسَّنَةِ وَالشَّهْرِ وَسَمِّيَتْهُ: بِالْمُورِدِ الرَّوِّيِّ فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—আল্লাহর বাণী ‘নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছেন একজন রাসূল’^{৩৩১}— এ আয়াতটিতে ইশারা ও ইঙ্গিত করে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরণীতলে শুভাগমনকে শ্রদ্ধাসহ উদযাপন করা উচিত। আর এর জন্য আবশ্যকীয় হলো, শুকরিয়া প্রকাশার্থে উল্লেখিত বিষয়গুলোর উপর আমল করা, যেগুলো ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে স্বীকৃত। যখনই সেমা ও অন্যান্য বিষয়াদির কথা আসবে, তখন ওইগুলোর মধ্যে যেসব বিষয় বৈধ ও জায়েয তা গ্রহণীয়, অন্যথায় নিষিদ্ধ তথা বর্জনীয় এমনকি ইখতিলাফের বিষয়গুলো পর্যন্ত। বরং আমরা তো ওই মাসে (রবিউল আউয়াল) দিবা-রাত্রি ওইসব আমল করতে থাকি, যা হযরত ইবনে জামা‘আ হতে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের কাছে এই মর্মে এসেছে যে, ধার্মিক ও সাধকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হযরত আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন আবদুর রহীম বিন ইবরাহীম বিন জামা‘আ যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নগরী মদীনা মোনাওয়ারায় হাজির হতেন, তখন তিনি খাবার প্রস্তুত করে ঘোষণা করতেন, “আমি যদি সক্ষম হতাম, তাহলে মাসের প্রতিদিনই মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করতাম।

আমি বলি, যেহেতু আমি বাহ্যিকভাবে মানুষের প্রতি আতিথেয়তা করে মীলাদুন্নবী উদযাপনে অক্ষম, সেহেতু এসব পৃষ্ঠায় কথাগুলো লেখেছি, যাতে রূপকভাবে আমার যিয়াফত হয়ে যায় এবং যা আমার পক্ষে নির্দিষ্ট কোনো মাস-বছরে সীমাবদ্ধ না হয়ে যুগান্তরকারী হয়ে যায়। আমি এ কিতাবটির নাম দিয়েছি ‘আল-মাওরুদুর রাভী ফী মাওলিদিন নবী’^{৩৩২}

মোল্লা আলী কারী আরো লিখেন,

وَقَدْ رَوَى أَبُو لَهَبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي النَّوْمِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا حَالُكَ؟ فَقَالَ: فِي النَّارِ، إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِّي كُلَّ لَيْلَةٍ اثْنَتَيْنِ، فَأَمُصُّ مِنْ بَيْنِ أَصْبُعَيْ هَاتَيْنِ مَاءً، وَأَشَارَ إِلَيَّ رَأْسُ أَصَابِعِهِ، وَإِنَّ ذَلِكَ بِإِعْتَابِي لِثَوْبَةٍ عِنْدَ مَا بَشَّرْتَنِي بِوَلَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِإِرْضَاعِهَا لَهُ.

৩৩১. আল কুরআন: সূরা তাওবা, ৯:১২৮।

৩৩২. মোল্লা আলী ক্বারী, ‘আল-মওরুদ আল-রাওয়ী ফী মওলিদ আল-নাবাওয়ী ওয়া নাসাবিহি আল-তা‘হির, ১৭ পৃষ্ঠা।

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: فَإِذَا كَانَ هَذَا أَبُو هَبٍ الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْفُرْلَانُ بِدَمِّهِ جُوزِيٍّ فِي النَّارِ بِفَرْحِهِ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا حَالَ الْمُسْلِمُ الْمُوَحِّدُ مِنْ أُمَّتِهِ يَسُرُّ بِمَوْلَاهُ، وَيَبْذُلُ مَا تَصَلُّ إِلَيْهِ قُدْرَتِهِ فِي مُحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لِعُمْرِي! إِنَّمَا يَكُونُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَنْ يَدْخُلَهُ بِفَضْلِهِ الْعَمِيمِ جَنَّاتِ التَّعِيمِ.

—আবু লাহাবকে স্বপ্নে দেখানো হলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, ‘তোমার ব্যাপারে কী ফায়সালা হয়েছে?’ সে উত্তর দেয়, ‘আমি জাহান্নামের আগুনে জ্বলছি। তবে প্রতি সোমবার (রোববার দিবাগত) রাতে আমার শাস্তি লাঘব করা হয় এবং আমি এই আঙ্গুলগুলোর ডগা থেকে পানি পান করতে সক্ষম হই (ওই সময় সে তার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের দিকে ইশারা করছিলো); আর এটা এ কারণে যে আমি (আমার দাসী) সুওয়াইব’কে (আঙ্গুলের ইশারায়) মুক্ত করে দিয়েছিলাম, যখনই সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমনের সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলো আমার কাছে।

ইবনে আল-জায়ারী বলেন, এ-ই যদি হয় আবু লাহাবের অবস্থা, যার ব্যাপারে আল-কুরআনে অভিসম্পাত দেয়া হয়েছে, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের রাতে খুশি হওয়ার দরুন তার শাস্তি করা হয়েছে লাঘব, এমতাবস্থায় ওই মুসলমানের কতোটুকু উচ্চমর্যাদা হবে, যিনি আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করেন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হন, আর যিনি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত উপলক্ষে খুশি হন এবং তাঁরই প্রতি ইশক-মহব্বতের খাতিরে সাধ্যমতো অর্থব্যয় করেন? নিশ্চয় মহানুভব আল্লাহ তা‘আলার তরফ থেকে তাঁর পুরস্কার হবে এই যে, আল্লাহ পাক তাঁকে নিজ বিশাল নেয়ামতের ভাণ্ডার হতে দান করবেন এবং তাঁকে সুখ-শান্তির বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেবেন!৩৩৩

৬.৩১ হযরত মোজাদ্দিদ-ই আলফে সানী (৯৭১-১০৩৪ হিজরী)

শায়খ আহমদ সেরহিন্দী মোজাদ্দিদী অলফে সানী (১৫৬৪-১৬২৪ খৃষ্টাব্দ) তাঁর ‘মাকতূবা’ত (পত্রাবলী) পুস্তকে লিখেন,

نفس قرآن خواندن بصوت حسن ودر قصاد نعت ومنتقبت خواندن چه مضائقه است؟ ممنوع تحريف و تغيير حروف قرآن است، والتزام رعایة مقامات نغمه و ترديد صوت باں، به طریق الحان با تصفيق مناسب آں که در شعر نیز غیر مباح است۔ اگر به نحی خوانند که تحريف کلمات قرآن نشود۔۔۔ چه مانع است؟

—কুরআন মজীদ সুরেলা কণ্ঠে তিলাওয়াত, কসীদাসমূহ ও না‘তে রাসূল পাঠ করার মধ্যে দৃশ্যীয় কী থাকতে পারে? শুধু যে বিষয়টি নিষিদ্ধ, তা হলো কুরআন শরীফের বাণীকে পরিবর্তন, বিকৃত ও অতিরঞ্জন করা; এসব কাজ কবিতার মধ্যে করাও নিষেধ। যদি আল-কুরআন ও কবিতা সঠিক পদ্ধতিতে পাঠ করা হয় এবং তাতে উপরোল্লিখিত নিষিদ্ধ বিষয়ের কোনোটি না থাকে, তাহলে এর বিরোধিতা কেন করা হবে?৩৩৪

৬.৩২ ইমাম আলী বিন ইবরাহীম আল-হালাবী (৯৭৫-১০৪৪ হিজরী)

ইমাম নূর উদ্দীন আলী বিন ইবরাহীম বিন আহমদ বিন আলী বিন উমর বিন বুরহান উদ্দীন হালাবী কাহেরী শাফেঈ অত্যন্ত যোগ্য একজন আলেম-উলামাদের মাঝে বরেণ্য ও কর্তৃত্বশীল ইসলামী পণ্ডিত। তাঁকে তাঁর বিশাল পাণ্ডিত্যের জন্যে ‘ইমাম-এ কবীর’ ও ‘আল্লামা-এ যমান’ খেতাবগুলো দেয়া হয়। সমসাময়িকদের মাধ্যে তিনি অতুলনীয় ও অসংখ্য মৌলিক গ্রন্থপ্রণেতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সীরাত-পুস্তক তিনি রচনা করেন, যার শিরোনাম ‘ইনসানুল উইয়ূন ফী সীরাতিল আমীনিল মামূন’ পুস্তকটি ‘আস-সীরাতুল হালাবীয়া’ নামে অত্যধিক পরিচিত। মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদযাপনের পক্ষে

প্রামাণিক দলিল পেশ করার পরে তিনি এর বৈধতা প্রমাণ করেন এবং এটা যে প্রশংসিত তাও বিবৃত করেন। তিনি লিখেন,

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبِدْعَةَ الْحَسَنَةَ مُتَّفَقٌ عَلَى نَذْيِهَا، وَعَمَلُ الْمَوْلِدِ وَاجْتِمَاعُ النَّاسِ لَهُ كَذَلِكَ أَيْ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ،

—এতদসংক্রান্ত আলোচনার সারকথা হলো, বেদআতে হাসানাহ (উত্তম বিদআত) প্রচলনের ব্যাপারে উলামাদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুশীলিত প্রথাটি এবং এ উদ্দেশ্যে মানুষের সভা-সমাবেশ একটি বেদআতে হাসানাহ।^{৩৩৫}

৬.৩৩ শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী (১৫৮-১০৫২ হিজরী)

মহান সূফী ও মুহাদ্দীস আলেমবৃন্দের উজ্জ্বল নক্ষত্র শায়খ ‘আবদুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী (১৫৫১-১৬৪২ খৃষ্টাব্দ) স্বীয় পুস্তক ‘মা-সাবাতা মিনাস সুন্নাহ ফী আইয়ামিস সানাহ’য় বছরের নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ রাত-দিনসহ প্রতিটি মাসের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন; প্রতিটি বিশেষ উপলক্ষে যেসব ইবাদত-বন্দেগী পালিত হওয়া উচিত, তিনি গ্রন্থটিতে তা উল্লেখ করেন। রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের অনুমতি প্রমাণ করে লায়লাতুল কুদরের চেয়ে এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেন। তিনি লিখেন,

وَقَدْ رَوَى أَبُو لَهَبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي النَّوْمِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا حَالُكَ؟ قَالَ: فِي النَّارِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ كُلِّ لَيْلَةٍ اثْنَيْنِ، وَأَمُصُّ مِنْ بَيْنِ أُصْبُعَيْ هَاتَيْنِ مَاءً وَأَشَارَ إِلَيَّ رَأْسِ أُصْبُعِيهِ وَإِنَّ ذَلِكَ بِإِعْتَابِي لِثَوْبَةٍ عِنْدَ مَا بَشَّرْتَنِي بِوَلَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِإِرْضَاعِهَا لَهُ.

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: فَإِذَا كَانَ أَبُو لَهَبٍ الْكَافِرَ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِدَمِهِ جَوْزِيٍّ فِي النَّارِ بِفَرْجِهِ لَيْلَةً مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ مِنْ أُمَّتِهِ يَسَّرَ بِمَوْلِدِهِ، وَيَبْذُلُ مَا تَصَلَّى إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مُحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لِعُمْرِي! إِنَّمَا كَانَ جَوَاؤُهُ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَنْ يَدْخُلَهُ بِفَضْلِهِ جَنَّاتِ التَّعِيمِ.

وَلَا يَزَالُ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَايِمَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيْلَاتِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيُظْهِرُونَ الشَّرُورَ وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ وَيَتَنَوَّنُ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيُظْهِرُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَكَانِهِ كُلِّ فَضْلٍ عَمِيمٍ. وَمِمَّا أَجْرُبُ مِنْ خَوَاصِّهِ أَنَّهُ أَمَانَ فِي ذَلِكَ الْعَالَمِ وَيُشْرِي عَاجِلُ بَنِيْلِ الْبَغْيَةِ وَالْمَرَامِ، فَرَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا إِتَّخَذَ لَيْلِي شَهْرَ مَوْلِدِهِ الْمُبَارَكِ أَعْيَادًا لِيَكُونَ أَشَدُّ غَلَبَةً عَلَى مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَعَنَادٌ.

—আবু লাহাবকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখানো হয়। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, ‘তোমার ব্যাপারে কী ফায়সালা হয়েছে?’ সে উত্তর দেয়, ‘আমি জাহান্নামের আগুনে জ্বলছি। তবে প্রতি সোমবার রাতে আমার শাস্তি লাঘব করা হয় এবং আমি এই আগুনগুলোর ডগা থেকে পানি পান করতে সক্ষম হই (ওই সময় সে তার তর্জনী ও মধ্যমার দিকে ইশারা করছিলেন); আর এটা এ কারণে যে আমি (আমার দাসী) সুওয়াইবাকে (আগুনের ইশারায়) মুক্ত করে দিয়েছিলাম, যখনই সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমনের সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলো আমার কাছে। এরই ফলশ্রুতিতে সে তাঁকে দুধ পান করাতে সক্ষম হয়েছিলো।’

ইবনে জাযারী বলেন, এ-ই যদি হয় আবু লাহাবের অবস্থা, যাকে কুরআনে আল-কুরআনে অভিসম্পাত দেয়া হয়েছে, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের রাতে খুশি হওয়ার দরুন তার শাস্তি করা হয়েছে লাঘব, এমতাবস্থায় ওই মুসলমানের কতোটুকু উচ্চমর্যাদা হবে, যিনি আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করেন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হন, আর যিনি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের বেলাদত উপলক্ষে খুশি হন এবং তাঁরই প্রতি ইশক-মহব্বতের খাতিরে সাধ্যমতো অর্থব্যয় করেন? নিশ্চয় মহানুভব আল্লাহ তা‘আলার তরফ থেকে তাঁর পুরস্কার হবে এই যে, আল্লাহ পাক তাঁকে নিজ বিশাল নেয়ামতের ভাণ্ডার হতে দান করবেন এবং তাঁকে সুখ-শান্তির বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেবেন!”

ইসলামের অনুসারীবৃন্দ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনের মাসে (ধর্মীয়) মাহফিল ও খানাপিনার আয়োজনের মাধ্যমে এর উদযাপন অব্যাহত রেখেছেন। মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতগুলোতে তাঁরা দান-সদকাহ ও বেশি বেশি পুণ্যদায়ক কর্ম পালন এবং খুশি প্রকাশ করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত-সম্পর্কিত বর্ণনা পাঠে তাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এর আশীর্বাদে তাঁদের মাঝে সব ধরনের বৃহৎ নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনে সঞ্চিত একটি অনন্য অভিজ্ঞতা হলো এই যে, এটা সারা বছরের নিরাপত্তার একটা উৎস এবং অন্বেষণকৃত সর্বপ্রকারের কল্যাণের একটি আগাম সুসংবাদ। যে ব্যক্তি মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতগুলোকে বার্ষিক উদযাপনের জন্যে গ্রহণ করেন এই উদ্দেশ্যে যে, এটা তাঁর অন্তরের ব্যাধি নিরাময়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মোক্ষম দাওয়াই হবে, তাঁর প্রতি আল্লাহ তা‘আলার রহমত ও করুণা অবতীর্ণ হোক।^{৩৩৬}

শায়খ আবদুল হক্ক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর রচিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত-বিষয়ক পারসিক ‘মাদারিজুন নবুওয়াত’ গ্রন্থেও উপরোক্ত বর্ণনা সংযুক্ত করেন এবং মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের উৎকর্ষ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

৬.৩৪ ইমাম মুহাম্মদ আয-যুরকানী (১০৫৫-১১২২ হিজরী)

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল বাকী বিন ইউসুফ আল-মালেকী আয-যুরকানী (১৬৪৫-১৭১০ খৃষ্টাব্দ) সীরাত-বিষয়ক বিখ্যাত ‘আল-মাওয়াহিব আল-লাদুনিয়া বিল-মিনাহিল মুহাম্মদিয়া’ গ্রন্থের উপর তাঁর ব্যাখ্যামূলক পুস্তকে লিখেন:

إِسْتَمَرَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي شَهِدَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحْيَرِيَّتِهَا، فَهُوَ بِدْعَةٌ، وَفِي أَنَّهَا حَسَنَةٌ، قَالَ السُّيُوطِيُّ : وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِّ فِي مَدْخِلِهِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا دَمَّ مَا احْتَوَى عَلَيْهِ مِنَ الْحَرَمَاتِ مَعَ تَصْرِفِهِ قَبْلَ بَأْتِهِ يَنْبَغِي تَخْصِيصُ هَذَا الشَّهْرِ بِزِيَادَةِ فِعْلِ الْبِرِّ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَاتِ وَالْخَيْرَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَجْهِ الْقُرْبَاتِ. وَهَذَا هُوَ عَمَلُ الْمَوْلِدِ مُسْتَحْسِنٌ وَالْحَافِظُ أَبِي الْخَطَّابِ بِنِ دَحِيَّةٍ أَلَفَ فِي ذَلِكَ التَّنْوِيرِ فِي مَوْلِدِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ فَأَجَارَهُ الْمَلِكُ الْمُظَفَّرُ صَاحِبُ إِرْبَلٍ بِأَلْفٍ دِينَارٍ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الطَّيِّبِ السَّبْتِيُّ تَرْبُلُ قُوَيْسٍ وَهُوَ لَاءٌ مِنْ أَجَلَةِ الْمَالِكِيَّةِ أَوْ مَذْمُومَةٍ وَعَلَيْهِ النَّاجُ الْفَاكِهَانِيُّ وَتَكْفِيلُ السُّيُوطِيِّ، لِرَدِّ مَا اسْتَبَدَّ إِلَيْهِ حَرْفًا حَرْفًا وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، لَمَّا اسْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ الْكَثِيرِ.

يَحْتَفِلُونَ: يَهْتَمُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِي بَأَنَوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ بِهِ، وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ قِصَّةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيُظْهِرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلِّ فَضْلٍ عَمِيمٍ.

—ইসলামের তিন প্রজন্মে পুণ্যাআ যাঁদের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সত্যায়িত হয়েছে, তাঁরা (প্রচলিত) মীলাদ অনুষ্ঠান পালন করেননি; অতএব, এই অর্থে এটা একটা বেদআত (নতুন প্রচলন)। তবে এই বেদআত উত্তম (আমল) হিসেবে বিবেচিত,

৩৩৬. আবদুল হক্ক দেহলভী, ‘মা’ সাবাতা মিন আল-সুন্নাহ ফী আইয়া‘মিল সানা’, ৬০ পৃষ্ঠা।

যেমনটি ইমাম সুয়ূতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, ইবনুল হজ্জ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর ভাষ্যের সারমর্ম হলো এই যে, তিনি সরাসরি মীলাদুন্নবী উদযাপনের নিন্দা করেননি, বরঞ্চ তাতে পালিত অবৈধ ও মন্দ কাজগুলোকেই তিনি নিষেধ করেন। তাঁর আলোচনার প্রথম অংশে তিনি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যে, এই (রবিউল আউয়াল) মাসটিকে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্তিসূচক অতিরিক্ত নেক আমল বা কর্ম, দান-সদকাহ ও অন্যান্য সৎকর্ম পালনের জন্যে সুনির্দিষ্ট করা উচিত। এটাই অবশেষে মীলাদুন্নবী উদযাপনের বিষয়বস্তু, যা আমরা উত্তম বলে বিবেচনা করি।^{৩৩৭}

হাফেয আবুল খাত্তাব বিন দিহইয়া (যিনি নিজেও একে সমর্থন করেন, তিনি) মীলাদ-বিষয়ক একটি বই লিখেন যার নাম ‘আত-তানভীর ফী মাওলিদিল বাশীরিন্ নাযীর’-এর জন্যে ইরবিলের রাজা মুযাফফর শাহ তাঁকে ১০০০ দিনার উপহার দেন। মীলাদুন্নবীকে আরো সমর্থন করেন কাওস-এর অধিবাসী শায়খ আবু তাইয়্যাব সাবতী। এই আলেমবৃন্দ সবাই মালেকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এবং তাঁরা এটাকে সমর্থন করেন। তবে তাজ ফাকেহানীর মতো কিছু লোক মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেদআত বলে অভিহিত করে। ইমাম সুয়ূতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার প্রতিটি অপযুক্তি ধরে ধরে খণ্ডন করেন।

প্রথম অভিমতটি সবচেয়ে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কেননা এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অনেক ধরনের উত্তম কর্ম। সর্বসাধারণ বড় বড় মেজবান খানাপিনা ও মাহফিল আয়োজনের মাধ্যমে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাসটি (আগ্রহ ভরে) উদযাপন করে থাকেন। এর রাতগুলোতে তাঁরা বিভিন্ন দান-সদকাহ ও খুশি প্রকাশ এবং বেশি বেশি নেক আমল পালন করেন। তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমনের বিভিন্ন বর্ণনা আলোচনা করার ব্যাপারে উৎসাহী হন, আর এরই আশীর্বাদে যাবতীয় মহাকল্যাণের বহিঃপ্রকাশ তাঁদের মাঝে ঘটে থাকে।^{৩৩৮}

৩৩৭. আস্-সুয়ূতী।

৩৩৮. আয-যুরকানী, ‘শারহু আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া বিল-মিনাহ আল-মুহাম্মদিয়া’, ১:২৬১-২৬২।

৬.৩৫ শাহ আবদুর রহীম দেহলভী (১০৫৪-১১৩১ হিজরী)

কুতুবুদ্দীন আহমদ শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলভী (১১১৪-১১১৭৪ হিজরী)-এর পিতা শাহ আবদুর রহীম দেহলভী বলেন:

كُنْتُ أَصْنَعُ فِي أَيَّامِ الْمَوْلِدِ طَعَامًا صِلَةً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَفْتَحْ لِي سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ شَيْءٌ أَصْنَعُ بِهِ طَعَامًا، فَلَمْ أَجِدْ إِلَّا حَمَصًا مُقْلِيًا فَقَسَمْتُهِ بَيْنَ النَّاسِ، فَرَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَّنَّ يَدَيْهِ هَذَا الْخَمِصَ مُتَبَهِّجًا بِشَأْنًا.

-প্রতি বছর আমি মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনে খাদ্য পরিবেশন করি এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এর সওয়াব বখশে দিই। তবে একবার আমার কাছে প্রস্তুত করার মতো এর সওয়াব বখশে দিই। তবে একবার আমার কাছে প্রস্তুত করার মতো পর্যাপ্ত খাবার ছিলো না; আমার কাছে ছিলো স্রেফ সেদ্ধ করা ছোলা। সেগুলোই আমি মানুষের মাঝে বিতরণ করি। অনতিবিলম্বে আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে আমার সামনে ওই ছোলা হাতে দাঁড়ানো দেখতে পাই, আর তিনি খুশি ও স্মিত হাস্যরত ছিলেন।^{৩৩৯}

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলভী উপমহাদেশীয় সকল ইসলামী ভাবধারার দল-উপদলের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও গৃহীত একজন আলেম। তিনি তাঁর পিতার অনুশীলিত আচার ও তৎপরবর্তী স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন। ফলে এই বর্ণনাটি মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈধতার পক্ষে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

৬.৩৬ শায়খ ইসমাঈল হক্কী (১০৬৩-১১৩৭ হিজরী)

শায়খ ইসমাঈল হক্কী বারুসাভী (১৬৫২-১৭২৪ খৃষ্টাব্দ) স্বীয় ‘তাকসীর-ই রুহুল বয়ান’ গ্রন্থে লিখেন,

৩৩৯. শাহ ওলী-আল্লাহ, ‘আল-দুর আল-সামীন ফী মুবাশিরা’ত আল-নবী আল-আমীন’, ৪০ পৃষ্ঠা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ উদযাপন করা তাঁকে সম্মান করারই সামিল, যতোক্ষণ পর্যন্ত না কোনো মন্দকর্ম তাতে মিশ্রিত হয়। ইমাম সুযুতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

مِنْ تَعْظِيمِهِ عَمَلُ الْمَوْلِدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُنْكَرٌ قَالَ الْإِمَامُ السُّيُوطِيُّ قَدَّسَ سِرُّهُ يَسْتَحِبُّ لَنَا أَظْهَارُ الشُّكْرِ لِمَوْلِدِهِ.

-মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ দিবস উপলক্ষে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাটা মোস্তাহাব (প্রশংসনীয়)।^{৩৪০}

৬.৩৭ শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (১১১৪-১১৭৪ হিজরী)

কুতুবুদ্দীন আহমদ শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (১৭০৩-১৭৬২ খৃষ্টাব্দ) তাঁর পিতার এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেক ও পুণ্যবান পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহফিলগুলোতে অংশগ্রহণ করতেন। মক্কা মোয়াযযমাতে তাঁর সফর বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লিখেন:

وَكُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ الْمُعَظَّمَةِ فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ وَلَدَتْهُ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَذْكُرُونَ إِرْهَاصَاتِهِ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي وَلَدَتِهِ وَمَشَاهِدَةٍ قَبْلَ بَعَثَتِهِ، فَرَأَيْتُ أَنْوَارًا سَطَعَتْ دَفْعَةً وَجَدَّاهُ لَا أَقُولُ أَنِّي أَدْرَكْتُهَا بِبَصَرِ الْجَسَدِ، وَلَا أَقُولُ أَدْرَكْتُهَا بِبَصَرِ الرُّوحِ فَقَطْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ الْأَمْرُ بَيْنَ هَذَا وَذَلِكَ، فَتَأَمَّلْتُ تِلْكَ الْأَنْوَارَ فَوَجَدْتُهَا مِنْ قَبْلِ الْمَلَائِكَةِ الْمُؤَكِّلِينَ بِأَمْثَالِ هَذَا الْمُشَاهِدِ وَبِأَمْثَالِ هَذَا الْمَجَالِسِ، وَرَأَيْتُ يُخَالِطُ أَنْوَارُ الْمَلَائِكَةِ أَنْوَارَ الرَّحْمَةِ.

-ইতিপূর্বে আমি মক্কা মুয়াজ্জামায় অনুষ্ঠিত মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিবসের একটি অনুষ্ঠানে মক্কায় অবস্থান করছিলাম। মানুষেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাতু-সালাম পেশ করছিলেন এবং তাঁর ধরাধামে শুভাগমনের সময় প্রকাশিত নুবুওয়্যতের পূর্বাভাসগুলো (এরহাস) ও নুবুওয়্যত লাভের আগে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করছিলেন। ওই সমাবেশে আমি নূরের জ্যোতির এক ঝলক দেখতে পাই। আমি বলি না যে সেগুলো আমার (নিজ) চর্মচক্ষে দেখেছি, কিংবা শ্রেফ রূহানী দৃষ্টিতে দেখেছি; (কেননা) আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন এই দুইয়ের মাঝে কীভাবে তা (সম্ভব) হয়েছিলো। আমি এসব নূরের ব্যাপারে গভীর ধ্যানমগ্ন হই এবং জানতে পারি যে, এগুলো ওই সমস্ত মাহফিলে (দেখাশোনার) দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের কাছ থেকেই নিঃসৃত হয়েছিলো। আমি ফেরেশতাদের নূরগুলোকে খোদায়ী করুণার সাথে অবতীর্ণ হতে দেখেছিলাম।^{৩৪১}

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর মতো এমন একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের দ্বারা মক্কা মোয়াযযমায় (অনুষ্ঠিত) মীলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণ এর বৈধতার পক্ষে একটি প্রামাণ্য দলিল বটে। অধিকন্তু, মক্কাবাসী সর্বসাধারণও যে মীলাদের মজলিশে অংশগ্রহণ করতেন, তাও এতে প্রমাণিত হয়। আজকে যদিও সেখানে সরকারিভাবে মীলাদুন্নবী উদযাপিত হয় না, তথাপিও এতে কোনোক্রমে প্রমাণিত হয় না যে, আশেকানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন না। ধর্মপ্রাণ মানুষ এখনো সেখানে মীলাদুন্নবী উদযাপন করে থাকেন।

৬.৩৮ শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (১১৫৯-১২৩৯ হিজরী)

শাহ ওলীউল্লাহর বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র শাহ 'আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (১৭৪৫-১৮২২ খৃষ্টাব্দ) তাঁর 'ফাতাওয়া' পুস্তকে লিখেন:

وَبَرَكَهٖ رِبْعُ الْأَوَّلِ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ابْتَدَأَ وَبَشَّرَ
بَرَكَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأُمَّةِ حَسْبُ مَا يَبْلُغُ عَلَيْهِ مِنْ هَدَايَا
الصَّلَاةِ وَالْإِطْعَامَاتِ مَعًا.

—রবিউল আউয়াল মাসের বরকতসমূহ ওই মাসে নিহিত মহাসম্মানিত
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ-দিবসের কারণেই
(মঞ্জুরিকৃত)। উম্মতের প্রতি বর্ষিত নেয়ামতের পরিমাণ প্রেরিত সালাতু-
সালামের পর্যায় ও এর পাশাপাশি বণ্টনকৃত খাবারের পরিমাণ অনুসারে
বর্ষিত হয়।^{৩৪২}

৬.৩৯ শায়খ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব নজদী (১১৬৫-১২৪২হি.)

আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ হচ্ছেন ‘সালাফী’ মতবাদের প্রবর্তক মুহাম্মদ ইবনে
আবদিল ওয়াহাব নজদীর (১১১৫-১২০৬ হিজরী/১৭০৩-১৭৯১ খৃষ্টাব্দ)
পুত্র। তিনি তাঁর পিতার রচিত ‘মুখতাসারু সীরাতির রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ শীর্ষক পুস্তকের উপর একটি ব্যাখ্যামূলক বই
লিখেছেন। তাতে আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ লিখেন:

وَأَرْضَعْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبِيَّةَ عَتِيقَةَ أَبِي لَهَبٍ، أَعْتَقَهَا حِينَ بَشَّرْتُهُ
بِوِلَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ رَوَى أَبُو لَهَبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي النَّوْمِ، فَقِيلَ
لَهُ: مَا حَالُكَ؟ فَقَالَ: فِي النَّارِ. إِلَّا أَنَّهُ حَقَّقَ عَنِّي كُلَّ أَثْنَيْنِ، وَأَمُصُّ مِنْ بَيْنِ
أَصْبُعَيْ هَاتَيْنِ مَاءً، وَأَشَارَ بِرَأْسِ أَصْبَعَةٍ، وَإِنَّ ذَلِكَ بِإِعْتَاقِي لثَوْبِيَّةَ عِنْدَمَا
بَشَّرْتَنِي بِوِلَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإَرْضَاعِهَا لَهُ.

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: فَإِذَا كَانَ هَذَا أَبُو لَهَبٍ الْكَافِرِ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنَ بِدَمِهِ
جَوْزِيٌّ بِفَرْجِهِ لَيْلَةَ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ، فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ
الْمُوحَّدُ مِنْ أُمَّتِهِ يَسُرُّ بِمَوْلِدِهِ.

—আবু লাহাবের মুক্ত করে দেয়া দাসী সুওয়াইবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শৈশবকালীন দুগ্ধ পান করান। আবু লাহাব তাঁকে
মুক্ত করে দিয়েছিলো যখন তিনি (সুওয়াইবা) তার কাছে মহানবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। আবু
লাহাবের মৃত্যুর পর এক স্বপ্নে তার দর্শন লাভ হয়। তাকে জিজ্ঞেস করা
হয়, ‘তোমার সাথে কী ফায়সালা হয়েছে?’ সে উত্তর দেয়, ‘আমি দোষখের
আগুনে পুড়ছি। তবে প্রতি সোমবার রাতে আমার শাস্তি লাঘব হয় এবং
আমি এই আগুলের ডগাগুলো হতে পানি পান করতে পারি (ওই সময় সে
তার তর্জনী ও মধ্যমা আগুলগুলোর দিকে ইশারা করছিলেন)। আর এটা
এই কারণে যে আমি সুওয়াইবাকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম যখন সে আমার
কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের সুখবর নিয়ে
এসেছিলো এবং সে তাঁকে দুগ্ধ পান করাতে পেরেছিলো।’

এটা যদি কুরআনে অভিশপ্ত অবিশ্বাসী আবু লাহাবের ক্ষেত্রে হয়, যাকে
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের রাতে তার অনুভূত
খুশির কারণে জাহান্নামের আগুনেও পুরস্কৃত করা হয়েছে, তাহলে ওই
ঈমানদার মুসলমানের উচ্চ-মকাম কী হবে, যিনি আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস
করেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের একজন
হিসেবে তাঁরই পবিত্র বেলাদত উপলক্ষে আনন্দ অনুভব করেন?

৬.৪০ শাহ আহমদ সাঈদ মুজাদ্দেরী দেহলভী (ইন্তেকাল: ১২৭৭ হিজরী)

শাহ আহমদ সাঈদ মোজাদ্দেরী দেহলভী (ইন্তেকাল: ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ)
ভারত উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও আধ্যাত্মিক
ব্যক্তিত্ব। তিনি মদীনা মোনাওয়ারায় পরলোকগমন করেন এবং তাঁকে
খলীফা উসমান ইবনে আফফান রাহিয়াল্লাহু আনহুর মাযারের পাশে দাফন

করা হয়। তিনি ‘ইসবাতুল মাওলিদ ওয়াল-কিয়াম’ শিরোনামের একটি বই লিখেন। তাতে তিনি বলেন:

أَيُّهَا الْعُلَمَاءُ السَّائِلُونَ عَنْ دَلَائِلِ مَوْلِدِ الشَّرِيفِ لَنَبِيِّنَا وَسَيِّدِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْلَمُوا أَنَّ مُحْفَلَ الْمَوْلِدِ الشَّرِيفِ يَشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرِ الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الصَّحَاحِ الدَّالَّةِ عَلَى جَلَالَةِ قَدْرِهِ وَأَحْوَالِ وَلَادَتِهِ وَمِعْزَاجِهِ وَمُعْجَزَاتِهِ وَوَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كُلَّمَا ذَكَرَهُ الدَّاكِرُونَ وَكَلَّمَا عَقَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ. فَإِنَّكَارَكُمْ مُبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ اسْتِمَاعِهِ.

—আমাদের আকা ও মাওলা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ শরীফের সমর্থনে দালিলিক প্রমাণ প্রদর্শনের দাবিদার ওহে উলামা সকল! জেনে রাখুন, এসব মীলাদের মজলিশে কুরআন মজীদ হতে সেসব আয়াতে করীমা ও হযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেসব আহাদিস শরীফ পাঠ করা হয়, যেগুলো তাঁর মহান মর্যাদা, বেলাদতের সময়কার ঘটনাবলী, মিরাজ শরীফ, মু'জিয়া ও বেসাল শরীফ সম্পর্কে বর্ণনা দেয়। স্রেফ যাঁরা মনোযোগী, তাঁরাই তাঁর স্মরণ করেন। অপরদিকে, যারা অসতর্ক, তারা এব্যাপারে অমনোযোগী। অতএব, আপনাদের এই প্রত্যাখ্যান আপনাদেরই নিজেদের অবহেলার উপর ভিত্তিশীল।

৬.৪১ মুফতী মুহাম্মদ এনায়াত আহমদ কাকুরাভী (১২২৮-১২৭৯ হি.)

মুফতী মুহাম্মদ এনায়াত আহমদ কাকুরাউয়ী (১৮১৩-১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ), যিনি ‘ইলমুল ফরায়েয’, ‘ইলমুস সীগা’, ‘নাকশাহ মাওয়াকিবুন নুজুম’ ইত্যাদির মতো অনেক গ্রন্থাবলীর রচয়িতা, তিনি তাঁর প্রণীত ‘তাওয়ারীখ হাবীব ইলাহ ইয়ানি সীরাত সাইয়্যিদিল মুরসালীন’ পুস্তক যেটা উর্দু ভাষায় লিখিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-সম্পর্কিত প্রথম জীবনীগ্রন্থ, সেটাতে লিখেন:

—‘সোমবার ১২ই রবিউল আউয়াল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত-সূত্রে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মহাসম্মান মঞ্জুর করা হয়েছে। দুইটি পবিত্র নগরী (হারামাঈন শরীফাইন) ও ইসলামী বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অনুশীলিত রীতি হলো রবিউল আউয়াল মাসে মুসলমানবন্দ মীলাদ পাঠের উদ্দেশ্যে সমবেত হন; তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অটল সালাতু-সালাম পাঠ করেন, মানুষদেরকে খাবারের জন্যে আমন্ত্রণ করেন এবং মিষ্টি বিতরণ করেন। এই আচারটি নিশ্চিতভাবে অশেষ সওয়াবের যোগ্য এবং এটা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কারো ইশক-মুহাব্বত বৃদ্ধির একটা কার্যকর মাধ্যম। রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে মদীনা মোনাওয়ারায় অবস্থিত মসজিদে নববীতে একটি আশীর্বাদপূর্ণ সমাবেশের আয়োজন করা হয়, অপরদিকে মক্কা মোয়াযযমায় এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত-স্থানে।^{৩৪৩}

মুফতী কাকুরাভীর পাশাপাশি আরো বর্ণনা করেন শাহ মুহাদ্দীস দেহলভীর ঘটনাটি, যা উল্লেখ রয়েছে আমাদের বইয়ের পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে। ওই ঘটনা বর্ণনার পরে তিনি বলেন:

—মুসলমান সর্বসাধারণের উচিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের খাতিরে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহফিল আয়োজন করা এবং তাতে অংশগ্রহণ করা। তবে শর্ত থাকে এই যে (প্রত্যেকের) নিয়ত হতে হবে আন্তরিক এবং লৌকিকতাহীন। উপরন্তু, বর্ণিত ঘটনাবলী হওয়া উচিত নির্ভরযোগ্য এবং হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাবতীয় মু'জিয়াও হওয়া উচিত বিশ্বস্ত সূত্রের; কেননা বেশির ভাগ মানুষই এ ধরনের মাহফিলে কাব্য ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা শুনে সন্তুষ্ট থাকেন। উলামাবন্দ আরো উল্লেখ করেন যে, এসব মজলিশে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেসাল শরীফের বর্ণনা যেনো না দেয়া হয়; কেননা এ ধরনের মজলিশ প্রফুল্লচিন্তের; তাই দুঃখ-বেদনার স্মরণ এসব মাহফিলে যথার্থ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

৩৪৩. আল-কাকুরাউয়ী, ‘তাওয়ারীখ হাবীব ইলাহ’ এয়া’নী সীরাত সাইয়েদ আল-মুরসালীন’, ১৪-১৫ পৃষ্ঠা।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেসাল শরীফের বিষয়টি সম্পর্কে দুটি পবিত্র মসজিদে কখনোই আলোকপাত করা হয়নি।^{৩৪৪}

মুফতী কাকুরাভী সাহেব আবু লাহাবের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনাটি উদ্ধৃত করেন:

—হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি আবু লাহাবের মৃত্যুর পরে তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করেন, ‘তোমার সাথে কী ফায়সালা হয়েছে?’ আবু লাহাব উত্তরে বলে, ‘আমি জাহান্নামের আগুনে জ্বলছি। তবে প্রতি সোমবার রাতে আমার শান্তি লাঘব করা হয় এবং আমি আমার তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দুটোর মাঝখান হতে প্রবাহিত পানি পান করতে সক্ষম হই; আর এটা একারণে যে, আমি (দাসী) সোয়াইবাকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম যখনই সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলো। আমি পানি পান করতে পারি বলে আমার শান্তি লাঘব হয়।

এই ঘটনা উল্লেখ করার পরে মুহাদ্দীস উলামাবন্দ সিদ্ধান্ত নেন যে, আবু লাহাবের মতো অবিশ্বাসী, যাকে আল-কুরআনে অভিসম্পাত দেয়া হয়েছে, তাকে যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ শরীফের রাতে তারই অনুভূত খুশির কারণে জাহান্নামের আগুনেও পুরস্কৃত করা হয়, তাহলে আল্লাহ তা’আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে তাঁরই আশীর্বাদপূর্ণ বেলাদত উপলক্ষে খুশি প্রকাশকারী কোনো মুসলমানের মর্যাদা কতোখানি উচ্ছে হবে?

৬.৪২ মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (ইন্তেকাল: ১২৯৭ হিজরী)

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদযাপন সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা আহমদ আলী মুহাদ্দীস সাহারানপুরী দেওবন্দী বলেন,

إِنَّ ذِكْرَ الْوَلَادَةِ الشَّرِيفَةِ لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَوَايَاتٍ صَحِيحَةٍ فِي أَوْقَاتٍ خَالِيَةٍ عَنْ وَطَائِفِ الْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَاتِ وَبِكَيْفِيَّاتٍ لَمْ تَكُنْ مُحَالَفَةً عَنْ طَرِيقَةِ الصَّحَابَةِ وَأَهْلِ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الْمَشْهُودِ لَهَا بِالْخَيْرِ، وَبِالْإِعْتِقَادَاتِ الَّتِي مُوَهَّمَةٌ بِالشَّرْكَ وَالْبِدْعَةِ وَبِالْأَدَابِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مُحَالَفَةً عَنْ سِيرَةِ الصَّحَابَةِ الَّتِي هِيَ مُصَدِّقُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي وَفِي مَجَالِسِ خَالِيَةٍ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مُوجِبٌ لِلْخَيْرِ وَالزُّبُرَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونُوا مَقْرُونًا بِصَدَقِ النَّبِيِّ وَالْإِخْلَاصِ وَاعْتِقَادُ كَوْنِهِ دَاخِلًا فِي جُمْلَةِ الْأَذْكَارِ الْحَسَنَةِ الْمُنْدُوبَةِ غَيْرِ مُقَيَّدٍ بِوَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِكُونِهِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ أَوْ بَدْعَةٍ.

বস্তুতঃ নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদত শরীফকে স্মরণ করা এমন সময়ে যখন কোনো বাধ্যতামূলক (ফরয) এবাদত-বন্দেগী থাকে না; আর (তা করা) এমন এক পদ্ধতিতে, যা সাহাবা-এ কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ও প্রথম তিন ইসলামী প্রজন্ম যাঁদের ধার্মিকতা সত্যায়িত হয়েছে, তাঁদের আচরিত পন্থার পরিপন্থী হয় না। অধিকন্তু এমন সেই (ইসলামী) সম্প্রদায়ের সাথে তা পালন করা, যাঁরা শির্ক ও বেদআতের সন্দেহমুক্ত। এমন আদব-কায়দাসহ তা পালন করা, যা সাহাবা-এ কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)’র (উত্তম) নিদর্শনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়, যে নিদর্শন সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমার ও আমার সাহাবীবৃন্দের পথ ও মত”। আর তা পালন করা এমন সমাবেশে যেখানে শরীয়তের নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হয় না—এমতাবস্থায় এই (মীলাদের) অনুষ্ঠান একটি আশীর্বাদপূর্ণ ও উত্তম অনুশীলন হবে এই শর্তে যে তাতে খাঁটি উদ্দেশ্য, পূর্ণ আন্তরিকতা ও এ বিশ্বাস থাকবে যে এটা বিভিন্ন মোস্তাহাব যিকরগুলোর একটি, যা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত নয় [বঙ্গানুবাদকের নোট: এগুলো চিরচেনা ওহাবী অপযুক্তি; তাদের অন্তরে শুধু শর্ত আর

শর্ত। এই যদি হয় বিষয়বস্তু, তাহলে আমরা এমন কোনো মুসলমান সম্পর্কে অবগত নই যিনি এটাকে শরীয়তবিরোধী বা বেদআত বলে ফতোয়া দেবেন।^{৩৪৫}

৬.৪৩ সাইয়েদ আহমদ বিন যাইনী দাহলান (১২৩৩-১৩০৪ হিজরী)

সাইয়েদ আহমদ বিন যাইনী দাহলান হাসানী হাশেমী কুরাইশী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই নগরীতেই তিনি ছিলেন মুফতী এবং তাঁর সমসাময়িকদের মাঝে উচ্চমর্যাদায় আসীন। তিনি (ইসলামী) প্রায় সব বিষয়েই ৩৫টিরও বেশি পুস্তক লিখেছেন। তাঁর ‘আস্-সীরাতুন্ নববীয়া’ শীর্ষক পুস্তকে তিনি অনেক জ্ঞানী-গুণী আলেমের মতামত সংকলন করেন, যা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, এমনকি একজন অমুসলিমও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ-দিবস পালনের ফলশ্রুতিতে আশীর্বাদপ্রাপ্ত ও পুরস্কৃত হন; তাহলে এমতাবস্থায় আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী বেসালপ্রাপ্ত মুসলমানের পুরস্কার কী হতে পারে? এ ধরনের (ঈমানদার) ব্যক্তির বৈধ আবেদন-নিবেদন ও আন্তরিক আকাজক্ষাগুলো তাৎক্ষণিকভাবে মহান আল্লাহ পাক কবুল করে নেবেন।

৬.৪৪ মাওলানা আবদুল হাই লাখনৌভী (১২৬৪-১৩০৪ হিজরী)

মাওলানা আবুল হাসানাত মুহাম্মদ ‘আবদুল হাই ফারাংগী মহল্লী লাখনৌভী (১৮৪৮-১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ) মীলাদ সম্পর্কে লিখেন: অতএব, আবু লাহাবের মতো অবিশ্বাসীর ক্ষেত্রে যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত উপলক্ষে নিজের (প্রকাশিত) খুশির কারণে শান্তি লাঘব হতে পারে, তাহলে সেই মুসলমানের ব্যাপারে কী ফায়সালা হবে, যিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতে খুশি প্রকাশ করেন এবং তাঁর প্রতি মহব্বতস্বরূপ নিজের সম্পদ হতে যা পারেন তা ব্যয় করেন? তিনি

৩৪৫. সাহা’রানপুরী কৃত ‘আল-মুহান্নাদ ‘আলাল-মুফান্নাদ’, ৬১-৬২ পৃষ্ঠা।

কি পুরস্কৃত হবেন না? ইমাম ইবনে জাওয়ী (৫১০-৫৭৯ হিজরী) ও আবদুল হক্ক মুহাদ্দীস দেহলভী (৯৫৮-১০৫২ হিজরী) অনুরূপ কথাই লিখেছেন।^{৩৪৬}

মীলাদুন্নবী মাহফিলের দিন-তারিখ ও সময় নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি লিখেন, এই মহতী মাহফিল যখনই অনুষ্ঠিত হোক না কেন, এটা (খোদায়ী) পুরস্কারের একটা উৎস। দুটি পবিত্র নগরীর (মক্কা ও মদীনার) মানুষ, এর পাশাপাশি বসরা (ইরাক), সিরিয়া ও ইয়েমেনের মানুষও রবিউল আউয়াল মাসের নতুন চাঁদ উঠলে খুশি প্রকাশ করেন; তাঁরা কুরআন তিলাওয়াত ও সেমা মাহফিলের আয়োজন করেন। রবিউল আউয়াল মাস ছাড়াও এসব দেশে মীলাদুন্নবীর সমাবেশ হয়ে থাকে। অতএব, কারো এতে বিশ্বাস করা উচিত নয় যে শ্রেফ রবিউল আউয়াল মাসেই মীলাদ উদযাপনের পুরস্কার পাওয়া যায়।^{৩৪৭}

৬.৪৫ নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (মৃত্যু: ১৩০৭ হিজরী)

প্রখ্যাত সালাফী পণ্ডিত নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী লিখেন:

—প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিকর (স্মরণ) দৈনিক ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি পালন না করতে পারলে তাঁর যিকরের জন্যে সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট দিন-তারিখ নির্ধারণ করার মধ্যে কী ক্ষতি নিহিত আছে, যেটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী, মীলাদ, বেসাল ও সংগ্রামের স্মরণে উৎসর্গিত হবে? অতএব, পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসের দিনগুলো বিফলে যেতে দেবেন না; সহীহ হিসেবে প্রমাণিত ওই সব হাদীস ও রিওয়াযাত পাঠ করুন।^{৩৪৮}

তিনি আরো লিখেন:

৩৪৬. আবদুল হাই লাখনৌভী, ‘মজমু’আয়ে ফাতা’ওয়া’, ২:২৮২।

৩৪৭. প্রাপ্ত ‘মজমু’আয়ে ফাতা’ওয়া’, ২:২৮৩।

৩৪৮. ভূপা’লী কৃত ‘আল-শামা’মা আল-আমবারিয়া মিন মওলিদে খায়র আল-বারিয়া’, পৃষ্ঠা ৫।

—যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদের বর্ণনাগুলো শুনে খুশি হয় না এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে এই আশীর্বাদের জন্যে কৃতজ্ঞতা জানায় না, সে মুসলমান নয়।^{৩৪৯}

৬.৪৬ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (১২৩৩-১৩১৭ হিজরী)

উপমহাদেশের, বিশেষ করে দেওবন্দী মাসলাকের সাথে জড়িতদের বড় আলেম হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (১৮১৭-১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ) ভারত হতে হিজরত করে মক্কায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে সেখানে তিনি শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। তিনি এই নগরীতেই ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল মু'আল্লায় তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।^{৩৫০} হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী সাহেব চারটি বিখ্যাত সুফী তরিকার ধারানুযায়ী মুরীদানবর্গকে বায়াত করাতেন। দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (১২৪৮-১২৯৭ হি./ ১৮৩৩-১৮৮০ খৃ.) ও মাদ্রাসার অধ্যক্ষ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (১২৪৪-১৩২৩ হি./ ১৮২৯-১৯০৫ খৃ.) ছিলেন তাঁর মুরীদানের অন্তর্ভুক্ত; হাজী সাহেবের উত্তরসূরীদের মধ্যে রয়েছেন পীর মেহের আলী শাহ গুলটবী (১২৭৫-১৩৫৬ হি./ ১৮৫৯-১৯৩৭ খৃ.), আশরাফ আলী থানভী (১২৮০-১৩৬২ হি./ ১৮৬৩-১৯৪৩ খৃ.), মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (মৃত্যু: ১৩৩৯ হি./ ১৯২০ খৃ.) এবং অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ।

‘মীলাদ শরীফ উদযাপন সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?’— এ মর্মে এক প্রশ্নের উত্তরে হাজী সাহেব নিজ ‘শামায়েমে এমদাদিয়া’ পুস্তকের ৪৭ ও ৫০ পৃষ্ঠায় লিখেন:

—হারামাইন শরীফাইনের সকল অধিবাসী মীলাদ পালন করেন; আর এটাই আমাদের কাছে এর বৈধতার জন্যে প্রামাণ্য দলিল। তাহলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণকে কীভাবে কখনো দোষারোপযোগ্য বিবেচনা করা যায়? তবে লোকেরা যে কিছু নতুন প্রথা

৩৪৯. প্রাগুক্ত, ১২ পৃষ্ঠা।

৩৫০. ১৯৬৩ সালে লেখক শায়খ তাহিরুল কাদেরী সাহেবের শৈশবে ওই সমাধি যেয়ারতের সুযোগ হয়েছিলো। সে সময় হাজী সাহেবের সমাধিটি একক কক্ষবিশিষ্ট ছিলো।

চালু করেছে, সেগুলো অনুশীলন করা উচিত নয়। আমি কেয়াম সম্পর্কে কোনো কথা বলবো না; বস্তুতঃ আমি তাতে অনন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে থাকি।^{৩৫১}

হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী সাহেব আরো লিখেন:

—আমাদের আলেম-উলামা মীলাদুন্নবী বিষয়ে বিস্তর ঝগড়াঝাটি করেন কিন্তু আমি তাঁদেরই পক্ষে আমার মতামত দেই, যাঁরা এটাকে সমর্থন করেন। এর বৈধতার পক্ষে দলিল থাকার পরও এই বিদ্রোহের কেন? আমাদের জন্যে দুটি পবিত্র নগরী (মক্কা-এ মোয়ায্যমা ও মদীনা-এ মোনাওয়ারা)^{*}র অধিবাসীদের অনুসরণই যথেষ্ট। তবে (মীলাদে) কেয়াম তথা দণ্ডায়মান হওয়ার সময় কারো উচিত নয় এ কথা চিন্তা করা যে, বেলাদত ঠিক তৎক্ষণাৎ সংঘটিত হচ্ছে; কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্ভাব্য পবিত্র উপস্থিতি দ্বারা মীলাদের মাহফিলকে আশীর্বাদধন্য করতে পারেন মর্মে বিশ্বাস করাতে কোনো সমস্যা নেই। এর পেছনে কারণ হলো, বস্তুজগৎ স্থান ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ, অথচ আধ্যাত্মিক জগৎ তা নয়। অতএব, মীলাদের মজলিশে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির হতে পারেন মর্মে বিশ্বাস করাটা মোটেও কষ্টকল্পিত নয়।^{৩৫২}

হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী সাহেবের উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে একেবারে স্পষ্ট যে, মক্কা মোয়ায্যমা ও মদীনা মোনাওয়ারার অধিবাসীদের মাঝে মীলাদ উদযাপনের ব্যাপারে কোনো রকম মতপার্থক্য বা বিরোধিতা ছিলো না। তাঁরা এর বৈধতার বিষয়ে একমত ছিলেন এবং এটাকে তাঁরা উদযাপন করতেন। এটা আমাদের কাছে যেমন নির্ভরযোগ্য, তেমনি এর প্রতি আপত্তি উত্থাপনকারীদের জন্যেও এটা প্রামাণ্য দলিল বটে।

৩৫১. হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, ‘শামায়েমে এমদাদিয়া’, ৪৭ পৃষ্ঠা; আশরাফ আলী থানভী সাহেব এই উদ্ধৃতিটি তাঁর রচিত ‘এমদাদ আল-মুশতাকু ইলা আশরাফ আল-আখলাকু’ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন।

৩৫২. এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী কৃত ‘শামায়েমে এমদাদিয়া’, ৫০ পৃষ্ঠা। মওলানা আশরাফ আলী থানভী এই উদ্ধৃতিটি নিজ ‘এমদাদ আল-মুশতাকু ইলা আশরাফ আল-আখলাকু’ (৫৮ পৃষ্ঠা) পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন।

হাজী সাহেব তাঁর দলিলসমৃদ্ধ ‘ফায়সালা-এ হাফত মাসআলা’ পুস্তিকায় সাতটি আকীদা-বিশ্বাসগত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।^{৩৫৩} এতে একটি সাওয়াল ছিলো এ মর্মে যে, মীলাদ সম্পর্কে হাজী সাহেবের অভিমত কী। জবাবে তিনি বলেন:

—এই অধম বান্দার রীতি হলো মীলাদ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা। বস্তুতঃ আশীর্বাদ লাভের জন্যে আমি বার্ষিক পর্যায়ে মীলাদের আয়োজন করে থাকি। এধরনের মাহফিলে কেয়াম করার সময় আমি এক বিশেষ আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাসপূর্ণ হালত-অবস্থার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি।^{৩৫৪}

পুস্তকটির অন্যত্র তিনি লিখেন:

—মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নূরানী উপস্থিতি দ্বারা মীলাদের মজলিশ আশীর্বাদধন্য করেন কি-না?— প্রশ্নে এই বিশ্বাসটিকে শিরক ও বেদআত বলে অভিযুক্ত করা একেবারেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাপার। এর সম্ভাবনা বিরাজমান এবং এটাকে শরঈ দলিলের পাশাপাশি যৌক্তিক জ্ঞান দ্বারাও প্রমাণ করা যায়। বস্তুতঃ সময়ে সময়ে এটা বাস্তবিকই ঘটে থাকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে এধরনের মাহফিল সম্পর্কে অবগত হন এবং কীভাবে তাঁর এই আগমন সম্ভব হয়, এ মর্মে সন্দেহ করাটা একেবারেই বৃথা। (কেননা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (ঐশী) জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতার মোকাবেলায় এই সংশয় একদম অমূলক, যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে

৩৫৩. কতিপয় দেওবন্দী আলেম দাবি করেন যে, এই পুস্তকটি হাজী সাহেবের লেখা নয়; অথচ স্বয়ং মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব তার লেখা ‘আশরাফ আস-সাওয়ানিহ’ পুস্তকে (৩:৩৫৫-৩৫৬) বিবৃত করেন যে, পুস্তকটি হাজী সাহেবেরই রচিত। মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী নিজ ‘ফাতাওয়া-এ রশীদিয়া’ কিতাবে লিখেন যে, হাজী সাহেব এই পুস্তকটি শ্রুতি লিখনের জন্যে পড়ে গুলিয়েছিলেন এবং প্রুফ-রিডিংও করেছিলেন। অতএব, এতে যা সন্নিবেশিত হয়েছে, তা হাজী সাহেবেরই মতামত সম্বলিত লেখনী। উপরন্তু, দেওবন্দী প্রকাশকবর্গ হাজী এমদাদ উল্লাহ সাহেবের দশটি পত্রসম্বলিত ‘কুল্লিয়াতে এমদাদিয়া’ শীর্ষক সংকলন ছেপেছেন, যার মধ্যে ‘ফায়সালা-এ হাফত মাসআলা’ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সংকলন প্রকাশ করেছে কুতুবখানা-এ আশরাফিয়া ও রশীদ কোম্পানী (দেওবন্দ, ভারত) এবং এদারা-এ ইসলামিয়া (লাহোর, পাকিস্তান)।

৩৫৪. হাজী এমদাদউল্লাহ, ‘ফায়সালা-এ-হাফত মাসআলা,’ পৃষ্ঠা ৭।

নির্ভরযোগ্য আহাদীসে এবং সূফী-দরবেশবৃন্দের আধ্যাত্মিক মুকাশাফা তথা দিব্যদৃষ্টিতে।^{৩৫৫}

যেসব লোক মীলাদ মাহফিলকে বেদআত বলে দোষারোপ করে এবং দাবি করে যে এটা শরীয়তের পরিপন্থী, তাদের অন্তত নিজেদের আপন শিক্ষক ও শায়খের লেখা এই বক্তব্য পাঠ এবং এ নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করা উচিত।

৬.৪৭ আল্লামা ওয়াহিদুজ্জামান (ইন্তেকাল: ১৩৩৮ হিজরী)

প্রখ্যাত সালাফী পণ্ডিত নওয়াব ওয়াহিদুজ্জামান (মৃত্যু: ১৯২০ খৃষ্টাব্দ) মীলাদ সম্পর্কে বলেন:

وَكَذَلِكَ مَنْ يَرْجَرُ النَّاسُ بِالْعُفَى وَالْتِشَادِ عَلَى سَمَاعِ الْغَنَاءِ أَوْ الْمُزَامِيرِ أَوْ
مَجْلِسِ لِلْمِيلَادِ أَوْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ الْمَوْسُومَةِ وَيُقَسِّفُهُمْ أَوْ يَكْفُرُهُمْ عَلَى هَذَا.

—অনুরূপভাবে, মীলাদুন্নবীর মজলিশ বাদ্যযন্ত্রসহ যাঁরা নাশীদ (গান) করেন, তাঁদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা অথবা যাঁরা ফাতেহা পাঠ করেন তাঁদেরকে গালমন্দ করা বা তাঁদের প্রতি তাকফিরি ফতোয়া আরোপ করা আপনাআপনিই এক সীমালঙ্ঘন বৈ কিছু নয়।^{৩৫৬}

৬.৪৮ ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী (১২৬৫-১৩৫০ হিজরী)

বরণে মুহাদ্দীস ও আরব জগতের (অনুকরণীয়) দৃষ্টান্ত শায়খ ইউসুফ বিন ইসমাঈল বিন ইউসুফ নাবহানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) রচিত ‘হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন ফী মু’জিয়াতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন’ পুস্তকে মীলাদের বিষয়ে একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন, যার শিরোনাম: ‘ইজতিমাউন্ নাস্ লি-কিরআতি কিস্সাতি মাওলিদন নবী’ (মহানবী

৩৫৫. প্রাপ্ত পুস্তিকা, ৬ পৃষ্ঠা।

৩৫৬. ওয়াহিদুজ্জামান প্রণীত ‘হাদিয়া আল-মাহদী মিন আল-ফিকুহ আল-মুহাম্মদী,’ ১১৮-১১৯ পৃষ্ঠা।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমনের বর্ণনা পাঠের উদ্দেশ্যে জনসমাবেশ)। এই অধ্যায়ে তিনি মীলাদ সম্পর্কে বিভিন্ন আলেমের ফতোয়া উদ্ধৃত করেন এবং সবশেষে সিদ্ধান্ত নেন এই মর্মে যে, মীলাদুন্নবী প্রতিষ্ঠা সহীহ দলিলের উপর ভিত্তিশীল এবং এটা একটা মোস্তাহাব আমল।

শায়খের লেখা অপর একটি বইয়ের নাম ‘আল-আনওয়ার মুহাম্মাদিয়া মিনাল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়া।’ তাতে তিনি লিখেন,

وَلَيْلَةُ مَوْلَاهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَلَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَّةَ فِي الدَّارِ الَّتِي كَانَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ. وَأَرْضَعَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُؤَيْبَةُ عَتِيفَةَ أَبِي لَهَبٍ. أَعْتَقَهَا حِينَ بَشَّرَتْهُ بِوَلَادَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَقَدْ رُوِيَ أَبُو لَهَبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي التَّوْمِ. فَقِيلَ لَهُ: مَا حَالَكَ؟ فَقَالَ: فِي النَّارِ. إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفُ عَنِّي فِي كُلِّ لَيْلَةٍ اثْنَيْنِ. وَأُمِّصُ مِنْ بَيْنِ أُصْبُعِي هَاتَيْنِ مَاءً. وَأَشَارَ بِرَأْسِ أُصْبُعِهِ. وَإِنَّ ذَلِكَ بِإِعْتَاقِي لِثُؤَيْبَةَ عِنْدَمَا بَشَّرَنِي بِوَلَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: فَإِذَا كَانَ هَذَا أَبُو لَهَبٍ الْكَافِرُ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ بِدَمِهِ جَوْزِي فِي النَّارِ بِفَرْجِهِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ، فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِّدِ مِنْ أُمَّتِهِ يَسَّرَ بِمَوْلَاهِ، وَيَبْذُلُ مَا تَصَلَّى إِلَيْهِ قَدْرَهُ فِي مُحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! لِعُمْرِي! إِنَّمَا يَكُونُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَنْ يَدْخُلَهُ بِفَضْلِهِ الْعَمِيمِ جَنَّاتِ التَّعِيمِ.

وَلَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلَاهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيْلِيَةِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ. وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ وَزِينَتَهُ فِي الْمَبَرَّاتِ. وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلَاهِ الْكَرِيمِ. وَيُظْهِرُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلِّ فَضْلٍ عَظِيمٍ. وَمِمَّا جَرَّبَ مِنْ خَوَاصِّهِ أَنَّهُ أَمَانَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، وَبُشْرَى عَاجِلَةٍ بِنَيْلِ الْبُعْيَةِ وَالْمَرَامِ، فَرَحِمَ اللَّهُ أَمْرَاءَ اتَّخَذَ لِيَالِي شَهْرِ مَوْلَاهِ الْمُبَارَكِ أَعْيَادًا.

—মীলাদুন্নবীর রাত কুদরের রাতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। মক্কা নগরীতে মুহাম্মদ বিন ইউসুফের মালিকানাধীন বাড়িটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত শরীফ হয়। আবু লাহাবের মুক্ত করে দেয়া দাসী সুওয়াইবা তাঁকে শৈশবকালীন দুধ পান করান। আবু লাহাব তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলো যখনই তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদের সুসংবাদ তাকে দিয়েছিলেন।

আবু লাহাবকে এক স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করা হয়, ‘তোমার কী ফায়সালা হয়েছে?’ সে উত্তর দেয়, ‘আমি জাহান্নামের আগুনে পুড়ছি। তবে প্রতি সোমবার আমার শাস্তি লাঘব হয় এবং আমি আমার এই আঙ্গুলগুলোর ডগা থেকে পানি পান করতে পারি (ওই সময় সে তার তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলির দিকে ইঙ্গিত করছিলো)। আর এটা এ কারণে যে আমি সুওয়াইবাকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম (আঙ্গুলের ইশারায়) যখনই সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদের সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলো।’

ইবনে জাওয়াযী বলেন: আল-কুরআনে তিরস্কৃত অবিশ্বাসী আবু লাহাবের ক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদের রাতে আনন্দ অনুভবের কারণে যদি তাকে জাহান্নামের আগুনেও পুরস্কৃত করা হয়, তাহলে আল্লাহ তা‘আলার একত্বে বিশ্বাসী ওই মুসলমানের বেলায় আপনারা কী বলবেন, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত ও তাঁর পবিত্র মীলাদ উপলক্ষে খুশি হন এবং তাঁরই প্রতি মহব্বতের নিদর্শনস্বরূপ মীলাদ উদযাপনে আপন সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থব্যয় করেন? নিশ্চয় মহা দয়াময় আল্লাহর तरফ থেকে ওই মুসলমানের পুরস্কার হলো এই যে, আল্লাহ তা‘আলা নিজ নেয়ামত হতে তাঁকে দান করবেন এবং (চির) সুখ-শান্তির বেহেশতে তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দেবেন!

ইসলাম ধর্মের অনুসারীবৃন্দ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের মাসে মীলাদ অনুষ্ঠান ও খানাপিনার আয়োজন করে থাকেন। এই মাসের রাতগুলোতে তাঁরা দান-সদকাহ, খুশি প্রকাশ ও বেশি বেশি নেক আমল পালন করেন। ধরাধামে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শুভাগমন বিষয়ক বর্ণনাগুলো পাঠে আগ্রহ প্রকাশ

করেন এবং এরই আশীর্বাদে তাঁদের প্রতি সব ধরনের (খোদায়ী) রহমত-বরকতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

মীলাদ অনুষ্ঠানের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এটা সারা বছরের জন্যে নিরাপত্তার একটি উৎস এবং প্রার্থিত সমস্ত উত্তম বস্তুর একটি সুসংবাদ। আল্লাহ পাক সে ব্যক্তির প্রতি তাঁর রহমত বর্ষণ করুন, যিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদের রাতগুলোকে বাৎসরিক উদযাপন হিসেবে গ্রহণ করেন।^{৩৫৭}

৬.৪৯ হাকিমুল উম্মাহ আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল (১২৯৪-১৩৫৭ হিজরী)

পূর্বাঞ্চলের কবি ড: মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮ খৃ.) একবার বলেছিলেন:

সংক্ষেপে, মুসলমানদের কাছে পবিত্র দিনগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি বিশ্বাস করি, মানবের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্যে ফলদায়ক কোনো বিষয়ের নিয়মিত পালন ও স্মরণ তারই বুদ্ধিবৃত্তি ও আবেগের প্রতিপালনের জন্যে একটি মৌলিক শর্ত। অতএব, মুসলমানদের জন্যে এটা অত্যাবশ্যক যে, তাঁরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থাপিত নিখুঁত দৃষ্টান্ত সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত ধরে রাখেন তথা সংরক্ষণ করেন, যাতে তাঁকে অনুসরণ-অনুকরণ ও ধার্মিকতা অনুশীলনে উদ্দীপনাকে নব-তেজোদীপ্ত করা যায়। এই উদ্দীপনা তিনটি পদ্ধতিতে জারি রাখা যেতে পারে:

প্রথম পদ্ধতিটি হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাতু-সালাম পাঠ; এটা ঈমানদারের দৈনন্দিন জীবনের একটি মৌলিক দিক, যাঁদের নিকট এর জন্যে সর্বদা সময় বরাদ্দ থাকে। আমাদের জানানো হয়েছে যে, আরব বিশ্বে যখন দু'জন ব্যক্তি কোনো বাজার এলাকায় ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হন, তখন তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে জোরে জোরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত পাঠ করেন, আর সাথে

৩৫৭. আল-নাবহানী রচিত 'আল-আনওয়ার আল-মুহাম্মদিয়া মিন আল-মাওয়াহিব আল-লাদুনিয়া', ২৮-২৯ পৃষ্ঠা।

সাথেই কলহে লিপ্ত দু'জন শান্ত হয়ে যান; তাঁরা মারমুখো মনোভাব পরিত্যাগ করেন। এটাই হচ্ছে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাতের প্রভাব। যাকে স্মরণ করেই এই সালাতু-সালাম পাঠ করা হোক না কেন, তা তার অন্তরে প্রভাব ফেলতে বাধ্য।

প্রথম পদ্ধতিটি ব্যক্তি-পর্যায়ের। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি কিন্তু সামষ্টিক ধর্মসভাভিত্তিক। অর্থাৎ, সর্বসাধারণকে ধর্মীয় সমাবেশে এনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী সম্পর্কে সম্যক অবগত কোনো আলেম তা হতে বিভিন্ন বর্ণনা তুলে ধরবেন, যাতে গোটা মুসলমান সমাজ ধর্মীয় আবেগের সাথে হৃদয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ হন। এটাই আমাদের আজকের এই ধর্মীয় সমাবেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তৃতীয় পদ্ধতিটি যদিও একটি চ্যালেঞ্জস্বরূপ, তথাপি এখানে তার উল্লেখ করতে হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ এমন ঘন ঘন ও এমন উপায়ে করা চাই, যাতে মানুষের অন্তরগুলো আপনা আপনিই তাঁর রেসালাত তথা (ঐশী) আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আরেক কথায়, প্রায় তেরোশ বছর আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র উপস্থিতি দ্বারা সৃষ্ট (ধর্মীয়) উৎসাহ-উদ্দীপনা বর্তমানে মানুষেরই (আত্মিক) উচ্ছ্বাসপূর্ণ মনোভাবে পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে।^{৩৫৮}

৬.৫০ মাওলানা আশরাফ আলী খানবী (১২৮০-১৩৬২ হিজরী)

আশরাফ আলী খানভী (১৮৬৩-১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ) দারুল উলূম দেওবন্দ (ভারত) হতে টাইটেল পাশ দেওবন্দী মাসলাকের এক পরিচিত আলেম, যিনি হাজী এমদাদউল্লাহ মুহাজিরে মক্কী চিশ্তী সাহেবের হাতে বায়াত হয়েছিলেন। তাঁর লিখিত 'নশরুল্লাহ ফী যিকরিন্ নবিরিয়াল হাবীব' শীর্ষক সীরাতে গ্রন্থটিতে রাসূলপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই প্রকাশনার প্রথম অধ্যায়ে তিনি হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ মহানবী

৩৫৮. গোলাম দস্তগীর রশীদ, 'আসা'রে ইকবাল, ৩০৬-৩০৭ পৃষ্ঠা।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর-বিষয়ক হাদীসখানা উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি এধরনের আরো কিছু হাদীস বর্ণনা করেন। একইভাবে, মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাঁর বেশ কিছু প্রভাষণসম্বলিত একটি সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সমাবেশগুলোর একটিতে তিনি ঘোষণা করেন:

কিছু বছর যাবৎ আমার একটা অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, রবিউল আউয়াল হিসেবে উল্লেখিত পবিত্র সময়কাল— যা আশেকে রাসূল মোল্লা আলী কারী সাহেব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেছেন নিম্নের পংক্তিতে:

لَهَذَا الشَّهْرِ فِي الْإِسْلَامِ فَضْلٌ مُنْقَبُتُهُ تَفْوَقُ عَلَى الشُّهُورِ
رَبِّيعٌ فِي رَبِّيعٍ وَنُورٌ فَوْقَ نُورٍ فَوْقَ نُورٍ

—ইসলামে এই মাসটির রয়েছে বিশেষত্ব, অন্যান্য মাসের উপরে এর শ্রেষ্ঠত্ব বসন্তের মাঝে বসন্তের মাঝে বসন্ত, নূরের উপরে নূরের উপরে নূর দীপ্ত।

সেই পবিত্র মাস উপস্থিত হলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম বৈশিষ্ট্যগুলো, যেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে তাঁর বেলাদত উপলক্ষে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, সেগুলো আমি আলোচনা করি। সেগুলো আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করি, ফরয বিবেচনা না করেই। কেননা এক্ষেত্রে উলামাদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান (কোনো নির্দিষ্ট দিন-তারিখ নির্ধারণের প্রশ্নে)। অতএব, ফরয মনে না করে আমি দুটি কারণে এটা করে থাকি:

প্রথম কারণটি হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ আপনাপনাই আনুগত্য ও বাধ্যতামূলক এবং এটা আশীর্বাদ অর্জনের একটি মাধ্যম।

দ্বিতীয়তঃ সর্বসাধারণকে এ মর্মে সচেতন করে তোলা যে, আমরা যারা মীলাদ মাহফিলকে নিষেধ করি, (রাসূলের) যিকরের কারণে তা করি না; কেননা আমরা যিকরকে আনুগত্য হিসেবে বিবেচনা করি; বরঞ্চ আমরা তা নিষেধ করে থাকি শ্রেফ এই কারণে যে, এর সাথে ভুল বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট হয়ে গিয়েছে। নতুবা আমরা যিকরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে পুরোপুরি সমর্থন করি, আর এটা আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও বটে।

এগুলো হচ্ছে স্পষ্ট কারণ। বাস্তবতা হলো আমার অন্তর অন্যান্য দিনের চেয়ে ওই দিনগুলোতেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিকর-তায়কেরা করতে ব্যাকুল। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, যে সময়ে প্রকৃত ঘটনাটি ঘটেছে সে ক্ষণের প্রতিই অন্তরের টান বেশি থাকবে। মন যখন নিয়মিত ওর দিকে টানে, এমতাবস্থায় জিহ্বা সাথে সাথে এ বিষয়টি বর্ণনা আরম্ভ করলে ক্ষতি কী? এটা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাশিত।^{৩৫৯}

আশরাফ আলী থানভী তাঁর একই ভাষণের অন্যত্র বলেন:

—প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রতি রবিউল আউয়াল মাসে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে আমার এই প্রবণতা এমনই এক বিষয়, যা আমার নিয়মিত অনুশীলন হতে নিঃসৃত ছিলো, আর তা আমার কৃত কোনো বাধ্যবাধকতা (মানে ওই নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নির্ধারিত বিষয়) ছিলো না। অতএব, কিছু বছরের জন্যে আমি নিয়মিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী সম্পর্কে বয়ান রেখেছি, অসংখ্য ভাষণে যার নামগুলোর ছন্দ মিলে যায় এবং শেষ অক্ষরগুলোও একই হয়; যেমন— ‘আন্-নূর’, ‘আয্-যুহূর’, ‘আস্-সুরূর’, ‘আশ-শাদূর’, ‘আল-হাবূর’। পরবর্তী সময়ে কিছু প্রাকৃতিক বাধার কারণে এই নিয়মিত চর্চায় কিছু কালের জন্যে ছেদ পড়ে। হয়তো এর একটি কারণ হতে পারে এই যে, মানুষ মনে করতে পারতো এই অনুশীলনী বুঝি একটি বাধ্যবাধকতা, যদিও তা নিয়মিত চর্চার পরিপন্থী হতো।^{৩৬০} নিয়মিত অনুশীলনের সবচেয়ে বড় কারণ ছিলো এই যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমার যিকর-তায়কেরাহ ওই দিনগুলোতে অন্যান্য দিন হতে বেশি ছিলো, আর এটা শরীয়ত বা আক্বায়েদের শর্তের পরিবর্তে ছিলো।^{৩৬১}

৩৫৯. আশরাফ আলী থানভী, ‘খুতাবাত মীলাদ আল-নবী’, ১৯০ পৃষ্ঠা।

৩৬০. বঙ্গানুবাদের নোট: এই যুক্তি ধোপে টেকে না; কেননা খোলাসা বয়ান দিলেই সবাই বুঝতে সক্ষম।

৩৬১. প্রাগুক্ত, ১৯৮-১৯৯ পৃষ্ঠা।

‘ফযল’ ও ‘রহমত’ শব্দগুলো ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আশরাফ আলী থানভী বলেন:

—এই আয়াতের শানে নুযূলের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, এটা কুরআন মজীদকে উদ্দেশ্য করেছে। তবে সাধারণ অর্থে যদি আমরা নেই, তাহলে কুরআন শরীফকে উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে নিতে হবে, যা অধিকতর যথাযথ। অর্থাৎ, ‘ফযল’ ও ‘রহমত’ শব্দগুলো দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত শরীফকেই উদ্দেশ্য করা উচিত। এই উপলব্ধি অনুসারে, পার্থিব বা আধ্যাত্মিক সকল আশীর্বাদ, যাঁতে অন্তর্ভুক্ত আল-কুরআনও, তার সবই এই বেলাদত শরীফের মধ্যে ধারণকৃত। এটা একারণে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক সত্তা অন্য সব আশীর্বাদের উৎসস্থল, আর সকল নেয়ামত ও করুণার নির্ধারক। অতএব, এটাই হলো সবচেয়ে সামগ্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। আর এই তাফসীরেরই ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতে করীমার সারসংক্ষেপ হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরের অস্তিত্ব হোক বা তাঁর শারীরিক বেলাদতই হোক, প্রত্যেকেরই (এ ব্যাপারে) খুশি প্রকাশ করা উচিত; কেননা তিনিই সকল আশীর্বাদের মাধ্যম। (সার্বিক অন্যান্য আশীর্বাদ ছাড়াও) সবচেয়ে সেরা আশীর্বাদ হলো ঈমান, যা সুনিশ্চিতভাবে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন খোদ আমাদের নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই। পরিশেষে বলবো, সকল তথ্য-উপাত্ত বিবেচনায় নিলে (পরিস্ফুট হয় যে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক সত্তাই (আয়াতোক্ত) ‘ফযল’ ও ‘রহমত’। তাই তাঁর আশীর্বাদময় সত্তার অস্তিত্বে কেউ খুশি প্রকাশ করলেও পর্যাপ্ত হবে না।^{৩৬২}

আশরাফ আলী থানভীর এসব বক্তব্য-বিবৃতি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর বিশ্বাস আলাদাভাবে মীলাদ-বিরোধী ছিলো না, বরঞ্চ তিনি এটাকে নির্দিষ্ট তারিখে নির্ধারণ করার পক্ষপাতি ছিলেন না। প্রতিটি পন্থায় মীলাদ উদযাপন বৈধ ও প্রশংসনীয় একটি আমল বলে তাঁর দৃষ্টিতে সাব্যস্ত হয়।

৬.৫১ মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী (জন্ম: ১৩৪১ হিজরী)

মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী (জন্ম: ১৯২২ খৃষ্টাব্দ) বলেন:

—প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত উপলক্ষে খুশি প্রকাশের কারণে যদি আবু লাহাবের মতো অভিশপ্ত অবিশ্বাসী তার শাস্তি লাঘব পেতে পারে, তাহলে ওই মুসলমানের কী অবস্থা হবে, যিনি (এ উপলক্ষে) খুশি প্রকাশ করেন এবং মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ (এই খাতে) ব্যয় করেন? তিনি কি কোনো পুরস্কার পাবেন না?^{৩৬৩}

৬.৫২ মুফতী মুহাম্মদ মাযহারুল্লাহ দেহলভী

মুফতী মুহাম্মদ মাযহারুল্লাহ দেহলভী লিখেন:

—বারো রবিউল আউয়াল তারিখে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করা এ শর্তে যে, তা সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তিশীল হবে এবং জশনে জুলূস-মিছিল বের করা এ শর্তে যে, তাতে কোনো হারাম কাজ সংঘটিত হবে না বরং এই দুটোই বৈধ কাজ। এর পরিপন্থী কোনো বক্তব্য পেশ করতে হলে শরীয়তের দলিল প্রয়োজন হবে। আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি এর সমালোচকবর্গের কাছে মীলাদের বিরুদ্ধে তাদের কী দলিল আছে? সাহাবা-এ কেরাম রাডিয়াল্লাহু আনহুম মীলাদ পালন করেননি বা এভাবে জশনে জুলূস-মিছিলের আয়োজন ঠিক নয় মর্মে যুক্তি উপস্থাপন করা চলবে না, কেননা কোনো জায়েয কাজ না করলেই তা না-জায়েয হবার দলিল হয় না।^{৩৬৪}

৬.৫৩ শায়খ মুহাম্মদ রেযা মিসরীর গবেষণা

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ শায়খ মুহাম্মদ রেযা মিসরী ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বিষয়ে উলামাবৃন্দের রায়গুলো সংকলন করেছেন তাঁর প্রণীত প্রসিদ্ধ ‘মুহাম্মাদুর রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ শীর্ষক গ্রন্থে। সারা বিশ্বে অনুষ্ঠিত মীলাদ মাহফিল সম্পর্কে তিনি বইটিতে তিনটি পৃষ্ঠা রচনা করেছেন। এই পৃষ্ঠাগুলোর অনুবাদ হলো:

—ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)’র শায়খ ইমাম আবু শামা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমাদের যুগে প্রবর্তিত সেরা বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত বার্ষিকীর দিনটির উদযাপন। ওই দিন দান-সদকাহ করা হয়, নেক আমল পালন করা হয়, আর উত্তম পোশাক পরিধান এবং খুশি প্রকাশ করা হয়। এধরনের কর্ম, গরিবদের প্রতি দয়াপরবশ হওয়া ছাড়াও ইঙ্গিত করে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মানুষের অন্তরে ইশক-মহব্বত, শ্রদ্ধা ও (তাঁর) মহিমা (উপলব্ধিসূচক) অনুভূতি বিরাজমান; আর পাশাপাশি আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা বিদ্যমান এই কারণে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করে জগতসমূহের জন্যে তাঁরই (খাস) রহমত হিসেবে প্রেরণ করে তাদেরকে আশীর্বাদধন্য করেছেন।”

ইমাম সাখাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

—পবিত্র মীলাদ উদযাপনের (বর্তমান প্রচলিত ধারাটি) পুণ্যাত্মাদের প্রথম তিনটি প্রজন্ম হতে বর্ণিত হয়নি সত্য; এটা নেক তথা পুণ্যময় উদ্দেশ্য ও একনিষ্ঠ অন্তর সহকারে পরবর্তীকালে প্রবর্তিত হয়। ইসলামের অনুসারী মানুষেরা বিভিন্ন দেশে ও শহরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদের মাসটিতে বড় বড় মেজবান খানাপিনা ও সমাবেশের আয়োজন করে এটাকে উদযাপন করতে থাকেন। মীলাদুন্নবীর রাতগুলোতে মুসলমান সম্প্রদায় দান-সদকাহ ও খুশি প্রকাশ করেন, আর বেশি বেশি পুণ্যদায়ক কর্মের অনুশীলনও করে থাকেন। বস্তুতঃ তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমন-স্থানের নৈকট্য হতে ফায়দা গ্রহণ করেন, আর এর আশীর্বাদে তাঁদের উপর প্রতিটি মহা নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশও ঘটে।”

ইমাম ইবনে জাওয়াযী বলেন,

—মীলাদ অনুষ্ঠান উদযাপনের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি হলো, এটা সারা বছরের জন্যে নিরাপত্তার একটি উৎস এবং অন্বেষণকৃত প্রতিটি কল্যাণের আগাম সুসংবাদ। মীলাদুন্নবী প্রচলনকারী প্রথম ব্যক্তি ছিলেন ইরবিল রাজ্যের সুলতান মোযাফফর আবু সাঈদ। হাফেয আবু দিহইয়া (ওই

মীলাদুন্নবী অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্যে) একখানি কিতাব রচনা করেন, যার শিরোনাম দেন ‘আত-তানভীর ফী মাওলিদিল বাশীর আল-নাযীর’ (সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীর ধরাধামে শুভাগমনে জ্যোতির্ময়তা)। আর এই বইটির জন্যে মোযাফফর শাহ তাঁকে এক হাজার দিনার পুরস্কার দেন। সুলতান মোযাফফর শাহ পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে মীলাদের আয়োজন করেন এবং এতে মহা জাঁকজমকের সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নির্মল আত্মাসম্পন্ন, সাহসী, বুদ্ধিমান ও মতোপরায়ণ ব্যক্তি। কেউ কেউ বলেন তিনি মীলাদ অনুষ্ঠানে ৩,০০,০০০/- (তিন লাখ) দিনার ব্যয় করতেন।

তিলিমসান রাজ্যের সুলতান আবু হামওয়া মূসাও মহা জাঁকজমকের সাথে মীলাদ উদযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন, ঠিক যেমনটি পালন করতেন তাঁরই পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক মরক্কো ও আন্দালুসিয়া (স্পেন) রাজ্যগুলোর রাজা-বাদশাহবন্দ। হাফেয সাইয়েদী আবু আবদিল্লাহ তুনসী তিলিমসানী নিজ ‘রাহাল আরওয়াহ ফীমা ক-লাহ মওলা আবু হামওয়া মিনাশ শি’রি ওয়াকীলা ফী-হি মিনাল আমদাহ’ (আবু হামওয়ার কাব্যে আত্মসমূহের প্রশান্তি এবং ওই কাব্যের প্রশংসায় যা বলা হয়েছিলো) শীর্ষক গ্রন্থে সুলতানের মীলাদ উদযাপন সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন।

হাফেয সাহেব তাতে লিখেন যে সুলতান আবু হামওয়া মূসা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদের রাতে একটি উন্মুক্ত (ধর্ম) সভা করতেন, যা’তে গণ্যমান্য ও সর্বসাধারণসহ অনেক মানুষ জড়ো হতেন। দামী ফরাশ পাতা স্টেজ সাজানো হতো এবং তা ফুলে সুশোভিত হতো। সোনালী বালিশের কভার মোড়ানো বড় বড় বালিশ বিছানো হতো অংশগ্রহণকারীদের আরামের সুবিধার্থে। লম্বা লম্বা স্তম্ভ সদৃশ দীর্ঘাকৃতির প্রদীপ জ্বালানো হতো। বিশাল ভোজের আয়োজনও করা হতো। তাওয়াগুলোতে সুগন্ধিযুক্ত আগরবাতি জ্বালানো হতো; এমন মনে হতো যেনো তা সোনা গলাচ্ছে। অংশগ্রহণকারীদের মাঝে প্রতিটি সুস্বাদু খাবার এমন শোভাবর্ধক পছন্দ্য পরিবেশিত হতো যেনো সেগুলো তাজা ফুলের মালা। রং-বেরংয়ের খাবার দর্শকদের খাদ্যরুচি বৃদ্ধি করতো। ভোজ্য এসব দ্রব্যের খোদ দৃশ্য দেখেই তাঁদের চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। সবচেয়ে মনোরম সুগন্ধিসমূহ হাওয়ায় ভাসতো এবং (ধর্মীয়) সমাবেশকে

সুবাসিত করতো। মীলাদ সমাবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে মর্যাদা অনুযায়ী মেহমানদের জন্যে বসার ব্যবস্থা করা হতো।

(ধর্মীয়) সমাবেশের শেষে উপস্থিত গণ্যমান্যদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাকারী প্রশংসাসূচক বক্তব্য রাখতে দেয়া হতো। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ এবং তওবা করার উৎসাহ প্রদানসূচক ওয়ায-নসীহত তাতে পেশ করা হতো। এসব প্রাজ্ঞল বাণী কানে শুনতে আনন্দদায়ক ছিলো এবং এগুলো শ্রোতামণ্ডলীর অন্তরের গভীরে ঢালা হতো।^{৩৬৫}

আমাদের এই যুগে ইসলামী বিশ্বজুড়ে মুসলমান সমাজ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ পালন করে থাকেন। মিসরে তাঁর বেলাদত বিষয়ে জনসমাবেশে বর্ণনাসমূহ পঠিত হয় এবং গরিব ও অভাবী মানুষের মাঝে দান-সদকা করা হয়। কায়রোতে মধ্যদিবসের পরে মানুষের ঢল নামে এবং ওই মিছিল প্রধান প্রাদেশিক শাসনকর্তার কার্যালয় অতিক্রম করে আব্বাসীয়া চত্বর অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে; এসময় তাঁরা পুলিশ প্রহরাধীন সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করেন। এই জুলূস-মিছিল গৌরিয়া, আশরাকিয়া, কোয়েলা বাজার ও হোসাইনিয়া অতিক্রম করে আব্বাসিয়ায় এসে থামে। এসব এলাকা প্রদক্ষিণ করার কালে সর্বসাধারণ দলে দলে জুলূস-মিছিলে যোগ দেন এবং ফলশ্রুতিতে এর আকৃতি তৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়। পুলিশ ওই জুলূসের অগ্রভাগে অবস্থান নেয় এবং সৈন্যরা ওর দুদিক ঘিরে দাঁড়ায়। এই দিনটি মিসরে একটি জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে গণ্য; ফলে মন্ত্রীদের জন্যে তাঁবু নির্মাণ করা হয়। শাসনকারী বাদশাহ বা তাঁর প্রতিনিধিও এতে অংশ নেন এবং তাঁরা বৃহৎ তাঁবুতে প্রবেশের আগে সেনাবাহিনী তাঁদেরকে অভিবাদন জানায়।

অতঃপর সমস্ত সূফী তরীকার মাশায়েখবৃন্দ নিজ নিজ পতাকা উড্ডীন করেন এবং মীলাদুন্নবী বিষয়ে ওয়ায-নসীহত করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান-শওকত তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান শেষে শাসক মহোদয় বক্তাবৃন্দকে একটি করে রাজকীয় আলখেল্লা উপহার দেন। আর

অংশগ্রহণকারীদের মাঝে মিষ্টি ও শরবত বিতরণ করা হয়। তোপধ্বনির গর্জনের মধ্যে রাজ ব্যক্তিবৃন্দ স্থানত্যাগ করেন।

সন্ধ্যায় তাঁবুগুলোতে বাতি স্থাপন করা হয়, যা এক মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করে। সকালে জাতীয় ছুটির কারণে সমস্ত কার্যালয় বন্ধ থাকে। মিসরের প্রধান প্রাদেশিক শাসনকর্তার উপস্থিতিতে হুসাইনী মসজিদের আশপাশে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী বর্ণনা করা হয়। আজকাল অনেক নতুন প্রচলন (বেদআত) রহিত করা হয়েছে, আলেম-উলামা ও কর্তৃপক্ষের একনিষ্ঠ প্রয়াসের কল্যাণে।

এটাই হলো মীলাদুন্নবীর বর্ণনা। এর পাশাপাশি আমরা কর্ণধার শাসকবৃন্দের প্রতি প্রতিনিয়ত অনুরোধ জানাই, যাতে তাঁরা ধর্মবিরোধী প্রতিটি বিষয়েরই প্রতি কঠোর নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করেন; যেমন— পাপ ও বেহুদা কথাবার্তা। কেননা এটা ইসলামের একটা নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদের মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কলঙ্কিত করে।^{৩৬৬}

৬.৫৪ দেওবন্দী মৌলভীদের সর্বসম্মত মত

দ্বীন-মাযহাব তথা আক্বীদাগত ও মতপার্থক্যের ২৬টি বিষয় সম্পর্কে মক্কা মোয়াযযমা ও মদীনা মোনাওয়ারার আলেম-উলামাবৃন্দ একবার দেওবন্দী মৌলভীদের প্রশ্ন করেন [উসমানীয় তুর্কী শাসনামলে]। খলীল আহমদ সাহারানপুরী (১২৬৯-১৩৪৬ হিজরী) লিখিত বই আকারে ১৩২৫ হিজরী সালে একটি জবাব দেন যার শিরোনাম ছিলো ‘আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ’। চব্বিশ জন পরিচিত দেওবন্দী আলেম এতে অনুমোদনসূচক স্বাক্ষর করেন, যাঁদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (মৃত্যু: ১৩৩৯ হিজরী), আহমদ হাসান আমরুহী (মৃত্যু: ১৩৩০ হিজরী), দারুল উলূম দেওবন্দের গ্র্যান্ড মুফতী আযীযুর রহমান (মৃত্যু: ১৩৪৭ হিজরী), আশরাফ আলী থানভী (মৃত্যু: ১৩৬২ হিজরী) ও আশীক এলাহী মিরাতী। উক্ত আলেমবর্গ দ্ব্যর্থহীনভাবে বইটির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন

এই কথা বলে যে, এটা তাঁদের এবং তাঁদের পূর্ববর্তীদের মাসলাক তথা পথ ও মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

এই বইটিতে ২১তম প্রশ্নটি ছিলো মীলাদ-সংক্রান্ত। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়:

أَتَقُولُونَ أَنَّ ذِكْرَ وَلَدَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَفْهِجٌ شَرْعًا عَنِ الْبِدْعَاتِ السَّيِّئَةِ الْمُحَرَّمَةِ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ.

—আপনারা কি এ মতের উপর অটল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ বর্ণনা করা একটি দূষণীয় বেদআত তথা নতুন প্রচলন এবং শরীয়তে নিষিদ্ধ কাজ? না কি অন্য কিছু?

দেওবন্দী মৌলভীবর্গ সর্বসম্মতভাবে উত্তর দেন:

حَاشَ أَنْ يَقُولَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضْلًا أَنْ نُوقَلَ نَحْنُ أَنَّ ذِكْرَ وَلَدَتِهِ الشَّرِيفَةِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. بَلْ وَذَكَرَ عَبَارُ نَعَالَهُ وَبَوَّلَ حَمَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَفْهِجٌ مِنَ الْبِدْعَاتِ السَّيِّئَةِ الْمُحَرَّمَةِ. فَلَا حَوْلَ الْيَتِي لَهَا أَذْيٌ تَعْلُقُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ذِكْرَهَا مِنْ أَحَبِّ الْمُنْدُوبَاتِ وَأَعْلَى الْمُسْتَحَبَّاتِ عِنْدَنَا سَوْءٌ، كَانَ ذِكْرَ وَلَدَتِهِ الشَّرِيفَةِ أَوْ ذَكَرَ يَوْلَدَ وَبَرَّارِهِ وَقِيَامِهِ وَقُعُودِهِ وَتَوَمُّمِهِ وَنَبْهَتِهِ، كَمَا هُوَ مَصْرُوحٌ فِي رِسَالَتِنَا الْمُسَمَّاةِ بِالْبَرَاهِينِ الْقَاطِعَةِ فِي مَوَاضِعَ شَتَّى مِنْهَا.

—আমরা তো দূরে, মুসলমানদেরও উচিত নয় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদময় মীলাদের কথা দূরে থাক, বরঞ্চ তাঁর পবিত্র চপ্পল বা তাঁর গাধার মূত্র অপছন্দনীয় বেদআত বলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সামান্যতম সংশ্লিষ্টতা রাখে এমন কোনো বিষয়ের স্মরণ আমাদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় ও প্রশংসিত আমল তথা পুণ্যকর্ম। এটা হতে পারে তাঁর মীলাদের যিকর-তাযকেরা, বা পবিত্র মলমূত্র, তাঁর দাঁড়ানো বা উপবেশন কিংবা ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থা, ঠিক

যেমনটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে আমাদের প্রণীত ‘বারাহীনে ক্বাতেআ’ শীর্ষক বইটির বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে।^{৩৬৭}

এধরনের লেখনীর সহজলভ্যতা সত্ত্বেও পরিতাপের বিষয় হলো, ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে আজ এতোখানি অজ্ঞতা বিরাজমান যে, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ইউরোপ ও আরবে প্রচারকবর্গ তাদের ভাষণ ও বিবৃতিতে মীলাদের কোনো ভিত্তিই নেই বলে তরুণ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করছে। তাদের মতে, এটা একটা দূষণীয় বেদআত যা স্বেচ্ছা ভারত উপমহাদেশেই অনুশীলিত হয়। যদি এ কথা বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে ইতিহাসে প্রত্যেক বিখ্যাত ইসলামী জ্ঞান বিশারদ যাঁদের কারো কারো নাম আমাদের এ বইতে উদ্ধৃত হয়েছে, তাঁদের সবাইকেই গোমরাহ ও বেদআতী বলে ধরে নিতে হবে; আর তাঁদের অনুসারীদেরও খারিজ বলে ঘোষণা করতে হবে। এমতাবস্থায় এই গুরুতর অভিযোগ ও অঙ্গুলি নির্দেশ হতে ইসলামী ইতিহাসের কেউই নিস্তার পাবেন না।

৬.৫৫ মুসলিম বিশ্বে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনের ইতিহাস

রবিউল আউয়াল মাস যখন ঘনিয়ে আসে, তখন সারা বিশ্বের মুসলমান সম্প্রদায় ধর্মীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে মীলাদুন্নবীর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। প্রতিটি মুসলমান প্রধান দেশে নিজ নিজ প্রথা ও ঐতিহ্য অনুসারে এই মাসটি অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে উদযাপিত হয়। এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ সমসাময়িককালের মুসলমানদের দ্বারাই কেবল পালিত হয়নি বরং এই দিনটি নিকট ও দূর অতীতে সর্বদাই একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিবস হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী উদযাপিতও হয়েছে।

ইবনে জাওয়াযী (৫১০-৫৭৯ হিজরী/ ১১১৬-১২০১ খৃষ্টাব্দ) তাঁর ‘বয়ানুল মীলাদ আন্-নববী’ গ্রন্থে লিখেন

لَا زَالَ أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَالْمِصْرِ وَالْيَمَنِ وَالشَّامِ وَسَائِرِ بِلَادِ الْعَرَبِ
مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ يَحْتَفِلُونَ بِمَجْلِسِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ هَلَالِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَيَهْتَمُونَ إِهْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَيَّ
السَّمَاعِ وَالْقَرَاءَةِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَأَلَّوْنَ بِذَلِكَ أَجْرًا
جَزِيلًا وَقُورًا عَظِيمًا.

—রবিউল আউয়াল মাসের আগমনীবার্তা নিয়ে নতুন চাঁদ উদ্ভিত হলে হারামাঈন শরীফাইনের (মক্কা ও মদীনার) পাশাপাশি মিসর, ইয়েমেন, ভূ-মধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল এবং আরব রাজ্যের পূর্ব হতে পশ্চিমের সকল মানুষ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমন উপলক্ষে খুশি প্রকাশার্থে মীলাদ উদযাপন অব্যাহত রাখেন। তাঁরা (তাঁরই শানে) ধর্মীয় সঙ্গীত (সেমা) ও মীলাদ পাঠে সাধ্যমতো প্রয়াস পান; আর এরই ফলশ্রুতিতে তাঁরা আশীর্বাদপূর্ণ পুরস্কার ও মহাবিজয় অর্জন করবেন।^{৩৬৮}

সর্ব-ইমাম সাখাভী (৮৩১-৯০২ হি./ ১৪২৮-১৪৯৭ খৃ.), কসতলানী (৮৫১-৯২৩ হি./ ১৪৪৮-১৫১৭ খৃ.), শায়খ আবদুল হক্ক মুহাদ্দীস দেহলভী (৯৫৮-১০৫২ হি./ ১৫৫১-১৬৪২ খৃ.) ও ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী (১২৬৫-১৩৫০ হি.) বিবৃত করেন:

وَأِنَّمَا حَدَّثَ بَعْدَهَا بِالْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ، وَالنِّيَّةِ الَّتِي لِلْإِخْلَاصِ شَامِلَةٍ، ثُمَّ لَا
زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ فِي سَائِرِ الْأَقْطَارِ وَالْمَدَنِ الْعِظَامِ يَحْتَفِلُونَ فِي شَهْرِ مَوْلِدِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ بِعَمَلِ الْوَلَائِمِ الْبَدِيعَةِ، وَالْمَطَاعِمِ
الْمُسْتَمْلَةِ عَلَى الْأُمُورِ النَّهْجَةِ وَالْبَدِيعَةِ، وَتَتَصَدَّقُونَ فِي لَيْلَائِهِ بِأَنْوَاعِ
الصَّدَقَاتِ، وَيُظْهِرُونَ الْمَسَرَّاتِ وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ بَلْ يَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ
مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيُظْهِرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلِّ فَضْلٍ عَمِيمٍ.

—(প্রচলিত) মীলাদ সাহাবা-এ কেরাম রাহিয়াল্লাহু আনহুম-এর যুগের পরে সং উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করা হয়েছিলো। ইসলাম ধর্মের অনুসারীবৃন্দ বিভিন্ন দেশে ও বড় বড় শহরগুলোতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের মাসে মীলাদ অনুষ্ঠান ও খানাপিনার আয়োজন করে থাকেন। এই মাসের রাতগুলোতে তাঁরা দান-সদকাহ, খুশি প্রকাশ ও বেশি বেশি নেক আমল পালন করেন। বস্তুতঃ তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত-স্থানের নৈকট্যের সুবিধা গ্রহণ করেন এবং এরই আশীর্বাদে তাঁদের প্রতি সব ধরনের (খোদায়ী) রহমত-বরকতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।^{৩৬৯}

মুফতী মুহাম্মদ এনায়েত আহমদ কাকুরাভী (১২২৮-১২৭৯ হি./১৮১৩-১৮৬৩ খৃ.) লিখেন:

—দুইটি পবিত্র নগরী (হারামাঈন শরীফাইন) ও ইসলামী বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের অনুশীলিত রীতি হলো রবিউল আউয়াল মাসে মুসলমানবৃন্দ মীলাদ পাঠের উদ্দেশ্যে সমবেত হন; তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অগণিত সালাতু-সালাম পাঠ করেন, মানুষদেরকে খাবারের জন্যে আমন্ত্রণ করেন এবং মিষ্টি বিতরণ করেন। এই আচারটি নিশ্চিতভাবে অশেষ সওয়াবের যোগ্য এবং এটা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কারো ইশক-মহব্বত বৃদ্ধির একটা কার্যকর মাধ্যম। রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে মদীনা মোনাওয়ারায় অবস্থিত মসজিদে নববীতে একটি আশীর্বাদপূর্ণ সমাবেশের

৩৬৯. মোল্লা আলী ক্বারী, ‘আল-মওরিদ আল-রাউয়ী ফী মওলিদ আল-নাবাউয়ী ওয়া নাসাবিহি আল-তা’হির’, ১২-১৩ পৃষ্ঠা; আল-কসতলানী, ‘আল-মাওয়া’হিব আল-লাদুনিয়া বি আল-মিনাহ আল-মুহাম্মদীয়া’, ১:১৪৮; আস-সালেহী, ‘সুবুল আল-হদা’ ওয়া আল-রাশা’দ ফী সীরাতে খায়র আল-এব’দ’, ১:৩৬২; আল-হালাবী, ‘ইনসা’ন আল-উয়ূন ফী সীরাতে আল-আমীন আল-মা’মুন’, ১:৮৪; আবদুল হক্ক দেহলভী, ‘মা’ সাবাতা মিন আল-সুন্নাহ ফী আইয়াম আল-সানা’, ৬০ পৃষ্ঠা; আল-মুরক্বানী, ‘শরহ আল-মাওয়াহিব আল-লাদুনিয়া বি আল-মিনাহ আল-মুহাম্মদীয়া’, ১:২৬১-২৬২; ইসমাঈল হাক্কী, ‘তাফসীরে রুহ আল-বয়া’ন’, ৯:৫৭; আহমদ বিন যাইনী দাহলান মক্কী, ‘আল-সীরাতে আল-নাবাউয়ীয়া’, ১:৫৩; আল-নাবহানী, ‘হুজ্জাত-আল্লাহি আল-আলামীন ফী মু’জেযাতে সাইয়েদ আল-মুরসালীন’, ২৩৩-২৩৪ পৃষ্ঠা; নাবহানী, ‘আল-আনওয়ার আল-মুহাম্মদীয়া মিন আল-মাওয়াহিব আল-লাদুনিয়া’, ২৯ পৃষ্ঠা।

আয়োজন করা হয়, অপরদিকে মক্কা মোয়াযযমায় এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত-স্থানে।^{৩৭০}

মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব স্থানে উদযাপিত হয়, সেখানকার সার্বিক কিছু রেফারেন্স পেশ করার পর আমরা এবার মুসলিম বিশ্বের প্রত্যেকটি অঞ্চলে কীভাবে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালিত হয় তা দেখাতে প্রবৃত্ত হবো।

৬.৫৫.১ মক্কা মোয়াযযমায় মীলাদুন্নবী মাহফিল উদযাপন

ইমাম সাখাভী (৮৩১-৯০২ হিজরী/ ১৪২৮-১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ) লিখেন:

وَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ مَعْدِنِ الْخَيْرِ وَالْبَرْكََةِ فَيَتَوَجَّوْنَ إِلَى الْمَكَانِ الْمُنَوَاتِرِ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّهُ مَحَلُّ مَوْلِدِهِ، وَهُوَ فِي [سُوقِ اللَّيْلِ] رَجَاءُ بُلُوغِ كُلِّ مِنْهُمْ بِذَلِكَ الْمَقْصِدِ، وَيَزِيدُ إِهْتِمَامَهُمْ بِهِ عَلَى يَوْمِ الْعِيدِ حَتَّى قُلَّ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ أَحَدٌ مِّنْ صَالِحِ وَطَالِحِ، وَمَقْلٌ وَسَعِيدٌ سَيْنَا [الشَّرِيفُ صَاحِبُ الْحَجَّازِ] بِدُونِ تَوَارٍ وَحَجَّازٍ. وَجُودٌ قَاضِيهَا وَعَالِمُهَا الْبُرْهَانِيُّ الشَّافِعِيُّ إِطْعَامُ غَالِبِ الْوَارِدِينَ وَكَثِيرٍ مِّنَ الْقَاطِنِينَ الْمُشَاهِدِينَ فَأَخْرَجُوا الْإِطْعَمَةَ وَالْحُلُوبَ، وَبِمَدِّ الْجَمْعِ فِي مَنْزِلَةِ صَبِيحَتِهَا سَمَاطًا جَامِعًا رَجَاءَ لِكَشْفِ الْبُلُوبِ، وَتَبَعَهُ وَلَدُهُ الْجَمَالِيُّ فِي ذَلِكَ لِلْقَاطِنِ وَالسَّالِكِ.

—মীলাদ উদযাপনকালে মক্কা মোয়াযযমায় অধিবাসীবৃন্দ যাঁরা মহত্ত্ব ও খোদায়ী আশীর্বাদের রত্নভাণ্ডার, তাঁরা দলে দলে ‘সূকাল লাইল’ নামের স্থানে গমন করেন; এই পবিত্র স্থানটি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমনস্থল হিসেবে পরিগণিত। মক্কাবাসী মুসলমানবৃন্দ এখানে আসেন নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের আশায়। এই

৩৭০. আল-কা'করাউয়ী, ‘তাওয়া'রীখ হাবীব ইলা'হ এয়া'নী সীরাত সাইয়েদ আল-মুরসালীন', ১৪-১৫ পৃষ্ঠা।

দিনটিতে তাঁদের উদযাপন ঈদের দিনের উদযাপনকেও ছাড়িয়ে যায়; আর তাঁদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই এটাকে এড়িয়ে যেতে অভ্যস্ত, চাই তাঁরা হোন ধার্মিক বা অধার্মিক, নিষ্ঠাবান বা উদাসীন। এটা হেজাজ অঞ্চলের বেলায় বিশেষভাবে সত্য; তবে এসব দিনে তিনি অন্য সময়ে ওই পবিত্র স্থানটি যেয়ারত করে থাকেন। মক্কা মোয়াযযমার কাজী (বিচারক) ও আলেম (বিদ্বান) আল-বুরহানী শাফেঈ সাহেবের দানশীলতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলো অতিথি, স্থানীয় অধিবাসী ও উপস্থিতজনদেরকে উন্নত খাবার ও মিষ্টি এই আশা নিয়ে খাওয়ানো যাতে বাল্য-মসীবত দূর হয়। আল-বুরহানী সাহেবের পুত্র জামালী সাহেবও কর্তব্যপরায়ণতার সাথে তাঁরই পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন এবং স্থানীয় অধিবাসী ও মুসাফিরদেরকে (একইভাবে) দান করে চলেছেন।^{৩৭১}

মোল্লা আলী কারী (ইস্তেকাল: ১০১৪ হি./ ১৬০৬ খৃ.) এই বিষয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেন:

—আমি বলি, আজকে শ্রেফ রান্নার আগুনের ধোঁয়াই অবশিষ্ট আছে এবং আমরা যা যা উল্লেখ করেছি তার কিছুই আর দৃশ্যমান নেই; এর ব্যতিক্রম শুধু ফুলের রয়ে যাওয়া সুবাস। এই পরিস্থিতি হলো সে রকম, যেমনটি কেউ কেউ বলে থাকেন—

أَمَّا الْحَيَامُ فَإِنَّهَا كَخِيَامِهِمْ وَأَرَى نِسَاءَ الْحَيِّ غَيْرَ نِسَائِهِمْ

—তাঁদের তাঁবুগুলো যেনো ঠিক তাঁদেরই তাঁবু,
কিন্তু আমি দেখি নারীরা তাঁদের নারী নয় কভু।^{৩৭২}

মুহাম্মদ জারুল্লাহ বিন যাহীরা হানাফী (ইস্তেকাল: ৯৮৬ হিজরী/ ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ) মক্কা মোকাররমায় মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদযাপন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেন:

৩৭১. মোল্লা আলী কারী কৃত ‘আল-মওরিদ আল-রাওয়া ফী মওলিদ আল-নাবাউয়ী ওয়া নাসাবিহি আল-তা'সির’, ১৫ পৃষ্ঠা।

৩৭২. প্রাণ্ডজ, ১৫ পৃষ্ঠা।

وَجَرَتْ الْعَادَةُ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ عَامٍ أَنَّ قَاضِي مَكَّةَ الشَّافِعِيَّ يَتَهَيَّأُ لِرِيَاةِ هَذَا الْمَحَلِّ الشَّرِيفِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِي جَمْعٍ عَظِيمٍ، مِنْهُمْ الثَّلَاثَةُ الْقَضَاةُ وَأَكْثَرُ الْأَعْيَانِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْفُضَّلَاءِ، وَدُورِ الْبُيُوتِ بِفَوَانِيسَ كَثِيرَةٍ وَشُمُوعَ عَظِيمَةٍ وَزَحَامَ عَظِيمَةٍ. وَيَدْعِي فِيهِ لِلْسُلْطَانِ وَلِأَمِيرِ مَكَّةَ. وَلِلْقَاضِي الشَّافِعِي بَعْدَ تَقْدِيمِ خُطْبَةٍ مُنَاسِبَةٍ لِلْمَقَامِ، ثُمَّ يَعُودُ مِنْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَبِيلَ الْعِشَاءِ. وَيَجْلِسُ خَلْفَ مَقَامِ الْحَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِزَاءِ قُبَّةِ الْفَرَّاشِينَ، وَيَدْعُو الدَّاعِي لِمَنْ ذَكَرْنَا أَنْفَاءً بِحُضُورِ الْقَضَاةِ وَأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ. ثُمَّ يَصْلُونَ الْعِشَاءَ وَيَنْصَرِفُونَ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى أَوَّلِ مَنْ سَنَّ ذَلِكَ، سَأَلْتُ مُؤَرِّخِي الْعَصْرِ فَلَمْ أَجِدْ عَنْدهُمْ عِلْمًا بِذَلِكَ.

—মক্কা শরীফে পালিত একটি প্রথা এই যে, প্রতি বছর ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখের রাতে মক্কা নগরীর শাফেঈ (মযহাবের) কাজী (বিচারক) মাগরিবের নামাযের পরে বিশাল মিছিল (জুলুস) সহকারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদের স্থানটি যেয়ারত করতে যান; ওই মিছিলে আরো অন্তর্ভুক্ত থাকেন (হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মযহাবের) অন্য তিন কাজী, বিখ্যাত ফিকাহবিদ, পুণ্যবান মুসলমানবৃন্দ এবং অভিজাত খানদানের মানুষ, যাঁদের সাথে থাকে অনেক ঝাড়বাতি, বড় বড় প্রদীপ ও সাধারণ জনতা। এই সমাবেশে মানুষেরা প্রথমে সুলতানের জন্যে দুআ করেন, তারপর মক্কার আমীরের জন্যে দুআ করেন; আর শাফেঈ কাজী দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ধর্মীয় ওয়ায-নসীহত করেন এবং এরপর তাঁরা সবাই বায়তুল্লাহ শরীফে ইশার নামাযের জন্যে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তাঁরা মাক্কাতে ইবরাহীমের পেছনে ও ক্বিবলাল ফারা'নিশ-এর সামনে বসেন। আমাদের উল্লেখিত ঘোষক (শাফেঈ) কাজীবৃন্দের ও অধিকাংশ ফিকাহবিদের উপস্থিতি কামনা করে আহ্বান জানান, আর এরপর তাঁরা সবাই 'এশা' ওয়াজের নামায পড়েন এবং প্রস্থান করেন। এই আচরিত প্রথার প্রবর্তককে আমি খুঁজে পাইনি;

আর আমি যখন এই সময়কার ইতিহাসবিদদের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাই, আমি তাঁদের কাছেও কোনো উত্তর খুঁজে পাইনি। ৩৭৩

কুতুব উদ্দীন হানাফী তাঁর রচিত 'কিতাবুল ইলাম বি-আ'লমি বায়তিল্লাহিল হারা'ম ফী তারীখি মক্কা তাল মোশাররাফা' পুস্তকে মক্কাবাসীদের আচরিত রীতি সম্পর্কে কিছু বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি তাতে ব্যাখ্যা করেন যে মক্কার অধিবাসীবৃন্দ বহু শতাব্দী যাবৎ মীলাদ উদযাপন করে আসছেন:

يَزَارُ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَكَانِيَّ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ عَامٍ، فَيَجْتَمِعُ الْفُقَهَاءُ وَالْأَعْيَانُ عَلَى نِظَامِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْقَضَاةِ الْأَرْبَعَةِ بِمَكَّةَ الْمُشْرِفَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِالشُّمُوعِ الْكَثِيرِ الْمُفَرَّغَاتِ وَالْفَوَانِيسِ وَالْمَشَاعِلِ وَجَمِيعِ الْمَشَائِخِ مَعَ طَوَائِفِهِمْ بِالْأَعْلَامِ الْكَثِيرَةِ وَيَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى سَوْقِ اللَّيْلِ وَيَمْشُونَ فِيهِ لِي إِلَى مَحَلِّ الْمَوْلِدِ الشَّرِيفِ بِإِزْدَحَامٍ وَيَخْطُبُ فِيهِ شَخْصٌ وَيَدْعُو لِلْسُلْطَنَةِ الشَّرِيفِ، ثُمَّ يَعُودُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَيَجْلِسُونَ صُفُوفًا فِي وَسْطِ الْمَسْجِدِ مِنْ جِهَةِ الْبَابِ الشَّرِيفِ خَلْفَ مَقَامِ الشَّافِعِيَّةِ وَيَقِفُ رَيْئِسُ زَمَرَمَ بَيْنَ يَدَيْ نَاطِرِ الْحَرَمِ الشَّرِيفِ وَالْقَضَاةِ وَيَدْعُو لِلْسُلْطَانِ وَيَلْبَسُهُ النَّاطِرُ خِلْعَةً وَيَلْبَسُ شَيْخُ الْفَرَّاشِينَ خِلْعَةً. ثُمَّ يُؤَدِّنُ لِلْعِشَاءِ وَيُصَلِّي النَّاسُ عَلَى عَادَتِهِمْ، ثُمَّ يَمْشِي الْفُقَهَاءُ مَعَ نَاطِرِ الْحَرَمِ إِلَى الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَتَقَرَّفُونَ. وَهَذِهِ مِنْ أَعْظَمِ مَوَاقِبِ نَاطِرِ الْحَرَمِ الشَّرِيفِ بِمَكَّةَ الْمُشْرِفَةِ وَيَأْتِي النَّاسُ مِنَ الْبُدُوِّ وَالْحَضَرِ وَأَهْلِ جِدَّةٍ. وَسُكَّانُ الْأَوْدِيَةِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَيَفْرَحُونَ بِهَا.

—প্রতি বছর ১২ই রবিউল আউয়াল রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ তথা ধরাধামে শুভাগমন স্থানটি যেয়ারত করা হয়; আর ফকীহমণ্ডলী, পবিত্র মসজিদুল হারামের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনরত বিশিষ্টজনেরা এবং মক্কা শরীফের চারজন কাজী (বিচারক) সবাই মাগরিবের নামাযের পরে সমবেত হন, আর এসময় তাঁরা বিপুল সংখ্যক মোমবাতি, হারিকেন ও মশাল বহন করেন; উপরন্তু, সমস্ত মাশায়েখ কেরাম তাঁদের মুরীদানসহ সেখানে আসেন, আরো আসেন ঘোষকবৃন্দ। তাঁরা মসজিদে হারাম ত্যাগ করে ‘সূকাল লায়ল’-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, যেখানে তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত-স্থানের দিকে হাঁটতে থাকেন; এসময় পবিত্র ওই স্থানটি জনাকীর্ণ থাকে। উপস্থিতদের মধ্যে কেউ একজন মহান খেলাফতের জন্যে দু‘আ করেন। অতঃপর তাঁরা পবিত্র মসজিদে ফিরে এসে আল-বাবুশ শরীফের দিকে মুখ করে মসজিদের মাঝখানে সারিবদ্ধ হয়ে বসে পড়েন। বিচারকমণ্ডলী এরপর সুলতান ও (কা’বা শরীফের) তত্ত্বাবধায়ককে আহ্বান করেন এবং (কিসওয়ার) এক টুকরো বস্ত্র দ্বারা তাঁকে আবৃত করেন; আর এর পরপরই আযান দেয়া হয় এবং মানুষেরা সাধারণতঃ যেভাবে ইশার নামায পড়ে থাকেন, সেভাবেই সালাত আদায় করেন। নামায শেষে ফকীহমণ্ডলী মসজিদের তত্ত্বাবধায়কের সাথে হেঁটে তার দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাঁর যাঁর পথে চলে যান। মক্কা মোকাররমার পবিত্র মসজিদের তত্ত্বাবধায়কদের জন্যে এটা সেরা সম্মানগুলোর একটা। প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকা ও শহরাঞ্চলের পাশাপাশি জেদ্দা নগরী ও বিভিন্ন উপত্যকার মানুষ এই রাতে এখানে সমবেত হন এবং এতে (আত্মিক) প্রশান্তি লাভ করেন।^{৩৭৪}

শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দিসে দেহলভী (১১১৪-১১৭৪ হি./ ১৭০৩-১৭৬২ খৃ.) মক্কা মোয়াযযমায় তাঁর সফর সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:

وَكُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ الْمُعَظَّمَةِ فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ وَلَدَتْهُ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَذْكُرُونَ

৩৭৪. কুতুব আল-দ্বীন আল-হানাফী, ‘কিতাব আল-এ’লাম বি-আ’লাম বায়ত আল্লাহ আল-হারাম ফী তারীখ মক্কা আল-মুশারীফা’, ৩৫৫-৩৫৬ পৃষ্ঠা।

إِرْهَاصَاتِهِ الَّتِي ظَهَرَتْ فِي وَلَدَتِهِ قَبْلَ بَعَثَتِهِ، فَرَأَيْتُ أَنْوَارًا سَطَعَتْ دَفْعَةً وَحِدَةً لَا أَقُولُ إِنَّ أَدْرَكْتُهَا بِبَصَرِ الْجَسَدِ، وَلَا أَقُولُ أَدْرَكْتُهَا بِبَصَرِ الرُّوحِ فَقَطُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ الْأَمْرُ بَيْنَ هَذَا وَذَلِكَ، فَتَأَمَّلْتُ تِلْكَ الْأَنْوَارَ فَوَجَدْتُهَا مِنْ قَبْلِ الْمَلَائِكَةِ الْمُؤَكِّلِينَ بِأَمْثَالِ هَذَا الْمُشَاهِدِ وَبِأَمْثَالِ هَذِهِ الْمَجَالِسِ، وَرَأَيْتُ يُخَالِطُهُ أَنْوَارُ الْمَلَائِكَةِ أَنْوَارُ الرَّحْمَةِ.

—ইতিপূর্বে আমি মক্কা মোকাররমায় অনুষ্ঠিত মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিবসের একটি অনুষ্ঠানে মক্কায় অবস্থান করছিলাম। মানুষেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাতু-সালাম পেশ করছিলেন এবং তাঁর ধরাধামে শুভাগমনের সময় প্রকাশিত নুবুওয়্যাতের পূর্বাভাসগুলো (এরহাস) ও নুবুওয়্যাত লাভের আগে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। ওই সমাবেশে আমি নূরের বলক দেখতে পাই। আমি বলি না সেগুলো আমার (নিজ) চর্মচক্ষে দেখেছি, কিংবা শ্রেফ রূহানী দৃষ্টিতে দেখেছি; (কেননা) আল্লাহ তা‘আলাই ভালো জানেন এই দুইয়ের মাঝে কীভাবে তা (সম্ভব) হয়েছিলো। আমি এসব নূরের ব্যাপারে গভীর ধ্যানমগ্ন হই এবং জানতে পারি যে, নূর ওই মাহফিলগুলোর (দেখাশোনার) দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের কাছ থেকেই নিঃসৃত হয়েছিলো। আমি ফেরেশতাদের নূরগুলোকে খোদায়ী করুণার সাথে অবতীর্ণ হতে দেখেছিলাম।^{৩৭৫}

৬.৫৫.১.১ মক্কায় ঈদে মীলাদুন্নবীর চাক্সুস সাক্ষীদের বর্ণনা

১. সবচেয়ে সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত-দিবস উপলক্ষে মক্কা মোয়াযযমায় এক মহৌৎসবের আয়োজন হয়; এটাকে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখ্যায়িত করা হয়। এই সময় মিষ্টি বিক্রি হয় ডজনে ডজনে। পবিত্র মসজিদে (বায়তুল্লাহ শরীফে) হানাফীদের নামাযের স্থানটির পেছনে স্টেজ সাজানো হয়। হেজাজ (মক্কা-মদীনা) অঞ্চলের শরীফ (গভর্নর) তাঁর সেনাপতিবৃন্দ ও সভাসদমণ্ডলীসহ

৩৭৫. শাহ ওলী-আল্লাহ, ‘ফুয়ূয আল-হারামাইন’, ৮০-৮১ পৃষ্ঠা।

রং-বেরংয়ের (জাঁকজমকপূর্ণ) পোশাক পরে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত-স্থানে গমন করেন তাঁর প্রশংসাপূর্ণ কিছু কবিতা আবৃত্তির উদ্দেশ্যে। পবিত্র মসজিদ ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত-স্থানের মাঝে দুটি সারিতে মানুষেরা প্রদীপ ধরে থাকে; এতো উজ্জ্বল আলোর প্রভা ছড়িয়ে পড়ে যে, গন্তব্য-পথের উপর দোকানপাট ও বসতবাড়িগুলো আলোকিত হয়। এই উপলক্ষে পবিত্র বেলাদত-স্থানটি জ্যোতির্ময়তার একখানি প্রতীক হিসেবে দৃশ্যমান হয়। পবিত্র স্থানটিতে গমনের সময় যেয়ারতকারীবৃন্দ সৌজন্যতা বজায় রেখে সুরেলা কণ্ঠে না'ত গাইতে থাকেন।

ইশার নামাযের পরে ১১ই রবিউল আউয়াল তারিখ (দিবাগত) রাতে পবিত্র মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। রাত দুটো পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসাসূচক কসীদা পাঠ করা হয়। তাঁর মীলাদের রাতে সর্বসাধারণের অনেকগুলো দল বেলাদত-স্থানে গমন করেন এবং সেখানে না'ত আবৃত্তি করেন। রবিউল আউয়াল মাসের ১১ তারিখ মাগরিব নামাযের সময় হতে ১২ তারিখ আসর নামাযের ওয়াক্ত পর্যন্ত প্রতি ওয়াক্ত নামায শেষে আজইয়াদ দুর্গ হতে ২১ বার তুর্কী তোপধ্বনি দেয়া হয়। এসব দিনে মক্কার মুসলমানবৃন্দ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় গান গেয়ে এবং তাঁরই সম্মানার্থে মাহফিল করে সর্বোচ্চ মাত্রায় আনন্দ উদযাপন করেন।^{৩৭৬}

২. রবিউল আউয়াল মাসের ১১ তারিখ আসরের নামাযের আযান দেয়ামাত্রই মক্কা নগরব্যাপী তোপধ্বনির গর্জন শোনা যায়। মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে নগরীর বাসিন্দাবৃন্দ একে অপরকে অভিনন্দন জানান। শরীফ হুসাইন (পাশা) হানাফীদের নামাযের স্থানে মাগরিবের নামায পড়েন। নামায শেষে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন উপলক্ষে প্রধান বিচারক (কাজী) শরীফকে শুভেচ্ছা জানান। অতঃপর সালতানাতের (রাজ্যের) সমস্ত মন্ত্রী ও সদস্যবৃন্দ এক সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত-স্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এই মহৎ জনতা অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ও

সুশৃঙ্খলভাবে সেখানে যান। রাজপ্রাসাদ হতে আশীর্বাদপূর্ণ জায়গাটিতে যাওয়ার পথে দুটি সারিতে মানুষেরা প্রদীপের আলোসহ তাঁদের সঙ্গি হন। আর বেলাদত-স্থানটি এমন উজ্জ্বল ও জাঁকজমকপূর্ণ আলোর বিকিরণ করতে থাকে, মনে হয় যেনো তা একটি বেহেশতের বাগান।

(প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) পবিত্র বেলাদত-স্থানটিতে পৌঁছানোর পর যেয়ারতকারীদের একটি দল সেখানে সর্বোচ্চ আদবসহ দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী ভক্তি ভরে জনৈক বক্তার কাছ থেকে শোনেন, যে বক্তা অত্যন্ত কার্যকর পন্থায় তা পাঠ করেন। জীবনী পাঠকারীর আলোচনা চলাকালে (পিনপতন) নীরবতা পালন করা হয়। এরকম একটি পবিত্র স্থানে তাঁদের অবস্থান করার বাস্তবতা টু শব্দটি করতেও তাঁদের বাদ সাধে; সবাই এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের জাদুস্পর্শে নিজেদের হারিয়ে ফেলেন।

এর অব্যবহিত পরেই উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী শায়খ ফুওয়াদ এক প্রাঞ্জল ভাষণ দেন, যিনি অনুপ্রেরণাদাতা ও মানবেতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, উপস্থিত সকলের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু, তিনি তাঁর জীবনের (বিভিন্ন দিকের) উপর আলোকপাত করে। সবশেষে সুবক্তা একখানি কবিতা আবৃত্তি করেন, যা শ্রোতামণ্ডলীকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত শরীফ যে স্থানটিতে হয়েছিলো, সেটার চার পাশে (বৃত্তাকারে) প্রত্যেকেই ঘুরে বেড়ান এবং এরপর তাঁরা ইশার নামায পড়ার জন্যে পবিত্র মসজিদে (বায়তুল্লাহ শরীফে) প্রত্যাবর্তন করেন। নামায শেষে তাঁরা মসজিদের কোনো অংশে মীলাদুন্নবীর বার্ষিক ওয়াজ-নসীহত শুনতে জড়ো হন। সবচেয়ে সদাশয় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈতিকতা ও প্রশংসা সম্পর্কে এখানেও অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট এক ভাষণ দান করেন আলোচনাকারীবৃন্দ।

এই পবিত্র দিন উপলক্ষে সমস্ত সরকারি বিভাগ, দাপ্তরিক কার্যালয় ও বিদ্যালয় ১২ই রবিউল আউয়াল বন্ধ রাখা হয়। চমৎকার এ দিনটি সম্পর্কে এটা একটা সাধারণ বর্ণনা। আমি দোয়া করি সর্বশক্তিমান আল্লাহ

তা'আলা যেনো এরকম বিস্ময়কর দিন আমাকে আবারো প্রত্যক্ষ করার ভাগ্য নসীব করেন, আমীন।^{৩৭৭}

ايس دعا از من واز جمله جہاں آمین باد۔

-(হে প্রভু), এ দুআ'খানি মোর,
করুন মঞ্জুর,
আমার ও জগতের খাতির।

উপরে উল্লেখিত বর্ণনা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, নিকট অতীতেও পবিত্র মক্কা নগরীতে মীলাদ শরীফ ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভক্তিসহ উদযাপিত হতো। কতোই না জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেয়া হতো এবং তা চাক্ষুস সাক্ষীর বিবরণে লিপিবদ্ধ তথা সংরক্ষিতও হয়েছে। কিন্তু আজ কী দুর্ভাগ্যের বিষয় যে স্বীয় এই জাতি (মানে মুসলমান সম্প্রদায়) আমাদের এ যুগে এই আশীর্বাদপূর্ণ দিনটির বৈধতার প্রশ্নে (বে-হুদা) তর্কে লিপ্ত।

৬.৫৫.২ মদীনা মোনাওয়ারায় মীলাদুন্নবী মাহফিল উদযাপন

وَلَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَثَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ إِحْتِفَالٍ وَعَلَى فِعْلِهِ إِقْبَالٍ وَكَانَ لِلْمَلِكِ الْمُظَفَّرِ صَاحِبُ أَرْيَكَ بِذَلِكَ فِيهَا أَتَمُّ الْعِنَايَةِ وَاهْتِمَامًا بِشَأْنِهِ جَاوَزَ الْعِيَايَةَ، فَأَتْنِي عَلَيْهِ بِهِ الْعَلَامَةُ أَبُو شَامَةَ أَحَدُ شُيُوخِ الثُّورِيِّ السَّابِقِ فِي الْأَسْتِقَامَةِ فِي كِتَابَةِ الْبَاعِثِ عَلَى الْبِدْعِ وَالْحَوَادِثِ. وَقَالَ مَثَلُ هَذَا الْحَسَنِ: يُنْدَبُ إِلَيْهِ وَيَشْكُرُ فَاعِلُهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ. زَادَ بَنُ الْجُزْيِيِّ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ إِلَّا إِرْعَامُ الشَّيْطَانِ وَسُرُورَ أَهْلِ الْإِيمَانِ. قَالَ يَعْنِي الْجُزْيِيُّ: وَإِذَا كَانَ

৩৭৭. আল-ক্বিবলা পত্রিকা, মক্কা; এবং তরীকুত ম্যাগাজিন, লাহোর। বি: দ্র: এসব বিবরণ 'ইমরোয ম্যাগাজিন' (২১/১০/১৯৮৮)-এর একটি সংখ্যা থেকে সংকলন করা হয়েছে। লেখক (শায়খ তাহিরুল কাদেরী) এই বিবরণটি পুনর্মুদ্রণের সদয় অনুমতির জন্যে সাদ্দ বদর সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞ।

أَهْلُ الصَّلِيبِ اتَّخَذُوا لَيْلَةَ مَوْلِدِ نَبِيِّهِمْ عَيْدًا أَكْبَرُ فَأَهْلُ الْإِسْلَامِ أُولَى بِالتَّكْرِيمِ وَأَجْدَرُ.

-মদীনাবাসী, আল্লাহ তাঁদের বৃদ্ধি করুন, তাঁরা মহা উৎসাহ-উদ্দীপনায় মীলাদ মাহফিলের উদযাপন করে থাকেন। বাদশাহ মোযাফফর শাহ, আল্লাহ পাকের করুণা তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক, তিনি এর উদযাপন ও প্রস্তুতিতে প্রচুর সাধনা করতেন। ইসলামী জ্ঞান বিশারদ আবু শামা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) যিনি ইমাম নববী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র শিক্ষকদের মধ্যে অবত্র সাধুতার জন্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি তাঁর কৃত 'আল-বায়েস্ 'আলাল-বিদআ ওয়াল-হাওয়াদিস' পুস্তকে এই জন্যে মোযাফফর শাহের প্রশংসা করেন এবং বলেন, “এধরনের কর্ম পুণ্যদায়ক ও প্রশংসিত; আর যিনি তা পালন করেন তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা উচিত।” ইবনে জায়ারী যোগ করেন, ‘এমনকি যদি তা শয়তানকে নারাজ করে এবং ঈমানদারবৃন্দের মনে খুশি-আনন্দ বয়েও আনে (তবু ওই প্রশংসা করা উচিত)।’ জায়ারী আরো বলেন, সলীব তথা ক্রুশের অনুসারীবর্গ (মানে খৃষ্টান সম্প্রদায়) যদি তাঁদের নবী-রাসূল আলাইহিমুস্ সালামদের মীলাদের রাতকে বড় ধরনের এক উদযাপন হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মীলাদ উপলক্ষে মহানন্দ ও খুশি প্রকাশের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনের আরো বেশি অধিকার মুসলমানদের রয়েছে।^{৩৭৮}

মোল্লা আলী কারী (বেসাল: ১০১৪ হিজরী/ ১৬০৬ খৃষ্টাব্দ) ইমাম বুরহান উদ্দীন বিন জামা'আ শাফেঈ (৭২৫-৭৯০ হিজরী/ ১৩২৫-১৩৮৮ খৃষ্টাব্দ)'র আচরিত রীতি সম্পর্কে বিবৃত করেন:

فَقَدْ اتَّصَلَ بِنَا أَنَّ الزَّاهِدَ الْقُدْوَةَ الْمُعَمَّرَ أَبَا إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ جَمَاعَةً لَمَّا كَانَ بِالْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى سَاكِنِهَا أَفْضَلَ الصَّلَاةِ

৩৭৮. মোল্লা আল কারী প্রণীত 'আল-মওরিদ আল-রাউয়ী ফী মওলিদিল-নাবাউয়ী ওয়া নাসাবিহিল-তা'হির', ১৫-১৬ পৃষ্ঠা।

وَأَكْمَلُ التَّحِيَّةِ كَانَ يَعْمَلُ طَعَامًا فِي الْمَوْلِدِ النَّبِيِّ، وَيُطْعَمُ النَّاسُ، وَيَقُولُ: لَوْ تَمَكَّنْتُ عَمَلْتُ بِطُولِ الشَّهْرِ كُلِّ يَوْمٍ مَوْلِدًا.

—আমাদের কাছে (রিওয়াযাতে) এসেছে এই মর্মে যে, ধার্মিক ও সাধকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হযরত আবু এসহাক ইবরাহীম বিন আবদুর রহীম বিন ইবরাহীম বিন জামা’আ যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নগরী মদীনা মোনাওয়ারায় হাজির হতেন, তখন তিনি খাবার প্রস্তুত করে ঘোষণা করতেন, “আমি যদি সক্ষম হতাম, তাহলে মাসের প্রতিদিনই মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করতাম।”^{৩৭৯}

৬.৫৫.৩ মিসর ও শাম (সিরিয়া) অঞ্চলে মীলাদুন্নবী মাহফিল উদযাপন

فَأَكْثَرُهُمْ بِذَلِكَ عِنَايَةُ أَهْلِ مِصْرٍ وَالشَّامِ، وَلِسُلْطَانِ مِصْرٍ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنَ الْعَامِ أَعْظَمُ مَقَامٍ، قَالَ: وَلَقَدْ حَضَرْتُ فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وَسَبْعٍ مِائَةٍ لَيْلَةَ الْمَوْلِدِ عِنْدَ الْمَلِكِ الظَّاهِرِ بَرْقُوقٍ بِقَلْعِهِ الْجَبَلِ الْعَلِيَّةِ. فَرَأَيْتُ مَا هَالِكِي وَسَرْنِي وَمَا سَاءَنِي، وَخَرَرْتُ مَا أَنْفَقَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ عَلَى الْقُرَاءِ وَالْحَاضِرِينَ مِنَ الْوَعَاظِ وَالْمُنْشِدِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْإِتْبَاعِ وَالْعِلَمَانِ وَالْخِدَامِ الْمُتَرَدِّدِينَ بِنَحْوِ عَشْرَةِ آلَافٍ مِثْقَالَ مِنَ الذَّهَبِ مَا بَيْنَ خِلْعٍ وَمَطْعُومٍ وَمَشْرُوبٍ وَمَسْمُومٍ وَشُمُوعٍ وَغَيْرِهَا مَا يَسْتَقِيمُ بِهِ الصَّلُوعُ. وَعَدَدْتُ فِي ذَلِكَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنَ الْقُرَاءِ الصَّيِّتِينَ الْمَرْجُو كَوْنَهُمْ مُثَبَّتِينَ، وَلَا نَزَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إِلَّا بِنَحْوِ عِشْرِينَ خِلْعَةً مِنَ السُّلْطَانِ وَمِنْ الْأُمَرَاءِ الْأَعْيَانِ.

قَالَ السَّخَاوِيُّ: قُلْتُ: وَلَمْ يَزُلْ مُلُوكُ مِصْرٍ خِدَامَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ مِمَّنْ وَقَّعَهُمُ اللَّهُ لَهُدْمَ كَثِيرٍ مِّنَ الْمُتَاكِيرِ وَالشَّيْنِ، وَنَظَرُوا فِي أَمْرِ الرَّعِيَّةِ كَالْوَالِدِ لَوْلَدِهِ، وَشَهَرُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْعَدْلِ، فَأَسْعَفَهُمُ اللَّهُ بِجُنْدِهِ وَمَدَدِهِ.

—মিসর ও শাম (সিরিয়া) অঞ্চলের বাসিন্দাবৃন্দ মীলাদুন্নবী মাহফিল উদযাপনে সবচেয়ে তৎপর। মিসরীয় সুলতান (মীলাদের) ওই রাতে অন্যতম বৃহৎ মহোৎসবের আয়োজন করেন। আমি ৭৮৫ হিজরী সালে একবার মালেক মোযাফফর বারকুক শাহ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)’র সান্নিধ্যে আল-জাবালিল আলীয়া দুর্গে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম। ওই উৎসবে আমি যা দেখেছিলাম তা আমাকে সর্বাধিক আনন্দিত করেছিলো এবং (তাতে) কোনো কিছুকেই আমি অপছন্দ করিনি। মোযাফফর শাহ ওই রাতে আবৃত্তিকার ও উপস্থিত বক্তা, গায়ক, শিশু ও সেবকদের প্রতি দানস্বরূপ যে অর্থ ব্যয় করেন, সেটা আমার হিসেব মতে দশ হাজার মিসকাল (৪৫০ কেজি) সোনা হবে, যা রাজকীয় জামাকাপড়, খাদ্য, পানীয়, সুগন্ধি, মোমবাতি এবং অন্যান্য ধরনের খাবার বাবদ খরচ হয়েছিলো। ওই রাতে আমি ২৫ জন না’ত গায়ককে গণনা করতে পেরেছিলাম; আর এটা আশা করা যায় যে তারা ওইভাবেই থাকবে। সুলতান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে ২০টির মতো জামা পায়নি এমন কোনো ক্বসীদা-গায়ক তাদের মধ্যে ছিলো না।

মিসরের শাসকবৃন্দ ও দুটি পবিত্র স্থানের খাদেমবৃন্দ ছিলেন ওই সকল মানুষের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের প্রতি আল্লাহ তা’আলা নেয়ামত বর্ষণ করেছেন বহু মন্দ ও অমতো অপসারণের ক্ষেত্রে। তাঁরা জনগণের কল্যাণ এমনভাবে নিশ্চিত করেছেন, যেমনিভাবে পিতা তাঁর সন্তানের যত্ন নেন; আর তাঁরা তাঁদের মতোবিচারের জন্যে বিখ্যাত। আল্লাহ তা’আলা যেনো তাঁদের প্রতি তাঁর ঐশী সাহায্য মঞ্জুর করেন।^{৩৮০}

وَقَدْ عَمِلَ الْمُجِبُّونَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحًا بِمَوْلِدِهِ الْوَلَائِمِ، فَمَنْ ذَاكَ مَا عَمِلَهُ بِالْقَاهِرَةِ الْمُعَزِّيَةِ الْوَلَائِمِ الْكَبَارِ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْمَعْرُوفُ بِإِبْنِ فُقْلٍ قَدَّسَ اللَّهُ تَعَالَى سِرَّهُ، شَيْخُ شَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ التُّعْمَانِ، وَعَمِلَ ذَاكَ قَبْلَ جَمَالِ الدِّينِ الْعَجْمِيِّ الْهَمْدَانِيِّ، وَمِمَّنْ عَمِلَ ذَاكَ عَلَيَّ قَدَرٍ وَسَعِهِ يُوسُفُ الْحَجَّارِ بِمِصْرَ، وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْرُضُ يُوسُفُ الْمَذْكُورُ عَلَيَّ عَمَلٍ ذَاكَ.

—প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাঁরা মহব্বত করেন, তাঁরা তাঁর বেলাদত উপলক্ষে খুশি প্রকাশার্থে মীলাদ উদযাপনে খানাপিনার আয়োজন করেন। এঁদের একজন হলেন কায়রোর সম্মানিতজন, যাঁর নাম শায়খ আবুল হাসান এবং যিনি কুফুল নামে সমধিক পরিচিত (আল্লাহ তাঁর রহস্যকে পবিত্রতা দিন); তিনি এক মহাভোজের আয়োজন করে থাকেন। তিনি হলেন আমাদের শিক্ষক আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ বিন নুমানের শিক্ষক। তাঁর আগে মীলাদুন্নবী উৎসবের আয়োজন করতেন জামাল উদ্দীন আজামী হামাদানী। অন্যান্যরা, যাঁদের মধ্যে আছেন মিসরের ইউসুফ হাজ্জার, তাঁরাও সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করেন মীলাদের আয়োজন করতে; আর বাস্তবতা হলো তিনি (হাজ্জার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছিলেন, যিনি তাঁকে এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে উৎসাহিত করেন।^{৩৮১}

৬.৫৫.৪ কাওস এলাকায় মীলাদুন্নবী মাহফিল উদযাপন

ইমাম কামাল উদ্দীন আদফুভী (৬৮৫-৭৪৮ হিজরী/১২৮৬-১৩৪৭ খৃষ্টাব্দ) নিজ ‘আত-তালিউস্ সাঈদিল জামি লি-আসমায়ি নুজাবাউস্ সাঈদ’ গ্রন্থে লিখেন:

حَكِي لَنَا صَاحِبُنَا الْعَدْلُ نَاصِرُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعِمَادِ أَنَّ أَبَا الطَّيِّبِ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ السَّبْتِيَّ الْمَالِكِيَّ نَزِلُ قَوْصٍ، أَحَدُ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، كَانَ يَجُورُ

৩৮১. আস্-সালেহী, ‘সুবুল আল-হুদা’ ওয়াল-রাশা‘দ ফী সীরাতে খায়র আল-এবাদ’, ১:৩৬৩।

بِالْمَكْتُوبِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَلَدَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ: يَا فَقِيه! هَذَا يَوْمُ سُورُورٍ، أَصْرُفُ الصَّبِيَّانِ، فَيَصْرِفُنَا.

وَهَذَا مِنْهُ دَلِيلٌ عَلَى تَقْزِيرِهِ وَعَدَمِ انْكَارِهِ، وَهَذَا الرَّجُلُ كَانَ فِيهَا مَا كِثْرًا مُتَّفَعِينَ فِي غُلُومٍ مُتَوَرِّعًا، أَخَذَ عَنْهُ أَبُو حَيَّانٍ وَغَيْرُهُ، مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَتِسْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ.

—আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু নাসির উদ্দীন মাহমুদ বিন ইমাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, আবু তাইয়্যাব মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম সাবতী মালেকী, যিনি ফুস নগরীর অধিবাসী এবং পুণ্যবান আলেম-উলামার একজন, তিনি স্থানীয় মকতব (বিদ্যালয়) অতিক্রমের সময় বলতেন, ‘ওহে আলেম! আজ খুশির দিন; শিশুদের বেরোতে দাও।’ এমতাবস্থায় তাঁকে (না’সিরুদ্দীন ইমাদকে) বেরোতে দেয়া হতো।

এটা তাঁর কাছ থেকে একটা প্রামাণ্য দলিল এ মর্মে যে, তিনি মীলাদ উদযাপনকে গ্রহণ করতেন; আর এর প্রতি অস্বীকৃতির অনুপস্থিতিতে তিনি ছিলেন এক কর্তৃত্বশীল আলেম, যিনি মালেকী মাযহাবের ফকীহ এবং বিভিন্ন বিদ্যাশাস্ত্রেও দক্ষ বিদ্বান; এছাড়া তিনি ছিলেন নীতি-নৈতিকতায় এক বিবেকবান ব্যক্তি। আবু হাইয়ান ও অন্যান্য জ্ঞানী পণ্ডিত তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি ৬৯৫ হিজরী সালে বেসালপ্রাপ্ত হন।^{৩৮২}

৬.৫৫.৫ আন্দালুসিয়া (স্পেন) ও রোমে মীলাদুন্নবী মাহফিল উদযাপন

وَأَمَّا مُلُوكُ الْأَنْدَلُسِ وَالْعَرَبِ فَلَهُمْ فِيهِ لَيْلَةٌ تَسِيرُ بِهَا الرُّكْبَانُ يَجْتَمِعُ فِيهَا أَيْمَةُ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ، فَمَنْ يَلِيهِمْ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَعَلِمُوا بَيْنَ أَهْلِ الْكُفْرِ

৩৮২. আস্-সুয়ুতী, হুসন আল-মাকুসিদ ফী আমলিল-মওলিদ’, ৬৬-৬৭ পৃষ্ঠা; আস্-সুয়ুতী, ‘আল-হাউয়ী লিল-ফাতাওয়া’, ২০৬ পৃষ্ঠা; আল-নাবহানী, ‘হজ্জাতুল্লাহ ‘আলাল আলামীন ফী মো’জেযাতে সাইয়েদ আল-মুরসালীন’, ২৩৮ পৃষ্ঠা।

كَلِمَةِ الْإِيمَانِ، وَأَطْلُ أَهْلِ الرُّومِ لَا يَخْتَلِفُونَ عَنِ ذَلِكَ، إِقْتِفَاءً بِغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُلُوكِ فِيمَا هُنَالِكَ.

-আন্দালুসিয়া ও মাগরিব (পশ্চিম) অঞ্চলের শাসকবৃন্দ এ (মীলাদের) রাতকে উদযাপন করেন, যে অনুষ্ঠানে শীর্ষস্থানীয় আলেম-উলামা ও অন্যান্যরা প্রতিটি এলাকা হতে দলে দলে যোগ দান করেন; আর এতে এমনকি অমুসলিম জনগোষ্ঠীও যোগ দেন। আমি বিশ্বাস করি, রোমান জাতিও তা থেকে বঞ্চিত হতে চান না, কেননা তাঁরা তাঁদের অঞ্চলের অন্যান্য রাজা-বাদশাহদের অনুকরণ করতে চান।^{৩৮৩}

৬.৫৫.৬ ভারত উপমহাদেশে জশনে মীলাদুন্নবী উদযাপন

وَبِلَادِ الْهِنْدِ تَزِيدُ عَلَيَّ غَيْرَهَا بِكَثِيرٍ كَمَا أَعْلَمَنِيهِ بَعْضُ أُولِي التَّقْدِيرِ وَالتَّحْرِيرِ. وَأَمَّا الْعَجْمُ فَمَنْ حَيْثُ دَخَلَ هَذَا الشَّهْرَ الْمُعَظَّمَ وَالزَّمَانَ الْمَكْرَمُ لِأَهْلِهَا مَجَالِسَ فَحَامٍ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّعَامِ لِلْفُرَّاءِ الْكِرَامِ وَلِلْفُقَرَاءِ مِنَ الْخَاصِّ وَالْعَامِ، وَقَرَأَاتِ الْخُتَمَاتِ وَالتَّلَاوَاتِ الْمُتَوَالِيَاتِ وَالْإِنْشَادَاتِ الْمُتَعَالِيَاتِ، وَأَنْوَاعِ السُّرُورِ وَأَصْنَافِ الْخُبُورِ حَتَّى بَعْضُ الْعَجَائِزِ مِنْ غَزْلِهِنَّ وَنَسَجِهِنَّ يَجْمَعْنَ مَا يَقْمَنُ يَجْمَعُهُ الْأَكَابِرُ وَالْأَعْيَانُ وَيُضَيِّفَتُهُنَّ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ. وَمِنْ تَعْظِيمِ مَسَائِكُهُمْ وَعُلَمَائِهِمْ هَذَا الْمَوْلِدِ الْمُعَظَّمَ وَالْمَجْلِسِ الْمَكْرَمِ أَنَّهُ لَا يَأْبَاهُ أَحَدٌ فِي حُضُورِهِ، رَجَاءً إِذَا رَأَى نُورَهُ وَسُرُورَهُ.

وَقَدْ وَقَعَ لِشَيْخِ مَسَائِكِنَا مَوْلَانَا زَيْنُ الدِّينِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ الْقُشَيْبِيِّ قَدَسَ اللَّهُ سِرَّهُ الْعَلِيِّ أَنَّهُ أَرَادَ سُلْطَانُ الزَّمَانِ وَخَقَانِ الدُّورَانِ هَمَائُونُ بَادِشَاهُ

৩৮৩. মোল্লা আলী ক্বারী, 'আল-মওরিদুর রাউয়ী ফী মওলিদিল-নাবাউয়ী ওয়া নাসাবিহি আল-তা'হির', ১৪ পৃষ্ঠা।

تَعْمِدُهُ اللَّهُ وَأَحْسَنُ مَثْوَاهُ أَنْ يَجْتَمَعَ بِهِ وَيَحْصُلَ لَهُ الْمَدَدُ وَالْمَدَدُ بِسَبِّهِ فَأَبَاهُ الشَّيْخُ، وَامْتَنَعَ أَيْضًا أَنْ يَأْتِيَهُ السُّلْطَانُ اسْتِغْنَاءً بِفَضْلِ الرَّحْمَنِ فَأَلْجَ السُّلْطَانُ عَلَيَّ وَزِيرَهُ يَبْرُمُ خَانَ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَدْبِيرٍ لِلْاجْتِمَاعِ فِي الْمَكَانِ، وَلَوْ فِي قَلِيلٍ مِنَ الزَّمَانِ. فَسَمِعَ الْوَزِيرُ أَنَّ الشَّيْخَ لَا يَحْضِي فِي دَعْوَةٍ مِنْ هُنَاءٍ وَعِزَاءٍ إِلَّا فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْظِيمًا لِذَلِكَ الْمَقَامِ. فَأَنْهَى إِلَيَّ السُّلْطَانُ، فَأَمَرَهُ بِتَهْيِئَةِ أَسْبَابِهِ الْمُلُوكَانِيَّةِ فِي أَنْوَاعِ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرَبَةِ وَمِمَّا يَتَمَّمُ بِهِ وَيَبْخُرُ فِي الْمَجَالِسِ الْعَلَمِيَّةِ. وَنَادَى الْأَكَابِرُ وَالْأَهْلِي.

وَحَضَرَ الشَّيْخُ مَعَ بَعْضِ الْمَوَالِي فَأَخَذَ السُّلْطَانُ الْإِزْيُوقُ بِيَدِ الْأَدَبِ وَمُعَاوَنَةِ التَّوْفِيقِ، وَالْوَزِيرُ أَخَذَ الطَّشْتِ مِنْ تَحْتِ أَمْرِهِ رَجَاءً لُطْفِهِ وَنَظَرَهُ وَعَسَلًا يَدًا الشَّيْخِ الْمَكْرَمُ، وَحَصَلَ لَهُمَا بِرَكَّةٍ تَوَاضَعَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَقَامُ الْمُعَظَّمَ وَالْحِجَاهُ الْمُنْفَخُ.

-সত্যতা প্রতিপনকারী কিছু আলেম-উলামা আমাকে জানিয়েছেন যে, ভারত উপমহাদেশে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদযাপন অন্যান্য রাজ্যের উদযাপনকে ছাড়িয়ে যায়। আর অনারবদের বেলায় এই পুতঃপবিত্র ও সম্মানিত মাসের সূচনা হলে আজমী (অনারব) জনসাধারণের বিশাল সমাবেশের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের খানাপিনারও আয়োজন করা হয়, যা পুণ্যময় না'ত গায়ক বা আবৃত্তিকার এবং সমাজের সাধারণ মানুষ ও উঁচু স্তরের ব্যক্তিদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এই উৎসবের সময় তাঁরা অনেকবার কুরআন খতম করেন এবং নাশীদ তথা সেমা' পাঠও করে থাকেন। এগুলো খুশি ও পুণ্যময় উদযাপন; আর এমনকি বয়োবৃদ্ধ নারীরাও তাঁদের (সেলাই ও হাতের কাজের মাধ্যমে) অর্জিত অর্থ সাধ্যমতো মহান ব্যক্তিত্ব ও পথপ্রদর্শকদের উদ্দেশ্যে দেয়া ভোজে ব্যয় করেন। তাঁদের শায়খমণ্ডলী ও উলামাবৃন্দ এই সম্মানিত মীলাদ অনুষ্ঠান পালন ও পবিত্র মাহফিলের প্রতি এমনই আগ্রহাশ্বিত

থাকেন যে, কেউই এর (আধ্যাত্মিক) জ্যোতি ও সুখ লাভের আশায় এতে যোগ দিতে ব্যর্থ হন না।

আমাদের মাশায়েখবৃন্দের শায়খ, হযরত যাইনুদ্দীন মাহমূদ হামাদানী নকুশাবন্দী, আল্লাহ তাঁকে আশীর্বাদদায়ক করুন, উল্লেখ করেন যে, একবার তাঁর সময়কার শাসক খাকান আদ-দাওরান হুমায়ুন বাদশাহ, আল্লাহ তাঁকে বেহেশ্ত নসীব করুন, রুহানী মদদ তথা আধ্যাত্মিক সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁকে (শায়খকে) নিজ রাজদরবারে দাওয়াত করেন। কিন্তু শায়খ পরম করুণাময়ের সান্নিধ্যকে নিজের জন্যে যথেষ্ট জেনে রাজার ওই আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেন এবং তাঁকেও তাঁর (শায়খের) দর্শনপ্রার্থী হতে নিষেধ করেন। বাদশাহ নিজের মন্ত্রী বৈরাম খাঁনকে এমন এক কূটচাল আঁটার জন্যে অনুরোধ করেন, যাতে একই জায়গায় দু'জনের সমবেত হবার সুযোগ হয়, যদিও তা হয়ে থাকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে। মন্ত্রী জানতে পারেন শায়খ কোনো খুশিসূচক বা দুঃখজনিত সমাবেশে যোগ দেন না, কেবল ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহফিল ছাড়া। আর তা স্রেফ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চমর্যাদার প্রতি শায়খের শ্রদ্ধা প্রকাশার্থেই হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে খবর যখন রাজার কাছে পৌঁছে, তখন তিনি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সমাবেশের জন্যে বিভিন্ন খাদ্য ও পানীয় এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি আয়োজনেরও আদেশ দেন। অতঃপর তিনি গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ ও তাঁদের পরিবারসদস্যদের দাওয়াত দেন। শায়খ নিজের কয়েকজন মুরীদানসহ মাহফিলে যোগ দিতে আসেন। এমতাবস্থায় শায়খের দয়াপূর্ণ নজর (নেক দৃষ্টি) পাওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে সুলতান বিনম্রভাবে পানি ঢালার কলসখানি নিজের হাতে নেন এবং তাঁর মন্ত্রী ধরেন পানির পাত্র; আর তাঁরা শায়খের পবিত্র হাতযুগল নিজেরাই ধুয়ে দেন। তাঁদের এই বিনয়ীভাবের আশীর্বাদে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াস্তে বাদশাহ ও তাঁর মন্ত্রী উচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদাপূর্ণ স্তরে উন্নীত হন।^{৩৮৪}

উপরের এসব বিস্তারিত বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, মক্কা মোকাররমা, মদীনা মোনাওয়ারা, মিসর, শাম (সিরিয়া/জর্দান/লেবানন

ইত্যাদি), কর্ডোবা, গ্রানাডা এমনকি ভারত ও অন্যান্য অনারব রাজ্যের মুসলমানরাও বাৎসরিকভাবে ১২ই রবিউল আউয়াল মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। এটা একটা ঐতিহাসিক বাস্তবতা, যার সত্যতা আজো বহাল আছে।

এখানে স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, এঁদের কেউই ‘বেরলভীপন্থী’ (অর্থাৎ, ইমাম আহমদ রেযা খানের অনুসারী) ছিলেন না। কেননা মক্কা মোয়াযযমা, মদীনা মোনাওয়ারা, মিসর ও শাম রাজ্যগুলোতে তখন ‘বেরলভী’ মাসলাকের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। কেমন নিষ্ঠুর আচরণ ওই সকল ব্যক্তির তরফ হতে আজ দৃশ্যমান, যারা আমাদের ইসলামী ঐতিহ্য সম্পর্কে বেখবর এবং যাদের হাতে অন্য কোনো কিছুই করার নেই স্রেফ মানুষের মনে ফিতনা ও সংশয় সৃষ্টি করা ছাড়া, বর্তমানে তারাই সর্বসম্মতভাবে গৃহীত ইসলামী শিক্ষার প্রতি সন্দেহের বীজ বপনে আদাজল খেয়ে নেমেছে। ইসলামী ইতিহাসের জ্ঞানে তাদের কোনো ভিত্তি না থাকার দরুন তারা মিথ্যের বেসাতিতে লিপ্ত, সত্য গোপনরত এবং মানুষের কাছে আজকের এই বিকৃত তথ্য পরিবেশনে ব্যাপ্ত। এসব ভুয়া পণ্ডিত অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই প্রচার করছে না; বস্তুতঃ তারা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ে লিখিত অতীতের ওই সমস্ত বই অধ্যয়নের জন্যে কখনোই কোনো সময় ব্যয় করেনি।

৬.৫৬ মীলাদুন্নবী বিষয়ক তাৎপর্যপূর্ণ লেখনীসমগ্র

পূর্ববর্তী পুণ্যাত্মাবৃন্দের যুগ হতে অদ্যাবধি ইমাম ও হাদীসশাস্ত্রবিদ আলেম-উলামা নিজেদের স্বভাব ও মন-মানসিকতা অনুসারে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ে অবিরতভাবে নানা বই সংকলন করেছেন। তাঁরা গদ্য ও পদ্য মিলিয়ে সহস্র সহস্র বই সংকলন করেছেন, যার কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত, আবার কিছু কিছু বৃহদাকার।

ইমাম ও হাদীসশাস্ত্রবিদ আলেম-উলামা তাঁদের নিজেদের লেখা হাদীসের বইপত্র, সীরাত তথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীগ্রন্থ, নবুওয়্যাতের বৈশিষ্ট্যবিষয়ক পুস্তকাদি ও ইতিহাস সংক্রান্ত কিতাবগুলোতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ সম্পর্কিত বিষয়টিকে

অন্তর্ভুক্ত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম তিরমিযী (২১০-২৭৯ হিজরী) নিজ ‘আল-জামেউস্ সহীহ’ পুস্তকে ‘কিতাবুল মানাকিব’-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই বিষয়টিকে *مَا جَاءَ فِي مِيلَادِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* –‘মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যা বর্ণনায় এসেছে’ শিরোনামে লিপিবদ্ধ করেন। একইভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমন সম্পর্কে ইবনে ইসহাক (৮৫-১৫১ হিজরী) তাঁর ‘আস-সীরাতুন্ নবভীইয়া’ গ্রন্থে, ইবনে হিশাম (ইস্তেকাল: ২১৩ হিজরী) স্বীয় ‘আস-সীরাতুন্ নবভীইয়া’ কিতাবে, ইবনে সায়াদ (১৬৮-২৩০ হিজরী) নিজ ‘আত-তাবাকাতু কুবরা’ বইয়ে, আবু নুয়াইম (৩৩৬-৪৩০ হিজরী) তাঁর ‘দালাইলুন নুবুওয়া’ গ্রন্থে, আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮ হিজরী) আপন ‘দালাইলুন নুবুওয়া ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরীআ’ কিতাবে, আবু সা’আদ খারকূশী নীশাপুরী (ইস্তেকাল: ৪০৬ হিজরী) নিজ ‘কিতাবু শরফিল মুস্তাফা’ পুস্তকে, ইবনে আল-আসীর (৫৫৫-৬৩০ হিজরী) তাঁর ‘আল-কামিল ফীত-তারীখ’ গ্রন্থে, আত-তাবারী (২২৪-৩১০ হিজরী) আপন ‘তারীখুল উমামি ওয়াল মুলুক’ বইয়ে, ইবনে কাসীর (৭০১-৭৪৪ হিজরী) নিজ ‘আল-বেদায়া ওয়ান-নিহায়া’ কিতাবে, ইবনে আসাকির (৪৯৯-৫৭১ হিজরী) তাঁর ‘তারীখু দামেস্কিল কাবীর’ পুস্তকে এবং সকল প্রসিদ্ধ ও বরণ্য ইমাম, উলামা কিছু না কিছু লিখেছেন। অধিকন্তু, ইমাম মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী শামী (ওফাত: ৯৪৪ হিজরী) এই বিষয়ের সমর্থনে বিভিন্ন প্রামাণ্য দলিল পেশ করে ‘সুবুলুল হদা ওয়ার-রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ’ গ্রন্থে বিস্তারিত লিখেন। ইমাম আবু আবদুল্লাহ বিন আলহাজ্জ মালেকী (ওফাত: ৭৩৭ হিজরী)ও এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন ‘আল-মাদখাল ইলা তানমিয়াতিল আ’মল বি-তাহসীনিন্ নিয়্যাৎ ওয়াত-তানবীহ আলা কাসীর মিনাল বিদ’য়িল মোহদাসাতি ওয়াল আওয়াইদিল মুনতাহালা’ পুস্তকে। ইমাম আয-যুরকানী (১০৫৫-১১২২ হিজরী) নিজ ‘আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া বিল-মিনাহিল মুহাম্মদীয়া’ গ্রন্থে, শায়খ আবদুল হক্ক মুহাদ্দিস দেহলভী (৯৫৮-১০৫২ হিজরী) ‘মা সাবাতা মিনাস সুন্নাহ ফী আইয়্যামিস্ সানা’ পুস্তকে এবং ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাইল আল-নাবহানী (১২৬৫-১৩৫০ হিজরী) আপন ‘হজ্জাতুল্লাহ আলাল-আলামীন ফী মু’জিয়াতি

সাইয়েদিল মুরসালীন’ বইয়ের পাশাপাশি ‘জওয়াহিরু বিহার ফী ফাদায়েলিন নবীয়্যিল মুখতার’ কিতাব দুটোতেও মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

‘মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ বিষয়ে লিখিত কিছু বিখ্যাত কিতাবের নাম নিচে দেয়া হলো:

১. আবুল আব্বাস আহমদ ইকলীশী (ইস্তেকাল: ৫৫০ হিজরী)

আবুল আব্বাস আহমদ বিন মা’আদ বিন ঈসা’ ইকলীশী আন্দালুসী (ওফাত: ৫৫০ হিজরী) মীলাদ সম্পর্কে একটি বই রচনা করেন যার শিরোনাম *الذُّرُّ الْمُنْظَمُ فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ الْأَعْظَمِ* ‘আদ-দুররুল মুনায্যাম ফী মাওলিদিন নবীয়্যিল আ’যম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’। এতে দশটি অধ্যায় রয়েছে।^{৩৮৫}

২. আল্লামা ইবনে জাওযী (ইস্তেকাল: ৫১০-৫৯৭ হিজরী)

আবদুর রহমান বিন আলী বিন মাহমুদ বিন আলী বিন আবদিল্লাহ বিন হামাদী কুরাশী হাম্বলীকে জামাল উদ্দীন (গুণবাচক) নামে সবাই চেনেন। তিনি ৫১০ হিজরী সালে বাগদাদ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ৫৯৭ হিজরীতে ইস্তেকাল করেন।

তিনি অল্প বয়সেই শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং ধর্মপ্রচার ও মিশনারী কাজের দায়িত্ব নেন। হাদীসশাস্ত্রে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং হাফেয ও মুহাদ্দিস হিসেবে খ্যাত হন। কমপক্ষে ১৫৯টি কিতাবের রচয়িতা ছিলেন তিনি, যা প্রধানতঃ হাদীস, ইতিহাস ও ধর্মোপদেশ সংক্রান্ত। মীলাদ সম্পর্কে তিনি দুটি পুস্তক প্রণয়ন করেন:

১. *بَيَانُ الْمِيلَادِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* (বয়ানুলুল মীলাদ আন-নাবাভী);

২. *مَوْلِدُ الْعُرْوَسِ* (মাওলিদুল ‘উরুস)।

৩. ইবনে দিহিয়া কালবী (৫৪৪-৬৩৩ হিজরী)

আবুল খাত্তাব উমর বিন হাসান বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন দিহিয়া কালবী জনগ্ৰহণ করেন অন্দালুসিয়া (স্পেন) রাজ্যে। জ্ঞানপিপাসা তাঁকে সুদূর শাম (সিরিয়া, জর্দান, লেবানন ইত্যাদি এলাকা), ইরাক ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলো। অবশেষে তিনি মিসরে বসতি স্থাপন করেন। তিনি একজন বিখ্যাত হাদীসশাস্ত্র বিশারদ, কর্তৃত্বসম্পন্ন ইতিহাসবিদ ও শ্রদ্ধেয় লেখক। তিনি বেশ কিছু বই লিখেছেন, যা তাঁর রেখে যাওয়া জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করে। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মীলাদ-বিষয়ক গবেষণামূলক পুস্তক *التَّنْوِيرُ فِي مَوْلِدِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ* – ‘আত-তানভীর ফী মাওলিদিল বাশীরিন্ নাযীর’।

৪. হাফেয শামসুদ্দীন জাযারী (বেসাল: ৬৬০ হিজরী)

আবুল খায়র শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ জাযারী শাফেঈ (বেসাল: ১২৬২ হিজরী) ছিলেন তাঁর সময়কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্বারী ও মুহাদ্দিস। তিনি মীলাদ-বিষয়ক একটি বই লিখেন যার শিরোনাম ছিলো, *عُرْفُ* – ‘উরফুত্ তা’রীফ বিল-মাওলিদিল শরীফ’।

৫. শায়খ আবু বকর জাযাইরী (ইন্তেকাল: ৭০৭ হিজরী)

শায়খ আবু বকর মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ আভার জাযাইরী মীলাদ-বিষয়ক একটি বই লিখেন যার শিরোনাম *الْمَوْرِدُ الْعُذْبُ الْمَعِينُ فِي مَوْلِدِ سَيِّدِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ* – ‘আল-মাওরিদুল উযবিল মাঈঈন ফী মাওলিদে সাইয়েদিল খালকি আজমাঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

৬. ইমাম কামালুদ্দীন আল-আদফুভী (৬৮৫-৭৪৮ হিজরী)

ইমাম কামালুদ্দীন আবুল ফাদল জাফর বিন তালাব বিন জাফর আদফুভী তাঁর দেশ মরক্কোতে মীলাদ উৎসব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনাসম্বলিত একখানা বই রচনা করেন, যার শিরোনাম *الطَّالِعُ السَّعِيدُ الْجَامِعُ لِأَسْمَاءِ نُجَبَاءِ الصَّعِيدِ* – ‘আত-তা’লিউস্ সাঈঈদ আল-জামি’ লি-আসমায়ি নুজাবায়িস্ সাঈঈদ’।

৭. সাঈদুদ্দীন আল-কাযারুনী (ইন্তেকাল: ৭৫৮ হিজরী)

মুহাম্মদ বিন মাসউদ বিন মুহাম্মদ সাঈদুদ্দীন কা’যারুনী একটি বই লিখেন যার শিরোনাম *مَنَاسِكُ الْحُجْرِ الْمُتَقَيِّ مِنْ سَيَرِ مَوْلِدِ الْمُصْطَفَى* – ‘মানাসিকুল হিজযিল মুনতাক্বা’ মিন সিয়ারে মাওলিদিল মুস্তফা’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৮. আবু সাঈদ খলীল বিন কীকলাদী (৬৯৪-৭৬১ হিজরী)

আবু সাঈদ খলীল বিন কীকলাদী বিন আবদুল্লাহ আ’লাঈ দামেস্কী শাফেঈ কর্তৃক লিখিত পুস্তকের নাম *الذُّرُّ السَّيِّئَةُ فِي مَوْلِدِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ* – ‘আদ-দুরুস্ সুন্নিয়া ফী মাওলিদি খায়রিল বারিয়্যা’।

৯. ইমাম ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (৭০১-৭৭৪ হিজরী)

‘তাফসীরু কুরআনি আযীম’ গ্রন্থের লেখক ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা’ ইসমাঈল বিন কাসীর মীলাদ-সম্পর্কিত একটি কিতাবও রচনা করেন, যার শিরোনাম *ذِكْرُ مَوْلِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِضَاعِهِ* – ‘যিকরু মাওলিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া রাদা’ইহি’।

১০. সুলাইমান বারসাভী হানাফী

সুলাইমান বিন এওয়াদ বাশা বিন মাহমূদ বারসাভী হানাফী ইন্তেকাল করেন আনুমানিক ৭৮০ হিজরী সালের দিকে। সুলতান বায়জীদ উসমানী (তুর্কী)’র যুগে তিনি ছিলেন একজন গণ্যমান্য ইমাম। তুর্কী ভাষায় তিনি একটি মীলাদ-বিষয়ক স্মৃতিগাথা পুস্তক রচনা করেন, যার শিরোনাম *وَسِيلَةُ* – ‘ওসীলাতুন নাজাহ’।

১১. ইমাম আবদুর রহীম বারঈ (ইন্তেকাল: ৮০৩ হিজরী)

আবদুর রহীম বারী ইয়ামেনী (ইন্তেকাল: ১৪০০ খৃষ্টাব্দ) মীলাদ-বিষয়ক একটি বিখ্যাত বই প্রণয়ন করেন যার শিরোনাম *مَوْلِدُ الْبَرِّعِيِّ* – ‘মাওলিদুল বারী’ঈ’।

১২. হাফেয যাইনুদ্দীন ইরাকী (৭২৫-৮০৮ হিজরী)

হাফেয আবুল ফাদল যাইনুদ্দীন আবদুর রাহীম বিন হুসাইন বিন 'আবদুর রহমান মিসরী ইরাকী ছিলেন তাঁর যুগের এক অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একাধারে ওই সময়কার নেতৃস্থানীয় ইমাম; ইসলামের রক্ষাকারী; শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী; বুদ্ধিজীবী ও মহা গবেষক। তিনি হাদীসশাস্ত্র ও রাবীদের বর্ণনার এসনাদ এবং বর্ণনাগুলোর নির্ভরযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। হাদীসশাস্ত্রের একেবারে প্রাথমিক জ্ঞান লাভকারী শিক্ষার্থীও এই বিদ্যায় ইমাম সাহেবের পারদর্শিতা সম্পর্কে ওয়াক্কেফহাল। এই মহান ইমাম মীলাদ সম্পর্কে একটি গবেষণাপত্র লিখেন যার শিরোনাম, *الْمَوْرِدُ الْهَيْئِي فِي الْمَوْلِدِ السُّنِّي*, *মাওরিদুল হা'নী ফী মাওলিদিস সুন্নী*।

১৩. সুলাইমান বারসুনী

হাজী খলীফা নিজ *كَشَفُ الظُّنُونِ عَنْ أَسَائِي الْكُتُبِ وَالْفُنُونِ* 'কাশফুয যুনুন আন উসামীল কুতুব ওয়াল-ফুনুন' (২:১৯১০) শীর্ষক বইয়ে লিখেছেন যে, সুলাইমান বারসুনী ৮০৮ হিজরী সালে ইন্তেকাল করেন। তিনি মীলাদ বিষয়ে তুর্কী ভাষায় একটি সুবিন্যস্ত বই লিখেছিলেন, যেটা রোমে অনুষ্ঠিত মীলাদ মাহফিলগুলোতে পাঠ করা হতো।

১৪. ইমাম মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব ফায়রুযাবাদী (৭২৯-৮১৭ হিজরী)

আবু তাহের মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম ফায়রুযাবাদী ছিলেন একজন মহান ইমাম। তিনি অনেক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে, *تَنْوِيرُ الْمُقْبَاسِ مِنْ تَفْسِيرِ ابْنِ عَبَّاسٍ*, *وَالصَّلَاتُ*, *وَالْبَشَرُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى خَيْرِ الْبَشَرِ* 'তানজীরুল মিকবাস মিন তাফসীরি ইবনে আব্বাস', 'ওয়াস-সালাতু ওয়াল বাশরু ফীস-সালাতি আলা খায়রিল বাশার' এবং ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত পুস্তক *الْقَامُوسُ الْمَحِيْطُ* 'আল-কামুসুল মুহীত'। মীলাদ সম্পর্কে তিনি লিখেন *الْفَحْةُ الْعَنْبَرِيَّةُ فِي*

مَوْلِدِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ 'আন্-নাফহাতুল 'আনবারিয়া ফী মাওলিদি খায়রিল বারিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'।

১৫. ইমাম শামসুদ্দীন বিন নাসিরুদ্দীন দামেস্কী (৭৭৭-৮৪২ হিজরী)

শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবী বকর বিন আব্দুল্লাহ কীসী শাফেঈ, যিনি ইবনে নাসিরুদ্দীন দামেস্কী নামে সমধিক পরিচিত, তিনি সে সকল মহান ইমামেরই একজন যারা মীলাদ-বিষয়ে বই লিখেছেন। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণির ইতিহাসবিদ, অসংখ্য গ্রন্থপ্রণেতা, বেশ কিছু মূল্যবান কিতাবের শরাহ-লেখক এবং ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যে অবদান রেখেছেন এমনই এক ব্যক্তিত্ব। তাঁকে দামেস্কে 'দারুল হাদীসের' শায়খুল হাদীস হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো। মীলাদ সম্পর্কে তিনি অনেক দলিলপত্র সংকলন করেন। হাজী খলীফা তাঁর *كَشَفُ الظُّنُونِ عَنْ أَسَائِي الْكُتُبِ* 'কাশফুয যুনুন 'আন উসামীল কুতুব ওয়াল-ফুনুন' (২:১৯১০) পুস্তকে সেগুলোর মধ্যে তিনটির নাম উল্লেখ করেছেন:

১. *جَامِعُ الْأَنْبَارِ فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ* জামে'উল আসার ফী মাওলিদিন নবী আল-মুখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম;

২. *الْلَفْظُ الرَّائِقُ فِي مَوْلِدِ خَيْرِ الْخَلَائِقِ* আল-লাফযুর রা'ঈকু ফী মাওলিদি খায়রিল খালায়েকু এবং

৩. *مَوْرِدُ الصَّادِقِ فِي مَوْلِدِ الْهَادِي* মাওরিদুস সাদী ফী মাওলিদি হাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

১৬. শায়খ আফীফুদ্দীন আত-তাবরীযী (ইন্তেকাল: ৮৫৫ হিজরী)

আফীফুদ্দীন মুহাম্মদ বিন সাইয়েদ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হুসাইনী তাবরীযী শাফেঈ ৮৫৫ হিজরী সালে মদীনা মোনাওয়ারায় ইন্তেকাল করেন। ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৭ হিজরী) কৃত 'হাদীসে আরবাজন' ও ইমাম তিরমিযী (২১০-২৭৯ হিজরী) প্রণীত *الشَّامِلُ الْمُحَمَّدِيَّةُ* 'আল-শামা'ঈলুল মুহাম্মদিয়া'

গ্রন্থগুলোর উপর তিনি ব্যাখ্যামূলক পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি ‘মাওলিদিন্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ শিরোনামেও একটি বই লিখেন।

১৭. শায়খ মুহাম্মদ বিন ফখরুদ্দীন (ইন্তেকাল: ৮৬৭ হিজরী)

শামসুদ্দীন আবু কাসেম মুহাম্মদ বিন ফখরুদ্দীন ‘উসমান লু’লুই দামেস্কী হাম্বলী ছিলেন সুবিখ্যাত আল-লু’লু’ বিন আল-ফখর (الْلؤلؤ ابن الفجر) নামে। তিনি ‘আদ-দুররুল মুনায্যাম ফী মাওলিদিন্ নাবীয়্যিল মুআযযম’ বইটি রচনা করেন। পরবর্তীকালে তিনি রচনা করেন ‘আল-লফযুল জামীল বি-মাওলিদিন্ নাবীয়্যিল জালীল’ গ্রন্থটি, যা তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থটির একটি সার-সংক্ষেপ।

১৮. সায়েদ আসীলুদ্দীন হারাভী (ইন্তেকাল: ৮৮৩ হিজরী)

সাইয়েদ আসীলুদ্দীন আব্দুল্লাহ বিন ‘আবদুর রহমান হারাভী লিখেছেন ‘দারজুদ-দুরার ফী মিলাদি সাইয়েদিল বাশার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ শীর্ষক কিতাব।

১৯. ইমাম আব্দুল্লাহ হুসাইনী শীরাযী (ইন্তেকাল: ৮৮৪ হিজরী)

আসীলুদ্দীন ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আবদুর রহমান হুসাইনী শীরাযী লিখেছেন ‘দারজুদ-দুরার ফী মিলাদি সাইয়েদিল বাশার’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীর্ষক বইটি, যেমনটি উল্লেখিত হয়েছে হাজী খলীফার الظُّنُون ‘কাশফু-য়ুনূন’ গ্রন্থে (১:৭৪৫)।

২০. শায়খ আলাউদ্দীন আল-মারদাভী (ইন্তেকাল: ৮৮৫ হিজরী)

আবুল হাসান আলাউদ্দীন আলী বিন সুলাইমান বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ মারদাভী ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের মহান ফকীহ, যাঁর নিবাস দামেস্ক নগরীতে। মীলাদ সম্পর্কে তিনি লিখেন الْمَنهَلُ الْعَذْبُ الْقَرِيرُ فِي مَوْلِدِ

الْهَادِي الْبَشِيرِ الْمَذْذِيرِ ‘আল-মানহালুল উযবিল-কারীর ফী মাওলিদিন্ হাদীয়িল বাশীরিন্ নাবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’

২১. বুরহানুদ্দীন আবুস সফা (ইন্তেকাল: ৮৮৭ হিজরী)

বুরহানুদ্দীন আবুস-সফা বিন আবী ওয়াফা সংকলন করেন فَتَحُ اللَّهِ ‘ফাতহুল্লাহ হাসবী ওয়া কাফা’ ফী মাওলিদিন্ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীর্ষক পুস্তকটি।

২২. শায়খ উমর বিন আবদুর রহমান বা‘আলাভী (ইন্তেকাল: ৮৮৯ হিজরী)

উমর বিন আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বা‘আলাভী হাদরামী লিখেছেন كِتَابُ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ ‘কিতাবু মাওলিদিন্-নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ শিরোনামের একখানি বই।

২৩. ইমাম শামসুদ্দীন আস-সাখাভী (৮৩১-৯০২ হিজরী)

শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ কাহারী সাখাভী বিখ্যাত ইসলামী উলামাদের মাঝে স্বীকৃত একজন আলেম। এক সময় বলা হতো যে হাদীসশাস্ত্রে আয-যাহাবীর পরে আস-সাখাভীর মতো হাদীস-শাস্ত্রবিশারদ আর পাওয়া যায় না এবং হাদীস-বিদ্যায় পারদর্শিতা তাঁর ইন্তেকালের সাথে সাথে বিদায় নিয়েছে। শওকানী মন্তব্য করেন যে, সাখাভী যদি الْأَصْوَةُ اللَّامِعُ ‘আদ-দ্বুওউল লামা‘আ’ ছাড়া অন্য কোনো কিতাব রচনা নাও করতেন, তথাপিও এই বইটি একাই হাদীসশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য বহন করতো।

মীলাদ বিষয়ে সাখাভী প্রণয়ন করেন الْأَفْخَرُ الْعُلَوِّيُّ فِي الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ ﷺ ‘আল-ফখরুল আলুভী ফীল-মাওলিদিন্ নাবাভী’। তিনি তাঁর الْأَصْوَةُ اللَّامِعُ ‘আদ-দ্বুওউল লামা‘আ’ পুস্তকে এই বইটির উদ্ধৃতি দেন (১৮:৮)। এছাড়া

তিনি ‘আদ-দ্বুওউল লামা’আ’ বইটিতে সেসব আলেম-উলামার নাম তালিকাভুক্ত করেছেন, যাঁরা মীলাদ-বিষয়ক বই বা প্রবন্ধ লিখেছেন।^{৩৮৬}

২৪. ইমাম নূরুদ্দীন সামহুদী (৮৪৪-৯১১ হিজরী)

﴿مَوْلِدُ الْبَرِيَّةِ﴾ ‘আল-মাওরুদুল হানিয়া ফী মাওলিদি খায়রিল বারিয়া’ শীর্ষক আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বই লিখেন ইমাম নূরুদ্দীন আবুল হাসান আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আহমদ হুসাইনী শাফেঈ সামহুদী। লেখক মদীনা মোনাওয়ার ইতিহাস সম্পর্কে লিখেছেন এবং তাঁকে নির্ভরযোগ্য কর্তৃত্বশীল আলেম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২৫. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (৮৪৯-৯১১ হিজরী)

ইমাম জালালুদ্দীন আবদুর রহমান বিন আবী বকর সুয়ুতীর পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি সর্বজনস্বীকৃত ও সমাদৃত। তাঁর লিখিত বইপত্রের সংখ্যা সাত শতাধিক বলে লিপিবদ্ধ আছে। মীলাদুন্নবীর বৈধতার পক্ষে তাঁর লিখিত ﴿مَوْلِدُ الْحُسَيْنِ الْمَقْصُودُ فِي عَمَلِ الْمَوْلِدِ﴾ ‘হুসনুল মাকসুদ ফী আমলিল মাওলিদ’ শিরোনামের বইটি বিশ্বজুড়ে গৃহীত। এটা তাঁর ফতোয়াসমূহের সংকলন ﴿الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى﴾ ‘আল-হা’উয়ী লিল-ফাতওয়া’ গ্রন্থে বিদ্যমান।

২৬. আয়েশা বিনতে ইউসুফ বাউনিয়াহ (ইস্তেকাল: ৯২২ হিজরী)

আয়েশা বিনতে ইউসুফ বাউনিয়াহ দামেস্ককিয়া শাফিঈয়া একজন বিখ্যাত মহিলা সূফী বিদ্বান ও গবেষক, যাঁর অনেকগুলো বই রয়েছে। ﴿مَوْلِدُ الْمَوْلَى﴾ ‘মাওলুদুন্-নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ শীর্ষক একটি কাব্য এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর অবদানের সাক্ষ্য বহন করছে।

২৭. আবু বকর বিন মুহাম্মদ হালাবী (ইস্তেকাল: ৯৩০ হিজরী)

আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন আবী বকর হুবাইশী হালাবী লিখেছেন ﴿الْكَوَكِبُ الدَّرِّيَّةُ فِي مَوْلِدِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ﴾ ‘আল-কাওয়া’কিবুদ দুর্রিয়া ফী

মাওলিদি খায়রিল-বারিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ শিরোনামে একটি পুস্তক।

২৮. মোল্লা আরবুল ওয়াঈয (ইস্তেকাল: ৯৩৮ হিজরী)

মোল্লা আরবুল ওয়াঈয এতদসংক্রান্ত একটি বই লিখেন যার শিরোনাম ﴿مَوْلِدُ الْمَوْلَى﴾ ‘মাওলুদুন্-নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

২৯. ইবনে দীবা’আ আশ্-শায়বানী (৮৬৬-৯৪৪ হিজরী)

ওয়াজীহুদ্দীন আবদুর রহমান বিন ‘আলী বিন মুহাম্মদ শায়বানী শাফেঈ সমধিক পরিচিত ইবনে দীবা’ নামে। তিনি ‘সহীহুল বুখারী’ গ্রন্থের উপর একশটিরও বেশি প্রভাষণ দিয়েছেন; কোনো একবার তিনি তা মাত্র ছয় দিনে সমাপ্ত করেন। তিনি মীলাদ বিষয়েও লিখেছেন।

৩০. শায়খ আবদুল করীম আল-আদরানতাভী (ইস্তেকাল: ৯৬৫ হিজরী)

আবদুল করীম আদরানতাভী খালওয়াতী তুর্কী ভাষায় মীলাদ-বিষয়ক একটি কাব্য রচনা করেন।

৩১. ইমাম ইবনে হাজার হায়তামী মক্কী (৯০৯-৯৭৩ হিজরী)

হারামাঈন শরীফাইনের (মক্কা ও মদীনার) ইমাম আবুল-আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজার হায়তামী মক্কী শাফেঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির জন্যে কোনো ভূমিকার প্রয়োজন পড়ে না। ﴿الْفَتَاوَى الْحَدِيثِيَّةُ﴾, ﴿الْخَيْرَاتُ الْحَسَنَاتُ فِي مَنَاقِبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ﴾, ﴿الصَّوَاعِقُ الْمُحَرَّقَةُ فِي الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْبِدْعِ وَالزُّنْدَقَةِ﴾, ﴿الْحَوْزُ الْمُنْتَظَمُ فِي زِيَارَةِ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ النَّبَوِيِّ الْمَكْرَمِ الْمَعْظَمِ﴾ ‘আল-ফাতা’ওয়া’ল হাদীসিয়া’, ‘আল-খায়রাতিল হিসান ফী মানাকিবিল ইমাম আল-আ’যম আবী হানীফা নুমান’, আল-সাওয়াঈকিল মোহরাকা ফী রাঈদে আলা আহলিল-বিদ’আ ওয়ায-যানদাকা’ এবং ‘আল-জাওহারুল মুনায্যাম ফী যিয়ারতিল কুবরিশ শরীফিন নাবাভীল মুকাররামিল মু’আযযম’ শীর্ষক গ্রন্থগুলো তাঁর উচ্চমার্গের পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য বহন করে। হাদীসশাস্ত্রে তিনি ছিলেন শায়খুল

ইসলাম যাকারিয়া’ মিসরীর অন্যতম সেবা ছাত্র। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ছিলেন তাঁরই শায়খের শায়খ। ভারত উপমহাদেশের গর্ব মোল্লা আলী কারী ও كُنْزُ الْعُمَالِ فِي سُنَنِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ ‘কানযুল ‘উম্মাল ফী সুনানিল আকুওয়াল ওয়াল-আফ’আল’ শীর্ষক গ্রন্থপ্রণেতা আলাউদ্দীন আলী মুত্তাকী হিন্দী হলেন সে সকল আলেম-উলামার অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা তাঁর মাহফিলগুলো থেকে ফায়দা লাভ করেছেন। ইমাম ইবনে হাজার মক্কী মীলাদ সম্পর্কে অনেকগুলো বই লিখেছেন:

১. تَحْرِيرُ الْكَلَامِ فِي الْقِيَامِ عِنْدَ ذِكْرِ مَوْلِدِ سَيِّدِ الْأَنَامِ ﷺ ‘তাহরীরুল কলাম ফীল-কিয়ামি ‘ইন্দা যিকরিল মাওলিদ সাইয়েদিল আনাম’;
২. تَحْفَةُ الْأَخْيَارِ فِي مَوْلِدِ الْمُخْتَارِ ﷺ ‘তোহফাতুল আখইয়ার ফী মাওলিদিল মুখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’;
৩. اِتِّمَامُ التَّعْمَةِ عَلَى الْعَالَمِ بِمَوْلِدِ سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ ﷺ ‘ইতমামুন্-নি’মা আলাল আলম বি-মাওলিদ সাইয়েদি উলদি আদম এবং
৪. মাওলিদুন্-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এছাড়াও তিনি এই বিষয়টি তাঁর প্রণীত الْفَتَاوَى الْحَدِيثِيَّةِ ‘ফাতাওয়া আল-হাদীসিয়া’ গ্রন্থে কিছুটা আলোকপাত করেছেন।

৩২. ইমাম খতীব গুরবানী (ইন্তেকাল: ৯৭৭ হিজরী)

শামসুদ্দীন মুহাম্মদ বিন আহমদ খতীব গুরবানী পঞ্চাশ পৃষ্ঠার একটি মীলাদ-বিষয়ক পুস্তিকা লিখেন।

৩৩. আবুস সানা আহমদ হানাকী (ইন্তেকাল: ১০০৬ হিজরী)

আবুস সানা আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ‘আরিফ রুমী হানাকী এতদসংক্রান্ত একটি বই লিখেন, যার শিরোনাম مَوْلِدُ النَّبِيِّ ﷺ - ‘মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

৩৪. মোল্লা আলী কারী (ইন্তেকাল: ১০১৪ হিজরী)

হাদিসশাস্ত্রে হাফেয, তাঁর যুগের মুজতাহিদ মোল্লা আলী কারী বিন সুলতান বিন মুহাম্মদ হারাভী মীলাদ-সংক্রান্ত গ্রন্থপ্রণেতাদের অন্যতম। শওকানী নিজ اَلْبَدْرُ الطَّالِعُ ‘আল-বদরুত-তা’লি’ শীর্ষক পুস্তকে মন্তব্য করেন ইমাম সাহেব হাদীস ও রিওয়াযাত তথা সুন্নাহ-বিষয়ে জ্ঞানের বিশ্বকোষ ছিলেন; তাঁর ছিলো প্রখর স্মৃতি ও ধীশক্তি; আর তিনি মুসলিম জগতে ছিলেন বরণ্য মহানায়ক। মীলাদ সম্পর্কে তাঁর লেখা বইয়ের নাম الْمَوْزُودُ الرَّوِّيُّ ‘আল-মাওরিদুর রাবী ফী মাওলিদিন্ নবুভী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া নাসাবিহিত্ ত্বহির’। এতে তিনি জগতজুড়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মীলাদ মাহফিলের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

৩৫. ইমাম আবদুর রউফ মানাভী (৯৫২-১০৩১ হিজরী)

আবদুর রউফ বিন তা’জ আরিফীন বিন ‘আলী বিন যাইনুল আবেদীন মানাভী (১৫৪৫-১৬২১ খৃষ্টাব্দ) হলেন الجامع الصغیر ‘ফায়যুল ক্বাদীর শরহিল জামিয়াস্ সগীর’ ও شَرْحُ الشَّمَائِلِ عَلَى جَمْعِ ‘শরহুশ শামাইল আলা জা’ময়িল ওয়াসাইল’ শীর্ষক দুটো পুস্তকের প্রখ্যাত রচয়িতা। তিনি মীলাদ-বিষয়ক একটি গবেষণামূলক বইও প্রণয়ন করেন, যেটা مَوْلِدُ الْمَنَآوِي ‘মাওলিদুল মানাভী’ নামে সর্বজনবিদিত।

৩৬. মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের ঈদরুসী (৯৮৭-১০৩৮ হিজরী)

মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের বিন শায়খ বিন আব্দুল্লাহ ঈদরুসী রচনা করেন ‘আল-মুনতাখাবুল الْمُنتَخَبُ الْمُصَفَّى فِي أَخْبَارِ مَوْلِدِ الْمُصْطَفَى ﷺ মুসাফফা ফী আখবারি মাওলিদিল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

৩৭. ইমাম আলী বিন ইবরাহীম আল-হালাবী (৯৭৫-১০৩৮ হিজরী)

নূরুদ্দীন আলী বিন ইবরাহীম বিন আহমদ বিন আলী হালাবী কাহেরী শাফেঈ জনপ্রিয় اِنْسَانُ الْعُيُونِ فِي سِيرَةِ الْأَمِينِ الْمَأْمُونِ ‘ইনসানুল উয়ুন ফী সীরাতিল আমীনিল মামুন’ শীর্ষক সীরাত-পুস্তকের লেখক; এই

বইটি *الْحَلِيبَةُ السَّيْرَةُ* ‘সীরাতে হালাবী’ নামেও সর্বসাধারণে সুপরিচিত। ইমাম সাহেবের প্রতি *الْكَوَاكِبُ الْمُنِيرُ فِي مَوْلِدِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ* ‘আল-কাওয়াকিবুল মুনীর ফী মাওলিদিল বাশীরুন নাযীর’ শীর্ষক বইটি রচনার কৃতিত্বও আরোপ করা হয় *الْحَلِيبَةُ السَّيْرَةُ* ‘সীরাতে হালাবিয়া’ কিতাবে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনের সময় প্রত্যক্ষকৃত অলৌকিক ঘটনাগুলোর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন এবং এরপর মীলাদ উদযাপনের বৈধতা সপ্রমাণ করেন।

৩৮. ইমাম মুহাম্মদ বিন আল্লান সিদ্দীকী (৯৯৬-১০৫৭ হিজরী)

প্রখ্যাত তাফসীরকারক ও হাদীসশাস্ত্র বিশারদ মুহাম্মদ আলী বিন মুহাম্মদ বিন আল্লান বকরী সিদ্দীকী আলুভী (১৫৮৮-১৬৪৭ খৃষ্টাব্দ) প্রণয়ন করেন *مَوْزِدُ الصَّفَا فِي مَوْلِدِ الْمُصْطَفَى* ‘মাওলিদুস সাফা ফী মাওলিদিল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ শীর্ষক কিতাব।

৩৯. শায়খ যাইনাল আবেদীন খালীফাতী (ইস্তেকাল: ১১৩০ হিজরী)

যাইনাল আবেদীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আব্বাসী ছিলেন মদীনাবাসী এক সুবক্তা আলেম। খালীফাতী নামেই তিনি বিখ্যাত ছিলেন। মীলাদ সম্পর্কে তিনি প্রণয়ন করেন *الْجَمْعُ الرَّاهِرُ الْمُنِيرُ فِي ذِكْرِ مَوْلِدِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ* ‘আল-জামেউয় যাহিরিল মুনীর ফী যিকর মাওলিদিল বাশীরিন নাযীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ শীর্ষক পুস্তক।

৪০. ইমাম আবদুল গনী নাবলুসী (বেসাল: ১১৪৩ হিজরী)

আবদুল গনী নাবলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন উল্লেখযোগ্য ইমাম, যিনি সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট একটি পুস্তিকা লিখেন যার শিরোনাম *الْمَوْلِدُ النَّبَوِيُّ* ‘আল-মাওলিদুন নাবুভীয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

৪১. শায়খ জামালুদ্দীন বিন আকীলা মক্কী আয-যাহির (ইস্তেকাল: ১১৩০ হি.) জামালুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন সাঈদ বিন মাসউদ মক্কী যাহিরও একটি বই লিখেন যা *مَوْلِدُ النَّبِيِّ* ‘মাওলিদুনাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ নামে অভিহিত।

৪২. সুলাইমান নাহীফী রুমী (ইস্তেকাল: ১১৫১ হিজরী)

সুলাইমান বিন আবদুর রহমান বিন সালিহ নাহীফী অরুমী মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী (৬০৪-৬৭২ হিজরী) বিরচিত ‘মসনবী’ কাব্যগ্রন্থটিকে তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেন। একই ভাষায় তিনি মাওলিদ সম্পর্কে একটি কবিতাও রচনা করেন।

৪৩. ইউসুফ যাদা রুমী (১০৮৫-১১৬৭ হিজরী)

আব্দুল্লাহ হিলমী বিন মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বিন আবদুল মান্নান রুমী হানাফী মুকরী, যিনি ইউসুফ-যাদা, শায়খুল কুবরা নামে সর্বজনবিদিত, তিনি ছিলেন এক বিখ্যাত হাদীসবেত্তা। তিনি রচনা করেছিলেন *الْإِتِّبَافُ فِي إِيْتِلَافِ فِئَلِ الْفُرَاةِ* ‘ইতিলাফ ফী উজুদিল ইখতিলাফ ফীল-কিরয়াহ’ শীর্ষক পুস্তকটা, যেটা কুরআনের বিভিন্ন তিলাওয়াত-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। মীলাদ-বিষয়ে তিনি প্রণয়ন করেন *الْكَلامُ فِي مَوْلِدِ الْمُصْطَفَى* ‘আল-কালামু সানীয়্যাল মুসাফ্ফা ফী মাওলিদিল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

৪৪. হাসান বিন আলী মাদাবাগী (ইস্তেকাল: ১১৭০ হিজরী)

হাসান বিন ‘আলী বিন আহমদ বিন আব্দুল্লাহ মানতাবী, যিনি তাঁর যুগে মাদাবাগী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি ১১৭০ খৃষ্টাব্দে মিসরে ইস্তেকাল করেন। তিনি লিখেছিলেন *رِسَالَةُ فِي الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ* ‘রিসালা ফীল-মাওলিদিন নাবভী’ শীর্ষক একখানি পুস্তিকা।

৪৫. আব্দুল্লাহ কাশগরী (ইস্তেকাল: ১১৭৪ হিজরী)

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ কাশগরী বিনদাঈ নকুশবন্দী যাহিদী কনস্টানটিনোপোল নগরীতে নকুশবন্দী সূফী তরীকা-সংক্রান্ত প্রভাষণ দিতেন। তিনিও *مَوْلِدُ النَّبِيِّ* ‘মাওলিদুনাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ শিরোনামে একটি বই লিখেছিলেন।

৪৬. আহমদ বিন উসমান হানাফী (১১০০-১১৭৪ হিজরী)

আহমদ বিন ‘উসমান দিয়্যার বকরী আমাদী হানাফী একটি বই লিখেন *مَوْلِدُ النَّبِيِّ* ‘মাওলিদুনাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ শিরোনামে।

৪৭. আবদুল করীম বরযানজী (বেসাল: ১১৭৭ হিজরী)

সাইয়েদ জাফর বিন হাসান বিন আবদুল করীম বরযানজী শাফেঈ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) মদীনা মোনাওয়ারার গ্র্যাড মুফতী ও মুহাদ্দীস ছিলেন। (আরবী ভাষাসংক্রান্ত জনপ্রিয় পুস্তক) تَابُجُ الْعُرُوسِ مِنْ جَوَاهِرِ 'তাজুল-উরুস মিন জওয়া'হিরিল ক্বামূস'-প্রণেতা সাইয়েদ মুরতদা' আল-যাবীদী (১১৪৫-১২০৫ হিজরী) ইমামের সাথে দেখা করতেন; আর তিনি মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত হযরত ইমামের সেমিনারগুলোতে যোগ দিতেন। ইমাম সাহেব মীলাদ সম্পর্কে عَفْدُ الْجَوْهَرِ 'ইক্বদুল জওহার ফী মাওলিদিন নবীয়িল মোলুদু'ল বরযানজী' শিরোনামে একটি বিখ্যাত বই লিখেছিলেন, যেটা مَوْلُودُ الْبَرْزَنْجِيِّ 'মওলুদুল বরযানজী' হিসেবে সর্বজনবিদিত। এই বইটির সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আন্দাজ করা যায় এই বাস্তবতা হতে যে, সহস্র সহস্র আরব ও অনারব মুসলমান এটা মুখস্থ করেন এবং নিজেদের মাহফিলে তা পাঠ করে থাকেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনের বিবরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মহাসম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত মোবারকের সংক্ষিপ্তসার; এতে উল্লেখিত হয়েছে তাঁর নবুয়্যত, হিজরত, স্বভাব ও আচার-ব্যবহার এবং (যুদ্ধ) অভিযানগুলো সম্পর্কে, যেগুলো তাঁর বেসাল শরীফ অবধি চলেছিলো। ইমাম সাহেব (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সূচনায় লিখেন:

أَبْتَدِئُ الْإِمْلَاءَ بِاسْمِ الدَّاتِ الْعَلِيَّةِ، مُسْتَدِرًّا فَيُضُّ الْبَرَكَاتِ عَلَى مَا أَنَا لَهُ وَأَوْلَاهُ.

-প্রথমে বন্দনা করি নামে মহাসম্মানিত সত্তার,
এই উপায়ে অশেষ করি আশীর্বাদের প্রবাহ তাঁর,
যা তাঁরই কারণে অর্জিত হয়েছে আমার।

শায়খ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আলীশ (ইন্তেকাল: ১২৯৯ হিজরী) ইমাম সাহেবের এই বইটির উপর একটি উপকারী ও সামগ্রিক ব্যাখ্যামূলক পুস্তক প্রণয়ন করেন, যার শিরোনাম الْقَوْلُ الْمُنْجِي عَلَى مَوْلِدِ

الْبَرْزَنْجِيِّ 'আল-কাওলুল-মুনজী আলা মাওলিদিন বরযানজী'; পুস্তকটি মিশরে পুনঃপুনঃ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর নাতি সাইয়েদ জা'ফর বিন ইসমাঈল বিন যাইনাল আবেদীন বরযানজী (বেসাল: ১৩১৭ হিজরী), যিনি ছিলেন বিজ্ঞ ফকীহ ও ইতিহাসবিদ এবং মদীনা মোনাওয়ারার মুফতী, তিনি ১৯৮টি দ্বিচরণমূলক কাব্যে এই ব্যাখ্যাসূচক বইটি প্রকাশ করেন। সূচনা-পংক্তিতে বলা হয়:

بَدَأْتُ بِاسْمِ الدَّاتِ الْعَالِيَةِ الشَّانِ
بِهَا مُسْتَدِرًّا فَيُضُّ جُودٌ وَإِحْسَانِ

-প্রথমে বন্দনা করি নামে মহাসম্মানিত সত্তার,
অশেষ করি এ উপায়ে (তাঁরই) প্রবাহমান দয়া ও দানশীলতার।

এই কাব্যটি الْكَوْكَبُ الْأَنْوَارِ عَلَى عَفْدِ الْجَوْهَرِ فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ الْأَزْهَرِ 'আল-কাওকাবুল আনওয়ার আলা আকদিল জাওহার ফী মাওলিদিন নাবীয়িল আযহার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' নামে অভিহিত হয়।

৪৮. সাইয়েদ মুহাম্মদ বিন হুসাইন হানাফী জা'ফরী (১১৪৯-১১৮৬ হিজরী)

সাইয়েদ মুহাম্মদ বিন হুসাইন মাদানী আলুভী হানাফী জা'ফরী সঠিক পথপ্রাপ্ত খলীফামণ্ডলী রাঈয়াল্লাহু আনহুম ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাঁটি আহলে বায়ত রাঈয়াল্লাহু আনহুমবৃন্দের জীবনীমূলক অনেক বইপত্র রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: الْفَتْحُ وَالْبُشْرَى فِي مَنَاقِبِ سَيِّدَةِ الرَّهْمَاءِ، فُرَّةُ الْعَيْنِ فِي بَعْضِ مَنَاقِبِ سَيِّدِنَا الْحُسَيْنِ، مَنَاقِبُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ، الْمَوَاهِبُ الْعِزَّارِ فِي مَنَاقِبِ سَيِّدِنَا عَلَى الْكَرَّارِ 'আল-ফাতহ ওয়াল-বুশরা' ফী মানাক্বিবে সাইয়েদা ফা'তিমা আল-যাহরা', 'কুররাতুল আইন ফী বা'আদি মানাক্বিবে সাইয়েদিনা' আল-হুসাইন, 'মানা'ক্বিবে আল-খুলাফা' আল-আরবা'আ; 'আল-মাওয়াহিব আল-আযা'র ফী মানাক্বিবে সাইয়েদিনা' 'আলী আল-কারার রাঈয়াল্লাহু আনহু'।

৪৯. শায়খ মুহাম্মদ বিন আহমদ আদাভী (ইন্তেকাল: ১২০১ হিজরী)

আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ আদাভী মালেকী মিসরী সুপরিচিত ছিলেন ‘দারদীর’ খেতাবে। তাঁর *مَوْلِدُ الدَّرْدِيرِ* ‘মাওলিদুদ দারদীর’ শিরোনামের মীলাদ-বিষয়ক পুস্তকটি মিসর হতে প্রকাশিত হয়। তাঁর মেধা ও জ্ঞানের যোগ্যতাবলে এই পুস্তিকাটি জামে’ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক পঠিত হতো। শায়খুল আযহার (বিশ্ববিদ্যালয়) ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বায়জুরী (১১৯৮-১২৭৭ হিজরী) এই পুস্তিকাটি সম্পর্কে অত্যন্ত উপকারী একখানি ব্যাখ্যামূলক কিতাব রচনা করেন।

৫০. আশরাফ যা’দাহ বারসাভী (ইন্তেকাল: ১২০২ হিজরী)

আবদুল কাদের নাজীবুদ্দীন বিন শায়খ ইয়য্ উদ্দীন আহমদ, যিনি আশরাফ-যা’দাহ বারসাভী হানাফী নামে সর্বসাধারণে সুপরিচিত, তিনি ছিলেন এক তুর্কী কবি। তিনি তাসাউফ সম্পর্কে একটি বই লিখেন যার শিরোনাম *سِرُّ الدَّوْرَانِ فِي التَّصَوُّفِ* ‘সিররুদ-দাওরান ফীত-তাসাউফ’। তিনি তাঁর মাতৃভাষায় মীলাদ সম্পর্কেও একটি বই লিখেন।

৫১. মুহাম্মদ শাকের আক্কাদ আস-সালেমী (ইন্তেকাল: ১২০২ হিজরী)

মুহাম্মদ শাকির বিন আলী বিন হাসান আক্কাদ সালেমী রচনা করেন *تَذَكُّرُهُ أَهْلُ الْخَيْرِ فِي الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ ﷺ* ‘তায়কিরাতু আহলিল খায়র ফীল-মাওলিদিন নাবাভী’।

৫২. আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ মুকরী (ইন্তেকাল: ১২১০ হি.)

আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ নাহরাভী মিসরী মুকরী একটি ব্যাখ্যামূলক পুস্তক লিখেন হাসান বিন আলী মাদাবিগী (ইন্তেকাল: ১১৭০ হিজরী) বিরচিত *رِسَالَةُ فِي الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ ﷺ* ‘রিসালাতু ফীল-মাওলিদিল নাবাভী’ শীর্ষক গ্রন্থ বিষয়ে; এই হা’শিয়াটির শিরোনাম ছিলো *حَاشِيَةُ عَلَيَّ مَوْلِدِ*

لِلْمَدَائِنِي النَّبِيِّ ﷺ ‘হা’শিয়াতু ‘আলা মাওলিদিন নাবাভী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিল-মাদাবিগী’।

৫৩. সালামী আল-আযমীরী (ইন্তেকাল: ১২২৮ হিজরী)

মুস্তফা বিন ইসমাঈল শারহী আযমীরী সালামী তুর্কী ভাষায় মীলাদ-বিষয়ক একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন।

৫৪. মুহাম্মদ বিন আলী শানওয়ানী (ইন্তেকাল: ১২৩৩ হিজরী)

মুহাম্মদ বিন আলী মিসরী আযহারী শাফেঈ শানওয়ানী লিখেন মীলাদ-বিষয়ক গবেষণামূলক পুস্তক *أَلْجَوَاهِرُ السُّنِّيَّةِ فِي مَوْلِدِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ ﷺ* ‘আল-জাওয়াহরিস্ সুন্নীয়া ফী মাওলিদে খায়রিল বারিয়্যা’।

৫৫. ‘আব্দুল্লাহ সুওয়াইদান (ইন্তেকাল: ১২৩৪ হিজরী)

আব্দুল্লাহ বিন আলী বিন আবদুর রহমান দামলীজী দারীর মিসরী শাযিলী, যিনি সুওয়াইদান নামে সর্বজনবিদিত, তিনি একটি গবেষণাপত্র লিখেন যার শিরোনাম *مَطَالِعُ الْأَنْوَارِ فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ ﷺ* ‘মাতালিউল আনওয়ার ফী মীলাদিন নাবীয়িল মুখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

৫৬. ইবনে সালাহ আল-আমীর

সাইয়েদ আলী বিন ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বিন সালাহ আমীর সানআনী ১১৭১ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৩৬ হিজরী সাল নাগাদ ইন্তেকাল করেন। মীলাদ সম্পর্কে তাঁর বিবরণের শিরোনাম *تَأْنِيسُ أَرْبَابِ الصَّفَا فِي مَوْلِدِ الْمُصْطَفِيِّ ﷺ* ‘তা’নীসু আরবাবিস সাফা ফী মাওলিদিল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

৫৭. ইমাম মুহাম্মদ মাগরিবী (বেসাল: ১২৪০ হিজরী)

বরণে গবেষক, সূফী ও দরবেশ ইমাম মুহাম্মদ মাগরিবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদ সম্পর্কে *أَلْمَوْلِدُ النَّبَوِيِّ ﷺ* ‘আল-মাওলিদুন নাবাভী’ শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা

করেন। এই বিষয়ে তিনি হাদীসশাস্ত্রবিদ হতে অসংখ্য হাদীস এবং সূফীমণ্ডলীর বাণীও উদ্ধৃত করেন।

৫৮. শায়খ ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বাজুরী (ইন্তেকাল: ১২৭৬ হিজরী)

ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বাজুরী শাফেঈ মিসরী প্রণয়ন করেন *خُفَّةُ الْبَشْرِ عَلَيَّ* ‘তোহফাতু বাশার আলা মাওলিদি ইবনে হাজর’ শীর্ষক পুস্তক।

৫৯. শাহ আহমদ সাঈদ মোজাদ্দের দেহলভী (ইন্তেকাল: ১২৭৭ হি.)

শাহ আহমদ সাঈদ মোজাদ্দের দেহলভী (ইন্তেকাল: ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ) একজন স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও আধ্যাত্মিক শায়খ, যিনি ভারতীয় অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। মীলাদ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন *إثبات المَوْلِدِ وَالْقِيَامِ* ‘ইসবাতুল মাওলিদি ওয়াল কিয়াম।’

৬০. সাইয়েদ আহমদ মারযুকী

সাইয়েদ আবুল ফাওয আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন রামাদ্বান মক্কী মালেকী মারযুকী ছিলেন মক্কা মেয়ায্যমার পবিত্র মসজিদে হারামে (নিয়োজিত) একজন শিক্ষক। তিনি ১২৮১ হিজরী সালে *بُلُوغُ الْمَرَامِ لِبَيَانِ أَلْفَاظِ مَوْلِدِ* ‘বলুগুল মারাম লি-বয়ানি আলফাযি মাওলিদি সাযিয়াদিল আনাম ফী শরহে মাওলিদি আহমদ বুখারী’ শিরোনামে একটি কিতাব রচনা করেন। এছাড়াও তিনি ‘আক্বীদা আল-আওয়াম’ গ্রন্থে মাওলিদি সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। শেষোক্ত বইটির একটি ব্যাখ্যাত্রুত তিনি প্রণয়ন করেন, যার শিরোনাম *تَحْصِيلُ نَيْلِ الْمَرَامِ* ‘তাহসীলু নায়লিল মারাম’।

৬১. শায়খ মুহাম্মদ মাযহার বিন আহমদ সাঈদ (ইন্তেকাল: ১৩০১ হিজরী)

মুহাম্মদ মাযহার বিন আহমদ সাঈদ (ইন্তেকাল: ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ) মীলাদ-সংক্রান্ত একটি ঘটনাপঞ্জি রচনা করেন যার শিরোনাম *الرَّسَالَةُ السَّعِيدِيَّةُ* ‘আর-রিসালাতুস সাইয়েদিয়া।’

৬২. আবদুল হাদী আবইয়ারী (ইন্তেকাল: ১৩০৫ হিজরী)

আবদুল হাদী আবইয়ারী মিসরী মীলাদুন্নবীর উপর একটি সারসংক্ষেপ পুস্তক রচনা করেন।

৬৩. আবদুল ফাত্তাহ বিন আবদুল কাদের দামেস্কী (১২৫০-১৩০৫ হিজরী)

আবদুল ফাত্তাহ বিন আবদুল কাদের বিন সালিহ দামেস্কী শাফেঈ সংকলন করেন মীলাদ-বিষয়ক একটি বই, যার শিরোনাম *سُرُورُ الْأَبْرَارِ فِي مَوْلِدِ* ‘সুরুরু’ল আবরার ফী মাওলিদ্ নাবীয়ায়ল মুখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’

৬৪. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (মৃত্যু: ১৩০৭ হিজরী)

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী একজন বিখ্যাত সালাফী পণ্ডিত। তিনি মীলাদ সম্পর্কে একটি বই লিখেন, যা *الْشَّامَةُ الْعَنْبَرِيَّةُ مِنْ مَوْلِدِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ* ‘আশ-শামামাতুল আনবারিয়্যা মিন মাওলিদি খায়রিল বারিয়্যা’ নামে অভিহিত।

৬৫. ইব্রাহীম তারাবুলুসী হানাফী (ইন্তেকাল: ১৩০৮ হিজরী)

ইব্রাহীম বিন সাইয়েদ আলী তারাবুলুসী হানাফী মীলাদ সম্পর্কে একটি কাব্যিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন, যা *مَنْظُومَةٌ فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ* ‘মানযুমাতু ফী মীলাদিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ নামে অভিহিত।

৬৬. হিবাতুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল কাদের দামেস্কী (ইন্তেকাল: ১৩১১ হি.)

হিবাতুল্লাহ আবুল ফারহ মুহাম্মদ বিন আবদুল কাদের বিন মুহাম্মদ সালিহ দামেস্কী একটি পত্র রচনা করেন *مَوْلِدُ النَّبِيِّ* ‘মাওলিদুন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ শিরোনামে।

৬৭. আবু আবদুল মুতী মুহাম্মদ নুওয়াইর জাভী (ইন্তেকাল: ১৩১৫ হিজরী)

আবু আবদুল মুতী মুহাম্মদ নুওয়াইর বিন উমর বিন আরবী বিন আলী নববী জাভী হচ্ছেন *بُغْيَةُ الْعَوَامِ فِي شَرْحِ مَوْلِدِ سَيِّدِ الْأَنْامِ* ‘বুগইয়াতুল

‘আওয়াম ফী শরহি মাওলিদি সাইয়েদিল আনাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ শীর্ষক গ্রন্থপ্রণেতা।

৬৮. মুফতী আদরানা মুহাম্মদ ফাওযী রুমী (ইন্তেকাল: ১৩১৮ হি.)

মুফতী আদরানা মুহাম্মদফাওযী বিন আব্দুল্লাহ রুমী রচনা করেন إِبْتِاثُ ‘ইসবাতুল মুহসিনাত ফী তিলাওয়াতি মাওলিদি সাইয়েদিস সা’আদাত’ শীর্ষক পুস্তক।

৬৯. সাইয়েদ আহমদ বিন আবদুল গনী দামেস্কী (ইন্তেকাল: ১৩২০ হিজরী)

সাইয়েদ আহমদ বিন আবদুল গনী বিন উমর আবেদীন দামেস্কী ছিলেন বিশিষ্ট একজন হানাফী মায়হাবের ফকীহ, গবেষক এবং رُدُّ الْمُخْتَارِ عَلَي دُرِّ বিশিষ্ট একজন হানাফী মায়হাবের ফকীহ, গবেষক এবং رُدُّ الْمُخْتَارِ عَلَي تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ ‘রাব্বুল মোহতার আলা দুবরিল মুখতার আলা তানভীর আবসার’ শীর্ষক গ্রন্থপ্রণেতা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আমীন বিন আবেদীন শামী দামেস্কী (১১৯৮-১২৫২ হিজরী)’র ভাতিজা। তিনি ইমাম ইবনে হাজার হায়তামী মক্কী (৯০৯-৯৭৩ হিজরী) বিরচিত ‘মাওলিদ’ পুস্তকের উপর একটি বিশাল ব্যাখ্যামূলক বই প্রণয়ন করেন যার শিরোনাম ‘নাসরুদ্ দুরার আলা মাওলিদি ইবনে হাজার।’

৭০. ইমাম আহমদ রেযা খাঁন (১২৭২-১৩৪০ হিজরী)

আহমদ রেযা’ বিন নকী আলী খাঁন কাদেরী (১৮৫৬-১৯২১ খৃষ্টাব্দ) নিম্নের দুটো মীলাদ-বিষয়ক বই লিখেন:

১. نُطْقُ الْهَلَالِ بِأَرْخِ وَلَادَةِ الْحَبِيبِ وَالْوَصَالِ ‘নুতকুল হিলাল বি’আরখি বিলাদতিল হাবীব ওয়াল বেসাল’;
২. إِقَامَةُ الْقِيَامَةِ عَلَى طَاعِنِ الْقِيَامِ لَنَبِيِّ تَهَامَةً ﷺ ‘ইকামাতুল কিয়ামা আলা তা’আনিল কিয়াম লি-নাবীযিত্ তিহামা।’

৭১. মুহাম্মদ বিন জা’ফর কাত্তানী (ইন্তেকাল: ১৩৪৫ হিজরী)

সূফী সাইয়েদ শরীফ মুহাম্মদ বিন জাফর কাত্তানী ছিলেন একজন বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দীস। তাঁর লেখা أَلَيْمُنَ وَالْإِسْعَادُ بِمَوْلِدِ خَيْرِ الْعِبَادِ ‘আল-

ইউমান ওয়াল-ইস’আদ বি-মাওলিদি খায়রিল ইবাদ’ শীর্ষক পুস্তিকায় মীলাদ সম্পর্কে ষাটটি ঐতিহ্যবাহী ও সমসাময়িক ফতোয়া বিধৃত হয়েছে।

৭২. ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী (১২৬৫-১৩৫০ হিজরী)

ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী আরব-বিশ্ব হতে উদিত বিখ্যাত এক ব্যক্তিত্ব এবং হাদীসশাস্ত্র বিশারদ। মীলাদ-বিষয়ে তাঁর অবদান হলো তাঁরই কাব্য جَوَاهِرُ النَّظْمِ الْبَدِيعِ فِي مَوْلِدِ الشَّفِيعِ ﷺ ‘জওয়াহিরন্ নাযমিল বাদী’ঈ ফী মাওলিদিশ শাফী’ঈ।

৭৩. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (১২৮০-১৩৬২ হিজরী)

আশরাফ আলী থানভী (১৮৬৩-১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ) একজন বিখ্যাত দেওবন্দী আলেম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত-সংক্রান্ত তাঁর লেখা نَشْرُ الطَّبِيبِ فِي ذِكْرِ النَّبِيِّ الْحَبِيبِ ﷺ ‘নাশরুত্ ত্বীব ফী যিকরিন্ নাবীযিল হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ শীর্ষক পুস্তকটির সূচনায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর সৃষ্টির বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং এর পাশাপাশি হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের সময় প্রত্যক্ষকৃত আলৌকিক ঘটনারও বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। থানভী সাহেব ‘তরীক্বা-ই মাওলিদ’ও সংকলন করেন।

৭৪. শায়খ মাহমুদ আত্তার দামেস্কী (১২৮৪-১৩৬২ হিজরী)

মাহমুদ বিন মুহাম্মদ রাশীদ আত্তার আহনাফী ছিলেন দামেস্কের একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দীস। তিনি তাঁর সময়কার নেতৃস্থানীয় আলেম-উলামার কাছে জ্ঞান শিক্ষা করেন; এমন কী আজ অবধিও দামেস্কীয় উলামাবৃন্দকে তাঁর শিষ্য বা তাঁর শিষ্যদের শিষ্য বিবেচনা করা হয়। মীলাদ সম্পর্কে শায়খ একটি গবেষণাপত্র লিখেন যার শিরোনাম إِسْتِحَابُّ الْقِيَامِ عِنْدَ ذِكْرِ وَلَادَتِهِ ‘ইসতেহাবুল কিয়াম ‘ইন্দা যিকরি বিলাদাতিহি আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম।’

৭৫. ইমাম মুহাম্মদ যাহিদ কাওসারী (১২৯৬-১৩৭১ হিজরী)

বরেণ্য আরবীয় পণ্ডিত ও ইসলামের নবায়নকারী মুহাম্মদ যাহিদ কাওসারীর অনেকগুলো গবেষণাপত্র আছে মীলাদ সম্পর্কে।

৭৬. ‘আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ হিরারী (ইন্তেকাল: ১৩৮৯ হিজরী)

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ শীবী আবদারী হিরারী হাবাশী (ইন্তেকাল: ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ) মীলাদ সম্পর্কে দুটি পুস্তক প্রণয়ণ করেন:

১. كِتَابُ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ ﷺ ‘কিতাবুল মাওলিদিন্ নাবাভী’ এবং

২. الرَّوَائِحُ الزَّكِيَّةُ فِي مَوْلِدِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ ﷺ ‘আর-রাওয়াইহিয্ যাকীয়া ফী মীলাদে খায়রিল বারীয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’

৭৭. শায়খ মুহাম্মদ রশীদ রেযা মিসরী

মুহাম্মদ রাশীদ রেযা’ মিসরী যিনি ছিলেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ, গবেষক, মুহাদ্দিস ও তাফসীরকারক, তিনি মীলাদ বিষয়ে একটি বই লিখেন যার শিরোনাম ذِكْرُ الْمَوْلِدِ وَخُلَاصَةُ السِّيَرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَحَقِيقَةِ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ‘যিকরুল মাওলিদ ওয়া খুলাসা তুত্ সীরাতিন নাবাভিয়াহ ওয়া হাকীকাতিদ দাওয়াতিল ইসলামিয়া।’

৭৮. শায়খ মুহাম্মদ বিন আলুভী মালেকী মক্কী (বেসাল: ১৪২৫ হিজরী)

মরহুম মুহাম্মদ বিন আলুভী মালেকী মক্কী (বেসাল: ২০০৪ খৃষ্টাব্দ), যিনি মক্কা মোয়াযযমার একজন কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব ও হাদীসশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ, তিনি মীলাদ-বিষয়ক পুস্তিকাসমূহ প্রকাশ করেন, যাঁতে তিনি অত্যন্ত যোগ্য তিনজন ইসলামী পণ্ডিতের দৃষ্টিভঙ্গির সারমর্ম তুলে ধরেন:

১. ইবনে কাসীর: ذِكْرُ مَوْلِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِضَاعِهِ ‘যিকরু মাওলিদি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া রাদা’ইহি।’

২. মোল্লা আলী কারী: الْمَوْرَدُ الرَّوِّي فِي الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ ﷺ ‘আল-মাওরুদুর রাভী ফী মাওলিদিন্ নাবাভী (শায়খ আলুভী মালেকী এই প্রকাশনার পর্যালোচনা করেন)।

৩. ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী: مَوْلِدُ النَّبِيِّ ﷺ ‘মাওলিদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’

শায়খ এ ছাড়াও মীলাদ বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র লিখেন যার শিরোনাম حَوْلُ الْإِحْتِفَالِ بِذِكْرِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ ﷺ ‘হাওলুল ইহতেফাল বি-যিকরিল মাওলিদিন্ নাবাভীশ শরীফ।’ অধিকন্তু তিনি এর বৈধতার পক্ষে মহান আলেম-উলামার বাণী ও ফতোয়া সংকলন করেন; বইটির শিরোনাম الْإِعْلَامُ بِفَتَاوَى أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ حَوْلَ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ আন্-ইলাম বি-ফাতাওয়া-ই আইম্মাতিল ইসলাম হাওলা মাওলিদিহি আলাইহিস সালাতু ওয়াস-সালাম।

৭৯. শায়খ আবদুল আযীয বিন মুহাম্মদ

আবদুল আযীয বিন মুহাম্মদ ছিলেন প্রথম শ্রেণির একজন গবেষক। তিনি ‘সং কাজে আদেশ ও অসং কাজে নিষেধ কমিটি’র সভাপতি ছিলেন। তিনি রচনা করেন بَعْنَةُ الْمُصْطَفَى ﷺ ‘বি’সাতুল মুস্তফা ফী মাওলিলি মুস্তফা’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীর্ষক পুস্তক।

৮০. সাইয়েদ মাদী আবুল আযাঈম

তিনি الْبَشَائِرُ الْأَخْيَارُ فِي مَوْلِدِ الْمُخْتَارِ ‘বাশায়েরুল আখইয়ার ফী মাওলিদিল মুখতার’ শীর্ষক পুস্তক প্রণেতা। এতে তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর সৃষ্টির বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করেন। তিনি আরো বর্ণনা করেন হযুরের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৈশবকাল, নুবুওয়াত এবং অন্যান্য আশিয়া আলাইহিমুস সালামবৃন্দের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে। মীলাদুন্নবী উদযাপনের পক্ষেও তিনি প্রামাণ্য দলিলাদি পেশ করেন।

৮১. সাইয়েদ মুহাম্মদ উসমান মীরগনী: তিনি লিখেন الْأَسْرَارُ الرَّبَّانِيَّةُ

‘আল-আসরারুর রাব্বানিয়া আল-মা’রুফ বি-মাওলিদিন্ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ শীর্ষক পুস্তিকা। এতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ-পরিচয়, ধরাধামে

শুভাগমন এবং তাঁর আশীর্বাদময় (প্রকাশ্য) জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

৮২. মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ মানসুরী শাফেঈ খাইয়্যাত: ইবনে হাজর প্রণীত ‘মাওলিদ’ গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যামূলক পুস্তক তিনি রচনা করেন যার শিরোনাম إِفْتِنَا صُ الشَّوَارِدِ مِنْ مَوَارِدِ الْمَوَارِدِ ‘ইকতেনাসুশ শাওয়ারিদ মিন মাওয়ারিদিল মাওয়ারিদ’।

৮৩. আহমদ বিন কাসেম মালেকী বুখারী হারীরী: مَوْلِدُ النَّبِيِّ ﷺ ‘মাওলিদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

৮৪. আবুল হাসান বকরী: الْأَنْوَارُ فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ ‘আল-আনওয়ার ফী মাওলিদ্দিন্ নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

৮৫. ইবরাহীম আবইয়ারী: مَوْلِدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ‘মাওলিদু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

৮৬. সালেহুদ্দীন হুওয়ারী: الْمَوْلِدُ النَّبَوِيُّ الشَّرِيفُ ﷺ ‘আল-মাওলিদুন্ নাবাভী শরীফ’।

৮৭. আবু মুহাম্মদ ভেলতরী: إِبْتِغَاءُ الْوُصُولِ لِحُبِّ اللَّهِ بِمَدْحِ الرَّسُولِ ﷺ ‘ইবতেগায়ুল উসূল লি-হুব্বিল্লাহি বি-মাদহির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

৮৮. যাইনুদ্দীন মাখদুম ফানানী: الْبُنْيَانُ الْمَرْصُوصُ فِي شَرْحِ الْمَوْلِدِ ﷺ ‘আল-বুনিয়ানুল মারসূস ফী শরহিল মাওলিদ্দিল মানকূস’।

৮৯. আব্দুল্লাহ আফীফী: الْمَوْلِدُ النَّبَوِيُّ الْمُخْتَارُ ﷺ ‘আল-মাওলিদ্দিন্ নাবাভীল মুখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

৯০. আব্দুল্লাহ হিমসী শাযিলী: مَوْلِدُ النَّبِيِّ ﷺ ‘মাওলিদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

৯১. শায়খ খালিদ বিন ওয়ালিদী: مَوْلِدُ النَّبِيِّ ﷺ ‘মাওলিদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

৯২. শায়খ মুহাম্মদ ওয়াফা সিইয়াদী: مَوْلِدُ النَّبِيِّ ﷺ ‘মাওলিদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

৯৩. শায়খ মাহমূদ মাহফূয দামেস্কী শাফেঈ: مَوْلِدُ النَّبِيِّ ﷺ ‘মাওলিদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

৯৪. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ মুনাভী শাযিলী: مَوْلِدُ الْجَلِيلِ حُسْنُ الشَّكْلِ الْجَمِيلِ ‘মাওলিদুল জলীল হসনুশ শিকলিল জামীল’।

৯৫. হাফেয আবদুর রহমান বিন আলী শায়বানী: مَوْلِدُ النَّبِيِّ ﷺ ‘মাওলিদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

৯৬. সাইয়েদ আবদুল কাদের ইসকান্দারানী: الْحَقَائِقُ فِي قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ ‘আল-হাক্বায়েকু ফী ক্বিরাআতি মাওলিদ্দিনাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

৯৭. মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ দিমইয়াতী: مَوْلِدُ الْعَرْبِ ‘মাওলিদুল ‘আযব’।

৯৮. শায়খ মুহাম্মদ হাশেম রেফাঈ: مَوْلِدُ النَّبِيِّ ﷺ ‘মীলাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

৯৯. শায়খ মুহাম্মদ হিশাম কাক্বানী: الْمَوْلِدُ فِي الْإِسْلَامِ بَيْنَ الْبِدْعَةِ ‘আল-মীলাদ ফীল-ইসলাম বায়নাল বেদআতি ওয়াল-ঈমান’।

১০০. সাঈদ বিন মাসউদ বিন মুহাম্মদ কাযরুনী: تَعْرِيبُ الْمُتَنَبِّي فِي سَيْرِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفِيِّ ﷺ ‘তা’রীবুল মুত্তাকা ফী সিয়্যারে মাওলিদ্দিনাবীল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’।

১০১. শায়খ মুহাম্মদ নূরী বিন ‘উমর বিন আরবী বিন আলী নববী শাফেঈ: رحمته الله ‘الْأَبْرَزُ الدَّانِي فِي مَوْلِدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعَدْنَانِي رحمته الله ফী মাওলিদি সাইয়েদিনা মুহাম্মদুল আদনানী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’

১০২. শায়খ মুহাম্মদ নূরী বিন উমর বিন আরবী বিন আলী নববী শাফেঈ: رحمته الله ‘بُغِيَّةُ الْعَوَامِ فِي شَرْحِ مَوْلِدِ سَيِّدِ الْأَنَامِ رحمته الله ‘বুগিয়াতুল আওয়াম ফী শরহি মাওলিদি সাইয়েদিনা আনাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’

১০৩. যাইনুল আবেদীন মুহাম্মদ আব্বাসী: رحمته الله ‘الْجَمْعُ الزَّاهِرُ الْمُنِيرُ فِي ذِكْرِ مَوْلِدِ رحمته الله ‘আল-জামউয যাহিরিল মুনীর ফী যিকরি মাওলিদি বাশীরিন নাযীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’

১০৪. আবু শাকের ‘আব্দুল্লাহ শালাবী: رحمته الله ‘الدَّرُّ الْمُنَظَّمُ شَرْحُ الْكَزْرِ الْمُطْلَسَمِ فِي رحمته الله ‘আদ-দুরুল মুনায্যাম শরহিল কানযিল মুতালসাম ফী মাওলিদ্ নাবীয়িল মু‘আযযাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’

১০৫. সাইফুদ্দীন আবু জা‘ফর উমর বিন আইয়ুব বিন উমর বিন হুমাইরী তুরকুমানী দামেস্কী হানাফী: رحمته الله ‘الدَّرُّ النَّظِيمُ فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ رحمته الله ‘আদ-দুরুল নাযীম ফী মাওলিদ্ নাবীয়িল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’

১০৬. আবু হাশেম মুহাম্মদ শরীফ নূরী: رحمته الله ‘إِحْرَارُ الْمَرْيَةِ فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ خَيْرِ رحمته الله ‘ইহরাযুল মাযিয়া ফী মাওলিদ্ নাবীয়ি খায়রিল বারিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’

১০৭. বদরুদ্দীন ইউসুফ মাগরিবী: رحمته الله ‘فَتْحُ الْقَدِيرِ فِي شَرْحِ مَوْلِدِ الدَّرْدِيرِ رحمته الله ‘ফাতহুল কাদীর ফী শরহে মাওলিদ্ দারদীর।’

১০৮. আবুল ফতূহ হালাবী: رحمته الله ‘الْفَوَائِدُ الْبَهِيَّةُ فِي مَوْلِدِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ رحمته الله ফাওয়াইদুল বাহিয়া ফী মাওলিদি খায়রিল বারিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’

১০৯. সুওয়াইদান আব্দুল্লাহ বিন আলী বিন দিমলীজী মিসরী: رحمته الله ‘مَطَالِعُ الْأَنْوَارِ فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ رحمته الله ‘মাতালীউল আনওয়ার ফী মাওলিদ্ নাবীয়িল মুখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’

১১০. ইবনে আলান মুহাম্মদ আলী সিদ্দীকী মক্কী: رحمته الله ‘مَوْرَدُ الصَّفَا فِي مَوْلِدِ الْمُصْطَفَى رحمته الله ‘মওরিদুস সাফা ফী মাওলিদ্ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’

১১১. সাইয়েদ মুহাম্মদ বিন খলীল আত-তারাবুলুসী, যিনি কাকূউজী নামে সুপরিচিত: رحمته الله ‘مَوْلِدُ النَّبِيِّ رحمته الله ‘মাওলিদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’

১১২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ আত্তার জাযাইরী: رحمته الله ‘أَلَوْرْدُ الْعَذْبِ الْمُبِينِ فِي مَوْلِدِ سَيِّدِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ رحمته الله ‘আল-ওয়ারদুল মুবীন ফী মাওলিদি সাইয়েদিনা খালকি আজমাঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’

১১৩. আবুল হাসান আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আল-বকরী: رحمته الله ‘كِتَابُ الْأَنْوَارِ وَمِفْتَاحُ رحمته الله ‘কিতাবুল আনওয়ার ওয়া মিফতাহুস সুরুর ওয়াল-আফকার ফী মাওলিদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’

১১৪. আহমদ বিন আলী বিন সাঈদ: رحمته الله ‘ظِلُّ الْعِمَامَةِ فِي مَوْلِدِ سَيِّدِ تَهَامَةِ رحمته الله ‘যিল্লুল গামামা ফী মাওলিদি সাইয়েদিনা তিহামা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’

১১৫. ইবনুশ শায়খ আক শামসুদ্দীন হামদুল্লাহ: رحمته الله ‘الْمَوْلِدُ الْحِسْمَانِيُّ وَالْمَوْرِدُ رحمته الله ‘আল-মাওলিদুল জিসমানী ওয়াল মাওরিদুর রহানী।’

১১৬. মুহাম্মদ বিন হাসান বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন জামাল উদ্দীন খালওয়াতী সামনুদী: **الدُّرُّ الثَّمِينُ فِي مَوْلِدِ سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ**
‘আদ-দুররুস সামীন ফী মাওলিদ সাইয়েদিল আউয়ালীন ওয়াল আখিরীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’^{৩৮৭}

উপরে ১২৫টি প্রকাশিত কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলো সবচেয়ে দয়াবান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশীর্বাদময় মীলাদ বিষয়ে রচিত; এগুলোর প্রণেতা সর্বমোট ১১৬ জন প্রসিদ্ধ ও কর্তৃত্বশীল আলেম-উলামার নামও উল্লেখিত হয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো এই যে, এখানে উদ্ধৃত বইপত্রের সংখ্যার চেয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরাধামে শুভাগমনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে লিখিত এবং মীলাদুন্নবী উদযাপনের স্মৃতিচারণমূলক বইপত্রের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। উর্দু, পাঞ্জাবি, সিন্ধী, বালুচি, পশতু, সারাইকি, হিন্দী, পারসিক ও ইংরেজির মতো নানা ভাষায় অসংখ্য বইপত্র সর্বত্র ও অনায়াসে খুঁজে পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ মুসলমান সম্প্রদায় যেসব রাজ্যে বসবাস করেন, সেখানে প্রতিটি ভাষায়ই এ ধরনের বই পাওয়া যাবে।

আমরা এসব বর্ণনা থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, সর্বাধিক করুণাশীল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধরণীতলে শুভাগমন (দিবস) উদযাপন, তাঁর আশীর্বাদময় বেলাদতকালীন ঘটনাবলী বর্ণনা, তাঁর জীবনী হতে বিবরণের উল্লেখ, আর তাঁরই প্রশংসায় না’ত পেশ করাটা এমন

৩৮৭. মাওলিদ-বিষয়ক পুস্তকের এই তালিকা প্রস্তুতকালে নিম্নবর্ণিত রেফারেন্সগুলোও প্রদত্ত হয়:

ক) ইবনে নাদীম, ‘আল-ফিহরিস্ত’;

খ) হা’জী খলীফা, ‘কাশফ আল-যুনুন ‘আন উসা’মী আল-কুতুব ওয়াল-ফুনুন’;

গ) বা’বানী, ‘হাদএয়া আল-আরেফীন’;

ঘ) এডওয়ার্ড ভ্যান ডাইক, ‘একতেফা’ আল-কানু বিমা’ হওয়া মাতবু’;

ঙ) আল-খাওয়ারিযমী, ‘মাফা’তীহ আল-উলুম’;

চ) বা’শা’ আল-বাগদাদী, ‘এদা’হ আল-মাকনুন’;

ছ) আবদ আল-হাই আল-কিত্তানী, ‘ফাহরাস আল-ফাহারিস ওয়াল-আসবাত ওয়া মু’জাম আল-মা’আজিম ওয়াল-মাসীখাত ওয়াল-মুসালসালাত’;

জ) ইলএয়া’ন সারকীস, ‘মু’জাম আল-মাতবু’আত আল-আরাবিয়া ওয়াল-মু’আরবা’;

ঝ) আল-কানুজী, ‘আবজাদ আল-উলুম আল-ওয়াশী আল-মারকুম ফী বয়া’নে আহওয়াল আল-উলুম’;

ঞ) আল-কিত্তানী, ‘আল-রিসালা আল-মুসতাতরিফা লি বয়া’নে মাশুর কুতুব আল-সুন্নাহ আল-মুশারীফা।’

কোনো বিষয় নয় যা সমসাময়িককালের মুসলমানবৃন্দ প্রবর্তন বা চালু করেছেন, অথবা নিকট-অতীতের বিশেষ একটি এলাকাধীন নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ প্রচলন করেছেন; বরঞ্চ তা সারা বিশ্বব্যাপী মুসলমানবৃন্দ নিয়মিত অনুশীলন করে আসছেন বিরতিহীনভাবে।

মাওলিদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদাসর্বদাই এমন একটি মাধ্যম হিসেবে খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে, যা দ্বারা মুসলমান সমাজ নিজেদের পরিচয় সম্পর্কে সাংস্কৃতিকভাবে সচেতন হচ্ছেন। এর উদযাপন দ্বারা তাঁরা নিজেদের ঈমান-আক্বীদাকে পুনরুজ্জীবিত করছেন। আল্লাহ মাফ করুন, মাওলিদ যদি মন্দ বেদআত (নতুন উদ্ভাবন) হতো, যেমনটি কিছু লোক অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে, তাহলে যৌক্তিকভাবে প্রশ্ন ওঠে কেন এতোজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ইমাম ও দক্ষ আলেম এই তথাকথিত বিধর্মী প্রথায় অংশগ্রহণের ফাঁদে পা দিয়েছেন? আর কেনইবা এর সপক্ষে এমন দালিলিক প্রমাণভিত্তিক লেখনীও উপস্থাপন করেছেন?

যেসব লোক এই আশীর্বাদময় (মীলাদুন্নবীর) উদ্যোগের সমালোচনা করে এর বিরোধিতা করে থাকে, তারা তা করে থাকে নিজেদের মনগড়া মতবাদের ভিত্তিতেই; তাদের নিজেদেরই ব্যক্তিগত পক্ষপাতের কারণে। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে এসব লোক সবচেয়ে সদাশয় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে অন্যান্যদেরকেও দূরে সরিয়ে দেয়, যা দ্বারা তাঁর পবিত্র সত্তা মোবারকের সাথে প্রত্যেকের (আত্মিক) আবেগময় সংশ্লিষ্টতার অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে খাটো করা হয়। (আল্লাহ তা‘আলার) একত্ববাদের ব্যাপারে নিজেদের ভ্রান্তিপূর্ণ আচ্ছন্নতার দরুন তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে আশীর্বাদ ও কল্যাণ অর্জনে অন্যদেরকে বাধাগ্রস্ত করে; নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামবৃন্দের কাছ থেকে মানুষকে ফেরানোটা যুগে যুগে শয়তানেরই (মন্দ) বৈশিষ্ট্য তথা চিহ্ন বটে। মীলাদ উদযাপনের সময় অশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ভ্রান্ত প্রথার অনুশীলন অবশ্যই দূর করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে মাওলিদকে চূড়ান্তভাবে নাকচ করা চলবে না, অথবা না-জায়েযও ঘোষণা করা যাবে না। অধিকন্তু, এর অনুশীলনকারীদেরকে ‘শিরক’ ও ‘বেদআত’ সংঘটনকারী বলার মতো মানহানিকর কথাও অবশ্যাবশ্য পরিহার করতে হবে।

সপ্তম অধ্যায়

যে কারণে প্রথম মুসলমান প্রজন্ম মীলাদ পালন করেননি

আল্লাহ তা'লার প্রিয় মাহবুব (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমন দিবস (মীলাদ) উপলক্ষে খুশি প্রকাশ করা এবং এই দিনটির উদযাপনে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা একজন ঈমানদার মুসলমানের জন্যে সর্বোচ্চ সম্মানের ব্যাপার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন কিছু লোক আছে যারা মীলাদ'কে শরীয়তবিরোধী বিবেচনা করে এবং তা ঘোষণাও করে থাকে। তাদের এই ধারণার সমর্থনে তারা অপযুক্তি পেশ করে যে মহান সাহাবা-এ কেরাম (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)-এর যুগে কোনো মীলাদ উদযাপনের রীতি চালু ছিলো না; বরঞ্চ এটা বহু প্রজন্ম পরে অস্তিত্ব পেয়েছে। তাই এ ব্যাপারে নিচে অনুসন্ধান চালানো হবে এই মর্মে যে, সবচেয়ে সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেসাল শরীফ (পরলোকে খোদার সাথে মিলনপ্রাপ্তি)-এর পরে মহান সাহাবা-এ কেরাম (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) কেন মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদযাপনের প্রথা হিসেবে গ্রহণ করেননি। এর কারণগুলো ওই সময়কার প্রেক্ষাপট ও ঘটনাবলীকে বিবেচনায় নিয়েই ব্যাখ্যা করা হবে।

৭.১ আসহাব (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)-বৃন্দের জন্যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বেসাল শরীফ ছিল চরম বেদনাময়

সারা জাহানের জন্যে খোদা তা'আলার করুণা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধরণীতলে আশীর্বাদময় শুভাগমন মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে দুনিয়ার সমস্ত আনন্দ-ফুর্তি ও সুখ-শান্তির চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। মুসলমান প্রথম প্রজন্মের জন্যে আম/সাধারণভাবে এবং আশীর্বাদধন্য সাহাবা-এ কেরাম (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)-এর জন্যে খাস/বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর এই নশ্বর পৃথিবীতে শুভাগমনের মতো গুরুত্বপূর্ণ আর কী হতে পারতো? এই সর্বশ্রেষ্ঠ নেআমত (খোদায়ী অনুগ্রহ/দান) সম্পর্কে মহান সাহাবাবৃন্দের (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) চেয়ে বেশি আর কে মূল্যায়ন করতে পারতেন? সাহাবা-এ কেরাম (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)'এর অনুভূত

অপরিমাপযোগ্য খুশি ও সুখ আজকের মুসলমান সমাজ এমন কী অনুধাবন করতেও একদম অক্ষম।

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র বেসাল শরীফের পরে সাহাবা-মণ্ডলী (রাঃদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুম) যদি ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মীলাদ উদযাপন না করে থাকেন, তবে তার পেছনে একটি ঐকান্তিক কারণ ছিলো। এটা সবার জানা যে তাঁর বেলাদত শরীফের তারিখ আবার তাঁর বেসাল শরীফেরও তারিখ। রবীউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ এলে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র জিসমানী পর্দা করায় ভগ্নহৃদয় সাহাবাবৃন্দকে (রাঃদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুম) দিনটি তাঁর বেসাল শরীফের কথাও স্মরণ করিয়ে দিতো; আর এরই ফলশ্রুতিতে খুশি ও সুখের যে-কোনো অনুভূতির ওপর দুঃখ-বেদনার অনুভূতি আধিপত্য বিস্তার করতো। আশীর্বাদধন্য সাহাবাবৃন্দ (রাঃদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুম) প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র সাথে (সোহবতে) কাটানো তাঁদের সময়গুলোর কথা স্মরণ করতেন এবং এর সাথে সাথে তাঁর বেসাল শরীফের কথাও তাঁদের মনে পড়ে যেতো; যার দরুন তাঁদের মাঝে আনন্দ ও বেদনার এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিতো। তাই তাঁরা তাঁর বেসাল শরীফের প্রতি দুঃখভার ও শোকের অনুভূতি ব্যক্ত করতেন।

৭.১.১ দুঃখের সময় প্রকাশ্যে আনন্দ উদযাপনের অনুমতি দেয় না মানব-স্বভাব

নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা আমাদের বলে যে কেউ যখন-ই ইন্তেকাল করেন, তৎক্ষণাৎ শোকের অনুভূতি দেখা দেয়। এ রকম শোক-সন্তপ্ত পরিবারে যদি কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজনের পূর্ব-নির্ধারিত কর্মসূচি থাকতো, তাহলে নিশ্চিতভাবে তা বাতিল করা হতো। আর তারিখ যদি পেছানোই না যেতো, তাহলে মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে বিয়ের আয়োজন সবচেয়ে অনাড়ম্বর পন্থায় করা হতো।

অতঃপর একই পরিবারে পাঁচ বা দশ বছর পরে যদি কোনো বিয়ের আয়োজন চলে, তাহলে তা প্রচলিত প্রথা ও সংস্কৃতি অনুসারে মহা ধুমধামের সাথে সম্পন্ন হবে। ওই বিয়েতে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে তাঁদের

মরহুম আত্মীয়ের ইন্তেকালের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের অভিযোগ কেউই তাঁদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করবেন না। এটা এ কারণে যে (ওই রকম পরিস্থিতিতে) মানুষের মনের ওপর দুঃখ-বেদনার অনুভূতি প্রাকৃতিকভাবেই প্রাধান্য বিস্তার করে; আর সময় অতিক্রান্ত হলে শোকের প্রভাব ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় এবং দুঃখের ঘটনা যেতাই বিয়োগান্ত হোক না কেন, তা অতীতে পরিণত হয়।

৭.২ প্রথম প্রজন্মের খুশি প্রকাশে এই মহাশোক ছিলো বড় বাধা

মানবপ্রকৃতি অনুযায়ী মাহবুব (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘এর পর্দা করার শোক মহান সাহাবাবৃন্দের (রাঃদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুম) ওপর ভারী প্রভাব ফেলেছিলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেলাদত ও বেসাল শরীফ একই দিনে হওয়ার কারণে সাহাবা-এ কেরাম (রাঃদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুম)‘এর অনুভূত শোক খুশির অনুভূতির তুলনায় বেশি ছিলো। সাহাবা-মণ্ডলী (রাঃদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুম) ছিলেন নিঃস্বার্থপরতা ও ত্যাগের জীবন্ত দৃষ্টান্ত/প্রতীক। তাঁরা মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র ভ্রুকুণ্ঠনেও নিজেদের জীবন খুশি মনে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর প্রতি তাঁদের গভীর ভালোবাসা-ই ছিলো তাঁদের মধ্যকার ঈমানের প্রধানতম মাপকাঠি।

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র বেসাল শরীফের মতো এতোটা আঘাত আর কোনো কিছুতে সাহাবাবৃন্দ (রাঃদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুম) পাননি। এই সংবাদে তাঁরা একেবারেই হতবিহ্বল হয়ে পড়েন; তাঁদের দুনিয়া যেনো ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে এমনটা-ই তাঁরা অনুভব করেছিলেন। এই ভক্ত-অনুরক্ত খেদমতগারবৃন্দ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র বেসালপ্রাপ্তির সংবাদটি কীভাবে নিয়েছিলেন, তা কল্পনা করাটাও প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাঁরা এক মুহূর্তের তরেও তাঁর (সোহবত হতে) বিচ্ছেদকে পছন্দ করতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই নশ্বর জগৎ ত্যাগ করেন, তখন এমন কী সিংহ-হৃদয়ের হযরত উমর ফারুক রাঃদিয়াল্লাহু আনহু-ও নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি; এমতাবস্থায় অন্যান্য সাহাবা-মণ্ডলী

(রাঈয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুম) কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, তা ভাবটা বেশ কঠিন।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র আহলে বায়ত (রাঈয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুম) ও আসহাব (রাঈয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুম)’এর জন্যে এই সংবাদটি ছিলো চরম আঘাত; কেননা তাতে বোঝা গিয়েছিলো তাঁদের মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেসালপ্রাপ্ত হয়েছেন; এটা তাঁদের কাছে মোটেও সহনীয় ছিলো না। তাই তাঁদের ওই প্রতিক্রিয়া ছিলো স্বাভাবিক। কেননা তাঁরা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র সাথে থাকার জন্যে নিজেদের দেশ, পরিবার ও মালামাল, বস্তুতঃ সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। অতএব, মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আর তাঁদের পাশে নেই, এমন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার কথা তাঁরা ইতিপূর্বে ভাবেননি। এটা তাঁদের কাছে কল্পনারও অতীত ছিলো। নিচের অনুচ্ছেদে মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র বেসাল শরীফের সংবাদে সাহাবা-একেরাম (রাঈয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুম)’এর আবেগময় প্রতিক্রিয়া এক নজরে আলোকপাত করা হবে:

৭.২.১ মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বিচ্ছেদ হযরত আবু বকর (রাঈয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু)-এর বেসালের কারণ

মহাসম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর বেসাল শরীফের পরে আশেক-ভক্তবৃন্দের শিরোমণি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঈয়াল্লাহু আনহু) শোকে মূহ্যমান হন। প্রতিনিয়ত প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র স্মরণ অবশেষে তাঁরও বেসালের কারণ হয়। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঈয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন:

كَانَ سَبَبُ مَوْتِ أَبِي بَكْرٍ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ جِسْمُهُ يَجْرِي حَتَّى مَاتَ.

—হযরত আবু বকর (রাঈয়াল্লাহু আনহু)’এর বেসাল শরীফ মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র বেসাল শরীফের (দুঃখের) কারণে ঘটেছিলো। তাঁর জিসম মোবারক ক্ষীণকায় হতে হতে তাঁরই বেসালে উপনীত হয়।^{৩৮৮}

যিয়া‘দ বিন হানযালা বর্ণনা করেন:

كَانَ سَبَبُ مَوْتِ أَبِي بَكْرٍ الْكَمَدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—হযরত আবু বকর (রাঈয়াল্লাহু আনহু)’এর বেসাল শরীফ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ের প্রতি তাঁরই শোকের কারণে ঘটেছিলো।^{৩৮৯}

৭.২.২ মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বেসালে হযরত উমর (রাঈয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু)-এর প্রতিক্রিয়া

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র বেসাল শরীফের সংবাদ হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঈয়াল্লাহু আনহু)’র মতো তেজস্বী, সাহসী ও বীরপুরুষের ব্যক্তিত্বের জন্যেও এক বড় আঘাত হিসেবে এসেছিলো। তিনি নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম ছিলেন এবং অতি শোকে মূহ্যমান হয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, “যে ব্যক্তি বলবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেসালপ্রাপ্ত হয়েছেন, তার গর্দান আমি কেটে নেবো” [আল-তাবারী কৃত ‘তারীখ আল-উমাম ওয়াল-মুলুক’, ২:২৩৩]। তাঁর এই প্রতিক্রিয়া জীবনী ও ইতিহাস পুস্তকগুলোতে লিপিবদ্ধ হয়েছে:

৩৮৮. আল-হাকিম কৃত ‘আল-মুস্তাদরাক’, ৩:৬৩-৬৪ #৪৪১০; ইবনে আল-জাওয়ী প্রণীত ‘সাকফওয়া আল-সাকফওয়া’, ১:২৬৩; এবং আল-সৈয়ুতী রচিত ‘মুসনাদ আবী বকর আল-সিদ্দীক’, ১৯৮ পৃষ্ঠা #৬৩১।

৩৮৯. আল-হাকিম কৃত ‘আল-মুস্তাদরাক’, ৩:৬৩-৬৪ #৪৪১০; ইবনে আল-জাওয়ী প্রণীত ‘সাকফওয়া আল-সাকফওয়া’, ১:২৬৩; এবং আল-সৈয়ুতী রচিত ‘মুসনাদ আবী বকর আল-সিদ্দীক’, ১৯৮ পৃষ্ঠা #৬৩১; আল-সৈয়ুতী লিখিত ‘মুসনাদ আবী বকর আল-সিদ্দীক’, ১৯৮ পৃষ্ঠা #৬৩২

إِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُتَافِقِينَ يَزْعُمُونَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَدْ تُوفِّيَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) مَا مَاتَ، وَلَكِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى رَبِّهِ كَمَا ذَهَبَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ، فَقَدْ غَابَ عَنِ قَوْمِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ قِيلَ: مَاتَ، وَوَاللَّهِ! لَيَرْجِعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ (ص) كَمَا رَجَعَ مُوسَى، فَلْيَقْطَعَنَّ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ زَعْمُوا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) مَاتَ .

অর্থ: মোনাফেক-বর্গ ধারণা করে যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অতিক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু বেসালপ্রাপ্ত হননি; বরং তিনি তাঁর প্রভুর কাছে গমন করেছেন যেমনিভাবে পয়গম্বর মূসা ইবনে ইমরান (আলাইহিস্ সালাম) নিজ প্রভুর কাছে গিয়েছিলেন। তিনি (মূসা আলাইহিস্ সালাম) আপন জাতির মাঝে চল্লিশ রাত অনুপস্থিত ছিলেন; আর যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করেন ততোক্ষণে তাঁর বেসালের খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো। আল্লাহর শপথ! মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিশ্চয় পয়গম্বর মূসা (আলাইহিস্ সালাম)’র মতোই প্রত্যাবর্তন করবেন। এরপর তিনি অবশ্যাবশ্য সেসব লোকের হাত-পা কেটে নেবেন, যারা এমন কী তাঁর বেসাল হয়েছে মর্মে ধারণাটাও অন্তরে লালন করেছে।^{৩৯০}

যদিও মানুষ বলতে পারে যে হযরত উমর ফারুক (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু)’র প্রতিক্রিয়া ছিলো প্রবল, তবুও তা অস্বাভাবিক ছিলো এমন কথা কেউই বলতে পারবেন না। কারো প্রিয়ভাজন ব্যক্তির ইন্তেকাল হলে তিনি মহা শোকে কাতর হতে পারেন এবং অনুরূপ উপায়ে প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করতে পারেন।

৩৯০. ইবনে এসহাক কর্তৃক ‘আল-সীরাতে আল-নববীয়া’ গ্রন্থে বর্ণিত, ৭১৩ পৃষ্ঠা; ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রণীত ‘আল-মুসনাদ’, ৩:১৯৬ #১৩,০৫১; ইবনে হিব্বান কৃত ‘আল-সহীহ’, ১৪:৫৮৮ #৬৬২০; ইবনে হিশাম রচিত ‘আল-সীরাতে আল-নববীয়া’, ১১৩৪ পৃষ্ঠা; ইবনে সাআদ লিখিত ‘আল-তাবাকাত’ আল-কুবরা’, ২:২৭০; ইবনে আসীর প্রণীত ‘আল-কামিল ফীল-তারীখ’, ২:১৮৭; আল-সুহায়লী কৃত ‘আল-রাওদ আল-উনুফ ফী তাফসীরিল সীরাতে আল-নববীয়া লি-ইবনে হিশাম’, ৪:৪৪৩; এবং আল-সৈয়ুতী রচিত ‘আল-দুরুল মানসূর ফীল-তাফসীরে বিল-মা’সূর’, ২:৩৭৭

হযরত উমর ফারুক (রাঃদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু)’এর খেলাফত আমলে তিনি রাষ্ট্রের নাগরিকদের কল্যাণ ও সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতে মদীনা মোনাওয়ারা’র রাস্তাগুলোতে রাতে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁদের ভালাইয়ের ব্যাপারে শেষ বিচার দিবসে খলীফার দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার গভীর এক উপলব্ধি হতে তিনি এই কাজটি করতেন। যায়দ বিন আসলাম বর্ণনা করেন: (এমনি) এক রাতে যখন খলীফা তাঁর জাতির ভালো-মন্দ যাচাইয়ের জন্যে রাস্তায় বের হন, তখন তিনি একটি বাড়িতে প্রদীপের আলো জ্বলতে দেখেন। এক বৃদ্ধা পশমের সুতো কাটছিলেন; তিনি প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র স্মৃতিচারণে নিজেকে হারিয়ে ফেলছিলেন নিচের পংক্তিগুলো আবৃত্তি করে:

عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاحُ الْأَبْرَارِ
صَلَّ عَلَيْكَ الْمُصْطَفُونَ الْأَخْيَارُ
قَدْ كُنْتَ قَوَّامًا بِكَيْيَ الْأُسْحَرِ
يَا لَيْتَ شَعْرِي وَالْمَنَايَا أَطْوَارُ
هَلْ تَجْمَعُنِي وَحَبِيبِي الدَّارُ

প্রিয়নবীর প্রতি পুণ্যআবুন্দের আশীর্বাদ হোক বর্ষিত
মনোনীত বান্দাবৃন্দ আপনার প্রতি সালাওয়াত করেন প্রেরিত
আপনি শেষ রাতে এবাদতে ছিলেন সদা ব্রত, হয়ে ক্রন্দনরত
হায়, বেসাল যবে আমাদের দেয় ভিন্ন আকৃতি যতো
তবে কি তা প্রেমাস্পদের সাথে করবে আমায় মিলিত?^{৩৯১}

এই ছত্রগুলো শুনে সাহসী হযরত উমর ফারুক (রাঃদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) বিগলিত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন; আর মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র সমস্ত স্মৃতি বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মতো

৩৯১. ইবনে আল-মোবারক, ‘আল-যুহদ, ৩৬২-৩৬৩ পৃষ্ঠা #১০২৪; কাজী আয়ায, ‘আল-শিফা বি-তারিফ হুকুক আল-মোস্তফা’, ২:৫৬৯; এবং মোল্লা আলী ক্বারী, ‘শরহ আল-শেফা’, ২:৪২-৪৩।

তাঁর মানসপটে ফিরে আসে। ‘আমীর আল-মো’মেনীন ফীল-হাদিস’ শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (১১৮-১৮১ হিজরী) যিনি ইমাম আল-আযম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিজরী)’র ছাত্র ও ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিজরী)’র শিক্ষক ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন:

فَجَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى قَرَعَ الْبَابَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟
قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَقَالَتْ: مَا لِي وَلِعُمَرَ؟ وَمَا يَأْتِي بِعُمَرَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟
فَقَالَ: اِفْتَحِي، رَحِمَكَ اللَّهُ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ، فَفَتَحَتْ لَهُ، فَدَخَلَ. وَقَالَ: رُدِّي
عَلَيَّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي قُلْتِ آنفًا، فَرَدَّتْهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغَتْ آخِرَهُ، قَالَ: أَسْأَلُكَ أَنْ
تُدْخِلَنِي مَعَكُمْ. قَالَتْ: وَعُمَرُ، فَاغْفِرْ لَهُ يَا غَفَّارُ. فَرَضِيَ عُمَرُ وَرَجَعَ.

-(এ ছত্র শোনার পর) হযরত উমর (রাঃ) আল্লাহ তা‘আলা আনহু বসে অবিরত কাঁদতে থাকেন যতোক্ষণ না তিনি ওই বৃদ্ধার দরজায় টোকা দেন। মহিলা জিজ্ঞেস করেন, ‘কে?’ তিনি উত্তর দেন, ‘আমি উমর বিন খাত্তাব।’ মহিলা আবার জিজ্ঞেস করেন, ‘আমার সাথে উমরের কী ব্যাপার?’ কোন্ বিষয়টি তাঁকে এই সময়ে এখানে নিয়ে এসেছে?’ তিনি উত্তর দেন, ‘আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন। অনুগ্রহ করে দরজা খুলুন। দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।’ এমতাবস্থায় ওই বৃদ্ধা খলীফা’কে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেন। তিনি বাড়িতে প্রবেশ করে বলেন, ‘আপনি কবিতার যে চরণগুলো এই মাত্র আবৃত্তি করেছেন, তা দয়া করে আরেকবার আমায় শোনান।’ বৃদ্ধা কবিতাটি আবার আবৃত্তি করেন এবং যখন তিনি ওর শেষ পর্যায়ে উপনীত হন, তখন খলীফা উমর ফারুক (রাঃ) আল্লাহ তা‘আলা আনহু) অনুরোধ করেন, ‘আমি আপনার কাছে আরজ করি যাতে আপনি আমাকেও আপনাদের দু জনের (বৃদ্ধা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেন।’ অতঃপর ওই মহিলা দোয়া করেন, ‘উমরকেও (অন্তর্ভুক্ত করুন)। তাঁকে ক্ষমা করুন, হে ক্ষমাশীল (খোদা)!’ এতে খলীফা খুব খুশি হন এবং বাড়ি ফিরে যান।^{৩৯২}

৩৯২. ইবনে আল-মোবারক, ‘আল-যুহদ’, ৩৬২-৩৬৩ পৃষ্ঠা #১০২৪; এবং খিফাজী, ‘নাসীম আল-রিয়াদ ফী শরহে শিফা আল-কাজী আযায়’, ৪:৪২৮-৪২৯।

কাজী সুলায়মান মানসূরপুরী’র ভাষ্য মোতাবেক খলীফা উমর ফারুক (রাঃ) আল্লাহ তা‘আলা আনহু) এই ঘটনার পর অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হন এবং বেশ কিছু দিন সাহাবা-এ কেরাম (রাঃ) আল্লাহ তা‘আলা আনহু) তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নিতে তাঁকে দেখতে যান।^{৩৯৩}

৭.২.৩ হযরত ফাতেমাতুয্ যাহরা (রাঃ) আল্লাহ তা‘আলা আনহু)-এর শোক

বেহেশতী নারীবৃন্দের নেত্রী সাইয়েদা ফাতিমা আল-যাহরা (রাঃ) আল্লাহ তা‘আলা আনহু) প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’র স্নেহধন্য কন্যা হওয়ার চিরসম্মান লাভ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং হৃয়ুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ‘তাঁরই অংশ’ বলে ঘোষণা করেছিলেন [মিসওয়ার বিন মাখারামা বর্ণনা করেন যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ ফরমান: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ]

مِّنِّي অর্থাৎ, ফাতিমা আমারই অংশ^{৩৯৪}]। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’র বেসাল শরীফের দরুন সাইয়েদা ফাতিমা রাঃ আল্লাহ তা‘আলা আনহু) কর্তৃক অনুভূত অবর্ণনীয় শোক ও বিষন্নতার কথা ইতিহাস পুস্তকসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মহাসম্মানিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর বেসাল শরীফের পরে তাঁর পরিবারের মধ্যে সাইয়েদা ফাতিমা আল-যাহরা রাঃ আল্লাহ তা‘আলা আনহু)-ই প্রথম জন যিনি নশ্বর জগৎ ত্যাগ করেন, ঠিক যেমনটি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তবে এর সময়কাল সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে: কতিপয়

৩৯৩. মানসূরপুরী, ‘রাহমাতুল লিল-আলামীন’, ২:৩৪৩।

৩৯৪. সহীহ বুখারী, কিতাব আল-মানাকিব, ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আত্মীয়-স্বজনের উন্নত বৈশিষ্ট্যাবলী’ অধ্যায়, ৩:১৩৬১ #৩৫১০; সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ‘ফাতিমা রাঃ আল্লাহ তা‘আলা আনহু’র দৃষ্টান্তমূলক বৈশিষ্ট্য অধ্যায়’, ৩:১৩৪৬ #৩৫৫৬; এবং সহীহ মুসলিম, ‘কিতাব ফাযাইল আল-সাহাবা’, ‘রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর কন্যা ফাতিমা রাঃ আল্লাহ তা‘আলা আনহু) অধ্যায়, ৪:১৯০৩ #২৪৪৯।

ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেছেন যে ছয় মাসের পাকের (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেসালের আট মাস পরে তিনি বেসালপ্রাপ্ত হন; অন্যান্যরা বলেন এক শ দিনের মাথায় তা ঘটেছিলো; আবার এমনও ইতিহাসবিদ আছেন যাঁরা ওই সময়কাল সত্তর দিন বলে উল্লেখ করেন। তবে সবচেয়ে সঠিক মত হলো ছয় মাস। এগারো হিজরী সালের ৩ রা রমজান তারিখে তিনি যখন বেসালপ্রাপ্ত হন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ২৯ বছর। এতো কম বয়সে বেসালপ্রাপ্তির কারণ হলো, তিনি বিয়োগ-বেদনা ও শোক সহ্য করতে পারেননি। তিনি সব সময়ই ছিলেন শোকে মুহ্যমান এবং মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বেসাল শরীফের পরে কখনোই হেসেছেন বলে জানা যায়নি।^{৩৯৫}

সহীহ আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিজরী) হাদীসগ্রন্থে হযরত আনাস (রাঃরাঃরাঃ আনহু) বর্ণনা করেন যে হযরত সাইয়েদাহ ফাতিমা (রাঃরাঃরাঃ আনহা) তাঁর পিতৃশোকে এতোই কাতর ছিলেন যে তিনি সর্বদা কেঁদে ফরিয়াদ করতেন:

يَا أَبَتَاهُ! أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ
يَا أَبَتَاهُ! مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَا وَاهُ

يَا أَبَتَاهُ! إِلَى جَبْرِئِلَ نُنْعَاهُ

হে পিতা! আপনি খোদার কাছে প্রত্যাবর্তনের জন্যে তাঁরই ডাকে দিয়েছেন সাড়া,
হে পিতা! আপনি করছেন বসবাস জান্নাতুল ফেরদৌসে, যা মর্যাদায় সেরা,
হে পিতা! আমি জিবরীলের শোনার জন্যে করেছি ব্যক্ত এই শোক, হয়ে পিতৃহারা।^{৩৯৬} (ভাবানুবাদ)

৩৯৫. দূলাবী, 'আল-দুরিয়া আল-তাহিরা', ১১১ পৃষ্ঠা, #২১২; মুহিব্ব আল-তবারী, 'দাখায়র আল-উকুবা ফী মানাক্বিবে দাউয়ী আল-কুরবা', ১০৩ পৃষ্ঠা; ইবনে আসীর, 'আসাদ আল-গাবা ফী মা'রেফাতে আল-সাহাবা', ৭:২২১; এবং ইবনে রজব হাম্বলী, 'লাতায়ফ আল-মা'আরিফ ফীমা লি-মাওয়াসিম আল-আম মিন আল-ওয়ায়ায়েফ', ২১৪ পৃষ্ঠা।

৩৯৬. সহীহ আল-বুখারী, 'কিতাব আল-মাগাযী', 'প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র শেষ অসুখ ও বেসাল শরীফ' অধ্যায়, ৪:১৬১৯ #৪১৯৩; আহমদ ইবনে হাম্বল, 'আল-মুসনাদ', ৩:১৯৭ #১৩,০৫৪; আল-দারিমী, 'আল-সুনান', ১:৪১ #৮৮;

ইমাম ইবনে মা'জাহ (২০৯-২৭৩ হিজরী) প্রণীত 'সুনান' পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে যে সাইয়েদাহ ফাতিমা (রাঃরাঃরাঃ আনহা) নিচের ছত্রগুলো পাঠ করেছিলেন:

وَأَبَتَاهُ! إِلَى جَبْرِئِلَ أَنْعَاهُ

وَأَبَتَاهُ! مِنْ رَبِّهِ مَا أَذْنَاهُ

وَأَبَتَاهُ! جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَا وَاهُ

وَأَبَتَاهُ! أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ

হে পিতা! মোর এই শোকগাথা জিবরীলকে করাতে চাই শ্রবণ,
হে পিতা! আপনি প্রভু খোদা তা'আলার (সবচেয়ে) নৈকট্যপ্রাপ্ত জন,
হে পিতা! জান্নাতুল ফেরদৌসে করেছেন আপনি বসতি স্থাপন,
হে পিতা! আপনি খোদার (কাছে ফিরে তাঁরই) আঞ্জা করেছেন পালন।^{৩৯৭}
(ভাবানুবাদ)

ইমাম বুখারী (রাঃরাঃরাঃ আলাইহি) 'সহীহ' পুস্তকে বিবৃত হয়েছে যে মহান সাহাবা-এ কেরাম (রাঃরাঃরাঃ আনহুম) যখন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র দাফনকার্য শেষ করে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন সাইয়েদাহ ফাতিমা (রাঃরাঃরাঃ আনহা) চরম বিষাদভরা অন্তরে তাঁদেরকে বলেন:

يَا أَنَسُ، أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا التُّرَابَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ.

আল-তাবারানী, 'আল-মু'জাম আল-কবীর', ২২:৪১৬ #১০২৯; এবং ইবনে কাসীর, 'আল-বেদায়া ওয়াল-নেহায়া', ৪:২৫৪।

৩৯৭. ইবনে মা'জাহ, 'আল-সুনান': 'কিতাব আল-জানায়েয', 'মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বেসাল ও জানাযা সম্পর্কিত আলোচনা' অধ্যায়, ২:১০৩ #১৬৩০; আল-নাসাঈ, 'আল-সুনান': 'কিতাব আল-জানায়েয', 'ইন্তেকালপ্রাপ্তদের উদ্দেশ্যে ক্রন্দন' অধ্যায়, ৪:১২ #১৮৪৪; ইবনে হিব্বান, 'আল-সহীহ', ১৪:৫৯১-৫৯২ #৬৬২২; আল-হাকিম, 'আল-মুত্তাদারাক', ১:৫৩৭ #১৪০৮; প্রাগুক্ত, ৩:৬১ #৪৩৯৬; ইবনে সাআদ, 'আল-তাবাকাত আল-কুবরা', ২:৩১১; আল-যাহাবী, 'তারীখ আল-ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াত আল-মাশাহীর ওয়াল-'আলাম' (আল-সীরাত আল-নববীয়া), ১:৫৬২।

অর্থ: ওহে আনাস (রাঃরাঃরাঃ আনহু)! আপনারা কীভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র ওপর বালু স্থাপনের দ্বারা তাঁকে দাফনের বিষয়টি সহ্য করতে পারলেন? ৩৯৮

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিজরী) নিজ ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে সাইয়েদাহ ফাতিমা (রাঃরাঃরাঃ আনহা) হযরত আনাস (রাঃরাঃরাঃ আনহু)‘কে বলেন:

يَا أُنْسُ، أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ دَفَنْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ فِي التُّرَابِ وَرَجَعْتُمْ .

অর্থ: ওহে আনাস (রাঃরাঃরাঃ আনহু)! আপনারা কীভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘কে মাটিতে দাফনের বিষয়টি সহ্য করতে পারলেন আর (এভাবে তাঁকে রেখে) নিজেরা ফিরে আসতে পারলেন? ৩৯৯

ইমাম তাবারানী (২৬০-৩৬০ হিজরী) তাঁর ‘আল-মু‘জাম আল-কবীর’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন:

فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ قَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِّي (رضى الله عنه): يَا أَبَا الْحَسَنِ! دَفَنْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ فَاطِمَةُ (رضى الله عنها): كَيْفَ طَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْتُوا التُّرَابَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَمَا كَانَ فِي صُدُورِكُمْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمَةُ؟

৩৯৮. আল-বুখারী কর্তৃক নিজ সহীহ পুস্তকে বর্ণিত: ‘কিতাব আল-মাগাযী’, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র শেষ অসুখ ও তাঁর বেসাল শরীফ’, ৪:১৬১৯ #৪১৯৩; আবু এয়ালা, ‘আল-মুসনাদ’, ১:৪০২ #১৩৬৪; আবদ বিন হামিদ, ‘আল-মুসনাদ’, ১:৪০২ #১৩৬৪; আল-হাকিম, ‘আল-মুস্তাদরাক’, ১:৫৩৭ #১৪০৮; আল-তাবারানী, ‘আল-মু‘জাম আল-কবীর’, ২২:৪১৬ #১০২৯; এবং আল-বায়হাকী, ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৩:৪০৯ #৬৫১৯।

৩৯৯. আহমদ ইবনে হাম্বল, ‘আল-মুসনাদ’, ৩:২০৪ #১৩,১৩৯; ইবনে কাসীর, আল-বেদায়া ওয়াল-নেহায়া’, ৪:২৫৪; এবং আল-হালাবী, ‘ইনসান আল-উয়ুন ফী সীরাতিল আমীন আল-মা‘মুন’, ৩:৪৯৩; হাম্মাদ বর্ণনা করেন যে হযরত আনাস (রাঃরাঃরাঃ আনহু)‘এর শিষ্য ও বিখ্যাত তাবঈ হযরত সাবেত আল-বুনানী (রাঃরাঃরাঃ আনহু) যখন এই রওয়য়াত বর্ণনা করতেন, তখন তিনি এতো কাঁদতেন যে তাঁর পাঁজর বেরিয়ে আসতো। এটা ইবনে আল-জাওযী কর্তৃক ‘আল-ওয়াফা বি-আহওয়ালিল মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)’ পুস্তকেও বর্ণিত হয়েছে (৪:৭৯)।

أَمَا كَانَ مُعَلِّمَ الْحَيِّ؟ قَالَ: بَلَى، يَا فَاطِمَةُ! وَلَكِنَّ أَمَرَ اللَّهِ الَّذِي لَا مَرَدَّ لَهُ. فَجَعَلْتُ تَبْكِي وَتَنْدُبُ، وَهِيَ تَقُولُ: يَا أَبَتَاهُ! الْآنَ انْقَطَعَ جَبْرِئِلُ (عليه السلام)، وَكَانَ جَبْرِئِلُ يَأْتِينَا بِالْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ

—প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘কে দাফনের পরে সাহাবা-একেরাম (রাঃরাঃরাঃ আনহুম) প্রত্যাবর্তন করলে সাইয়েদাহ ফাতিমা (রাঃরাঃরাঃ আনহা) হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাল্ল করীম)‘কে উদ্দেশ্য করে বলেন: ‘হে আবুল হাসান (ইমাম হাসানের বাবা)! আপনারা কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘কে দাফন করেছেন? তিনি উত্তর দেন: ‘হ্যাঁ।’ হযরত মা ফাতেমা (রাঃরাঃরাঃ আনহা) বলেন, ‘আপনারা রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘এর ওপর বালু স্থাপন করে তাঁর দাফন করাকে কীভাবে সহ্য করতে পারলেন? তাঁর প্রতি আপনাদের অন্তরে কি কোনো দয়া-ময়াই ছিলো না? তিনি কি খায়র তথা হিতসাধনকারী ছিলেন না? হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাল্ল করীম) উত্তর দেন, ‘হে ফাতিমা, হ্যাঁ অবশ্যই! কিন্তু কেউই আল্লাহ তা‘লার আদেশ রহিত করতে পারেন না।’ এই কথা শুনে মা ফাতিমা (রাঃরাঃরাঃ আনহা) অঝোরে কাঁদতে লাগলেন এ কথা বলে: ‘হে পিতা! এখন থেকে জিবরীল (আলাইহিস্ সালাম)‘এর আগমন শেষ হয়ে গেলো; (অথচ) তিনি আসমান থেকে আল্লাহর বাণী নিয়ে আমাদের কাছে আসতেন।^{৪০০}

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র বেসাল শরীফের পরে মহান সাহাবা-মণ্ডলী (রাঃরাঃরাঃ আনহু) নিরন্তর শোকে মূহ্যমান ছিলেন, আর তাঁদের অনেককেই আর কখনো হাসতে দেখা যায়নি। সাইয়েদাহ ফাতিমা (রাঃরাঃরাঃ আনহা) সম্পর্কে আবু জা‘ফর (রাঃরাঃরাঃ আনহু) বলেন:

৪০০. আল-তাবারানী কৃত ‘মু‘জাম আল-কবীর’, ৩:৬৪ #২৬৭৬; এবং আবু নুয়াইম লিখিত ‘হিলএয়া আল-আউলিয়া ওয়া তাবাক্বাত আল-আসফিয়া’, ৪:৭৯।

مَا رَأَيْتُ فَاطِمَةَ (رضي الله عنها) صَاحِبَةً بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ: রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র বেসালের পরে আমি আর কখনোই হযরত ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা)‘কে হাসতে দেখিনি।^{৪০১}

হযরত আলী বিন আবী তা‘লিব (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম) হতে বর্ণিত হয়েছে যে সাইয়েদা ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) যখন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র রওজা শরীফ যেয়ারত করতেন, তখন তিনি সেখান থেকে এক মুঠো মাটি নিতেন এবং নিজের দু চোখের ওপরে তা স্থাপন করতেন। এরপর তিনি কেঁদে কেঁদে বলতেন:

أَخَذْتُ قَبْضَةً مِّنْ تُرَابِ الْقَبْرِ، فَوَضَعْتُهُ عَلَى عَيْنَيْهَا، فَبَكَتْ وَأَنْشَأَتْ تَقُولُ:
مَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ ثُرْبَةَ أَحْمَدَ أَنْ لَا يَشُمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا
صَبَّتْ عَلَى مَصَائِبُ لَوْ أَنَّهَا صَبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا

অর্থ: যে ব্যক্তি ঠুঁকেছেন আপনার রওযা‘র মাটির সুগন্ধময় স্রাণ,

তাঁর আর প্রয়োজন নেই অন্য কোনো সুগন্ধের - আজীবন,

আপনার বেসালের পরে আমার মোকাবেলাকৃত দুঃখ-বেদন,

যদি দিনসমূহ করতো মোকাবেলা, তবে দিন রাতে হতো পরিবর্তন।^{৪০২}

(ভাবানুবাদ)

এই শোকের সময়কালে সাইয়েদা ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) যখন বেসালপ্রাপ্তির সন্ধিক্ষণে, তখন তিনি তাকে স্বেচ্ছায় বরণ করেন; কেননা এ নশ্বর জগৎ হতে বেসালের মানে হচ্ছে তিনি আল্লাহ তা‘লার সাথে মিলিত হতে যাচ্ছেন এবং তাঁর প্রিয় পিতা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র সাথেও। ইমামমণ্ডলী ও মুহাদ্দেসীন উলামাবৃন্দ এটা লিপিবদ্ধ করেছেন:

৪০১. ইবনে আল-জাওয়যী, ‘আল-ওয়াফা’ বি-আহওয়াল আল-মুস্তফা’, ৮০৩ পৃষ্ঠা।

৪০২. আল-যাহাবী, ‘সিয়্যার আ‘লম আল-নুবালা’, ২:১৩৪; এবং ইবনে কুদামা, ‘আল-মুগনী’, ২:২১৩।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضي الله عنها) قَالَتْ: اشْتَكَّتْ فَاطِمَةُ شَكْوَاهَا الَّتِي قُبِضَتْ فِيهَا، فَكُنْتُ أَمْرُضُهَا، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا كَأَمْثَلِ مَا رَأَيْتُهَا فِي شَكْوَاهَا تِلْكَ، قَالَتْ: وَخَرَجَ عَلَيَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَتْ: يَا أُمُّهُ اسْكُبِي لِي غُسْلًا. فَسَكَبْتُ لَهَا غُسْلًا، فَأَغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ. ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمُّهُ، أَعْطِينِي ثِيَابِي الْجُدُدَ. فَأَعْطَيْتُهَا فَلَبِسَتْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمُّهُ، قَدِّمِي لِي فِرَاشِي وَسَطَ الْبَيْتِ. فَفَعَلْتُ وَاضْطَجَعْتُ وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمُّهُ، إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ. وَقَدْ تَطَهَّرْتُ فَلَا يَكْشِفُنِي أَحَدٌ فَقَبِضْتُ مَكَانَهَا، قَالَتْ: فَجَاءَ عَلَيَّ فَأَخْبَرْتُهُ

-হযরত উম্মে সালামা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহা) বর্ণনা করেন, সাইয়েদা ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) যখন তাঁর (অস্তিত্ব) অসুখের শেষ পর্যায়ে উপনীত, তখন আমি তাঁর যত্ন নিচ্ছিলাম। একদিন সকালে তিনি জেগে ওঠে ওই অসুখ চলাকালীন যে-কোনো দিনের চেয়ে সুস্থ বোধ করেন। হযরত আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহুল নিজশ্ব কোনো প্রয়োজনে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সাইয়েদা ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, ‘হে মাতা! আমার গোসলের জন্যে কিছু পানির ব্যবস্থা করুন।’ অতঃপর আমি পানির ব্যবস্থা করি এবং তিনি ভালোভাবে স্নান করেন। এরপর তিনি বলেন, ‘হে মাতা! আমাকে নতুন জামাকাপড় দিন।’ এমতাবস্থায় আমি তাঁকে তা দেই, আর তিনি তা পরিধান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, ‘হে মাতা! বাসার মাঝখানে আমার জন্যে ফরাশ পেতে দিন।’ আমি তা-ই করি; আর তিনি ক্বিবলা-মুখো হয়ে হাত কপোলের নিচে রেখে মাটিতে শুয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি বলেন, ‘প্রিয় মাতা! আমাকে এখন নিয়ে যাওয়া হবে (বেসালে) এবং আমাকে পুতঃপবিত্র করা হয়েছে। আমাকে যেনো কেউই অনাবৃত না করে।’ এ কথা বলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই

বেসালপ্রাপ্ত হন। হযরত আলী (কারীমাল্লাহু ওয়াজহাহু) পরবর্তী সময়ে ফিরে এলে আমি তাঁকে খবরটি জানাই।^{৪০৩}

জীবনীকার ও ইতিহাসবিদবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেন যে সাইয়েদা ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) মাগরেব ও এশা'র নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে বেসালপ্রাপ্ত হন। তাঁরই নির্দেশ অনুসারে তাঁকে রাতে দাফন করা হয়; আর সর্ব-হযরত আলী বিন আবী তালেব (কারীমাল্লাহু ওয়াজহাহুল করীম), আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও ফযল বিন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-ই তাঁকে তাঁর মাযারে নামিয়ে রাখেন। এইভাবেই তিনি তাঁর প্রিয় পিতা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সান্নিধ্যে গমন করেন।^{৪০৪}

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বিচ্ছেদের শোক যদি এমনই পর্যায়ের হয়, এ কথা বিস্মৃত না হয়ে যে তাঁর বেসাল শরীফ ঘটেছিলো তাঁরই মীলাদ-দিবসে, এমতাবস্থায় সাহাবা-এ কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)'এর পক্ষে তাঁর মীলাদ উদযাপন করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে?

৪০৩. আহমদ ইবনে হাম্বল, 'আল-মুসনাদ', ৬:৪৬১৪৬২ #২৭,৬৫৬; আহমদ ইবনে হাম্বল, 'ফাযায়েল আল-সাহাবা', ২:৬২৯ ও ৭২৫ #১০৭৪ ও ১২৪৩; আল-দূলাবী, 'আল-যুরীয়া আল-তাহিরা', ১১৩ পৃষ্ঠা; আল-হায়তামী, 'মজমাউল যাওয়াঈদ ওয়া মানবা' আল-ফাওয়াইদ', ৯:২১১; আল-যায়লাঈ, 'নসব আল-রাযা লি-আহাদীসিল হেদায়া', ২:২৫০; মুহিব আল-তাবারী, 'যাখায়ের আল-উকুবা ফী মানাক্বিবে যাউয়ী আল-কুরবা', ১০৩ পৃষ্ঠা; এবং ইবনে আসীর, 'আসাদ আল-গাবা ফী মা'রিফা আল-সাহাবা', ৭:২২১।

৪০৪. আল-হাকিম, 'আল-মুস্তাদরাক', ৩:১৭৭-১৭৮ #৪৭৬৩-৪৭৬৫; ইবনে আবী শায়বা, 'আল-মুসান্নাফ', ৩:৩১ #১১,৮২৬; প্রাণ্ডজ, ৭:২৫ #৩৩,৯৩৮; আল-বায়হাকী, 'আল-সুনান আল-কুবরা', ৪:৩১; মুহিব আল-তাবারী, 'আল-রিয়াদ আল-নাদরা ফী মানাক্বিব আল-আশরা', ১:১৭৫-১৭৬; মুহিব আল-তাবারী, 'যাখায়ের আল-উকুবা ফী মানাক্বিবে যাউয়ী আল-কুরবা', ১০৪ পৃষ্ঠা; আল-শায়বানী, 'আল-আহাদ ওয়াল-মাসানী', ৫:৩৫৫ #২,৯৩৭; ইবনে সা'আদ, 'আল-তাবাকাত আল-কুবরা', ৮:২৯; ইবনে আল-জাওযী, 'সাক্ষায়া আল-সাক্ষাওয়া', ২:৮; এবং ইবনে আসীর, 'আসাদ আল-গাবা ফী মা'রিফা আল-সাহাবা', ৭:২২১।

৭.২.৪ হযরত আনাস বিন মালেক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর শোক

হযরত আনাস বিন মালেক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দশ বছর যাবৎ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর খেদমতে ছিলেন। এই সময়কালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁর সত্তার ওপর এমন এক স্থায়ী ছাপ ফেলে যে, তিনি হুযূর পূর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর বিচ্ছেদে নিরন্তর শোকে মূহমান থাকেন; (বস্তুতঃ) তাঁর বেসাল শরীফ হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র জন্যে মহা এক বিপর্যয় হয়ে দেখা দেয়। তিনি তাঁর এক মুহূর্তের সান্নিধ্যের জন্যে ছিলেন ব্যাকুল; আর তাঁর বিচ্ছেদ ছিলো অসহনীয়। মহান রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর স্মরণে তিনি অবিরাম কান্নাকাটি করতেন। তাঁর ভগ্ন হৃদয়ে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে তিনি প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র ব্যবহৃত বরকতপূর্ণ বস্ত্র-সামগ্রীর দিকে তাকাতেন এবং বিভিন্ন সমাবেশে তাঁকে স্মরণ করতেন; তিনি তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্যে ব্যাকুল থাকতেন এবং অন্যদেরকেও ব্যাকুল করে তুলতেন।

একবার হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাহমাতুল্লিল আলামীন তথা জগতসমূহের প্রতি খোদায়ী করুণা হযরতে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর শারীরিক গঠনের বর্ণনা প্রদান করছিলেন। তিনি তাঁর সৌন্দর্যের কথা স্মরণ করে বলেন:

وَلَا مَسِسْتُ خَزَّةً وَلَا حَرِيرَةً أَلَيَّنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَلَا شِمْمْتُ مِسْكَةً وَلَا عَبِيرَةً أَطْيَبَ رَائِحَةٍ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর হাতের তালুর মতো কোমল কোনো রেশম আমি কখনো স্পর্শ করিনি। আর আমি তাঁর সুগন্ধের চেয়ে মনোরম কোনো সুগন্ধ বা সুঘ্রাণ কখনোই গ্রহণ করিনি।^{৪০৫}

৪০৫. আল-বুখারী, 'আল-সহীহ': কিতাব আল-সওম, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের রোযা ও ইফতার-সম্পর্কিত বর্ণনার অধ্যায়, ২:৬৯৬ #১৮৭২; মুসলিম, 'আল-সহীহ': কিতাব আল-ফাযায়েল, 'প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) ঘনঘন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'কে স্বপ্নে দেখতেন। মুসান্না বিন সাঈদ বর্ণনা করেন যে তিনি হযরত আনাস (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু)'কে বলতে শোনেন:

مَا مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا وَأَنَا أَرَى فِيهَا حَبِيبِي، ثُمَّ يَبْكِي

—এমন কোনো রাত অতিবাহিত হয় না, যা'তে আমি আমার হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'কে না দেখতে পাই। অতঃপর তিনি (হযরত আনাস রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) অঝোরে কাঁদেন।^{৪০৬}

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক মদীনা মোনাওয়ারায় প্রবেশ ও তাঁর বেসাল শরীফের ঘটনা বর্ণনাকালে হযরত আনাস (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْمَدِينَةَ، أَصَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ

—প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেদিন মদীনা মোনাওয়ারায় প্রবেশ করেন, সেদিন সব কিছুই জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। অতঃপর যেদিন তিনি বেসালপ্রাপ্ত হন, সেদিন (আমার জন্যে) সব কিছুতেই যুলমাতের অন্ধকার নেমে আসে।^{৪০৭}

সুগন্ধ, তাঁর কোমল স্পর্শ, এবং তাঁর হাত থেকে বরকত/তাবারক্ক লভ' অধ্যায়, ৪:১৮১৪ #২৩৩০; আল-দারিমী, 'আল-সুনান', 'আল-মোকাদামা', প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র সৌন্দর্য' অধ্যায়, ১:৪৫ #৬১; ইবনে হিব্বান, 'আল-সহীহ', ১৪:২১১ #৬৩০৩; এবং আহমদ ইবনে হাম্বল, 'আল-মুসনাদ', ৩:১০৭।

৪০৬. ইবনে সা'আদ, 'আল-তাবাকাত আল-কুবরা', ৭:২০; এবং আল-যাহাবী, 'সিয়্যার আলম আল-নুবালা', ৩:৪০৩।

৪০৭. তিরমিযী, 'আল-জামিউন্ সহীহ': কিতাব আল-মানাক্বিব, 'মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র দৃষ্টান্তমূলক বৈশিষ্ট্যাবলী' অধ্যায়, ৬:১৩ #৩৬১৮; ইবনে মাজাহ, 'আল-সুনান': 'কিতাব আল-জানায়েহ', 'প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বেসাল শরীফ ও দাফনসম্পর্কিত আলোচনা' অধ্যায়, ১:৫২২ #১৬৩১; আহমদ ইবনে হাম্বল, 'আল-মুসনাদ', ৩:২৬৮ #১৩৮৫৭; ইবনে হিব্বান, 'আল-সহীহ', ১৪:৬০১ #৬৬৩৪; আবু এয়ালা, 'আল-মুসনাদ', ৬:৫১ ও ১১০ #৩২৯৬ ও ৩৩৭৮; এবং আল-মাকুদিসী, 'আল-আহাদীস আল-মুখতার', ৪:৪১৮-৪১৯ #১৫৯২-১৫৯৩।

হযরত আনাস (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) অনুভব করেন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র যাহেরী/প্রকাশ্য অনুপস্থিতিতে তাঁদের (সাহাবা-মণ্ডলী রাঃদিয়াল্লাহু আনহু'মের) ওপর এক কালো ছায়া বিস্তৃত হয়েছিলো। ইবরাহীম আল-বায়জুরী ওই মহান সাহাবী (রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র এই বক্তব্যকে নিম্নে ব্যাখ্যা করেন এভাবে:

إِسْتَنَارَ مِنَ الْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ كُلُّ شَيْءٍ نُورًا حَسْبًا وَمَعْنَوِيًّا، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُورُ الْأَنْوَارِ وَالسَّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَنُورُ الْهَدَايَةِ الْعَامَّةِ وَرَفَعَ الظُّلْمَةَ النَّامَةِ، وَقَوْلُهُ: أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ؛ أَيُّ لِفَقْدِ النُّورِ وَالسَّرَاجِ مِنْهَا فَذَهَبَ ذَلِكَ النُّورُ بِمَوْتِهِ.

—মদীনা মোনাওয়ারার সব কিছুই আলোকিত হয়েছিলো একটি উপলব্ধিযোগ্য ও রূপক জ্যোতি দ্বারা। এটা এই কারণে যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পবিত্র সত্তা মোবারক সকল জ্যোতির উৎসস্থল, এক প্রোজ্জ্বল প্রদীপ; তিনি-ই হলেন সবার হোদায়াত/পথপ্রদর্শনের আলো এবং সর্বপ্রকার নিপীড়ন-নির্যাতন ও অন্যায়ের মূলোৎপাটনকারী। হযরত আনাস (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু)'এর প্রদত্ত 'সব কিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়' মর্মে বক্তব্যটি রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর জ্যোতি ও তা দ্বারা তাঁর সব কিছু আলোকিত করার অনুপস্থিতিকে উদ্দেশ্য করেছে, যেহেতু তাঁর বেসাল শরীফের সাথে সাথে তা (জ্যোতি) চলে গিয়েছিলো।^{৪০৮}

৭.২.৫ হযরত বিলাল বিন রাবাহ (রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর শোক

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পুণ্যবান আশেক সাইয়েদিনা বিলাল (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) আপন মাহবুব (দ:)এর বিচ্ছেদের শোক ও সন্তাপের অনুভূতিকে সামাল দিতে অক্ষম ছিলেন। তাঁর এই অনুভূতিকে

৪০৮. আল-বায়জুরী, 'আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া 'আলাল-শামায়েলিল-মুহাম্মদিয়া', ২৮৭ পৃষ্ঠা।

মোকাবেলা করতে না পেরে তিনি মদীনা মোনাওয়ারা ছেড়ে সিরিয়ার আলেশ্পো নগরীতে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন। কেননা মদীনায় মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সাথে তাঁর স্মৃতি নিরন্তর তাঁকে তাড়া করে ফিরছিলো। তিনি ওই নগরীতে বসবাস করার যাতনা আর সহ্য করতে পারছিলেন না, যেহেতু প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শারীরিক তথা যাহেরীভাবে এখানে ছিলেন অনুপস্থিত।

সহীহ আল-বুখারীর ব্যাখ্যা (শরাহ) লেখক আল-কিরমানী (৭১৭-৭৮৬ হিজরী) লিপিবদ্ধ করেন যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন বেসালপ্রাপ্ত হন, তখন হযরত বিলাল (রাঃরাঃরাঃ আনহু) অত্যন্ত ভারাক্রান্ত অন্তরের দরুন মদীনা মোনাওয়ারা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃরাঃরাঃ আনহু)'কে যখন এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানানো হয়, তখন তিনি তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত বদলানোর জন্যে অনেক চেষ্টা করেন এই কথা বলে যেনো তিনি মসজিদে নববী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র আযান অব্যাহত রাখেন। কিন্তু হযরত বিলাল (রাঃরাঃরাঃ আনহু) উত্তরে বলেন:

إِنِّي لَا أُرِيدُ الْمَدِينَةَ بِدُونِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَلَا أَتَحْمِلُ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خَالِيًا عَنْهُ

-আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-শূন্য মদীনা নগরী চাই না। মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র মাক্বাম (স্থান)-টি তাঁর (যাহেরী) উপস্থিতি হতে খালি থাকাটা আমি সহ্য করতে পারি না।^{৪০৯}

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত বিলাল (রাঃরাঃরাঃ আনহু)'এর উত্তরটি লিপিবদ্ধ আছে এভাবে:

يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنْ كُنْتُ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِنَفْسِكَ فَأَمْسِكْنِي، وَإِنْ كُنْتُ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِلَّهِ فَدَعْنِي.

-হে আবু বকর (রাঃরাঃরাঃ আনহু)! আপনি যদি আমাকে খরিদ করে থাকেন স্রেফ আপনারই জন্যে, তাহলে আমাকে থামিয়ে দিন; আর যদি আপনি আমাকে মুক্ত করে থাকেন স্রেফ আল্লাহরই ওয়াস্তে, তাহলে আমায় একান্তে থাকতে দিন।^{৪১০}

মূসা বিন মুহাম্মদ বিন হারিস আল-তায়মী আপন পিতা হতে বর্ণনা করেন:

لَمَّا تُوِّفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْنَى بِلَالٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقْبَرْ، فَكَانَ إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ انْتَحَبَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ: فَلَمَّا دُفِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: أَدْنَى، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ إِنَّمَا أَعْتَقْتَنِي لِأَنْ أَكُونَ مَعَكَ فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وَإِنْ كُنْتُ أَعْتَقْتَنِي لِلَّهِ فَخَلِّنِي وَمَنْ أَعْتَقْتَنِي لَهُ، فَقَالَ: مَا أَعْتَقْتُكَ إِلَّا لِلَّهِ. قَالَ فَإِنِّي لَا أُوَدِّنُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

-মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেসালপ্রাপ্ত হলে হযরত বিলাল (রাঃরাঃরাঃ আনহু) আযান দেন, যদিও হযরত পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর দাফন তখনো সম্পন্ন হয়নি। (আযানের মধ্যে) 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল' বাক্যটি যখন তিনি ঘোষণা করেন, তখন মসজিদে উপস্থিত সবাই অবোরে কাঁদতে আরম্ভ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর দাফন সম্পন্ন হলে খলীফা আবু বকর (রাঃরাঃরাঃ আনহু) হযরত বিলাল (রাঃরাঃরাঃ আনহু)'কে আযান দিতে অনুরোধ করেন। তিনি উত্তরে বলেন, "আপনি যদি আমাকে

৪১০. সহীহ আল-বুখারী: কিতাবু ফাযাইলে সাহাবা, 'বিলাল বিন রাবাহ' (রাঃরাঃরাঃ আনহু) তা'আলা আনহু)'র দৃষ্টান্তমূলক বৈশিষ্ট্য' অধ্যায়, ৩:১৩৭১ #৩৫৪৫; ইবনে আবী শায়বা, 'আল-মুসান্নাফ', ৬:৩৯৬ #৩২,৩৩৬; আল-তাবারানী, 'আল-মু'জাম আল-কবীর', ১:৩৩৭ #১০১০; ইবনে সাআদ, 'আল-তাবাক্বাত আল-কুবরা', ৩:২৩৮; আল-মাকুরীযী, 'এমতা' বি মা' লি-নাবী মিন আল-আহওয়াল ওয়াল-আমওয়াল ওয়াল-হাফদা ওয়াল-মাতা', ১০:১৩২-১৩৩; মুহিব্ব আল-তাবারী, 'আল-রিয়াদ আল-নাদরা ফী মানা'ক্বিব আল-আশরা', ২:২৪; এবং আল-হালাবী, 'ইনসান আল-উযুন ফী সীরাতিল-আমীন আল-মা'মুন', ১:৪৮১।

শ্রেফ আপনারই জন্যে মুক্ত করে থাকেন, তাহলে আপনি যা আদেশ করবেন তা আমি পালন করবো; কিন্তু যদি আল্লাহরই খাতিরে আমায় মুক্ত করে থাকেন, তাহলে আমাকে ও যাঁর খাতিরে আপনি আমায় মুক্ত করেছেন, তাঁকে একান্তে থাকতে দিন।” হযরত আবু বকর (রাঃ) আল্লাহু আনহু উত্তর দেন, “আমি তোমাকে মুক্ত করেছি শ্রেফ আল্লাহরই ওয়াস্তে।” এমতাবস্থায় হযরত বিলাল (রাঃ) আল্লাহু আনহু বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া আর কারো জন্যেই আযান দেবো না।”^{৪১১}

(হযরত বিলাল রাঃ আল্লাহু আনহু) এই ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ এসনাদ-সহ বর্ণনা করার পরে ‘আল-ক্বামূস আল-মুহীত’ গ্রন্থের বিখ্যাত লেখক এয়াকুব ফায়রুযাবাদী (৭২৯-৮১৭ হিজরী) লেখেন:

كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَسَاكِرٍ فِي تَرْجَمَةِ بِلَالٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)، وَذَكَرَهُ أَيْضًا فِي تَرْجَمَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سُلَيْمَانَ بِسَنَدٍ آخَرَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ، فَذَكَرَهُ سِوَاءُ، وَابْنُ الْفَيْضِ رَوَى عَنْ خَلَائِقٍ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ وَأَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ، وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ الْمُفَرِّجِ فِي مُعْجَمِهِ وَآخَرُونَ .

—ইবনে আসাকির এই ঘটনা ‘হযরত বিলাল (রাঃ) আল্লাহু আনহু’ পরিচিতি’ অংশে লিপিবদ্ধ করেন। ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন সুলায়মান-ও এটা পৃথক একটি এসনাদে লিপিবদ্ধ করেন, যেটার শেষে ছিলেন (বিখ্যাত মুহাদ্দীস) মুহাম্মদ বিন ফয়েয। ইবনে আল-ফয়েয এই বর্ণনাটি অনেক বর্ণনাকারীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন, আর অনেক বর্ণনাকারীও তাঁর কাছ থেকে এটা গ্রহণ করেছিলেন; যেমন - আবু আহমদ বিন আদী, আবু

৪১১. আল-বায়হাকী, ‘আল-সুনান আল-ক্ববরা’, ১:৪১৯ #১৮২৮; ইবনে সাআদ, ‘আল-তাবাকাত আল-ক্ববরা’, ৩:২৩৬-২৩৭; আল-আযদী, ‘আল-জামে’, ১১:২৩৪; আবু নুয়াইম, ‘হিলএয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাত আল-আসফিয়া’, ১:১৫০-১৫১; ইবনে আল-জাওবী, ‘সাফওয়া আল-সাফওয়া’, ১:৪৩৯; এবং ইবনে আসাকির, ‘তারীখে দিমাশক আল-কবীর’, ১০:৩৬১।

আহমদ আল-হাকিম, আবু বকর বিন মাকুরী আপন ‘মু’জাম’ পুস্তকে, আর অন্যান্যরাও এঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।^{৪১২}

হযরত বিলাল (রাঃ) আল্লাহু আনহু সিরিয়ার উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেন এবং সেখানে ছয় মাস বসবাস করেন - যতোক্ষণ না প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং বলেন:

مَا هَذِهِ الْجَفْوَةُ، يَا بِلَالُ! أَمَا أَنْ لَكَ أَنْ تَزُورَنِي؟

—ওহে বিলাল! এটা কোন্ ধরনের আনুগত্য? তুমি কি আমার যেয়ারত করতে আসবে না?

ঘুম থেকে জেগে হযরত বিলাল (রাঃ) আল্লাহু আনহু তাঁর উটে চড়ে বসেন এ কথা বলে, “এয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আমার আকা ও মওলা, আমি আপনার খেদমতে হাজির।” অতঃপর তিনি মদীনা মোনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সেখানে পৌঁছে তিনি হন্যে হয়ে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র খোঁজে মসজিদ হতে তাঁর ব্যক্তিগত বসতঘর অবধি সর্বত্র ঘুরে বেড়ান; অবশেষে তিনি হুযুরে পাক (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর রওয়া শরীফে গমন করেন এবং খুঁজে না পেয়ে বিষন্নচিত্তে নিজের পবিত্র শির প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র রওয়া-এ-আক্বদসের ওপর (আলতোভাবে) রাখেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে ফরিয়াদ করেন, ‘এয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি আমাকে আদেশ করেছেন আপনার যেয়ারত করতে, আর আপনার সেবক আপনাকে দেখতে আলেপ্পো নগরী হতে (এখানে) সফর করে এসেছে।’ এভাবে ফরিয়াদ করার পর তিনি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র রওয়া শরীফের পাশে অচেতন হয়ে পড়ে যান এবং সেখানে দীর্ঘ সময় যাবৎ পড়ে থাকেন।

জ্ঞান ফেরার পর হযরত বিলাল (রাঃ) আল্লাহু আনহু দেখতে পান তাঁর (মদীনা) আগমনের খবর সর্বত্র বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। পবিত্র

৪১২. ফায়রুযাবাদী, ‘আল-সালাত ওয়াল-বিশর ফীল-সালাত ‘আলা খায়র আল-বাশার,’ ১৮৭-১৮৮ পৃষ্ঠা।

নগরীর সবাই তাঁকে নামাযের আযান দেয়ার জন্যে অনুরোধ করতে থাকেন, ঠিক যেমনিভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর সময় আযান দিতেন। কিন্তু হযরত বিলাল (রাঃদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তা করতে অস্বীকার করেন এই কথা বলে, “আমায় ক্ষমা করবেন; আমি এই আযান আর দিতে পারবো না। কেননা আমি যখন ইতিপূর্বে ঘোষণা করতাম এই বলে, ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর,’ তখন আমি মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে মহা আত্মিক প্রশান্তি লাভ করতাম। কিন্তু এখন ওই আযান দিতে গেলে কার দিকে তাকাবো আমি?” এমতাবস্থায় সাহাবা-এ কেরাম (রাঃদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) সিদ্ধান্ত নেন তাঁদের পক্ষ হয়ে সুপারিশ করার জন্যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র দৌহিত্র দু জনের কাছে অনুরোধ জানানোই শ্রেয়তর হবে; কেননা সাহাবাবন্দ (রাঃদ্বিয়াল্লাহু তা’আলা আনহুম) সরাসরি অনুরোধ করলে হযরত বিলাল (রাঃদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তা প্রত্যাখ্যান করবেন। এরই ফলশ্রুতিতে হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর হাত ধরে বলেন:

يَا بِلَالُ! نَشْفَعُكَ نَسْمَعُ أَدَانِكَ الَّذِي كُنْتَ تُؤَدِّنُ بِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ.

—হে বিলাল (রাঃদ্বিয়াল্লাহু আনহু)! আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর জন্যে মসজিদে নববীতে যেভাবে আযান দিতেন, আমরা আপনার কাছ থেকে সেভাবেই আযানের ডাক শোনার আকাঙ্ক্ষা রাখি।

হযরত বিলাল (রাঃদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবার আর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে না পেরে মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র সময়ে যেখান থেকে আযান দিতেন, ঠিক সেই স্থানটি হতেই আযান দেন। এই ঘটনাটি সীরাতে বইপত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে এভাবে:

فَلَمَّا أَنْ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، ارْتَحَّتِ الْمَدِينَةُ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ارْزَادَ رَجَّتْهَا، فَلَمَّا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، خَرَجَتْ الْعَوَاتِقُ مِنْ حُذُورِهِنَّ، وَقَالُوا: بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَمَا

رُبِّيْ يَوْمَ أَكْثَرَ بَاكِيًّا وَلَا بَاكِيَّةً بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

—অতঃপর তিনি (আযানে) ঘোষণা করেন, ‘আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।’ মদীনা মোনাওয়ারায় এর প্রতিধ্বনি ওঠে, আর এই ঘোষণা দানকালে তাঁর আবেগ আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি যখন বলেন, ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই,’ তখন ওই প্রতিধ্বনি আরো বৃদ্ধি পায়। অতঃপর তিনি যখন ঘোষণা করেন, ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর (প্রেরিত) রাসূল,’ এমতাবস্থায় পর্দানশীন মহিলাবৃন্দও তাঁদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন (এবং এক মর্মস্পর্শী শোকাবহ দৃশ্যের অবতারণা হয়)। মানুষেরা বলতে থাকেন, ‘রাসূলে খোদা (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগমন করেছেন।’ ওই দিন মদীনাবাসী নারী-পুরুষবৃন্দ এমন কান্নাকাটি করেন যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেসালপ্রাপ্ত হওয়ার পরে আর কখনোই তাঁরা তেমনভাবে কাঁদেননি।^{৪১৩}

হযরত বিলাল রাঃদ্বিয়াল্লাহু আনহু এই আযানকে কবি ইক্বাল ‘এশক্ব-মহব্বতের গীত’ আখ্যা দিয়ে বলেন:

اداس ازل سے ترے عشق کا ترانہ بنی

নমাস کے نظارے کا اک بہانہ بنی

৪১৩. ইমাম সুবকী কর্তৃক নিজ ‘শিফাউস সিকাম ফী যিয়ারাতে খায়র আল-আনাম’ পুস্তকে বর্ণিত, ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা; ইবনে আসাকির প্রণীত ‘তারীখ দিমাশকু আল-কবীর’, ৭:৯৭; আল-যাহাবী, ‘তারীখ আল-ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াত আল-শাহীরা ওয়া আল-আলম’, ৩:২০৪-২০৫; আল-যাহাবী, ‘সিয়্যার আলম আল-নুবালা’, ২:৩৫৮; ফায়রুযাবাদী, ‘আল-সালাত ওয়া আল-বিশর ফীল-সালাত আলা খায়র-ইল-বাশার’, ১৮৭ পৃষ্ঠা; আল-হায়তামী ‘আল-জওহারুল মুনাযযাম ফী যিয়ারাতিল কুবর আল-শরীফ আল-নববী আল-মুকার্রম আল-মুয়াযযাম’ পুস্তকের ২৭ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত করেন যে এই ঘটনাটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে; আল-সাখাবী, ‘আল-তোহফা আল-লতীফা ফী তারীখিল-মদীনা আল-শরীফা’, ২২১ পৃষ্ঠা; আল-সালেহী আল-শামী, ‘সুবুল আল-হুদা ওয়া আল-রাশাদ ফী সীরাতে খায়র আল-এবাদ’ ১২:৩৫৯; এবং আল-হালাবী, ‘ইনসান আল-উযূন ফী সীরাতে আল-আমীন আল-মা’মুন’, ২:৩০৮-৩০৯।

“এই আহ্বান অনাদিকাল হতে এশকু-মহব্বতের গীতরূপে বিরাজমান, নামায তো তাঁকে (প্রিয়নবীকে) দেখার এক বাহানাস্বরূপ মূর্তমান।” (ভাবানুবাদ)

৭.২.৬ হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) আল্লাহ তা‘আলা (আনহু) এর শোক হাদীস ও সীরাত তথা জীবনীগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে:

مَا ذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بَكَى، وَلَا مَرَّةً عَلَى رُبْعِهِمْ إِلَّا غَمَّصَ عَيْنَيْهِ.

—হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) আল্লাহ তা‘আলা (আনহু) কখনোই কান্নারত অবস্থা ছাড়া মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কথা উল্লেখ করতেন না। আর যখনই তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কোনো বসতঘর অতিক্রম করতেন, তৎক্ষণাৎ (দুঃখ-ভারাক্রান্ত অনুভূতির কারণে) নিজের চোখ বন্ধ করে রাখতেন।^{৪১৪}

৭.২.৭ হযরত আবদুল্লাহ বিন যায়দ (রাঃ) আল্লাহ তা‘আলা (আনহু) এর শোক ও তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ

হযরত আবদুল্লাহ বিন যায়দ (রাঃ) আল্লাহ তা‘আলা (আনহু) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে তাঁর পুত্র যখন তাঁকে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বেসাল শরীফের খবর পৌঁছে দেন, তখন তিনি জমিতে কৃষিকাজ করছিলেন। এই খবর শুনে তিনি শোকবিহ্বল হয়ে পড়েন এবং এর দরুন এতোখানি বেদনাত হন যে তিনি অনতিবিলম্বে তাঁর দু হাত তুলে দুআ করেন এই বলে:

৪১৪. আল-বায়হাকী, ‘আল-মাদখাল ইলাল-সুনান আল-কুবরা’, ১:১৪৮ #১১৩; আল-আসকালানী, ‘আল-এসাবা ফী তামযীয আল-সাহাবা’, ৪:১৮৭; এবং আল-যাহাবী, ‘তায়কেরা আল-হুফফায’, ১:৩৮।

اللَّهُمَّ! أَذْهَبْ بَصَرِي حَتَّى لَا أَدْرِي بَعْدَ حَبِيبِي مُحَمَّدٍ أَحَدًا

—হে আল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে (মানে তুলে) নেন, যাতে আমি আমার প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া আর কাউকে জানতে না পারি।^{৪১৫}

এই সাহাবী (রাঃ) আল্লাহ তা‘আলা (আনহু) এর দুআ তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক কবুল তথা গৃহীত হয় এবং এর পরপরই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে নেয়া হয় (মানে তিনি অন্ধ হয়ে যান)। ক্বাসিম বিন মুহাম্মদ বলেন:

إِنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَعَادُوهُ

—মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আল্লাহ তা‘আলা (আনহু) এর মধ্যে একজন অন্ধ হলে তাঁরা (সাহাবাবন্দ) তাঁকে সাহায্য দিতে যান।

সাহাবা-এ কেরাম (রাঃ) আল্লাহ তা‘আলা (আনহু) যখন তাঁদের সমবেদনা জানাতে আরম্ভ করেন, তখন ওই সাহাবী (রাঃ) আল্লাহ তা‘আলা (আনহু) বলেন:

كُنْتُ أُرِيدُهُمَا لِأَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا إِذَا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ، مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَا يَهْمَا بَطْنِي مِنْ ظُبَاءِ تَبَالَةٍ

—আমি আমার ওই চোখ দুটোকে ভালোবাসতাম শুধু এ কারণে যে, সেগুলো দ্বারা আমি প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে দেখতে সক্ষম ছিলাম; কিন্তু এখন যখন তিনি বেসালপ্রাপ্ত হয়েছেন, এমতাবস্থায় আমাকে যদি হরিণের চোখও দেয়া হয়, তবুও আমি কোনো রকম আনন্দ অনুভব করবো না।^{৪১৬}

৪১৫. আল-কুসতলানী, ‘আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া বিল-মিনাহ আল-মুহাম্মদীয়া’, ৩:২৭৯; এবং আল-যুরকানী, ‘শরহুল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়া’, ৯:৮৪-৮৫।

৪১৬. আল-বুখারী, ‘আল-আদাব আল-মুফরাদ’, ১:১৮৮ #৫৩৩।

৭.২.৮ আসহাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)-বৃন্দের শোকের আরো বর্ণনা

আল-আলুসী লিপিবদ্ধ করেন যে পুণ্যাত্মা সাহাবাবুন্দ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যখন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র (যাহেরী/প্রকাশ্য) অনুপস্থিতি অনুভব করতেন, তখন তাঁরা তাঁর কোনো পবিত্র স্মৃতিচিহ্নের খোঁজে বের হতেন:

فَجَاءَ إِلَى مَيْمُونَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)، فَأُخْرِجَتْ لَهُ مِرْأَتُهُ، فَتَنَظَّرَ فِيهَا، فَرَأَى صُورَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرَ صُورَةَ نَفْسِهِ.

অর্থ: অতঃপর তিনি হযরত মায়মূনা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)'র কাছে আসেন আর হযরত মায়মূনা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর জন্যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র আয়না বের করে দেন। তাতে তিনি তাকিয়ে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র চেহারা মোবারক দেখতে পান; আর নিজের চেহারা তিনি তাতে দেখতে পাননি।^{৪১৭}

হযরত ক্বাতাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে বর্ণিত আছে:

أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ أَخَذَهُ الْعَوِيلُ وَالزَّوِيلُ

অর্থ: তিনি যখনই কোনো হাদীস শরীফ শুনতেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর (মনের) অবস্থার পরিবর্তন হতো এবং তিনি অবোরে কাঁদতেন।^{৪১৮}

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: اكْشِفِي لِي قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَشَفَتْهُ لَهَا، فَبَكَتْ حَتَّى مَاتَتْ

অর্থ: জনৈকা মহিলা হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)'কে বলেন, 'আমার জন্যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র রওযা শরীফ

৪১৭. আল-আলুসী, 'রুহ আল-মা'আনী ফী তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম ওয়াল-সাব' আল-মাসা'নী', ২২:৩৯।

৪১৮. ইমাম কাজী আযাজ, 'আল-শিফা বি-তা'রিফ হক্কু আল-মুস্তফা', ২:৫৯৮।

উন্মুক্ত করে দিন।' তিনি তাঁর জন্যে তা উন্মুক্ত করেন। ওই মহিলা (অবিরত) কাঁদেন যতোক্ষণ না তিনি ইস্তেক্বাল করেন।^{৪১৯}

এই দুঃখ-বেদনার ব্যাখ্যাকালে কবি আল্লামা ইক্ববাল বলেন:

وقت قلب و جگر گردونی

از خدا محبوب تر گردونی

“প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পবিত্র সত্তা করে বৃদ্ধি অন্তরের (ঈমানী) শক্তি, কারো (শ্রেফ) খোদাত্রেম দ্বারা অর্জিত হয় না এমন ভক্তি।^{৪২০}” (ভাবানুবাদ)

سوز صدیق و علی از حق طلب

ذره عشق نبی از حق طلب

“অতএব, নবীপ্রেম তাল্লাশ করো যেমনটি ছিলো আবু বকর সিদ্দীক ও আলীর, অতঃপর হক্কু তা'আলার কাছে যাচঞা করো নবীপ্রেমের অংশ-বিশেষের।^{৪২১}” (ভাবানুবাদ)

ইমাম কাজী আযাজ (৪৭৬-৫৪৪ হিজরী) লেখেন:

لَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْتَظِرُ إِلَى لَوْنِهِ كَأَنَّهُ نَزَفٌ مِنْهُ الدَّمُ، وَقَدْ جَفَّ لِسَانُهُ فِي فَمِهِ هَيْبَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-আবদুর রহমান বিন কাসিম (হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রপৌত্র) যখনই প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র কথা স্মরণ করতেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর পবিত্র চেহারার রং বদলে যেতো এমনভাবে যেনো

৪১৯. ইমাম কাজী আযাজ, 'আল-শিফা বি-তা'রিফ হক্কু আল-মুস্তফা', ২:৫৭০; ইবনে আল-জাওযী, 'সাফওয়া আল-সাফওয়া', ২:২০৪ #২০৩; এবং মোল্লা আলী ক্বারী, 'শরহে শেফা', ২:৪৪।

৪২০. আল্লামা ইক্ববাল, 'কুল্লিয়াত: আসরার ওয়া রামুয', ১৩৩ পৃষ্ঠা।

৪২১. আল্লামা ইক্ববাল, 'কুল্লিয়াত: পিয়াম-এ-মাশরিক', ২০৩ পৃষ্ঠা।

তাঁর সমস্ত রক্ত নির্গত হচ্ছে; প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রতি সমীহের কারণে তাঁর পবিত্র জিহ্বা শুকিয়ে যেতো।^{৪২২}

৭.২.৯ মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সেবাদানকারী প্রাণিদের শোক

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বেসালপ্রাপ্তিতে শুধু সাহাবা-এ কেরাম (রাহিয়াল্লাহু আনহুম)-ই শোকে কাতর হননি, এমন কী প্রাণিকুলও এই বিচ্ছেদের বেদনা সহ্য করতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলো। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহেলভী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করে লেখেন:

وناقه آنحضرت علف نمی خورد وآب نمی نوشید تا آنکه مرد، از جمله آياتی که ظاهر شد بعد از موت آنحضرت آن حماری که آنحضرت گاهی بران سوار میشد چندان حزن کرد که خود را در چاهی انداخت-

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মাদী উটটি পানাহার ত্যাগ করে মারা যায়। অদ্ভুত ঘটনাগুলোর মধ্যে আরেকটি হলো, যে গাধাটির পিঠে তিনি আরোহণ করতেন তাঁর বেসালপ্রাপ্তির পর সেটা এমনই শোকাহত হয় যে এক রাতে সেটা এক কুয়ার মধ্যে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহনন করে; কেননা সেটা তখন বেঁচে থাকার ইচ্ছা হারিয়েছিলো।^{৪২৩}

৭.৩ রবীউল আউয়াল মাসে খুশি ও শোক সমানভাবে অনুভূত

আসহাবে কেরাম (রাহিয়াল্লাহু আনহুম) যখনই রবীউল আউয়াল মাস প্রত্যক্ষ করতেন, তৎক্ষণাৎ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনে অনুভূত তাঁদের খুশি (তাঁরই বিচ্ছেদের)

দুঃখ-বেদনার নিচে চাপা পড়ে যেতো। তাঁদের দ্বারা যথেষ্ট খুশি মনে মীলাদ/মীলাদ উদযাপন এ কারণেই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই পরিস্থিতি তাঁদের উত্তরসূরী তাবেরঈন ও তাঁদের শিক্ষার্থী তাবের' তাবেরঈনবৃন্দের সময়কালেও চলেছিলো। যদিও তাবেরঈন (উত্তরাধিকারী) বৃন্দ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পবিত্র সোহবত/সান্নিধ্যের সাক্ষী হননি বা অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেননি, তবুও তাঁরা সাহাবা-এ কেরাম (রাহিয়াল্লাহু আনহুম) এর বহনকৃত প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর স্মৃতি সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণ ওয়াকফহাল। এসব স্মৃতি তাঁরা তাঁদের শিক্ষার্থীদের ও অনাগত প্রজন্মগুলোর মাঝে পরবর্তীকালে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

৭.৪ সময়ের পরিক্রমণে শোকের ওপর খুশির প্রাধান্য বিস্তার

তাবেরঈন (রাহমতুল্লাহে আলাইহিম) বৃন্দের যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী সময়ে আগত প্রজন্মগুলো প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সোহবতের অভিজ্ঞতা যেমন সঞ্চয় করেননি, তেমনি তাঁরা তাঁর বেসালপ্রাপ্তিতে শোকের অনুভূতির অভিজ্ঞতাও লাভ করেননি। সময়ের পরিক্রমণের দরুন খুশি দুঃখের ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করে। উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মীলাদের এই মহা নেআমতপ্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে ওই দুঃখ-বেদনা ভুলে যেতে শুরু করেন; প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর (যাহেরী/প্রকাশ্য) জিন্দেগী ও বেসাল শরীফ দুটোই যে উম্মতের জন্যে নেআমত তথা খোদায়ী আশীর্বাদের উৎস, এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে ওঠে। মহাসম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর 'বরযখী' (আধ্যাত্মিক) জীবন এমনই এক আকীদা-বিশ্বাস, যা মুসলমানবৃন্দের অন্তরে শান্তি ও স্বস্তি বয়ে আনে।

৭.৫ মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বেলাদত ও বেসাল উভয়ই রহমতস্বরূপ

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমন ও বেসাল শরীফ তথা পরলোকে খোদার সাথে মিলনপ্রাপ্তি দুটোই

৪২২. ইমাম কাজী আজাজ, 'আল-শিফা বি-তা'রিফ হক্কুল আল-মুস্তফা, ২:৩৬

৪২৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহেলভী, 'মাদারিজুন নবুওয়্যাত', ২:৪৪৪; এবং আল-হালাবী, 'ইনসান আল-উয়ুন ফী সীরাতিল-আমীন আল-মা'মুন', ৩:৪৩৩।

উম্মতের জন্যে রহমতের উৎস। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস, যিনি বলেন:

حَيَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ تُحَدِّثُونَ وَتُحَدِّثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَّكُمْ، تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمَدْتُ اللَّهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ

অর্থ: আমার (প্রকাশ্য) জিন্দেগী তোমাদের জন্যে উপকারী; তোমরা তা বলবে, তোমাদেরকেও তা জানানো হবে। আর আমার বেসাল শরীফও তোমাদের জন্যে উপকারী; কেননা তোমাদের নেক আমল (উত্তম কর্ম) আমার সামনে পেশ করা হবে। আমি তোমাদের উত্তম কর্ম দেখলে আল্লাহর প্রশংসা করবো; আর মন্দ কর্ম দেখলে তোমাদের জন্যে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবো (যাতে তিনি ক্ষমা করেন)।^{৪২৪}

৪২৪. আল-বাযযার, ‘আল-বাহর আল-যুখার’ (আল-মুসনাদ), ৫:৩০৮-৩০৯ #১৯২৫; ইবনে আবী উসামা ‘মুসনাদ আল-হারিস’, ২:৮৮৪ #৯৫৩ গ্রন্থে সহীহ সনদে এটা বর্ণনা করেন; হাকিম তিরমিযী, ‘নওয়াদির আল-উসূল ফী আহাদীসির-রাসূল’, ৪:১৭৬; আল-দায়লামী নিজ ‘আল-ফেরদৌস বি-মা’সূর আল-খিতাব’ ১:১৮৩ #৬৮৬ গ্রন্থে এটা হযরত আবু হোরাযরাহ (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন; ইমাম কাজী আযাজ (রহমতুল্লাহে আলাইহে), ‘শেফা শরীফ’, ১:১৯; আল-হায়তামী আপন ‘মজমাউল যওয়াঈদ ওয়া মানবা’আ আল-ফওয়াঈদ’ ৯:২৪ পৃষ্ঠকে বর্ণনা করেন যে আল-বাযযারের সূত্রে বিবরণটি সহীহ এবং সেটার সকল বর্ণনাকারী-ই নির্ভরযোগ্য; ইবনে কাসীর, ‘আল-বেদায়া ওয়ান্ নেহায়া’, ৪:২৫৭; এবং যাইনুদ্দীন আবু আল-ফযল আল-এরাকুতী তাঁর ‘তারহু আল-তাতিরাব ফী শরহিল-তাকুরীব’ ৩:২৯৭ কিতাবে এই বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন। একটু আলাদা শব্দ চয়নে এই বিবরণটি হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু)-ও পেশ করেছেন; আরো বর্ণনা করেছেন আদ-দায়লামী নিজ ‘আল-ফেরদৌস বি-মা’সূর আল-খিতাব’ ২:১৩৭-১৩৮ #২৭০১ বইয়ে; এবং আল-আজলুনী আপন ‘কাশফ আল-খাফা ওয়া মুযীল আল-এলবাস’ ১:৪৪২ #১১৭৮ পৃষ্ঠকে। বকর বিন আবদ-আল্লাহ আল-মুযনী এই বিবরণটি পেশ করেছেন একটি মুরসাল সনদে; আরো বর্ণনা করেছেন শায়খ ইবনে সাআদ নিজ ‘আল-তাবাকাত আল-কুবরা’ ২:১৯৪ কিতাবে; ইবনে এসহাক, ‘ফযল আল-সালাত আলাল্ নবী’, ১:৩৮-৩৯ #২৫-২৬; আল-সুবকী, ‘শিফা আল-সিকাম ফী যিয়ারাতে খায়র আল-আনাম’, ৩৪ পৃষ্ঠা; আহমদ বিন আবদীল হাদী নিজ ‘আল-সারিম আল-মুনকী ফীল-রাঈ আল-আল-সুবকী’ ২৬৬-২৬৭ পৃষ্ঠকে এটা সহীহ সনদে বর্ণনা করেন এবং এতে বকর হাঃছেন নির্ভরযোগ্য রাবী/বর্ণনাকারী; মুহাদ্দিস ইবনে আর-জাওয়ী তাঁর ‘ওয়াফা বি-আহওয়ালিল মোস্তফা’ ৮২৬ #১৫৬৪-১৫৬৫ পৃষ্ঠকে

এই হাদীসটি স্পষ্টভাবে এ বাস্তবতা প্রতীয়মান করে যে, মহাসম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বেসাল শরীফ মুসলিম উম্মাহ’র জন্যে ঠিক সে রকম রহমত, যেমনটি সমগ্র জগতের মাঝে তাঁর প্রকাশ্য উপস্থিতি (খোদায়ী) করুণা।

৭.৬ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বেসাল তাঁর উম্মতের জন্যে সুপারিশের এক উৎসস্বরূপ

হযরত আবু মূসা আশ’আরী (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের বেসাল শরীফ সম্পর্কে এরশাদ ফরমান:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةً أُمَّةٍ مِنْ عِبَادِهِ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةً أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيَّهَا حَيًّا، فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ

-আল্লাহ তা’আলা যখন কোনো উম্মতের প্রতি তাঁর করুণা বর্ষণের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি (ওই উম্মতের) পয়গম্বর (আলাইহিস্ সালাম) কে ওদের সামনে স্থাপন করেন। তিনি পয়গম্বর (আলাইহিস্ সালাম) কে তাঁর জাতির জন্যে শাফাআত তথা সুপারিশের উৎস বানান। আর যখন আল্লাহ পাক কোনো জাতিকে শাস্তি দিতে চান, তখন তিনি ওই জাতিকে মর্মস্ত্রদ

এটা বর্ণনা করেন সর্ব-হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) ও বকর বিন আবদিল্লাহ (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) উভয় হতে; আল-সৈয়ুতী নিজ ‘কিফায়াত আল-তালিব আল-লাবীব ফী খাসাইসিল-হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)’ ২:৪৯১ ও ‘মানাহিল আল-সাফা ফী তাখরীজে আহাদীস আল-শিফা’ পৃষ্ঠা ৩ পৃষ্ঠক দুটোতে লিখেন যে ইবনে আবী উসামা তাঁর ‘আল-মুসনাদ’ কিতাবে এটা হযরত বকর বিন আবদিল্লাহ (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন এবং আল-বাযযার আপন ‘আল-মুসনাদ’ গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) হতে সহীহ সনদে বর্ণনা করেন; এটা আল্লামা খাফজাজী-ও সমর্থন করেন এবং মোল্লা আলী ক্বারী সাহেব যথাক্রমে ‘শেফা শরীফ’, ‘নাসীম আল-রিয়াদ’ ১:১০২ এবং ‘শরহে শেফা’ ১:৪৫ ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থগুলোতে এটা বর্ণনা করেন; আর আল-আজলুনী বর্ণনা করেন ‘কাশফ আল-খাফা ওয়া মুযীল আল-এলবাস’ ১:৪৪২ #১১৭৮ গ্রন্থে।

শান্তি দেন তাদের পয়গম্বরের (আলাইহিস্ সালাম) জীবদ্দশাতেই; এতে ওই জাতির পয়গম্বর (আলাইহিস্ সালাম)*কে এটা দেখিয়ে স্বস্তি দেয়া হয় (এ কারণে) যে তারা তাঁকে (মিথ্যুক বলে) প্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং তাঁর আনা ঐশী বিধানকেও অমান্য করেছিলো।^{৪২৫}

মোল্লা আলী ক্বারী (ইন্তেক্বাল: ১০১৪ হিজরী) ‘ফারাত’ শব্দটি ব্যাখ্যাকালে লেখেন:

أَصْلُ الْفَرْطِ هُوَ الَّذِي يَتَقَدَّمُ الْوَارِدِينَ لِيُهَيِّئَ لَهُمْ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ عِنْدَ نُزُولِهِمْ فِي مَنَازِلِهِمْ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ لِلشَّفِيعِ فَيَمْنُ خَلْفَهُ

–‘ফারাত’ শব্দটি মূলতঃ এমন কাউকে বোঝায়, যিনি অন্যদের অগ্রবর্তী হন, যাতে অন্যরা কোনো স্থানে থামলে তাদের প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা তিনি (আগেভাগে) তৈরি করে রাখতে পারেন। অতঃপর এই শব্দের ব্যবহারিক অর্থ উদ্দেশ্য করেছে ওই (পবিত্র) সত্তাকে, যিনি এমন অন্যদের হয়ে শাফাআত/সুপারিশ করেন, যারা এখনো তাঁর পরে আগমন করেননি।^{৪২৬}

এটা কতো বড় এক আশীর্বাদ যে, কোনো ব্যক্তির দ্বারা পরকালে প্রবেশের আগেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা আপন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)*কে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন, যাতে তিনি (নবী পাক) তাঁর উম্মতের জন্যে শাফাআতের উৎস হতে পারেন। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বেসাল শরীফকে খোদায়ী করুণা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। অতএব, নিঃসন্দেহে এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)*র যাহেরী/প্রকাশ্য জীবনে (দুনিয়ায়) উপস্থিতি ও তাঁর বেসালপ্রাপ্তি - দুটোই

৪২৫. সহীহ মুসলিম বর্ণিত: কিতাব আল-ফাযায়েল, ‘আল্লাহ কোনো জাতিকে আশীর্বাদ দেয়ার ইচ্ছা করলে তিনি তাদের পয়গম্বরকে সামনে স্থাপন করেন’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৭৯১-১৭৯২ #২২৮৮; ইবনে হিব্বান, ‘আল-সহীহ’, ১৫:২২ #৬৬৪৭; আল-বায়হার, ‘আল-বাহর আল-যুখার (আল-মুসনাদ)’, ৮:১৫৪ #৩১৭৭; আল-তাবারানী, ‘আল-মু‘জাম আল-আওসাত’, ৪:৩১৫ #৪৩০৬; এবং ইবনে আসাকির, ‘তারীখ দিমাশকু আল-কবীর’, ১৩:১১-১২।

৪২৬. মোল্লা আলী ক্বারী, ‘শরহে শেফা’, ১:৪৫।

(খোদায়ী) রহমত ও আশীর্বাদের উৎস। তাঁর ধরাধামে শুভাগমন (মীলাদ) হচ্ছে তাঁরই উম্মতের জন্যে সবচেয়ে বড় নেআমত, আর এরই মাধ্যমে আমরা তাঁর (শাফাআতের) দ্বিতীয় আশীর্বাদটুকুও অর্জন করেছি।

৭.৭ কোনো খোদায়ী আশীর্বাদপ্রাপ্তিতে খুশি হওয়া আল্লাহ তা‘লারই বিধান

আমাদের এ বইয়ের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা ব্যাখ্যা করেছি যে, কোনো রহমত/আশীর্বাদপ্রাপ্তিতে আমাদের খুশি প্রকাশ করা ও শোকরগুজার হওয়া সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘লারই আদেশ। পক্ষান্তরে, তিনি অতীতের কোনো দুঃখের ঘটনায় শোক প্রকাশ করতে আমাদের প্রতি আদেশও করেননি; ওই রকম (দুঃখ প্রকাশ) করা বরঞ্চ আল্লাহ তা‘লার আশীর্বাদের প্রতি অকৃতজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ হবে। এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ ফরমান:

وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

–আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠিন।^{৪২৭}

শোক তখনই প্রকাশ করা হয়, যখন কোনো আশীর্বাদ বন্ধ হয়ে যায় এবং যখন ওই নেআমত আর কারোরই জন্যে ফায়দা বয়ে আনে না; যথা - কারো পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণের পরে সেই সন্তানটি মারা গেলে ওই উপলক্ষে দুঃখ-শোক প্রকাশ করা যায়। তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘লার কৃতজ্ঞ বান্দাবন্দ তাঁদের লোকসান সম্পর্কে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করেন না, কেননা পরিবারসদস্যের বিয়োগ বা সম্পদ-সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি প্রত্যেকের জীবনে পরীক্ষাস্বরূপ আবিস্ভূত হয়। আর আল্লাহ তা‘আলা এক আশীর্বাদের পরিবর্তে আরেক আশীর্বাদ দান করেন, যদিও প্রথম আশীর্বাদটি তিনি তুলে নেন। অতএব, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)*র বেসালপ্রাপ্তির প্রতি শোক ও দুঃখ প্রকাশ আমাদের জন্যে (মোটোও) যথাযথ নয়, কেননা আমরা এখনো তাঁর নেআমত হতে উপকার/ফায়দা পাচ্ছি।

৪২৭. আল-কুরআন, ১৪:৭।

৭.৮ আমরা তাঁর রহমত পেয়েছি, তবে কেন এই দুঃখ?

রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রহমত/করণা যদি আর কখনো আমাদের প্রতি অবতীর্ণ না হতো, কিংবা তাঁর সাথে আমাদের (আত্মিক) সংশ্লিষ্টতা রহিত হয়ে যেতো, তাহলে আমাদের জন্যে শোক প্রকাশ করাটা যুক্তিসঙ্গত হতো। কিন্তু আজো মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতের হালত-অবস্থা সম্পর্কে ওয়াক্ফহাল/অবধান; আর তিনি উম্মতের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁদেরকে (আধ্যাত্মিক) সাহায্য ও সহায়তা করছেন। তাঁর বেসাল শরীফের ১৪০০ বছর পরেও তাঁর রহমত-বরকতের কোনো কমতি নেই; কমতি নেই তাঁর আশীর্বাদ, হেদায়াত (পথপ্রদর্শন) ও মো'জিয়া তথা অলৌকিকত্বেরও। তাঁর অনিন্দ্য সৌন্দর্য, মহাসম্মানিত মাক্বাম/মর্যাদা ও মোহরে নবুয়্যত এবং তাঁর অনুগ্রহ ও মনোযোগে যেখানে ছেদ পড়েনি, সেখানে দুঃখ-বেদনার কোনো প্রয়োজন আছে কি? আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

—প্রতিটি প্রাণকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।^{৪২৮}

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও নিঃসন্দেহে (ইহলৌকিক) এক জীবন হতে (পারলৌকিক) আরেক জিন্দেগীতে অতিক্রান্ত হয়েছেন, যেটা বাস্তবে তাঁরই প্রকৃত ও চিরস্থায়ী হায়াত। কোনো ঈমানদার ও বেঈমানের পারলৌকিক জীবনে যেখানে বিশাল ব্যবধান বিদ্যমান, সেখানে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উখরাভী হায়াত ও একজন সাধারণ মানুষের পারলৌকিক জীবনের মধ্যে সম্ভাব্য কী-ই বা সাযুজ্য থাকতে পারে? সাধারণ মানুষের চোখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেসালপ্রাপ্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠজন, ঈমানদার পুণ্যাত্মাদের মধ্যে যাঁরা মনোনীতজন, তাঁরা তাঁকে এখনো নিজেদের সচেতন (মানে সজাগ) অবস্থায় দেখতে সক্ষম। ইমাম জালালউদ্দীন সৈয়ুতী (৮৪৯-৯১১ হিজরী) হলেন ওরকম একজন খোদার

৪২৮. আল-কুরআন, ২১:৩৫ ও ২৯:৫৭।

মনোনীত বান্দা, যাঁর সারা জীবনে অন্ততঃ ৭৫ বার নসীব হয়েছিলো স্বচক্ষে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দর্শন লাভের।^{৪২৯}

প্রিয় পাঠক! আপনি কি প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র রওয়া মোবারকের যেয়ারত সেভাবেই করেন, যেভাবে অন্যান্য কবর যেয়ারত করে থাকেন? মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রওয়া শরীফ এমনই এক পুতঃপবিত্র স্থান, যেখানে সর্ব-হযরত জুনায়েদ আল-বাগদাদী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) ও বায়েযীদ বোস্তামী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) সম্মান ও সমীহ সহকারে নিঃশব্দে নিঃশ্বাস নিনেন। তিনি এই পবিত্র জায়গায় নিজের প্রকাশ্য জিন্দেগীতে যখন উপস্থিত ছিলেন তখন যেমন প্রত্যেকে ওই স্থানটিকে সম্মান করতেন, ঠিক তেমনি ওই পবিত্র স্থানটির প্রতি বর্তমানেও প্রত্যেকের সেভাবে সম্মান প্রদর্শন করা একান্ত আবশ্যিক। আজকে আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা সামগ্রিকভাবে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উচ্চমর্যাদার বাস্তবতা সম্পর্কে, অথবা তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট ওই সব স্থানের পবিত্রতা সম্পর্কেও অনবধান; বাস্তবে আমরাই হলাম হাঁটা-চলা ও কথপোকথনকারী মুর্দা (লাশ), যারা জীবনশূন্য; পক্ষান্তরে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'লার ওই সকল প্রিয় বান্দা যাঁরা তাঁদের মাযার-রওয়ায় অবস্থান করছেন, তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে জীবিত।

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু (রুহানীভাবে) জীবিত-ই নন, তিনি আমাদের সালাত-সালাম শুনতে পান এবং এমন কী প্রত্যুত্তরও দেন।^{৪৩০} তবে আমরা তাঁর এই জবাব আমাদের কানে শুনি না; কেননা

৪২৯. ইমাম আবদুল ওয়াহহাব শারানী, আল-মীযান আল-কুবরা, ১:৪৪।

৪৩০. আবু দাউদ, 'আল-সুনান: কিতাব আল-মানাসিক' (হজ্জের রীতিনীতি-সংক্রান্ত বই), 'মাযার যেয়ারত' অধ্যায়, ২:১৭৫ #২০৪১; আহমদ বিন হাম্বল, 'আল-মুসনাদ', ২:৫২৭; আল-তাবারানী, 'মু'জাম আল-আওসাত', ৪:৮৪ #৩১১৬; আল-বায়হাক্বী, 'শু'আব আল-ঈমান', ২:২১৭ #১৫৮১; আবু নুয়াইম, 'হিলইয়া আল-আউলিয়া ওয়া তাবাক্বাত আল-আসফিয়া', ৬:৩৪৯; মুনিরী, 'আল-তারগীব ওয়াল-তারহীব মিন আল-হাদীস আল-শরীফ', ২:৩৬২ #২৫৭৩; আল-হায়সামী, 'মজমাউল যাওয়াইদ ওয়া মানবী' আল-ফাওয়াইদ', ১০:১৬২; আল-মাকুরীযী, 'এমতা' আল-আসমা' বি মা লি নাবী মিন আল-আহওয়াল ওয়াল-আমওয়াল ওয়াল-হাফাদা ওয়াল-মাতা', ১১:৫৯; ইবনে কাইয়েম, 'জালা' আল-আফহাম ফীল-সালা' ওয়াল-সালাম 'আলা খায়র আল-আনাম', ১৯ পৃষ্ঠা #২০; এবং আল-সাখাভী, 'আল-কুওল আল-বাদী' ফীল-সালা' 'আলাল্ হাবীব আল-শাফী', ১৫৬ পৃষ্ঠা।

আমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি এই বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত (আল্লাহ তা'লার পুণ্যবান বান্দাবৃন্দের ঠিক বিপরীতে)। অতএব, মো'মেন মুসলমানদের সমাজ হিসেবে (মীলাদ উপলক্ষে) খুশি উদযাপনে আমাদের বাধ্যবাধকতা রয়েছে; কেননা এ উপলক্ষে দুঃখ ও শোক প্রকাশের কোনো ভিত্তি-ই নেই।

৭.৯ শেষ বিচার দিবস অবধি মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিষ্ঠিত

কলেমা **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ** 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন তাঁরই প্রেরিত রাসূল/পয়গম্বর' -বাক্যটি এই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে যে, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রকাশ্য জিন্দেগীতে যেমন তাঁর নুবুয়্যত সত্য ছিলো, তা শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত জারি তেমনি থাকবে। কেউই এ কথা দাবি করতে পারবেন না 'মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল ছিলেন;' কেউ এরকম মন্তব্য করলে তিনি ইসলামে এখনো দাখিল হতে পারেন নি। কেননা মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র নুবুয়্যত ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত স্থায়ী মর্মে বিশ্বাস করাটা ঈমানের একটি মৌলিক পূর্বশর্ত।

অনুরূপভাবে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন 'খা'তেম আল-নাবিয়্যীন' তথা নুবুয়্যতের সীলমোহর। পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূল (আলাইহিস্ সালাম) এসেছেন এবং চলে গিয়েছেন; তাঁদের নুবুয়্যত পরবর্তী পয়গম্বরের (আলাইহিস্ সালাম) আগমন দ্বারা সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'লার সর্বশেষ পয়গম্বর। তাঁর পরে আর নতুন কোনো পয়গম্বর এসে তাঁর নুবুয়্যতের সমাপ্তি টানবেন না। অতএব, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে আমাদেরই রাসূল, ঠিক যেমনটি ছিলেন সাহাবা (রাহিয়াল্লাহু আনহুম)'বৃন্দের, এ মর্মে বিশ্বাস

করা বাধ্যতামূলক; আর এ-ও বিশ্বাস করা জরুরি যে শেষ বিচার দিবস অবধি তিনি-ই হলেন সমস্ত অনাগত প্রজন্মের রাসূল।

একমাত্র পার্থক্য, যদি কোনো পার্থক্য থেকে থাকে, তা হলো সাহাবামণ্ডলী (রাহিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁকে ৬৩ বছর যাবৎ নিজেদের চর্মচক্ষে দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন; আর আজকে সামান্য কিছু সংখ্যক মনোনীত জন নিজেদের স্বপ্নে কিংবা জাগ্রত অবস্থায় তাঁকে ঘন ঘন দেখার সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বিশ্বস্ত ও অনুগত গোলামদেরকে বর্তমানেও তাঁর করুণা প্রদর্শন করেন তাঁদেরকে হেদায়াত দিয়ে; তিনি তাঁদেরকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং তাঁরা দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময়কালে তিনি তাঁদের রুহ/আত্মাবৃন্দকে স্বাগত জানাতে আগমন করেন।

৭.১০ খুশি প্রকাশ কোনো বেদআত নয়: এটা মানবপ্রকৃতি

কোনো রহমত/বরকতপ্রাপ্তিতে খুশি প্রকাশ করা মানবপ্রকৃতির মৌলিক একটি অংশ। ইতিপূর্বে আমরা পেশ করেছি জানাযা/দাফনের একটি উদাহরণ ও পরিবারের অনুভূত শোক। আমরা বলেছিলাম, ওই জানাযার অল্পকাল পরেই পরিবারটিতে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান হবার কথা থাকলে তা নিশ্চিতভাবেই বাতিল হয়ে যেতো। তা যদি পিছিয়ে না-ও দেয়া হতো, তবুও মরহুমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনস্বরূপ বিয়ের আয়োজন যথাসম্ভব অনাড়ম্বরভাবে করা হতো। অতঃপর যদি একই পরিবারে পাঁচ বা দশ বছর পরে আবারো কোনো বিয়ের আয়োজন হয়, তাহলে সর্বাঙ্গিক আনন্দ-ফুটির সাথে সমস্ত রীতি-রেওয়াজ পালন করে বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে। এর মানে এই নয় যে, ওই পরিবারটি পরলোকগত মরহুমকে একেবারেই ভুলে গিয়েছেন বা তাঁর শোক কাটিয়ে ওঠেছেন। সহজভাবে বলতে গেলে শোক-দুঃখের অনুভূতি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে মানুষকে আচ্ছন্ন করাটা মানবপ্রকৃতির একটি অংশ; কিন্তু সময়ের পরিক্রমণে মানুষ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় এবং ঘটনা যেতাই মর্মান্তিক ও বিয়োগান্ত হোক না কেন, অতীত দুঃখ-শোক কাটিয়ে ওঠে।

ইসলাম ধর্মের মহান উলামাবৃন্দ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমন দিবস উদযাপন করা শরীয়তেরই সারাংশ এবং তা মানব প্রকৃতির মৌলিক প্রয়োজনও; অপর দিকে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র বেসাল শরীফে শোক প্রকাশ শরীয়তের পরিপন্থী এবং তা ইসলামের অপরিবর্তনীয় মৌলনীতিমালার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। ইমাম আল-সৈয়ুতী (৮৪৯-৯১১ হিজরী) এই নীতি সম্পর্কে বলেন:

إِنَّ وَلَادَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمُ النِّعَمِ عَلَيْنَا، وَوَفَاتُهُ أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ لَنَا، وَالشَّرِيعَةُ حَثَّتْ عَلَى إِظْهَارِ شُكْرِ النِّعَمِ وَالصَّبْرِ وَالسُّكُونِ وَالْكَتْمِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ، وَقَدْ أَمَرَ الشَّرْعُ بِالْعَقِيقَةِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ وَهِيَ إِظْهَارُ شُكْرِ وَفَرَجٍ بِالْمَوْلُودِ، وَلَمْ يَأْمُرْ عِنْدَ الْمَوْتِ بِذَنْجٍ وَلَا بِغَيْرِهِ. بَلْ نَهَى عَنِ التِّيَاخَةِ وَإِظْهَارِ الْحُزَنِ، فَذَلَّتْ قَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ عَلَى أَنَّهُ يُحْسَنُ فِي هَذَا الشَّهْرِ إِظْهَارُ الْفَرَجِ بِوِلَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ إِظْهَارِ الْحُزَنِ فِيهِ بِوَفَاتِهِ.

অর্থ: নিশ্চয় মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মীলাদ তথা ধরাধামে শুভাগমন আমাদের প্রতি (খোদা তা‘আলার) সবচেয়ে বড় নেআমত/আশীর্বাদ; আর তাঁর বেসালপ্রাপ্তি তথা পরলোকে খোদার সাথে মিলনপ্রাপ্তি আমাদেরকে আক্রান্তকারী সবচেয়ে মারাত্মক দুর্যোগ। শরীয়ত বা ঐশী বিধান আমাদেরকে আশীর্বাদপ্রাপ্তির সময় কৃতজ্ঞ হতে উৎসাহিত করে, আর দুর্যোগকালে ধৈর্যধারণের, আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সমর্পণের ও শান্ত থাকার নির্দেশ দেয়। কোনো শিশুর জন্মকালে ‘আক্বীক্বা’ পালনের জন্যে ঐশী বিধানদাতা আমাদের প্রতি আদেশ জারি করেছেন এবং সেটা ওই নবজাতকের খাতিরে কৃতজ্ঞতা ও খুশি প্রকাশের উদ্দেশ্যে করা হয়; কিন্তু কোনো শিশুর ইন্তেকাল হলে পশু কুরবানী বা অনুরূপ কিছু করতে তিনি আমাদের প্রতি আদেশ দেননি। বস্তুতঃ তিনি (ঐশী বিধানের প্রতি) অসন্তোষ প্রকাশক বিলাপ ও কান্নাকাটি নিষেধ করেন। অতএব, শরীয়তের নীতিমালা ইঙ্গিত করে যে এই (রবীউল আউয়াল) মাসে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মীলাদ নিয়ে খুশি

প্রকাশ করা প্রশংসনীয় কাজ; আর তাঁর বেসালপ্রাপ্তিতে শোক প্রকাশ করা প্রশংসনীয় মর্মে কোনো ইশারা এতে নিহিত নেই।^{৪৩১}

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র বেসালপ্রাপ্তি (আমাদের প্রতি) এই দাবি রাখে যে মুসলমান সাধারণের এটা সম্পর্কে কখনোই বিস্মৃত হওয়া চলবে না, কেননা তাঁর নুবুয়্যতের নেআমত/আশীর্বাদ শেষ দিনটি পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। হুযূরে পাকের (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বরযখী/অন্তর্বর্তী পারলৌকিক জীবন তাঁরই দুনিয়াবী যাহেরী জিন্দেগী হতে উত্তম। এ বিষয়ে মোল্লা আলী ক্বারী সাহেব লেখেন:

لَيْسَ هُنَاكَ مَوْتُ وَلَا فَوْتُ بَلْ انْتِقَالَ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ وَإِرْتِحَالٌ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ.

অর্থ: (বস্তুতঃ) কোনো মৃত্যু বা ওফাত নেই, স্রেফ আছে এক হালত-অবস্থা থেকে আরেক হালত-অবস্থায় ইনতেকাল/স্থানান্তর, এক বসত ঘর থেকে পরবর্তী আবাসস্থলে (স্থানান্তর)।^{৪৩২}

আমরা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি কেন মুসলমানদের প্রথম প্রজন্ম মীলাদ (ব্যাপকভাবে) পালন করেননি; এটা এ কারণে যে, ১২ই রবীউল আউয়াল তারিখ যখন-ই আগমন করতো, সাহাবা-এ কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাদ্জিন)‘এর মনে পড়ে যেতো তাঁদের মাঝে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘এর পবিত্র জীবনযাপন এবং এর পাশাপাশি তাঁর বেসাল শরীফ-ও। এর দরুন তাঁদের মনে খুশি ও দুঃখের এক মিশ্র আবেগ-অনুভূতি দেখা দিতো, আর তাতে দুঃখ-ভারাক্রান্ত ভাবই তাঁদেরকে আচ্ছন্ন করতো বেশি। তবে কয়েক শতাব্দী পরে এই বেদনার অনুভূতি হ্রাস পায় এবং প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র পবিত্র বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনের খুশি ওর স্থলাভিষিক্ত হয়। ফলে মানব প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র উদযাপন জারি হয়; আর এর অনুশীলন বর্তমানকাল পর্যন্ত জারি আছে। এই প্রসঙ্গে মুফতী মুহাম্মদ মাযহারউল্লাহ দেহেলভী সাহেব লেখেন:

৪৩১. আল-সৈয়ুতী, ‘হুসন আল-মাকুসিদ ফী আমালিল মওলিদ’, ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা; এবং আল-সৈয়ুতী, ‘আল-হা‘ওয়ী লিল-ফাতা‘ওয়া’, ২০৩ পৃষ্ঠা।

৪৩২. মোল্লা আলী ক্বারী, ‘শরহুল শেফা’, ১:৪৫।

বারো রবীউল আউয়াল তারিখে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করা এ শর্তে যে তা সহীহ হাদীসের ওপর ভিত্তিশীল হবে এবং জশনে জুলুস-মিছিল বের করা এ শর্তে যে তাতে কোনো হারাম কাজ সংঘটিত হবে না- এই দুটোই বৈধ কাজ। এর পরিপন্থী কোনো বক্তব্য পেশ করতে হলে শরীয়তের দলিল প্রয়োজন হবে। আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি এর সমালোচকবর্গের কাছে মীলাদের বিরুদ্ধে তাদের কী দলিল আছে? সাহাবা-এ কেরাম (রাঃদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুম) মীলাদ পালন করেননি বা এভাবে জশনে জুলুস-মিছিলের আয়োজন ঠিক নয় মর্মে যুক্তি উপস্থাপন করা চলবে না, কেননা কোনো জায়েয/অনুমতিপ্রাপ্ত কাজ না করলেই তা না-জায়েয/অবৈধ হবার দলিল হয় না।^{৪৩৩}

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র প্রথম উর্দু জীবনীগ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছেন মুফতী মুহাম্মদ ‘এনায়াত আহমদ কা’কুরাউয়ী (১২২৮-১২৭৯ হিজরী)। তিনি লেখেন যে মীলাদ উদযাপন করা হয় এ কারণে, যাতে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র ধরাধামে শুভাগমনের প্রতি খুশি প্রকাশ করা যায়; আর এ উপলক্ষে শোক প্রকাশ সহনীয় নয়। তিনি লেখেন:

মুসলমান সর্বসাধারণের উচিত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মহব্বতের খাতিরে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাহফিল আয়োজন করা এবং তাতে অংশগ্রহণ করা। তবে শর্ত থাকে এই যে, (প্রত্যেকের) নিয়ত হতে হবে আন্তরিক এবং প্রদর্শনীমুক্ত। উপরন্তু, বর্ণিত ঘটনাবলী হওয়া উচিত নির্ভরযোগ্য এবং হযূরের (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাবতীয় মো‘জেযা-ও হওয়া উচিত বিশ্বস্ত সূত্রের; কেননা বেশির ভাগ মানুষই এ ধরনের মাহফিলে কাব্য ও অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা শুনে সন্তুষ্ট থাকেন। উলামাবৃন্দ আরো উল্লেখ করেন যে এসব মজলিশে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বেসাল শরীফের বর্ণনা যেনো না দেয়া হয়; কেননা এ ধরনের মজলিশ প্রফুল্লচিত্তের; তাই দুঃখ-বেদনার স্মরণ এসব মাহফিলে যথাযথ নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি

ওয়াসাল্লাম)-এর বেসাল শরীফের বিষয়টি সম্পর্কে দুটি পবিত্র মসজিদে কখনোই আলোকপাত করা হয়নি।^{৪৩৪}

বস্তুতঃ মীলাদ কোনো বেদআত তথা নতুন প্রচলন নয়; বরঞ্চ এটা স্বতন্ত্রভাবে মানব প্রকৃতি। তাই মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র জমায়েতগুলোকে ইসলামী সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলাটা মোটেও ভুল নয়।

৭.১১ কোনো ঘটনা/অনুষ্ঠান পালন প্রথম প্রজন্মের সংস্কৃতি ছিল না

মীলাদের উদযাপন হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘এর সাথে কারো (মহব্বতের) আবেগপূর্ণ সংশ্লিষ্টতার এক সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশ। আমরা যদি প্রথম প্রজন্ম হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামী ইতিহাসের বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখা যাবে প্রতিটি যুগে মানব সমাজের বিভিন্ন অংশ আনন্দ-খুশি ও দুঃখ-বেদনা প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইতিহাস পরিবর্তনে অবদান রেখেছে এমন কিছু ঘটনার দৃষ্টান্ত আমরা এখানে উপস্থাপন করবো:

৭.১১.১ মদীনায হিজরত

ইতিহাসের বইপত্রে লিপিবদ্ধ আছে যে, মদীনাবাসী জনগণ যখন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র মদীনায হিজরত করার সংকল্প সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন তাঁরা ফজর নামায শেষে প্রতিদিন সকালে মদীনা নগরীর তিন কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত ‘হারী’ নামের একটি স্থানে সফর করে যেতেন; সেখানে তাঁরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে অপেক্ষা করতেন, যদিও দিনের তাপমাত্রা চড়ে যেতো। উষ্ণতা চরমে পৌঁছুলে এবং আর কোনো ছায়া অবশিষ্ট না থাকলেই কেবল তাঁরা

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজেদের বাড়ি ফিরে যেতেন। মদীনাবাসীদের সম্পর্কে
হযরত আবদুর রহমান বিন উওয়াইম বিন সা'ঈদা (রাঃ) আল্লাহু আনহু
বলেন:

لَمَّا سَمِعْنَا بِمُخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ، وَتَوَكَّفْنَا قُدُومَهُ، كُنَّا نَخْرُجُ إِذَا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ، إِلَى ظَاهِرِ حَرَّتِنَا، نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَاللَّهِ! مَا نَبْرُحُ حَتَّى تَغْلِبَنَا الشَّمْسُ عَلَى الظَّلَالِ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ ظِلًّا دَخَلْنَا، وَذَلِكَ فِي أَيَّامِ حَارَّةٍ.

অর্থ: আমরা যখন গুনতে পাই প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কা নগরী ত্যাগ করেছেন, তখনই আমরা তাঁর প্রতীক্ষায় থাকি। আমরা ফজর নামায শেষে হারী'র উন্মুক্ত স্থানটিতে গমন করতাম; আর সেখানে তাঁরই অপেক্ষায় থাকতাম। আল্লাহর নামে শপথ! আমরা সেখানে ততোক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করতাম, যতোক্ষণ সূর্য হতে কোনো ছায়া আর অবশিষ্ট থাকতো না। অতঃপর আমরা কোনো ছায়া অবশিষ্ট না পেলে বাড়ি ফিরে যেতাম; কেননা তা ছিলো ভর গ্রীষ্মকাল।^{৪৩৫}

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মদীনা মোনাওয়ারায়
 শুভাগমন করেন, শহরবাসী সর্বসাধারণ তখন খুশিতে আত্মহারা হন। তাঁর
 শুভাগমনে তাঁরা এতোখানি আনন্দিত হন যে, তাঁকে স্বাগত জানাতে
 প্রত্যেকেই শহরের বাইরে চলে আসেন। মদীনা মোনাওয়ারার শিশুরা দফ
 বাদ্য বাজিয়ে খুশি প্রকাশক স্বাগত সঙ্গীত গাইতে থাকে; সকল মানুষ
 জ্বলুস-মিছিল করে উচ্চস্বরে সালামসূচক না'রা ধ্বনি দিতে থাকেন; ওই
 সময় তাঁরা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সাথে সাথে হাটতে
 থাকেন, যতোক্ষণ না তাঁরা হযরত খালিদ বিন যাইদ আবু আইয়ুব আল-

৪৩৫. ইবনে হিশাম এটা বর্ণনা করেন 'আল-সীরাতে আল-নববীয়া' পুস্তকে, ৪২৩ পৃষ্ঠা; আল-তাবারী কৃত 'তারীখ আল-উমাম ওয়াল-মুলুক', ১:৫৭১; আল-যাহাবী রচিত 'তারীখ আল-ইসলাম ওয়া ওয়াফা'য়া'ত আল-মাশাহীর ওয়াল-'আলম' (আল-সীরাতে আল-নববীয়া), ১:৩৩১; ইবনে কাসীর প্রণীত 'আল-বেদায়া ওয়াল-নেহায়া', ৩:১৯৬; এবং আল-খাযাঈ লিখিত 'তাক্বরীজ আল-দালা'লাত আল-সামি'ইয়া 'আলা মা' কা'না ফী আহদ রাসুল আল্লাহ মিন আল-হার্ফ', ৪৪৬ পৃষ্ঠা।

আনসারী (রাহিয়াল্লাহু আনহু)’র গৃহে পৌঁছেন। এখানেই প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা’আলা ইয়াহি ওয়াসাল্লাম)’র বাসস্থান হয়।

মদীনা মোনাওয়ারায় হিজরত ছিলো ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। এই হিজরত একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তিস্তর স্থাপন করেছিলো, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে আরব উপদ্বীপে ইসলাম ধর্মের আধিপত্য বিস্তারের নিয়ামক হয়েছিলো। অতএব, মদীনা মোনাওয়ারায় তাঁর শুভাগমন দিবসটি ছিলো এক মহা তাৎপর্যময় ও খুশির দিন। তথাপি মদীনাবাসী জনগণ এই দিনটি উদযাপন করেননি, কেননা এটা তাঁদের সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের অংশ ছিলো না। তবে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র শুভাগমন উপলক্ষে মদীনাবাসী জনগণ মহাসম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর জন্যে এক চমক সৃষ্টিকারক অভ্যর্থনার আয়োজন করেছিলেন; অন্ততঃ এই দৃষ্টান্ত থেকে এ মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তাৎপর্যপূর্ণ কোনো ঘটনায় খুশি প্রকাশ করা এবং সে উপলক্ষে ব্যাপক আয়োজন দ্বারা তা উদযাপন করা একদিকে যেমন জায়েয/বৈধ, তেমনি অপরদিকে তা মানবপ্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ-ও। এই বিষয়টি মানবের প্রাকৃতিক/সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের সাথে সম্পর্কিত; এতে এমন কোনো কিছুই অস্তিত্ব নেই যা শরীয়তের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অতএব, এর প্রতি বেদআত/নতুন প্রচলনের অভিযোগ উত্থাপন এবং এটাকে প্রত্যাখ্যানের জন্যে অজুহাত তৈরি করা এমন-ই এক ব্যাধির ইঙ্গিতবহ, যা কারো অন্তরের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত এবং তা (মানে অজুহাত) ধর্মীয় ন্যায্যতাপূর্ণও নয়।

୧.୧୧.୨ ଯଦୀନା ଅନନ୍ଦ

মদীনা মোনাওয়ারায় প্রবেশের পরে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনাবাসী আনসার (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও মক্কার মুহাজির (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বৃন্দের সাথে পরামর্শক্রমে মদীনার ইহুদী গোত্রগুলোর সাথে একটি সন্ধিচুক্তি প্রণয়ন করেন। এই ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তিকে মদীনার সনদ তথা শান্তিচুক্তি হিসেবে স্মরণ করা হয়। ওই দিন প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) সেটার প্রথম সাংবিধানিক রাষ্ট্রপ্রধান হন। মুসলমানদের জন্যে এই ঘটনাটি প্রকৃতপ্রস্তাবেই উদযাপনযোগ্য ছিলো; তবুও মদীনাবাসী জনগণ দিনটি উদযাপন করেননি, কেননা সেটা তাঁদের সংস্কৃতির অংশ ছিলো না।

৭.১১.৩ বদর দিবস

হিজরতের পরে মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে খুশির দিন ছিলো বদর দিবস, যেদিন মিথ্যের ওপরে সত্যের ফায়সালাকারী জয় সূচিত হয়েছিলো। এই দিনটি ছিলো মুসলমানদের অনুপ্রেরণার একটি উৎস, যেহেতু ওই বিজয় এসেছিলো সর্বশক্তিমান খোদা তা‘আলার তরফ থেকে একটি (ঐশী) নিদর্শনস্বরূপ; এটা এমনই তাৎপর্যপূর্ণ দিন ছিলো যে কুরআন মজীদে এটাকে **يَوْمَ الْفُرْقَانِ** তথা ‘পার্থক্যকারী/ মীমাংসাকারী (সিদ্ধান্তের) দিবস^{৪৩৬}’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। যদিও এই দিনটির বার্ষিকী প্রতি বছর ঘুরে আগমন করতো, তথাপিও সাহাবা-এ কেরাম (রাঃদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাদ্দীন) তা উদযাপনের কোনো আয়োজন করতেন না। কেননা এই ধরনের বিষয় তাঁদের সংস্কৃতির অংশ ছিলো না।

৭.১১.৪ মক্কা বিজয়

একইভাবে, মদীনায় হিজরতের পরে যেদিন মক্কা বিজয় সূচিত হয়, সে দিনটিও তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো; এই দিনটিতেই আরব এলাকায় ইসলাম ধর্ম সবচেয়ে আধিপত্যশীল শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ১০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে মক্কা নগরীতে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন। এটা সেই একই নগরী যেখান থেকে তিনি ও তাঁর সাহাবাবুন্দ (রাঃদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুম) কুফফারবর্গের নির্ধ্বংস ও শত্রুতার কারণে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। আল-কুরআন এ মহিমামণ্ডিত দিনটির প্রতি উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করেছে - **فَتْحًا مُبِينًا** তথা ‘সমুজ্জ্বল

বিজয়^{৪৩৭}। এর চেয়ে বেশি খুশির দিন আর কোনটি হতে পারে? তবুও মুসলমানবৃন্দের প্রথম প্রজন্ম এটাকে উদযাপন করেন নি, কেননা তা তাঁদের সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের অংশ ছিলো না।

৭.১১.৫ শবে কদর: কুরআন নাযেলের রাত

রমজান মাসের ২৭ তারিখের রাতটি (২৬ তারিখের দিনগত রাত) ওই (খোদায়ী) আশীর্বাদময় রাত, যা‘তে কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছিলো। এই মহিমামণ্ডিত রজনীতে আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার দান করেন - সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘কে প্রেরণ করেন - যিনি শেষ বিচার দিবস পর্যন্ত আমাদের হেদায়াত/সঠিক পথের দিকনির্দেশনার অসীল বা মাধ্যম হন। কিন্তু এমন একটি রাতও বার্ষিক উদযাপনের উপলক্ষ হয়নি; কেননা তা ওই যুগের প্রথা ছিলো না।

৭.১১.৬ নবযুগের নব চাহিদা

আমরা যদি বর্তমান জগতের দিকে আরো গভীরভাবে তাকাই, তাহলে উপলব্ধি করতে পারবো যে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ দিবসগুলোই কেবল আমরা উদযাপন করি না, বরঞ্চ আধুনিক যুগের চাহিদানুযায়ী প্রচলনকৃত অনেক নতুন উৎসবও আমরা জাতীয় পর্যায়ে উদযাপন করে থাকি।

এই আলোচনার সার-সংক্ষেপ হলো, ধর্মীয় গুরুত্বসম্পন্ন ও জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ দিবসগুলো উদযাপন করাটা মুসলমানবৃন্দের প্রথম প্রজন্মের ঐতিহ্য ছিলো না। সাহাবা-এ কেরাম (রাঃদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাদ্দীন) কুরআন নাযেলের দিবস, এয়াওমে বদর ও মক্কা বিজয়ের দিনের মতো ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলোকে উদযাপন করতেন না; কেননা সেটা তাঁদের প্রথা

ছিলো না। এই বাস্তবতা সত্ত্বেও ইসলাম ধর্মের তাৎপর্যপূর্ণ দিনগুলোকে চিহ্নিত করার গুরুত্বকে এটা কোনোভাবেই খর্ব করে না।

আজকের দুনিয়ায় অন্যান্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর মতোই পাকিস্তানও (লেখকের জন্মভূমি; তবে তিনি বর্তমানে ক্যানাডার নাগরিক) দৃঢ় হতে দৃঢ়তর আত্মবিশ্বাস ও মহিমাসহ নিজ স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছে। (কেননা) একবিংশ শতাব্দীতে এটা অন্যান্য জাতিরও প্রথা। আধুনিক সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে এ প্রথা। অনুরূপভাবে, সৌদি আরব ও বেশ কিছু মধ্যপ্রাচ্যের দেশে তাদের নেতৃবর্গ যে দিনগুলোতে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ওই রাজ্যগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়, সেসব দিনও উদযাপিত হয়ে থাকে। তারা ওই উদযাপনকে ‘আল-ঈদ আল-ওয়াতানী’ (জাতীয় উৎসব দিবস) হিসেবে উল্লেখ করেন। একইভাবে, প্রত্যেকটি দেশ ও জাতি-ই নিজ নিজ প্রথা ও আদর্শ অনুসারে ভিন্ন ভিন্নভাবে দিবস উদযাপন করেন। এভাবে তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে নিজেদের জাতীয় পরিচয় তুলে ধরেন।

এই পরিবর্তনের আলোকে মীলাদ/মীলাদ আগের চেয়েও বেশি গুরুত্ববহ হয়ে ওঠেছে; আর এই বাস্তবতা কোনো বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ-ই অস্বীকার করবেন না। আমাদের ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলোর অন্তরে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র প্রতি আবেগ ও প্রেমাগ্নি জ্বালাবার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে মীলাদ; আর এটা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সম্পর্ক জোড়া দেয়ারও অন্যতম অসীল।

অষ্টম অধ্যায়

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গঠনাত্মক উপাদান

সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন ধর্মসভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সুন্দর সুন্দর বর্ণনা পেশ করা হয়। কিন্তু যখন পবিত্র রবীউল আউয়াল মাস আগমন করে, তখন-ই খুশি ও উৎফুল্লতা তুঙ্গে উঠে। মুসলিম দেশগুলোর প্রতিটি রাস্তায় এবং প্রায় প্রতিটি ঘরে, আর এমন কী অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলোতে বসবাসরত মুসলমানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিসরেও মীলাদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়; এসব অনুষ্ঠানে মুসলমান সর্বসাধারণ স্রেফ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রতি এশকু-মহব্বত ও ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশের মহৎ উদ্দেশ্যে সমবেত হন। অন্যান্যরা মিষ্টি বিতরণ, ঘর সাজানো ও অলোকসজ্জা এবং রাস্তায় জশনে জলুস বের করে নিজেদের খুশি প্রকাশ করেন। মীলাদ মাহফিলগুলোতে মানুষেরা প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশার্থে তাঁর শানে প্রশংসা করেন এবং না'রা-শ্লোগান দেন; কবিবন্দ তাঁর সম্মানে না'ত/সানা-সীফাত আবৃত্তি করেন; অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী মানুষ সুর করে কুরআন তেলাওয়াত করেন; আর আলেম-উলামাকে দূরদূরান্ত থেকে দাওয়াত করে আনা হয় প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রতি প্রকৃত প্রেমাত্মি প্রজ্জ্বলনকারী ওয়ায-নসীহত পেশের উদ্দেশ্যে। সংক্ষেপে, সবচেয়ে করুণার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রতি গভীর এশকু-মহব্বত ও ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশে সবাই উদ্বুদ্ধ হন।

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপলক্ষে সবচেয়ে সম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রতি আমাদের খুশি ও ভক্তি প্রকাশের পন্থাগুলো কী কী? এই উদযাপনের সময় পুণ্যবান আশেকুভক্তবৃন্দের আচরিত রীতিগুলো কী কী? আর মীলাদ উদযাপনের মৌলিক গঠনাত্মক উপাদানগুলোই বা কী কী? এই অধ্যায়ে আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর দেবো এবং এর প্রতিটি বিষয়কে কুরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে যাচাই করবো এটা নির্ধারণ করতে যে, মীলাদের অন্তর্ভুক্ত কোন্ কোন্ উপাদান জায়েয/বৈধ, আর কোনগুলো, যদি আদৌ থেকে থাকে, অবৈধ। কেউ (এতদসংক্রান্ত) কোনো আমল বৈধ ও সওয়াবদায়ক কি না, তা ওই আমলের এক-একটি দিক বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করতে পারবেন। আমরা এই বিষয়টি নিয়েই এ অধ্যায়ে ব্যাপ্ত হবো।

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র গঠনাত্মক উপাদানগুলোর ঈমান আলোকিতকারী ও চিত্ত-উৎফুল্লদায়ক আমল/অনুশীলনী নিচে তালিকাভুক্ত করা হলো:

১. মাহফিল ও সমাবেশ আয়োজন;
২. প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র জীবনী ও গুণাবলী বর্ণনা;
৩. নবী-বন্দনামূলক না'ত/শে'র/কুসীদা আবৃত্তি;
৪. প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রতি সালাত-সালাম পেশ;
৫. ক্বিয়া'ম (প্রথাগত সম্মানার্থে দাঁড়ানো)
৬. আলোকসজ্জা
৭. খাদ্য বিতরণ ও
৮. জশনে জলুস/মিছিল।

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে উপরোক্ত গঠনাত্মক উপাদানগুলোর প্রতিটিরই সুনির্দিষ্ট বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হবে, (ইনশা'আল্লাহ)।

মাহফিল ও সমাবেশ আয়োজন

৮.১ মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক তাঁরই সৃষ্টির ঘটনা উল্লেখ যা বেলাদতের আগে ঘটেছিলো

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) আল্লাহ্ আনহু বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম-মণ্ডলী (রাঃ) আল্লাহ্ তা'আলা আনহুম) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'কে জিজ্ঞেস করেন:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النَّبُوءَةُ؟

-হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! কখন আপনার প্রতি নব্বয়্যত বিধান করা হয়?

এটা ছিলো একটা অস্বাভাবিক প্রশ্ন, কেননা মহান সাহায্যে কেরাম (রাঙ্গিয়াল্লাহু আনহুম)'এর মধ্যে কে না জানতেন মহানবী (সাল্লাল্লাহু

آدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ.

-আমি তখনো নবী ছিলাম, যখন পয়গম্বর আদম (আলাইহিস সালাম) আত্মা ও শরীরের মধ্যবর্তী (অবস্থানে) ছিলেন।^{৪৩৮}

উক্ত হাদীসের মানে হলো, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে এমন সময়ে নুযুওয়াত মঞ্জুর করা হয়েছিলো, যখন পয়গম্বর আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়নি। এভাবেই প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপন বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনেরও পূর্ববর্তীকালে তাঁর সৃষ্টির বর্ণনা সাহাবা-মণ্ডলী (রাডিয়াল্লাহু আনহুম) র কাছে প্রদান করেন।

৪৩৮. ইমাম তিরমিযী, ‘আল-জামেউস্ সহীহ’: কিতাবুল মানা’ক্বিব, ‘রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর অনিন্দ্য বৈশিষ্ট্যাবলী’ শীর্ষক অধ্যায়, ৫:৫৮৫
#৩৬০৯; ইবনে মুত্তফা’দ ‘কিতা’ব আল-কুদর’, ২৭ পৃষ্ঠা #১৪ গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে
এর রাবী/বর্ণনাকারীবৃন্দ নির্ভরযোগ্য; তামা’ম রা’যী, ‘কিতা’বুল ফাওয়াঈদ’, ১:২৪১
#৫৮১; ইবনে হিব্বান, ‘কিতা’বুল সিকাত’, ১:৪৭; লা’লাকা’ঈ, ‘এ’তেক্বা’দু আহলিস্
সুন্নাহ’, ১:৪২২ #১৪০৩; আল-হা’কিম ‘আল-মুসতাদরাক’, ২:৬৬৫ #৪২১০; আল-
বায়হাকী, ‘দালা’ঈলু আল-নুবওয়ায়া ওয়া মা’রিফা আহওয়াল সা’হিব আল-শরীআ’
(সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম), ২:১৩০; আল-সৈয়তী, ‘আল-দুর্র আল-
মানসূর ফীল-তাফসীর বিল-মা’সূর’, ৬:৫৬৯; এবং না’সিরুদ্দীন আলবানী ‘সহীহ আল-
সীরাত আল-নববীয়া’, ৫৪ পৃষ্ঠা #৫৩ পৃষ্ঠকে এই হাদীসকে সহীহ ঘোষণা করেছে।

৮.২ মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক তাঁর বেলাদতের স্মরণে সমাবেশের আয়োজন

জুমুআ'র খুতবা প্রদান ছাড়াও মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র রীতি ছিলো বিভিন্ন সমাবেশের আয়োজন করা, যেগুলোতে তিনি তাঁর মহান সাহাবা-এ কেরাম (রাহিয়াল্লাহু আনহুম)'এর সাথে ধর্মীয়, নৈতিকতামূলক, আধ্যাত্মিক, শিক্ষাসংক্রান্ত, ধর্মতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আইনি, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক বিষয়াদি আলোচনা করতেন। উপরন্তু, তিনি এমন সমাবেশের আয়োজন করতেন, যেগুলোতে তিনি নিজের খান্দানের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর অতুলনীয় মাহাত্ম্যের কথা উল্লেখ করতেন এবং ধরাধামে তাঁরই আশীর্বাদময় শুভাগমনকে ঘিরে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দিতেন। এ বিষয়টিকে সপ্রমাণকারী কিছু ঘটনার বর্ণনা নিচে দেয়া হলো:

১. হযরত মুত্তালিব ইবনে আবী ওয়াদা'আ (রাহিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন:

جَاءَ الْعَبَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْهُ سَمِعَ شَيْئًا، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: مَنْ أَنَا؟ فَقَالُوا: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ! قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا وَخَيْرِهِمْ نَسَبًا.

—হযরত আব্বাস (রাহিয়াল্লাহু আনহু) প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র দরবারে হাজির হন। তাঁকে মনে হচ্ছিলো তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে কুফফারবর্গের কাছ থেকে অশোভনীয় কিছু শুনেছিলেন (এবং রাগান্বিত হয়ে হুযূর পাককে তা বলতে চাচ্ছিলেন; কিংবা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য জ্ঞানের সূত্রে তা ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছিলেন)। এমতাবস্থায় নবী পাক

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিসরে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন, “আমি কে?” সাহাবায়ে কেরাম (রাহিয়াল্লাহু আনহুম) বলেন, “আপনি আল্লাহর রাসূল, আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।” তিনি বলেন, “আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আব্দিল মুত্তালিব। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃজন করে আমাকে তাদের সেরার (তথা মনুষ্যকুলের) মাঝে হতে আবির্ভূত করেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে দুটো দলে বিভক্ত করেন (আরব ও অনারব) এবং আমাকে সেরা দলে (মানে আরবদের মাঝে) আবির্ভূত করেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেন এবং আমাকে সেরা গোত্রে (অর্থাৎ কুরাইশ গোত্রে) আবির্ভূত করেন। এরপর তিনি তাদেরকে পরিবারে বিভক্ত করেন এবং আমাকে সেরা পরিবার (বনু হা'শিম) ও বংশে প্রেরণ করেন। (তাই আমি সমগ্র সৃষ্টিকুলে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন; আমার খান্দান, গোত্র, পরিবার ও ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যও আমি-ই সেরা)।^{৪৩৯}

ওপরের রওয়াযাত তথা বর্ণনায় বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় বিদ্যমান:

(ক) প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি মিসরে আরোহণ করতেন এবং ধর্মীয় ভাষণ দিতেন। নচেৎ বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলে তিনি মিসরে আরোহণ করে প্রভাষণ দেয়ার পরিবর্তে শ্রেফ কাছেরাে অবস্থিতদের সে সম্পর্কে জানাতেন। কিন্তু ওপরের বর্ণনায় তিনি মিসরে আরোহণ করেন; তাই এটা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হওয়ার ইঙ্গিতবহ।

৪৩৯. ইমাম তিরমিযী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), ‘আল-জামেউস সহীহ’, কিতা'বুল দা'ওয়াত, ৫:৫৪৩ #৩৫৩২; ইমাম তিরমিযী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), ‘আল-জামেউস সহীহ’, কিতা'বুল মানা'কিব, ‘প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উন্নত বৈশিষ্ট্যাবলী' শীর্ষক অধ্যায়, ৫:৫৮৪ #৩৬০৮ পৃষ্ঠকে ‘তাদের মধ্যে বংশে সেরা’ কথাটির পরিবর্তে ‘তাদের মধ্যে ব্যক্তিতে সেরা’ উল্লেখিত হয়েছে; ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), ‘আল-মুসনাদ’, ১:২১০ #১৭৮৮ পৃষ্ঠকে যুক্ত হয়েছে এই কথা, ‘আমি তোমাদের মাঝে পরিবারে ও ব্যক্তিতে সেরা’; প্রাগুক্ত ৪: ১৬৫; আল-হায়তামী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), ‘মজমাউয়-যাওয়াইদ ওয়া মানবা'আ আল-ফাওয়াইদ’, ৮:২১৬; এবং ইমাম বায়হাকী, ‘দালা'ঈল আল-নুবুওয়া' ওয়া মা'রিফা আহওয়া'ল সা'হিব আল-শারী'আ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)', ১:১৬৯।

(খ) সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাদীন) কে জিজ্ঞেস করেন, “আমি কে?” তাঁরা সবাই উত্তর দেন, “আপনি আল্লাহর রাসূল, আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।” যদিও তাঁদের উত্তর সত্যনির্ভর ছিলো, তবুও তা প্রত্যাশিত উত্তর ছিলো না; কেননা এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উত্তরটি (হওয়া উচিত) ছিলো ভিন্নতর। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাঁর কাক্ষিত উত্তরটি পাননি, তখন তিনি নিজেই উত্তর দেন: “আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আব্দিল মুত্তালিব” (মানে আমি মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবদিল মুত্তালিবের পুত্র)। এটা স্পষ্ট ইঙ্গিত করে এ মর্মে যে, তিনি মহান সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) কে তাঁর উচ্চ খন্দান ও আশীর্বাদময় পয়দায়োশের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবহিত করতে চেয়েছিলেন। মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) র সাথে এই বিষয়টি সরাসরি সম্পৃক্ত। যদিও মহান সাহাবা-মণ্ডলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাদীন) এসব বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন, তথাপিও প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) র এই অত্যন্ত গুরুত্বারোপিত ভাষ্যটি ইঙ্গিত করে যে তিনি তাঁর মীলাদকে তাঁরই সুন্নাহ’গুলোর একটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

(গ) ওপরোক্ত হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহান সাহাবা-বৃন্দ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাদীন) কে সর্বশক্তিমান খোদা তা‘আলার কোনো আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে অথবা ইসলামী নীতি-নৈতিকতা ও অনুশীলনী/আমল সম্পর্কে কিছুই জানাননি। বরঞ্চ তিনি তাঁদেরকে তাঁর আশীর্বাদময় বেলাদত (ধরাধামে শুভাগমন) ও আপন খন্দানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানিয়েছেন। এটা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রই আমল/অনুশীলনী।

(ঘ) প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মীলাদ সম্পর্কে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু উল্লেখ করেননি, কিন্তু তিনি মহান সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বৃন্দকে নিয়ে একটি সমাবেশ/মাহফিল করেছেন, যা ইশারা করে যে এই সমাবেশের জন্যে বিশেষ প্রস্তুতি (তথা ব্যবস্থাপনা) নেয়া হয়েছিলো।

সর্ব-ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিজরী), মুসলিম (২০৬-২৬১ হিজরী), তিরমিযী (২১০-২৭৯ হিজরী), ক্বাজী আয়াজ (৪৭৬-৫৪৪ হিজরী),

ক্বসতলানী (৮৫১-৯২৩ হিজরী) ও নাবহানী (১২৬৫-১৩৫০ হিজরী) প্রমুখের মতো মহান আলেম-উলামার লেখা হাদীস, সীরাহ/জীবনী ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) র গুণগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনাকারী গ্রন্থাবলীতে এমন অসংখ্য বর্ণনা আছে, যার সাথে দ্বীনী বিষয়াদির কোনো সম্পর্ক নেই। বরঞ্চ সেগুলো প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) র বেলাদত, মহত্ত্ব, উচ্চ খন্দান ও অনুপম গুণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে ব্যাপ্ত।

২. হযরত আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُرْدِيْشًا جَلَسُوا فَتَذَاكَرُوا أَحْسَابَهُمْ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلُوا مِثْلَكَ مِثْلَ خَلْقٍ فِي كِبْوَةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِهِمْ مِنْ خَيْرِ فَرَقِهِمْ وَخَيْرِ الْقَرِيْقَيْنِ، ثُمَّ تَخَيَّرَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ قَبِيلَةٍ، ثُمَّ تَخَيَّرَ الْبُيُوتَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ بُيُوتِهِمْ، فَأَنْ خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا.

অর্থ: আমি আরয করলাম: এয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! কুরাইশ গোত্র আপনার খানদান সম্পর্কে উল্লেখ করার সময় বলে থাকে যে আপনার উপমা হলো মাটির টিবি/টিলার ওপরে খেজুর গাছের মতো। (এতদশ্রবণে) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তর দেন: “আল্লাহ সৃষ্টিকুলকে সৃজন করে আমাকে তাদের সেরা বানান, তা তাদের দলগুলোর মাঝে সেরা দল হতে, এবং দুটো দলের মাঝে সেরা দল হতে। অতঃপর তিনি গোত্রসমূহ সৃষ্টি করেন এবং সেরা গোত্রে (কুরাইশ) আমাকে প্রেরণ করেন। এরপর তিনি পরিবারসমূহ সৃষ্টি করেন এবং আমাকে সেরা পরিবারে (বনু হাশেম) প্রেরণ করেন। অতএব, আমি সমস্ত সৃষ্টিকুলে ব্যক্তি পর্যায়ে ও পারিবারিক দিক থেকে সেরা।^{৪৪০}”

৪৪০. তিরমিযী, ‘আল-জামেউ আল-সহীহ’: ‘কিতাব আল-মানা’কিব’, ‘মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) র উন্নত গুণাবলী’ শীর্ষক অধ্যায়, ৫:৫৮৪ #৩৬০৭; আহমদ ইবনে হাম্বল, ‘ফাযায়েলে সাহাবা’, ২:৯৩৭ #১৮০৩; এবং আবু এয়ালা, ‘আল-মুসনাদ’, ৪:১৪০ #১৩১৬।

৩. হযরত ওয়া'সিলা বিন আসকা (রাহিয়াল্লাহু আনহু) প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ .

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)'এর সন্তানদের মাঝে পয়গম্বর ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)'কে মনোনীত করেন। হযরত ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)'এর প্রজন্মের মধ্য হতে তিনি কিনা'না গোত্রকে বেছে নেন। তিনি কিনা'না গোত্রের মধ্য হতে কুরাইশকে বেছে নেন। অতঃপর কুরাইশের মধ্য হতে বনু হা'শিমকে বেছে নেন। আর তিনি বনু হা'শিমের মধ্য হতে আমাকেই মনোনীত করেন।^{৪৪১}

এই হাদীসটিতে সবচেয়ে মর্যাদাবান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের খান্দানের কথা বলেছেন। উপরন্তু, তিনি (আরবী) 'ইস্তফা' (মনোনীত) শব্দটিও ব্যবহার করেছেন; কেননা তাঁর সম্মানসূচক লক্বব/উপাধি হলো 'আল-মুস্তফা' (মনোনীত)। এই লক্ববটি তাঁর সমগ্র খান্দানেরই প্রতি আরোপ করা যায়।

৪৪১. তিরমিযী, 'আল-জামেউ আস্ সহীহ': 'কিতাব আল-মানা'ক্বিব', 'মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উন্নত গুণাবলী' শীর্ষক অধ্যায়, ৫:৫৮৩ #৩৬০৫; মুসলিম, 'আল-সহীহ': 'কিতাব আল-ফাযায়েল', 'প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র খান্দানের মহৎ গুণাবলী ও তাঁর নবুয়্যতের আগে পাথরের পঠিত সালাওয়াৎ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৭৮২ #২২৭৬; আহমদ ইবনে হাম্বল, 'আল-মুসনাদ', ৪:১০৭; ইবনে আবী শায়বা, 'আল-মুসনাদ', ৬:৩১৭ #৩১,৭৩১; আবু এয়ালা, 'আল-মুসনাদ', ১৩:৪৬৯ ও ৪৭২ #৭৪৮৫ ও ৭৪৮৭; তাবারানী, 'আল-মু'জাম আল-কবীর', ২২:৬৬ #১৬১; আল-বায়হাকী, 'আল-সুনান আল-কুবরা', ৬:৩৬৫ #১২,৮৫২; এবং আল-বায়হাকী, 'শু'য়াব আল-ঈমান', ২:১৩৯ #১৩৯১।

৮.৩ মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণ/বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্যের স্মরণে বিশেষ মজলিশের আয়োজন

১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাহিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَهُ قَالَ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَسَمِعَ حَدِيثَهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ عَجَبًا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَ مِنْ خَلْقِهِ خَلِيلًا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا . وَقَالَ آخَرُ مَاذَا بَاعَجَبَ مِنْ كَلَامِ مُوسَى كَلِمَةً تَكْلِيمًا وَقَالَ آخَرُ فَعِيسَى كَلِمَةً اللَّهُ وَرُوحُهُ . وَقَالَ آخَرُ آدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ وَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَمُوسَى نَجِيُّ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَعِيسَى رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُوَ كَذَلِكَ أَلَا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا حَامِلُ لَوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيَدْخِلْنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ

-রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর কতিপয় সাহাবা (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) বসে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। (হযরত ইবনে আব্বাস রাহিয়াল্লাহু আনহু অতঃপর বলেন), তিনি বেরিয়ে আসেন। যখন তিনি তাঁদের কাছে আসছিলেন, তখন শুনতে পান তাঁরা নিজেদের মাঝে আলাপে রত। তাঁদের কেউ একজন বলেন: 'কী বিস্ময়কর ব্যাপার যে আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টিকুল হতে তাঁরই খলীল তথা ঘনিষ্ঠ বন্ধু পয়গম্বর ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আলাইহিস সালাম)'কে বেছে নিয়েছেন!' আরেকজন তখন বলেন: 'পয়গম্বর মূসা (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার সাথে সরাসরি কালাম তথা কথা বলার চেয়ে আর কী বিষয়টি বিস্ময়কর হতে পারে?' এমতাবস্থায় আরেকজন বলেন: 'পয়গম্বর ঈসা (আলাইহিস সালাম) হলেন আল্লাহর বাক্য ও তাঁরই (ফোঁকা) রুহ!'

অপর একজন বলেন: ‘পয়গম্বর আদম (আলাইহিস সালাম) হলেন আল্লাহর মনোনীত।’ অতঃপর প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের মাঝে গমন করে তাঁদেরকে সালাম-সম্ভাষণ জানিয়ে বলেন: “আমি তোমাদের আলাপ শুনতে পেয়েছি; আর তোমরা বিস্ময়াভিভূত হয়েছো এ ব্যাপারে যে পয়গম্বর ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) হলেন খলীলউল্লাহ (আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধু), এবং তিনি (সত্যি) তা-ই; আর পয়গম্বর মূসা (আলাইহিস সালাম) হলেন নাজিউল্লাহ (আল্লাহর বিশ্বস্ত বন্ধু যার কাছে আল্লাহ নিজের গোপন কথা বলেছেন), এবং তিনি (সত্যি) তা-ই; আর পয়গম্বর ঈসা (আলাইহিস সালাম) হলেন রুহুল্লাহ তথা আল্লাহর (ফোঁকা) আত্মা ও কালিমাতুল্লাহ বা আল্লাহর বাক্য, এবং তিনি (সত্যি) তা-ই; আর পয়গম্বর আদম (আলাইহিস সালাম) হলেন আল্লাহর মনোনীত, এবং তিনি (সত্যি) তা-ই। কিন্তু আমি (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলাম হাবীবুল্লাহ (আল্লাহর প্রিয়তম বন্ধু) এবং এতে কোনো ফخر তথা দম্ব নেই; আর আমি-ই ক্বেয়ামত দিবসে (আল্লাহর) প্রশংসার পতাকা বহনকারী হবো এবং এতেও কোনো দম্ব নেই; আর আমি-ই ক্বেয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম শাফাআত/সুপারিশকারী হবো যার সুপারিশ সর্বপ্রথমে (আল্লাহর দরবারে) গৃহীত হবে এবং এতেও কোনো দম্ব নেই; আর আমি-ই ওই দিন সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় কড়া নাড়বো এবং আল্লাহ তা আমার জন্যে খুলে দেবেন আর আমাকে তাতে (সর্বপ্রথমে) প্রবেশের অনুমতি দেবেন; আমার সাথে (ওই সময়) থাকবে ঈমানদারদের মধ্যে ফকীরবর্গ এবং এতেও কোনো দম্ব নেই; আর আমি-ই (আল্লাহর দৃষ্টিতে) অগ্রবর্তী ও পরবর্তী জনগোষ্ঠীর মাঝে সর্বাধিক সম্মানিত সত্তা এবং এতেও কোনো দম্ব নেই।^{৪৪২}”

৪৪২. ইমাম তিরমিযী, ‘জামেউস সহীহ’: ‘কিতাব আল-মানা’ক্বিব’, ‘প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র উন্নত বৈশিষ্ট্য শীর্ষক অধ্যায়, ২:২০২ #৩৬১৬; আল-দারিমী, ‘আল-সুনান,’ ১:৩৯ #৪৭; আল-বাগউয়ী, ‘শরহুস সুন্নাহ,’ ১৩:১৯৮ ও ২০৪ #৩৬১৭ ও ৩৬২৫; আল-রাযী, ‘মাফা’তীহুল গায়ব’ (আল-তাফসীরুল কবীর), ৬:১৬৭; ইবনে কাসীর, ‘তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম,’ ১:৫৬০; এবং আল-সৈয়ুতী, ‘আল-দুর্রুল মানসুর ফীল-তাফসীরে বিল-মা’সুর,’ ২:৭০৫।

২) হযরত উক্ববা ইবনে আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ. وَإِنِّي وَاللَّهِ، لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ؛ وَإِنِّي وَاللَّهِ، مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا.

অর্থ: একদিন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বের হয়ে উহুদ ময়দানে গমন করেন এবং সেখানে জানাযা পড়েন, যেনো তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদানের জানাযা পড়ছিলেন (আট বছর পরে)। অতঃপর তিনি মিশরে আরোহণ করেন এবং বলেন: “আমি (তোমাদের সামনে) তোমাদেরই পূর্বসূরী; আর আমি তোমাদের (হিসাবের) সাক্ষী। নিশ্চয় আমি আল-হাউজ (কাউসার হুদ)’এর দিকে নজর করছি এবং আমাকে (সমগ্র) জগতের রত্নভাণ্ডারের চাবিসমূহ দান করা হয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি আশঙ্কা করি না যে তোমরা আমার (বেসালের) পরে মুশরিক/মূর্তি পূজারী হয়ে যাবে; কিন্তু আমি আশঙ্কা করি যে তোমরা হয়তো নিজেদের (দুনিয়াবী) খায়েশ চরিতার্থ করতে মগ্ন হবে।” রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’কে (নয়ন জুড়ানো ও আত্মিক প্রশান্তিময়) দর্শনের সেটাই ছিলো আমার (জীবনে) শেষ বার।^{৪৪৩}

৪৪৩. আল-বুখারী কৃত ‘আল-সহীহ’: ‘কিতাব আল-জানায়েয,’ ‘শহীদানের জানাযার নামায’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:৪৫১ #১২৭৯; আল-বুখারী, ‘আল-সহীহ,’ ‘কিতাব আল-মানা’ক্বিব,’ ‘নবুওয়্যাতের নিদর্শন, শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১৩১৭ #১৪০১; আল-বুখারী, ‘আল-সহীহ,’ ‘কিতাব আল-মাগা’যী, ‘উহুদ আমাদের ভালোবাসে’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৪৯৮ #৩৮৫৭; আল-বুখারী, ‘আল-সহীহ,’ ‘কিতাব আল-রিক্বাক্ব,’ ‘দুনিয়ার আকর্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা এবং একে অপরের সাথে এ আকর্ষণ নিয়ে প্রতিযোগিতা’ শীর্ষক অধ্যায়, ৫:২৩৬১ #৬০৬২; আল-বুখারী, ‘আল-সহীহ,’ ‘কিতাব আল-হাওজ,’ ‘হুদ’ শীর্ষক অধ্যায়, ৫:২৪০৮ #৬২১৮; মুসলিম কৃত ‘আল-সহীহ,’ ‘কিতাব আল-ফাদায়েল,’ ‘হুদ সম্পর্কে দুদোক্তি,’ ৪:১৭৯৫ #২২৯৬; আহমদ ইবনে হাম্বল, ‘আল-মুসনাদ,’ ৪:১৪৯ ও ১৫৩; ইবনে হিব্বান, ‘আল-সহীহ,’ ৭:৪৭৩ #৩১৬৮; এবং প্রাণ্ডুজ ৮:১৮ #৩২২৪।

এখানে “অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন” মর্মে কথাটি থেকে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়: কবরস্থানে কি মিম্বর বিদ্যমান? তা তো (সাধারণতঃ) নির্মিত হয় মসজিদে খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে; কিন্তু উহুদে তো কোনো মসজিদ নেই, স্বেচ্ছা শহীদানের কবরস্থান বিরাজমান। স্মর্তব্য যে, ওই সময় কেবল একটি মিম্বরের অস্তিত্ব ছিলো, আর তা মদীনা মোনাওয়ারায় অবস্থিত মসজিদে নববী’তে। বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে এই ঘটনাটি ঘটেনি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, উহুদের কবরস্থানে একটি মিম্বর আনা হয়েছিলো, যা ইঙ্গিত করে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হয় তা আদেশ করেছিলেন, না হয় সাহাবায়ে কেরাম (রাঃদিয়াল্লাহু আনহুম) আসার সময় তাঁদের সাথে নিয়ে এসেছিলেন। তবে মনোযোগের বিষয়টি এখানে ‘কী’ নয়, বরং ‘কেন’? উহুদ ময়দানে মিম্বর আনার দরুন আমরা দেখতে পাই যে, সমাবেশের জন্যে বিশেষ আয়োজন করা হয়েছিলো, যে সমাবেশে দয়ালু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র গুণাবলী ও মহত্ত্ব উল্লেখ করা হয়েছিলো - আর এই সমাবেশ স্বয়ং সবচেয়ে করুণাময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। ‘নেআমত’/আশীর্বাদ ঘোষণার সূত্র ধরে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহান সাহাবাবুন্দ (রাঃদিয়াল্লাহু আনহুম)’কে তাঁরই গুণাবলী ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবহিত করেন, যা এই হাদীসের উপজীব্য। আর তাই এই হাদীসটি মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র মাহফিল/সমাবেশ আয়োজনের পক্ষে একটি স্পষ্ট দলিল।

ওপরে উল্লেখিত হাদীসগুলো এই বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করে যে, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র গুণাবলী ও মাহাত্ম্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে মাহফিল/সমাবেশের আয়োজন করা তাঁরই সুন্নাহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মীলাদ/মীলাদ মাহফিলের আয়োজন এই সুন্নাহ পালনের একটি মাধ্যম বটে। আমাদের এই সীমা লঙ্ঘনের যুগে এ ধরনের সমাবেশের আয়োজন অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। বস্তুতঃ আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে এটা বর্তমানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, যাতে এই উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র প্রতি এশকু-মহব্বত দ্বারা আলোকিত হয় এবং তাঁরই নিখুঁত দৃষ্টান্ত অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হয়।

পরিচ্ছেদ: ০২

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী ও গুণাবলী আলোচনা

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’র পবিত্র মাহফিল-সমাবেশগুলোতে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র জীবনী/সীরাহ ও গুণাবলীর যিকর তথা স্মরণ করা হয়। এই যিকরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর পাঁচটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হবে নিচে।

৮.৪ শরয়ী বিধানের উল্লেখ

মীলাদের মাহফিলগুলোতে ওয়াজিয়া নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ও শরীয়তের অন্যান্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। শরীয়তের মৌলনীতি এবং ঈমান ও ইসলামের ভিত্তিস্তম্ভের সাথে সম্পৃক্ত প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র শিক্ষা ও আজ্ঞা এসব অনুষ্ঠানে আলোচিত হয়। ফেকুহ (ধর্মশাস্ত্রীয় বিধানগত জ্ঞান) ও শরীয়তের অন্যান্য জ্ঞানের শাখা সম্পর্কে আলোচনার পরিবর্তে মাহফিলে অংশগ্রহণকারীদেরকে তাঁদের এবাদত-বন্দেগী শুদ্ধ করে তা (আল্লাহর কাছে) গ্রহণযোগ্য করার এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার উপায় শিক্ষা দেয়া হয়। তাঁদেরকে আরো জানানো হয় কীভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর প্রতি আমাদের আনুগত্য ও এশকু-মহব্বত সাফল্যের দ্বার উন্মোচিত করতে পারে এবং আমাদের ঈমান সুদৃঢ়করণে সহায়ক হতে পারে। অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ও মাহফিলে উল্লেখ করা হয়, যাতে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র পূর্ণতাপ্রাপ্ত/নিখুঁত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে প্রত্যেকে নিজের আচরণ-আচরণে (আল্লাহর) গোলামির মৌলিক গুণ সন্নিবেশিত করতে পারেন এবং নিজের জীবনকে উন্নতির দিকে পরিবর্তিত করার বেলায় সংকল্পবদ্ধ হতে পারেন।

৮.৫ নবী পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহজাত প্রতিভা ও সদাচরণ

মীলাদুননী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র মাহফিল-সমাবেশে দ্বিতীয় যে পন্থাটি ব্যবহৃত হয় তা হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর **خصائل** 'খাসাইল' (তথা সুন্দর আচার-আচরণ ও মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য) যা তাঁর অনন্য দৃষ্টান্ত হতে পরিদৃষ্ট হয়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা। এর উদ্দেশ্য হলো, এর শ্রোতাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁরই সুন্নাহর অনুসরণ-অনুকরণ দ্বারা নিজেদের ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত ও জাতীয় জীবনের পর্যায়গুলোতে যেনো আপন আপন জীবনকে ঢেলে সাজানো যায়। এটাই হচ্ছে আলেম-উলামা কর্তৃক আলোচিত দ্বিতীয় বিষয়টি। যদিও এসব সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বেলাদত/মীলাদ তথা ধরাধামে শুভাগমনের প্রতি খুশি প্রকাশ, তবুও আলেম-উলামা কুরআন-হাদীস হতে বয়ান দান এবং নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও শিক্ষণীয় বিষয়াদি প্রচারের জন্যে এই সুযোগকে ব্যবহার করে থাকেন।

৮.৬ মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ

নবুওয়্যতের বিভিন্ন দিক স্মরণ করার সময় প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সুযোগ্যতা ও গুণগত মাহাত্ম্য উল্লেখ করা হয়। তাঁর রুচিশীলতা, মহিমা ও অপরূপ সৌন্দর্য সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ ও নিখুঁত সৌন্দর্য কুরআন মজীদ, হাদীস শরীফ ও সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাদ্দীন) কর্তৃক অত্যন্ত চমৎকার ও মনমুগ্ধকর ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। মহাসম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর নূরানী/জ্যোতির্ময় চেহারা মোবারক এবং কালো ও সুগন্ধময় কেশদাম মোবারকের হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা শ্রোতার জন্যে বয়ে আনে গভীর সন্তুষ্টি। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অপরূপ সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক; আর মর্যাদার দিক থেকে তাঁর মহিমামণ্ডিত

উপস্থিতির ব্যাপ্তি নির্ণয় করা একেবারেই অসম্ভব এক ব্যাপার। মহান সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাদ্দীন) সদয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর সৌন্দর্য দর্শনে উৎফুল্লচিত্ত এক হালত-অবস্থার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন; আর তাঁরা তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা দেয়ার সময় বিনম্রভাব অনুভব করতেন। সত্যতা হলো, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র খোদাপ্রদত্ত নিখুঁত সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়া আমাদের সাধ্যের একদম বাইরে। এমন কী আরব জাতি, যারা নিজেদের ভাষায় সুপণ্ডিত ও বাগ্মী ছিলেন, তাঁরাও তাঁকে তাঁর প্রাপ্য অনুযায়ী বর্ণনা করতে সক্ষম ছিলেন না।

মহানতম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর অতুলনীয় সৌন্দর্য বর্ণনা করার আন্তরিক প্রয়াসে গোটা পবিত্র রবীউল আউয়াল মাস অতিবাহিত হয়। কেউ কেউ তাঁর মোবারক সুগন্ধময় কেশদাম ও জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডলের বর্ণনা নিয়ে সময় ব্যয় করেন; কেউ কেউ তাঁর পবিত্র নয়নযুগলের উদার চাহনির প্রশংসা করেন; কেউ কেউ তাঁর আশীর্বাদময় প্রখর ও অতুলনীয় শ্রুতির মহিমা গান; আর অন্যরা তাঁর কোমল ঠোঁটের গুণগান করেন, যা ছিলো কোনো স্বর্গীয় ফুলের পাপড়ির মতো। আবার কেউ কেউ তাঁর পবিত্র হাত দুটো দ্বারা সংঘটিত মো'জেযা তথা অলৌকিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বর্ণনা দেন। কেউ কেউ তাঁর মোবারক মুখ ও লালার গুণগান করেন। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র এসব অনুপম গুণগত বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা তাঁর দরবার হতে খুশির হালত-অবস্থা ও আশীর্বাদপূর্ণ দান বয়ে আনে। এগুলোই হলো মাহফিল-সমাবেশের (প্রকৃত) অবস্থা, যা কারো অন্তর ও আত্মায় ঈমানকে আলোকিত করে। এসব-ই আখেরাতের রসদ, যা ঈমানদারের চিরস্থায়ী যাত্রার জন্যে অপরিহার্য। বস্তুতঃ রবীউল আউয়াল মাস পুরোটুকু-ই প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে বর্ণনা দেয়ার আন্তরিক ও একনিষ্ঠ প্রয়াসে কেটে থাকে।

৪৪৪. আল কুরআন: সূরা নিসা, ৪:৮০।
 ৪৪৫. আল কুরআন: সূরা তাওবা, ৯:৬২।
 ৪৪৬. আল কুরআন: সূরা ফাতাহ, ৪৮:১০।
 ৪৪৭. আল কুরআন: সূরা আনফাল, ৮:১৭।

৪৪৮. আল কুরআন: সূরা নজম, ৫৩:৩-৪ ।
 ৪৪৯. আল কুরআন: সূরা নিসা, ৪:১৪ ।
 ৪৫০. আল কুরআন: সূরা তাওবা, ৯:৬৩ ।
 ৪৫১. আল কুরআন: সূরা তাওবা, ৯:৫৯ ও ৭৪ ।

بَيْدِي، وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي، يَطُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمٍ كَأَنَّهُمْ بَيْضُ
مَكْنُونٍ أَوْ لَوْلُو مَنُثُورٍ

অর্থ: আমি-ই সর্বপ্রথমে (আমার রওয়া মোবারক হতে) বের হবো। আমি তাদের (তথা মানব জাতির) নেতৃত্ব দেবো যখন তারা সমবেত হবে (হাশরের ময়দানে)। আমি-ই হবো তাদের মুখপাত্র যখন তারা থাকবে নিশ্চুপ। আমি তাদের জন্যে সুপারিশকারী হবো যখন তারা হবে পরীক্ষার মুখোমুখি; আর আমি-ই হবো তাদেরকে সুসংবাদ প্রদানকারী যখন তারা থাকবে হতাশাগ্রস্ত। ওই দিন (শেষ বিচার দিবসে) মহত্ত্ব ও বেহেশতের চাবিসমূহ থাকবে আমার হাতে; কেননা আমার প্রভু আল্লাহ তা'লার কাছে আমি হলাম পয়গম্বর আদম (আলাইহিস্ সালাম)'এর সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত। (ওই দিন) এক হাজার সংখ্যক সেবক আমাকে ঘিরে থাকবে, যেনো তারা লুকোনো ডিম (মানে আড়ালে রক্ষিত সৌন্দর্য) কিংবা ছড়ানো ছিটানো মুক্তো।^{৪৫২}

ওপরে উদ্ধৃত হাদীসটি প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উচ্চমর্যাদা এবং শেষ বিচার দিবসে তাঁরই (উচ্চ) অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ করে; আর এটাও মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত।

৪৫২. আল-দা'রিমী কৃত 'সুনান', ১:৩৯ #৪৮; আল-তিরমিযী রচিত 'আল-জামেউন্ সহীহ': 'কিতাব তাফসীর আল-কুরআন', 'আল কুরআন: সূরা বনী ইসরাঈল হতে সংকলিত' অধ্যায়, ৫:৩০৮ #৩১৪৮; আল-তিরমিযী লিখিত 'আল-জামেউন্ সহীহ': 'কিতাব আল-মানা'ক্বিব', 'প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র চমৎকার গুণাবলী' শীর্ষক অধ্যায়, ৫:৫৮৫ #৩৬১০; আবু এয়াল প্রণীত 'আল-মু'জাম', ১৪৭ পৃষ্ঠা #১৬০; ক্বাযওয়ানী কৃত 'আল-তাদউয়ীন ফী আখবাবি ক্বাযউয়ীন', ১:২৩৪-২৩৫; আল-দায়লামী রচিত 'আল-ফেরদৌস্ বি-মা'সুরিল খিতাব', ১:৪৭ #১১৭; আল-বাগাভী লিখিত 'শরহু সূনাহ', ১৩:২০৩ #৩৬২৪; ইবনে আবী হা'তিম আল-রা'যী প্রণীত 'তাফসীরে কুরআনে আযীম', ১০:৩২১২ #১৮,১৮৯; আল-বায়হাকী কৃত 'দালা'ইল আল-নুবুওয়্যাত ওয়া মা'রিফা আহওয়াল সা'হিব আল-শরীআ' (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম), ৫:৪৮৪; আবু না'ইম রচিত 'দালা'ইল আল-নবুওয়া', ১:৬৪-৬৫ #২৪; আল-বাগাভী লিখিত 'মু'আলিম আত্ তানযীল', ৩:১৩১; এবং আল-সৈয়তী প্রণীত 'আল-দুরুল মানসুর ফীল-তাফসীরে বিল-মা'সুর', ৮:৩৭৬।

২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করেন:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَبَيْدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا نَحْتُ لَوَائِي، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ.

-আমি-ই হবো শেষ বিচার দিবসে পয়গম্বর আদম (আলাইহিস্ সালাম)'এর সন্তানদের (মানে মানব জাতির) সাইয়েদ তথা অধিকর্তা এবং এটা কোনো দম্ব নয়; (আল্লাহ তা'লার) প্রশংসার পতাকা থাকবে আমারই হাতে এবং এটাও কোনো দম্ব নয়; পয়গম্বর আদম ও অন্যান্য নবী-রাসূল (আলাইহিমুস্ সালাম আজমাঈন) আমারই পতাকাতলে অবস্থান করবেন (এবং এটাও নয় কোনো দম্ব)। আমি-ই হবো প্রথম, যার জন্যে মাটি বিভক্ত হবে (মানে ফেটে যাবে) এবং এটাও কোনো দম্ব নয়।^{৪৫৩}

৩) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করেন:

أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، فَأَكْسَى الْحُلَّةِ مِنْ حُلِّي الْجَنَّةِ، ثُمَّ أَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ يَقُومُ ذَلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِي

অর্থ: আমি-ই সর্বপ্রথম যার জন্যে মাটি দু ভাগ হবে। আমার পরনে থাকবে বেহেশতী পোশাক। অতঃপর আমি আরশের ডান দিকে দাঁড়াবো, যেখানে আমি ছাড়া সৃষ্টিকুলের মধ্য হতে কেউই দাঁড়াবে না।^{৪৫৪}

৪৫৩. আল-তিরমিযী, 'আল-জামে' আল-সহীহ': কিতাব আল-মানা'ক্বিব', 'প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র চমৎকার গুণাবলী' শীর্ষক অধ্যায়, ৫:৫৮৭ #৩৬১৫; সহীহ মুসলিম, 'কিতাব আল-ফাদায়েল', 'সমগ্র সৃষ্টির ওপরে আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র শ্রেষ্ঠত্ব' অধ্যায়, ৪:১৭৮২ #২২৭৮; ইবনে হিব্বান, 'আল-সহীহ', ১৪:৩৯৮ #৬৪৭৮; আহমদ ইবনে হাম্বল, 'আল-মুসনাদ', ১:২৮১; প্রাগুক্ত, ৩:২; আবু এয়াল, 'আল-মুসনাদ', ১৩:৪৮০ #৭৪৯৩; এবং আল-মাকুদেসী, 'আল-আহাদীস আল-মুখতা'রা', ৯:৪৫৫ #৪২৮।

৪৫৪. তিরমিযী কৃত 'জামিউল সহীহ': কিতাব আল-মানা'ক্বিব (গুণগত বৈশিষ্ট্যের বই), 'প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র চমৎকার বৈশিষ্ট্যাবলী', ৫:৫৮৫ #৩৬১১; এবং ইবনে কাসীর প্রণীত 'আল-বেদায়া ওয়ান্ নেহায়া', ১০:২৬৩।

এখানে উপস্থাপিত হাদীসগুলো এ বিষয়টি প্রদর্শন করতে সরবরাহ হয়েছে যে, শরীয়তের হালাল-হারাম, ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার-প্রসার, কিংবা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র জীবনী ও মহান চরিত্র এগুলোতে উল্লেখিত হয়নি। বরঞ্চ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র গুণাবলী ও অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং আদম-সন্তানদের মাঝে তাঁর মহান মর্যাদা-ই এখানে আলোচ্য বিষয়। ফাযাইল ও মানাক্বিব (উন্নত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য)'এর গ্রন্থাবলীতে এই দিকটি-ই বিধৃত হয়েছে; আর এটাই মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র মূল বিষয়বস্তু।

৮.৮ তাঁর পবিত্র বেলাদতের বর্ণনা ও সেসময় সংঘটিত মহান আধ্যাত্মিক নিদর্শনের উল্লেখ

পঞ্চম পদ্ধতিটি হচ্ছে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পবিত্র বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনের বর্ণনা ও সে সময়ে প্রকাশিত আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনগুলোর উল্লেখ। এটা মীলাদ মাহফিলের একটি বিশেষ দিক। তাঁর পবিত্র বেলাদত ও শৈশব এবং যৌবনকালকে ঘিরে অলৌকিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়; তাঁর পবিত্র বেলাদত শরীফ থেকে আরম্ভ করে নুবুওয়্যত ঘোষণার সময়কাল অবধি জীবনের বর্ণনাগুলোও উল্লেখিত হয়। মক্কা ও দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর পবিত্র বেলাদতের সময়কার চমকপ্রদ নিদর্শনগুলোরও বর্ণনা দেয়া হয়।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র নুবুওয়্যত-বিষয়ক খুশির আগমনীবার্তা অন্যান্য যে সব আশ্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)'র আনীত ঐশীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিলো, সেগুলোর প্রতি আলোকপাত করা হয়। পয়গম্বর আদম (আলাইহিস সালাম) হতে আরম্ভ করে পয়গম্বর ঈসা (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত প্রত্যেক পয়গম্বর-ই আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ নবী হিসেবে তাঁর আসন্ন আগমনের সুখবর দিয়েছিলেন। আর এগুলোর সবই মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র বিষয়বস্তু। অনুরূপভাবে, মাহফিলে অংশগ্রহণকারীদেরকে এ-ও জানানো হয় যে, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পূর্বপুরুষদের ঔরসে তিনি নূর/জ্যোতি হিসেবে স্থানান্তরিত হয়েছেন, যতোক্ষণ না তিনি মা সৈয়দা আমেনা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)'র

গর্ভে নিজেকে প্রকাশ করেন; আর দুনিয়াতে এয়াতীম হিসেবে শুভাগমন করেন। তাঁদেরকে আরো জানানো হয় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'কে আল্লাহ তা'আলার (খাস) রহমত/করণা ও মহান অনুগ্রহ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

মহাসম্মানিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর পবিত্র বেলাদত ও শৈশবকাল, যা তিনি মা সৈয়দা আমেনা ও সৈয়দা হালীমা সা'দিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)'র স্নেহযত্নে কাটিয়েছিলেন, তা অংশগ্রহণকারীদের অন্তরাত্মা ছুঁয়ে যায়। মহাসম্মানিত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর মো'জেযা (অলৌকিক ক্ষমতা)-ও আলোচনা করা হয়। ওয়াজদ তথা আত্মিক উচ্ছ্বাসের দৃশ্যগুলো স্রেফ কল্পনা ও প্রত্যক্ষ করা যায়; কিন্তু সেগুলো সম্পর্কে বলা বা লেখার ক্ষমতা কারোরই নেই।

ঈমানদারের অন্তরে ঈমানের আলো জ্বালবার সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হচ্ছে মীলাদের মাহফিল। এটা (ঈমানী) শক্তির উৎস, যা কবি ইক্বালের মতে মহান প্রেমের শক্তি, যেটা দ্বারা পবিত্র 'মুহাম্মদ' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামটির জ্যোতি সমস্ত দিগন্তকে জ্যোতির্ময় করে তোলে। এটাই হলো মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

কবি ইক্বাল বলেন:

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کروے

وہر میں اسم محمد (ﷺ) سے اُجالا کروے

-এশকু-মহব্বাতের শক্তি দ্বারা প্রতিটি হার কোরো জয়ে পরিণত,
আর জগতকে কোরো মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর নাম দ্বারা আলোকিত। [ভাবানুবাদ]

পরিচ্ছেদ: ০৩

মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর প্রশংসায় না'ত/কসীদা/শে'র/পদ্যের আবৃত্তি

মীলাদ/মীলাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ গঠনাত্মক উপাদান হচ্ছে পরম শ্রদ্ধাভাজন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর শানে না'ত/কসীদা/শে'র/পদ্যের আবৃত্তি। তাঁর সম্মানে এগুলোর রচনা ও আবৃত্তি দ্বারা মুসলমান সমাজ মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর প্রতি তাঁদের অনুভূত প্রেম-ভক্তি ব্যক্ত করতে সক্ষম হন। কাব্যাকারে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রশংসা কোনো নতুন কিছু (মানে বেদআত) নয়; বরঞ্চ এটা কুরআন-হাদীসসমর্থিত বিষয়। এই অধ্যায়ে এসব প্রামাণিক দলিল হতে কিছু কিছু পেশ করা হবে নিচে:

৮.৯ কুরআন মজীদে নিহিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাব্যিক প্রশংসা

কুরআন মজীদে অসংখ্য স্থানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা আপন মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তথাপি তিনি কোথাও তাঁকে নাম ধরে সরাসরি সম্বোধন করেননি। বরং তিনি তাঁকে 'আলখাল্লা-পরিহিত' বা 'চাদরাবৃত' বলে অভিহিত করেন; এবং আরেকটি আয়াতে করীমায় তিনি তাঁকে 'এয়া-সীন' বলে ডাকেন। কুরআন মজীদে অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আপন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র জ্যোতির্ময় চেহারার শপথ উচ্চারণ করে বলেন, “উজ্জ্বল প্রভাতের শপথ;” আর যখন তিনি বলেন, “ছড়িয়ে পড়া তমিযনিবিড় রাতের শপথ,” তখন তিনি আপন মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর সুন্দর কালো কেশদামের শপথ করেন। বস্তুতঃ গোটা আল-কুরআনই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর এক কাব্যিক প্রশংসা ছাড়া কিছু নয়। বিষয়টি স্পষ্ট করার লক্ষ্যে নিম্নে কিছু আয়াতে করীমা উপস্থাপন করা হলো:

১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর বক্ষ সম্ভ্রসারণ, তাঁর দুঃখকষ্ট দূর ও যিকর-তায়কেরা/স্মরণ সমুন্নতকরণ উল্লেখিত হয়েছে এভাবে:

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ .

—আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্ত করিনি (জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোর জন্যে)? এবং আপনার ওপর থেকে আপনার (উম্মতের কষ্টের) ওই বোঝা নামিয়ে নিয়েছি, যা আপনার (পবিত্র) পৃষ্ঠ ভেঙ্গেছিলো, এবং আমি আপনার জন্যে আপনারই স্মরণকে সমুন্নত করেছি (দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বত্র আমার নামের সাথে আপনার নামকে সম্পর্কযুক্ত করে দিয়ে)।
[আল-কুরআন, ৯৪:১-৪]

২. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতাকুল প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র প্রতি সর্বদা দরুদ-সালাম প্রেরণ করেন:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .

—নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর (সমস্ত) ফেরেশতাবৃন্দ (সম্মানিত) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করছেন। হে ঈমানদারবর্গ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ প্রেরণ করো এবং (সর্বান্তকরণে) পরিপূর্ণ আদবের সাথে অধিক পরিমাণে সালাম পেশ করো।^{৪৫৫}

৩. নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর দরবারে সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا .

—আর আমরা এ জন্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করা হবে। আর (হে হাবীব!) যখন তারা নিজেদের উপর যুলুম করে, অতঃপর আপনার নিকট আগমন করে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসূলও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের জন্যে ক্ষমা চান, তবে তারা (এ ওয়াসিলা এবং শাফায়াতের ভিত্তিতে) অবশ্যই আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও অসীম দয়ালুরূপে পাবে।^{৪৫৬}

৪. প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)‘র আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা‘লারই আনুগত্য:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا—

—যে রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর হুকুম মান্য করলো সে তো আল্লাহরই হুকুম মান্য করলো, কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নিলো তবে আমি আপনাকে তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারীরূপে প্রেরণ করিনি।^{৪৫৭}

৫. মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)‘র নাম মোবারক তৌরাত ও ইনজিলে উল্লেখিত হয়েছে:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ—

—(এরা ওইসব লোক) যারা ওই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর আনুগত্য করে যিনি ‘উম্মী’ (উপাধিপ্ৰাপ্ত) নবী (অর্থাৎ

৪৫৬. আল-কুরআন, ৪:৬৪।

৪৫৭. আল-কুরআন, ৪:৮০।

দুনিয়াতে কোনো ব্যক্তির নিকট শিক্ষা লাভ করা ব্যতিরেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে অদৃশ্যের সংবাদ দেন এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়ের জ্ঞান ও সূক্ষ্ম গোপন বিষয়াদি অবগত করেন), যাঁর (বৈশিষ্ট্য ও পরিপূর্ণতার) উল্লেখ তারা তাঁদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে পায়, যিনি তাদেরকে উত্তম বিষয়ের নির্দেশ দেন এবং মন্দ বিষয়ে নিষেধ করেন, তাদের জন্যে পবিত্র বস্তুগুলোকে হালাল করেন, অপবিত্র বস্তুগুলোকে হারাম করেন এবং তাদের থেকে তাদের (নাফরমানীর কারণে চাপিয়ে দেয়া) ভারী বোঝা ও (বন্দিত্বের) শৃঙ্খল অপসারণ করেন (এবং তাদেরকে মুক্তির নিয়ামতের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান করেন)। অতঃপর যারা (এ মহিমাম্বিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর উপর ঈমান আনবে, তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করবে, তাঁকে (দ্বীনে) সাহায্য ও সহায়তা করবে এবং তাঁর সাথে অবতীর্ণ এ (কুরআনের) আলোর আনুগত্য করবে, তারাই সফলকাম।^{৪৫৮}

৬. তাঁর নুবুওয়্যতের সর্বজনীনতা ব্যাখ্যা করে এরশাদ হয়েছে:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ—

—বলে দিন, ‘হে মানবসমাজ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি ওই আল্লাহর রাসূল (হয়ে আগমন করেছি) যিনি সমগ্র আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী’।^{৪৫৯}

৭. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা বদর যুদ্ধে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কতৃক কাফেরদের দিকে নুড়িপাথর নিক্ষেপের কাজটিকে নিজের প্রতি আরোপ করেছেন:

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى

৪৫৮. আল-কুরআন, ৭:১৫৭।

৪৫৯. আল-কুরআন, ৭:১৫৮।

–আর (হে মহিমাম্বিত হাবীব!) যখন আপনি (তাদের প্রতি নুড়ি পাথর) নিক্ষেপ করেছিলেন, (তা) আপনি নিক্ষেপ করেননি বরং (তা তো) আল্লাহ নিক্ষেপ করেছিলেন।^{৪৬০}

৮. প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র নিজ উম্মতের প্রতি পূর্ণ দয়র্দ ও দয়ালু হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ.

–অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে (একজন সম্মানিত) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমন করেছেন। তোমাদের ভোগান্তি এবং কষ্টে পতিত হওয়া তাঁর জন্যে খুবই কষ্টদায়ক। (হে লোকসকল!) তিনি তোমাদের (কল্যাণ এবং হিদায়াতের) খুবই আকাঙ্ক্ষী এবং উদগ্রীব। (আর) মুমিনদের জন্যে চুড়ান্ত(ই) দয়র্দ, সীমাহীন অনুগ্রহশীল।^{৪৬১}

৯. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর আশীর্বাদময় জীবনের শপথ করেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা’আলা:

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

(হে সম্মানিত হাবীব!) আপনার পবিত্র জীবনের কসম, নিশ্চয় এ লোকেরাও (লূতের সম্প্রদায়ের মতো) নিজেদের পাপাচারে মত্ত থেকে পেরেশান হয়ে ঘুরছে।^{৪৬২}

১০. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা’আলা আপন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’কে দুঃখক্লিষ্ট দেখতে চাননি, তাই তিনি ফরমান:

طه - مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ

৪৬০. আল-কুরআন, ৮:১৭।

৪৬১. আল-কুরআন, ৯:১২৮।

৪৬২. আল-কুরআন, ১৫:৭২।

–ত্বা-হা। (প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তা’আলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই অধিক অবগত।) (হে সম্মানিত মাহবুব!) আমরা আপনার প্রতি কুরআন এ জন্যে অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি কষ্টে পতিত হবেন।^{৪৬৩}

১১. প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমগ্র জগতের জন্যে (আল্লাহর) করুণা:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

–আর (হে মহিমাম্বিত রাসূল!) আমরা তো আপনাকে বিশ্বজগতের জন্যে রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।^{৪৬৪}

১২. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর দরবারে পালিত আদব/শিষ্টাচার মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিতে আল্লাহ তা’আলা ঘোষণা করেন:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

–(হে মুসলমানেরা!) তোমরা রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের আহ্বানের মতো গণ্য কোরো না। (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ওয়াসাল্লামকে আহ্বান করা যখন তোমাদের পারস্পরিক আহ্বানের মতো নয়, তখন স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ওয়াসাল্লামের সত্তা কীভাবে তোমাদের মতো হতে পারে?) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে (ভালোভাবে) জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে একে অপরের আড়ালে (রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে) চুপিসারে সড়ে পড়ে। সুতরাং যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ওয়াসাল্লাম)-এর (শিষ্টাচারের বিষয়ে)

৪৬৩. আল-কুরআন, ২০: ১-২।

৪৬৪. আল-কুরআন, ২১:১০৭।

বিরোধিতা করে তারা যেন সতর্ক হয় যে, (ইহকালেই) তাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসবে অথবা (পরকালে) তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি গ্রাস করবে।^{৪৬৫}

১৩. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ব্যক্ত করেন যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈমানদারদের নিজেদের আত্মার চেয়েও নিকটতর:

الَّتِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

—এ (সম্মানিত) নবী মুমিনদের কাছে তাদের প্রাণের চেয়েও ঘনিষ্ঠতর এবং স্বত্বাধিকারী এবং তাঁর (পবিত্র) স্ত্রীবৃন্দ তাদের মাতা।^{৪৬৬}

১৪. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সাক্ষী, সুসংবাদ প্রদানকারী, সতর্ককারী, আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী ও আলোকোজ্জ্বলকারী সূর্যরূপে প্রেরণ করেন। এরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.

—হে (সম্মানিত) নবী! আমরা অবশ্যই আপনাকে প্রেরণ করেছি (সত্য এবং সৃষ্টির) সাক্ষীরূপে ও (আখেরাতের সৌন্দর্যের) সুসংবাদদাতা এবং (পরকালের শাস্তির) সতর্ককারীরূপে, আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং আলো বিচ্ছুরণকারী সূর্যরূপে (প্রেরণ করেছি)।^{৪৬৭}

১৫. প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)র অতুলনীয়, অনুপম গুণাবলী অন্যত্র উল্লেখিত হয়েছে এভাবে:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.

৪৬৫. আল-কুরআন, ২৪:৬৩।

৪৬৬. আল-কুরআন, ৩৩:৬।

৪৬৭. আল-কুরআন, ৩৩:৪৫-৪৬।

—নিশ্চয় আমরা আপনাকে (কিয়ামতের দিন উম্মতের কর্মকাণ্ড ও অবস্থাদির) প্রত্যক্ষ সাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাতে (হে লোকেরা!) তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনো, তাঁকে সাহায্য করো, তাঁকে সীমাহীন সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করো এবং (একই সাথে) সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো।^{৪৬৮}

১৬. আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)র প্রশংসা করে এ কথা বলেন:

يَس- وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ- إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

—ইয়া-সীন। (প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামই সম্যক অবগত)। শপথ প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনের, নিশ্চয়ই আপনি আবশ্যিকীয়ভাবে রাসূলবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত।^{৪৬৯}

১৭. প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)র প্রতি বায়'আত/আনুগত্যের শপথ গ্রহণ প্রকৃতপ্রস্তাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহরই প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَّا يَشِئُتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

—(হে হাবীব!) নিশ্চয়ই যারা আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে তারা আল্লাহরই নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে। তাদের হাতের উপর (আপনার হাতের আকারে) আল্লাহরই হাত। অতঃপর যে বাইয়াত ভঙ্গ করে, তার এ বাইয়াত ভঙ্গের পরিণতি তার নিজেরই এবং যে তা পূর্ণ করে যা (পূর্ণ করার) প্রতিশ্রুতি সে আল্লাহর নিকট করেছে, তবে তিনি শীঘ্রই তাদেরকে প্রদান করবেন মহাপুরস্কার।^{৪৭০}

৪৬৮. আল-কুরআন, ৪৮:৮-৯।

৪৬৯. আল-কুরআন, ৩৬:১-৩।

৪৭০. আল-কুরআন, ৪৮:১০।

১৮. আল্লাহ তা'আলা বারণ করেছেন তাঁর প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র কণ্ঠস্বরের ওপরে কারো কণ্ঠস্বর উঁচু করতে কিংবা মানুষ একে অপরকে যেভাবে আহ্বান করে সেভাবে তাঁকে আহ্বান করতে; তিনি হুঁশিয়ার করেছেন যে এতে তাদের সমস্ত সৎকর্ম (নেক আমল) বিনষ্ট হতে পারে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

—হে ঈমানদারবর্গ! তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর সম্মানিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাইহী ওয়াসাল্লাম)-এর কণ্ঠস্বরের উপর উঁচু কোরো না এবং তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরেও কথা বোলো না যে রূপ উচ্চস্বরে তোমরা একে অপরের সাথে কথা বোলো। (অন্যথায়) এতে তোমাদের (ঈমানসহ) সমস্ত আমলই নিষ্ফল হয়ে যাবে, অথচ তোমরা টেরও পাবে না (যে, তোমাদের ঈমান ও আমল ধ্বংস হয়ে গিয়েছে)।^{৪৭১}

১৯. প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সামনে আপন কণ্ঠস্বর নিচু রাখাকে পুণ্য ও ধার্মিকতার মানদণ্ড হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ عَظِيمَةٌ.

—নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাইহী ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মুখে (শিষ্টাচার ও নিবেদনের নিমিত্তে) তাদের কণ্ঠস্বর নিচু রাখে তারাই সেসব লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ তাক্বওয়ার জন্যে মনোনীত করেছেন। তাদের জন্যেই রয়েছে ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার।^{৪৭২}

৪৭১. আল-কুরআন, ৪৯:২।

৪৭২. আল-কুরআন, ৪৯: ৩।

২০. মে'রাজ রাতে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উর্ধ্বগমনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবে:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

—(সকল ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে) পূতঃপবিত্র ও মহান সে সত্তা, যিনি রাতের কিয়দংশে তাঁর (সর্বাধিক প্রিয় ও নৈকট্যবান) বান্দাকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায় নিয়ে গিয়েছেন; যার চতুর্পাশকে আমরা বরকতময় করেছি, যাতে আমরা তাঁকে (এই পরিপূর্ণ বান্দাকে) আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাতে পারি। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।^{৪৭৩}

২১. পবিত্র শবে মে'রাজের উর্ধ্বগমন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করে সূরা নজম:

وَالْجُمُ إِذَا هُوَ - مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى - وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى -
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى - عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى - ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى - وَهُوَ
بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى - ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى - فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى - فَأَوْحَى إِلَى
عَبْدِهِ مَا أَوْحَى - مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى - أَفَتُخَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَى - وَلَقَدْ
رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى - عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى - عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى - إِذْ يَغْشَى
السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى - مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى - لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ
الْكَبَرَى -

অর্থ: শপথ উজ্জ্বল তারকা (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাইহী ওয়াসাল্লাম)-এর যখন তিনি (মিরাজ রজনীতে এক মুহূর্তে উর্ধ্বগমনের পর) নিম্নে অবতরণ করেন। তোমাদেরকে (স্বীয়) সাহচর্য প্রদানকারী (অর্থাৎ তোমাদেরকে স্বীয় সাহচর্যের অনুগ্রহ দ্বারা সাহাবীর মর্যাদা প্রদানকারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাইহী ওয়াসাল্লাম কখনো) পথ ভুলেননি এবং তিনি (কখনো) সৎপথ থেকে বিচ্যুতও হননি। আর

৪৭৩. আল-কুরআন, ১৭: ১।

তিনি (নিজ) প্রবৃত্তির তাড়নায়ও কথা বলেন না। তাঁর কথাই ওহী, যা তাঁর উপর প্রত্যাদেশ করা হয়। তাঁকে প্রবল শক্তিশালী (প্রতিপালক প্রত্যক্ষভাবে পূর্ণাঙ্গ) জ্ঞান দান করে ধন্য করেছেন, যিনি পরম সৌন্দর্যময়, অতঃপর (সৌন্দর্যের প্রবাহে নিজে) প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। আর তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজ রজনীতে বস্তুজগতের) সর্বোচ্চ দিগন্তে ছিলেন (অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের চূড়ান্ত সীমানায়)। অতঃপর তিনি (অর্থাৎ মহিমাম্বিত প্রতিপালক স্বীয় হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) নিকটবর্তী হলেন, আরো অধিক নিকটবর্তী। ফলে (উন্মোচিত পর্দায় আল্লাহ তা‘আলা এবং সম্মানিত হাবীবের মাঝে) দুই ধনুকের ব্যবধান রইলো কিংবা (চূড়ান্ত নৈকট্য) তার চেয়েও কম। অতঃপর (এ বিশেষ নৈকট্যের মাকাম এবং মিলিত হওয়ার মাঝে) তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা) স্বীয় (প্রিয়) বান্দার প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন, যা(ই) ওহী করার। (তাঁর) অন্তর এর অন্যথা জানেনি, যা (তাঁর) চক্ষু দেখেছে। তোমরা কি এ ব্যাপারে তাঁর সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে যা তিনি দেখেছেন? আর অবশ্যই তিনি তো তাঁকে (পর্দা উন্মোচিত আল্লাহ তা‘আলাকে) আরেকবার দেখেছিলেন। (আর তোমরা তার একবার দেখা নিয়েই বিবাদ করছো!) প্রান্তবর্তী বৃক্ষ সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে, এর নিকট রয়েছে জান্নাতুল মাওয়া। যখন নূর হক বা আল্লাহ তা‘আলার নূরের বিচ্ছুরণ সিদরাহ (মুত্তাহাকে)ও ঢেকে ফেলেছিল, যা ছিল এর দ্বারা আচ্ছাদিত।^{৪৭৪} তাঁর দৃষ্টিভ্রম হয়নি, আর সীমালঙ্ঘনও করেননি। (যাঁর দিকে তাকানোর তিনি তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন)। অবশ্যই তিনি (মিরাজ রজনীতে) স্বীয় প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছেন।^{৪৭৫}

২২. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘কে মহা মর্যাদাময় চরিত্রের বলে বর্ণনা করেন:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ-

৪৭৪. এ অর্থটিও ইমাম হাসান বসরী ও অন্যান্য ইমামবৃন্দের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে।

৪৭৫. আল-কুরআন, ৫৩: ১-১৮।

—আর অবশ্যই আপনি সর্বাধিক মহিমাম্বিত ও অতি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন চরিত্রে অধিষ্ঠিত (অর্থাৎ কুরআনী শিষ্টাচারে সুসজ্জিত এবং আল্লাহ তা‘আলার বৈশিষ্ট্যে গুণাম্বিত)।^{৪৭৬}

২৩. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা শপথ করেছেন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘র (মক্কা) শহর সম্পর্কে এ কথা বলে:

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ - وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ - وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

—আমি শপথ করছি এ (মক্কা) নগরীর, (হে মহিমাম্বিত হাবীব) এ জন্যে যে, আপনি এ নগরীর অধিবাসী। (হে আমার মহিমাম্বিত হাবীব!) শপথ (আপনার) পিতা (আদম অথবা ইবরাহীম আলাইহিমাস সালাম)-এর এবং শপথ (তাঁদের), যারা জন্মগ্রহণ করেছেন।^{৪৭৭}

২৪. সর্বশক্তিমান আল্লাহ শপথ করেছেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)‘এর জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল ও সুগন্ধময় কেশদামের:

وَالضُّحَى - وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى - وَلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى - وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى - أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى - وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى - وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى - فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ - وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ - وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.

— শপথ উদীয়মান প্রভাতের (যখন সূর্য উপরে উঠে স্বীয় আলো ছড়ায়), অথবা (হে সম্মানিত হাবীব!) শপথ উদীয়মান প্রভাতের (মতো আপনার সর্বাধিক আলোকোজ্জ্বল চেহারার, যার দ্যুতি অন্ধকার রূহসমূহকে আলোকিত করেছে), অথবা শপথ উদীয়মান প্রভাতের (মতো আপনার রেসালাতের সূর্য উপরে উঠার, যার নূর গোমরাহীর অন্ধকারকে আলোয় পরিবর্তন করে দিয়েছে, আর শপথ রাতের যখন তা ছেয়ে যায়, অথবা (হে সম্মানিত হাবীব!) শপথ অন্ধকার রাতের (মতো আপনার স্বর্ণালী কেশগুচ্ছের), যখন তা (আপনার কমনীয় চেহারায় অথবা কাঁধের উপর)

৪৭৬. আল-কুরআন, ৬৮:৪।

৪৭৭. আল-কুরআন, ৯০:১-৩।

ছেয়ে যায়, অথবা শপথ রাতের (মতো আপনার সত্তার আচ্ছাদনীর), যখন তা (আপনার নূরের প্রকৃতিকে একাধিক পর্দায়) আচ্ছাদিত করে রাখে, আপনার প্রতিপালক (যখন থেকে আপনাকে নির্বাচিত করেছেন) আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং (যখন থেকে আপনাকে প্রিয়তম বানিয়েছেন) আপনার প্রতি অসম্ভব হননি। আর আপনার জন্যে তো (প্রতিটি) পরবর্তী মুহূর্ত পূর্ববর্তীর চেয়ে উত্তম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চ মর্যাদার কারণ)। আর আপনার প্রতিপালক শীঘ্রই আপনাকে (এতো বেশি) প্রদান করবেন যে, আপনি সম্ভব হয়ে যাবেন। (হে প্রিয়তম!) তিনি কি আপনাকে এতিমরূপে পাননি, অতঃপর (আপনাকে মর্যাদাসম্পন্ন ও মাধুর্যমণ্ডিত) আশ্রয় দেননি? অথবা তিনি কি আপনাকে (দয়ালু) পাননি, অতঃপর তিনি (আপনার মাধ্যমে) এতিমদের আশ্রয় দেননি? আর তিনি আপনাকে পেয়েছেন তাঁর ভালোবাসায় নিমগ্ন ও আত্মহারা, অতঃপর তিনি আপনাকে অসীম লক্ষ্য অর্জন করিয়েছেন। অথবা তিনি আপনাকে বিপথগামী সম্প্রদায়ের মধ্যে (পথপ্রদর্শনকারী) পেয়েছেন, অতঃপর তিনি (তাদেরকে আপনার মাধ্যমে) হেদায়াত দিয়েছেন। আর তিনি আপনাকে পেয়েছেন (হকে বারি তা'আলার সাথে মিলিত হবার) মুখাপেক্ষী, অতঃপর তিনি (স্বীয় দর্শনের সুখানুভবে অনুগ্রহ করে চিরদিনের সকল চাহিদা থেকে) অমুখাপেক্ষী করেছেন। অথবা, তিনি আপনাকে পেয়েছেন (অতিশয় দানশীল ও কল্যাণময়), অতঃপর তিনি (আপনার মাধ্যমে) মুখাপেক্ষীদের অমুখাপেক্ষী করেছেন। সুতরাং আপনিও কোনো এতিমের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করবেন না, আর (আপনার কাছে সাহায্যপ্রার্থী) কোনো ভিক্ষুককে ভর্ৎসনা করবেন না, আর আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহের আলোচনা করুন (উত্তমরূপে)।^{৪৭৮}

২৫. প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে অসংখ্য নেয়ামত/আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছেন, সে সম্পর্কে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ - فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ - إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

-নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে সীমাহীন পর্যাণ্ডতায় দান করেছি (সকল শ্রেষ্ঠত্ব, রহমত ও বরকত)। অতঃপর আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন (এটি 'হাদইয়ায়ে তাশাক্কুর' বা কৃতজ্ঞতা আদায়ের উদ্দেশ্যে কুরবান)। অবশ্যই আপনার শত্রুই হবে নির্বংশ এবং নাম পরিচয়হীন।^{৪৭৯}

উপরোল্লিখিত আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান করে আল্লাহ তা'আলা কীভাবে তাঁর প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, মহিমা ও সর্বোচ্চ মর্যাদা তুলে ধরেছেন। এই কারণেই তাঁর সম্মানে গীতিকাব্য আবৃত্তি করা হয়ে থাকে। অতএব, যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তির অনুমতি/বৈধতা অস্বীকার করে, সে প্রকৃতপক্ষে কুরআন মজীদে ওপরের ওই আয়াতগুলোরই বিরোধিতা করে।

৮.১০ হযরত পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই নিজের প্রশংসাসূচক কবিতা গুনেছেন

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই নিজের প্রশংসাসূচক কাব্য আবৃত্তির সমাবেশের আয়োজন করতেন; তিনি হযরত হাসসা'ন বিন সা'বিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'কে সেসব কবিতা আবৃত্তির জন্যে আদেশ দিতেন, যেগুলো তিনি তাঁর সম্মানার্থে রচনা করেছিলেন। হযরত হাসসা'ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছাড়াও মহান সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'বৃন্দের অনেকেই মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র সামনে প্রশংসাসূচক কবিতা (রচনা ও) আবৃত্তির মতো শ্রেষ্ঠত্ব ধারণ করতেন। এর কিছু উদাহরণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

৮.১০.১ হযরত হাসসান বিন সাবিত (রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে প্রশংসাসূচক কবিতা শ্রবণ

১. ঈমানদারদের মা হযরত আয়েশাহ (রাঃদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحْسَانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَتْ: يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে নববীতে হযরত হাসসান (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) এর জন্যে একটি মিসর স্থাপন করতেন, যার ওপরে দাঁড়িয়ে তিনি প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রশংসাসূচক কবিতা আবৃত্তি করতেন। অথবা মা আয়েশা (রাঃদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: হযরত হাসসান (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পক্ষ সমর্থন করতেন।^{৪৮০}

এই হাদীসে বিবৃত كَان (কা'না) শব্দটি পরিস্ফুট করে যে এই ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটতো; অর্থাৎ, এটা রীতিসিদ্ধ ছিলো। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বারংবার হযরত হাসসান (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) কে মসজিদে নববীতে ডাকতেন এবং তাঁর জন্যে মিসরের ব্যবস্থা করতেন, যাতে তিনি হজুরে পূর নূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্মানে প্রশংসামূলক কবিতা পাঠ ও অবিশ্বাসীদের অভিযোগসমূহ খণ্ডন করতে পারেন। মা সৈয়দা আয়েশাহ (রাঃদিয়াল্লাহু আনহা) আরো বর্ণনা করেন যে হযরত হাসসান (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) যখনই তাঁর কবিতা আবৃত্তি করতেন, তৎক্ষণাৎ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুব খুশি হতেন এবং বলতেন:

لَنْ اللَّهُ يُؤَيِّدَ حَسَانَ بَرُوحِ الْقُدُسِ، مَا يُفَاخِرُ أَوْ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—“নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হাসসানকে রুহুল কুদুস (পবিত্র আত্মা মানে জিবরীল আমিন) দ্বারা সমর্থন দেবেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রশংসা ও তাঁর পক্ষ সমর্থন করবে।^{৪৮১}”

২. ঈমানদার মুসলমানদের মা হযরতে সাইয়েদা আয়েশাহ সিদ্দীকা (রাঃদিয়াল্লাহু আনহা) আরো বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরতে হাসসান (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেন:

إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ... هَجَاهُمْ حَسَنًا فَشَفَى وَاشْتَفَى.

অর্থ: রুহুল কুদুস (তথা পবিত্র আত্মা/জিবরীল আমিন) তোমাকে সমর্থন করা বন্ধ করবেন না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ সমর্থন করো। হাসসান অবিশ্বাসীদেরকে ব্যঙ্গ করেছিলো এবং এভাবে মুসলমানদেরকে সাত্ত্বনা দিয়েছিলো, আর (অবিশ্বাসীদের নিরন্তর করে) নিজেকেও নিরন্তর করেছিলো।

হযরত হাসসান (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) নিম্নের কয়েকটি পংক্তি পাঠ করেন:

هَجَرْتُ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ
وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ الْجَزَاءُ
هَجَرْتُ مُحَمَّدًا بَرًّا حَنِيفًا
رَسُولَ اللَّهِ شَيْئَتُهُ الْوَفَاءُ
فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِزِّي
لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ

৪৮১. তিরমিযী কৃত ‘আল-জামে’ আল-সহীহ: কিতাব আল-আদাব, ‘কবিতা আবৃত্তি সম্পর্কে আমাদের কাছে যা এসেছে’ শীর্ষক অধ্যায়, ৫:১৩৮ #২৮৪৬; আহমদ বিন হাম্বল প্রণীত ‘আল-মুসনাদ’, ৬:৭২ #২৪,৪৮১; আল-হাকিম রচিত ‘আল-মুস্তাদরাক’, ৩:৫৫৪ #৬০৫৮; এবং আবু এয়ালা লিখিত ‘আল-মুসনাদ’, ৮:১৮৯ #৪৭৪৬।

তুমি প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে করেছিলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ,
তাই আমি তোমায় জবাব দিয়েছি তাঁরই পক্ষস্বরূপ,
আর আল্লাহরই কাছে ফায়সালা যা এর প্রতিদানরূপ।
তুমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে করেছে
উপহাস যিনি সৎ ও ধার্মিক,
সুতরাং মোর পিতা, পিতামহ ও আত্মসম্মানবোধ সার্বিক,
প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) র সম্মান (ও নুবুয়তের
গৌরব) রক্ষায় ঢালস্বরূপ হোক ১৪৮২ (ভাবানুবাদ)

৩. হযরত হাসসান বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মোনাফেকদের মিথ্যে অভিযোগে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, যখন-ই তারা ঈমানদারদের মা হযরতে সাইয়েদা আয়েশাহ সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) র প্রতি অবিশ্বস্ততার দোষারোপ করেছিলো; তবে মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে ক্ষমা করে দেন, যেহেতু তিনি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্মানে কবিতা আবৃত্তিকারীদের একজন ছিলেন। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, “তিনি (এই প্রশংসাসূচক) কবিতাটি রচনা ও পাঠ করেছিলেন (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে):

فَإِنِّي أَبِي وَوَالِدُهُ وَعَرْضِي
لِعَرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ

সুতরাং মোর পিতা, পিতামহ ও আত্মসম্মানবোধ সার্বিক,
প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) র সম্মান (ও নুবুয়তের
গৌরব) রক্ষায় ঢালস্বরূপ হোক ১৪৮৩ (ভাবানুবাদ)

৪৮২. সহীহ মুসলিম: কিতাবু ফাযায়েলিস সাহাবা; ‘হযরত হাসসান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর গুণগত বৈশিষ্ট্য’ অধ্যায়, ৪:১৯৩৬ #২৪৯০; আল-বায়হাকী কৃত ‘সুনানে কুবরা’, ১০:২৩৮; আল-তাবারানী রচিত ‘মুজামে কবীর’, ৪:৩৮ #৩৫৮২; এবং হাসসান বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রণীত ‘দীওয়ান’, ২০-২১ পৃষ্ঠা।

৪৮৩. সহীহ বুখারী: ‘কিতাবুল মাগাযি’, ‘কুৎসার ঘটনা’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৫১৮ #৩৯১০; সহীহ মুসলিম: ‘কিতাবুত তওবা’, ‘কুৎসার ঘটনা ও কুৎসা রটনাকারীদের তওবা’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:২১৩৭ #২৭৭০; আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত ‘মুসনাদ’, ৬:১৯৭; আল-নাসাঈ প্রণীত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৫:২৯৬ #৮৯৩১; আবু এয়ালা লিখিত ‘মুসনাদ’, ৮:৩৪১ #৪৯৩৩; এবং হযরত হাসসান বিন সাবিত রচিত ‘দীওয়ান’, ২১ পৃষ্ঠা।

৪. হযরত হাসসান বিন সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হযরত আবু হোরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করেন, “আমি আল্লাহর খাতিরে আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে শুনেছেন এ কথা বলতে:

يَا حَسَّانُ! أَجِبْ عَن رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلَلَّهُمْ أَيْدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ.

—হে হাসসান! আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পক্ষে জবাব দাও। হে আল্লাহ, তাকে রুহুল কুদুস (তথা পবিত্র আত্মা/জিবরীল আমিন) দ্বারা সাহায্য করুন।”

হযরত আবু হোরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উত্তর দেন:

قال أبو هريرة: نعم.

অর্থাৎ, হ্যাঁ (আমি তাঁকে এ কথা বলতে শুনেছি) ১৪৮৪

৫. আল-বারা'আ ইবনে আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত হাসসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেন:

اهْجُؤْهُمْ أَوْ قَالَ: هَاجِجْهُمْ وَجَبْرِئِلَ مَعَكَ.

অর্থ: (হে হাসসান), (মক্কার) মুশরিকদেরকে বিদ্রূপ কোরো (ব্যঙ্গাত্মক কাব্য দ্বারা); (অথবা বলেন:) তাদেরকে ব্যঙ্গ কোরো আর জিবরীল আমিন (আলাইহিস সালাম) তোমার সাথে আছেন ১৪৮৫

৪৮৪. সহীহ বুখারী: কিতাব আল-আদাব, ‘মুশরিকদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ’ শীর্ষক অধ্যায়, ৫:২২৭৯ #৫৮০০; সহীহ বুখারী: কিতাব আস্ সালাহ, ‘মসজিদে কাব্য’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:১৭৩ #৪৪৪; সহীহ মুসলিম: ‘কিতাব আল-ফাদায়েল আস্ সাহাবা’, ‘হাসসান বিন সাবিতের গুণাবলী’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৯৩৩ #২৪৮৫; আল-নাসাঈ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৬:৫১ #১০,০০০; আবু এয়ালা রচিত ‘আল-মুসনাদ’, ১০:৪১১ #৬০১৭; আল-বায়হাকী প্রণীত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ১০:২৩৭; এবং আল-তাবারানী লিখিত ‘আল-মুজাম আল-আওসাত’, ১:২০৮ #৬৬৮।

আল্লাহ তা‘আলা-ই একমাত্র জানেন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’র সান্নিধ্যে হযরত হাসসা‘ন বিন সা‘বিত (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) কতো দীর্ঘ সময় যাবৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর সম্মানে প্রশংসাসূচক কবিতা আবৃত্তি করতেন।

৮.১০.২ হযরত আল-আসওয়াদ বিন সারী (রাঃদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) হতে প্রশংসাসূচক কবিতা শ্রবণ

আল-আসওয়াদ বিন সারী (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে তিনি প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’কে জিজ্ঞেস করেছিলেন:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ قَدْ مَدَحْتُ اللَّهَ بِمَدْحَةٍ وَمَدَحْتُكَ بِأُخْرَى

—এয়া রাসূলল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি আল্লাহ তা‘লার স্তুতিমূলক একটি কবিতা রচনা করেছি, আর আপনারও প্রশংসাসূচক আরেকটি কবিতা লিখেছি।

এতদশ্রবণে মহানতম পয়গম্বর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

هَاتِ وَابْدَأْ بِمَدْحَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

৪৮৫. সহীহ বুখারী: ‘কিতা’ব আল-আদাব’, ‘মুশরিকদের প্রতি ব্যঙ্গ’ শীর্ষক অধ্যায়, ৫:২২৭৯ #৫৮০১; সহীহ বুখারী: كتاب بدء الخلق - ‘কিতা’বু বাদ‘য়িল খালকি’ (সৃষ্টির আদি-সংক্রান্ত বই), ‘ফেরেশতাবন্দের উল্লেখ’ শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১১৭৬ #৩০৪১; সহীহ বুখারী: ‘কিতা’ব আল-মাগাযী’, ‘রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর আহযা’ব ফ্লেহাদ হতে প্রত্যাবর্তন ও বনু কুরায়যা’র দিকে রওয়ানা’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৫১২ #৩৮৯৭; সহীহ মুসলিম: ‘কিতা’বু ফাযায়েলেস্ সাহাবা’, ‘হাসসা‘ন বিন সা‘বিতের গুণাবলী’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৯৩৩ #২৪৮৬; আহমদ ইবনে হাম্বল প্রণীত ‘আল-মুসনাদ’, ৪:৩০২; আল-তায়্যালিসী কৃত ‘আল-মুসনাদ’, ১:৯৯ #৭৩০; আল-বায়হাকী রচিত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ১০:২৩৭; এবং আল-তাবারানী লিখিত ‘আল-মুজাম আল-কবীর’, ৪:৪১ #৩৫৮৮।

অর্থ: সেটা আনো! (আমায় আবৃত্তি করে শোনাও) প্রারম্ভে আল্লাহর বন্দনামূলক কাব্যটি।^{৪৮৬}

৮.১০.৩ হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহ (রাঃদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) হতে প্রশংসাসূচক কবিতা শ্রবণ

১. হযরত হায়সাম বিন আবী সানা‘ন (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) বিবৃত করেন: হযরত আবু হোরায়াহ (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) নিজ খুতবার মধ্যে মহানতম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর বিষয়ে উল্লেখ করার সময় বলেন, “তোমাদের ভাই (কবি) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়া’হা বৃথা কোনো কথা বলেন না।’ এ কথা বলে হযরত আবু হোরায়াহ (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর (কবির) কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন:

وَفِينَا رَسُولَ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ
إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ
أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا
بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَقِيعٌ
يَبِيْتُ يُجَانِي جَنْبَهُ عَنْ فَرَاشِهِ
إِذَا اسْتَنْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَصَاجِعُ

—আমাদের মাঝে আছেন আল্লাহর নবী, যিনি কুরআন তেলাওয়াতরত, যেমনি সূর্যের উজ্জ্বল প্রভা ভোরের আকাশকে করে থাকে আলোকিত। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন অন্ধত্ব থেকে করে মুক্ত, আর তাই আমাদের অন্তর নিশ্চিত জানে তিনি যা বলেন তা ঘটবে সত্য। তিনি আপন বিছানা ত্যাগ করে রাত করেন (এবাদতে) অতিবাহিত,

৪৮৬. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত ‘আল-মুসনাদ’, ৪:২৪ #১৬,৩০০; ইবনে আবী শায়বা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রণীত ‘আল-মুসান্নাফ’, ৬:১৮০; আল-তাবারানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখিত ‘আল-মুজাম আল-কবীর’, ১:২৮৭ #৮৪২; এবং আল-বায়হাকী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) রচিত ‘শু‘য়াব আল-ঈমান’ ৪:৮৯ #৪৩৬৫।

যখন মুশরিকবর্গ নিজেদের বিছানায় থাকে সবচেয়ে গভীর নিদ্রাগত।^{৪৮৭}
(ভাবানুবাদ)

২. হযরত আনাস (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, মহানতম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়া'হা (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর অগ্রভাগে হাঁটছিলেন এবং নিম্নের পংক্তিগুলো উচ্চস্বরে (শে'র আকারে) আবৃত্তি করছিলেন:

خَلُّوا بَيْنِي الْكُفَّارَ عَنْ سَبِيلِهِ
الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِ
صَرَبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ
وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ

ওহে কুফরার সন্তানবর্গ, হও বিমুখ হতে নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র পথ,
কেননা তাঁর আগমন দিবসে আমরা তোমাদের করবো আঘাত,
যা এমনই যে (ঘাড় থেকে) করবে মুণ্ডপাত,
যার ফলে এক মিত্র ভুলবে তারই (আপন) মিত্রের জাত! (ভাবানুবাদ)

এতদশ্রবণে হযরত উমর ফারুক (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

يَا ابْنَ رَوَاحَةَ! بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَرَمِ اللَّهِ تَقُولُ
الشُّعْرُ؟

৪৮৭. সহীহ বুখারী: 'কিতা'ব আল-তাহাজ্জুদ', 'কারো রাতে জেগে উঠে এবাদত পালন' শীর্ষক অধ্যায়, ১:৩৮৭ #১১০৪; সহীহ বুখারী: 'কিতা'ব আল-আদব', 'মুশরিকদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ' শীর্ষক অধ্যায়, ৫:২২৭৮ #৫৭৯৯; আল-বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) রচিত 'আল-তারীখ আল-সগীর', ২৩ পৃষ্ঠা #৭১; আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত 'মুসনাদ', ৩:৪৫১; আল-বায়হাকী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রণীত 'আল-সুনান আল-কুবরা', ১০:২৩৯; এবং ইবনে কাসীর লিখিত 'আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া', ৩:৪৬৫।

—ওহে ইবনে রাওয়াহা, তুমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর সামনে এবং আল্লাহরই হারাম (মানে বায়তুল্লাহ) শরীফের স্থানে কাব্য পাঠ করছো?

এমতাবস্থায় মহানতম পয়গম্বর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত উমর (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু)'এর প্রশ্নের উত্তরে বলেন:

خَلَّ عَنْهُ يَا عُمَرُ، فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضِجِ التَّبَلِ.

অর্থ: হে উমর, ওকে ছেড়ে দাও; কেননা (ওর) এই কাব্য কুফরারদের (গায়ে) তীরের চেয়েও বেশি জোরে আঘাত করছে।^{৪৮৮}

৮.১০.৪ হযরত আমির বিন আকওয়া (রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে প্রকাশ্য সমাবেশে প্রশংসাসূচক কবিতা শ্রবণ

হযরত সালামাত বিন আকওয়া (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন: আমরা একবার রাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর সাথে খায়বরের উদ্দেশ্যে সফর করছিলাম। সফরকারীদের কেউ একজন আমার ভাই আমির বিন আকওয়া (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু)'কে বলেন, “আমাদের জন্যে আপনার কিছু কবিতা আবৃত্তি করুন।” এমতাবস্থায় তিনি তাঁর উট হতে নেমে নিচের পদ্য আবৃত্তি করেন:

اللَّهُمَّ! لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا
وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا أَبْقَيْنَا
وَتَبَّتْ الْأَقْدَامُ إِنْ لَا قَيْنَا

৪৮৮. ইমাম তিরমিযী কৃত 'আল-জামেউস্ সহীহ': 'কিতা'বুল আদব', 'কবিতা পাঠ সম্পর্কে আমাদের কাছে যা এসেছে' শীর্ষক অধ্যায়, ৫:১৩৯ #২৮৪৭, আর তিনি এটাকে হাসান সহীহ হাদীস ঘোষণা করেন; আল-নাসাঈ প্রণীত 'আল-সুনান': 'কিতা'ব মানাসিক আল-হাজ্জ', 'হারাম শরীফে পদ্য আবৃত্তি' শীর্ষক অধ্যায়, ৫:২০২ #২৮৭৩; এবং আল-কুরতুবী রচিত 'আল-জামেউ লি-আহকামিল-কুরআন', ১৩:১৫১।

হে আল্লাহ, আপনি না হলে আমরা না পেতাম হেদায়াত,
না করতাম দান-খয়রাত, না আদায় করতাম সালাত,
মোদের করুন ক্ষমা, যতোক্ষণ আপনারই পণে মোরা সৎ,
আর শত্রুর মোকাবিলায় মোদের কদমকে করুন মজবুত। (ভাবানুবাদ)

এতদশ্রবণে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: مَنْ هَذَا - কে এই (উট) চালক (যে আমার পক্ষে শের গাইছে)?

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃদিয়াল্লাহু আনহুম) উত্তর দেন: قَالُوا : غَامِرُ بْنُ -এয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এ আমার বিন আকওয়া।”

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুশি হয়ে তাঁর জন্যে দুআ করেন এই বলে: قَالَ : يَرْحَمُهُ اللَّهُ - “আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি আপন রহমত/করুণা বর্ষণ করুন।^{৪৮৯}”

৮.১০.৫ হযরত আব্বাস বিন আব্দিল মুত্তালিব (রাঃদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) হতে প্রশংসাসূচক কবিতা শ্রবণ

খারীম বিন আওস (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে পরে তিনি (মানে খারীম স্বয়ং) তাঁর হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ওই সময় তিনি হযরত আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেন: ‘এয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

৪৮৯. সহীহ বুখারী: ‘কিতাব আল-মাগাযী’, ‘খায়বর অভিযান’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৫৩৭ #৩৯৬০; সহীহ বুখারী: ‘কিতাব আল-আদব’, ‘কাব্যে যা অনুমতিপ্রাপ্ত’ শীর্ষক অধ্যায়, ৫:২২৭৭ #৫৭৯৬; সহীহ মুসলিম: ‘কিতাব আল-জিহাদ’, ‘খায়বরের অভিযান’ শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১৪২৮ #১৮০২; আবু আওয়ানা কৃত ‘আল-মুসনাদ’, ৪:৩১৪ #৬৮৩০; আল-বায়হাকী প্রণীত ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ১০:২২৭; এবং আল-তাবারানী রচিত ‘আল-মুজাম আল-কবীর’, ৭:৩২ #৬২৯৪।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি আপনার প্রশংসা করতে চাই।’ এই অনুরোধ শুনতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

[قُلْ، لَا يَفْضُضُ اللَّهُ فَآك.]

-অগ্রসর হোন। আল্লাহ তা‘আলা আপনার মুখের সীল (দাঁত) কখনো যেনো ধ্বংস না করেন।

অতঃপর হযরত আব্বাস (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)র শানে কবিতা আবৃত্তি করেন:

مِنْ قَبْلِهَا طِبَّتْ فِي الظَّلَالِ وَفِي
مُسْتَوْدَعٍ حَيْثُ يَخْصِفُ الْوَرَقُ

আপনি ছিলেন উত্তম, ধরণীতে শুভাগমনের আগে,
ছায়ায় ও (গোপন) ভাণ্ডারে (হযরত আদমের যুগে),
যখন তাঁরা নিজেদের আবৃত করতেন বৃক্ষ-পল্লবে।

ثُمَّ هَبَطْتَ الْبِلَادَ لَا بَشَرٌ
أَنْتَ وَلَا مُضَغَّةٌ وَلَا عُلُقُ

অতঃপর আবির্ভূত হন নয়কো (মরণশীল) মানবরূপে,
নয়কো মাংসপিণ্ড কিংবা ঝুলন্ত ভর হিসেবে।

بَلْ نُظْفَةُ تَرْكَبُ السَّفِينِ وَقَدْ
أَلْجَمَ نَسْرًا وَأَهْلَهُ الْعَرْقُ

বরঞ্চ এক বিন্দুরূপে, যা (নুহের) কিস্তি চড়ে,
লাগাম পরিয়েছিলো মূর্তি নাসরের গলে,
তার পূজারীরা যবে, গিয়েছিলো ডুবে জলে।

تُنْقَلُ مِنْ صَالِبٍ إِلَى رَحِمٍ
إِذَا مَضَى عَالَمٌ بَدَأَ طَبَقُ

ওই বিন্দু স্থানান্তরিত হয় পবিত্র ঔরস হতে পবিত্র গর্ভে,

জগৎ এগোয় যবে, নবযুগের সূচনা হয় এ ভবে।

حَتَّىٰ احْتَوَىٰ بَيْنَكَ الْمُهَيْمِنُ
خِنْدِفٌ عَلِيَّاءَ تَحْتَهَا النُّطُقُ

আপনার (অভিভাবকত্বপূর্ণ) ঘর ধারণ করেছে যবে,
খিন্দিফ পর্বতের চেয়েও উচ্চতা, আপন মহানুভবে,
পর্বতমালা নিচে পড়ে রয় যে খিন্দিফের পরাভবে।

وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقْتَ
الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأَفُقُ

(হে নবী) আপনার বেলাদত হয়েছিলো যবে,
ভূবন ও দিগন্ত আলোকিত হয়েছিলো আপনারই নূরের বৈভবে।

فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي
النُّورِ وَسَبِيلُ الرَّشَادِ نَحْتَرِقُ

সেই নূরের আলোয় ও ন্যায়ের পথেই চলেছি মোরা সবে।^{৪৯০} (ভাবানুবাদ)

৮.১০.৬ হযরত কা'আব (রাঃরাঃরাঃ তা'আলা আনহু) হতে প্রশংসাসূচক কবিতা শ্রবণ ও তাঁকে আলখাল্লা দান

ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন: হযরত কা'আব বিন যুহাইর বিন আবী সালামা (রাঃরাঃরাঃ আনহু) পলাতক হিসেবে মদীনায়া আগমন করেন এবং জুহায়না গোত্রে তাঁর পরিচিত এক ব্যক্তির আশ্রয়ে অবস্থান করেন। ফজর নামাযের সময় তাঁরা (উক্ত গোত্রভুক্ত মানুষ) তাঁকে

৪৯০. আল-হাকিম, 'আল-মুস্তাদরাক', ৩:৩৬৯-৩৭০ #৫৪১৭; আল-তাবারানী, 'আল-মু'জাম আল-কবীর', ৪:২১৩ #৪১৬৭; ইবনে জাওয়াই, 'সাফওয়া আল-সাফওয়া', ১:৫৪; ইবনে আসীর, 'আসাদ আল-গা'বা ফী মা'রিফাতিল সাহা'বা', ২:১৬৫-১৬৬; আল-হায়সামী, 'মজমাউল যাওয়াঈদ ওয়া মামবা'আ আল-ফাওয়াঈদ', ৮:২১৮; আহমদ ইবনে যাইনী দাহলান, 'আল-সীরাতুল নববীয়া', ১:৪৬; এবং আল-নাবহানী, 'আল-আনওয়ারুল মুহাম্মদীয়া মিনাল-মাওয়াহিবিল্ লাদুন্নিয়া', ২৫ পৃষ্ঠা।

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র কাছে নিয়ে যান। মহান সাহাবা কেরাম (রাঃরাঃরাঃ আনহুম)'এর সাথে নামায আদায়শেষে কেউ একজন তাঁকে জানান যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেখানে (মানে মসজিদে নববীতে) বসে আছেন। এমতাবস্থায় হযরত কা'আব (রাঃরাঃরাঃ আনহু) সেখানে যান এবং হযূর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর সামনে বসে তাঁর পবিত্র হাত মোবারকে নিজ হাত রেখে বলেন, 'এয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), নিশ্চয় কা'আব বিন যুহাইর অনুতপ্ত হয়ে আপনার কাছে এসেছে; আমি যদি তাকে আপনার সামনে ডাকি, তাহলে আপনি তাকে ক্ষমা করবেন কি?' প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তর দেন, 'হ্যাঁ।' এতদশ্রবণে তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'কে অবহিত করেন যে কা'আব ইবনে যুহাইর (রাঃরাঃরাঃ আনহু) আসলে তিনি নিজেই। হঠাৎ আনসার সাহাবা (রাঃরাঃরাঃ তা'আলা আনহু)'দের মধ্য হতে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'এয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আমায় এই শত্রুটির শিরোচ্ছেদ করার অনুমতি দিন।' তিনি উত্তর দেন, 'তাকে ছেড়ে দাও! নিঃসন্দেহে সে তার ইতিপূর্বকার অবস্থার ব্যাপারে ক্ষমাপ্রার্থী এবং পালিয়ে এখানে এসেছে।' অতঃপর হযরত কা'আব (রাঃরাঃরাঃ আনহু) 'বা'নাত সু'আদ' কবিতাটি পাঠ করে শোনান:

بَأَنْتَ سَعَادٌ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتَبَوِّلٌ
مُتَيِّمٌ إِثْرَهَا لَمْ يُفَدَ مَكْبُولٌ

সু'আদ তিরোহিত, আর আমার অন্তর আজ বিরহপীড়িত

মুগ্ধ, শেকলাবদ্ধ, কোনো হুঁশ-ই আসবে না (তারে) করতে মুক্ত।

أُنَبِّئُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْعَدَنِي
وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَأْمُولٌ

আমায় করা হয়েছে অবহিত, মোর (শিরের) ওপর পুরস্কার আরোপিত

এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর ক্ষমা (আমার একান্ত) কাঙ্ক্ষিত।

হযরত কা'আব (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) এরপর আবৃত্তি করেন:

إِنَّ الرُّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ
وَصَارِمٌ مِّنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُورٌ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর এমনই জ্যোতি যা
করে (সমস্ত) আলোকিত

(যেনো) আল্লাহরই তীক্ষ্ণ এক তরবারি, কোষমুক্ত ১৪৯১ (ভাবানুবাদ)

ইবনে ক্বা'নী আল-বাগদাদী (ইশ্তেকাল: ৩৫১ হিজরী) বর্ণনা করেন যে,
হযরত কা'আব (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু)'এর এই কবিতা পাঠের পরে সবচেয়ে
দয়াবান নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে নিজ আলখাল্লা
মোবারক উপহারস্বরূপ দান করেন:

فَكَسَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَةً لَهُ، فَاشْتَرَاهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهَبٍ بِمَالٍ،
فَبَيَّ الْبُرْدَةَ الَّتِي تَلْبَسُهَا الْخُلَفَاءُ فِي الْأَعْيَادِ

—সবচেয়ে মর্যাদাবান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে
নিজের একটি বুরদা তথা আলখাল্লা/চাদর দ্বারা আবৃত করে দেন।
পরবর্তীকালে হযরতে আমীরে মুয়াবিয়া (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) সেটা তাঁর
(উত্তরাধিকারী) পুত্রের কাছ থেকে অর্থকড়ি/পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে কিনে
নেন। এই আলখাল্লাটি-ই খলীফা ঈদের দিনগুলোতে পরিধান
করতেন।^{৪৯২}

৪৯১. হাকিম, 'আল-মুস্তাদরাক', ৩:৬৭০-৬৭৩ #৬৪৭৭; আল-তাবারানী, 'আল-মু'জাম আল-
কবীর', ১৯:১৫৭-১৫৯ #৪০৩; আল-বায়হাক্বী, 'আল-সুনান আল-কুবরা', ১০:২৪৩;
ইবনে ইসহাক, 'সীরাতুননবীয়া', ৫৯১-৫৯৪ পৃষ্ঠা; ইবনে হিশাম, 'আল-সীরাতুন
নববীয়া', ১০১১-১০২০ পৃষ্ঠা; আল-হায়তামী, 'মজমাউল্ যাওয়াঈদ ওয়া মামবা'আ
আল-ফাওয়াঈদ', ৯:৩৯৩; এবং ইবনে কাসীর, 'আল-বেদায়া ওয়াল-নেহায়া', ৩:৫৮২-
৫৮৮।

৪৯২. ইবনে ক্বা'নী বর্ণিত; 'মু'জাম আল-সাহা'বা', ১২:৪৪৬৬ #১৬৫৭; এবং ইবনে আল-
জাওয়ী, 'আল-ওয়াফা' বি-আহওয়াল-ইল-মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)',
৪৬৩ পৃষ্ঠা #৮১৩।

৮.১০.৭ হযরত নাবিগা আল-জা'দী (রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)
হতে প্রশংসাসূচক কবিতা শ্রবণ

হযরত নাবিগা আল-জা'দী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, তিনি সর্বোচ্চ
মর্যাদাসম্পন্ন নবী صلى الله عليه وسلم এর দরবারে হাজির হন এবং তাঁর
শানে (২০০ পংক্তিবিশিষ্ট) একটি দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। এর
কিছু চরণ নিচে বর্ণনা করা হলো:

وَلَا خَيْرَ فِي جِلْمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ
بَوَادِرُ تَحْمِي صَفْوَهُ أَنْ يُكَدَّرَا
وَلَا خَيْرَ فِي جَهْلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ
حَلِيمٌ إِذَا مَا أَوْرَدَ الْأَمْرَ أَصْدَرَا

এই অনুকম্পায় নেই কোনো ভালাই, যদি এর সাথে না থাকে ক্রোধের উত্তপ্ততা,
কর্দমাজতা হতে রক্ষা করে যা পবিত্রতা ও নির্মলতা।

আর এই অজ্ঞতায় নেই কোনো ভালাই, যদি না থাকেন এর সাথে ক্ষমাশীল সত্তা,
কোনো (মন্দ) পরিণতি রহিত করতে যিনি ইচ্ছুক, এমনই আদেশকর্তা।
(ভাবানুবাদ)

মহাসম্মানিত রাসূল صلى الله عليه وسلم তাঁর জন্যে দু'আ করেন এই বলে:
اللَّهُمَّ لَا يَفْضُضُ اللَّهُ فَائِدًا إِلَّا أَحْسَنَ النَّاسِ ثَغْرًا، وَكَانَ إِذَا سَقَطَتْ لَهُ سِنَّةٌ نَبَتْتُ.
ক্ষয়প্রাপ্ত না করেন।

বর্ণনাকারী বিবৃত করেন:

وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا، وَكَانَ إِذَا سَقَطَتْ لَهُ سِنَّةٌ نَبَتْتُ.

—আমাদের মাঝে তাঁরই ছিলো সেরা দাঁতের পাটি। যখনই কোনো দাঁত পড়ে যেতো, তৎক্ষণাৎ আরেকটি দাঁত সেখানে গজিয়ে উঠতো।^{৪৯৩}

ওপরের বিবরণে প্রিয়নবী ﷺ এর প্রশংসাকালে হযরত নাবিগা আল-জাদী رضي الله عنه একটি উপমা প্রয়োগ করেন। প্রথম চরণে তিনি রাসূল ﷺ র ‘ঐর্ষ্য/ক্ষমাশীলতা ও মহত্ত্বকে দয়া ও অনুগ্রহের পরম মূর্তরূপ হিসেবে বর্ণনা করেন। অথচ দ্বিতীয় ছন্দে তিনি ‘অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে ‘ক্ষমাশীল সত্তার’ থাকার কথা বলেন; আরেক কথায়, তিনি বিনীতভাবে নিজেকে অজ্ঞ ও সবচেয়ে দয়াবান প্রিয়নবী ﷺ র সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য লাভকারী হিসেবে ব্যক্ত করেন, যেহেতু মহানবী ﷺ-ই তাঁকে জীবনের যাবতীয় বিপদ-আপদ ও দুর্যোগ হতে রক্ষা করবেন। এই পন্থায় তিনি উপমা দ্বারা সবচেয়ে ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু রাসূল ﷺ এর প্রশংসা করেন; আর এরই ফলশ্রুতিতে সদাশয় নবী করীম ﷺ তাঁর এ প্রচেষ্টার প্রতি সম্মত হন এবং তাঁরই জন্যে দু’আ করেন।

৪৯৩. হা’রিস্ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক বর্ণিত ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে, ২:৮৪৪ #৮৯৪; আল-হায়সামী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত ‘মজমাউয় যাওয়াইদ ওয়া মানবাআ’ আল-ফাওয়াইদ’, ৮:১২৬; ইবনে হাইয়ান প্রণীত ‘তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীন বি-আসবাহান’, ১:২৭৪ #১১; ইবনে আবদিল বারর রচিত ‘আল-ইস্তিযাবু ফী মা’রৈফাতিল আসহাব’, ৪:১৫১৬ #২৬৪৮; ইবনে জাওয়া লিখিত ‘আল-ওয়াফা বি-আহওয়ালিল মুস্তফা ﷺ ৮৬২-৮৬৩ পৃষ্ঠা #৮১২; ইবনে আসীর কৃত ‘আসাদ আল-গাবা ফী মা’রৈফাতিল সাহাবা’, ৫:২৭৬-২৭৮; এবং ইমাম আসকালানী প্রণীত ‘আল-ইসাবা ফী তামযিয়-ইল-সাহাবা’, ৬:৩৯৪ #৮৬৪৫।

৮.১০.৮ মদীনাবাসী মেয়েদের দফ (খঞ্জনি)-সহ প্রশংসাসূচক না’ত পরিবেশন

পরম দয়াবান রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা মোয়াযযমা হতে মদীনা মোনাওয়ারায় হিজরত করেন, তখন মদীনাবাসী আনসার তরুণীবৃন্দ মহিমাম্বিত নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর মহা-বরকতময় আগমনের খাতিরে দফ-বাদ্যসহ নিম্নের সুবিখ্যাত গানের চরণ গেয়ে শোনান:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا * مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا * مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعٍ
أَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا * جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمَطَاعِ

হেদায়াতের পূর্ণচন্দ্র আমাদের ভাগ্যাকাশে ‘আল-ওয়াদা’আ’ এলাকায় হয়েছেন উদ্ভিত,

যতোদিন আল্লাহর কোনো এবাদতকারী থাকবেন আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে হবো বাধিত,

হে রাসূল, আপনি আমাদের মাঝেই হয়েছেন (খোদা কর্তৃক) লালিত-পালিত,

এসেছেন নিয়ে এক ঐশী বিধান যা হতে হবে মান্যকৃত।^{৪৯৪} (ভাবানুবাদ)

৪৯৪. ইবনে আবী হা’তিম আল-রাযী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক ‘আল-সিকাত’ (১:১৩১) গ্রন্থে বর্ণিত; ইবনে আদিল বারর কৃত ‘আল-তামহীদ লিমা ফীল মুওয়াত্তা মিনাল মা’দানী ওয়াল-আসা’নীদ’, ১৪:৮২; আবু উবায়দ আল-আনদালুসী, ‘মু’জাম মা ইত্তা’জামা মিন আসমা’ আল-বিলাদ ওয়াল-মাওয়া’দী’, ৪:১৩৭৩; মুহিব্ব আল-তাবারী, ‘আল-রিয়াদ আল-নাদরা ফী মানা’ক্বিব আল-আশরা’, ১:৪৮০; আল-বায়হাকী, ‘দালায়েল আল-নুবুওয়া ওয়া মা’রীফা আহওয়াল সাহিব আল-শরীআ ২:৫০৭. ﷺ ইবনে কাসীর, ‘আল-বেদায়া ওয়াল-নেহায়া’, ২:৫৮৩; প্রাগুক্ত, ৩:২৬০; আল-আসকালানী, ‘ফাতহুল বারী’, ৭:২৬১; প্রাগুক্ত ৮:১২৯; আল-কুসতলানী, ‘আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া বিল-মিনাহ আল-মুহাম্মদীয়া’, ১:৬৩৪; আল-যুরকানী, শরহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়া বিল-মিনাহিল মুহাম্মদীয়া ৪:১০০-১০১; এবং আহমদ বিন যাইনী দাহলান মক্কী, ‘আল-সীরাতুল নাবাউইয়া’, ১:৩২৩।

৮.১০.৯ ইমাম বুসীরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর আরোগ্য লাভ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে উপহারস্বরূপ তাঁরই জুব্বাপ্রাপ্তি

ইমাম শারারুদ্দীন আল-বুসীরী (৬০৮-৬৯৬ হিজরী), যিনি ‘কুসীদা-এ-বুর্দা’ শীর্ষক পুস্তকের রচয়িতা, (নতুন করে) তাঁর পরিচয় প্রদানের কোনো প্রয়োজন এখানে নেই। তাঁর (প্রকাশ্য) জীবদ্দশাতেই তিনি ছিলেন প্রখ্যাত ও গভীর জ্ঞানী আলেমে হক্কানী, কবি ও বিশ্বখ্যাত লেখক। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে মহাগুণে গুণান্বিত করেছিলেন, যা তাঁকে তাঁর সময়কার রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধার পাত্র করেছিলো। একদিন রাস্তায় হাঁটার সময় তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পান, যিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, “বুসীরী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), আপনি কি সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী **صلى الله عليه وسلم** কে কখনো আপনার স্বপ্নে দেখেছেন?” ইমাম বুসীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি না-সূচক উত্তর দেন। এই সাক্ষাৎ তাঁর অন্তরের তারে অনুরণন তোলে এবং প্রিয়নবী **صلى الله عليه وسلم** এর প্রতি তাঁর এশক-মহব্বত এমন মাত্রায় বৃদ্ধি পায় যে, তিনি নিরন্তর তাঁর ভালোবাসায় বিভোর থাকেন। ওই সময় তিনি হুজুরে পূর নূর **صلى الله عليه وسلم** এর শানে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন।

ইমাম বুসীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদিন স্ট্রীকে আক্রান্ত হন, যার দরুন তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। দীর্ঘকাল তিনি এই অবস্থায় কাটান; আর সমস্ত চিকিৎসা নিষ্ফল হয়। এ রকম অসুস্থতার মাঝে তাঁর মনে এক ভাবনার উদয় ঘটে: “এই ব্যাধির আগে আমি তো দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের সম্মানে কবিতা লিখতাম; তাহলে সৃষ্টিকুল শিরোমণি প্রিয়নবী **صلى الله عليه وسلم** এর সম্মানে কেন লিখবো না, আর এই দুরারোগ্য ব্যাধি হতে সুস্থতার আশা কেন করবো না?” এরই ফলশ্রুতিতে তিনি একটি কবিতা রচনা করেন। সেই রাতে তিনি ঘুমোতে গেলে তাঁর তাকদীর খুলে যায়। তিনি নিজ স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ **صلى الله عليه وسلم** কে দেখার পরম সৌভাগ্য লাভ করেন; সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাসূল **صلى الله عليه وسلم**

‘**وسلم**’ এর সামনে গোটা কবিতাটুকু আবৃত্তি করে তাঁকে শোনাবার ভাগ্যও নসীব হয়। কবিতা শুনে প্রিয়নবী **صلى الله عليه وسلم** এতোখানি খুশি হন যে, তিনি আপন জুব্বা মোবারক খুলে ইমাম বুসীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির গায়ে পরিয়ে দেন এবং আপন আরোগ্যদানকারী হাত মোবারক হযরত ইমামের পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহের অংশে বুলিয়ে দেন; এমতাবস্থায় অলৌকিকভাবে হযরত ইমাম সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠে তিনি গৃহের বাইরে গেলে প্রথমেই আবু আল-রেযা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নামের এক প্রসিদ্ধ শায়খের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। শায়খ তাঁকে থামিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে তাঁরই রচিত কবিতাটি আবৃত্তি করার জন্যে অনুরোধ করেন। হযরত ইমাম জিজ্ঞেস করেন, “আপনি কোন্ কবিতাটির কথা বলছেন?” শায়খ উত্তর দেন, “যেটার সূচনা এই পংক্তি দ্বারা।

أَمِنْ تَذَكُّرٍ جِرَانٍ بِذِي سَلَمٍ
مَزَجَتْ دَمْعًا جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ بِدَمٍ

এ কী হতে যু-সালামের প্রতিবেশিদের স্মৃতিচারণ
যে, তুমি মিশিয়েছো রক্তের সাথে নয়নাশ্রুর বর্ষণ? (ভাবানুবাদ)

এই কথা শুনে হযরত ইমাম বিস্মিত হয়ে উচ্চারণ করেন, “আমি তো এ কবিতাখানা এখনো কারো কাছে আবৃত্তি করে শুনাই নি। আপনি এ সম্পর্কে জানলেন কীভাবে?” শায়খ উত্তর দেন, “আল্লাহর নামে শপথ! আপনি যখন কবিতাটি রাসূলুল্লাহ **صلى الله عليه وسلم** এর কাছে তা আবৃত্তি করে শুনাচ্ছিলেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং তা শুনছিলাম।” এই ঘটনার চিরস্থায়ী খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি; আর এমন কী আজো এই কবিতাটি সকল ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষের মাঝে আবৃত্তি হয়ে থাকে। বস্তুতঃ এটা সকলের জন্যে নেআমত-আশীর্বাদের চিরপ্রবাহমান একটি উৎস বটে।

হযরত ইমামের কাব্যটি ‘কুসীদাতুল বুর্দা’ শিরোনামে প্রসিদ্ধি লাভ করে, কেননা প্রিয়নবী **صلى الله عليه وسلم** তাঁকে আপন বুর্দা/জুব্বা মোবারক

মঞ্জুর করেছিলেন এবং তাঁর পবিত্র হাত বুলিয়ে ইমাম বৃসীরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অসুস্থতা সারিয়ে তুলেছিলেন। এই সংশ্লিষ্টতার কারণেই পদ্যটিকে ওই নাম দেয়া হয়েছে।^{৪৯৫}

৮.১১. মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মানে বন্দনামূলক কাব্য আবৃত্তিকারী সাহাবা (রাঃদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)-বৃন্দের তালিকা

সর্বাধিক প্রশংসিত রাসূল ﷺ এর বন্দনাসূচক কবিতা আবৃত্তি করার সম্মান দ্বারা আশীর্বাদধন্য হয়েছেন অনেক মহান সাহাবা رضي الله عنهم। তবেঈনবৃন্দের ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (বেসালপ্রাপ্তি: ১১০ হিজরী) তাঁদের কয়েকজনের নাম নিচে উল্লেখ করেন:

كَانَ شُعْرَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ، وَكَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ يُخَوِّفُهُمُ الْحَرْبَ، وَكَانَ حَسَّانُ يُقْبِلُ عَلَى الْأَنْسَابِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يُعَيِّرُهُمُ بِالْكَفْرِ.

—প্রিয়নবী ﷺ এর কবীবৃন্দ হলেন: সর্ব-হযরত হাসসান বিন সাবিত, কা'আব বিন মালিক ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা رضي الله عنهم। হযরত কা'আব (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল ﷺ এর শত্রুদের মাঝে ভীতির সঞ্চার করতেন যুদ্ধের কথা বলে; হযরত হাসসান (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) কুফ্যারদের বংশ নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন; আর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) কাফেরদের অবিশ্বাসের প্রতি (ব্যঙ্গ করে) তাদেরকে বিরতবোধে বাধ্য করতেন। [ইবনে আসীর, 'আসাদ আল-গাবা ফী মা'রিফতিস্ সাহাবা', ৪:৪৬১]

৪৯৫. খারপুটী, 'আসীদা আল-শুহদা শরহে ক্বাসীদা আল-বুর্দা', পৃষ্ঠা ৩-৫।

ইবনে আল-জাওয়ী (৫১০-৫৯৭ হিজরী)-ও তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেন:

وَقَدْ أَثْنَدَهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ الْعَبَّاسُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، وَحَسَّانُ، وَضِمَارٌ، وَأَسَدُ بْنُ زَيْنِمٍ، وَعَائِشَةُ، فِي خَلْقٍ كَثِيرٍ قَدْ ذَكَرْتُهُمْ فِي كِتَابِ الْأَشْعَارِ.

—প্রিয়নবী ﷺ এর প্রশংসায় অনেক মানুষ কবিতা আবৃত্তি করতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন: সর্ব-হযরত আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হাসসান, দিমার, আসাদ ইবনে যানীম رضي الله عنهم এবং সৈয়্যদাহ আয়েশা رضي الله عنها; এছাড়াও ছিলেন আরো অনেকে, যাঁদের নাম আমি কবিতার বইপত্রে উল্লেখ করেছি।^{৪৯৬}

মহানবী ﷺ এর সম্মানে যে সকল মহান সাহাবা رضي الله عنهم কবিতা/না'ত/কসীদা আবৃত্তি করেছিলেন, তাঁদের মোবারক নামগুলো নিচে তালিকাবদ্ধ হলো:

১. প্রিয়নবী ﷺ এর চাচা হযরত আব্বাস (বেসাল: ৩২ হিজরী)।^{৪৯৭}
২. রাসূল ﷺ এর চাচা হযরত হামযা (বেসাল: ৩ হিজরী)।^{৪৯৮}

৪৯৬. ইবনে আল-জাওয়ী, 'আল-ওয়াফা বি-আহওয়ালিল মুত্তফা', ৪৬৩ পৃষ্ঠা।

৪৯৭. আল-হাকিম, 'আল-মুত্তাদারক', ৩:৩৬৯-৩৭০ #৫৪১৭; আল-তাবারানী, 'আল-মু'জাম আল-কবীর', ৪:২১৩ #৪১৬৭; ইবনে জাওয়ী, 'আল-ওয়াফা বি-আহওয়ালিল মুত্তফা', ৪৬৩ পৃষ্ঠা; ইবনে জাওয়ী, 'সাফওয়া আল-সাফওয়া', ১:৫৪; ইবনে আসীর, 'আসাদ আল-গাবা ফী মা'রিফতিস্ সাহাবা', ২:১৬৫-১৬৬; আল-হায়সামী, 'মজমাউল্ যাওয়াইদ ওয়া মানবাআ' আল-ফাওয়াইদ', ৮:২১৮; আহমদ ইবনে যাইনী দাহলান, 'আস-সীরাতুন নববীয়া', ১:৪৬; এবং আল-নাবহানী, 'আল-আনওয়ারুল মুহাম্মদীয়া মিনাল-মাওয়াহিবিল লাদুন্নীয়া', ২৫ পৃষ্ঠা।

৪৯৮. ইবনে ইসহাক, 'সীরাতে নববীয়া', ২১২-২১৩ পৃষ্ঠা; এবং ইবনে হিশাম, 'সীরাতে নববীয়া', ৫০৩-৫০৪ পৃষ্ঠা।

৩. নবী পাক ﷺ'র চাচা হযরত আবু তালেব (বেসাল: ১০ নবউয়ী)।^{৪৯৯}
৪. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (বেসাল: ১৩ হিজরী)।^{৫০০}
৫. হযরত উমর ফারুক (বেসাল: ২৩ হিজরী)।^{৫০১}
৬. হযরত উসমান গনী (বেসাল: ৩৫ হিজরী)।^{৫০২}
৭. হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (বেসাল: ৪০ হিজরী)।^{৫০৩}
৮. ঈমানদারবৃন্দের মা হযরত আয়েশাহ (বেসাল: ৫৮ হিজরী)।^{৫০৪}
৯. সাইয়েদ্যাহ ফাতিমা আল-যাহরা (বেসাল: ১১ হিজরী)।^{৫০৫}

৪৯৯. আল-বুখারী, 'আল-সহীহ': 'কিতাব আল-ইসতিসকা' (বৃষ্টির নামাযের বই), 'মানুষ খরাপীড়িত হয়ে ইমামকে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্যে অনুরোধ' অধ্যায়, ১:৩৪২ #৯৬৩; ইবনে মাজাহ, 'আল-সুনান: কিতাব ইকামাতিস্ সালাহ ওয়াস্ সুন্নাহ ফীহা' (নামায ক্বায়েম ও ওতে নিহিত সুন্নাহ), 'বৃষ্টি প্রার্থনাসংক্রান্ত নামাযের বর্ণনা' অধ্যায়, ১:৪০৫ #১২৭২; আহমদ ইবনে হাম্বল, 'আল-মুসনাদ,' ২:৯৩; আল-বায়হাকী, 'আল-সুনান আল-কুবরা,' ৩:৩৫২; ইবনে হিশাম, 'আল-সীরাতুল নববীয়াহ,' ২৪৬-২৫৩ পৃষ্ঠা; আল-বায়হাকী, 'দালায়েল আল-নুবুওয়া ওয়া মা'রিফা আহওয়াল সাহিব আল-শরীয়া ﷺ,' ৬:১৪২-১৪৩; এবং ইবনে কাসীর, 'আল-বেদায়া ওয়াল-নেহায়া,' ৪:৪৭১-৪৭২।

৫০০. আবু যায়দ আল-কুরাইশী, 'জামহারা আশ'আর আল-আরব,' ১০ পৃষ্ঠা।

৫০১. প্রাগুক্ত।

৫০২. প্রাগুক্ত।

৫০৩. পূর্বোক্ত।

৫০৪. ইবনে জাওয়াযী, 'আল-ওয়াফা বি-আহওয়াল আল-মোত্তফা,' ৪৬৩ পৃষ্ঠা।

৫০৫. সহীহ আল-বুখারী: 'কিতাব আল-মাগাযী (যুদ্ধাভিযানের বই),' 'রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর অসুস্থতা ও বেসালপ্রাপ্তি' অধ্যায়, ৪:১৬১৯ #৪১৯৩; ইবনে মাজাহ, 'আল-সুনান': 'কিতাব আল-জানায়েয' (জানাযা-দাফনের বই), রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর বেসালপ্রাপ্তি ও দাফনের উল্লেখ,' ২:১০৩ #১৬৩০; আল-নাসাঈ, 'আল-সুনান': 'কিতাব আল-জানায়েয,' 'মরহুমের স্মরণে কান্নাকাটি' অধ্যায়, ৪:১২ #১৮৪৪; আহমদ বিন হাম্বল, 'আল-মুসনাদ,' ৩:১৯৭ #১৩,০৫৪; আল-দারিমী, 'আল-সুনান,' ৫৬ পৃষ্ঠা #৮৮; ইবনে হিব্বান, 'আল-সহীহ,' ১৪:৫৯১-৫৯২ #৬৬২২; আল-হাকিম, 'আল-মুত্তাদারাক,' ১:৫৩৭ #১৪০৮; প্রাগুক্ত, ৩:৬১ #৪৩৯৬; আল-তাবারানী, 'আল-মু'জাম আল-কবীর,' ২২:৪১৬ #১০২৯; ইবনে সা'আদ, 'আল-তাবাকাত আল-কুবরা,' ২:৩১১; আল-যাহাবী, 'তারীখ আল-ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াত আল-মাশাহীর ওয়াল-আলম (সীরাতে নববীয়া),' ১:৫৬২; এবং ইবনে কাসীর, 'আল-বেদায়া ওয়াল-নেহায়া,' ৪:২৫৪।

১০. সাইয়েদ্যাহ সাফইয়া বিনতে আবদিল মুত্তালিব (বেসাল: ২০ হিজরী)।^{৫০৬}
১১. সাইয়েদ্যাহ শীমা বিনতে হালিমা সা'আদিয়া (রাধিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)।^{৫০৭}
১২. আবু সুফিয়ান বিন হারিস (রাসূল ﷺ'এর চাচাতো ভাই)।^{৫০৮}
১৩. আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়া'হা (বেসাল: ৮ হিজরী)।^{৫০৯}
১৪. কা'ব বিন মালিক আল-আনসারী (বেসাল: ৫১ হিজরী)।^{৫১০}
১৫. হাসসান বিন সা'বিত (বেসাল: ৪০ হিজরী)।^{৫১১}

৫০৬. হাফেয শামস আল-দ্বীন বিন নাসির আল-দ্বীন আল-দিমাশকী, 'মওরিদ আল-সা'আদী ফী মওলিদ আল-হাদী'।

৫০৭. আল-আসকালানী, 'আল-ইসা'বা ফী তাময়িয আল-সাহাবা,' ৭:১৬৫-১৬৬ #১১,৩৭৮।

৫০৮. ইবনে আবদ আল-বার, 'আল-ইস্তিযাব ফী মা'রিফা আল-আসহাব,' ৪:১৬৭৫; এবং ইবনে আসীর, 'আসাদ আল-গাবা ফী মা'রিফা আল-সাহাবা,' ৬:১৪২-১৪৩।

৫০৯. আল-বুখারী, 'সহীহ': 'কিতাব আল-তাহাজ্জুদ,' 'কেউ রাতে জেগে উঠে নামায পড়া' শীর্ষক অধ্যায়, ১:৩৮৭ #১১০৪; আল-বুখারী, 'সহীহ': 'কিতাব আল-আদাব,' 'মুশরিকদের ব্যঙ্গ করা' শীর্ষক অধ্যায়, ৫:২২৭৮ #৫৭৯৯; আল-তিরমিযী, 'আল-জামেউস্ সহীহ': 'কিতাব আল-আদাব,' 'কবিতা আবৃত্তি সম্পর্কে আমাদের কাছে যা বর্ণিত হয়ে এসেছে' শীর্ষক অধ্যায়, ৫:১৩৯ #২৮৪৭; আল-নাসাঈ, 'আল-সুনান': 'কিতাব আল-মানাসিক আল-হজ্জ,' 'হারাম শরীফে কবিতা আবৃত্তি' শীর্ষক অধ্যায়, ৫:২০২ #২৮৭৩; আল-বুখারী, 'আল-তারীখ আল-কবীর,' ৮:২১২ #২৭৫৪; আল-বুখারী, 'আল-তারীখ আল-সগীর,' ২৩ পৃষ্ঠা, #৭১; আহমদ ইবনে হাম্বল, 'আল-মুসনাদ,' ৩:৪৫১; আল-বায়হাকী, 'আল-সুনান আল-কুবরা,' ১০:২৩৯; ইবনে জাওয়াযী, 'আল-ওয়াফা বি-আহওয়ালিল মুত্তফা,' ৪৬৩ পৃষ্ঠা; ইবনে কাসীর, 'আল-বিদায়া ওয়াল-নেহায়া,' ৩:৪৬৫; এবং আল-কুরতুবী, 'আল-জামেউ লি-আহকামিল কুরআন,' ১৩:১৫১।

৫১০. ইবনে আবী আসিম, 'আল-আহাদ ওয়াল-মাসানী,' ৬৬৩ পৃষ্ঠা #১১৭১।

৫১১. আল-বুখারী, 'সহীহ': 'কিতাব আল-সালাহ,' 'মসজিদে পদ্য আবৃত্তি' শীর্ষক অধ্যায়, ১:১৭৩ #৪৪২; আল-বুখারী, 'সহীহ': 'কিতাব আল-বাদ' আল-খালকু,' 'ফেরেশতাবৃন্দের উল্লেখ' শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১১৭৬ #৩০৪১; আল-বুখারী, 'সহীহ': 'কিতাব আল-মানাকিব,' 'যে ব্যক্তি আপন বংশের অপমান চান না,' ৩:১২৯৯ #৩৩৩৮; আল-বুখারী, 'সহীহ': 'কিতাব আল-মাগাযী,' 'প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর আহযাব যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন এবং বনু কুরায়যা'র দিকে রওয়ানা' শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৫১২ #৩৮৯৭; আল-বুখারী, 'সহীহ': 'কিতাব আল-মাগাযী' 'কুৎসার ঘটনা' শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৫১৮ #৩৯১০; আল-বুখারী, 'সহীহ': 'কিতাব আল-আদাব,'

১৬. যুহায়র বিন সুর্দ আল-জাসমী (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।^{৫১২}
 ১৭. আব্বাস বিন মিরদা'স আল-সুলামী (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।^{৫১৩}
 ১৮. কা'আব বিন যুহায়র ('কসীদায়ে বা'নাত সু'আদ' রচয়িতা)।^{৫১৪}
 ১৯. আবদুল্লাহ ইবনে আল-যাবা'রা' (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।^{৫১৫}
 ২০. আবু 'ইযযা আল-খুহামজী (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।^{৫১৬}
 ২১. সাইয়েদাহ কাতীলা বিনতে আল-হা'রিস আল-কুরায়শীয়া (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।^{৫১৭}
 ২২. মা'লিক বিন নামাত আল-হামদা'নী (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।^{৫১৮}

'মুশরিকদের প্রতি ব্যঙ্গ' শীর্ষক অধ্যায়, ৫:২২৭৯ #৫৮০০-৫৮০১; মুসলিম, 'সহীহ': 'কিতাব আল-ফাযায়েল আল-সাহাবা', 'হাসসান বিন সাবিতের পবিত্র গুণাবলী' শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৯৩৩ #২৪৮৫-২৪৮৬; মুসলিম, 'সহীহ': 'কিতাব আল-ফাযায়েল আল-সাহাবা', 'হাসসান বিন সাবিতের পবিত্র গুণাবলী' শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৯৩৬ #২৪৯০; মুসলিম, 'সহীহ': 'কিতাব আল-তওবা', 'অপবাদের ঘটনা ও কুৎসা রটনাকারীদের তওবা' শীর্ষক অধ্যায়, ৪:২১৩৭ #২৭৭০; এবং তিরমিযী, 'আল-জামেউন্ সুহীহ': 'কিতাব আল-আদাব', 'পদ্য আবৃত্তির ব্যাপারে আমাদের কাছে যা এসেছে' শীর্ষক অধ্যায়, ৫:১৩৮ #২৮৪৬।

৫১২. ইবনে আবদীল বার, 'আল-ইস্তীয়াব ফী মা'রিফতিস্ আসহাব', ২:৯৭-৯৮ #৭২৩; এবং ইবনে আসীর, 'আসাদ আল-গা'বা ফী মা'রিফতিস্ সাহাবা', ২:৩২৫ #১৭৬৯।
 ৫১৩. ইবনে হিশাম, 'আল-সীরাতুন নববীয়া', ৯৪৯ ও ৯৭৭ পৃষ্ঠা; ইবনে আবদীল বার, 'আসাদ আল-গা'বা ফী মা'রিফতিস্ সাহাবা', ২:৩৬২-৩৬৪ #১৩৮৭; এবং ইবনে কাসীর, 'আল-বেদায়া ওয়ান্ নেহায়া', ৩:৫৪৭-৫৫৩।
 ৫১৪. আল-হাকিম, 'আল-মুস্তাদরাক', ৩:৬৭০-৬৭৩ #৬৪৭৭; আল-তাবারানী, 'আল-মু'জাম আল-কবীর', ১৯:১৫৭-১৫৯ #৪০৩; আল-বায়হাকী, 'আল-সুনান আল-কুবরা', ১০:২৪৩; ইবনে ইসহাক, 'আল-সীরাতুল নববীয়া', ৫৯১-৫৯৪ পৃষ্ঠা; ইবনে হিশাম, 'আল-সীরাত আল-নববীয়া', ১০১১-১০২০ পৃষ্ঠা; আল-হায়সামী, 'মজমাউন্ যওয়াইদ ওয়া মানবা'আ আল-ফওয়াইদ', ৯:৩৯৩; ইবনে জাওয়ী, 'আল-ওয়াফা বি-আহওয়ালিল মুত্তফা', ৪৬৩ পৃষ্ঠা #৮১৩; এবং ইবনে কাসীর, 'আল-বেদায়া ওয়াল-নেহায়া', ৩:৫৮২-৫৮৮।
 ৫১৫. ইবনে ইসহাক, 'আল-সীরাত আল-নববীয়া', ৫৩৬ পৃষ্ঠা; এবং ইবনে হিশাম, 'আল-সীরাত আল-নববীয়া', ৯৪২-৯৪৩ পৃষ্ঠা; এবং ইবনে আসীর, 'আসাদ আল-গা'বা ফী মা'রিফতিস্ সাহাবা', ৩:২৩৯-২৪০ #২৯৪৬।
 ৫১৬. ইবনে হিশাম, 'আল-সীরাত আল-নববীয়া', ৫৫৫ পৃষ্ঠা।
 ৫১৭. প্রাগুক্ত, ৬৩৫-৬৩৬ পৃষ্ঠা।

২৩. আনাস বিন যানীম (উনা'স বিন যানীম)।^{৫১৯}
 ২৪. আসইয়াদ বিন সালমা আল-সুলামী (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।^{৫২০}
 ২৫. হাওয়া'যিন নেতা মালিক বিন আউফ আল-নাসরী (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।^{৫২১}
 ২৬. ক্বায়স বিন বাহর আল-আশজাঈ (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।^{৫২২}
 ২৭. 'আমর বিন সুবাঈ আল-রাহা'উয়ী (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।^{৫২৩}
 ২৮. না'বিগা আল-জা'দী (বেসাল: ৭০ হিজরী)।^{৫২৪}
 ২৯. মা'যিন বিন আল-গাদূবা আল-তাঈ (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।^{৫২৫}
 ৩০. আল-আশী আল-মা'যিনী (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।^{৫২৬}
 ৩১. ফাদা'লা আল-লায়সী (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।^{৫২৭}

৫১৮. ইবনে হিশাম, 'আল-সীরাত আল-নববীয়া', ১০৮৯ পৃষ্ঠা; এবং ইবনে আসীর, 'আসাদ আল-গা'বা ফী মা'রিফতিস্ সাহাবা', ৫:৪৬-৪৭ #৪৬৫১।
 ৫১৯. ইবনে ইসহাক, 'আল-সীরাত আল-নববীয়া', ৫৩৯-৫৪০ পৃষ্ঠা; ইবনে হিশাম, 'আল-সীরাত আল-নববীয়া', ৯৪৭ পৃষ্ঠা; এবং ইবনে জাওয়ী, 'আল-ওয়াফা বি-আহওয়ালিল মুত্তফা', ৪৬৩ পৃষ্ঠা।
 ৫২০. ইবনে আসীর, 'আসাদ আল-গা'বা ফী মা'রিফতিস্ সাহাবা', ১:২৫৩-২৫৪ #১৯১; এবং আল-আসকালানী, 'আল-ইসা'বা ফী তাময়ীয আল-সাহাবা', ১:৮৫-৮৬ #২১১।
 ৫২১. ইবনে হিশাম, 'আল-সীরাত আল-নববীয়া', ১০০২-১০০৩ পৃষ্ঠা।
 ৫২২. ইবনে হিশাম, 'আল-সীরাত আল-নববীয়া', ৭৬০-৭৬১ পৃষ্ঠা; এবং ইবনে আসীর, 'আসাদ আল-গা'বা ফী মা'রিফতিস্ সাহাবা', ৪:৩৯৪ #৪৩২৭।
 ৫২৩. ইবনে আসীর, 'আসাদ আল-গা'বা ফী মা'রিফতিস্ সাহাবা', ৪:২১৪-২১৫ #৩৯৩২।
 ৫২৪. ইবনে আবদীল বার, 'আল-ইস্তীয়াব ফী মা'রিফতিস্ আসহাব', ৪:১৫১৬ #২৬৪৮; ইবনে জাওয়ী, 'আল-ওয়াফা বি-আহওয়ালিল মুত্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম)', ৪৬২-৪৬৩ পৃষ্ঠা #৮১২; এবং ইবনে আসীর, 'আসাদ আল-গা'বা ফী মা'রিফতিস্ সাহাবা', ৫:২৭৬-২৭৮ #৫১৬২।
 ৫২৫. ইবনে আবদীল বার, 'আল-ইস্তীয়াব ফী মা'রিফতিস্ আসহাব', ৩:১৩৪৪; ইবনে আসীর, 'আসাদ আল-গা'বা ফী মা'রিফতিস্ সাহাবা', ৫:৪ #৪৫৫৩; এবং আল-আসকালানী, 'আল-ইসা'বা ফী তাময়ীযিস্ সাহাবা', ৫:২১-২২ #৭৫৮৪।
 ৫২৬. ইবনে সা'আদ, 'আল-তাবাকাতুল কুবরা', ৭:৫৩; ইবনে আবদীল বার, 'আল-ইস্তীয়াব ফী মা'রিফতিস্ আসহাব', ১:২২৯ #১৫৯; এবং ইবনে আসীর, 'আসাদ আল-গা'বা ফী মা'রিফতিস্ সাহাবা', ১:২৫৬-২৫৭ #১৯৬।
 ৫২৭. আল-ফা'কাহী, 'আখবার মাক্কা ফী কাদীম আল-দাহর ওয়া হাদীসিহী', ২:২২২-২২৩; ইবনে আসীর, 'আসাদ আল-গা'বা ফী মা'রিফতিস্ আসহাবা', ৪:৩৪৭ #৪২৩৩; এবং আল-আসকালানী, 'আল-ইসা'বা ফী তাময়ীয আল-সাহাবা', ৪:৩৪৬ #৬৯৯৯।

৩২. ‘আমর বিন সা’লিম আল-খুযাঈ (রাঃদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু)।^{৫২৮}
 ৩৩. আসইয়াদ বিন আবী উনা’স আল-কিন’আনী (রাঃদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু)।^{৫২৯}
 ৩৪. ‘আমর বিন মুর’আ আল-জাহনী (রাঃদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু)।^{৫৩০}
 ৩৫. ক্বায়স বিন বাহর আল-আশজাঈ (রাঃদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু)।^{৫৩১}
 ৩৬. আবদুল্লাহ বিন হা’রিস বিন ক্বায়স (রাঃদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু)।^{৫৩২}
 ৩৭. উসমা’ন বিন মায়উন (রাঃদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু)।^{৫৩৩}
 ৩৮. আবু আহমদ বিন হাজাশ (রাঃদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু)।^{৫৩৪}
 ৩৯. আল-সুরা’ক্বা বিন মা’লিক বিন জা’শাম (রাঃদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু)।^{৫৩৫}
 ৪০. আল-আসওয়াদ বিন সারী (রাঃদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু)।^{৫৩৬}
 ৪১. ‘আমির বিন আকওয়া (রাঃদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু)।^{৫৩৭}

৫২৮. আল-বায়হাকী, ‘আল-সুনান আল-কুবরা,’ ৯:২৩৩; ইবনে হিশাম, ‘আল-সীরাত আল-নববীয়া,’ ৯২৩ পৃষ্ঠা; এবং ইবনে আসীর, ‘আসাদ আল-গা’বা ফী মা’রিফতিস্ সাহা’বা,’ ৪:২১২-২১৩ #৩৯৩৯।
 ৫২৯. ইবনে আসীর, ‘আসাদ আল-গা’বা ফী মা’রিফতিস্ সাহা’বা,’ ১:২৩৬ #১৬১।
 ৫৩০. ইবনে কাসীর, ‘আল-বিদা’য়া ওয়ান্ নিহা’য়া,’ ২:২৮৮-২৮৯ ও ৩২৭।
 ৫৩১. ইবনে হিশাম, ‘আল-সীরাতুলনববীয়া,’ ৭৬১ পৃষ্ঠা।
 ৫৩২. ইবনে ইসহাক, ‘আল-সীরাত আল-নববীয়া,’ ২৫৪ পৃষ্ঠা; এবং ইবনে হিশাম, ‘আল-সীরাতুল নববীয়া,’ ২৯৩ পৃষ্ঠা।
 ৫৩৩. আবু নুয়াইম, ‘হিলইয়াতুল আউলিয়া’ ওয়া তাবাক্বাত আল-আসফিয়া,’ ১:১০৪।
 ৫৩৪. ইবনে হিশাম, ‘আল-সীরাত আল-নববীয়া,’ ৪০৭-৪০৮ পৃষ্ঠা; এবং ইবনে কাসীর, ‘আল-বেদা’য়া ওয়াল-নেহা’য়া,’ ২:৫২২।
 ৫৩৫. আল-সুহায়লী, ‘আল-রওদ আল-উনুফ ফী তাফসীরিস্ সীরাত আল-নববীয়া লি-ইবনে হিশাম,’ ২:৩২২; এবং ইবনে কাসীর, ‘আল-বেদা’য়া ওয়ান্ নেহা’য়া,’ ২:৫৭০।
 ৫৩৬. আহমদ ইবনে হাম্বল, ‘আল-মুসনাদ,’ ৪:২৪ #১৬,৩০০; ইবনে আবী শায়বা, ‘আল-মুসনাদ,’ ৬:১৮০; আল-তাবারানী, ‘আল-মু’জাম আল-কবীর,’ ১:২৮৭ #৮৪২; এবং আল-বায়হাকী, ‘শু’আবুল ঈমান,’ ৪:৮৯ #৪৩৬৫।
 ৫৩৭. আল-বুখারী, ‘সহীহ’: ‘কিতাব আল-মাগা’যি,’ ‘খায়বার অভিযান’ অধ্যায়, ৪:১৫৩৭ #৩৯৬০; আল-বুখারী, ‘সহীহ’: ‘কিতাব আল-আদাব,’ ‘কাব্যে যা জায়েয’ অধ্যায়, ৫:২২৭৭ #৫৭৯৬; মুসলিম, ‘সহীহ’: ‘কিতাব আল-জিহাদ,’ ‘খায়বার অভিযান’ অধ্যায়, ৩:১৪২৮ #১৮০২; আবু আওয়া’না, ‘আল-মুসনাদ,’ ৪:৩১৪ #৬৮৩০; আল-বায়হাকী, ‘আল-সুনান আল-কুবরা,’ ১০:২২৭; এবং আল-তাবারানী, ‘আল-মু’জাম আল-কবীর,’ ৭:৩২ #৬২৯৪।

৪২. উম্মে মা’বাদ ‘আতিকা বিনতে খা’লিদ আল-খাযাঈ (রাঃদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু)।^{৫৩৮}
 ৪৩. মদীনা মোনাওয়ারার তরুণীবন্দ।^{৫৩৯}
 ৪৪. ইখিওপীয় দূতবন্দ।^{৫৪০}
 ৪৫. ‘আমর জিল্লী (প্রিয়নবী’র একজন জ্বীন সাহাবী)।^{৫৪১}

এ সকল মহান ব্যক্তিত্ব কেবল কাব্য রচনা-ই করেননি, বরঞ্চ তাঁরা সেগুলো শ্রেফ এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আয়োজিত সভা-সমাবেশে আবৃত্তিও করেছিলেন। সর্বাধিক মর্যাদাবান রাসূল صلی اللہ علیہ وسلم এর সম্মানে আজকে সর্বত্র কবিতা আবৃত্তির জন্যে মাহফিল/সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। হযরত হাসসা’ন বিন সা’বিত رضی اللہ عنه এর কবিতার পাশাপাশি অন্যান্য মহান সাহাবা رضی اللہ عنہم এর পদ্যও বরকত-আশীর্বাদ লাভের উদ্দেশ্যে আবৃত্তি করা হয়।

৫৩৮. ইবনে সা’আদ, ‘আল-তাবাক্বাত আল-কুবরা,’ ১:২৩০-২৩১।
 ৫৩৯. ইবনে আবী হা’তিম আল-রা’যী, ‘আল-সিক্বাত,’ ১:১৩১; ইবনে আদিল বার, ‘আল-তামহীদ লিমা’ ফীল মুওয়াত্তা’ মিনাল-মা’আনী ওয়াল-আসা’নীদ,’ ১৪:৮২; আবু উবায়দ আল-আন্দালুসী, ‘মু’জাম মা’ ইস্তা’জামা মিন আসমা’ আল-বিলা’দ ওয়াল-মাওয়া’দী,’ ৪:১৩৭৩; মুহিব আল-তাবারী, ‘আল-রিয়াদ আল-নাদরা ফী মানা’ক্বিল ‘আশরা,’ ১:৪৮০; আল-বায়হাকী, ‘দালা’য়েল আল-নুবুওয়া ওয়া মা’রিফাত আহওয়াল সা’হিব আল-শরী’আ’ (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম), ২:৫০৭; ইবনে কাসীর, ‘আল-বিদা’য়া ওয়াল-নিহা’য়া,’ ২:৫৮৩; প্রাগুক্ত, ৩:২৬০; আল-আসক্বালানী, ‘ফাতহ আল-বারী,’ ৭:২৬১; প্রাগুক্ত, ৮:১২৯; আল-কুসতলানী, ‘আল-মাওয়া’হিব আল-লাদুন্নিয়া বিল-মিনাহিল মুহাম্মাদিয়া,’ ১:৬৩৪; আল-যুরক্বানী, ‘শরহুল মাওয়া’হিবিল লাদুন্নিয়া বিল-মিনাহিল মুহাম্মাদীয়া,’ ৪:১০০-১০১; এবং আহমদ যাইনী দাহলান, ‘আল-সীরাতুল নববীয়া,’ ১:৩২৩।
 ৫৪০. আহমদ ইবনে হাম্বল, ‘আল-মুসনাদ,’ ৩:১৫২; ইবনে হিব্বান, ‘সহীহ,’ ১৩:১৭৯ #৫৮৭০; মাকুদিসী, ‘আল-আহাদীস আল-মুখতা’রা,’ ৫:৬০ #১৬৮১; এবং আল-হায়সামী, ‘মাওয়া’রিদ আল-যামা’আন ইলা যাওয়া’ঈদে ইবনে হিব্বান,’ পৃষ্ঠা নং ৪৯৩ #২০১২।
 ৫৪১. ইবনে হিশাম, ‘আল-সীরাতুল নববীয়া,’ ৪১৯ পৃষ্ঠা; এবং আল-সুহায়লী, ‘আল-রওদ আল-উনুফ ফী তাফসীরিল সীরাত আল-নববীয়া লি-ইবনি হিশাম,’ ২:৩২৪।

এই আলোচনার শেষে আমি (শায়খ তাহির আল-ক্বাদেরী) বলবো, সবচেয়ে প্রশংসিত জন - প্রিয়নবী ﷺ এর সম্মানে কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করা এবং তা শোনা, আর এতদুদ্দেশ্যে বিশেষ মাহফিলের আয়োজন করা শুধু কুরআন-সুন্নাহের আলোকে জায়েয-ই নয়, বরং তা (শরীয়তের) একটি পছন্দনীয় আদেশও। সর্বাধিক প্রশংসিত নবী পাক رضي الله عليه وسلم এর সম্মানে ব্যাপক সংখ্যক মহান সাহাবা رضي الله عنهم এর কাব্য রচনা ও তা আবৃত্তির দৃষ্টান্ত হতে এই সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে এটা তাঁদের আচরিত রীতি ছিলো। আমরা যখন ওই একই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান ও মাহফিল-সমাবেশের আয়োজন করি, তখন আমরা এ সকল মহান সাহাবা رضي الله عنهم ও ইসলামের মহৎ ব্যক্তিত্বদের সুন্নাহ তথা রীতি-ই অনুসরণ করে থাকি। এই প্রথা মহান সাহাবা رضي الله عنهم বৃন্দের যুগ হতে আমাদের সময় পর্যন্ত চলে এসেছে। বস্তুতঃ এটা প্রকৃত ঈমানদারির একটা চিহ্ন।

পরিচ্ছেদ: ০৪

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সালাত-সালাম পাঠ

সর্বোচ্চ মর্যাদাবান নবী ﷺ এর প্রতি সালাত-সালামের উপহার প্রেরণ হচ্ছে মীলাদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটা অনন্য এক আমল তথা (পুণ্যদায়ক) কর্ম, যা আল্লাহ তা'লার দরবারে ক্ববুল বা গ্রহণীয় হবার গ্যারান্টিযুক্ত। এই আমলটি প্রত্যেককে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রিয়নবী ﷺ এর আরো ঘনিষ্ঠ করে থাকে। এটা অসাধারণ বিষয়, কেননা এটা প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ও তাঁরই ফেরেশতামণ্ডলীর একটা সুন্নাহ (আচরিত রীতি), যে সালাত-সালাম তাঁরা নিরন্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি প্রেরণ করে চলেছেন। ঈমানদারবৃন্দকেও একই কাজ করতে আদেশ করা হয়েছে। বস্তুতঃ এই (ঐশী) আজ্জার আওতায় প্রিয়নবী ﷺ رضي الله عليه وسلم এর প্রতি সদাসর্বদা সালাওয়াৎ প্রেরণ মুসলমানদের একটি রুটিন হয়েছে। সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল ﷺ এর মীলাদের বরকতময় দিবস যখন সমাগত হয়, তখন প্রিয়নবী ﷺ رضي الله عليه وسلم এর ভক্ত-আশেকীদের সালাত-সালাম প্রেরণও ব্যাপকতা লাভ করে এবং এর সুরধ্বনি সর্বত্র অনুরণিত হয়।

৮.১২ মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সালাওয়াত পাঠ আল্লাহরই সুন্নাহ ও বিধান

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

—নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর (সমস্ত) ফেরেশতাবৃন্দ (সম্মানিত) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করছেন। হে ঈমানদারবর্গ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ প্রেরণ করো এবং (সর্বাস্তুরূপে) পরিপূর্ণ আদবের সাথে অধিক পরিমাণে সালাম পেশ করো।^{৫৪২}

সালাওয়াৎ প্রেরণের কুরআনী এই হুকুম হচ্ছে ‘মুতলাকু’ তথা অসীম; এই অনুশীলনীটি স্থান-কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এটা যে-কোনো অবস্থায় তথা দাঁড়িয়ে, বসে, বা শুয়ে পালন করা যায়। অনুরূপভাবে, এটা মীলাদুন্নবী ‘সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’-এর সভা-সমাবেশের বাইরে যেমন আবৃত্তি করা যায়, তেমনি ওই মাহফিলের ভেতরেও পাঠ করা যায়। প্রিয়নবী ‘সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’-এর প্রতি দাঁড়িয়ে সালাম প্রেরণ করা (ধর্মীয়ভাবে) উৎকৃষ্টতর, যেহেতু এটা ভক্তি-শ্রদ্ধার শৃঙ্গচূড়া। ওপরের আয়াতোক্ত ‘তাসলিমা’ শব্দটি প্রিয়নবী ‘সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’-এর প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে। এই কাজটি আল্লাহ তা‘লারই একটি সুন্নাহ/রীতি। পরিস্থিতি বা সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের দরুন কিছু কর্মের সামান্য অদলবদল প্রয়োজন হতে পারে; কিন্তু (সালাওয়াৎ প্রেরণের) এই কাজটি আল্লাহ তা‘লার নিজের। তাই এর কখনোই পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হয় না। সর্বশক্তিমান আল্লাহর মর্যাদাপূর্ণ এই সুন্নাহটি চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত; আর এসব সালাত-সালাম যে উপায়ে প্রেরিত হয়ে থাকে, তাতে সামান্যতম পার্থক্যও হয় না। আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ ফরমান:

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا.

—কাজেই আপনি আল্লাহর বিধানে কখনোই কোনো পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর বিধানে কোনো ব্যতিক্রম (ও বিচ্যুতি) খুঁজেও পাবেন না।^{৫৪৩}

৫৪২. আল-কুরআন, ৩৩:৫৬।

৫৪৩. আল-কুরআন, ৩৫:৪৩।

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ পাক তাঁর সবচেয়ে প্রিয় রাসূল ‘সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’-কে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে ঈমানদারবৃন্দকে আদেশ করেছেন:

لْتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ.

—যাতে (হে লোকেরা!) তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনো, তাঁকে সাহায্য করো, তাঁকে সীমাহীন সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করো।^{৫৪৪}

প্রিয়নবী ‘সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’-এর উপস্থিতিতে মহান সাহাবাবৃন্দ ‘রুযি’-এর তাঁদের কণ্ঠস্বর নিচু রাখতে আদেশ করা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

—হে ঈমানদারবর্গ! তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর সম্মানিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কণ্ঠস্বরের উপর উঁচু কোরো না এবং তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরেও কথা বোলো না যে রূপ উচ্চস্বরে তোমরা একে অপরের সাথে কথা বোলো। (অন্যথায়) এতে তোমাদের (ঈমানসহ) সমস্ত আমলই নিষ্ফল হয়ে যাবে, অথচ তোমরা টেরও পাবে না (যে, তোমাদের ঈমান ও আমল ধ্বংস হয়ে গিয়েছে)।^{৫৪৫}

সর্বাধিক সম্মানিত নবী ‘সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’-এর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে যেমন ঈমানদারবৃন্দকে আদেশ দেয়া হয়েছে, একইভাবে তাঁর প্রতি সালাওয়াৎ প্রেরণের সময় প্রয়োজনীয় আদব রক্ষা বা শিষ্টাচার প্রদর্শনের নজির স্থাপনের বাধ্যবাধকতাও তাঁদের প্রতি বিধান করা হয়েছে।

৫৪৪. আল-কুরআন, ৪৮:৯।

৫৪৫. আল-কুরআন, ৪৯:২।

৮.১৩ সালাত-সালাম প্রেরণের তাৎপর্য

কুরআন মজীদে আলোকে সালামের একটি বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিদ্যমান। আল-কুরআনে এমন নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার কথা উল্লেখিত হয়েছে, যেগুলোতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা তাঁরই বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের প্রতি শান্তিময় সালাম প্রেরণ করেছেন। নিচে পেশকৃত আয়াতগুলোয় বিষয়টি স্পষ্ট হবে:

১. পয়গম্বর ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালামের বেলাদত বা ধরাধামে শুভাগমন উপলক্ষে প্রেরিত সালাম:

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.

—আর শান্তি বর্ষিত হোক ইয়াহইয়ার প্রতি, যেদিন তিনি জন্মলাভ করেছেন, যেদিন তাঁর ইন্তেকাল হবে এবং যেদিন তাঁকে জীবিত পুনরোত্থিত করা হবে।^{৫৪৬}

২. নিচের ভাষ্যটি পয়গম্বর ঈসা আলাইহিস্ সালামের প্রতি আরোপিত:

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.

—আর আমার প্রতি শান্তি, যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি, যেদিন আমার ইন্তেকাল হবে এবং যেদিন আমাকে জীবিত উত্থিত করা হবে।^{৫৪৭}

ওপরের আয়াতগুলোতে উল্লেখিত পয়গম্বর (আলাইহিম আস্ সালাম) বৃন্দের বেলাদত, নবুওয়্যত লাভ ও বেসালের আলোকে অতি করুণাশীল মহানবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের মীলাদ/মীলাদ উপলক্ষে সালাম প্রেরণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য (আমাদের উপলব্ধি ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে) জানানো হয়েছে।

৩. সামগ্রিকভাবে পয়গম্বর (আলাইহিম আস্ সালাম) মণ্ডলীর প্রতি শান্তিময় সালাম প্রেরণ:

৫৪৬. আল-কুরআন, ১৯:১৫।

৫৪৭. আল-কুরআন, ১৯:৩৩।

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ.

—আর শান্তি বর্ষিত হোক (সকল) রাসূলবৃন্দের উপর!^{৫৪৮}

৪. আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর প্রতি তাঁকে প্রশংসা ও তাঁরই মনোনীত বান্দাদের প্রতি শান্তিময় সালাম প্রেরণের নির্দেশ দেন:

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

—বলে দিন, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলারই এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর মনোনীত (মর্যাদাবান) বান্দাদের প্রতি।’^{৫৪৯}

কুরআন মজীদে উল্লেখিত হয়েছে পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দের দ্বারা কারো সাথে সাক্ষাতমাত্র নিজেদের অনুশীলিত শিষ্টাচার ও সুন্নাহ (রীতিনীতি), যেটা বস্তুতঃ শান্তিময় সালাম প্রেরণ (-রীতি)। নিচে এর কিছু উদাহরণ দেয়া হলো:

৫. আল্লাহ তা‘আলা ফরমান:

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ

—আর যখন আমাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনা লোকজন আপনার নিকট আগমন করে, তখন আপনি (তাদেরকে অনুগ্রহবশত) বলুন, ‘তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক’।^{৫৫০}

৬. আল্লাহ তা‘আলা বিবৃত করেন:

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ

—আর যথার্থই আমাদের প্রেরিত ফেরেশতাবৃন্দ ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর নিকট সুসংবাদ নিয়ে আগমন করেছিলেন। তাঁরা বললেন,

৫৪৮. আল-কুরআন, ৩৭:১৮১।

৫৪৯. আল-কুরআন, ২৭:৫৯।

৫৫০. আল-কুরআন, ৬:৫৪।

‘শান্তি (বর্ষিত হোক আপনার উপর)’, ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) প্রতিউত্তরে বললেন, ‘(আপনাদের উপরও) শান্তি বর্ষিত হোক’।^{৫৫১}

৭. আল্লাহ তা‘আলা ব্যক্ত করেন:

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.

—যখন তারা ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর নিকট আসলো, তখন তারা (তাকে) বললো, ‘সালাম’। ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) বললেন, ‘আমরা আপনাদের থেকে কিছুটা ভীতি অনুভব করছি’।^{৫৫২}

৮. গৃহে প্রবেশের সময় ঈমানদারবৃন্দের প্রতি শান্তিময় সালাম প্রেরণের জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

—হে ঈমানদারবর্গ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তাদের অনুমতি লাভ করো এবং (প্রবেশ করার মুহূর্তে) এর অধিবাসীদেরকে সালাম প্রদান করো। এটি তোমাদের জন্যে উত্তম (উপদেশ), যাতে তোমরা (এর যৌক্তিকতা) চিন্তা-ভাবনা করতে পারো।^{৫৫৩}

৯. আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ ফরমান:

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ.

—অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করো তখন তোমাদের (গৃহের অধিবাসীদের) প্রতি সালাম পেশ করো। (এটি) আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণকর, পবিত্র অভিবাদন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাঁর

৫৫১. আল-কুরআন, ১১:৬৯।

৫৫২. আল-কুরআন, ১৫:৫২।

৫৫৩. আল-কুরআন, ২৪:২৭।

বিধানাবলী সুস্পষ্ট করে দেন যাতে তোমরা (শরীয়তের বিধান ও জীবনের শিষ্টাচার) বুঝতে পারো।^{৫৫৪}

১০. লাইলাতুল ক্বদরের রাতে যখন জিবরীল (আলাইহিস্ সালাম)-সহ সহস্র সহস্র ফেরেশতা ধরণীতলে অবতরণ করেন, তখন ভোর অবধি শান্তি বিরাজ করে। আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন:

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ — سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

—এ রজনীতে অবতীর্ণ হন ফেরেশতাবৃন্দ এবং রুহুল আমীন (জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম), আপন রবের নির্দেশে (কল্যাণ ও বরকতের) প্রত্যেক বিষয় নিয়ে। এই (রাত) ফজরের উদীয়মান ক্ষণ পর্যন্ত (পরম) প্রশান্তি আর নিরাপত্তাময়।^{৫৫৫} ভোর হওয়া পর্যন্ত শান্তির প্রতিধ্বনি সকল দিক হতেই শোনা যায়।

১১. শেষ বিচার দিবসে ঈমানদার মুসলমানবৃন্দ যখন হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবেন, সর্বশক্তিমান আব্রাহাম পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صلى الله عليه وسلم এর খাতিরে তাঁদেরকে শান্তিময় সালাম দ্বারা গ্রহণ করবেন এবং তাঁরা শান্তি সহকারে পরস্পর পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। আল্লাহ তা‘আলা ফরমান:

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ.

—‘(তোমাদের উপর) শান্তি বর্ষিত হোক’। পরম করুণাময় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (তাদেরকে) জানানো হবে (এ) সম্ভাষণ।^{৫৫৬}

১২. আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন:

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ.

৫৫৪. আল-কুরআন, ২৪:৬১।

৫৫৫. আল-কুরআন, ৯৭:৪-৫।

৫৫৬. আল-কুরআন, ৩৬:৫৮।

—যে দিন তারা (মুমিনবৃন্দ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের (সাক্ষাতের) উপহার হবে ‘সালাম’।^{৫৫৭}

মনোনীত বান্দাদের যখন আল্লাহ তা‘লার সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর ঐশী দর্শনের জন্যে ডাকা হবে, সেদিন তাঁদের প্রতি দান করা হবে ‘সালামের’ বিশেষ উপহার; আর এই সালাম হবে বৈশিষ্ট্যসূচক ও বিরল উপহার।

১৩. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি শান্তিময় সালাম আবাহনের প্রতি বিশাল গুরুত্বারোপ করেছেন। শেষ বিচার দিবসে মনোনীত বান্দাবৃন্দ বেহেশতে প্রবেশকালে আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক শান্তিময় সালামের অভিবাদন দ্বারা স্বাগত হবেন। এ কথা কুরআন মজীদে বহু জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে:

وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ.

—এবং জান্নাতের অধিবাসীদের ডেকে বলবে, ‘তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক’। সে সকল (আ‘রাফবাসীরা স্বয়ং এখানো) জান্নাতে প্রবেশ করেনি, তবে তারা (এর) বাসনা করবে।^{৫৫৮}

১৪. আল্লাহ তা‘আলা বিবৃত করেন:

جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ — سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ
فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

—(যেখানে) চিরসবুজ বাগান রয়েছে, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পূর্বপুরুষ এবং তাদের স্ত্রী-সন্তানদের মধ্যে যারাই সৎকর্মশীল হবে তারা। আর ফেরেশতারা (জান্নাতে) তাদের নিকট প্রত্যেক দরোজা দিয়ে প্রবেশ করবে। (তাদেরকে স্বাগত ও মুবারকবাদ জানিয়ে বলা হবে:)

৫৫৭. আল-কুরআন, ৩৩:৪৪।

৫৫৮. আল-কুরআন, ৭:৪৬।

‘তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের ধৈর্যের বিনিময়ে। অতঃপর (দেখো) পরকালের আবাস কতোই না উত্তম!’^{৫৫৯}

১৫. আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেন:

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَذْخَلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

—যাদের রূহ ফেরেশতাবৃন্দ এমন অবস্থায় হরণ করবে যখন তারা (নেকী ও আনুগত্যের কারণে) পুতঃপবিত্র, আনন্দিত ও প্রফুল্লিত। (তাদেরকে ফেরেশতারা রূহ হরণ করার সময়েই বলে দেবে,) ‘তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো, সে (নেক আমলের) কারণে যা তোমরা করতে।’^{৫৬০}

১৬. আল্লাহ তা‘আলা ব্যক্ত করেন:

فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ

—তবে (তাকে বলা হবে:) ‘আপনার জন্যে ডানপার্শ্বস্থদের পক্ষ থেকে সালাম (অথবা হে নবী! আপনার উপর ডানপার্শ্বস্থদের পক্ষ থেকে সালাম)’।^{৫৬১}

এই আলোচনায় যে বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রয়োজন এবং যে প্রতিপাদ্যের ওপর গুরুত্বারোপ জরুরি, তা সালাম আবাহন-সংক্রান্ত। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক, জিবরীল ফেরেশতা ও অন্যান্য সব ফেরেশতা অবিরত শান্তিময় সালাম ও আশীর্বাদ প্রেরণ করছেন, যেহেতু এটা তাঁদের আচরিত রীতি। ক্বদরের রাতে আসমানের বাসিন্দা ফেরেশতাকুলের দ্বারা উচ্চ আসমান হতে ধরণীতলে নেমে আসা একটি (নিয়মমাফিক) রুটিন। ঈমানদারবৃন্দ যখন বেহেশতে প্রবেশ করবেন, তাঁদেরকে শান্তিময় সালাম সহকারে অভিবাদন জানানো হবে; আর মনোনীত পুণ্যাত্মাবৃন্দ মহান প্রভু আল্লাহ

৫৫৯. আল-কুরআন, ১৩: ২৩-২৪।

৫৬০. আল-কুরআন, ১৬:৩২।

৫৬১. আল-কুরআন, ৫৬:৯১।

তাঁলার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করবেন, যিনি প্রতিদানস্বরূপ তাঁদেরকে শান্তিসূচক পুরস্কার দান করবেন। কুরআন মজীদ অনুসারে, পয়গাম্বর (আলাইহিস্ সালাম) বৃন্দের সুন্নাহ হচ্ছে নিম্নের আহ্বান: “শান্তি আমার প্রতি, যেদিন আমার পয়দায়েশ/মীলাদ হয়েছে।” কিতাবুল্লাহ তথা ঐশীগ্রন্থে সালাম প্রেরণের গুরুত্ব এতদ্বারা লক্ষণীয় একটি বিষয়।

৮.১৪ সালাত-সালামের অনন্ত স্বতন্ত্র মর্যাদা

কুরআন মজীদে নিম্নবর্ণিত আয়াতটিতে ধারণকৃত (ঐশী) আজ্ঞার বাস্তবায়ন প্রশ্নে কিছু ভুল বোঝাবুঝি ও ভুল ব্যাখ্যা বিদ্যমান। আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ ফরমান:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

—নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর (সমস্ত) ফেরেশতাবৃন্দ (সম্মানিত) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করছেন। হে ঈমানদারবর্গ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ প্রেরণ করো এবং (সর্বাস্তকরণে) পরিপূর্ণ আদবের সাথে অধিক পরিমাণে সালাম পেশ করো।^{৫৬২}

এই আজ্ঞাটি ঈমানদারদের প্রতি উদ্দিষ্ট। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা ‘সালাত (আশীর্বাদ) ও সালা‘ম (শান্তি)’এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কিছু মানুষ আপত্তি উত্থাপন করেন এই বলে যে, এ দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই; আর সালা‘মকে সালা‘তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ঠিক যেমনটি করা হয়েছে সালা‘তে ইবরাহীমে:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

—এয়া আল্লাহ! প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم ও তাঁর পরিবার-সদস্যবৃন্দের প্রতি সালাওয়াত/ আশীর্বাদ বর্ষণ করুন, যেমনিভাবে আপনি করেছিলেন পয়গাম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর পরিবারের প্রতি। নিশ্চয় আপনি (সকল) প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী।

আপত্তি উত্থাপনকারী এ সব মানুষের মতানুসারে, সালা‘ম হচ্ছে সালা‘তেরই একটি অংশ; এ কারণে ওই দুটোর মধ্যে পার্থক্য করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁদের এ যুক্তিটি ধোপে টেকে না, কেননা সালা‘ম সালা‘তের একটি অংশ হওয়া সত্ত্বেও নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা ধারণকারী। আল্লাহ তা‘আলা দুটো বিষয়ে আমাদের আদেশ করেছেন:

১. প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর প্রতি সালাওয়াত প্রেরণ;

২. এবং তাঁকে যথোপযুক্ত প্রভূত পরিমাণ শান্তিময় (ও আকুল অন্তরের) অভিবাদন দ্বারা সালাম অর্পণ।

এখানে আল্লাহ তা‘আলা সালা‘ত ও সালা‘ম দুটোকেই স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন। অতএব, যেহেতু আজ্ঞাগুলো উভয়েরই জন্যে আলাদা আলাদাভাবে এসেছে, সেহেতু প্রত্যাশাগুলোর বাস্তবায়নও একে অপরের থেকে পৃথক হতে হবে। তাই সালা‘ত (আশীর্বাদ আবাহন) ও সালা‘ম (শান্তিময় সালাম) সবচেয়ে মর্যাদাবান রাসূল صلى الله عليه وسلم এরই প্রতি বখশানো বা অর্পণ করা হবে।

শান্তিময় সালাম পাঠের তাৎপর্যের প্রতি আরো আলোকপাত করেছে যেসব বিষয়, তা নিম্নরূপ:

৮.১৪.১ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সালাত-সালামের মাধ্যমেই আল্লাহর কাছে কারো দোয়া কবুল হয়

সালাম প্রেরণ এমন-ই তাৎপর্যপূর্ণ যে, মহাপবিত্র আল্লাহর প্রতি কারো প্রশংসাস্তুতি গ্রহণীয় হওয়াটা তারই প্রেরিত শান্তিময় সালামের ওপর নির্ভরশীল। কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছে:

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ - وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

—পবিত্র আপনার প্রতিপালক, মর্যাদার অধিকারী; এ (বিষয়) থেকে পবিত্র যা তারা আরোপ করে। আর শান্তি বর্ষিত হোক (সকল) রাসূলবৃন্দের উপর! আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।^{৫৬৩}

এই আয়াতে করীমায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ ভাষণটি তাঁদের দিকে নির্দেশিত করেছেন, যাঁরা তাঁরই স্মরণে নিমগ্ন এই ঘোষণাসহ যে, তিনি তাঁদের প্রশংসা ও স্মরণ (যিকর) হতে উর্ধ্বে। তিনি তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁদের পেশকৃত প্রশংসা দ্বারা তাঁরা কখনোই তাঁর প্রশংসা পাওয়ার অধিকারকে পরিপূর্ণ করতে সক্ষম নন। তিনি আরো ব্যক্ত করেন, তাঁরা যদি তাঁদের প্রশংসা ও মহিমা-কীর্তনকে মকুবুল তথা গ্রহণীয় করতে চান, তাহলে তাঁদেরকে অবশ্যাবশ্য আশিয়া ও রাসূলবৃন্দের (আলাইহিমুস সালাম) প্রতি শান্তিময় সালাম প্রেরণ করতে হবে। এই শর্ত যতোক্ষণ পূরণ না হবে, ততোক্ষণ তাঁরা যা-ই শ্রম-সাধনা করেন না কেন, তা (আল্লাহর দরবারে) স্বীকৃত বা গৃহীত হবে না।

আশিয়া আলাইহিমুস সালামের প্রতি শান্তিময় সালাম প্রেরণ-ই হচ্ছে সে মাধ্যম, যা দ্বারা আমাদের প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার কাছে পৌঁছে যায়। এটা এ কারণে যে, তিনি সব সময়ই তাঁর নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামবৃন্দের প্রতি প্রেরিত শান্তিময় সালাম গ্রহণ (কুবুল) করে থাকেন। অতএব, এই প্রশংসার সাথে শান্তিময় সালামকে অন্তর্ভুক্ত করলে বিনা বাধায় তা তাঁর কাছে পৌঁছবে, এ কথা নিশ্চিত। আরেক কথায়, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক এটা বিবৃত করেছেন, যে প্রশংসার সাথে সালাম যুক্ত হবে, তা নিশ্চিতভাবে গৃহীত হবে।

৮.১৪.২ (নামাযের) তাশাহুদে সালাত-সালাম

সুন্নাহ'র প্রতিটি নামাযে 'তাশাহুদ' আরম্ভ হয় সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাসহ; এর পরপরই সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাসূল صلی اللہ علیہ وسلم এর প্রতি শান্তিময় সালাম প্রেরণ করা হয়। অতঃপর 'শাহাদা' তথা ঈমানের সাক্ষ্য, যা'তে আল্লাহ তা'আলার একত্ব ও প্রিয়নবী صلی اللہ علیہ وسلم এর রেসালাতের পক্ষে সাক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে, তা প্রদত্ত হয়। এরপর 'সালা'তে ইবরাহীম' পাঠ ও সমাপনী দুআ' পেশ করা হয়। আমরা 'তাশাহুদ'কে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই এতে চারটি উপাদান নিহিত:

১. আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা: 'তাশাহুদের' প্রথম অংশটি কেবল আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা নিয়েই সুনির্দিষ্ট:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ،

আমার যাবতীয় এবাদত-বন্দেগীর কর্ম, হোক তা কথায় বা শারীরিক ক্রিয়ায় অথবা অর্থব্যয়ে, কেবল আল্লাহর জন্যেই উদ্দিষ্ট।

২. শান্তিময় সালাম: দ্বিতীয় অংশটি সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাসূল صلی اللہ علیہ وسلم এর প্রতি শান্তিময় সালাম প্রেরণের ক্ষেত্রে উৎসর্গিত:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،

হে রাসূল صلی اللہ علیہ وسلم! আপনার প্রতি বর্ষিত হোক শান্তি এবং আল্লাহর রহমত/করণা ও বরকত/আশীর্বাদও।

এই উপায়ে একাংশ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে আল্লাহর জন্যে এবং অপরাংশ করা হয়েছে তাঁরই প্রিয়নবী صلی اللہ علیہ وسلم এর জন্যে।

৩. শাহাদা: এই তৃতীয়াংশটি সর্বশক্তিমান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয়নবী صلی اللہ علیہ وسلم উভয়েরই জন্যেই উদ্দিষ্ট হয়েছে:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য (ইলাহ) নেই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ صلی الله علیه وسلم তাঁরই বান্দা ও রাসূল।

এই সাক্ষ্য প্রথমাত্মক নির্দিষ্ট করা হয়েছে আল্লাহর জন্যে, আর অপর অংশটি সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে তাঁরই প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم এর জন্যে, যার সারমর্ম হলো - আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য (ইলাহ) নেই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ صلی الله علیه وسلم তাঁরই প্রিয় বান্দা ও রাসূল।

৪. সালা'তে ইবরাহীম: চতুর্থ অংশটিও হচ্ছে শান্তিময় সালাম প্রেরণ ও বরকত/আশীর্বাদ বর্ষণ, যা স্রেফ মহানবী صلی الله علیه وسلم জন্মে সুনির্দিষ্ট:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ রাসূল صلی الله علیه وسلم ও তাঁর পরিবার-সদস্যদের প্রতি সালা'ত প্রেরণ করুন, যেমনিভাবে করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর পরিবার-সদস্যদের প্রতি। নিশ্চয় আপনি সকল প্রশংসার অধিকারী ও গৌরবময়। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ রাসূল صلی الله علیه وسلم ও তাঁর পরিবার-সদস্যদের প্রতি বরকত-আশীর্বাদ প্রেরণ করুন, যেমনিভাবে করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর পরিবার-সদস্যদের প্রতি। নিশ্চয় আপনি সকল প্রশংসার অধিকারী ও গৌরবময়।

সবশেষে, আল্লাহর পেশকৃত তাশাহুদ-এর বিন্যাসের আলোকে বলা যায়, এর মাত্র দেড় ভাগ আল্লাহ তা'লার প্রশংসায় উৎসর্গিত; অপর দিক,

আড়াই ভাগ-ই প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم এর প্রশংসায় উৎসর্গিত। আর আমরা যখন আমাদের দু'আ' এটার সাথে যোগ করি, তখন আমাদের প্রার্থনা ও দু'আ' দুটোই কবুল বা গৃহীত হয়। নামায সম্পন্ন করে 'খুরুজ আনিস্ সালা'ত' বা নামায থেকে বের হয়ে যাওয়াও শান্তিময় সালাম ফেরানো সাপেক্ষ:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.

আপনাদের প্রতি হোক শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত।

সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم ছাড়াও এই শান্তিময় সালাম উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে আউলিয়া কেরাম (রহমতুল্লাহে আলাইহিম), নেককার/পুণ্যাত্মাব্দ ও উম্মতের প্রতি।

ওপরের আলোচনা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছে শান্তিময় সালাম প্রেরণের মহিমা ও মৌলিক গুরুত্ব। তাহলে আমাদের পক্ষে এই অবিচ্ছেদ্য অংশটি কীভাবে এড়ানো সম্ভব?

৮.১৪.৩ সালাতের পরে সালাম প্রেরণের পক্ষে রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ صلی الله علیه وسلم ঈমানদারবৃন্দের প্রতি আদেশ দিয়েছেন এ মর্মে যে, তাঁরা যেখানেই থাকুন না কেন, (তাঁর প্রতি) সালাত পাঠের পর তাঁদের (তাঁর প্রতি) শান্তিময় সালাম প্রেরণ করা অত্যাবশ্যিক।

হযরত আলী বিন হুসাইন رضي الله عنه তাঁর দাদাজান হযরত আলী ইবনে আলী তালেব رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم এরশাদ করেন:

وَصَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا حَيْثُمَا كُنْتُمْ، فَسَيَبْلُغُنِي سَلَامُكُمْ وَصَلَاتُكُمْ.

অর্থ: আমার প্রতি সালাত পাঠ ও শান্তিময় সালাম প্রেরণ করো, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন; তোমাদের সালাত-সালাম আমার কাছে পৌঁছবে।^{৫৬৪}

ওপরের হাদীসে দুটো বিষয় আদিষ্ট হয়েছে: সালাত পাঠ ও শান্তিময় সালাম প্রেরণ। প্রিয়নবী ﷺ যদি এই পার্থক্য করে থাকেন, তাহলে আমাদের পক্ষে এই দুটো বিষয়কে এক ও অভিন্ন বিবেচনা করা কীভাবে সম্ভব? এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ সকল ঈমানদারের প্রতি।

৮.১৫ সালাত হযূর পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে পৌঁছে

ঈমানদারের প্রশংসা, সালাত ও শান্তিময় সালাম প্রেরণ সৃষ্টিকূল শিরোমণি প্রিয়নবী ﷺ এর কাছে বিভিন্নভাবে পৌঁছে থাকে; এটা অনেকগুলো রওয়াযাত/বিবরণে সাবেত বা প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই সব বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হলো:

৮.১৫.১ সালাত-সালাম হযূর পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সরাসরি পৌঁছে

সৃষ্টিকূল শিরোমণি প্রিয়নবী ﷺ এর পার্থক্যকারী গুণাবলীর মধ্যে একটি এই যে, ঈমানদার ব্যক্তি যেখানেই অবস্থান করে

৫৬৪. ইবনে এসহাক বর্ণিত, ফাদলুস সালাত 'আলান নাবী', ৩৫ পৃষ্ঠা #২০; আহমদ বিন হাম্বল, 'আল-মুসনাদ', ২:৩৬৭ #৮৭৯০; ইবনে আবী শায়বা, 'আল-মুসান্নাফ', ২:১৫০ #৭৫৪২; ইবনে কাসীর, তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম', ৩:৫১৫, তিনি এতে 'ফা-সা-এয়াবলুগুনী' বাক্যটির পরিবর্তে 'ফা-তাবলুগুনী' বাক্যটি বর্ণনা করেন; আল-আসকালানী, 'লিসান আল-মীযান', ২:১০৬-তেও 'ফা-তাবলুগুনী' বাক্যটি উল্লেখ করে; এবং হিন্দী, 'কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকুওয়াল ওয়াল আফ'য়াল', ১:৪৯৮ #২১৯৯।

আপন আশীর্বাদপূর্ণ সালাত ও শান্তিময় সালাম প্রেরণ করুন না কেন, সর্বদা তাঁর ওই সালাত-সালাম সরাসরি প্রিয়নবী ﷺ এর কাছে পৌঁছবে। আহাদীসে বিবৃত 'তাবলুগুনী', 'ফা-তাবলুগুনী', 'এয়াবলুগুনী', 'ফা-সা-এয়াবলুগুনী' ও অনুরূপ অন্যান্য অভিব্যক্তি স্পষ্টভাবে এ বিষয়টি প্রমাণ করে। এটা এ কারণে যে, আরবী ব্যাকরণের আলোকে বাক্যগুলো কর্তৃবাচ্যসূচক, কর্মবাচ্যমূলক নয়। অধিকন্তু, এ সব ক্রিয়ার উদ্দেশ্য হয় 'তোমাদের সালাত আহ্বান' (সালাতু'কুম), না হয় 'তোমাদের শান্তিময় সালাত' (সালাতু'মুকুম), যা প্রমাণ করে যে ওই আহ্বান নিজে নিজে প্রিয়নবী ﷺ এর কাছে পৌঁছে যায়।

১. হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে সবচেয়ে মর্যাদাবান রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন:

وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.

-আমার প্রতি সালাত/আশীর্বাদ আহ্বান করো। নিশ্চয় তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌঁছোয়, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন।^{৫৬৫}

২. হযরত আলী বিন হুসাইন رضي الله عنه তাঁর দাদাজান হযরত আলী ইবনে আলী তালেব رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন যে প্রিয়নবী ﷺ এরশাদ করেন:

فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَ مَا كُنْتُمْ.

৫৬৫. আবু দাউদ, 'আল-সুনান': 'কিতাব আল-মানাসিক', 'কবর যিয়ারত' অধ্যায়, ২:১৭৬ #২০৪২; আগমদ বিন হাম্বল, 'আল-মুসনাদ', ২:৩৬৭; ইবনে আবী শায়বা, 'আল-মুসান্নাফ', ২:১৫০ #৭৫৪২; আল-তাবারানী, 'আল-মুজাম আল-কবীর', ৮:৮২-৮৩ #৮০৩০; আল-বায়হাকী, 'শুয়াব আল-ঈমান', ৩:৪৯১ #৪১৬২; আল-মাকুরীযী, 'ইমতা' আল-আসমা' বি মা লি-নাবী মিন আল-আহওয়াল ওয়াল-আমওয়াল ওয়াল-হাফদা ওয়াল-মাতা', ১১:৫৯ ও ৭১; ইবনে কাইয়েম, 'জালা' আল-আফহাম ফীল-সালাত ওয়াল-সালাম আলা খায়রিল আনাম', ৪২ পৃষ্ঠা #৬১; ইবনে কাসীর, 'তাফসীর আল-কুরআন আল-আযীম', ৩:৫১৪; এবং আল-আসকালানী, 'ফাতহুল বারী', ৬:৪৮৮।

—নিশ্চয় তোমাদের শান্তিময় সালাম আমার কাছে পৌঁছবে তোমরা যেখানেই থাকো না কেন।^{৫৬৬}

৩. হযরত হাসান বিন আলী رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم বলেন:

صَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ وَسَلَامَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَ مَا كُنْتُ.

—আমার প্রতি তোমরা সালাত ও সালাম প্রেরণ করো। নিশ্চয় তোমাদের সালাত-আশীর্বাদ আবাহন ও শান্তিময় সালাম প্রেরণ আমার কাছে পৌঁছোয়, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন।^{৫৬৭}

৪. হাসান বিন হাসান বিন আলী رضي الله عنه বর্ণনা করেন তাঁর পিতা হতে এই মর্মে যে, প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এরশাদ ফরমান:

حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي.

—তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, আমার প্রতি সালাত পাঠ করো; কেননা নিশ্চয় তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌঁছবে।^{৫৬৮}

৫৬৬. আবু এয়ালা, ‘আল-মুসনাদ’, ১:৩৬১ #৪৬৯; আল-মাকুদেসী, ‘আল-আহাদীস আল-মুখতা’রা’, ২:৪৯ #৪২৮; আল-হায়সামী, ‘মজমা’ আল-যওয়াঈদ ওয়া মানবা’ আল-ফাওয়াঈদ’, ৪:৩; এবং আল-আসকালানী, ‘লিসান আল-মীযান’, ২:১০৬।

৫৬৭. আবু এয়ালা, ‘আল-মুসনাদ’, ১২:১৩১ #৬৭৬১; এবং ইবনে আল-কাইয়েম, ‘জালা’ আল-আফহাম ফীল-সালাত ওয়া সালাম আলা খায়রিল আনাম’, ৪২ পৃষ্ঠা, #৬০।

৫৬৮. আল-তাবারানী, ‘আল-মু’জাম আল-কবীর’, ৩:৮২ #২৭২৯; আহমদ বিন হাম্বল, ‘আল-মুসনাদ’, ২:৩৬৭, এ সব কথা হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন; আল-তাবারানী, ‘আল-মু’জাম আল-আওয়াত’, ১:২৩৮ #৩৬৭, বিবৃত করেন এর বর্ণনাকারী হচ্ছেন হুসাইন বিন হাসান বিন আলী (رضي الله عنه); আবদুর রাযযাক, ‘আল-মুসান্নাফ’, ৩:৫৭৭ #৬৭২৬, ভিন্ন শব্দচয়নে বর্ণনা করেন; দুলাবী, ‘আল-দুরিয়া আল-তাহিরা’, ৭৩ পৃষ্ঠা #১৯৯; মুনিযীরী, ‘আল-তারগীব ওয়াল-তারহীব মিনাল হাদীস আল-শরীফ’, ২:৩৬২, এতে বিবৃত করেন যে ইমাম তাবারানী নিজ ‘আল-মু’জাম আল-কবীর’ গ্রন্থে একটি হাসান সনদে রওয়ায়াত করেন; আল-হায়সামী, ‘মজমা’ আল-যওয়াঈদ ওয়া মানবা’ আল-ফওয়াঈদ’, ১০:১৬২; এবং ইবনে কাইয়েম, ‘জালা’ আল-আফহাম, ফীল-সালাত ওয়া সালাম আলা খায়রিল আনাম’, ৪২ পৃষ্ঠা, #৬১।

৫. হযরত হাসান বিন হুসেইন رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেন:

وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُ.

—আমার প্রতি সালাত পাঠ করো। নিশ্চয় তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌঁছোয়, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন।^{৫৬৯}

৮.১৫.২ মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সরাসরি সালাত-সালাত শোনে

প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ এমন এক চমৎকার আমল (যেটা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়েছে এ পর্যায়ে) যে, খোদা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা’আলা তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী ও নেক আমলদার বান্দাদেরকে নিয়ে এতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁর মহাসম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসব সালাত-সালাম পাঠ সরাসরি শ্রবণের অনন্য সামর্থ্য দ্বারা আশীর্বাদধন্য করেছেন। হযরত আবু আল-দারদা’ رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রাসূল صلى الله عليه وسلم এরশাদ করেছেন:

أَكْثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ شَهِدَهُ الْمَلَائِكَةُ، لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا بَلَغَنِي صَوْتُهُ حَيْثُ كَانَ.

—“আমার প্রতি জুমুআ’ তথা শুক্রবার দিন অধিক পরিমাণে সালাত পাঠ করো; কেননা এই দিনটি হচ্ছে ফেরেশতাদের সাক্ষ্যসম্বলিত প্রত্যয়ন

৫৬৯. ইবনে এসহাক, ‘ফাদল আল-সালাত আলান্ নাবী’, পৃষ্ঠা ৪৫ #৩০; ইবনে আবী শায়বা, ‘আল-মুসান্নাফ’, ২:১৫০ #৭৫৪৩; এবং আবদুর রাযযাক, ‘আল-মুসান্নাফ’, ৩:১৭ #৪৮৩৯, বর্ণনা করেন যে এটা হযরত হাসান বিন আলী (رضي الله عنه) হতে এসেছে।

দিবস। আমার প্রতি সালাত প্রেরণকারী এমন কোনো এবাদতকারী বান্দা নেই, যার কণ্ঠস্বর আমার কাছে পৌঁছে না, সে যেখানেই থাকুক না কেন।”

মহান সাহাবা কেলাম رضي الله عنهم सर्वाधिक सम्मानित रासूल صلى الله عليه وسلم এর प्रति प्रश्न করেন, “আমরা কি এই আমল অব্যাহত রাখবো আপনার বেসাল শরীফের পরও?” মহানবী صلى الله عليه وسلم উত্তর দেন:

وَبَعْدَ وَقَاتِي، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.

—(হ্যাঁ), আমার বেসাল শরীফের পরও (জারি থাকবে)। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা আশিয়া আলাইহিমুস্ সালামের দেহ মোবারককে মাটির জন্যে হারাম করে দিয়েছেন।^{৫৭০}

ওপরে বর্ণিত ‘তার কণ্ঠস্বর বা গলার আওয়াজ আমার কাছে পৌঁছে’- এই কথাটি ইঙ্গিত করে যে সর্বাধিক মর্যাদাবান রাসূল صلى الله عليه وسلم ফেরেশতাদের মতো কোনো মাধ্যমের সহায়তায় (ওই সালাত পাঠ) শোনেন না, বরং তিনি নিজেই প্রকৃতপ্রস্তাবে শুনে থাকেন। এতে কাছে বা দূরে থাকার কোনো শর্তারোপ নেই; বরঞ্চ সবচেয়ে সম্মানিত রাসূল صلى الله عليه وسلم নিজেই এ সব সালাত পাঠ শ্রবণ করেন। ইমাম আহমদ রেযা খাঁন সাহেব (১২৭২-১৩৪০ হিজরী) এই বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন নিচের পংক্তিগুলোতে:

دور وزدیک کے سننے والے وہ کان

৫৭০. ইবনে ক্বাইয়্যেম কৃত ‘জালা’ আল-আফহাম ফীস-সালা’তে ওয়াস্ সালা’মে ‘আলা খায়রিল আনা’ম’, ৬৩ পৃষ্ঠা #১০৮ বিবৃত করে যে ইমাম তাবারানী (رحمة الله عليه) এটা বর্ণনা করেছেন; আল-হায়তামী রচিত ‘আল-দুর্ল মানদূদ ফীস-সালা’তে ওয়াস্ সালা’মে ‘আলা সা’হেবিল মকামিল মাহমূদ’, ১৫৫-১৫৬ পৃষ্ঠা; আল-সাখাবী প্রণীত ‘আল-কুওলুল বাদী ফীস সালা’তে ‘আলাল হাবীবিল শাফঈ’, ১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠা বিবৃত করে যে ইমাম তাবারানী (رحمة الله عليه) এটা বর্ণনা করেছেন; এবং আল-নাবহানী, ‘হুজ্জাতুল্লাহি আলাল-আলামীন ফী মু’জিয়াতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন’, ৭১৩ পৃষ্ঠা।

كان لعل كرامتہ لاکھوں سلام

ওই আশীর্বাদপূর্ণ কর্ণযুগল দূরে বা কাছের সবই শুনতে সক্ষম,
অলৌকিক ওই দুই কানরূপী রত্নের প্রতি (জানাই)শত-সহস্র সালাম।

(ভাবানুবাদ)

একবার সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রাসূল صلى الله عليه وسلم এর প্রতি প্রশ্ন করা হয় তাঁর প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণকারীদের সম্পর্কে এ মর্মে যে, তাঁরা যতো দূরেই থাকুন না কেন, অথবা এমন কী তাঁর বেসাল শরীফের পরও তাঁদের এসব সালা’ত-সালা’ম তাঁর কাছে পৌঁছুবে কি না? তিনি উত্তর দেন:

أَسْمَعُ صَلَاةَ أَهْلِ حَبَّتِي وَأَعْرِفُهُمْ.

—আমি আমার আশেক-ভক্তদের আশীর্বাদপূর্ণ সালা’ত শুনতে পাই এবং আমি তাদেরকে চিনতে পারি।^{৫৭১}

এই দলিল হতে বোঝা যায়, সর্বাধিক মর্যাদাবান পয়গাম্বর صلى الله عليه وسلم তাঁর ভক্ত-আশেকানের পঠিত শাস্তিময় সালা’ম ও আশীর্বাদপূর্ণ সালা’ত কেবল শ্রবণ-ই করেন না, বরং তিনি তাঁদেরকে চিনতেও পারেন এবং জানেন তাঁরা কারা; এমন কী তাঁরা যদি হন বাহ্যিকভাবে তাঁর থেকে অনেক দূরেও; কিংবা হন তাঁর সময়কাল হতে অন্য কোনো সময়কালে জীবিত (মানে স্থান-কালের কোনো সীমাবদ্ধতা এখানে নেই)।

৫৭১. ইমাম জাযুলী, ‘দালা’ইল আল-খায়রা’ত ওয়া শাওয়া’রিকু আল-আনওয়া’র ফী যিকর আল-সালা’ত ‘আলা আল-নাবী আল-মুখতা’র’, ১৮ পৃষ্ঠা; এবং আল-ফা’সী, ‘মাতা’লী আল-মাসারী’ত বি-জালা’ দালা’ইল আল-খায়রা’ত ওয়া শাওয়া’রিকু আল-আনওয়া’র ফী যিকর আল-সালা’ত ‘আলা আল-নাবী আল-মুখতা’র’, ৮১ পৃষ্ঠা।

৮.১৫.৩ হযূর পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাওয়াতের জবাব দেন

সর্বাধিক সম্মানিত নবী ﷺ শুধু শান্তিময় সালাম ও আশীর্বাদপূর্ণ সালাত শুনতেই পান না, বরং তিনি সেগুলোর প্রত্যুত্তরও দিয়ে থাকেন। হযরত আবু হুরায়রাহ رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন:

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي، حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

—কেউ আমার প্রতি শান্তিময় সালা'ম প্রেরণ করলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার রূহ/আত্মা ফিরিয়ে দেন, যতোক্ষণ না আমি তার সালা'মের প্রত্যুত্তর দেই।^{৫৭২}

হযরত আবু হুরায়রাহ رضي الله عنه হতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ سَلَّمَ عَلَيَّ فِي شَرْقٍ وَلَا غَرْبٍ، إِلَّا أَنَا وَمَلَائِكَتُ رَبِّي نَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

—পূর্ব অথবা পশ্চিমে কোনো মুসলমান আমার প্রতি শান্তিময় সালাম প্রেরণ করলে আমি ও আমার প্রভু আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাকুল তার সালা'মের প্রত্যুত্তর দেই।^{৫৭৩}

৫৭২. ইমাম আবু দাউদ বর্ণিত, 'আল-সুনান': কিতাব আল-মানাসিক, 'মাযার য়েয়ারত' অধ্যায়, ২:১৭৫ #২০৪১; ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, 'আল-মুসনাদ', ২:৫২৭; আল-তাবারানী, 'আল-মু'জাম আল-আওয়াত', ৪:৮৪ #৩১১৬; আল-বায়হাকী, 'আল-সুনান আল-কুবরা', ৫:২৪৫; আল-বায়হাকী, 'শু'আব আল-ঈমান', ২:২১৭ #১৫৮১; মুনিযরী, 'আল-তারগীব ওয়াল-তারহীব মিনাল-হাদীসিল শরীফ', ২:৩৬২ #২৫৭৩; এবং আল-হায়তামী, 'মজমাউয্ যাওয়াইদ ওয়া মানবা' আল-ফাওয়াইদ', ১০:১৬২।

৫৭৩. আবু নুয়াইম, 'হিলইয়াত আল-আউলিয়া' ওয়া তাবাক্বাত আল-আসফিয়া', ৬:৩৪৯; আল-মাকুরীযী, 'ইমতা' আল-আসমা' বি মা' লি-নাবী মিন আল-আহওয়া'ল ওয়াল-আমওয়া'ল ওয়াল-হাফদা ওয়াল-মাতা', ১১:৫৯; ইবনে ক্বাইয়েম, 'জালা' আল-আফহা'ম ফীল-সালাত ওয়াল-সালাম' আল-খায়র আল-আনা'ম', ১৯ পৃষ্ঠা, #২০; এবং আল-সাখা'ভী, 'আল-কুওল আল-বাদী ফীল-সালাত আল-ল হাবীব আল-শাফী', ১৫৬ পৃষ্ঠা।

৮.১৫.৪ মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ফেরেশতাবন্দ সালাত-সালাম পাঠ করেন

সর্বাধিক সম্মানিত পয়গাম্বর ﷺ এর সবচেয়ে বিশিষ্ট মর্যাদা হচ্ছে তাঁর অনুগত সেবকবন্দের পাঠিত শান্তিময় সালাম ও আশীর্বাদসিক্ত সালা'ত তিনি নিজেই শুনতে পান। তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নিযুক্ত করেছেন তাঁরই প্রিয়নবী ﷺ এর কাছে সালাম-গুলো পৌঁছে দেয়ার কাজে; এটা রাসূল ﷺ এর মহাসম্মানের খাতিরেই। এতদসত্ত্বেও হযরত আনাস বিন মালিক رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে প্রিয়নবী ﷺ এরশাদ করেছেন:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ مِائَةً مَرَّةً، قَضَى اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ: سَبْعِينَ مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ وَثَلَاثِينَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، ثُمَّ يُؤَكِّلُ اللَّهُ بِذَلِكَ مَلَكًا يُدْخِلُهُ فِي قَبْرِى كَمَا يُدْخِلُ عَلَيْكُمُ الْهَدَايَا، يُخْرِئُنِي مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِاسْمِهِ وَتَسْبِيهِ إِلَى عَشِيرَتِهِ، فَأُثْبِتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيِّضَاءَ.

—যে ব্যক্তি আমার প্রতি জুমুআ' তথা শুক্রবার দিন ও (তৎপূর্ববর্তী) রাতে এক শ বার আশীর্বাদময় সালাত প্রেরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার একশটি চাহিদা পূরণ করবেন; এর মধ্যে সত্তরটি পরকালে, আর ত্রিশটি এই জীবনে। অতঃপর এরই কারণে আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে নিযুক্ত করবেন যিনি আমার কাছে তা পেশ করবেন, যেমনিভাবে কেউ তোমাদের কাছে হাদীয়া পেশ করে থাকে; তিনি আমাকে ওই সালা'ত ওর পাঠকারীর নাম, বংশ পরিচয় ও পরিবারসহ জানাবেন। অতঃপর আমি তা আমার সাথে গচ্ছিত একটি মোড়ানো সাদা পাতায় লিপিবদ্ধ করবো।^{৫৭৪}

৫৭৪. আল-বায়হাকী, 'শু'আব আল-ঈমান', ৩:১১১ #৩০৩৫; ফায়রোয-আবাদী, 'আল-সালাত ওয়াল-বিশর ফীল-সালাত' আল-খায়রিল বাশার', ৭৭ পৃষ্ঠা; আল-সৈয়তী, 'আল-দুর্রুল মানসুর ফী তাফসীরিল বিল-মা'সূর', ৫:২১৯; আল-যুরকানী, 'শরহুল মাওয়া'হিবিল লাদুন্নিয়া বিল-মিনাহিল মুহাম্মাদীয়া', ৭:৩৭২; এবং আল-সাখা'ভী, 'আল-ক্বাওলুল বাদী ফী সালাত' আল-ল হাবীব আল-শাফী', ১৫৬ পৃষ্ঠা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه বর্ণনা করেন রাসূল صلى الله عليه وسلم এর কথা, যিনি বলেন:

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ.

—নিশ্চয় আল্লাহ তা‘লার এমন ফেরেশতা আছেন, যাঁরা দুনিয়াময় সফর করে আমাকে আমারই উম্মতের সদস্যদের প্রেরিত শান্তিময় সালাম পৌঁছে দেন।^{৫৭৫}

হযরত আবু উমা'মা رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এরশাদ ফরমান:

أَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ، فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَرْزَلَةً.

—জুমুআ'র দিন তোমরা আমার প্রতি বেশি বেশি আশীর্বাদসিদ্ধ সালা'ত পাঠ করো। নিশ্চয় আমার প্রতি উম্মতের সদস্যদের পাঠিত সালা'ত প্রত্যেক শুক্রবার আমার সামনে পেশ করা হয়। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি সালা'ত পাঠ করবে, সে আমার ঘনিষ্ঠতর স্তরে উপনীত হবে।^{৫৭৬}

৫৭৫. ইমাম নাসাঈ, ‘আল-সুনান: কিতাবুস সাহউ, ‘প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর প্রতি প্রেরিত সালাম’, ৩:৩১ #১২৮২; আল-নাসাঈ, ‘আমল আল-এয়াওম ওয়াল-লায়লা’, ১৬৭ পৃষ্ঠা #৬৬; ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ‘আল-মুসনাদ’, ১:৩৮৭, ৪৪১ ও ৪৫২; আল-দারিমী, ‘আল-সুনান’, ২:৪০৯ #২৭৭৪; ইবনে হিব্বান, ‘আল-সহীহ’, ৩:১৯৫ #৯১৪; আল-বায়হার, ‘আল-বাহর আল-যুখার (আল-মুসনাদ), ৫:৩০৭-৩০৮ #১৯২৪-১৯২৫; আবু এয়ালা, ‘আল-মুসনাদ’, ৯:১৩৭ #৫২১৩; এবং ইবনে আবী শায়বা, ‘আল-মুসান্নাফ’, ২:২১৫ #৩১১৬। ইবনে হিব্বানের বর্ণনাটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ এবং এর সকল রাবী-ই বিশ্বস্ত। ইমাম হাকিম এটাকে সহীহ বলেন এবং ইমাম যাহাবী তাঁর সাথে একমত পোষণ করেন। ইবনে কুইয়েম-ও এর এসনাদকে সহীহ বলেছেন।

৫৭৬. আল-বায়হাকী, ‘শু‘আবুল ঈমান’, ৩:১১০ #৩০৩২; আল-বায়হাকী, ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৩:২৪৯ #৫৭৯১; আল-দায়লামী, ‘আল-ফেরদৌস বি-মা‘সুর আল-খিতাব’, ১:৮১ #২৫০; মুনিযরী, ‘আল-তারগীব ওয়াল-তারহীব মিনাল-হাদীসিল শরীফ’, ২:৩২৮

এসব হাদীস হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, দূরে কিংবা কাছে হোক, সর্বাধিক সম্মানিত পয়গাম্বর صلى الله عليه وسلم তাঁর প্রতি তাঁরই অনুগত উম্মতদের পাঠিত আশীর্বাদসিদ্ধ সালাত ও শান্তিময় সালাম শুনতে পান। কেবল তাঁর দরবারের আদব-কায়দা রক্ষার্থে ফেরেশতাবৃন্দ সালাত-সালাম তাঁর কাছে পৌঁছে দেন। নতুবা (তাঁর) গোলাম/সেবকের কণ্ঠস্বরই শুধু তাঁর কাছে পৌঁছে না, বরং সবচেয়ে মর্যাদাবান নবী صلى الله عليه وسلم তার সালামের প্রত্যুত্তর দিয়ে তাকে সম্মানিতও করে থাকেন। এ রকম স্পষ্ট ও খোলাসা বিধি-বিধান ও এর বহু গুণগত বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ মীলাদুন্নবী صلى الله عليه وسلم এর মাহফিল/সমাবেশের প্রতি সমালোচনাপূর্বক আপত্তি উত্থাপন করে, তাহলে তা তারই দুর্ভাগ্য হবে। এই বিরোধিতাকারীদের কুরআন ও সুন্নাহ’র দলিল হতে সত্য সম্পর্কে জানা উচিত।

এই অধ্যায়ে আমরা প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণের চমৎকার বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং এর তাৎপর্য সংক্রান্ত হাদীসের একটি ছোট সংকলন উপস্থাপন করেছি; নচেৎ এই বিষয়ে হাদীসের বিশাল রত্নভাণ্ডার উপস্থিত রয়েছে। বিজ্ঞ আলেম-উলামা এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বড় বড় কিতাব রচনা করেছেন। আরো জানতে হলে পড়ুন আমার লেখা বই ‘আল-বদর আল-তামাম ফীস সালা’তে আলা সা’হেবিল দুনুউ ওয়াল মাক্বাম’।

#২৫৮৩: সুবকী, ‘শিফাউস সিক্বাম ফী যিয়ারাতি খায়রিল আনাম’, ১৩৬ পৃষ্ঠা; আল-মাকুরীযী, ‘ইমতা’ আল-আসমা’ বি মা’ লি-নাবী মিনাল-আহওয়াল ওয়াল-আমওয়াল ওয়াল-হাফদা ওয়াল-মাতা’, ১১:৬৬; ইবনে আল-কুইয়েম, ‘জালা’ আল-আফহাম ফীল-সালা’তে ওয়াল-সালা’মে আলা খায়রিল আনাম’, ৪০ পৃষ্ঠা #৫৬; এবং আযীম আবাদী, ‘আওন আল-মাবুদ আলা সুনানে আবী দাউদ’, ৪:২৭২।

পরিচ্ছেদ - ৫

কিয়াম (দাঁড়াবার রীতি)

মীলাদুন্নবী ﷺ এর মাহফিলে সর্বাধিক প্রশংসিত রাসূল ﷺ এর প্রতি ক্বিয়াম তথা দাঁড়িয়ে সালাম প্রেরণ করা আশেক্ব-ভক্তদের এক নির্দেশক ছাপ; এটা প্রশংসাযোগ্য একটা কাজ -ঠিক যেমনটা সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় পয়গাম্বর ﷺ এর (প্রকাশ্য) হায়াতে জিন্দেগীতে তাঁরই মোবারক যাত/সত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ছিলো রুযি الله মহান সাহাবায়ে কেরাম رضي الله তাঁদের সম্মান প্রদর্শনে ছিলেন ভীষণ সতর্ক। একইভাবে, আজকেও ওই ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন (আমাদের জন্যে) বাধ্যতামূলক। মীলাদের মজলিশে বা কাব্য-কসীদা পাঠের আসরে প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করা ওই সম্মান প্রদর্শনেরই ধারাবাহিকতা। যে সব মাহফিলে ক্বিয়াম করা হয়, তা নিশ্চিতভাবে খোদায়ী জ্যোতি ও বরকত/আশীর্বাদধন্য। কিন্তু দণ্ডায়মান হয়ে এই সম্মান প্রদর্শনের রীতিকে কেউ কেউ বিরোধিতার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন; তাঁদের মতে এটা শরীয়তের খেলাফ। এমতাবস্থায় নিচে এতদসংক্রান্ত আলোচনায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হবে:

৮.১৬ ক্বিয়াম বা দাঁড়াবার রীতি কি শুধু আল্লাহরই জন্যে খাস (সুনির্দিষ্ট)?

কিছু লোক মনে করেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো সম্মানার্থে ক্বিয়াম করা বা (প্রথাগতভাবে) দাঁড়ানো জায়েয নেই। তাঁদের কাছে দাঁড়ানো এবাদত-বন্দেগীরই একটি আকার-আকৃতি, আর এবাদত একেবারেই আল্লাহ তা'আলার জন্যে খাস/সুনির্দিষ্ট। ফলশ্রুতিতে তাঁদের পার্থিব জ্ঞান ও বিবেচনায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া শির্ক তথা অংশীবাদের আওতায় পড়ে যায়। এই কারণেই তাঁদের

মতানুসারে মীলাদের মজলিশগুলোতে অতি-করণাশীল নবী ﷺ এর সম্মানার্থে দাঁড়ানো না-জায়েয।

বিরোধীদের এই দাবিটি ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত। কেননা দাঁড়ানো যদি এবাদত-বন্দেগীর অংশ হয়, তাহলে বসা এবং শোয়াও এবাদতের অংশ হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত; কারণ কুরআন মজীদে সেগুলোকেও দাঁড়ানোর সাথে একযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

-তারা সেসব লোক যারা আল্লাহকে স্মরণ করে (আপাদমস্তক আত্মসমর্পণকারীরূপে) দাঁড়িয়ে, (পরিপূর্ণ আদব রক্ষা করে) উপবিষ্ট হয়ে, (ভালোবাসায় ব্যাকুল হয়ে) নিজেদের পার্শ্ব পরিবর্তনে।^{৫৭৭}

ওপরের কুরআনী আয়াতে আল্লাহ তা'আলার এবাদত ও যিকরের সাথে সম্পৃক্ত তিনটি অবস্থার কথা বিবৃত হয়েছে: দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্যেই যদি দণ্ডায়মান হওয়া খাস/সুনির্দিষ্ট হয়, তাহলে কার জন্যে উপবেশন ও শয়ন করা (খাস) হবে? উপরোক্ত আয়াতের ভাষ্যানুযায়ী, উপবেশন ও শয়নও আল্লাহ তা'আলারই জন্যে খাস হওয়া উচিত। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্যে দাঁড়ানো যদি তাঁর সাথে অন্যদেরকে শরিক (অংশীদার) বলে বিবেচনা করা হয়, তাহলে অন্য কারো জন্যে বসা ও শোয়াও শির্ক হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, কেননা এই তিনটি ক্বিয়াই এবাদতের অংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে আয়াতটিতে। এমতাবস্থায় আর কী-ই বা অবশিষ্ট থাকলো? এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে পুরো জীবন-ব্যবস্থাই বিঘ্নিত হবে; কেননা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্যে দাঁড়ানো, উপবেশন ও শয়ন শির্ক পরিণত হবে। তাই এসব (শারীরিক) ক্বিয়াকে এবাদত-বন্দেগী বলে ঘোষণা করা একদম হাস্যকর একটা কাজ হবে।

এবাদত (আরাধনা) ও তা'যীম (সম্মান)'এর মধ্যকার পার্থক্য বোঝাতে নিচে আরো আলোচনা করা হলো:

৮.১৬.১ নামাযের দাঁড়ানো ও বসা অবস্থাগুলো খোদ এবাদত নয়

প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত যে, নামাযে বিভিন্ন অবস্থাগুলো (দাঁড়ানো, বসা ইত্যাদি) আপনাআপনি এবাদতের কর্ম নয়। তাই সেগুলো শির্ক (আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এটা এই কারণে যে, এবাদতের মূল বিষয় হচ্ছে কারো নিয়্যত তথা উদ্দেশ্য। প্রিয়নবী ﷺ এরশাদ ফরমান:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

—সকল কর্ম উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে বিবেচিত/মূল্যায়িত হবে।^{৫৭৮}

নিয়্যত-হীন কোনো কাজ গৃহীত হবে না। এবাদতের সাথে দাঁড়ানোর কোনো সম্পর্কই নেই, যতোক্ষণ না তাতে এবাদতের নিয়্যত যুক্ত হচ্ছে। ফেকাহ-শাফ্র (ইসলামী বিধিবিধান সংক্রান্ত বিদ্যা) অনুযায়ী, এক হাতের ওপর আরেক হাত স্থাপন ফরয/বাধ্যতামূলক নয়, ওয়া'জিব/অবশ্যকর্তব্য-ও নয়; ক্রিয়াম হলো শুধু সোজা হয়ে দাঁড়ানো। হানাফী, শাফেঈ, মালেকী বা হাম্বলী মাযহাব অনুসারে ক্রিয়াম কেউ পালন করুন বা না-ই করুন, তা শরীয়তে বৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে। কোনো মাযহাবে হাত দুটো বাঁধা নামাযের নিয়ম, আবার অপর কোনো মাযহাবে হাত দু পাশে ছেড়ে দাঁড়ানো হচ্ছে নিয়ম। বাস্তবে অন্তরের নিয়্যত থাকলে দুটো অবস্থাই নামাযের বলে বিবেচিত হবে। কেউ এ দাবি করতে পারবেন না - 'আমার ক্রিয়ামের অনুশীলন হচ্ছে এবাদত-বন্দেগী, আর তোমার সম্মানসূচক ক্রিয়ামের অনুশীলন হচ্ছে শির্ক।' কেননা, এবাদতের নিয়্যত না করা হলে তা শির্ক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে কীভাবে? ওই কর্মটি সম্মানের উদ্দেশ্যে করা হলে তাতে শির্ক আরোপ করার সম্ভাবনাই থাকে না। অতএব, এবাদতের উদ্দেশ্যে কৃত কর্মসমূহ এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কৃত কর্মসমূহের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা অত্যাৱশ্যক।

৫৭৮. সহীহ বুখারী: 'কিতাবু বা'আদ আল-ওহী', 'ওহীর সূচনা' শীর্ষক অধ্যায়, ১:৩ #১; সহীহ মুসলিম: 'কিতাবুল ইমার', 'কর্মসমূহ নিয়্যত দ্বারা বিবেচিত' অধ্যায়, ৩:১৫১৫ #১৯০৭।

এই আলোচনার সার-সংক্ষেপ হলো, এবাদত-বন্দেগী নিয়্যতের সাথে সম্পৃক্ত, স্বয়ং দাঁড়ানোর অনুশীলনীর সাথে নয়। ক্রিয়াম কেবল সোজা হয়ে দাঁড়ানো; এর সাথে (দুই) হাতের কোনো সম্পর্ক নেই। সেগুলো বাঁধা না ঝুলোনো তাতে কিছু এসে যায় না।

৮.১৬.২ দাঁড়ানো অবস্থা যদি এবাদত হয়, তাহলে অন্যান্য অবস্থাগুলো কী হবে?

আমরা যদি রীতিগত নামাযে দণ্ডায়মান হওয়ার পর সেটার দিকে সূক্ষ্ম নজর দেই, তাহলে দেখতে পাবো তাতে রুকু, সেজদা ও উপবিষ্ট হওয়ার অবস্থাগুলোও বিরাজমান; আর এগুলোর সবই রীতিগত নামাযের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দাঁড়ানো অবস্থাটুকু নামাযের গঠনাত্মক উপাদান হলে বসা অবস্থাও একই ব্যাপার হবে: দাঁড়ানো এবাদত-বন্দেগী হলে বসাও তা-ই হবে; আর যদি দণ্ডায়মান হওয়া একমাত্র আল্লাহ তা'লারই জন্যে খাস/সুনির্দিষ্ট হয়, তাহলে বসাও তাঁরই জন্যে খাস হবে। কেননা এই অবস্থাগুলোর সবই নামাযের বাধ্যতামূলক অংশ। আর কৌতূহলের বিষয় হলো, (নামাযে) তাশাহহুদ বৈঠকের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি সালাম প্রেরণকে এক স্বকীয় অংশ করেছেন। যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্যে এসব অবস্থা পালন শির্ক হয়, তাহলে রীতিগত নামাযের মধ্যেই আমরা তা সংঘটনের দায়যুক্ত হবো (কেননা বসা অবস্থায় প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি সালাম পাঠ করা হয়ে থাকে)। বাস্তবতা হলো এটা শির্ক অনুশীলনের ব্যাপার নয়, কেননা দাঁড়ানো ও বসা অবস্থাগুলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'লার প্রতি এবাদত-বন্দেগী হিসেবে পালিত হয়, আর তা পালিত হয় সবচেয়ে সম্মানিত রাসূল ﷺ এর প্রতি তা'যীম/শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। যদি রীতিগত নামাযে সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় রাসূল ﷺ এর প্রতি বসা অবস্থায় সালাত ও সালাম প্রেরণ করা এবাদত

বিবেচিত না হয়, তাহলে রীতিগত নামাযের বাইরে তা দাঁড়ানো অবস্থায় পালন একই বিবেচনার পর্যায়ে পড়বে কীভাবে?

৮.১৬.৩ নামাযের দাঁড়ানো প্রথা এবাদত হয় কোন্ উপায়ে?

রীতিগত নামাযে দুই হাত নাভির নিচে বাঁধতে তথা জোড়া দিতে হয়। কিছু লোক মনে করে এভাবে দাঁড়ানো, যেমনটি পশ্চিমা বিশ্বে (সমাজ/রাষ্ট্রের) কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়ানো হয়, তা হওয়া বুঝি এবাদত-বন্দেগীরই একটি অনুশীলনী; আর তাই তা শির্ক/অংশীবাদ। এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে মালেকী মাযহাব ও জা'ফরী মসলকের অনুসারীদের ব্যাপারে ফতোয়া কী হবে? কেননা এই দুটো পথ ও মত অনুসারে (নামাযে) হাত দুটো দু পাশে ছেড়ে দাঁড়াতে হয় (ইরসা'ল আল-এয়াদাইন); যদি ওই মতের অনুসারীরা কারো সামনে হাত দু পাশে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ান, তবে কি তা শির্ক বলে বিবেচিত হবে? নিশ্চয় না! আসলে এ ধরনের বক্তব্য জ্ঞানের অভাবের ফলশ্রুতি ছাড়া কিছু নয়।

৮.১৭ ক্রিয়াম (প্রথাগত দাঁড়ানো) সুন্নাহ'র আলোকে অনুমতিপ্রাপ্ত

আমাদের ওপরের আলোচনা হতে এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, দাঁড়ানো খোদ আপনা হতে এবাদত নয়। এটাকে এবাদতের পরিসরে এনে থাকে এরই পশ্চাতে অবস্থিত নিয়ত তথা উদ্দেশ্য। ক্রিয়াম (রীতিগত দাঁড়ানো) হচ্ছে একটি জায়েয অনুশীলন, সেটা তা'যীম হোক বা না-ই হোক। আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে: রীতিগত ক্রিয়াম কি সুন্নাহ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত? নাকি এটা শ্রেফ জায়েয/বৈধ? ক্রিয়াম যে প্রিয়নবী ﷺ এর সুন্নাহ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি আমল/অনুশীলন, তা খোলাখুলিভাবে প্রতীয়মানকারী হাদীসসমূহ দ্বারা বিস্তারিতভাবে নিচে প্রদর্শন করা হবে:

৮.১৮ ক্রিয়ামের শ্রেণিকরণ

অন্য কারো জন্যে দাঁড়ানো প্রিয়নবী ﷺ এর সুন্নাহ, এটা আহাদিস দ্বারা প্রমাণিত। ক্রিয়াম করার বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান। হাদীসগুলোর সামগ্রিক বিশ্লেষণ আমাদেরকে জ্ঞাত করে যে, অন্য কারো জন্যে দাঁড়ানো সাতটি পরিস্থিতিতে হয়ে থাকে:

১. ক্রিয়াম লিল-ইসতিক্বা'ল: কাউকে অভ্যর্থনা/স্বাগত জানাতে;
২. ক্রিয়াম লিল-মাহাব্বা: ভালোবাসা প্রকাশের জন্যে;
৩. ক্রিয়াম লিল-ফারহা: আনন্দ প্রকাশের জন্যে;
৪. ক্রিয়াম লিত্ তা'যীম: সম্মানার্থে দাঁড়ানো;
৫. ক্রিয়াম লিল-ইকরা'ম আল-ইনসা'নী: মানুষের মর্যাদার উদ্দেশ্যে;
৬. ক্রিয়াম লিয়-যিকর: স্মরণার্থে দাঁড়ানো;
৭. ক্রিয়াম লিস্ সালা'ত ওয়াস্ সালা'ম: আশীর্বাদসিদ্ধ সালা'ত ও শান্তিময় সালা'ম প্রেরণোদ্দেশ্যে।

এই শ্রেণিকরণ ক্রিয়ামের অর্থ বোঝার সুবিধার্থে ও অধিকতর নিয়মতান্ত্রিক করার লক্ষ্যে করা হয়েছে।

৮.১৮.১ ক্রিয়াম লিল্ ইসতিক্বাল বা কাউকে স্বাগত জানাতে দাঁড়ানো

কোনো বিশেষ অতিথি বা সম্মানিত নেতাকে স্বাগত জানাতে উঠে দাঁড়ানোকে বলা হয় ক্রিয়াম লিল্ ইসতিক্বাল, অথবা কাউকে অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়ানো। এটার আসল বা মূল প্রিয়নবী ﷺ এর সুন্নাহ'তে নিহিত।

'আহযা'ব'-এর যুদ্ধে দয়াবান রাসূল ﷺ এর সাথে বনু কুরায়যা গোত্র তাদের সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করে; তারা কুফফার-বর্গের সহায়তা করে এবং মুসলমানবৃন্দের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি করতে সবচেয়ে সম্মানিত রাসূল ﷺ

যুদ্ধের পর সরাসরি তাদের কাছে যান এবং আউস গোত্রীয় (বনু কুরায়যা'র মিত্র) নেতা হযরত সা'আদ ইবনে মু'আয রাঈয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে সালিশ নিয়োগ করেন।

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী رضي الله عنه বর্ণনা করেন:

فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدٍ، فَأَتَى عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ: قُومُوا إِلَيَّ سَيِّدُكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ.

অর্থ: মহানবী رضي الله عنه হযরত সা'আদ رضي الله عنه ডেকে পাঠান; আর তিনি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে আসেন। তিনি মসজিদের নিকটবর্তী হলে প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم আনসার সাহাবা মসজিদের নিকটবর্তী হলে প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم বন্দকে বলেন: “তোমাদের নেতা/সরদারের জন্যে দাঁড়াও!” অথবা বলেছিলেন, “তোমাদের মাঝে সেরা জনের জন্যে দাঁড়াও।” ৫৭৯

“তোমাদের মাঝে সেরা জন” (خَيْرِكُمْ) বাক্যটি ইঙ্গিত করে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশটি ‘কিয়াম লিল ইন্তিকুবা’ল তথা স্বাগত জানানোর উপলক্ষে দাঁড়ানোকে উদ্দেশ্য করেছিলো; এটাকে ‘কিয়াম লিত তা'যীম’ (সম্মানার্থে) হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যায়। কিছু লোক এই ঘটনাকে এড়ানোর চেষ্টা করেছে এই দাবি তুলে যে হযরত সা'আদ বিন মু'আয رضي الله عنه অসুস্থ ছিলেন, আর তাই

৫৭৯. সহীহ আল-বুখারী, ‘কিতাবুল মাগাযী’, ‘রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর আহযাব যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৫১১ #৩৮৯৫; সহীহ বুখারী, ‘কিতাবুল ইত্তি'দা'ন’, ‘রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর উক্তি ‘তোমাদের নেতার জন্যে দাঁড়াও’ শীর্ষক অধ্যায়, ৫:২৩১০ #৫৯০৭; সহীহ মুসলিম, ‘কিতাবুল জিহাদ’, ‘চুক্তিভঙ্গকারী কাউকে হত্যার বৈধতা’ শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১৩৮৮ #১৭৬৮; এবং সুনানে আবী দাউদ, ‘কিতাবুল আদাব’, ‘রীতিগত ক্রিয়াম সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:৩৫৫ #৫২১৫।

প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم তাঁকে সওয়ার থেকে নামানোর জন্যে কয়েকজনকে উঠে দাঁড়াতে আদেশ করেন।

আমাদের যদি এতে বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم কেন হযরত সা'আদ رضي الله عنه কে সাহায্য করার জন্যে কিছু মানুষকে আদেশ দেননি? কেন তিনি এর বিপরীতে গোটা গোত্রকেই (উদ্দেশ্য করে) নির্দেশটি দিয়েছিলেন? হাদীসের উদ্ধৃতি হলো-

قَالَ لِلْأَنْصَارِ: قُومُوا إِلَيَّ سَيِّدُكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ.

–“তোমাদের নেতার জন্যে দাঁড়াও!”

কয়েকজনকে নয়, বরং পুরো গোত্রকেই দাঁড়ানোর জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। অতএব, তাঁরা তাঁর অসুস্থতা হেতু সাহায্য করতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন মর্মে দাবিটি হাদীসের লিপির (সম্পূর্ণ) বিরোধী। এই আদেশটি ছিলো তাদের ওপর হযরত সা'আদ رضي الله عنه এর নেতৃত্বের সূত্রে, আর তাই দণ্ডায়মান হওয়া তাঁকে স্বাগত জানানোর একটি মাধ্যম ছিলো। অধিকন্তু, “তোমাদের মাঝে সেরা জন” –চূড়ান্ত এই বাক্যটিও এই বিষয়টির ইঙ্গিতবহ।

ইমাম আবু দাউদ (২০২-২৭৫ হিজরী) এই বর্ণনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থের ‘কিতাবুল আদাব’, ‘কিয়াম সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে’ শীর্ষক অধ্যায়ে; সেখানে তিনি অন্যদের জন্যে মানুষের দণ্ডায়মান হওয়ার অনুরূপ বিভিন্ন বর্ণনাও লিপিবদ্ধ করেছেন। অতএব, হযরত সা'আদ رضي الله عنه কে তাঁর সওয়ার থেকে নামানোর জন্যে সাহায্য করতে বলা হয়েছিলো মর্মে দাবিটি একেবারেই ভিত্তিহীন; কেননা এই বর্ণনা যদি অন্যদের জন্যে কারো দাঁড়ানোর ব্যাপারে না হয়ে থাকে, তাহলে মুহাদ্দীস উলামাবৃন্দ এই বর্ণনাকে ‘রীতিগত দাঁড়ানোর’ (ক্রিয়ামের) আদব/শিষ্টাচার-সংক্রান্ত অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করতেন না।

৮.১৮.২ ক্রিয়াম লিল্ মুহাব্বাহ বা ভালোবাসা প্রকাশার্থে দাঁড়ানো

কারো জন্যে দাঁড়ানো ভালোবাসা প্রকাশার্থেও হতে পারে। এটা ‘কিয়াম লিল-মাহাব্বা’ অথবা ‘কিয়াম ফীল-হুব’ নামে পরিচিত। এই শ্রেণিভুক্ত হচ্ছে কোনো পিতার দাঁড়ানো তাঁর সন্তানের জন্যে; কোনো শিক্ষকের তাঁর ছাত্রের জন্যে; কোনো শায়খের তাঁর বিশেষ মুরীদের জন্যে; কিংবা কোনো সিনিয়র/বয়োজ্যেষ্ঠের তাঁর জুনিয়র/কনিষ্ঠের জন্যে। এই ধরনের দাঁড়ানো এমন কী ৪-৫ বছরের বাচ্চার জন্যেও করা যায়। দাঁড়ানোর এই বিশেষ রীতি সরাসরি সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল صلی اللہ علیہ وسلم এর সুন্নাহ’তে প্রতিষ্ঠিত। এতদসংক্রান্ত কিছু রওয়াযাত/বর্ণনা নিচে পেশ করা হলো:

ঈমানদারবৃন্দের মা হযরত আয়েশাহ সিদ্দীকা **رضي الله عنها** বর্ণনা করেন:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلًّا وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا.

—রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে দাঁড়ানো ও বসার আদব-
কায়দা তথা আচার-ব্যবহারে আমি আর এতো ঘনিষ্ঠ কাউকে দেখিনি,
যেমনটি দেখেছি হযরত ফাতিমা বিনতে রাসূল ﷺ কে।
তিনি যখন নবী করীম ﷺ এর দরবারে প্রবেশ করতেন,
তখনই নবী পাক ﷺ তাঁর জন্যে দাঁড়াতেন এবং তাঁর
কপালে চুম্বন করতেন, আর নিজের বসার জায়গায় তাঁকে বসাতেন।
আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে প্রবেশ
করলে হযরত ফাতিমা رضي الله عنها তাঁর জন্যে উঠে দাঁড়াতেন এবং তাঁর

মোবারক হাতে চুম্বন করতেন, আর তাঁকে নিজের বসার স্থানে বসাতেন।^{৫৮০}

এই হাদীসে হযরত মা ফাতিমা **رضي الله عنها** এর আপন প্রিয় পিতার জন্যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি এবং তাঁর জন্যে প্রিয়নবী **صلى الله** জন্যে ভালোবাসা ও খুশির অভিব্যক্তি আপনাপনি-ই সুস্পষ্ট হয়। এই একটি মাত্র বর্ণনাতেই আমরা ‘ক্বিয়াম লিল-ফারহা ওয়াল-মাহাব্বা’ এবং ‘ক্বিয়াম লিত তা’যীম’ উভয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

আরেকটি ঘটনায় হযরত আনাস্ বিন মালিক (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন:

رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّسَاءَ وَالصَّبِيَّانَ مُقْبِلِينَ، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّه قَالَ: مِنْ غُرَيْسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمْتَلًا . فَقَالَ: (اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ)؛ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَارٍ.

—সর্বাধিক মর্যাদাবান রাসূল صلی اللہ علیہ وسلم একবার মহিলাদের ও শিশুদের আসতে দেখেন— আমার মনে হয় আনাস رضی اللہ عنه বলেছিলেন, ‘কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান হতে’—অতঃপর নবী পাক صلی اللہ علیہ وسلم দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, “ও আল্লাহ! তোমরা আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ!” তিনি একথা তিন বার বলেন।^{৭৮১}

৫৮০. তিরমিযী, 'জামে' আল-সহীহ: 'কিতাব আল-মানা'ক্বিব', হযরত ফাতিমা (রাহিদায়াছাহ তা'আলা আনহা)'এর দৃষ্টান্তমূলক গুণগত বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক অধ্যায়, ৬:১৭৫ #৩৮৭২; আবু দাউদ, 'সুনান', 'কিতাব আল-আদব', 'রীতিগত দাঁড়ানো (ক্বিয়াম) সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে' শীর্ষক অধ্যায়, ৪:৩৫৫ #৫২১৭; নাসাঈ, 'আল-সুনান আল-কুবরা', ৫:৯৬ #৮৩৬৯; ইবনে হিব্বান, 'আল-সহীহ', ১৫:৪০৩ #৯৯৫৩; হাকিম, 'আল-মুসনাদরাক', ৩:১৭৪ #৪৭৫৩; এবং ইবনে রা'হাওয়াইহ, 'আল-মুসনাদ', ১:৮ #৬।

৫৮১. সহীহ বুখারী: 'কিতাব আল-ফাযায়েল আল-সাহা'বা', 'আনসারদের প্রতি রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর বক্তব্য: তোমরা আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ' শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১৩৭৯ #৩৫৭৪; সহীহ বুখারী: 'কিতাব আল-নিকাহ', 'মহিলা ও শিশুদের বিয়েতে যাওয়া' শীর্ষক অধ্যায়, ৫:১৯৮৫ #৪৫৫৮; সহীহ মুসলিম: 'কিতাব ফাযায়েল আল-সাহা'বা', 'আনসারবৃন্দের দৃষ্টান্তমূলক গুণগত বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৯৮৪ #২৫০৮; আহমদ বিন হাম্বল, 'আল-মুসনাদ,' ৩:১৭৫ #১২,৮২০; এবং ইবনে আবী শায়বা, 'আল-মুসনাদাফ', ৬:৩৯৮ #৩২,৩৫০।

৮.১৮.৩ ক্রিয়াম লিল্ ফারহা বা আনন্দ প্রকাশার্থে দাঁড়ানো

এই ধরনের দাঁড়ানো অত্যধিক সুখ ও খুশির বহিঃপ্রকাশকালে ঘটে থাকে। কারো আগমনে কেউ খুশি হলে তিনি সেই আনন্দের অভিব্যক্তিস্বরূপ উঠে দাঁড়ান। এ বিষয়ে নিচে কিছু হাদীস পেশ করা হলো:

১. হযরত আওন বিন হুজায়ফা رضي الله عنه নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেন:

لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنْ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ، تَلَقَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَانَقَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ: مَا أَذْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَسْرُ: بِفَتْحٍ خَيْرٍ أَوْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ؟

-হযরত জা'ফর رضي الله عنه যখন আবিসিনিয়ায় হিজরতশেষে (মদীনায়) আসেন, তখন রাসূলুল্লাহ صلی الله علیه وسلم তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে উঠে দাঁড়ান; তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কপালে চুম্বন করেন এবং বলেন: “আমি জানি না কোনটি আমাকে বেশি আনন্দিত করছে: খায়বর বিজয়, না জা'ফরের আগমন?”^{৫৮২}

২. মক্কা বিজয়ের সময় হযরত رضي الله عنه ইয়েমেনে আশ্রয় নেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁকে ফেরত আনার ক্ষেত্রে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মোহতারামার সম্পৃক্ততার সুবাদে হযরত ইকরিমা رضي الله عنه মুসলমান হন এবং প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم এর দরবারে হাজির হন। বর্ণনায় বিধৃত হয়েছে:

فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْتَبَشَرَ وَوَتَّبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ فَرِحًا بِقُدُومِهِ.

৫৮২. আল-তাবারানী, ‘আল-মু'জাম আল-কবীর’, ২:১০৮ #১৪৭০; এবং আল-তাহাবী, ‘শরহে মা'আনী আল-আসার’, ৪:৯২ #৬৭৬৪।

-তিনি (ইকরিমা) যখন রাসূলুল্লাহ صلی الله علیه وسلم এর দরবারে পৌঁছেন, তখন হযরত পাক صلی الله علیه وسلم আনন্দে উদ্বেলিত হন এবং তাঁর জন্যে উঠে দাঁড়ান - তিনি নিজ দুই কদম মোবারকে দণ্ডায়মান হন হযরত ইকরিমা رضي الله عنه এর আগমনের খুশিতে।^{৫৮৩}

এই দাঁড়ানো ছিলো ‘ক্রিয়াম লিল-ফারহা,’ যেটা (আবু জেহেলের পুত্র) ইকরিমা رضي الله عنه এর ইসলাম গ্রহণের সূত্রে ঘটেছিলো। প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم এতোখানি আনন্দে উদ্বেলিত ছিলেন যে তিনি তাঁকে স্বাগত জানাতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

৩. একদিন মহানবী صلی الله علیه وسلم হযরত মা আয়েশাহ رضي الله عنها এর ঘরে অবস্থান করছিলেন যখন হযরত যায়দ বিন হারিসা رضي الله عنه দরজায় টোকা দেন। কে এসেছেন বুঝতে পেরে সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল صلی الله علیه وسلم তাঁর জন্যে উঠে দাঁড়ান। এই দাঁড়ানো ছিলো ‘ক্রিয়াম লিল-ফারহা’ ও ‘ক্রিয়াম লিল-ইসতিক্বা'ল’। হাদীসবিদ উলামা এই হাদীসটি আদব/শিষ্টাচারের বইপত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন, যা এর বৈধতার ইঙ্গিতবহ।

হযরত সাইয়েদাহ আয়েশাহ رضي الله عنها বর্ণনা করেন: “হযরত যায়দ ইবনে হা'রিসা رضي الله عنه যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন সবচেয়ে দয়াবান রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে অবস্থান করছিলেন। হযরত যায়দ رضي الله عنه দরজায় টোকা দেন:

فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرْيَانًا يُجْرُ تَوْبَهُ وَاللَّهُ، مَا رَأَيْتُهُ غُرْيَانًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ.

৫৮৩. আল-হাকিম, ‘আল-মুস্তাদরাক’, ৩:২৬৯ #৫০৫৫; এবং আল-বায়হাক্বী, ‘আল-মাদখাল ইলাল-সুনানিল-কুবরা’, পৃষ্ঠা - ৩৯৮ #৭১০।

—প্রিয়নবী ﷺ তাঁর জন্যে খালি শরীরে উঠে দাঁড়ান, নিজ জামা টানতে টানতে। আল্লাহর কসম! আমি ইতিপূর্বে বা পরে আর কখনোই তাঁকে এ রকম অনিয়মিত বেশে (কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে) দেখি নি। তিনি যায়দ عنه رضي الله عنه কে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁর কপালে চুম্বন করেন।^{৫৮৪}

প্রিয়নবী ﷺ হয়রত যায়দ عنه رضي الله عنه এর কণ্ঠস্বর শোনা মাত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের ভালোবাসা ও আনন্দ প্রকাশার্থে তাঁর জন্যে উঠে দাঁড়ান। এই উপায়ে তিনি তাঁর উম্মতকে সঠিক আদব-কায়দা শিক্ষা দেন এ মর্মে যে, যখন কোনো প্রিয়ভাজন কেউ আগমন করেন, তখন তাঁকে স্বাগত জানাতে সবার উঠে দাঁড়ানো উচিত। আপন মহব্বত ও খুশি প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রিয়ভাজনের কপাল চুম্বন করা হলো ‘কিয়াম লিল-ইসতিক্বাল’ ও ‘কিয়াম লিল-ফারহা’-এর পরবর্তী ধাপ।

৮.১৮.৪ কিয়াম লিল্ তা’যিম বা সম্মানার্থে দাঁড়ানো

এই দাঁড়ানোর রীতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, যেখানে সম্মান ও শ্রদ্ধাই (একমাত্র) নিয়ত; যেমন - কোনো ঈমানদারের দণ্ডায়মান হওয়া তাঁরই প্রিয়নবী ﷺ এর জন্যে; কোনো সন্তানের দাঁড়ানো তার পিতার জন্যে; কোনো মুরীদের দাঁড়ানো তার শায়খের জন্যে; কোনো ছাত্রের দাঁড়ানো তার শিক্ষকের জন্যে; ছোটদের দণ্ডায়মান হওয়া তাদের বড়দের জন্যে।

৫৮৪. তিরমিযী, ‘আল-জামে’ আল-সহীহ: ‘কিতাব আল-ইস্তি‘দান ওয়াল-আদাব’, ‘আলিঙ্গন ও চুম্বন সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:৪৫০ #২৭৩২; আল-তাহাবী, ‘শরহে মা‘আনিল আ‘সা‘র’, ৪:৯২ #৬৭৬৫; যায়লাঈ, ‘নসব আল-রায়্যা লি-তাখরিজে আহা‘দীসিল হেদায়া’, ৪:২৫৬; আল-আসক্বালানী, ‘ফাতহুল বারী’, ১১:৫২; এবং আল-আসক্বালানী, ‘আল-ইসা‘বা ফী তাময়ীযিল সাহা‘বা’, ২:৬০১।

৮.১৮.৪.১ কিয়াম লিল্ এসতেক্বাল ও কিয়াম লিল্ তা’যিমের মধ্যকার পার্থক্য

‘কিয়াম লিল-ইস্তিক্বাল’ করা হয় আগমনকারী ব্যক্তির মাঝে আস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং এটা শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রদর্শনের প্রেরণা দ্বারা পরিচালিত নয়। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো বিয়েতে বর পার্টির সাথে আগত মেহমানদের জন্যে দাঁড়ানো। তাঁদের মধ্যে অপরিচিতও থাকতে পারেন, কিন্তু তবু তাঁদের স্বাগত জানানোর জন্যে দণ্ডায়মান হন সবাই। মানুষ অহরহ কোনো নতুন মেহমানের জন্যেও উঠে দাঁড়ান, কিন্তু এই দাঁড়ানো শিক্ষকের জন্যে ছাত্রের বা পীরের জন্যে মুরীদের দাঁড়ানোর সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। অনুরূপভাবে, কেউ উঠে দাঁড়াতে পারেন কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যে; সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল ﷺ এর যিকর-তায়কেরা তথা উল্লেখের সম্মানে; আর নিজের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক পীরের সম্মানেও।

৮.১৮.৪.২ মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মানার্থে সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু)-বৃন্দের চর্চিত দাঁড়ানোর প্রথা

মহান সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم সর্বাধিক মর্যাদাবান রাসূল ﷺ এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর রীতি অনুশীলন করতেন।

১. হয়রত আবু হুরায়রাহ عنه رضي الله عنه বর্ণনা করেন:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَجْلِسِ يُحَدِّثُنَا، فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا، حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضُ بَيُوتِ أَزْوَاجِهِ.

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে (মসজিদে) বসতেন এবং আলাপ-আলোচনা করতেন; অতঃপর যখন তিনি উঠতেন, তখন আমরাও তাঁর (সম্মানে) উঠে দাঁড়াতাম এবং দাঁড়িয়ে থাকতাম যতোক্ষণ না আমরা رضي الله দেখতে পেতাম তিনি তাঁর কোনো একজন পবিত্র বিবি সাহেবা عنها এর ঘরে প্রবেশ করেছেন।^{৫৮৫}

ওপরের হাদীস হতে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই মজলিশ ত্যাগ করার জন্যে উঠে দাঁড়াতেন, তৎক্ষণাৎ মহান সাহাবা رضي الله عنه ও তাঁর জন্যে উঠে দাঁড়াতেন। হাদীসের বক্তব্য - ‘তিনি যখন উঠতেন, আমরাও তাঁর (সম্মানে) উঠে দাঁড়িয়ে থাকতাম’ - স্পষ্ট ইঙ্গিত করে সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম মণ্ডলী সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াতেন এবং তিনি তাঁর কোনো পবিত্র বিবি সাহেবা عنها এর ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তাঁরা দাঁড়িয়েই থাকতেন। এটা ছিলো তাঁদের দৈনন্দিন আচরিত রীতি, হঠাৎ কোনো একদিনের ঘটনা নয়।

সর্বাধিক সম্মানিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিশ ত্যাগের জন্যে উঠে দাঁড়ালেও মজলিশ জারি থাকতো। এটা এই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয় না যে তিনি যখন স্থান ত্যাগ করতে নিতেন, তখন কেউই তাঁকে বেরোবার পথে থামিয়ে নিজের হাজত/প্রয়োজন পূরণের জন্যে তাঁকে অনুরোধ করতেন না। এই উপায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে পৌঁছানোর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কিছু সময় পেরোতো। এতদসত্ত্বেও মহান সাহাবা কেলাম رضي الله عنهم বন্দ দাঁড়িয়ে থাকতেন, যতোক্ষণ না তিনি তাঁর পবিত্র ঘরে

৫৮৫. আবু দাউদ, ‘আল-সুনান’: ‘কিতাব আল-আদব’, ধৈর্য ও প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য শীর্ষক অধ্যায়, ৪:২৪৭ #৪৭৭৫; আল-বায়হাকী, ‘শুয়াবুল ইমান’, ৬:৪৬৭ #৮৯৩০; আল-বায়হাকী, ‘আল-মাদখাল ইলাল-সুনানিল-কুবরা’, ৪০১ পৃষ্ঠা #৭১৭; এবং আল-আসকালানী, ‘ফাতহুল বারী’, ১১:৫২।

প্রবেশ করতেন; আর তাঁরা তাঁকে ত্যাগ করে ঘরে প্রত্যাবর্তন করতেন না। এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে, এই ক্বিয়াম ছিলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানার্থে।

২. রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানে সাইয়েদাহ ফাতিমা رضي الله عنها ও দণ্ডায়মান হতেন, যেমনিভাবে মা আয়েশাহ رضي الله عنها বর্ণনা করেন:

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا.

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে প্রবেশ করলে হযরত ফাতিমা رضي الله عنها তাঁর জন্যে উঠে দাঁড়াতেন এবং তাঁর মোবারক হাতে চুম্বন করতেন, আর তাঁকে নিজের বসার স্থানে বসাতেন।^{৫৮৬}

৩. হযরত ‘আমর ইবনে সা’ইব عنه رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে নিম্নের হাদীসটি তাঁর কাছে বর্ণনা করা হয়েছিলো:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا فَأَقْبَلَ أَبُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهَا شِقَّ ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ، فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ أَخُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَامَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.

৫৮৬. তিরমিযী, ‘জামে’ আল-সহীহ: ‘কিতাব আল-মানা’কিব’, হযরত ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দৃষ্টান্তমূলক গুণগত বৈশিষ্ট্য শীর্ষক অধ্যায়, ৬:১৭৫ #৩৮৭২; আবু দাউদ, ‘সুনান’, ‘কিতাব আল-আদব’, ‘রীতিগত দাঁড়ানো (ক্বিয়াম) সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:৩৫৫ #৫২১৭; নাসাঈ, ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ৫:৯৬ #৮৩৬৯; ইবনে হিব্বান, ‘আল-সহীহ’, ১৫:৪০৩ #৯৯৫৩; হাকিম, ‘আল-মুসতাদরাক’, ৩:১৭৪ #৪৭৫৩; এবং ইবনে রা’হাওয়াইহ, ‘আল-মুসনাদ’, ১:৮ #৬।

—একদিন রাসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর পালক পিতা আগমন করেন। অতঃপর তিনি আপন চাদর বিছিয়ে দেন তাঁর (বসার) জন্যে। এরপর তাঁর পালক মাতা আগমন করেন, আর তিনি নিজ চাদরের বাকি অর্ধেক অংশ বিছিয়ে দিয়ে তাঁকে বসান। এরপর তাঁর পালক ভাই এলে তিনি উঠে দাঁড়ান এবং তাঁকে তাঁর সামনে বসান।^{৫৮৭}

ওপরে উদ্ধৃত হাদীস দ্বারা প্রিয়নবী صلی اللہ علیہ وسلم এর আচরিত রীতি হতে ‘কিয়াম লি ত’-যীম’ (সম্মানার্থে দাঁড়ানো) সাবিত তথা সপ্রমাণিত হয়।

৪. হযরত উম্মে ফযল رضي الله عنها হতে বর্ণিত:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَاهُ، قَامَ إِلَيْهِ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ أَفْعَدَهُ عَنْ يَمِينِهِ.

অর্থ: নবী পাক صلی اللہ علیہ وسلم আসেন এবং যখন তিনি (চাচা) হযরত আব্বাস رضي الله عنه কে দেখতে পান, তখন তিনি তাঁর জন্যে উঠে দাঁড়ান, আর তাঁর পবিত্র কপালে চুম্বন করেন; অতঃপর তিনি হযরত আব্বাস رضي الله عنه কে তাঁর ডান পাশে বসান।^{৫৮৮}

৫৮৭. আবু দাউদ, ‘সুনান’: ‘কিতাবুল আদব’, ‘পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:৩৩৭ #৫১৪৫; ক্বাযউইনী, ‘আল-তাদউয়ীন ফী আকবরী ক্বাযউইন’, ২:৪৫৫; এবং আল-আসক্বালানী, ‘ফাতহুল বারী’, ১১:৫২।

৫৮৮. তাবরানী, ‘আল-মু’জামুল আওসাত’, ১০:১১৬ #৯২৪৬; তাবরানী, ‘আল-মু’জামুল কবীর’, ১০:২৩৫ #১০,৫৮০; আল-হায়সামী, ‘মজমা’আ যওয়াঈদ ওয়া মানবা’ আল-ফাওয়াঈদ’, ৯:২৭৫; এবং খতীব বাগদাদী, ‘তারীখে বাগদাদ’, ১:৬৩।

৮.১৮.৪.৩ নামায আল্লাহরই জন্যে; একামত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্যে

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মতানুসারে, ওয়াক্জিয়া (মানে প্রাত্যহিক রীতিগত) নামাযে দণ্ডায়মান হবার সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি হচ্ছে যখন ‘হাইয়া আলাস্ সালাহ’ ও ‘ক্বাদ ক্বা’মাত আস্ সালাহ’ বাক্যগুলো উচ্চারিত হয়। তবে খুব কম মানুষই জানেন এর সূচনা কীভাবে হয়েছিলো এবং এর পেছনে কী প্রেরণা কাজ করেছিলো। একামত পঠিত হওয়ার সময় এই যে দাঁড়ানোর প্রথা, এটা আসলে প্রিয়নবী صلی اللہ علیہ وسلم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিলো। এটা ছিলো সাহাবা-এ কেরাম رضي الله عنهم এর অভ্যাস/স্বভাব এ মর্মে যে, নামাযে একামত পাঠের সময় রাসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم বেরিয়ে এলে তাঁরা তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াতেন।

এই উপায়ে এ দাঁড়ানো একামতের জন্যে ছিলো না, বরঞ্চ সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রাসূল صلی اللہ علیہ وسلم এর সম্মানে ছিলো, যাতে সবাই সচেতন হতে পারেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করেছেন। এরই ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে, মহান সাহাবা কেরাম رضي الله عنهم এর ওয়াক্জিয়া নামায ছিলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে, আর একামাত ছিলো সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্যে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক, যা আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে নিচে:

আমাদের এ যুগে নামাযের ওয়াক্জ নির্ধারিত হয় ঘণ্টা ও মিনিট হিসেবে। আযান দেয়া হয় নির্ধারিত সময়ে, আর এরপর একামত দেয়া হয়। এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায়: প্রিয়নবী صلی اللہ علیہ وسلم এর (যাহেরী) হাযাতে জিন্দেগীতে ওয়াক্জিয়া নামায কীভাবে ক্বায়েম হতো? এর উত্তর হলো, মহান সাহাবা-এ কেরাম رضي الله عنهم ফরয নামাযের আযান শোনার পর মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং সুন্নাহ নামায আদায়শেষে সারিবদ্ধ হয়ে

বসে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রাসূল ﷺ এর আগমনের জন্যে প্রতীক্ষারত থাকতেন। ওয়াক্জিয়া নামাযের সময়টুকু ছিলো প্রিয়নবী ﷺ যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন স্রেফ তখনই; তিনি প্রবেশ না করা পর্যন্ত সবাই উপবিষ্ট থাকতেন। এটাই ছিলো সাহাবা رضي الله عنهم বৃন্দের অনুসৃত নিয়ম।

প্রিয়নবী ﷺ এর মুয়াজ্জিন হযরত বিলাল বিন রাবাহ رضي الله عنه আযান দেয়ার পরে (মসজিদের) এক কোণায় দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র হজরাহ/প্রকোষ্ঠগুলোর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাঁরই আগমনের জন্যে আগ্রহভরে অপেক্ষা করতেন। মহান সাহাবা কেলাম رضي الله عنهم-ও অনুরূপভাবে প্রতীক্ষারত থাকতেন তাঁর ইমামতিতে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে। হযরত বিলাল رضي الله عنه পর্দা সেরে যাওয়ার আওয়াজের জন্যে ধৈর্যসহ অপেক্ষা করতেন; তিনি যখনই তা সরানোর আওয়াজ পেতেন, তৎক্ষণাৎ প্রথম সারিতে এগিয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করতেন -“আল্লাহু আকবর; আল্লাহু আকবর।” এতে মহান সাহাবায়ে কেলাম رضي الله عنهم জেনে যেতেন যে প্রিয়নবী ﷺ আগমন করেছেন এবং তাঁরা তখন পরম ভক্তিশ্রদ্ধাসহ (নামাযে) সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতেন। এটা ছিলো ‘ক্বিয়াম লিত্ তা’যীম’ (সম্মানার্থে দাঁড়ানো), যা সুন্নাহ’র আকারে ইসলামের একটি নিদর্শনে পরিণত হয়েছে।

১. হযরত জাবির ইবনে সামুরা رضي الله عنه বর্ণনা করেন:

كَانَ بِلَالٌ يُؤَدِّنُ إِذَا دَخَصَتْ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يُخْرِجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ .

—হযরত বিলাল رضي الله عنه আযান দিতেন। প্রিয়নবী ﷺ বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত তিনি একমত পাঠ করতেন না। তাঁকে দেখার পরই তিনি নামাযের একমত পাঠ করতেন।^{৫৮৯}

সাইয়েদুনা বিলাল رضي الله عنه ওয়াক্জিয়া নামাযের জন্যে সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল ﷺ কে ডাকতে যেতেন না। একমতের উদ্দেশ্য ছিলো মহান সাহাবা رضي الله عنهم বৃন্দকে জানানো যে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান নবী ﷺ বেরিয়ে এসেছেন; আর তাই তাঁদের উচিত তাঁরই সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া। এমন কী আজো একমতের দাঁড়ানোর রীতিটি মহান সাহাবা رضي الله عنهم মণ্ডলীর পালিত ওই সুন্নাহ অনুসরণেরই একটি মাধ্যম; এটা ‘ক্বিয়াম লিল-ইসতিক্বাল’ ও ‘ক্বিয়াম লিত্ তা’যীম’।

হযরত বিলাল رضي الله عنه এর দাঁড়ানো ছিলো একমতের সূচনার উদ্দেশ্যে, আর সাহাবা-এ কেলাম رضي الله عنهم এর দণ্ডায়মান হওয়া ছিলো সবচেয়ে সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে। ইমাম কাজী আযাজ (৪৭৬-৫৪৪ হিজরী)-ও এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ওই দুটো কিসিমের কথা উল্লেখ করেন। তিনি ওগুলোর পার্থক্য তুলে ধরে বলেন:

بِأَنَّ بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُرَاقِبُ خُرُوجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَاهُ غَيْرُهُ أَوْ إِلَّا الْقَلِيلَ، فَلَأَوَّلِ خُرُوجِهِ أَقَامَ هُوَ: ثُمَّ لَا يَقُومُ النَّاسُ حَتَّى يَظْهَرَ لِلنَّاسِ وَيَرَوْهُ، ثُمَّ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ حَتَّى يَعْدِلُوا صُفُوفَهُمْ.

৫৮৯. সহীহ মুসলিম: ‘কিতাবুস্ সালাহ’, ‘মানুষের কখন নামাযে দাঁড়ানো উচিত’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:৪২৩ #৬০৬; আল-তিরমিযী, ‘আল-জামেউস্ সহীহ’: ‘কিতাবুস্ সালাহ’, ‘নামাযে ইমামতির জন্যে যোগ্যতর ইমাম সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:৩৯১ #২০২; আহমদ বিন হাম্বল, ‘আল-মুসনাদ’, ৫:১০৪ #২১,০৩৯; এবং আবু আওয়ানা, ‘আল-মুসনাদ’, ১:৩৭২ #১৩৫০।

অর্থ: প্রিয়নবী ﷺ এর জন্যে হযরত বিলাল عنه رضي الله عنه এমন এক স্থানে প্রতীক্ষারত থাকতেন, যেখানে কেউ তাঁকে দেখতে পেতেন না, অথবা গুটি কয়েকজন দেখতে পেতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মসজিদে প্রবেশের মুহূর্তেই তিনি একামত পাঠ করতেন; আর কেউই তাঁর দৃশ্যমান হবার আগে বা নিজেদের কাছে দৃষ্টিগোচর হবার আগে দাঁড়াতেন না। প্রিয়নবী ﷺ তাঁর (নির্দিষ্ট) স্থানে দাঁড়াতেন না, যতোক্ক্ষণ না তাঁরা কাতার/সারি সোজা করে দণ্ডায়মান হতেন।^{৫৯০}

ইমাম কাজী আযাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বলেন:

وَفِيهِ أَنَّ الْفَيْمَ لِلصَّلَاةِ لَا يَلْتَزِمُ بِالْإِقَامَةِ أَوْ قَوْلِهِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَوْ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، عَلَى مَا نَذَرُ مِنْ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّمَا يَلْتَزِمُ بِخُرُوجِ الْإِمَامِ .

—এ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, ওয়াক্জিয়া নামায়ে দণ্ডায়মান হওয়া একামত দ্বারা আবশ্যিক হয় না, কিংবা ‘ক্বাদ ক্বামাতুস্ সোয়ালাহ’ বা ‘হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ’ বাক্যগুলো দ্বারা আবশ্যিক হয় না, যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি উলামাবৃন্দের মতপার্থক্য হতে। তা কেবল আবশ্যিক হয় ইমামের আগমন দ্বারাই।^{৫৯১}

ইমাম বদরুদ্দীন আঈনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই বিষয়ে বিবৃত করেন:

وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ بِلَا لَّا كَانَ يُرَاقِبُ خُرُوجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَاهُ غَيْرُهُ أَوْ إِلَّا الْقَلِيلَ، فَعِنْدَ أَوَّلِ خُرُوجِهِ يُقِيمُ وَلَا يَقُومُ النَّاسُ حَتَّى يَرَوْهُ، ثُمَّ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ حَتَّى يُعَدَّلَ الصُّفُوفُ .

—এই দুটোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপায় হচ্ছে এই যে, হযরত বিলাল রাহিমাতুল্লাহু তা‘আলা আনহু প্রিয়নবী ﷺ এর জন্যে এমন

এক স্থানে প্রতীক্ষারত থাকতেন যেখানে তাঁকে কেউই দেখতে পেতেন না, অথবা গুটি কয়েকজন দেখতে পেতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মসজিদে প্রবেশের মুহূর্তেই তিনি একামত পাঠ করতেন; এবং কেউই রাসূল ﷺ এর দৃশ্যমান হবার আগে দাঁড়াতেন না। প্রিয়নবী ﷺ তাঁর (নির্দিষ্ট) স্থানে দাঁড়াতেন না, যতোক্ক্ষণ না কাতার/সারি সোজা করা হতো।^{৫৯২}

হযরত বিলাল عنه رضي الله عنه এর জন্যে এটা ছিলো সর্বাধিক সম্মানিত নবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার পূর্ণতাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এ মর্মে যে, একমাত্র তিনি-ই সর্বপ্রথমে তাঁকে দেখতে পাবেন। মাহবুব ﷺ এর জামাল তথা সৌন্দর্য দর্শন তাঁর নয়নযুগল-ই সবার চোখের আগে প্রত্যক্ষ করুক, এই ছিলো তাঁর কামনা। ‘আল্লাহু আকবর,’ ‘আল্লাহু আকবর’ বাক্যটির ঘোষণার মাধ্যমে জানানো হতো যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন, আর মহান সাহাবা কেরাম রাহিমাতুল্লাহু তা‘আলা আনহু এতদশ্রবণে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে গ্রহণ করতেন। এটাই ছিলো তাঁদের নিয়মিত অনুশীলন।

উপরন্তু, কখনো কখনো এরকমও হতো যে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রাসূল সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অশীর্বাদপূর্ণ ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন নিজস্ব কোনো প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে, আর মহান সাহাবা কেরাম رضي الله عنهم তিনি নামায়ে ইমামতি করতে বেরিয়েছেন মনে করে উঠে দাঁড়াতেন এবং কাতার/সারি সোজা করতেন। এই ঘটনা বেশ কয়েকবার হওয়ার পরে প্রিয়নবী ﷺ তাঁদেরকে আদেশ করেন তাঁরা যেনো কেবল তাঁর নির্দিষ্ট নামাযের জায়গায় আসার পরই কাতারবদ্ধ হন। এই উপায়ে এ নির্দেশটি ‘হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ’ বা

৫৯০. কাজী আযাজ, ‘ইকমাল আল-মুয়াল্লিম বি-ফাওয়াইদে মুসলিম’, ২:৫৫৬-৫৫৭।

৫৯১. প্রাণ্ডু কাজী আযাজ, ‘ইকমাল আল-মুয়াল্লিম বি-ফাওয়াইদে মুসলিম’, ২:৫৫৬।

৫৯২. ইমাম আঈনী, ‘উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহ বুখারী’, ৫:১৫৪।

‘ক্বাদ ক্বামাতুস্ সোয়ালাহ’ বাক্যগুলো পঠিত হবার সময় জামাআতে (নামাযে) দণ্ডায়মান হওয়ার ভিত্তি হয়ে যায়।

২. হযরত আবু সালামা বিন আবদির রহমান বিন আউফ رضي الله عنه বিবৃত করেন যে তিনি হযরত আবু হুরায়রাহ رضي الله عنه কে শুনেছেন এ কথা বলতে:

أَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَعَدَلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مَضَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ وَقَالَ لَنَا: ((مَكَانَكُمْ)) فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا .

صلى الله عليه رضي الله عنه একামত পাঠ করা হলে রাসূলুল্লাহ (একবার নামাযে) একামত পাঠ করা হলে রাসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم আমাদের কাছে বেরিয়ে আসার আগে আমরা কাতার/সারি সোজা করি। অতঃপর তিনি বেরিয়ে আসেন এবং তাকবীর বলার আগে তাঁর নির্দিষ্ট জায়গায় দণ্ডায়মান হন; এমন সময় (কিছু একটা) স্মরণ করে তিনি ফেরত যান। যাওয়ার সময় আমাদের বলেন, “তোমাদের স্থানে অবস্থান করো।” তাই আমরা নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি, যতোক্ষণ না তিনি (আবার) আমাদের কাছে বেরিয়ে আসেন।^{৫৯৩}

অতএব, মহান সাহাবা-এ কেরাম رضي الله عنهم এর এটা একটা নিয়মিত অনুশীলন ছিলো যে, তাঁরা সর্বাধিক সম্মানিত রাসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم এর নিজ পবিত্র ঘর বা অন্য কোথাও থেকে বেরিয়ে আসা নির্বিশেষে

৫৯৩. মুসলিম, ‘সহীহ’: ‘কিতাবুস্ সালাহ’, ওয়াক্ফিয়া নামাযে মানুষের কখন দাঁড়ানো উচিত? শীর্ষক অধ্যায়, ১:৪২২ #৬০৫; এবং বায়হাকী, ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ২:৩৯৮ #৩৮৭৪।

তাঁকে দেখা মাত্র তাঁর জন্যে দাঁড়াবেন। তাঁদের এই ক্বিয়াম ছিলো সম্মানার্থে। এটা নিম্নের হাদীসগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয়:

৩. হযরত আবু ক্বাতাদা رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এরশাদ ফামান:

إِذَا أُقِيَمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي.

—একামত পঠিত হলে দাঁড়াবেন না, যতোক্ষণ পর্যন্ত না আমাকে দেখতে পাও।^{৫৯৪}

ওপরে উদ্ধৃত এই হাদীস, যা লিপিবদ্ধ হয়েছে সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও জামেউত-তিরমিযী গ্রন্থগুলোতে, তাতে রয়েছে প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم কর্তৃক তাঁর মহান সাহাবা কেরাম رضي الله عنهم দ্বিতীয় এক নির্দেশ, যার ফলশ্রুতিতে তাঁদের অভ্যেসে এক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মুহাদ্দেসীন তথা হাদীস-শাস্ত্রবিদ উলামামণ্ডলীর মতানুসারে তাকবীর শ্রুত হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেকের উঠে দাঁড়ানো উচিত।

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদীসটি ‘কিতাবুল আযান’ বইয়ের ‘একামত পাঠের সময় ইমামকে দেখা গেলে মানুষদের কখন দণ্ডায়মান হওয়া উচিত?’ শীর্ষক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেন; ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ‘কিতাব আল-মসজিদ ওয়া মাওয়া’দি আল-সালাহ’ বইয়ের ‘নামাযের জন্যে মানুষদের কখন দাঁড়ানো উচিত?’ শীর্ষক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেন; আর ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তা লিপিবদ্ধ করেন ‘কিতাব আল-জুমুআ’ বইয়ের ‘নামাযের শুরুতে দণ্ডায়মান

৫৯৪. সহীহ বুখারী, ‘কিতাবুল আযান’, ‘একামত পাঠের সময় ইমামকে দেখা গেলে মানুষদের কখন দণ্ডায়মান হওয়া উচিত?’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:২২৮ #৬১১; সহীহ মুসলিম, ‘কিতাব আল-মসজিদ ওয়া মাওয়া’দি আল-সালাহ’, ‘নামাযের জন্যে মানুষদের কখন দাঁড়ানো উচিত?’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:৪২২ #৬০৪; এবং জামেউল তিরমিযী, ‘কিতাব আল-জুমুআ’, ‘নামাযের শুরুতে দণ্ডায়মান অবস্থায় মানুষদের দ্বারা ইমামের জন্যে অপেক্ষমান থাকার দৃশ্যীয় রীতি’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:২৮৭ #৫৯২।

অবস্থায় মানুষদের দ্বারা ইমামের জন্যে অপেক্ষমান থাকার দুষণীয় রীতি' শীর্ষক অধ্যায়ে।

উক্ত ইমামবৃন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম এই অধ্যায়গুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন এই মর্মে যে, সেগুলোতে বিদ্যমান হাদীসসমূহ কিয়াম তথা দাঁড়ানো-সংক্রান্ত। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো মানুষকে জানানো যে, ইমাম সাহেব উপস্থিত বা অনুপস্থিত থাকাকালীন ওয়াক্জিয়া নামাযের প্রাক মুহূর্তে তাঁদের কখন উঠে দাঁড়ানো উচিত। তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম সাহেবকে দেখা মাত্র একামত পাঠের সময় মানুষদের উঠে দাঁড়াতে হবে, ঠিক যেমনটি মহান সাহাবা رضي الله عنهم মণ্ডলী নিজেদের ইমাম ও সকল নবী-রাসূল আলাইহিমুস্ সালামের ইমাম, সবচেয়ে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন রাসূল صلى الله عليه وسلم কে দেখলে উঠে দাঁড়াতেন।

“একামত পাঠিত হলে দাঁড়াবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাকে দেখতে পাও”-إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي-রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এর এ আজ্ঞাটি এক গভীর চিন্তার খোরাক বটে। প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন যদি এতে উদ্ভিষ্ট না হতো, তাহলে তাঁকে আসতে দেখে সাহাবা কেবল رضي الله عنهم উঠে দাঁড়াতে তিনি আদেশ-ই করতেন না। বরঞ্চ তিনি তাঁদেরকে তাকবীর ও একামত পাঠ শ্রুত হওয়ার সাথে সাথেই দণ্ডায়মান হতে নির্দেশ দিতেন। এটা এক্ষণে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ওই কিয়াম/দাঁড়ানো প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর জন্যে খাস/সুনির্দিষ্ট ছিলো এবং তা ওয়াক্জিয়া নামাযের খাতিরে ছিলো না; কেননা এটা ছিলো কিয়াম লিল-ইস্তিক্বাল এবং কিয়াম লিত্ তা'যীম।

৪. নিচের এ হাদীসটি হযরত আবু ক্বাতাদা رضي الله عنه হতে ভিন্ন একটি সনদে (বর্ণনাকারীদের পরম্পরায়) ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন, আর এতে বিবৃত হয়েছে যে মহানবী صلى الله عليه وسلم ফরমান:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ.

—যখন ইকামত পাঠ করা হবে, তখন আমাকে না দেখা পর্যন্ত উঠে দাঁড়াবে না- (কেননা) তোমাদের প্রতি শান্ত-সৌম্যভাব বিধান করা হয়েছে (মানে কিয়ামের জন্যে তাড়াহুড়ো আচরণ কোরো না)।^{৫৬৫}

এই হাদীসটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট ব্যক্ত করে যে, ওয়াক্জিয়া নামাযের সময় প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم কে না দেখা পর্যন্ত সাহাবা رضي الله عنهم বৃন্দের দণ্ডায়মান হওয়া উচিত নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাকবীরে তাহরীমা পাঠের সময় উঠে দাঁড়ানো আল্লাহর জন্যে (খাস), আর ইকামতের সময় দণ্ডায়মান হওয়া সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল صلى الله عليه وسلم এর খাতিরে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক ওয়াক্জিয়া নামায সুনির্দিষ্ট করেছেন নিজেরই জন্যে, আর ইকামত সুনির্দিষ্ট করেছেন সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রাসূল صلى الله عليه وسلم এরই জন্যে। অতএব, ওয়াক্জিয়া নামাযের সময় হলে প্রথম কিয়ামটি সাধিত হয় প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর উদ্দেশ্যে, পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় কিয়ামটি সাধিত হয় সর্বশক্তিমান আল্লাহর উদ্দেশ্যে।

৫. ইসহাক্ব (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সর্ব-হযরত মু'আম্মার ও শায়বান রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে অতিরিক্ত এই কথাগুলো বর্ণনা করেন:

حَتَّى تَرَوْنِي فَذَخَرَجْتُ.

—যতক্ষণ না তোমরা আমাকে দেখতে পাও যে আমি বেরিয়ে এসেছি (ওয়াক্জিয়া নামাযের উদ্দেশ্যে)।^{৫৬৬}

৫৬৫. সহীহ বুখারী, 'কিতাবুল আযান': 'নামাযের জন্যে তাড়াহুড়ো না করা এবং শান্ত-সৌম্যভাবে উঠে দাঁড়ানো' শীর্ষক অধ্যায়, ১:২২৮ #৬১২; এবং সহীহ ইবনে হিব্বান, ৫:৫১ #১৭৫৫।

৫৬৬. সহীহ মুসলিম: 'কিতাবুল আযান', 'ওয়াক্জিয়া নামাযে মানুষদের কখন দাঁড়ানো উচিত?' শীর্ষক অধ্যায়, ১:৪২২ #৬০২; আল-তিরমিযী, 'আল-জামেউস্ সহীহ', 'কিতাবুল

লোকে ‘সহীহ মুসলিম’ অধ্যয়ন করে ঠিক, কিন্তু (এর রচয়িতা) ইমাম সাহেব যে বিষয়টি বোঝাতে চাইছেন তা তারা অনুধাবন করতে একেবারেই অক্ষম। সহীহ মুসলিম গ্রন্থের নিম্নবর্ণিত শব্দচয়ন ও সাহায্যে কেরাম رضي الله عنهم এর এতদসংক্রান্ত ভাষ্য বিষয়টি দিবালোকের মতো পরিষ্কার করবে। এই হাদীসটি সর্বোচ্চ মর্যাদাবান নবী صلى الله عليه এর প্রতি এশকু-মহব্বতে অনুপ্রাণিত। হযরত আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه বর্ণনা করেন:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَأَنَّ تَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—নিশ্চয় ওয়াজিয়া নামাযের (কিয়াম) প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর জন্যে করা হতো।

অধিকন্তু, হযরত আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه আরো ব্যাখ্যা করেন যে ইকামত শ্রেফ রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এর খাতিরেই করা হতো। নিচে এর কারণ ব্যাখ্যা করা হলো:

فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَقَامَهُ.

—নবী পাক صلى الله عليه وسلم নিজস্ব (নামাযের) স্থানে দণ্ডায়মান হবার আগেই মানুষেরা (নামাযের) কাতার/সারিবদ্ধ হতেন।^{৫৯৭}

জুমআ’, ‘নামাযের শুরুতে দণ্ডায়মান অবস্থায় মানুষদের দ্বারা ইমামের জন্যে অপেক্ষমান থাকার দৃষ্টীয় রীতি’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:৪৮৭ #৫৯২; ‘সুনানে আবী দাউদ’, ‘কিতাবুস সালাহ’, ‘ওয়াজিয়া নামাযে ইকামত পঠিত হলে এবং ইমাম আগমন না করলে তাঁর জন্যে বসে অপেক্ষা করা উচিত’, শীর্ষক অধ্যায়, ১:১৪৮ #৫৪০; আবু আওয়ানা, ‘আল-মুসনাদ’, ২:২৮; আবদুল হামীদ, ‘আল-মুসনাদ’, ১:৯৫ #১৮৯; এবং আল-বায়হাকী, ‘আল-সুনান আল-কুবরা’, ২:২০ #২১২০।

৫৯৭. সহীহ মুসলিম, ‘কিতাবুস সালাহ’, ‘ওয়াজিয়া নামাযে মানুষদের কখন দাঁড়ানো উচিত?’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:৪২৩ #৬০৫; এবং সুনানে আবী দাউদ, ‘কিতাবুস সালাহ’, ‘ওয়াজিয়া নামাযে ইকামত পঠিত হলে এবং ইমাম আগমন না করলে তাঁর জন্যে বসে অপেক্ষা করা উচিত’, শীর্ষক অধ্যায়, ১:১৪৮ #৫৪১।

এই হাদীস স্পষ্ট ব্যক্ত করে যে, ইকামত (এ উদ্দেশ্যে) পাঠ করা হতো যাতে রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم কর্তৃক ওয়াজিয়া নামাযে নিজ স্থান গ্রহণ করে ইমামতি করার আগেই মানুষেরা কাতার সোজা করতে এবং দণ্ডায়মান হতে পারেন। হযরত আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه এই কথা বলেন নি মানুষেরা ওয়াজিয়া নামাযের জন্যে কাতার সোজা করতেন, বরং তাঁরা প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর দ্বারা নিজ স্থান গ্রহণের আগে তাঁরই সম্মানার্থে কাতার সোজা করতেন এবং দাঁড়াতেন। এই রওয়য়াত/বর্ণনা আরো খোলাসা করে যে, ওই দাঁড়ানো প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর জন্যে সুনির্দিষ্ট/খাস ছিলো এবং তা ওয়াজিয়া নামাযের জন্যে ছিলো না; কেননা তা ছিলো ‘কিয়াম লিল ইসতিক্বাল এবং ‘কিয়াম লিত তা’যীম।’

৮.১৮.৫ মানুষের মর্যাদার জন্যে দাঁড়ানো (কিয়াম লিল একরাম আল-ইনসানি)

ইত্তেকালপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ‘ইকরাম লিল ইনসান’-এর আওতায় পড়ে। এটা রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এর সুল্লাহ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। জানাযার শব যাত্রা অতিক্রম করার সময় সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়ানো প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এরই অনুশীলিত আচার ছিলো; এমন কী মৃত ব্যক্তি অ-মুসলিম হলেও তিনি এ প্রথা অনুশীলন করতেন। (তাঁর) শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এই আচরণ ছিলো মানবের (তথা মানবতার) খাতিরে।

১. আমির বিন রাবি’আ رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم ফরমান:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تَخْلَفَكُمْ.

—তোমরা কোনো জানাযার শব যাত্রা দেখতে পেলে (সম্মানার্থে) দণ্ডায়মান হও, যতোক্ক্ষণ না তা তোমাদের অতিক্রম করে যায়।

২. অপর এক বর্ণনায় আমির ইবনে রাবি'আ رضي الله عنه বর্ণনা করেন মহানবী صلى الله عليه وسلم এর বাণী:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلَّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ.

—তোমরা কোনো জানাযার শব যাত্রা দেখতে পেলে (সম্মানার্থে) দণ্ডায়মান হও, যতোক্ক্ষণ না তা তোমাদের অতিক্রম করে, অথবা (কবরে) শায়িত করা হয়।^{৫৯৮}

নবী পাক صلى الله عليه وسلم এর এই আদেশটি মানব দেহের মর্যাদার খাতিরে (প্রদত্ত)।

৩. মানবের মর্যাদা বিষয়ে ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিজরী) নিজ 'সহীহ' গ্রন্থে জনৈক ইহুদী-সম্পর্কিত একটা হাদীস বর্ণনা করেন, যেটা 'কিতাবুল জানায়েয' বইয়ে 'মান ক্বামা লি-জানাযা এয়াহুদী' শীর্ষক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে। হযরত জাবির বর্ণনা করেন:

مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةً، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا لَهُ.

—একটি জানাযার শব যাত্রা আমাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলো; আর রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم সেটার জন্যে উঠে দাঁড়ান এবং আমরাও তাঁর জন্যে উঠে দাঁড়াই।

৫৯৮. সহীহ মুসলিম, 'কিতাবুল জানায়েয', 'জানাযার (শবের) জন্যে দাঁড়ানো' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৬৫৯ #৯৫৮; তিরমিযী, 'জামেউস্ সহীহ', 'কিতাবুল জানায়েয', 'জানাযার (শবের) জন্যে দাঁড়ানো সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে' শীর্ষক অধ্যায়, ৩:৩৬০ #১০৪২; আবু দাউদ, 'আল-সুনান', 'কিতাবুল জানায়েয', 'জানাযার (শবের) জন্যে দাঁড়ানো' শীর্ষক অধ্যায়, ৩:২০৩ #৩১৭২; ইবনে মাজাহ, 'আল-সুনান', 'কিতাবুল জানায়েয', 'জানাযার (শবের) জন্যে দাঁড়ানো সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে' শীর্ষক অধ্যায়, ১:৪৯২ #১৫৪২; এবং আল-হাকিম, 'আল-মুসতাদরাক', ৩:৪০৪ #৫৫৩৭।

এখানে মহান সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم এর অনুশীলিত আদব-কায়দার প্রতি প্রত্যেকের লক্ষ্য করা উচিত; তাঁরা বসে থাকেন নি, বরং সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল صلى الله عليه وسلم কে দাঁড়াতে দেখে তাঁরাও তৎক্ষণাৎ কাল বিলম্ব না করে তাঁরই খাতিরে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তবে তাঁরা যা অনুভব করেছিলেন, তা তাঁরা মহানবী صلى الله عليه وسلم কে জানিয়েছেন এই বলে:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ؟

—হে আল্লাহর রাসূল! এ তো এক ইহুদীর শেষকৃত্য।

সাহাবা رضي الله عنهم বৃন্দের বক্তব্য শ্রবণ শেষে প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم ফরমান:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا.

—তোমরা জানাযার (শব যাত্রা) দেখলে দণ্ডায়মান হও।^{৫৯৯}

মুসলমান বা ইহুদী নির্বিশেষে যখনই কোনো শব যাত্রা অতিক্রম করে, তৎক্ষণাৎ সম্মানার্থে প্রত্যেকের উঠে দাঁড়ানো উচিত। এই দণ্ডায়মান হওয়া কোনো মরদেহের মর্যাদার সূত্রে হয়ে থাকে। মানবতার ক্ষেত্রে মুসলমান ও ইহুদীর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; উভয়েই মানুষ। অতএব, মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ উভয়েরই মরদেহ সম্মান পাওয়ার অধিকার রাখে।

এই বিষয়ে অনুরূপ হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছেন সর্ব-ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।^{৬০০}

৫৯৯. সহীহ বুখারী, 'কিতাবুল জানায়েয', 'জানাযার (শবের) জন্যে দাঁড়ানো' শীর্ষক অধ্যায়, ১:৪৪১ #১২৪৯; আহমদ ইবনে হাম্বল, 'মুসনাদ', ৩:৩৫৪; আল-তাহাবী, 'শরহু মা'আনী আল-আ'সার': 'কিতাব আল-জানায়েয', 'মানুষের সামনে দিয়ে কোনো শব যাত্রা অতিক্রম কালে তাদের দাঁড়ানো উচিত কি না?' শীর্ষক অধ্যায়, ২:১৪ #২৭১৭; এবং আল-বায়হাকী, 'সুনানে কুবরা', ৪:২৬।

৬০০. সহীহ: কিতাবুল জানায়েয, 'কোনো ইহুদীর শব যাত্রার জন্যে দাঁড়ানো' শীর্ষক অধ্যায়, ১:৪৪১ #১২৫০), মুসলিম (সহীহ: কিতাবুল জানায়েয, 'জানাযার শব যাত্রার জন্যে

এসব হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল صلی الله علیه وسلم নিজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাঁরই উম্মতকে শব যাত্রার প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ উঠে দাঁড়াতে শিখিয়েছেন। যারা ক্বিয়াম তথা দাঁড়ানোর এই রীতির প্রতি পুরোপুরি আপত্তি উত্থাপন করেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ সূন্নাহের সাথে তাঁদের কোনো সম্পর্ক-ই নেই; কেননা প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم নামায ছাড়া অন্যন্য ক্ষেত্রেও ক্বিয়াম/দাঁড়ানোর এই রীতি অনুশীলন করেছেন বলে সাবেত/সাব্যস্ত হয়। পরম দরদি নবী صلی الله علیه وسلم উন্নত নৈতিকতার এমন উচ্চ মানদণ্ড স্থাপন করেছেন যে, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে কোনো শব যাত্রা দেখলে প্রত্যেককে শ্রদ্ধাস্বরূপ উঠে দাঁড়াতে হয়। এটা মানবিক মর্যাদাবোধ সূত্রে এসেছে, যা মৃতের প্রতি মানবিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনস্বরূপ করা হয়। আর এ রকম কর্ম সংঘটন প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم এর শিক্ষার মধ্যে পড়ে।

অতএব, কোনো মরদেহের যদি শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকার থাকে এবং তা মহানবী صلی الله علیه وسلم এর সূন্নাহেরই অন্তর্গত হয়, তাহলে সর্বাধিক সম্মানিত রাসূলুল্লাহ صلی الله علیه وسلم এর প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণ, তাঁর শানে/সম্মানে না'ত/ কসীদা/ প্রশংসাসূচক কবিতা আবৃত্তি ও তাঁর প্রতি এশকু-মহব্বত প্রকাশের সময় সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানো কীভাবে শরীয়তে না-জায়েয/নিষিদ্ধ কাজ হিসেবে ঘোষিত হতে পারে?

দাঁড়ানো' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৬৬১ #৯৬১), আহমদ ইবনে হাম্বল (আল-মুসনাদ, ৬:৬), নাসাঈ (সহীহ: কিতাবুল জানায়েয, 'কোনো মুশরিকের শব যাত্রার জন্যে দণ্ডায়মান হওয়া' শীর্ষক অধ্যায়, ৪:৪৫ #১৯২১; এবং 'সূন্নাতে কুবরা', ১:৬২৬ #২০৪৮), আল-তাহাবী (শরহু মা'আনি-ইল-আসার: কিতাবুল জানায়েয, 'মানুষের সামনে দিয়ে শব যাত্রা অতিক্রম করলে তাঁরা সেটার জন্যে উঠে দাঁড়াবেন কি না?' শীর্ষক অধ্যায়, ২:১৩ #২৭১৪।

৮.১৮.৬ যিকর বা স্মরণের জন্যে দাঁড়ানো (ক্বিয়াম লিয্ যিকর)

ক্বিয়াম তথা রীতিগত দাঁড়ানোর একটি প্রকার হলো স্মরণার্থে দাঁড়ানো (ক্বিয়াম লিয্ যিকর)। এর আওতাভুক্ত রয়েছে কোনো ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে, অথবা ধর্মীয় শিক্ষা প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে দণ্ডায়মান হওয়া। এগুলোর উদাহরণ হলো পাঠদানের সময় কোনো শিক্ষকের দাঁড়ানো, বা কোনো খতীবের খুতবা দানের জন্যে মিম্বরে দাঁড়ানো, কিংবা কোনো ক্বারী সাহেবের কুরআন তেলাওয়াতের জন্যে দণ্ডায়মান হওয়া। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ ফরমান:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

-তারা সেসব লোক যারা আল্লাহকে স্মরণ করে (আপাদমস্তক আত্মসমর্পণকারীরূপে) দাঁড়িয়ে, (পরিপূর্ণ আদব রক্ষা করে) উপবিষ্ট হয়ে, (ভালোবাসায় ব্যাকুল হয়ে) নিজেদের পার্শ্ব পরিবর্তনে।^{৬০১}

শান্তিময় সালাম হচ্ছে আল্লাহর মাহবুব صلی الله علیه وسلم এর যিকর/স্মরণ, আর সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم এর যিকর তাঁর নিজেরই যিকর।^{৬০২}

৬০১. আল-কুরআন, ৩:১৯১।

৬০২. আল-কুরআন, ৯৪:৪ - وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ - এবং ইবনে হিব্বান, আল-সহীহ, ৮:১৭৫ #৩৩৮২; বঙ্গানুবাদকের নোট: তাফসীরে জালালাইন শরীফে বিবৃত হয়: “(হে রাসূল) আপনাকেও স্মরণ করা হয় সেখানে, যেখানে আমাকে স্মরণ করা হয়” - নামাযের একামতের সময় দ্বিতীয় আযানে, যাতে সাক্ষ্যস্বরূপ উল্লেখ করা হয়: নেই কোনো উপাস্য প্রভু আল্লাহ ব্যতিরেকে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁরই রাসূল”; এটা আল্লাহ তা'আলার ওই বিধান জারির অনুরূপ, যেখানে তিনি প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم এর প্রতি আনুগত্যকে তাঁর নিজেরই প্রতি আনুগত্য বলেছেন [আল-কুরআন, ৪:৮০; وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ]; আর প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم এর প্রতি আবাহ্যতা খোদ আল্লাহরই প্রতি আবাহ্যতা [আল-কুরআন, ৪:১৪; ৩৩:৩৬ ও ৭২:২৩ - يَخْلُقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُزَيِّنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْ أَنْ يَزَيِّنُوهُ - وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ]; প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কর্ম সংঘটন তাঁর নিজেরই কর্ম সংঘটন [আল-কুরআন, ৮:১৭ - وَمَا رَمَيْتْ إِلَّا رَمِيَّتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى]; রাসূলুল্লাহ صلی الله علیه وسلم এর প্রতি আঘাত খোদ তাঁরই প্রতি আঘাত [আল-

৬০৪. ইবনে হিব্বান, আল-সহীহ, ৮:১৭৫ #৩৩৮২; আবু এয়ালা, আল-মুসনাদ, ২:৫২২ #১৩৮০; খিলা'ল, 'আল-সুনা'হ, ১:২৬২ #৩১৮ গ্রন্থে এই এসনাদকে 'হাসান'/নির্ভরযোগ্য ঘোষণা করেন; আল-দায়লামী, 'আল-ফেরদৌস বি-মা'সুরিল-খিতাব', ৪:৪০৫ #৭১৭৬; আল-হায়সামী, 'মাওয়ারিদু যামান ইলা যাওয়াঈদ-ইবনে হিব্বান', ৪৩৯ পৃষ্ঠা #১৭৭২; ইবনে আবী হাতিম আল-রাযী, 'তাফসীরুল কুরআন আল-আযীম', ১০:৩৪৪৫ #১৯,৩৯৩; আল-আসকালানী, 'ফাতহুল বারী', ৮:৭১২; ইবনে কাসীর, 'তাফসীরুল কুরআন আল-আযীম', ৪:৫২৪; এবং আল-সৈয়ুতী, 'দুর্বুল মানসুর ফীল-তাফসীরে বিল-মা'সুর', ৮:৪৯।

প্রথায় তাঁর প্রতি পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানসহ শান্তিময় সালাম ও আশীর্বাদ প্রেরণ করা হয়। এই দাঁড়ানো আবার নানা ধরনের ক্রিয়ামের সমষ্টি; যেমন -‘ক্রিয়াম লিল্ মাহাব্বা,’ ‘ক্রিয়াম লিল্ ফারহা,’ ক্রিয়াম লিত্ তা‘যীম’ ও ‘ক্রিয়াম লিয়্ যিকর।’

সালাত ও সালাম প্রেরণের জন্যে দণ্ডায়মান হওয়ার বিষয়টি যখন আমরা গ্রহণ করি, যেমনটি মীলাদ মাহফিল/মজলিশে চর্চিত হয়ে থাকে, তখন দাঁড়ানো বা না দাঁড়ানোর ব্যাপারে সমস্ত আলোচনা-ই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়; কেননা সৃষ্টিকুল শিরোমণি (রাসূল صلی الله علیه وسلم) এর ধরাধামে শুভাগমনের সাথে সেগুলোর কোনো সম্পৃক্ততা-ই নেই, যেহেতু এখানে বর্ণিত ক্রিয়াম/দাঁড়ানো কাউকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হওয়া নয় (অর্থাৎ, ক্রিয়াম লিল্ ইস্তিক্বা‘ল নয়)। অতএব, প্রথমাবস্থা থেকেই ক্রিয়ামটি ইস্তিক্বা‘ল বা স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে হবে কী হবে না, সে ব্যাপারে বিতর্ক করাকে আমরা একদম অযৌক্তিক বিবেচনা করি; কারণ এই দাঁড়ানো মূলতঃ তা‘যীম (শ্রদ্ধা প্রদর্শন) এর জন্যে করা হয়, যা ফারহা (খুশি) ও মাহাব্বা (ভালোবাসা) দ্বারা অনুপ্রেরণা-প্রাপ্ত। এ সব ক্রিয়ামের পদ্ধতি প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم এর সুন্নাহ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, আর তাই এর বিরোধিতা করা বা এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করার কোনো অবকাশ-ই নেই। মীলাদের ক্রিয়ামকে বিতর্কের উৎস বানানো শ্রেফ অসিদ্ধ একটি কাজ। রাসূলুল্লাহ صلی الله علیه وسلم এর মহা মর্যাদাপূর্ণ দরবারে দাঁড়িয়ে শান্তিময় সালাত ও সালাম প্রেরণ পয়গাম্বর মূসা আলাইহিস সালামের সুন্নাহ।

১. হযরত আনাস বিন মালিক رضي الله عنه মেরাজ রাতের নিম্নোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেন; মেরাজ সম্পর্কে নবী পাক صلی الله علیه وسلم বলেন:

مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ.

-আমি (পয়গাম্বর) মূসা আলাইহিস সালামকে অতিক্রম করি; ওই সময় তিনি তাঁর মাথারে সালা‘ত আবৃত্তি/পাঠ করছিলেন।^{৬০৫}

২. ভিন্ন একটি এসনাদ/বর্ণনাকারীদের পরম্পরাসহ হযরত আনাস বিন মালিক رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে রাসূলে করীম صلی الله علیه وسلم এরশাদ ফরমান:

مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ.

-মেরাজ রাতে উর্ধ্বগমনকালে আমি মূসা আলাইহিস সালামকে লাল বালিস্তূপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি এবং (দেখতে পাই) তিনি তখন দাঁড়িয়ে সালাত আবৃত্তি করছিলেন।^{৬০৬}

প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم এর প্রতি পয়গাম্বর মূসা আলাইহিস সালাম সালাত পাঠ (আশীর্বাদ বর্ষণ) করছিলেন। আরো খোলাসা করার জন্যে নিচে ‘সালা‘ত’ শব্দটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

৬০৫. মুসলিম, ‘সহীহ’: ‘কিতাবুল ফাযায়েল’, ‘মূসা (আলাইহিস সালাম)’ এর উন্নত গুণাবলী’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৮৪৫ #২৩৭৫; নাসাঈ, ‘আল-সুনান’, ‘কিতাবু ক্রিয়াম আল-লায়ল ওয়া তাত্তাওয়া আল-নাহার’, আব্দুল্লাহর নবী মূসা (আলাইহিস সালাম)’ এর প্রার্থনার উল্লেখ’ শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১৫১ #১৬৩৭; আল-নাসাঈ, ‘সুনানে কুবরা’, ১:৪১৯ #১৩২৯; আহমদ ইবনে হাম্বল, ‘আল-মুসনাদ’, ৩:১২০; ইবনে হিব্বান, ‘আল-সহীহ’, ১:২৪১ #৪৯; এবং আবু এয়ালা, ‘আল-মুসনাদ’, ৭:১২৭ #৪০৮৫।

৬০৬. মুসলিম, ‘আল-সহীহ’: ‘কিতাব আল-ফাযায়েল’, ‘মূসা (আলাইহিস সালাম)’ এর উন্নত গুণাবলী’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৮৪৫ #২৩৭৫; আহমদ ইবনে হাম্বল, ‘আল-মুসনাদ’, ৩:১৪৮; আল-বায়হাকী, ‘দালায়েল আল-নুবুওয়া ওয়া মা‘রিফা আহওয়াল সা‘হিব আল-শরীয়া’ (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম), ২:৩৮৭; সুবকী, ‘শিফাউস সিক্কাম ফী যিয়ারা খায়র আল-আনাম’, ১৩৭ পৃষ্ঠা; আল-মাকুরিযী, ‘ইমতা’ আল-আসমা’ বি মা লি-নাবী মিন আল-আহওয়াল ওয়াল-আমওয়াল ওয়াল-হাফাদা ওয়াল-মাতা’, ৮:২৫০; প্রাগুক্ত, ১০:৩০৪; আল-সৈয়তী, ‘আল-হাওয়া লিল্ ফাতাওয়া’, ৬৬৮ পৃষ্ঠা; এবং আল-সাখাভী, ‘আল-কুওল আল-বদী ফীল-সালা‘তে আলাল্ হাবীবিল শাফী’, ১৬৮ পৃষ্ঠা।

৮.১৮.৭.১ সালাতের অর্থ: শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষণ/প্রেরণের প্রার্থনা

সাধারণতঃ ওপরের এই হাদীসটি নিম্নবর্ণিত উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয় এ মর্মে যে, সৃষ্টিকুল শিরোমণি প্রিয়নবী ﷺ মে'রাজ রাতে আসমা'নে উর্ধ্বগমনে যাওয়ার সময় পয়গাম্বর মূসা আলাইহিস্ সালামের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন। তখন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর মাযারে (নফল) নামায আদায় করছিলেন।

এই লেখক (শায়খ তাহিরুল ক্বাদেরী সাহেব) যে ব্যাখ্যা পেশ করেছি এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে পয়গাম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম বাস্তবে প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি শান্তিময় সালাম ও আশীর্বাদময় সালা'ত পাঠ তথা বর্ষণ/প্রেরণ করছিলেন, তা হাদীসের স্পষ্ট প্রতীয়মান কথার সাথে (মোটো) সাংঘর্ষিক নয়। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম অন্যান্য পয়গাম্বর আলাইহিমুস্ সালামের সাথে মসজিদে আকুসা'তে সমবেত হয়েছিলেন সর্বাধিক সম্মানিত পয়গাম্বর ﷺ কে 'উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন রাসূল ﷺ ইতিমধ্যেই তাঁর মে'রাজ রাতের যাত্রা আরম্ভ করেছেন এবং তিনি মসজিদে আকুসায় তাঁদের নামাযের জামা'আতে ইমামতি করতে যাচ্ছেন, আর এটা মে'রাজে গমনের আগেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রাসূল ﷺ কর্তৃক পয়গাম্বর মূসা আলাইহিস্ সালামের সাথে আসমা'নে সাক্ষাতের বিষয়টি পূর্বাঙ্কে নির্ধারিত ছিলো, আর মূসা আলাইহিস্ সালামেরও জেরুসালেমে তাঁর ইমামতিতে নামায আদায়ের বিষয়টি (তাকদীরে) পূর্বনির্ধারিত ছিলো।

অধিকন্তু, এই (উর্ধ্বগমনের) যাত্রাটি কোনো পার্থিব যানবাহন দ্বারা সম্পন্ন হয়নি, বরং বুরাক নামের বাহনে চড়ে হয়েছিলো; এর গতিবেগ মানব মস্তিষ্কের ধারণারও অতীত। বুরাক এক মুহূর্তে যে দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম, তা আলোকের গতিও অতিক্রম করতে পারে না। এসব বিষয় মাথায় রেখে ভাবা উচিত যে, মূসা আলাইহিস্ সালামের মাযারের পাশ

দিয়ে প্রিয়নবী ﷺ এর গমনকালে পয়গাম্বর মূসা আলাইহিস্ সালামের পক্ষে কীভাবে নফল নামাযের রাক'আতগুলো আদায় করা সম্ভব হতে পারে? সেই ওয়াজিয়া নামায যদি ফরয/বাধ্যতামূলক হতো, তাহলে তা বোধগম্য হতো; কিন্তু ইন্তেকালের পরে বরযখী জীবনে ফরয নামায তো নেই। আশিয়া আলাইহিমুস্ সালাম ও আউলিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম যদি ওই ধরনের কোনো আমল (বেসাল শরীফের পরে) করে থাকেন, তাহলে তা নফল এবাদতের শ্রেণিভুক্ত হবে।

গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে তা হলো, পয়গাম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম সম্যক অবগত ছিলেন যে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রাসূল ﷺ মসজিদে হারাম শরীফ হতে সূচিত মে'রাজের যাত্রাকালে তাঁরই (মাযার শরীফের) পাশ দিয়ে অতিক্রম করবেন। অতএব, সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল ﷺ তাঁর মাযার শরীফের পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় পয়গাম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম নফল নামায পড়ছিলেন মর্মে অভিমতটি সঠিক নয়। কাজেই ওপরোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হচ্ছে এই যে, পয়গাম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর মাযারে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি শান্তিময় সালাম ও আশীর্বাদময় সালাত প্রেরণ করছিলেন। এই সিদ্ধান্তটি হাদীসের স্পষ্ট প্রতীয়মান লিপির পরিপন্থী নয়, কেননা সকল আশিয়া আলাইহিমুস্ সালাম অবগত ছিলেন সর্বাধিক মর্যাদাবান রাসূল ﷺ নামাযে ইমাম হবেন এবং মূসা আলাইহিস্ সালাম মসজিদে আকুসায় তাঁর ইমামতিতে নামায পড়বেন। অতএব, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে পূর্বনির্ধারিত সাক্ষাতের বিষয়ে অবগত হয়েও নফল নামায পড়ছিলেন বলাটা একেবারেই অযৌক্তিক।

৮.১৮.৭.২ সালাত শব্দটির আক্ষরিক/আভিধানিক অর্থ

ওপরে উল্লেখিত হাদীসে উদ্ধৃত- “وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ”- “তিনি তাঁর মাযারে সালাত আবৃত্তি/পাঠ করছিলেন” মর্মে বাক্যটিতে ‘সালাত’ শব্দটির সঠিক অর্থ ওয়াজিয়া (বা নফল) নামায নয়, বরঞ্চ শান্তিময় সালাম ও আশীর্বাদপূর্ণ সালাত প্রেরণ। ‘সালাত’ শব্দটি কেবল ওয়াজিয়া নামাযের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না, বরং কারো প্রতি (খোদায়ী) করুণা বর্ষণ, প্রশংসা ও শান্তিময় সালাম প্রেরণের বেলায়ও ব্যবহৃত হয়।

ইমাম আল-মুরতাজা আল-যুবায়েদী ‘সালাত’ শব্দের অর্থ সম্পর্কে লেখেন:

وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَةِ، وَمِنْهُ (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ) أَيُّ يَرْحَمُ.

—শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহর তরফ থেকে আস-সালাত মানে হলো করুণা বর্ষণ। উদাহরণস্বরূপ- هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ “তিনি (খোদা)-ই তোমাদের প্রতি সালাত প্রেরণ করেন” [আল-কুরআন, ৩৩:৪৩] আয়াতটির মানে হলো তিনি তোমাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করেন।^{৬০৭}

ইবনে মানযূর (৬৩০-৭১১ হিজরী)- أَوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ - ‘এরাই সেসব লোক যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রয়েছে ক্রমাগত অনুগ্রহ ও রহমত^{৬০৮}’-মর্মে আয়াতটি সম্পর্কে বিবৃত করেন যে এর অর্থ হলো:

فَمَعْنِ الصَّلَوَاتِ هَهُنَا الثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى.

—এখানে সালাওয়াতের মানে হচ্ছে তাঁদের জন্যে আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা।^{৬০৯}

৬০৭. আল-যুবায়েদী, ‘তাজ আল-উরুস্ মিন জওয়া‘হির আল-কামুস’, ১৯:৬০৭।

৬০৮. আল-কুরআন, ২:১৫৭।

৬০৯. ইবনে মানযূর, ‘লিসান আল-‘আরব’, ১৪:৪৬৫।

৮.১৮.৭.৩ সালাত শব্দটির আক্ষরিক অর্থের প্রয়োগ

‘সালাত’ শব্দটির প্রয়োগ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে এবং হাদীস-সমূহে:

১. আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

—নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর (সমস্ত) ফেরেশতাবর্গ (সম্মানিত) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করছেন। হে ঈমানদারবর্গ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ প্রেরণ করো এবং (সর্বাস্তকরণে) পরিপূর্ণ আদবের সাথে অধিক পরিমাণে সালাম পেশ করো।^{৬১০}

২. অপর এক আয়াতে করীমায় আল্লাহ বিবৃত করেন:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

—তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাবৃন্দও (রহমতের দোয়া করেন), যেন তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন।^{৬১১}

৩. হাদীসসমূহে এই ‘সালাত’ শব্দটি শান্তিময় সালাম ও আশীর্বাদ প্রেরণে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু বর্ণনা করেন প্রিয়নবী صلى الله عليه এর বাণী, যিনি বলেন:

مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَاةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَا عَشْرًا وَكَتَبَ لَهُ بِمَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ.

৬১০. আল-কুরআন, ৩৩:৫৬।

৬১১. আল-কুরআন, ৩৩:৪৩।

—যে ব্যক্তি আমার প্রতি সালাত (আশীর্বাদ) প্রেরণ করে, আল্লাহ তা‘আলা ওর বিনিময়ে দশ গুণ সালাত তার প্রতি প্রেরণ করেন, আর তার নামে দশটি সওয়াব/পুণ্য লিপিবদ্ধ করেন।^{৬১২}

এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী, উপরোক্ত হাদীসটি হতে জ্ঞাত হয় যে ‘সালাত’ শব্দটির মানে ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ’এর প্রতি প্রেরিত শান্তি ও আশীর্বাদ।’ অতএব, পয়গাম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম যখন দাঁড়িয়ে সালাত পাঠ করছিলেন, তখন প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রিয়নবী ﷺ এর শুভাগমনের প্রতি অভ্যর্থনা জানাতেই তিনি তা করছিলেন।

ইমাম আল-শা‘রানী (৮৯৮-৯৭৩ হিজরী) মে‘রাজের উর্ধ্বগমন সম্পর্কে নিজ ‘আল-এয়াওয়া‘ক্বীত ওয়াল-জওয়া‘হির ফী বয়ানে আক্বা‘য়িদিল আক্বা‘বির’ গ্রন্থে লেখেন: প্রিয়নবী ﷺ যখন (মে‘রাজ রাতে) সিদরাত আল-মুনতাহা অতিক্রম করেন, তখন তিনি বুর্কাকু‘কে পেছনে রেখে রফরফের মাধ্যমে ওই মাক্বামে উন্নীত হন, যাকে “সুম্মা দানা ফা তাদাল্লাহ” (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى) বলে ব্যাখ্যা করা হয়। অতঃপর তাঁকে আল্লাহ তা‘লার দরবারে প্রবেশ করতে দেয়া হয় এবং (উক্ত)- ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى -শীর্ষক মাকাম তথা মর্যাদাপূর্ণ পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। ওই স্থানে আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর প্রিয়নবী ﷺ ছাড়া অন্য কেউই উপস্থিত ছিলেন না। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মাহবুব ﷺ এর সাথে কথা বলেন এবং ঘোষণা করেন:

يَا مُحَمَّدُ! قِفْ، إِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي.

৬১২. তিরমিযী, আল-‘জামে‘ আল-সহীহ’: কিতাব আল-সালাত’, ‘রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর প্রতি সালাত প্রেরণের শ্রেষ্ঠত্ব-সম্পর্কিত বর্ণনা’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:৩৫৪ #৪৮৪।

—হে রাসূল ﷺ! স্থিত হোন। আপনার প্রভু আপনারই প্রতি তাঁর সালাত/করণা বর্ষণ করছেন।^{৬১৩}

মে‘রাজ রাতের উর্ধ্বগমনের ঘটনা থেকে এ কথা স্পষ্ট, আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক তাঁর প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি যে সালাত পঠিত হয়েছিলো, তা মহান পয়গাম্বর মূসা আলাইহিস্ সালামের পঠিত ওই একই সালাত। সেই রাতে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম রীতিগত নফল নামায পড়ছিলেন না, বরঞ্চ ওপরের আলোচনার আলোকে তিনি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ সালাত ও শান্তিময় সালাম প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি বখশে দিচ্ছিলেন; (তাঁর) এই আশীর্বাদ ছিলো অভিনন্দন ও সম্মানসূচক এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপক।

অতএব, আবারো বলতে হয়, সালাত শব্দটির অর্থকে (শ্রেফ) রীতিগত নামাযে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়। বরং এটাকে সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল ﷺ এর প্রতি শান্তিময় সালাম ও আশীর্বাদপূর্ণ সালাত প্রেরণ হিসেবে বুঝতে হবে; এই কাজটি-ই পয়গাম্বর মূসা আলাইহিস্ সালাম করছিলেন যখন তাঁর সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয় ‘তিনি দাঁড়িয়ে সালাত পাঠ করছিলেন।’ এই তথ্যটি আমাদেরকে জানিয়েছেন সবচেয়ে মতোবান রাসূল ﷺ, যিনি বিবৃত করেন যে তিনি পয়গাম্বর মূসা আলাইহিস্ সালামকে সালাত পাঠরত অবস্থায় দেখেছিলেন (মে‘রাজ রজনীতে)। আরেক কথায়, মূসা আলাইহিস্ সালাম তখন তাঁর মাযার শরীফে দাঁড়িয়ে প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি শান্তি ও আশীর্বাদ বর্ষণ করছিলেন।

কেউ ওপরের দুটো ব্যাখ্যার যে কোনোটি গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু মহানবী ﷺ কেন তাহলে প্রথমাবস্থায় এই ঘটনার (মানে পয়গাম্বর মূসা আলাইহিস্ সালামের আপন মাযারে দাঁড়িয়ে সালাত

৬১৩. আল-শা‘রানী, ‘আল-এয়াওয়া‘ক্বীত ওয়াল-জওয়া‘হির ফী বয়ানে আক্বা‘য়িদিল আক্বা‘বির’, ২:৩৬৭।

প্রেরণের বৃত্তান্তের) কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন? হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম যদি রীতিগত নামায আদায় করতেন, তবে তা হতো তাঁর ও আল্লাহ তা'লার মধ্যকার একটা বিষয়। প্রত্যেক পয়গাম্বর আলাইহিস্ সালামই নিজেদের নূরানী/জ্যোতির্ময় মাযার-রওয়ায প্রথাগত নফল নামায আদায় করেন; এটা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। কিন্তু তবু এর দরুন নিম্নের প্রশ্নের উদ্ভব হয়: সর্বাধিক মর্যাদাবান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজ রাতে উর্ধ্বগমনের সময় সংঘটিত এই ঘটনার উল্লেখ করে কী বোঝাতে চেয়েছেন? আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন, হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর একজন আশেক-ভক্ত এবং (তাই) তিনি সর্বাধিক সম্মানিত নবী **صلى الله عليه وسلم** এর মে'রাজ (উর্ধ্বগমনের) রাতে রাসূল **صلى الله عليه وسلم** এর প্রতি আপন ভক্তি-শ্রদ্ধা পেশ করেছিলেন। এই উপায়ে প্রিয়নবী **صلى الله عليه وسلم** নিজ উম্মতকে তাঁরই প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণের আদব/শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন।

৪. সহীহ মুসলিম শরীফ গ্রন্থের 'কিতাবুল ঈমান' বইয়ের 'মরিয়ম-তনয় মসীহ আলাইহিস্ সালাম ও দাজ্জালের উল্লেখ' শীর্ষক অধ্যায়ে এ বিষয়ে অনুরূপ একটি হাদীসও উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম সাখাভী (৮৩১-৯০২ হিজরী) রচিত 'আল-কুওলুল বদী ফীস-সালা'তে আলাল-হাবীবিল শাফী'ঈ' পুস্তকেও প্রিয়নবী **صلى الله عليه وسلم** এর প্রতি পয়গাম্বর মুসা আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক সালাত-সালাম প্রেরণ-বিষয়ক এই হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে:

হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে সবচেয়ে মর্যাদাবান রাসূল **صلى الله عليه وسلم** এরশাদ ফরমান:

قَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرَبَ جَعْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَةَ.

অর্থ: আমি নিজেকে আশিয়া আলাইহিমুস্ সালামবৃন্দের সমাবেশে দেখতে পাই। সেখানে পয়গাম্বর মুসা আলাইহিস্ সালামকে দেখতে পাই দাঁড়িয়ে সালাত পাঠরত। তিনি লম্বা, পাতলা ও কোঁকড়া চুলবিশিষ্ট, যেনো শানুয়া গোত্রের পুরুষদের মধ্য হতে (আগত পুরুষ)।

وَإِذَا عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهَ شَبَهِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الشَّقْفِيِّ .

-এরপর আমি দেখতে পাই পয়গাম্বর ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস্ সালামকে দাঁড়িয়ে সালাত পাঠরত। মানুষের মাঝে তাঁর সদৃশ হলো উরওয়াহ ইবনে মাসউদ শাক্বাফী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

[وَإِذَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشَبَّهُ النَّاسِ بِهَ صَاحِبُكُمْ يَغْنِي نَفْسُهُ، فَحَائِثِ الصَّلَاةِ فَأَمَّتْهُمْ].

-এরপর আমি দেখতে পাই পয়গাম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে দাঁড়িয়ে সালাত পাঠরত। মানুষের মাঝে তাঁর সদৃশ হলেন তোমাদের সাহেব/সৈয়দ [তথা খোদ মহানবী **صلى الله عليه وسلم** নিজে]। অতঃপর নামাযের সময় হলে আমি জামাআতে ইমামতি করি।^{৬১৪}

এই বর্ণনাটি ব্যাখ্যা করে যে, মে'রাজ রাতে প্রিয়নবী **صلى الله عليه وسلم** এর প্রতি (সম্মানার্থে) সকল পয়গাম্বর আলাইহিস্ সালাম দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁদের আশীর্বাদপূর্ণ সালাত ও শান্তিময় সালাম

৬১৪. সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান, 'মরিয়ম-তনয় মসীহ (عليه السلام) ও দাজ্জালের উল্লেখ' শীর্ষক অধ্যায়, ১:১৫৭ #১৭২; খতীব তাবরীযী, 'মিশকাতুল মাসাবীহ': 'কিতাব আহওয়াল আল-কিয়া'মা ওয়া বাদ' আল-খালক', ৩:৩৭৯ #৫৮৬৬; আল-বায়হাকী, 'দালায়েল আল-নুবুওয়াহ ওয়া মা'রিফাহ আহওয়াল সাহিব আল-শরীআ' **صلى الله عليه وسلم**, ১৩৫ ও ১৩৮ পৃষ্ঠাগুলো; আল-মাকুরীযী, 'ইমতা' আল-আসমা' বি মা' লি নাবী মিন আল-আহওয়াল ওয়াল-আমওয়া'ল ওয়াল-হাফাদা ওয়াল-মাতা', ৮:২৪৯; এবং আল-সাখাভী, 'আল-কুওল আল-বদী ফীল-সালা'তে আলাল-হাবীব আল-শাফী'ঈ', ১৬৮ পৃষ্ঠা।

(হাদীয়াস্বরূপ) পেশ করেছিলেন। এই অভ্যর্থনা শেষে সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল ﷺ তাঁদেরকে নিয়ে জামাআত-সহকারে নামাযে ইমামতি করেন।

৮.১৮.৮ মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অভ্যর্থনা জানাতে মীলাদে দাঁড়ানো হয় না

কিয়াম বিষয়ে আমরা খোলাসা করতে চাই কেন আমরা তা পালন করি এবং কার জন্যে এটা পালন করা হয়। এখানে একটা ভুল ধারণা অপনোদন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ মর্মে যে, আল্লাহ মাফ করুন, আমরা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কিয়াম পালন করি না যে প্রিয়নবী ﷺ এর বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমন ওই সময়েই ঘটতে চলেছে, কিংবা ঠিক ওই সময়ে তিনি (মীলাদের) মাহফিলে প্রবেশ করছেন, আর তাই আমরা তাঁকে স্বাগত জানাতে দণ্ডায়মান হয়েছি। ওই ধরনের বুঝ কখনোই মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস হতে পারে না; এটা ‘কিয়াম লিল-ইসতিক্বাল’ তথা ‘কাউকে স্বাগত জানাতে দাঁড়ানো নয়।’ অধিকন্তু, এই কিয়াম মীলাদ সমাবেশে অংশগ্রহণকারী যে কারো জন্যেও নয়।

মীলাদুন্নবী ﷺ এর মজলিশে আধ্যাত্মিকভাবে প্রিয়নবী ﷺ এর আগমন করার বিষয়টি অসম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে ওই ধরনের বিষয় সম্ভব। প্রিয়নবী ﷺ যেখানে যেতে চান, সেখানেই যেতে পারেন (রুহানীভাবে)। এটা শারীরিক ব্যাপার নয়, কেননা তাঁর পবিত্র শরীর (মোবারক) মদীনা মোনাওয়ারায় অবস্থিত রওয়া আকদসে বিশ্রামরত অবস্থায় আছেন। কিন্তু ফেরেশতা ও আত্মাগুলোর মতো তিনি আধ্যাত্মিকভাবে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। বহু আউলিয়া-দরবেশ তথা আল্লাহর বন্ধুদের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে, ঠিক তেমনি (অন্য) কেউ তাঁকে স্বপ্নে বা জাহাজে অবস্থায় দেখলেও তিনি সত্যিসত্যি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দর্শন দ্বারা আশীর্বাদধন্য

হয়েছেন। যদিও তা প্রিয়নবী ﷺ কে শারীরিকভাবে দেখার মতো দৃশ্যমান হতে পারে, তবু বাস্তবে তাঁর রুহ/আত্মা মোবারক-ই তাঁর শারীরিক আকৃতিতে দৃশ্যমান হন (‘আল-রুহ আল-তামসীল’ অথবা ‘আল-রুহ আল-মুতামাসসিলা’)। এর উদাহরণ হলো যখন সর্ব-হযরত জিবরীল আলাইহিস্ সালাম বা আজরাঈল আলাইহিস্ সালাম মানব আকৃতিতে দৃশ্যমান হন। এই প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসে অনেক দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

কুরআন মজীদে বিবৃত হয় যে, হযরত জিবরীল ফেরেশতা আলাইহিস্ সালাম সাইয়েদাহ মরিয়ম عنها رضي الله এর কাছে মানবাকৃতিতে আসেন:

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا.

-তখন আমরা তাঁর নিকট আমাদের রুহ (অর্থাৎ ফেরেশতা জীবরাঈলকে) প্রেরণ করলাম। অতঃপর তিনি তাঁর সামনে পূর্ণ মানবাকৃতিতে আবির্ভূত হলেন।^{৬১৫}

এ আয়াতে - بَشَرًا سَوِيًّا - কথাটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হচ্ছে এই যে, হযরত জিবরীল আলাইহিস্ সালাম জীবিত মানুষের আকৃতিতে সাইয়েদাহ মরিয়ম রাঈয়াল্লাহু তা‘আলা আনহার কাছে এসেছিলেন। বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী (জানা যায়), প্রিয়নবী ﷺ এর কাছে তিনি আসেন এক পুরুষ ব্যক্তির সুরতে।^{৬১৬}

৬১৫. আল-কুরআন, ১৯:১৭।

৬১৬. সহীহ বুখারী: ‘কিতাব আল-ঈমান,’ ‘ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কে জিবরীল (আলাইহিস্ সালাম) কর্তৃক প্রিয়নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:২৭ #৫০; সহীহ বুখারী: ‘কিতাব আল-তাফসীর আল-কুরআন,’ ‘আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান - মর্মে আল্লাহর ভাষ্য’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৭৯৩ #৪৪৯৯; এবং সহীহ মুসলিম: ‘কিতাব আল-ঈমান,’ ‘ঈমান, ইসলাম ও ইহসান-বিষয়ক’ অধ্যায়, ১:৩৭ ও ৩৯ #৮-৯।

প্রকৃত সুন্নাহসম্মত আক্বীদাহ-বিশ্বাস হচ্ছে বিশ্বজগতের জন্যে খোদারী করুণা, প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم এর শরীর মোবারক তাঁর রওয়া পাকে বিশ্রামরত; কিন্তু তাঁর পবিত্র রুহ (আত্মা) মোবারক যে-কোনো সময় যে-কোনো স্থানে দৃশ্যমান হতে সক্ষম। মহানবী صلی الله علیه وسلم আত্মিকভাবে যেখানে যেতে চান, সেখানে যেতে পারেন না মর্মে কুৎসা রটনা করা তাঁরই প্রতি চরম অসম্মান প্রদর্শন; যদিও ফেরেশতাদের মতো তাঁকেও রুহানী/আত্মিকভাবে যে-কোনো জায়গায় যাওয়ার ঐশী ক্ষমতা মঞ্জুর করা হয়েছে। যখন রুহ মোবারক শরীরের মতো দৃশ্যমান হন, তখন তাকে বলা হয় ‘তামাসসুল আল-রুহ’ অথবা ‘তাজাসসুদ আল-রুহ।’ এই ছিলো ঘটনা যখন আল্লাহ তা‘আলা সাইয়েদাহ মরিয়ম رضي الله عنها এর সামনে হযরত জিবরীল আলাইহিস্ সালামের দৃশ্যমান হওয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন (আল-কুরআনে)।

প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم শারীরিক আকৃতিতে যদিও আত্মিকভাবে দৃশ্যমান হওয়ার ক্ষমতা রাখেন, তথাপিও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত কোনো মুসলমানের এই আক্বীদা-বিশ্বাস নেই যে তিনি মীলাদ মাহফিলে প্রকৃতপক্ষে তাঁরই শরীর মোবারক নিয়ে আগমন করেন; আর তাই তাঁরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে (কিয়াম লিল্ ইসতিক্বাল) দণ্ডায়মান হন না। কেউ ওই ধরনের অভিযোগ করলে তা হবে একটা মিথ্যে দোষারোপ, বাস্তবতার সাথে যার কোনো সম্পর্কই নেই।

মীলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণকারী মুসলমানবৃন্দ প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রতীকস্বরূপ আশীর্বাদপূর্ণ সালাত ও শান্তিময় সালাম পেশের সময় দণ্ডায়মান হন। এই দাঁড়ানো এ কারণে নয় যে, সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল صلی الله علیه وسلم ওই সময় ধরাধামে শুভাগমন করছেন, আল্লাহ মাফ করুন। একজন নির্বোধ ও ভারসাম্যহীন ব্যক্তি-ই কেবল এ ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারে। মীলাদ মাহফিলগুলোতে কৃত কিয়াম শুধু ওই (বেলাদতের) স্মৃতির সম্মানার্থে

পালন করা হয়। নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পয়গাম্বর صلی الله علیه وسلم এর বেলাদত শরীফ এতোখানি মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বহন করে যে, সেটার স্মৃতিচারণ তার চেয়েও বেশি পুতঃপবিত্রতা (মানে সওয়াব) ধারণ করে। এই শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দাবি হলো, আমরা যেনো করুণাশীল নবী পাক صلی الله علیه وسلم এর পবিত্র যাত/সত্তা মোবারক ও গুণাবলীর প্রতি আমাদের আশীর্বাদপূর্ণ সালাত ও শান্তিময় সালাম পেশ দাঁড়িয়েই করি।

৮.১৮.৯ মীলাদে দাঁড়ানোর প্রথা মূলতঃ খুশি প্রকাশের উদ্দেশ্যে

প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم এর বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনের উল্লেখ/তায়কিরাহ সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল صلی الله علیه وسلم এরই প্রতি আমাদের এশক্ব-মহব্বতের একটি প্রত্যাশা, আকাজক্ষা ও সংশ্লিষ্টতা (তথা ঘনিষ্ঠতা)। তাঁর এই আশীর্বাদপূর্ণ মাস যখনই নিকটবর্তী হয়, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলার দরবারে আমাদের প্রতি সর্ববৃহৎ রহমত-বরকত-নেয়ামত বর্ষণের খাতিরে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করা আমাদের জন্যে অত্যাবশ্যক হয়। প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم এর ধরাধামে শুভাগমন দ্বারা সত্য, নিশ্চয়তা ও হেদায়াতের জ্যোতি সর্বত্র প্রসার লাভ করেছিলো এবং শিকের (অংশীবাদের) তমসা বিদূরিত হয়েছিলো।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم এর অসীলায় সমগ্র মনুষ্যজাতির ওপর আচ্ছন্নকারী অন্ধকার দূর করে দেন। পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির (কালো) ছায়ার মাঝে ঐশী জ্যোতির আবির্ভাব হয় এবং তার দীপ্তিময় কিরণ দিগন্তকে উজ্জ্বল করতে এক নতুন ভোরের জন্ম দেয়। অতএব, মীলাদের সময় আল্লাহ তা‘আলার এ অনুপম অনুগ্রহের জন্যে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের জন্যে বাধ্যতামূলক। এই মাস এবং বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ صلی الله علیه وسلم এর বেলাদতের মহান দিবসটি এক খাস (তথা সুনির্দিষ্ট) রহমত ও আশীর্বাদ।

সৃষ্টিকুল শিরোমণি প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এই নশ্বর দুনিয়ায় তাসরীফ এনে অফুরন্ত খুশি ও সুখশান্তির ভাণ্ডার দ্বারা এটাকে ধন্য করেন, যা আসমান ও জমিনে প্রসার লাভ করে। কেউ আপন মাহবুব صلى الله عليه وسلم এর প্রেমভক্তিতে নিমগ্ন অবস্থায় এই ঘটনা স্মরণ করার মুহূর্তে ক্রিয়াম করলে তা তাঁরই পরিপূর্ণ ঈমানদারির নিদর্শন বটে।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত সকল হাদীস শরীফ প্রথাগত দাঁড়ানোর (মানে ক্রিয়ামের) পক্ষে সমর্থন দেয়। অনুরূপভাবে, প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর প্রশংসায় কাব্য ও পদ্যচর্চার সুবিন্যস্ত রওয়াযাত/বর্ণনাসমূহ হাদীসের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। এই অনুশীলনটি আসলে একটি সুন্নাহ, যা ইমামবন্দ ও হাদীসবেত্তামণ্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইতিহাসজুড়ে ওই সব হাদীস লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি এর (মানে কাব্যচর্চার) পক্ষে নিজেদের মতামত উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত করে বজায় বা জারি রেখেছিলেন।

ক্রিয়াম-সংক্রান্ত এই অধ্যায়টির শেষে আমরা বলতে পারি যে, মানুষের মর্যাদা অনুযায়ী তাঁদের জন্যে দণ্ডায়মান হওয়া একদম অনুমতিপ্রাপ্ত (জায়েয) ও বৈধ এক আচার। একজন ছাত্র তার শিক্ষকের জন্যে দাঁড়ায়, একজন মেজবান তাঁর মেহমানের জন্যে দাঁড়ান, একজন মুরীদ দাঁড়ান তাঁর পীরের (আধ্যাত্মিক গুরুর) জন্যে, এবং একজন সন্তান সৌজন্যস্বরূপ দাঁড়ায় তার পিতা-মাতার জন্যে। এসব পরিস্থিতিতে ক্রিয়াম কেবল বৈধ-ই নয়, বরং ভালোবাসা ও ভক্তি এমর্মে নির্দেশ করে যে এগুলো করা বাধ্যতামূলক। মহব্বত ও সম্মানের উদ্দেশ্য নিয়ে এরকম ক্রিয়াম করার বেলায় নিষেধাজ্ঞার কোনো কিছুই পাওয়া যায় না। অতএব, প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর জন্যে প্রেমভক্তিমূলক ক্রিয়ামের বৈধতাসম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপন এক্ষেত্রে একেবারেই ভিত্তিহীন। এই অনুশীলনটি অখণ্ডনীয়, কেননা কোনো পিতা বা মাতা, শিক্ষক কিংবা আধ্যাত্মিক গুরু (পীর) হতে প্রেমভক্তি পাবার অধিকার প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর অনেক, অনেক বেশি। মীলাদ মাহফিলে আমরা যখন দণ্ডায়মান হই, তখন তা আমাদের মহব্বত ও (আত্মিক) সুখ-শান্তিজনিত ভক্তিশ্রদ্ধা হতেই সূচিত হয়।

৮.১৮.১০ ক্রিয়ামের প্রতি নিষেধাজ্ঞা: এর কারণসমূহ

ক্রিয়াম বা দাঁড়ানোর নিষেধাজ্ঞা প্রশ্নে তা পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল; যেমন- কোনো দাঙ্গিক লোক কোনো মজলিশে বা সমাবেশে প্রবেশ করার সময় যদি চায় যে অন্যরা তার সম্মানার্থে দাঁড়াক, তবে তা নিষিদ্ধ। এ ধরনের ক্রিয়ামের ব্যাপারেই প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم তাঁর মহান সাহাবা কেরাম رضي الله عنهم কে সতর্ক করেছিলেন, যেমনটি বর্ণনা করেছেন সর্ব-ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিজরী), আল-তিরমিযী (২১০-২৭৯ হিজরী) এবং আবু দাউদ (২০২-২৭৫ হিজরী)। কেউ মানুষের সমাবেশে যোগ দেয়ার সময় তাঁদেরকে তার খাতিরে দণ্ডায়মান হতে দেখতে চাওয়ার প্রতি নিন্দাবাদ ওই বর্ণনায় বিধৃত হয়েছে। [লেখকের নোট: আমরা মুয়াবিয়া رضي الله عنه বর্ণনা করেন প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর বাণী:

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ سَرَهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرَّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

-যে ব্যক্তি অন্যান্য মানুষ তার জন্যে দাঁড়াক এতে খুশি হয়, সে যেনো জাহান্নামে নিজের ঘর বানিয়ে নেয়।]৬১৭

অতএব, ক্রিয়ামের প্রশ্নে বিনয় ও নম্রতার প্রতি তাকিদ দেয়া হয়েছে। মানুষ কারো জন্যে অপেক্ষারত থাকলে তাঁদের জন্যে সম্মানার্থে দাঁড়ানো প্রশংসনীয় কাজ, কেননা তা শঙ্কারই বহিঃপ্রকাশ। কেউ তার জন্যে মানুষ দাঁড়াক এমনটি চাইলে সেটা হবে নিন্দনীয় কাজ, যেহেতু তা (মানুষকে) দম্ব ও প্রদর্শনীর দিকে ধাবিত করে। তাই এটা স্পষ্ট করা উচিত যে,

৬১৭. আল-তিরমিযী, ‘আল-জামেউস্ সহীহ: কিতাবুল আদব:’ ‘কারো জন্যে কেউ দাঁড়ানোর দোষ’ শীর্ষক অধ্যায়, ৫:৯০ #২৭৫৫; আবু দাউদ, ‘আল-সুনান: কিতাবুল আদব,’ ‘কারো জন্যে কেউ দাঁড়ানো’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:৩৫৮ #৫২২৯; আল-বুখারী, ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’, ৩৩৯ #৯৭৭ পৃষ্ঠা; আহমদ বিন হাম্বল, ‘আল-মুসনাদ’, ৪:৯৩ ও ১০০; আল-তাবারানী, ‘আল-মুজাম আল-আওসাত’, ৪:২৮২ #৪২০৮; এবং আল-তাবারানী, ‘আল-মুজামুল কবীর,’ ১৯:৩৫১ #৮১৯।

সুনৈতিকতা ও ইসলামী শিক্ষার অংশ হিসেবেই ক্রিয়াম পালন করা হয়, যাতে মানুষ নিজেদের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা গড়ে তুলতে পারেন। পক্ষান্তরে, কেউ কোনো সমাবেশে প্রবেশ করলে এবং তাঁর জন্যে কেউ উঠে না দাঁড়ালে তাঁর রাগ করা ও হতাশ হওয়া উচিত নয়; কেননা তাঁর ভালোভাবে জানা উচিত যে ওই রকম আকাঙ্ক্ষা ইসলামী নৈতিকতা ও শিষ্টাচারের খেলাফ বা পরিপন্থী।

পরিচ্ছেদ: ০৬

আলোকসজ্জার আয়োজন

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনে যিকর-তাযকেরাহ (বা স্মরণ) এর সমাবেশ ও কাব্যিক প্রশংসাস্তুতির বৈঠকগুলো পরম ভক্তিশ্রদ্ধাসহ অনুষ্ঠিত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমনের রাতে আলোকসজ্জার আয়োজন মীলাদেরই আরেকটি ঈমান-আলোকোজ্জ্বলকর দিক। বিভিন্ন রংয়ের বর্ণালি আলোকসজ্জা ইমারতসমূহে ও নগরীর রাস্তাগুলোর চারপাশে টানানো হয়। সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল ﷺ মানবজাতিকে (অজ্ঞতার) তিমির হতে জ্ঞান ও হেদায়াতের আলোতে নিয়ে আসেন: তাঁর মোবারক জাত/সন্তা-ই ওই ঐশী জ্যোতির পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ। এ কারণেই ধরাধামে তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ শুভাগমন বার্ষিকীকে এক বর্ণালি আলোকসজ্জার অপূর্ব প্রদর্শনী দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলা হয়।

প্রত্যেকের মনে হয়তো একটি প্রশ্ন জাগতে পারে: এ ধরনের আচার অনুশীলনের পক্ষে প্রাথমিক যুগের মুসলিম প্রজন্মগুলো হতে কোনো অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত আছে কি? বস্তুতঃ নির্ভরযোগ্য রওয়াযাত/বর্ণনা অনুসারে, খোদ এই প্রশ্নটি আল্লাহ তা'আলারই একটি সূন্যাহ। হযরত উসমান বিন আবী আল-আস্ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাতা হযরত ফাতিমা বিনতে আবদ-আল্লাহ আল-সাক্বফিয়া رضي الله عنها উল্লেখ করেন যে তিনি প্রিয়নবী ﷺ এর বেলাদতের সময় তাঁর মা হযরতে আমিনা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার সাথে ছিলেন। তিনি (আরো) বর্ণনা করেন:

فَلَمَّا وَلَدَتْهُ حَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهُ الْبَيْتُ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ وَالْدَّارُ، فَمَا شَيْءٌ أَنْظَرُ إِلَيْهِ إِلَّا نُورٌ.

—মা আমিনা رضي الله عنها যখন প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم জ্যোতি মা আমিনা رضي الله عنها বেলাদত দেন, তখন একটি (ঐশী) জ্যোতি মা আমিনা رضي الله عنها হতে বিচ্ছুরিত হয়, যা দ্বারা প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর জন্যে ঘর আলোকিত হয়, যে ঘর ও এর আশপাশে আমরা ছিলাম। অতঃপর আমি আর কিছু দেখছিলাম না কেবল (ঐশী) জ্যোতি ছাড়া।^{৬১৮}

সাইয়েদাহ আমিনা رضي الله عنها নিজে প্রায় অনুরূপ এক বর্ণনা দেন:

إِنِّي رَأَيْتُ حَيْنَ وَلَدَتْهُ أَنَّ خَرَجَ مِنِّي نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورٌ بُصِّرَى مِنْ أَرْضِ الشَّامِ .

অর্থ: আমি যখন রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم কে বেলাদত দেই, তখন প্রত্যক্ষ করি আমা হতে বিচ্ছুরিত এক (ঐশী) জ্যোতি, যা সিরিয়ার বসরা এলাকার প্রাসাদগুলোকে আলোকিত করে তুলেছিলো।^{৬১৯}

৬১৮. তাবারানী, ‘আল-মুজাম আল-কবীর,’ ২৫:১৪৭ ও ১৮৬, #৩৫৫ ও ৪৫৭; আল-শায়বানী, ‘আল-আহাদ ওয়াল-মাসানী,’ ৬৩১ পৃষ্ঠা #১০৯৪; আল-মাওযাঈ, ‘আলম আল-নুবুওয়া,’ ২৪৭ পৃষ্ঠা; আল-তাবারী, ‘তারীখ আল-উমাম ওয়াল-মুলুক,’ ১:৪৫৪; আল-বায়হাকী, ‘দালায়েল আল-নুবুওয়া ওয়া মা’রিফা আহওয়াল সাহিব আল-শরীআ,’ ১:১১১; আবু নুয়াইম, ‘দালায়েল আল-নুবুওয়া,’ ১৩৫ পৃষ্ঠা #৭৬; ইবনে আল-জাওযী, ‘আল-মুনতযযাম ফী তারীখ আল-উমাম ওয়াল-মুলুক,’ ২:২৪৭; ইবনে আসাকির, ‘তারীখ দিমাশক আল-কবীর,’ ৩:৭৯ ও ‘আল-সীরাত আল-নববীয়া,’ ৩:৪৬; ইবনে কাসীর, ‘আল-বিদায়া ওয়াল-নিহায়া,’ ২:২৬৪; আল-হায়সামী, ‘মজমাউ’ আল-যাওয়াঈদ ওয়া মানবাআ’ আল-ফওয়াউদ,’ ৮:২২০; ইবনে রজব হামলী, ‘লাতায়েফ আল-মা’আরিফ ফী-মা লি-মাওয়া‘সিম আল-আম মিন আল-ওয়ায়ায়েফ,’ ১৭৩ পৃষ্ঠা; এবং আল-আসকালানী, ‘ফাতহ আল-বারী,’ ৬:৫৮৩।

৬১৯. তাবারানী, ‘আল-মুজাম আল-কবীর,’ ২৪:২১৪ #৫৪৫; ইবনে হিব্বান, ‘আল-সহীহ,’ ১৪:৩১৩ #৬৪০৪; আবদুর রায়যাক, ‘আল-মুসান্নাফ,’ ৫:৩১৮; আল-দারিমী, ‘আল-সুনান,’ ১:২০ #১৩; আল-শায়বানী, ‘আল-আহাদ ওয়াল-মাসানী,’ ৩:৫৬ #১৩৬৯; প্রাণ্ডক, ৪:৩৯৭ #২৪৪৬; আল-হাকিম, ‘আল-মুসতাদরাক,’ ২:৬৭৩ #৪২৩০; আল-হায়সামী বিবৃত করেন ‘মজমাউয্ যাওয়াঈদ’ (৮:২২২) পুস্তকে এ মর্মে যে, সর্ব-ইমাম আহমদ ও তাবারানী এই রওয়াযাতটি বর্ণনা করেছেন, আর ইমাম আহমদের বিবরণটির এসনাদ (বর্ণনাকারীদের পরম্পরা) হাসান/নির্ভরযোগ্য; হায়সামী, ‘মাওয়ারিদ আল-যামান ইলা যওয়াঈদ ইবনে হিব্বান,’ ৫১২ #২০৯৩; ইবনে সা’আদ, ‘আল-তাবাকাত আল-

৮.১৯ তারকারাজি আতশবাজির মতো নেমে এসেছিলো

মানুষেরা কোনো (উৎসব) উদযাপন করার সময় নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী আলোকসজ্জা, আতশবাজি ও মোমবাতির আয়োজনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এসব আলোকসজ্জা দ্বারা তাঁরা নিজেদের ঘরবাড়ি, শহর ও বাজার এলাকা আলোকিত করেন। তবে সমগ্র জাহানের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা’আলা যখন তাঁরই মাহবুব صلى الله عليه وسلم এর বেলাদত শরীফ তথা ধরাধামে শুভাগমনকে আলোকোজ্জ্বল করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি কেবল দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিমকেই আলোকিত করেন নি, বরং দেদীপ্যমান তারকারাজিকে দুনিয়ার কাছে টেনে এনে আসমানী জগতকেও তাতে অন্তর্ভুক্ত করেন।

হযরত উসমান বিন আবী আল-’আস رضي الله عنه বর্ণনা করেন তাঁর মাতা হযরত ফাতিমা বিনতে আব্দিল্লাহ আল-সাক্বফিয়া رضي الله عنها হতে, যিনি বলেন:

حَصَرَتْ وَلَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ الْبَيْتَ حِينَ وَضَعَ قَدِ امْتِلَأَ نُورًا، وَرَأَيْتُ التُّجُومَ تَذْنُو حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّمَا سَتَفَعُ عَلَيَّ.

—প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর বেলাদত শরীফ সমাগত হলে ওই সময় আমি বায়তুল্লাহ শরীফ তথা কা’বা ঘরের দিকে তাকিয়ে সেটাকে

কুবরা,’ ১:১০২; ইবনে এসহাক, ‘আল-সীরাত আল-নববীয়া,’ ১:৯৭ ও ১০৩; ইবনে হিশাম, ‘আল-সীরাত আল-নববীয়া,’ ১৬০; আল-তাবারী, ‘তারীখ আল-উমাম ওয়াল-মুলুক,’ ১:৪৫৫; ইবনে আসাকির, ‘তারীখ দিমাশক আল-কবীর,’ ১:১৭১-২; ইবনে আসাকির, ‘তারীখ দিমাশক আল-কবীর,’ ৩:৪৬৬ ও ‘আল-সীরাত আল-নববীয়া,’ ৩:৪৬; ইবনে কাসীর, ‘আল-বেদায়া ওয়াল-নেহায়া,’ ২:২৭৫; আল-সৈয়ুতী, ‘কেফায়াত আল-তা’লিবি আল-লাবীবি ফী খাসায়েস আল-হাবীব (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম),’ ১:৭৮; আল-হালাবী, ‘ইনসান আল-উয়ুন ফী সীরাত আল-আমীন আল-মা’মুন,’ ১:৮৩; এবং আহমদ ইবনে যাইনী দাহলান, ‘আল-সীরাত আল-নববীয়া,’ ১:৪৬।

আলোকিত দেখতে পাই; আমি তারকারাজিকে এতো কাছে দেখতে পাই যেনো সেগুলো আমার ওপর পতিত হতে চলেছিলো।^{৬২০}

৮.২০ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বেলাদত উপলক্ষে মক্কা মুয়াযযমায় মোমবাতি জ্বালানো

মক্কা মোয়াযযমা সত্যি এক আশীর্বাদময় নগরী এই মর্মে যে, এতে আল্লাহ তা'আলার ঘর (বায়তুল্লাহ শরীফ) ও সর্বশেষ পয়গাম্বর صلی الله علیه এর বেলাদত স্থান বিদ্যমান। এই কারণেই আল্লাহ পাক এ নগরীর নামে শপথ উচ্চারণ করেছেন (তাঁর পাক কালামে)। মক্কাবাসীদের জন্যে এখানকার অধিবাসী হওয়া এক মহাসম্মান বটে। এই নগরীর মানুষেরা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র বেলাদত উপলক্ষে (উৎসব) আয়োজন ও বিশেষ আলোকসজ্জার রীতি চালু রেখেছিলেন। ইমামমণ্ডলী তাঁদের বইপত্রে এ কথা উল্লেখ করেছেন। নিচে তার একটা দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো:

ইমাম মুহাম্মদ জা'ফরুল্লাহ বিন যাহীরা আল-হানাফী (বেসাল: ৯৮৬ হিজরী) মক্কাবাসীদের মীলাদুন্নবী صلی الله علیه وسلم উদযাপন সম্পর্কে বর্ণনা করেন:

وَجَرَتْ الْعَادَةُ بِمَكَّةَ لَيْلَةَ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ عَامٍ أَنَّ قَاضِي مَكَّةَ الشَّافِعِيَّ يَتَهَيَّأُ لَزِيَارَةِ هَذَا الْمَحَلِّ الشَّرِيفِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِي جَمْعٍ

৬২০. আল-সুহায়লী বর্ণিত, 'আল-রওদ আল-উনুফ ফী তাফসীর আল-সীরাত আল-নববীয়া লি-ইবনে হিশাম,' ১:২৭৮-২৭৯; ইবনে আসীর, 'আল-কামিল ফী ত'ারীখ,' ১:৪৫৯; আল-তাবারী, 'তারীখ আল-উমাম ওয়াল-মুলুক,' ১:৪৫৪; আবু নুয়াইম, 'দালায়েল আল-নুবুওয়্যাত ওয়া মা'রিফাত আহওয়াল সা'হিব আল-শরীআহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম),' ১:১১১; ইবনে আল-জাওয়যী, 'আল-মুনতযাম ফী তারীখ আল-মুলুক ওয়াল-উমাম,' ২:২৪৭; ইবনে রজব হাম্বলী, 'লাতায়ফ আল-মা'আরিফ ফীমা' লি-মাওয়া'সিম আল-'আম মিনাল-ওয়ায়া'য়েফ,' ১৭৩ পৃষ্ঠা; আল-সৈয়ুতী, 'কিফা'য়াত আল-তা'লিব আল-লাবীব ফী খাসা'য়েস আল-হাবীব (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম),' ১:৪০; আল-হালাবী, 'ইনসা'ন আল-উয়ুন ফী সীরাত আল-আমীন আল-মা'মুন,' ১:৯৪; এবং আল-নাবহা'নী, 'আল-আনওয়া'র আল-মুহাম্মদীয়া মিনাল-মাওয়া'হিব আল-লাদুন্নিয়াহ,' ২৫ পৃষ্ঠা।

عَظِيمٍ، مِنْهُمْ الثَّلَاثَةُ الْقُضَاةُ وَالْأَكْثَرُ الْأَعْيَانِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْفُضَّلَاءِ، وَدَوِيَ الْبُيُوتُ بِقَوَانِيْسٍ كَثِيرَةٍ وَشُمُوعٍ عَظِيمَةٍ وَزِحَامٍ عَظِيمٍ. وَيُدْعَى فِيهِ لِلْإِسْلَامِ وَلَا يُؤْمَرُ مَكَّةَ، وَلِلْقَاضِي الشَّافِعِيِّ بَعْدَ تَقْدَمِ خُطْبَةٍ مُنَاسِبَةٍ لِلْمَقَامِ، ثُمَّ يَعُودُ مِنْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قُبَيْلَ الْعِشَاءِ، وَيَجْلِسُ خَلْفَ مَقَامِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِزَاءِ قُبَّةِ الْفِرَاشِينَ، وَيَدْعُو الدَّاعِي لِمَنْ ذُكِرَ أَنْفًا بِمَحْضُورِ الْقُضَاةِ وَالْأَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ. ثُمَّ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ وَيَنْصَرِفُونَ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى أَوَّلِ مَنْ سَنَّ ذَلِكَ، سَأَلْتُ مُؤَرِّخِي الْعَصْرِ فَلَمْ أَجِدْ عَنْدهُمْ عِلْمًا بِذَلِكَ .

-মক্কা শরীফে প্রতি বছর পালিত একটি রীতি হলো এই যে, ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফের রাতে মক্কার শাফেঈ (মাযহাবের) কাজী (বিচারক) সাহেব মাগরেব নামাযশেষে বিশাল জনসমাবেশ-সহ প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم এর পবিত্র বেলাদত-স্থানটি যোয়ারতের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন; এতে অন্তর্ভুক্ত থাকেন অপর তিন মাযহাবের (তথা হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী) বিচারকদ্বয়, অধিকাংশ ফক্বীহ-মণ্ডলী, জ্ঞানী-গুণী পুণ্যাভাবুন্দ ও বাড়িঘরের (নেককার) সদস্যবৃন্দ। তাঁদের সাথে থাকে ঝাড়বাতি-দানি, বিশালাকৃতির প্রদীপ/বাতি ও মোমবাতি। এই সমাবেশে মানুষেরা (উসমানী) সুলতানের জন্যে দোয়া করেন; এরপর দোয়া করেন মক্কার আমীরের জন্যে; আর শাফেঈ বিচারক অনুষ্ঠানের সাথে মানানসই খুতবা প্রদান করেন। অতঃপর তাঁরা এশা'র নামাযের জন্যে মসজিদে হারামে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তাঁরা মাক্কামে ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের পেছনে বসেন, যা 'কিবলা-এ-ফারা'নিশ'-এর সামনে অবস্থিত। এরপর আমাদের সবেমাত্র উল্লেখিত ঘোষক মহোদয় বিচারকমণ্ডলী ও অধিকাংশ ফক্বীহদের উপস্থিতির আহ্বান জানান, আর তাঁরা সবাই এশা'র নামায আদায় করে স্থানত্যাগ করেন। এই রীতি প্রথমে যে ব্যক্তি চালু

করেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে আমি জানতে পারি নি; ওই সময়কার ইতিহাসবিদদেরকে জিজ্ঞেস করেও কোনো উত্তর পাইনি। ৬২১

আল্লামা কুতবুদ্দীন হানাফী তাঁর প্রণীত- كتاب الإعلام بأعلام بيت الله - (কিতাবুল এ'লামি বে-আলামি বায়তিল্লাহাল্
الحرام تاريخ مكة المشرفة - (হা'রাম তারীখি মাককাল মুশার'রাফাত) শিরোনামের গ্রন্থে মক্কাবাসীবৃন্দের
আচরিত রীতি সম্পর্কে কিছু বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লেখেন:

يُزَارُ مَوْلِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِي فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ عَامٍ، فَيَجْتَمِعُ الْفُقَهَاءُ وَالْأَعْيَانُ عَلَى نِظَامِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْقُضَاةِ الْأَرْبَعَةِ بِمَكَّةَ الْمُشْرِفَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِالشُّمُوعِ الْكَثِيرَةِ وَالْمَقَرَّغَاتِ وَالْفَوَانِيسِ وَالْمَشَاغِلِ وَجَمِيعِ الْمَشَائِخِ مَعَ طَوَائِفِهِمْ بِالْأَعْلَامِ الْكَثِيرَةِ وَيَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى سُوقِ اللَّيْلِ وَيَمْشُونَ فِيهِ إِلَى مَحَلِّ الْمَوْلِدِ الشَّرِيفِ بَارِزْدَحَامٍ وَيَخْطُبُ فِيهِ شَخْصٌ وَيَدْعُو لِلسُّلْطَنَةِ الشَّرِيفَةِ، ثُمَّ يَعُودُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَيَجْلِسُونَ صُفُوفًا فِي وَسْطِ الْمَسْجِدِ مِنْ جِهَةِ الْبَابِ الشَّرِيفِ خَلْفَ مَقَامِ الشَّافِعِيَّةِ وَيَقِفُ رَئِيسُ زَمَرَمَ بَيْنَ يَدَيْ نَاطِرِ الْحَرَمِ الشَّرِيفِ وَالْقُضَاةِ وَيَدْعُو لِلسُّلْطَانِ وَيُلْبِسُهُ النَّاطِرُ خِلْعَةً وَيُلْبِسُ شَيْخَ الْفَرَاشِينَ خِلْعَةً. ثُمَّ يُؤَذِّنُ لِلْعِشَاءِ وَصَلَّى النَّاسُ عَلَى عَادَتِهِمْ، ثُمَّ يَمْشِي الْفُقَهَاءُ مَعَ نَاطِرِ الْحَرَمِ إِلَى الْبَابِ الَّذِي يُخْرَجُ مِنْهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَتَقَرَّفُونَ. وَهَذِهِ مِنْ أَعْظَمِ مَوَاقِبِ نَاطِرِ الْحَرَمِ الشَّرِيفِ بِمَكَّةَ الْمُشْرِفَةِ وَيَأْتِي النَّاسُ مِنَ الْبَدْوِ وَالْحَضَرِ وَأَهْلِ جَدَّةَ، وَسُكَّانِ الْأَوْدِيَةِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَيَفْرَحُونَ بِهَا .

-প্রতি বছর রবীউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ রাতে প্রিয়নবী ﷺ এর বেলাদত-স্থান যেয়ারত করা হয়; আর ফক্বীহ-মণ্ডলী,

পবিত্র কা'বা শরীফের দায়িত্বশীল গণ্যমান্য ব্যক্তিবৃন্দ ও চার মাযহাবের কাজী/বিচারকমণ্ডলী সবাই মাগরেবের নামাযের শেষে সমবেত হন; তাঁরা অসংখ্য মোমবাতি, ঝাড়বাতি, মিষ্টি ও মশাল এবং সুগন্ধি বহন করেন; আর সমস্ত পীর-মাশায়েখ তাঁদের নিজ নিজ মুরীদান-সহ আগমন করেন। তাঁরা মসজিদ থেকে বের হয়ে 'সূখ আল-লায়ল'-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, যেখানে তাঁরা লোকে লোকারণ্য পবিত্র বেলাদত-স্থানের দিকে হাঁটতে থাকেন। তাঁদের মধ্য হতে কেউ একজন খুতবা পেশ করে মহান (উসমানীয় তুর্কী) সালতানাতের জন্যে দোয়া করেন, আর তাঁরা (এরপর) পবিত্র কা'বা শরীফ মসজিদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মসজিদের মাঝখানে সারিবদ্ধ হয়ে আল-বাব আশ্ শরীফের দিকে মুখ করে বসেন। কাজী-মণ্ডলী এরপর সুলতান ও একজন তত্ত্বাবধায়ককে আহ্বান করেন আর তাঁকে (কিসওয়া'র) একটি বস্ত্র পরিয়ে দেন; অতঃপর আযান দেয়া হয় এবং মানুষেরা রীতি অনুযায়ী এশা'র নামায পড়েন। নামায শেষ হলে ফক্বীহ-মণ্ডলী তত্ত্বাবধানকারীর সাথে হেঁটে মসজিদের বাইরে আসেন এবং যাঁর যাঁর পৃথক পথে প্রস্থান করেন। মক্কার পবিত্র কা'বা ঘরের তত্ত্বাবধানকারীর জন্যে এটা মহা সম্মানগুলোর একটা। প্রত্যন্ত এলাকা ও শহরগুলো এবং জেদ্দাহ ও উপত্যকা অঞ্চলের সব মানুষ এই রাতে সমবেত হন এবং এ উপলক্ষে খুশি উদযাপন করেন। ৬২২

এই আলোচনা হতে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, খুশির কোনো ঘটনায় আলোকসজ্জা করা আল্লাহ তা'লার সুন্নাত। আর সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল **صلی اللہ علیہ وسلم** এর মহা আশীর্বাদপূর্ণ বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমন উপলক্ষে খুশি উদযাপনের চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ কী হতে পারে? অতএব, যুক্তিতর্ক পরিহার করে আমাদের উচিত সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'লার সুন্নাহ/রীতি অনুসরণ করা এবং মক্কায় যেভাবে এ বিশেষ দিনে আলোকসজ্জা সহকারে এই (ঐশী) প্রথা উদযাপিত হতো, ঠিক সেভাবেই মীলাদুন্নবী **صلی اللہ علیہ وسلم** উদযাপন করা।

৬২১. ইবনে যাহীরা, 'আল-জামে আল-লতীফ ফী ফাদল মক্কা ওয়া আহলিহা ওয়া বিনা' আল-বায়ত আল-শরীফ,' ২০১-২০২ পৃষ্ঠা।

৬২২. কৃতবুদ্দীন আল-হানাফী, ‘কিতাবুল আ’লামি বে-আলামি বায়তিল্লাহাল হারাম তারীখি মাককাল মুশার্রাফাত’, ৩৫৫-৩৫৬ পৃষ্ঠা।

পরিচ্ছেদ: ০৭

খাবার বণ্টন

মীলাদুন্নবী ﷺ এর মাহফিল-সমাবেশে অংশগ্রহণকারী মুসলমানবৃন্দের প্রত্যেকের জন্যে পানাহারের সামগ্রী মওজুদ থাকে। বিভিন্ন পদের উন্নত খাবার ও মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা হয় এবং উপভুক্ত বিতরণ করা হয়। অন্যদেরকে খাওয়ানো শরীয়তে জায়েয কাজ, আর এটা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এর দৃষ্টিতে অতি পছন্দনীয় এক আমল। কুরআন ও হাদীসে এর প্রতি বেশ তাকিদ দেয়া হয়েছে।

৮.২১ মানুষদেরকে খাওয়ানোর চমৎকার গুণ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বর্ণনা

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাক কালামে অন্যদের খাওয়ানোকে ঈমানদারের গুণগত বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا.

—আর আল্লাহর ভালোবাসায় (নিজেদের চাহিদা ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও উৎসর্গ করার নিমিত্তে নিজেদের) আহাৰ্য দান করেন অভাবগ্রস্তকে, এতিমকে এবং বন্দীকে। ৬২৩

২. হজ্জের একটি প্রথা হচ্ছে পশু কুরবানী। আল্লাহ তা'আলা বিধান করেছেন যাতে এসব কুরবানীর পশুর গোস্ত কুরবানীদাতাবন্দ খান এবং গরিব-দুঃস্থদের মাঝেও বিতরণ করেন:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.

—অতঃপর তোমরা তা থেকে নিজে(ও) খাও, আর দুঃস্থ অভাবগ্রস্তকে(ও) খাওয়াও। ৬২৪

৩. আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে ঘোষণা করেন:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْفَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ.

—তখন তোমরা নিজেরা এ থেকে খাও এবং তাদেরকেও খাওয়াও যারা সংযমী এবং যাপ্ণকারী (অভাবগ্রস্ত)। ৬২৫

৪. সবচেয়ে বদান্যতায় পরিপূর্ণ রাসূল ﷺ খাবার গ্রহণে তাঁর মহান সাহাবা রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমবন্দকে আমন্ত্রণ জানাতে ছিলেন অভ্যস্ত, যেমনটি কুরআন মজীদে বিবৃত হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ

—হে ঈমানদারবর্গ! খাবারের অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা (সম্মানিত) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গৃহে প্রবেশ করো না, (সময়ে পূর্বে পৌঁছে) খাবার রান্না হওয়ার অপেক্ষাও করো না। হ্যাঁ, তোমাদেরকে আহবান করলে তখন তোমরা প্রবেশ করো, অতঃপর ভোজন শেষে (সেখান থেকে উঠে) ততক্ষণাৎ চলে যেও এবং তথায় কথাবার্তায় মগ্ন হয়ে থেকো না। ৬২৬

এ সব আয়াতে করীমা থেকে স্পষ্ট হয় যে, অন্যদেরকে খাবার গ্রহণের দাওয়াত করা এবং আপন বন্ধু ও গরিব-দুঃস্থ বা অভাবী মানুষকে

খাওয়ানো প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর অকৃত্রিম একটি সুন্যাহ (রীতিনীতি) এবং তা আল্লাহ তা'লার একটি আদেশ।

৮.২২ অন্যদেরকে খাওয়ানোর জন্যে হাদীসে প্রদত্ত উৎসাহ

সবচেয়ে সদয় রাসূল صلى الله عليه وسلم বিভিন্ন উপলক্ষে আপন আত্মীয়স্বজনের পাশাপাশি গরিব-দুঃস্থ ও অভাবী মানুষদের আহাৰ্য দানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। নিচে এর সমর্থনসূচক কিছু হাদীস বিধৃত হলো:

১. হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে সর্বাধিক সম্মানিত নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়: “ইসলামে কোন্ কাজটি সেরা?” তিনি উত্তর দেন:

تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

—অন্যদের আহাৰ্য দান করা এবং পরিচিত বা অপরিচিতদের সালাম সম্ভাষণ জানানো।^{৬২৭}

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে সবচেয়ে সম্মানিত পয়গাম্বর صلى الله عليه وسلم যখন মদীনা মোনাওয়ারায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রথম যে কথা বলতে শুনে তা হলো:

৬২৭. সহীহ বুখারী: কিতাব আল-ঈমান, ‘ইসলামে অন্যদের আহাৰ্য দান’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:১৩ #১২; সহীহ বুখারী: ‘কিতাবুল ঈমান,’ ‘সালাম সম্ভাষণের প্রসার’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:১৯ #২৮; সহীহ বুখারী: استئذان ‘ঘরে প্রবেশের অনুমতি’ শীর্ষক কিতাব, ‘কারো পরিচিত ও অপরিচিতদের প্রতি সালাম’ শীর্ষক অধ্যায়, ৫:২৩০২ #৫৮৮২; সহীহ মুসলিম: ‘কিতাবুল ঈমান,’ ‘ঈমানের শ্রেণিভেদ’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:৬৫ #৩৯; সুনানে আবী দাউদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘কিতাবুল আদব,’ ‘সালামের প্রসারকরণ’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:৩৫০ #৫১৯৪; সুনানে নাসাঈ: ‘কিতাব আল-ঈমান,’ ‘ইসলামে কী সেরা’ শীর্ষক অধ্যায়, ৮:১০৭ #৫০০০; এবং সুনানে ইবনে মাজাহ: ‘কিতাব আল-আত-ঈমা,’ ‘অন্যদের খাদ্য দান’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:১০৮৩ #৩২৫৩।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

—ওহে মানব সকল! শান্তিময় সালামের প্রসার করো; অন্যদের খাদ্য দান করো; আর মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ওয়াক্জিয়া নামায আদায় করো; তোমরা শান্তিতে বেহেশতে প্রবেশ করবে।^{৬২৮}

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর رضي الله عنه বর্ণনা করেন সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রাসূল صلى الله عليه وسلم এর বাণী, যিনি বলেন:

اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

—পরম করুণাময় আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী করো; অন্যদের আহাৰ্য দান করো; আর শান্তিময় সালামের প্রসার করো; তোমরা শান্তিতে বেহেশতে প্রবেশ করবে।^{৬২৯}

৪. হযরত উমর ফারুক رضي الله عنه মানুষকে মাত্রাতিরিক্ত আহাৰ্য দান করায় হযরত সুহায়ব رضي الله عنه এর প্রতি তিরস্কার করেন এই বলে যে এটা নিহায়েৎ অপচয়। হযরত সুহায়ব رضي الله عنه নিজ অভ্যেসকে মতোসঙ্গত প্রমাণ করতে উত্তরে সবচেয়ে দয়াবান রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم এর কথা উদ্ধৃত করেন:

خَيْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَرَدَّ السَّلَامَ.

৬২৮. তিরমিযী, জামেউস্ সহীহ: ‘কিতাব সিফাত আল-কিয়ামত ওয়াল-রাফায়েকু ওয়াল-ওয়ারা’, ৪:৬৫২ #২৪৮৫; সুনানে ইবনে মাজাহ: ‘কিতাবু এক্বামতিস্ সালাত ওয়া সুন্নাতু ফীহা,’ ‘রাত জেগে এবাদত’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:৪২৩ #১৩৩৪; সুনানে ইবনে মাজাহ: ‘কিতাবুল আত-ঈমা,’ ‘অন্যদের খাদ্য দান’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:১০৮৩ #৩২৫১; ইমাম আহমদ কৃত ‘মুসনাদ’, ৫:৪৫১ #২৩,৮৩৫; এবং সুনানে দারিমী, ৪:৪০৫ #১৪৬০।

৬২৯. ইমাম তিরমিযী প্রণীত ‘আল-জামেউস্ সহীহ’: কিতাবুল আত-ঈমা, ‘অন্যদের খাওয়ানোর ফযীলত সম্পর্কে আমাদের কাছে যা বর্ণিত হয়েছে’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:২৮৭০ #১৮৫৫; ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) রচিত ‘মুসনাদ’, ২:১৭০ #৬৫৮৭; সুনানে দারিমী, ২:১৪৮ #২০৮১; আল-বায়হার কৃত ‘আল-বাহর আল-যুখার (আল-মুসনাদ), ৬:৩৮৩ #২৪০২; এবং আল-বুখারী লিখিত ‘আল-আদাব আল-মুফরাদ’, ১:৩৪০ #৯৮১।

–তোমাদের মাঝে সেরা সেই ব্যক্তি, যে অন্যদের খাদ্য দান করে এবং যে শান্তিময় সালামের প্রত্যুত্তর দেয়।^{৬৩০}

৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস্ رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে সবচেয়ে করুণাশীল নবী পাক صلى الله عليه وسلم এরশাদ ফরমান:

مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ خُبْزًا حَتَّى يُشْبِعَهُ، وَسَقَاهُ مَاءً حَتَّى يَرْوِيَهُ، بَعَّدَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَعًى خَدَاقٍ بَعْدَ مَا بَيْنَ خَنْدَقَيْنِ مَسِيرَةَ خَمْسِ مِائَةِ سَنَةٍ.

–যে ব্যক্তি তার (দ্বীনী) ভাইকে রুটি খেতে দেয় যতোকক্ষণ না সে তৃপ্ত হয় এবং তাকে পানি পান করতে দেয় যতোকক্ষণ না তার তেষ্ঠা মেটে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সাতটি খন্দক দূরে রাখবেন - যে একটি খন্দক থেকে অপর খন্দকের দূরত্ব হবে ৫০০ বছর।^{৬৩১}

এ সব আহাদিস হতে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, বৈষম্য ছাড়াই অন্যদের আহায্য দান করা সর্বোচ্চ পর্যায়ের পুণ্যদায়ক একটি কাজ। এটা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে দূরে রাখার এবং জান্নাতের বাগানে নিজের চূড়ান্ত আবাসস্থল বানানোর একটি মাধ্যম। অতএব, নিত্য কোনো দিনে যদি কেউ অতোখানি পুরস্কার লাভ করতে পারেন, তাহলে সে দিনটি কেমন হতে পারে, যেদিন সৃষ্টিকুল শিরোমণি, সৃষ্ট জীবকুলের অধিপতি ও মানবজাতির ত্রাতা প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এই ধরাধামে শুভাগমন করেছিলেন? ওই আশীর্বাদপূর্ণ দিবসে অন্যদের আহায্য দান করা আরো কতোখানি বেশি পুরস্কারযোগ্য হবে?

৬৩০. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল কৃত ‘আল-মুসনাদ’, ৬:১৬ #২৩,৯৭১ এবং ২৩,৯৭৪; আল-তাহাবী, ‘শরহ মা‘আনী-ইল-আসার’, ৪:১৬৬-১৬৭ #৭১০৫; আল-হাকিম, ‘আল-মুসতাদরাক’, ৪:৩১০ #৭৭৩৯; এবং আল-বায়হাকী, ‘শু‘আবুল ঈমান,’ ৬:৪৭৮ #৮৯৭৩।

৬৩১. ইমাম হাকিম, ‘আল-মুসতাদরাক,’ ৪:১৪৪ #৭১৭২; আল-তাবরানী, ‘আল-মু‘জামুল আওসাত,’ ৬:৩২০ #৬৫১৮; আল-বায়হাকী, ‘শু‘আবুল ঈমান,’ ৩:২১৮ #৩৩৬৮; আল-দায়লামী, ‘আল-ফেরদৌস বি-মা‘সুর-ইল-খিতাব,’ ৩:৫৭৬ #৫৮০৭; মুনিযরী, ‘আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব মিনাল-হাদীসিশ্ শরীফ,’ ২:৩৬ #১৪০৩; এবং আল-হায়সামী, ‘মজমা‘উয যাওয়াঈদে ওয়া মামবা‘ঈল ফাওয়াঈদ,’ ৩:১৩০।

পরিচ্ছেদ: ০৮

মীলাদের জুলুস বা মিছিল

মীলাদুন্নবী صلى الله عليه وسلم উপলক্ষে জশনে জুলুস তথা শোভাযাত্রা বা মিছিলের আয়োজন করা (বর্তমানে) ওই দিনটি উদযাপনের অত্যাাবশ্যকীয় একটি অংশে পরিণত হয়েছে। এই ভক্তিমূলক অনুশীলন মহান সাহাবা-এ رضي الله عليه এর সুন্নাত/রীতি। রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ এর যুগে মিছিলসমূহ অনুষ্ঠিত হতো, যার মধ্যে সাহাবা رضي الله عنهم মণ্ডলী ছিলেন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। নিম্নবর্ণিত হাদীসগুলোতে এর প্রমাণ মেলে:

প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর মদীনায় হিজরতের ঘটনা প্রধান প্রধান হাদীসের পুস্তকে এবং সীরাত/জীবনীগ্রন্থে নিম্ন উপায়ে বর্ণিত হয়েছে:

প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর মদীনায় আগমন যখন আসন্ন, সেই দিনগুলোতে সমস্ত বয়োবৃদ্ধ ও যুবক, নারী ও পুরুষ পবিত্র নগরীর কয়েক মাইল বাইরে কুবা’ এলাকায় প্রতিদিন (দল বেঁধে) হেঁটে যেতেন এবং সেখানে আগ্রহ সহ তাঁর আগমনের জন্যে অপেক্ষা করতেন। এক দিন দীর্ঘ যাত্রা শেষে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর صلى الله عليه وسلم উপস্থিত হলে মানুষের আনন্দের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিলো না। কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই প্রত্যেক ব্যক্তি ঘর হতে বেরিয়ে (খুশির বহিঃপ্রকাশস্বরূপ) শহরের রাস্তায় ও অলি-গলিতে জুলুস-মিছিল করেন।

হাদীসের ভাষ্যানুসারে:

فَصَعَدَ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، وَتَفَرَّقَ الْعُلَمَاءُ وَالْحَدَثُ فِي الطَّرِيقِ يَتَأَدُّونَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ.

—পুরুষ ও নারীকুল তাঁদের গৃহের ছাদে ওঠেন। ছোট ছোট শিশুরা ও গোলামবৃন্দ রাস্তায় রাস্তায় ছুটোছুটি করে ঘোষণা করেন: এয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ عليه وسلم! ৬০২

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সওয়ারকে দেখতে পেয়ে মদীনাবাসীবৃন্দের অন্তর বাঁধভাঙ্গা আনন্দে আপ্পত হয়। ইমাম আল-রুএয়ানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর ভাষ্যানুসারে, শহরের নাগরিকবৃন্দ একটি (খুশি) উদযাপনমূলক মিছিলে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রশংসাস্বরূপ ঘোষণা করেন:

جَاءَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ [صلی الله علیه وسلم].

—রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করেছেন। ৬০৩

বনু আউস ও বনু খায়রাজ গোত্র দুটোর নিরীহ-নির্মল আত্মার তরুণী মেয়েরা দফ বাজাচ্ছিলেন এবং প্রিয় মেহমানকে (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বাগত জানিয়ে গান গাইছিলেন:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا * مِنْ ثِيَابِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا * مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعٍ

أَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا * جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ

হেদায়াতের পূর্ণচ্ছদ আমাদের ভাগ্যাকাশে ‘আল-ওয়াদা’আ’ এলাকায়
হয়েছেন উদ্ভিত,

যতোদিন আল্লাহর কোনো এবাদতকারী থাকবেন আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে
হবো বাধিত,

৬০২. সহীহ মুসলিম: ‘কিতাবু যুহদ ওয়ার-রাফায়েক’, ‘হিজরতের ঘটনা সংক্রান্ত’ অধ্যায়, ৪:২৩১১ #২০০৯; সহীহ ইবনে হিব্বান, ১৫:২৮৯ #৬৮,৯৭০; আবু এয়া‘লা কৃত ‘আল-মুসনাদ’, ১:১০৭ #১১৬; এবং আল-মারওয়ানী রচিত ‘মুসনাদু আবী বকর,’ পৃষ্ঠা-১২৯ #৬৫।

৬০৩. ইমাম আল-রুএয়ানী বর্ণিত: ‘মুসনাদুস সাহাবা’, ১:১৩৮ #৩২৯।

হে রাসূল, আপনি আমাদের মাঝেই হয়েছেন (খোদা কর্তৃক) লালিত-পালিত,
এসেছেন নিয়ে এক (ধর্মীয়) আদেশ যা হতে হবে মান্যকৃত। ৬০৪
(ভাবানুবাদ)

মীলাদুন্নবী ﷺ এর গঠনাত্মক উপাদানসমূহ সম্পর্কে ওপরের পৃষ্ঠাগুলোতে যা লেখা হয়েছে, তাতে এ কথা স্পষ্ট যে প্রিয়নবী ﷺ এর মীলাদ/বেলাদত দিবস ওপরোক্ত পদ্ধতিতে উদযাপন করা সম্পূর্ণভাবে জায়েয বা বৈধ। শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ এটাই ছিলো মুসলমান সমাজের উদযাপন পদ্ধতি বা রীতি। এখানে উল্লেখিত হয়েছে এমন একটি অনুশীলনও নেই যার উৎস রাসূলুল্লাহ ﷺ

رضي الله عنهم أجمعين এর যুগে খুঁজে পাওয়া যায় না, অথবা যা কুরআন ও হাদীসের খেলাফ/পরিপন্থী। এ সব গঠনাত্মক উপাদান যেমন বৈধ এবং এককভাবে প্রত্যেকটির ব্যাপারে (ইমাম/উলামাবৃন্দের) ঐকমত্য যেমন প্রতিষ্ঠিত, ঠিক অনুরূপভাবে এগুলোকে সামষ্টিকভাবে মীলাদুন্নবী ﷺ এর একটি আমল/অনুশীলন হিসেবে একত্রিত করা হয়েছে; আর এগুলো শরীয়তে জায়েয তথা বৈধতা অর্জন করেছে।

৬০৪. ইবনে আবী হা‘তিম আল-রাযী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক ‘আল-সিকাত’ (১:১৩১) গ্রন্থে বর্ণিত; ইবনে আদিল বার কৃত ‘আল-তামহীদ লিমা ফীল মুওয়াত্তা মিনাল মা‘দানী ওয়াল-আসা‘নীদ’, ১৪:৮২; আবু উবায়দ আল-আনদালুসী, ‘মু‘জাম মা ইত্তা‘জামা মিন আসমা’ আল-বিলাদ ওয়াল-মাওয়া‘দী’, ৪:১৩৭৩; মুহিব্ব আল-তাবারী, ‘আল-রিয়াদ আল-নাদরা ফী মানা‘ক্বিব আল-আশরা’, ১:৪৮০; আল-বায়হাক্বী, ‘দালায়েল আল-নুবুওয়া ওয়া মা‘রিফা আহওয়াল সাহিব আল-শরীআ ২:৫০৭, ২:৫৮৩; প্রাগুক্ত, ৩:২৬০; আল-আসকালানী, ‘ফাতহুল বারী’, ৭:২৬১; প্রাগুক্ত ৮:১২৯; আল-কুসতলানী, ‘আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া বিল-মিনাহ আল-মুহাম্মদীয়া’, ১:৬৩৪; আল-যুরকানী, শরহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়া বিল-মিনাহিল মুহাম্মদীয়া ৪:১০০-১০১; এবং আহমদ বিন যাইনী দাহলান মক্কী, ‘আল-সীরাতুল নাবাউইয়্যা’, ১:৩২৩।

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনে যে-কোনো ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ, যা (এতদুপলক্ষে) খুশি প্রকাশের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা শরীয়তে সম্পূর্ণভাবে বৈধ। একইভাবে, মীলাদুন্নবী ﷺ এর মাহফিল-সমাবেশ আধ্যাত্মিক দিক থেকে প্রশংসনীয় ও মকুবুল/গ্রহণযোগ্য আমল। এই বরকতময় বা আশীর্বাদপূর্ণ অনুশীলনের বৈধতা প্রশ্নে তর্কবিতর্ক করা হলো প্রকৃতপ্রস্তাবে বাস্তবতা হতে বিচ্ছিন্ন হওয়াই। বস্তুতঃ এটা মনের সংকীর্ণতা, অজ্ঞতা ও একগুঁয়েমি ছাড়া কিছু নয়।

নবম অধ্যায়

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি
ওয়াসাল্লাম)-এর বিভিন্ন দিক: একটি সংক্ষিপ্ত
পর্যালোচনা

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা মানুষের নানা চাহিদা পূরণে একটি মাধ্যম সৃষ্টি করেছেন, যা দ্বারা তার দৈহিক ও বস্তুগত চাহিদাগুলো পূরণ করা যায়। পক্ষান্তরে, পারলৌকিক জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যেও তিনি তাদেরকে এমন ধার্মিকতা ও হেদায়াত/পথপ্রদর্শন দান করেছেন, যা দ্বারা নৈতিক ও আত্মিক প্রত্যাশাগুলো তারা পূরণ করতে পারে।

এই আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শন ও ধার্মিকতার জ্যোতির্ময় কাফেলার যাত্রা আরম্ভ হয়েছিলো মানবজাতির পিতা পয়গাম্বর আদম (আলাইহিস্ সালাম)’এর সৃষ্টির মাধ্যমে, যাঁর পরে আদমিয়া ও রাসূল (আলাইহিমিস্ সালাম)’মণ্ডলীর ক্রমধারা বজায় রাখা হয়েছিলো; আর তাঁরা পথহারা মানুষের প্রজন্মগুলোকে রক্ষা করে হেদায়াতের পথে ফিরিয়ে আনেন। তবু বিভ্রান্তি/পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার তমসা মানুষের ওপর এমন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে যে, দীর্ঘকালের মনুষ্য ইতিহাসের কোনো এক বাঁকে সভ্যতা-ভব্যতার লেশচিহ্ন মাত্র আর অবশিষ্ট ছিলো না। অমতো, অবিচার, স্বৈরাচার ও জুলুমের বর্বরতার শিকারে পরিণত হয়েছিলেন অনেকে। মানব ইতিহাসের ঘন তমসাচ্ছন্ন রাত যখন চরমে পৌঁছে, ঠিক তখনই ঐশী বিধানের নিয়ম অনুসারে এক নব সূর্যোদয় ঘটে, যার চিরস্থায়ী জ্যোতি দুনিয়ার শেষ সময় পর্যন্ত ওই অমানিশাময় রাতের প্রভাব দূর করে দেয়। হেজাযের হাওয়ায় ওয়াহদানিয়াত তথা প্রভুর একত্বের ঘোষণা প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। মক্কার উপত্যকা পরিণত হয় সেই নিষ্পাপ ও খাঁটি-নির্মল পুণ্যাত্মার মীলাদ-স্থানে, যাঁর শুভাগমনের প্রতি সাগ্রহ প্রতীক্ষারত ছিলো আসমান ও জমিন; এমন কী সৃষ্টির সূচনাকাল হতে খোদ সময়ও।

সৃষ্টিকূল শিরোমণি, আশীর্বাদময় রাসূল ﷺ এর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব প্রাণহীন দেহগুলোতে প্রাণের সঞ্চারণ করেন, যা নতুন ইতিহাস অধ্যায়ের সূচনা করে - মানব মর্যাদার নতুন অধ্যায় রচিত হয়। এই সর্বাধিক সদাশয় ও পুতঃপবিত্র সত্তা ও তাঁরই সমস্ত অন্তর-আকর্ষণকারী কমনীয়তা ও মাধুর্যের আবির্ভাবে জগতসমূহের (তাবৎ) সৌন্দর্য আপনা হতে তাঁর মহত্ত্বে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে শির অবনত করে। এটা বন্দনা করা ছাড়া কবির আর গত্যন্তর ছিলো না:

زفرق تابه قدم هر کجا که می نگریم

کرشده دامن دل می کشد که جاین جاست

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপাদমস্তকের প্রতি যখনই আমি করি নজর,

তাঁর সৌন্দর্যের কমনীয়তা বিমোহিত করে আমার পুরো অন্তর।
[ভাবানুবাদ]

সবচেয়ে মহৎ পয়গাম্বর ﷺ এর বেলাদত/মীলাদ নবযুগের অভ্যুদয় ঘটায়; আর যদিও চৌদ্দ শ বছর (ইতোমধ্যে) অতিক্রান্ত হয়েছে, তবু এই জগত-স্থলে এ সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের শুভাগমন অদ্যাবধি উদযাপিত হচ্ছে। পৃথিবী জুড়ে মুসলমান সমাজ আজো উৎফুল্লচিত্ত এবং এতো সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার পরও তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রবীউল আউয়াল মাসের এই আশীর্বাদময় দিনটিকে নিজেদের অন্তরে অনুভূত ধর্মীয় আবেগ প্রকাশের মাধ্যমে উদযাপন করেন।

এই অধ্যায়ে আমরা সংক্ষেপে মীলাদুন্নবী ﷺ এর বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করবো, যাতে এর বিশ্লেষণের আওতাভুক্ত কোনো বৈশিষ্ট্য-ই বাদ না পড়ে যায়:

১. শরীয়তের দিক;
২. ঐতিহাসিক দিক;
৩. সাংস্কৃতিক দিক;
৪. নির্দেশনামূলক দিক;
৫. দাওয়া বা ধর্মপ্রচারের দিক;
৬. উদ্বুদ্ধকরণের দিক; এবং
৭. আধ্যাত্মিক দিক।

৯.১ শরীয়তের দিক

এ যাবৎ আমাদের বইয়ে মীলাদুন্নবী صلى الله عليه وسلم উদযাপন সংক্রান্ত শরঈ দিক নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। অতঃপর এখানে কিছু বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা যথেষ্ট মনে করি:

৯.১.১ আল্লাহ'র বর্ষিত রহমত-বরকতের স্মরণ

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে ঘোষণা করেন:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

—আর নিশ্চয়ই আমরা প্রেরণ করেছিলাম মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে আমাদের নিদর্শনাবলী সহকারে যে, ‘(হে মূসা!) তুমি তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যাও। আর তাদেরকে আল্লাহর দিবসগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দাও (যা তাদের এবং তাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতি এসেছিল)।’ নিশ্চয়ই এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে পরম ধৈর্যশীল, (এবং) কৃতজ্ঞতা আদায়কারীর জন্যে।^{৬৩৫}

এই আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হযরত উবাইদ ইবনে কা'আব রাঈয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে তিনি সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল صلى الله عليه وسلم কে শুনেছেন এ কথা বলতে:

إِنَّهُ بَيْنَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وَأَيَّامُ اللَّهِ بِلَاؤُهُ وَنَعْمَاؤُهُ.

—পয়গাম্বর মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর জাতিকে আল্লাহর দিনগুলো স্মরণ করিয়ে দিতেন। আল্লাহর দিনগুলো হলো তাঁরই (পক্ষ হতে) পরীক্ষা ও নেয়ামত/আশীর্বাদের দিনসমূহ।^{৬৩৬}

৬৩৫. আল-কুরআন, ১৪:৫।

৬৩৬. ইমাম কুরতুবী প্রণীত ‘আল-জামিউ লি-আহকামিল কুরআন’, ৯:৩৪২।

কুরআনী আয়াত - وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ - প্রসঙ্গে তাফসীরশাস্ত্রের উলামাবৃন্দ সাহাবী হযরতে ইবনে আব্বাস رضي الله عنه এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন এ মর্মে:

بِنِعْمِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

—(এটা) তাঁদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত/আশীর্বাদ মঞ্জুর-করণ।^{৬৩৭}

হযরতে ইবনে আব্বাস رضي الله عنه এর বিখ্যাত উত্তরসূরী ও শিষ্য হযরত মুজাহিদ رضي الله عنه এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেন এভাবে:

بِالنَّعْمِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْهِمْ: أَنْجَاهُ مِنْ آلٍ فِرْعَوْنَ وَفَلَقَ لَهُمُ الْبَحْرَ وَظَلَّلَ عَلَيْهِمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى.

—এটা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি মঞ্জুরকৃত নেয়ামত, (যেমন) ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দান; সাগর (দু'ভাগে) ভাগ হয়ে যাওয়া; (চরম উষ্ণ আবহাওয়ায়) মেঘমালা দ্বারা তাঁদেরকে ছায়া দান; এবং আল্লাহ কর্তৃক তাঁদের প্রতি মান্না ও সালওয়া প্রেরণ।^{৬৩৮}

এই আয়াতটি নাযেল/অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য ছিলো এটা প্রদর্শন করতে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর দানকৃত নেয়ামতগুলো বনী ইসরাঈল জাতি স্মরণ করতেন, যাতে তাঁদের অনাগত প্রজন্মগুলোও এসব আশীর্বাদ স্মরণ করেন এবং এ দিনগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে পারেন; যেমন - আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক ফেরাউনকে পানিতে ডুবিয়ে তার স্বজনপ্রীতি হতে তাঁদেরকে মুক্তি দান, মরুভূমির উত্তাপ হতে তাঁদেরকে ছায়া দান, এবং মান্না ও সালওয়া'র মতো বেহেশতী খাবার দ্বারা তাঁদের রিযিকের (মানে খাদ্যের) ব্যবস্থা করা। অতএব, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি ওই

৬৩৭. আল-কুরতুবী, ‘আল-জামিউ লি-আহকামিল কুরআন,’ ৯:৩৪১; আস-সৈয়তী, ‘আদ-দুর্বুল মানসুরে ফীত-তাফসীরি বিল-মা'সূর,’ ৫:৬; এবং আশ-শওকানী, ‘ফাতহুল ক্বাদীর,’ ৩:৯৫।

৬৩৮. আত্ তাবারী, ‘জামেউল বয়ানে ফী তাফসীরিল কুরআন,’ ১৩:১৮৪; এবং আস্ সৈয়তী, ‘আদ দুর্বুল মানসুরে ফীত-তাফসীরি বিল-মা'সূর,’ ৫:৬।

সব সমৃদ্ধির সময়গুলোকে বাৎসরিকভাবে স্মরণ করার আদেশ দিয়েছেন, যা দ্বারা তাঁরা আল্লাহরই দানের স্মৃতিচারণকে অল্লান বা জাগুরুক রাখেন এবং এর সাথে সাথে তাঁরই নেয়ামত/আশীর্বাদগুলোর জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

৯.১.২ খাদ্য-ভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়ার দিনটিকে ঈদ হিসেবে উদযাপন
কুরআন মজীদ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে:

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

—মারইয়াম-তনয় ঈসা (আলাইহিস সালাম) আরয় করলেন, ‘হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে আসমান থেকে (নিয়ামতের) দস্তরখানা অবতীর্ণ করো, যা (অবতীর্ণ হওয়ার দিন) আমাদের জন্যে হবে ঈদ-উৎসব, আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্যে(ও) এবং আমাদের পরবর্তীদের জন্যে(ও); আর (এ দস্তরখানা) হবে তোমার পক্ষ থেকে নিদর্শন, এবং আমাদেরকে রিযিক দান করো, আর তুমিই সবচেয়ে উত্তম রিযিকদাতা।’^{৬৩৯}

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজ ‘জামেউল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন’ গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, সবচেয়ে বিশুদ্ধ বর্ণনায় আয়াতোল্লিখিত দু’আ’টির মানে হলো খাদ্য-খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়ার দিনটিকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত, যে ঈদের দিনে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নামায আদায় করা হয় এবং সেইভাবে উদযাপন করা হয়, যেমনটি মানুষেরা তাঁদের ঈদ উৎসবগুলো উদযাপন করে থাকেন।^{৬৪০}

ইমাম তাবারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই ব্যাখ্যা এ বাস্তবতার প্রতি আলোকপাত করে যে, পয়গাম্বর ঈসা আলাইহিস সালাম খাদ্য-খাঞ্চা অবতীর্ণ হওয়ার এ দিনটিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রার্থনার একটি বার্ষিক

৬৩৯. আল-কুরআন, ৫:১১৪।

৬৪০. ইমাম তাবারী, ‘জামেউল বয়ান ফী তাফসীরিল-কুরআন,’ ৭:১৭৭।

তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন। এ দৃষ্টান্ত হতে পরিস্ফুট হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক মানবজাতির প্রতি নির্দিষ্ট কোনো নেয়ামত/আশীর্বাদ প্রেরণের দিনকে সম্মান প্রদর্শনার্থে (তাঁর প্রতি) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, এবাদত-বন্দেগী পালন করা এবং ঈদ হিসেবে উদযাপন করা ধার্মিক পুণ্যাত্মাবৃন্দের আচরিত প্রথা।

এ কথা ভেবে নিশ্চিত বলা যায়, যেদিনটিতে সর্বোত্তম ও সর্বশেষ পয়গাম্বর صلى الله عليه وسلم এই ক্ষণস্থায়ী ধরণীর আবাসভূমে আবির্ভূত হন, তা অন্যতম এক ঈদ দিবস; কেননা এ সময়েই আল্লাহ তা‘লার চূড়ান্ত অনুগ্রহ ও করুণা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়। অতএব, ঈদ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার ক্ষেত্রে এ দিনটির অধিকতর অধাধিকার রয়েছে; এটা আল্লাহ তা‘আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁরই এবাদত-বন্দেগী পালনের (শুভ)-লগ্ন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা‘লার দৃষ্টিতে এটা একটা প্রশংসনীয় আমল/অনুশীলন, যা তাঁরই মনোনীত বান্দাবৃন্দের দ্বারা ধারাবাহিকভাবে আচরিত হয়ে আসছে।

৯.২ ঐতিহাসিক দিক

ইসলামের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মীলাদুন্নবী صلى الله عليه وسلم উদযাপন করেছেন। এক্ষেত্রে যাঁর নাম সবচেয়ে উজ্জ্বল, তিনি হলেন সুলতান আবু সাঈদ আল-মুযাফফর শাহ কাওকাবুরী (বেসাল: ৬৩০ হিজরী); তিনি সুলতান গাযী সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (৫৩২-৫৮৯ হিজরী) এর ভগ্নিপতি। আবু আল-খাতাব বিন দিহইয়া আল-কালবী (৫৪৪-৬৩৩ হিজরী) এই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন ‘আত্ তানউইয়ু ফী মীলাদিল-বাহীরিন্ নাযীর’ গ্রন্থে। আবু মুযাফফর ইউসুফ (ইন্তেক্বাল: ৬৫৪ হিজরী), যিনি সিবত আল-জাওয়ী নামে সমধিক পরিচিত, তিনি ‘মির’আতুয্ যা়মানে ফী তারীখিল আ’য়্যা’ন’ শীর্ষক পুস্তকে সুলতানের পালিত মীলাদ উৎসবের বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন।^{৬৪১}

৬৪১. নোট: অনুগ্রহ করে এ বইয়ের ৬ষ্ঠ অধ্যায় দেখুন: মওলিদুন্নবী صلى الله عليه وسلم উদযাপনে মুহাদ্দেসীন ও ইমামবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গি।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হতে পর্যবেক্ষণ করা যায় যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আদেশ কেবল উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর প্রতি খাস বা সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল পূর্ববর্তী উম্মতদের বেলায়ও প্রযোজ্য। কুরআন মজীদে ইসরাঈল বংশীয়দের প্রতিও একই আজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে:

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اٰنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِيْنَ.

—হে (বনী ইসরাঈল!) ইয়াকুবের সন্তানেরা! স্মরণ করো আমার অনুগ্রহের কথা, যা আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছিলাম, আরো এ যে, আমি তোমাদেরকে (সে যুগে) সকল মানুষের উপর মর্যাদা দান করেছিলাম।^{৬৪২}

একইভাবে, পয়গাম্বর ঈসা আলাইহিস্ সালামের দুআ*টি বাড়তি সমর্থন যোগায় এ বাস্তবতার প্রতি যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে এই পস্থায় আল্লাহ তা‘লার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আদেশ দেয়া হয়েছিলো।

আল-কুরআন পয়গাম্বর যাকারিয়া আলাইহিস্ সালামের কাছে ভবিষ্যতে তাঁর পুত্র পয়গাম্বর ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালামের বেলাদত/মীলাদের সুসংবাদ প্রদানের বর্ণনাও দেয়:

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اٰنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِيْنَ.

—(এরশাদ হলো,) ‘হে যাকারিয়া! নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে ইয়াহইয়া (আলাইহিস্ সালাম); এ নাম তাঁর পূর্বে আমরা কাউকে দেইনি।’^{৬৪৩}

পয়গাম্বর ঈসা আলাইহিস্ সালামের বেলাদত সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ করা হয় এভাবে:

৬৪২. আল-কুরআন, ২:৪৭।

৬৪৩. আল-কুরআন, ১৯:৭।

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰۤمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اَسْمُ الْمَسِيْحِ عِيسٰى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ.

—যখন ফেরেশতারা বললো, ‘হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে নিজের পক্ষ থেকে একটি (বিশেষ) বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হবে ‘মারইয়াম তনয় মাসীহ্ ঈসা’ (আলাইহিস্ সালাম), তিনি হবেন (উভয় জাহান) ইহকাল ও পরকালে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এবং আল্লাহর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের মধ্যে গণ্য হবেন।^{৬৪৪}

ইতিহাসের চশমা দ্বারা আমরা জাতিসমূহের অতীত ও বর্তমান জীবনধারা বিশ্লেষণ করলে অখণ্ডনীয় বাস্তবতা হিসেবে প্রতীয়মান হবে এই যে, প্রতিটি যুগে সাধারণ মানুষের স্মৃতিতে যে সব দিবস তাৎপর্যপূর্ণ, সেগুলো বেশ জাঁকজমক সহকারে উদযাপিত হয়েছে। এমন কী আমাদের সময়েও দুনিয়াজুড়ে সব দেশে স্মরণীয় ঘটনাগুলো বাৎসরিকভাবে উদযাপন করা হয়। পাকিস্তানকেই উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক: প্রতি বছর ২৩ শে মার্চ লাহোর ঘোষণা দিবস, ১৪ ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস, ৯ ই নভেম্বর ইকবাল দিবস ও ২৫ শে ডিসেম্বর কায়দে আয়ম দিবস পালন করা হয়। একইভাবে, আরব দেশগুলো এবং সারা বিশ্বের অন্যান্য সব দেশে এই ধরনের ঘটনাগুলো উদযাপন করা হয়। আরব বিশ্বে কোনো বাদশাহ কর্তৃক সিংহাসনে আরোহণকে ‘আল-ঈদুল-ওয়াতানী (জাতীয় উদযাপন দিবস) হিসেবে পালন করা হয়।

সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল صلى الله عليه وسلم এর বেলাদত/মীলাদ দিবস-ও ওই সব ঘটনার একটা, যা (ইসলামের) ইতিহাসে একটি ঈদ হিসেবে উদযাপন করা হয়েছে। অন্যান্য উদযাপনের ব্যতিক্রমস্বরূপ এ উদযাপন কুরআন ও সুন্নাহ’র মতো বিশ্বস্ত বা নির্ভরযোগ্য উৎসের ওপর ভিত্তিহীন। বিশেষ কিছু লোকের দ্বারা উত্থাপিত আপত্তিগুলোর পেছনে কারণ হচ্ছে মীলাদের প্রতি তাদেরই সুনির্দিষ্ট বৈরিতা; নতুবা আপত্তির তো কোনো ভিত্তি-ই নেই। সবচেয়ে মর্যাদাবান নবী صلى الله عليه وسلم এমনই এক

৬৪৪. আল-কুরআন, ৩:৪৫।

বিপ্লব সাধন করেছিলেন যা ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করে দিয়েছিলো; এই কীর্তির পুনরাবৃত্তি আর কখনোই সম্ভব হবে না। তাঁর উত্তরসূরীবৃন্দ তাঁরই মহিমাম্বিত ও অমর শিক্ষাসমূহকে ধারণ করে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, আর এরই ফলশ্রুতিতে তাঁরা সভ্যতার আলো জ্বালান - পরবর্তীকালে আগত প্রজন্মগুলোকে নীতি ও সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ করে তোলেন। এই অসাধারণ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে খোদ ইতিহাসই (আজ) গর্বিত। এই মহা অর্জনের সাথে তুলনীয় হবার মতো কোনো কীর্তি-ই দুনিয়ার শেষ অবধি আর আসবে না। অতএব, মুসলমান সমাজের জন্যে এটা সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিষয় যে তাঁরা ওই জুড়িবিহীন প্রগতিসূচক কীর্তির অনুঘটক প্রিয়নবী صلی اللہ علیہ وسلم এর মীলাদ দিবস উদযাপনের মাধ্যমে অন্যান্য জাতির চেয়ে (দিবস উদযাপনের ক্ষেত্রে) অগ্রগামী হন। তাঁদের উচিত এমন জাঁকজমকের সাথে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করা, যাতে তা কবি ইকবালের আবেগ-অনুভূতিকে প্রতিধ্বনিত করে, যখনই তিনি কাব্যাকারে বলেছিলেন:

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کروے

وہر میں اسم محمد سے اُجالا کروے

ভালোবাসার শক্তি দ্বারা কোনো অতিক্রম প্রতিটি বাধা,
প্রতিটি যুগ কোনো উজাসিত প্রিয়নবী (صلی اللہ علیہ وسلم)'র নাম দ্বারা।

৯.৩ সাংস্কৃতিক দিক

প্রাচীনকাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানব সমাজের (ব্যক্তি ও সম্প্রদায় পর্যায়ে) আচার-আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং খুশি ও শোক প্রকাশের পদ্ধতি প্রতিনিয়ত বিবর্তিত হচ্ছে। প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে যা দ্বারা তাকে চিহ্নিত করা যায়: খুশির সময় প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আপন ঐতিহ্য অনুসারে তার উৎসবগুলো উদযাপন করে, যদিও এসব সংস্কৃতি ও প্রথা সময়ের পরিক্রমণে পরিবর্তিত হয়।

মুসলমান জাতি এ নিয়মের ব্যতিক্রম নন। ইসলামী প্রথম শতাব্দীর মুসলমানবৃন্দ নিজেদের খুশি প্রকাশে ছিলেন বেশ অনাড়ম্বর মানুষ; কিন্তু সময়ের পরিক্রমণে সংস্কৃতি ও নিয়মের নিত্য প্রবাহের ছাঁচে এ সব পদ্ধতিকে ঢেলে সাজানো হয়। ইসলামী প্রথম কয়েক শতাব্দীর মানুষ তাঁদের খুশি প্রকাশসূচক পদ্ধতিতে অধিকতর সংযত ছিলেন, কিন্তু এটা আধুনিক যুগে আরো ব্যাপকতর ও সরব পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। জীবনধারায় পরিবর্তন, জনসংখ্যা বিস্তারণ, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কেন্দ্রীয় প্রভাব, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং সামগ্রিক সমৃদ্ধি-ই হচ্ছে এই ক্রমাগত পরিবর্তনের কারণসমূহ; যার ফলশ্রুতিতে মীলাদ/মীলাদ আরো বৃহৎ পরিসরে এবং জাঁকালো মাত্রায় উদযাপিত হচ্ছে।

প্রধান একটি বাৎসরিক উদযাপনের উদাহরণ হলো পাকিস্তানের 'বসন্ত' উৎসব, বসন্তকালে যেটা ব্যাপকভাবে সেখানে পালিত হয়। এটা জাতীয় পর্যায়ে উদযাপিত হয় এবং আগাম কয়েক সপ্তাহ ধরে এর পরিকল্পনা চলে; আর হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টে এর অস্তিত্বের পক্ষে আইনকানুনও বিদ্যমান। পাকিস্তানী লাখ লাখ রুপী/টাকা ঘুড়ি, আতশবাজি, মোমবাতি/ঝাড়বাতি ও রকমারি খাবার ক্রয় বাবদ ব্যয় করা হয়। এই অতিব্যয়ের উৎসবে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সারা দুনিয়া হতে মানুষ লাহোরে প্রতি বছর আগমন করেন। এতে অংশগ্রহণকারীদের (বিপুল) সংখ্যার কারণে প্লেনে বা ট্রেনে টিকেট পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বসন্ত উৎসবের প্রাপ্তিসাধ্য ফলাফল যা-ই হোক না কেন, তা উৎসবের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে স্তান হয়ে যায়। অনেক মানুষ ভিড়ে পদদলিত হয়ে মারা যান; লাখ লাখ রুপী অপচয় হয়; নারী-পুরুষের আলাদা থাকার নিয়মের অভাবে অবাধ মেলামেশার দরুন প্রচুর অনৈতিকতা ও পাপ সংঘটিত হয়। তবু এ সব হতাশাব্যঞ্জক প্রভাব সত্ত্বেও এই উৎসবটিকে পাকিস্তানের ঐতিহ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে বিবেচনা করা হয় - ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

আজকালকার সংস্কৃতির দ্বিতীয় এক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পহেলা জানুয়ারীতে খবরের কাগজগুলোর সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ও সংবাদ প্রচার হতে। নববর্ষ এমনই মহা জাঁকজমকের সাথে উদযাপন করা হয়, যার দরুন তা আল্লাহ তা'লার গযব (নারাজি) ও আযাব (শাস্তি) ডেকে আনে।

তৃতীয় নজির হলো ‘ভ্যালেন্টাইন দিবস,’ যাকে পত্রপত্রিকা ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম ‘ভালোবাসা দিবস’ হিসেবে প্রচার করে; এরই ফলশ্রুতিতে তরুণ সমাজকে পশ্চিমা সংস্কৃতি অনুকরণে উৎসাহিত করা হয়, যার দরুন চারিত্রিক গুণচিহ্ন ও ইজ্জত-আবরূর ইসলামী রীতিনীতির লঙ্ঘন করা হয়। তরুণ-তরুণীদের কাছে অনৈতিকতার পাঠ প্রকাশ্যে দান করা হয় এভাবে যে, ছেলে ও মেয়েদের আলাদা না করেই তাদেরকে পার্টিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। পাকিস্তানী সরকার এই অধঃপতনের প্রতিকারে কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?

এ করুণ পরিস্থিতিতে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনে মাহফিল আয়োজন, যার ফলে অংশগ্রহণকারীরা জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা পান, তার গুরুত্ব এখন আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে ঢের বেশি। এই ধরনের মাহফিলে বর্ষিত খোদায়ী রহমত/আশীর্বাদ দ্বারা আমরা হয়তো বসন্ত দিবস, নববর্ষ ও ভ্যালেন্টাইন দিবসগুলোর মতো উৎসবের ক্ষতিকর দিকগুলো আমাদের সমাজ হতে চিরতরে দূর করতে সক্ষম হবো। দুঃখের বিষয় হলো, প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা হতে মানুষের বঞ্চিত হওয়ার কারণে উদ্ধৃত শূন্যতা পূরণ করছে ওই জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠানগুলো। এমতাবস্থায় আমাদের ওপর এই দায়িত্ব বর্তেছে যে, আমরা যুগের চাহিদা অনুযায়ী জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার করি।

আমরা ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবো যে, মদীনায়ে হিজরত, মদীনার সনদ, বদরের যুদ্ধ, মক্কা বিজয় ও কুরআন নাযেলের দিবস সবই ওই যুগে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো। এগুলোর প্রতিটি উপাখ্যান-ই ইতিহাসের গতি ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি পরিবর্তনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলো, কিন্তু মুসলমানদের প্রথম প্রজন্ম এগুলো উদযাপন করেননি। এর কারণ একদম সহজ: এটা তাঁদের সংস্কৃতি ও রীতিগত দিক ছিলো না। তবে এই বর্তমান যুগে ওই সব নিয়মে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এর ফলে আমরা কেবল উপরোক্ত ঘটনাগুলো মহা উৎসাহ নিয়ে উদযাপনই করছি না, বরঞ্চ যুগের সাধারণ ধারার সাথে সঙ্গতি রেখে আমরা তা পালনও করছি। অধিকন্তু,

পাকিস্তান দিবস, স্বাধীনতা দিবস, প্রতিরক্ষা দিবস, পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠাতার দিবস, আন্তর্জাতিক শ্রমদিবস, বিশ্ব নারী দিবস ইত্যাদির মতো ঐতিহাসিক দিনগুলোকেও আমাদের এই তালিকায় যোগ করা উচিত।

সর্বাধিক মর্যাদাবান রাসূল ﷺ এর বেলাদত/মীলাদ দিবস উপলক্ষে উসমানীয়া খেলাফত আমলে (তুরস্কে) ২১ বার তোপধ্বনি দেয়া হতো। একইভাবে, মক্কা, মদীনা, ইয়েমেন ও শাম (সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্দান, লেবানন, ইসরাঈল) এলাকাগুলোতেও মহা জাঁকজমকের সাথে মীলাদ পালিত হতো, যা ইতিপূর্বকার অধ্যায়সমূহে খোলাসা করা হয়েছে। বর্তমানকালে কোনো আরব দেশের রাজার সিংহাসনে আরোহণ কেবল ওই বছরই উদযাপিত হয় না, বরং পরবর্তী প্রতিটি বছরও সেই শাসককে উপহারসামগ্রীতে ভাসিয়ে তা পালিত হয়। তাঁর সম্মানে তোপধ্বনি ও অংশগ্রহণকারীদের মাঝে মিষ্টি বিতরণসহ সামগ্রিক একটি উৎসবের আমেজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমা বিশ্ব খ্রিস্টমাস উদযাপন করে ২৫ শে ডিসেম্বর, যদিও এর প্রস্তুতি কয়েক মাস আগে থেকেই নেয়া হয়। দিনটির প্রতি ঘনিষ্ঠতা প্রতিফলনের লক্ষ্যে দোকানপাট, বাড়িঘর ও হাটবাজারকে সাজিয়ে তোলা হয়, আর ইউরোপ ও আমেরিকায় সেপ্টেম্বর হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের বেলাদত তথা মীলাদে যদি এই পর্যায়ে উৎসব পালন হতে পারে, তাহলে প্রিয়নবী ﷺ এর মীলাদ দিবসে কী করা উচিত, যাঁর অসীলায় পয়গাম্বর ঈসা মসীহ ও অন্যান্য আশিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) তাঁদের নুবুওয়্যত পেয়েছেন, আর যিনি হলেন পয়গাম্বর ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামেরই দু‘আ’র পূর্ণতাপ্রাপ্তি? তাঁর বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমন উপলক্ষে মুসলমানদের কী পর্যায়ে খুশি প্রকাশ করা উচিত?

আজকে জীবনযাত্রা এমনই পর্যায়ে আমূল পরিবর্তন হয়েছে যে, স্বাধীনতা দিবস ও এ জাতীয় দিনগুলোর উদযাপন আমাদের জীবনধারা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়টি সম্পর্কে জেনে আমরা মীলাদ হতে কীভাবে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি, যে মীলাদ ইসলামী ঐতিহ্যের একটি চমৎকার প্রতীক? সবচেয়ে মর্যাদাবান রাসূল ﷺ

صلیٰ علیہ وسلم এর প্রতি প্রেমভক্তি হচ্ছে ঈমানের নির্যাস। তাঁর সর্বোত্তম অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ও শিক্ষাসমূহকে আঁকড়ে ধরার পাশাপাশি মীলাদ হচ্ছে তাঁর প্রতি কারো এশকু-মহব্বত প্রকাশের সেরা উপলক্ষ। এটা একটা মহা অমতো ও পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান মুসলমান শাসকবর্গ তাঁদের ক্ষমতায় আরোহণ উপলক্ষে নজিরবিহীন জাঁকজমকের আয়োজন করেন, আর কেউই তাতে ভুরু কুঁচকান না, অথবা তাঁদের প্রতি শির্ক বা বিদআতের দোষারোপও করেন না। অথচ যখনই সৃষ্টিকুল শিরোমণি صلیٰ علیہ وسلم এর মীলাদ একই রকম জাঁকজমকের সাথে উদযাপন করা হয়, তৎক্ষণাৎ নির্দিষ্ট কিছু জবান ওর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং কলমগুলো এ প্রথাকে ধর্মবিরোধিতা ও অংশীবাদের (মানে শির্কের) একটি আকার বলে সাব্যস্ত করতে অস্থির হয়ে ওঠে!

৯.৪ নির্দেশনামূলক দিক

বর্তমান বিশ্বের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় অতীতের যে-কোনো সময়ের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের সন্তানদের অন্তরে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রাসূলুল্লাহ صلیٰ علیہ وسلم এর এশকু-মহব্বত ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করা, যাতে তাঁর প্রতি প্রেম-ভালোবাসা তাদের অন্তরের সর্বত্র অনুরণিত হয়। তাঁর সাথে এক অটুট বন্ধন আমাদের সন্তানদের গড়ে তোলা উচিত। এটা অর্জনে মীলাদুন্নবী صلیٰ علیہ وسلم এর সমাবেশগুলোর চেয়ে শ্রেয়তর পন্থা আর কী হতে পারে, যা এই সম্পর্ককে অটল, অবিচল রাখতে একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে? এ প্রসঙ্গে একখানা হাদীস আমরা পেশ করবো, যেটা প্রকৃতপক্ষে এ মর্মে দিকনির্দেশনা দেয়:

أَدَّبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: حُبِّ نَبِيِّكُمْ، وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

-আমি তোমাদের সন্তানদের প্রতি তিনটি বৈশিষ্ট্যের দিকনির্দেশনা দিচ্ছি: তোমাদের নবী صلیٰ علیہ وسلم এর প্রতি মহব্বত রাখো; তাঁর আহলে বায়ত (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এর প্রতিও রাখো; আর কুরআন তেলাওয়াত করো।^{৬৪৫}

এই হাদীস শরীফে আরোপিত শর্ত পূরণের অন্যতম একটি কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে শিশুদেরকে কচি বয়সেই মীলাদ মাহফিলগুলোতে অংশগ্রহণের জন্যে উৎসাহিত করা। তাদেরকে নরম পন্থায় এই ধরনের মাহফিলের দিকে ধাবিত করতে হবে - যে মাহফিলগুলোতে প্রিয়নবী صلیٰ علیہ وسلم এর সীরাত/জীবনী আলোচনা ও তাঁর প্রশংসাসূচক কাব্য আবৃত্তি করা হয়। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা উচিত, যাতে শিশু-কিশোররা তাদের নবী صلیٰ علیہ وسلم এর প্রতি বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগপূর্ণ টান অনুভব করতে শেখে। চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পরে মাও সেতুং-এর অডিও টেইপ/ক্যাসেটগুলো শিশুর জন্মগ্রহণের প্রায় পরপরই কানে বাজানো হতো; এই কার্যক্রম চলেছিলো অনেক বছর ধরে। অনুরূপভাবে, রুশ বিপ্লবের পরে যুবকদেরকে লেনিনের (১৮৭০-১৯২৪ খৃষ্টাব্দ) বিভিন্ন কীর্তির কাহিনি শোনানো হতো। ইরানী বিপ্লবের সময় শিশুদেরকে নিয়মিত খোমেনীর (১৯০২-১৯৮৯ খৃষ্টাব্দ) ভাষণ শোনানো হতো। এ সব পদক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিলো নিশ্চিতভাবে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে শিশু প্রতিনিয়ত কোনো বিশেষ দর্শন বা ভাবধারা শোনার ক্ষেত্রে অভ্যস্ত হয়, যতোক্ষণ না তা তার মস্তিষ্কে দৃঢ়ভাবে শেকড় গেড়ে বসে।

৬৪৫. আল-সৈয়তী কৃত 'আল-জামেউস সগীর ফী আহাদীসিল্ বাশীরিন্ নাযীর,' ১:২৫ #৩১১; এবং আল-হিন্দী প্রণীত 'কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকুওয়াল ওয়াল-আফআল,' ১৬:৪৫৬ #৪৫৪০৯।

৯.৪.১ পিতামাতার মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

কোনো মুসলমান ও অভিভাবক হিসেবে আমাদের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে অনাগত প্রজন্মগুলোর জন্যে প্রকৃত ঈমানদারির ধনদৌলত দান হিসেবে রেখে যাওয়া। কয়েক বছর পেছনে ফিরে তাকালে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে, ঈমানদারির অমূল্য ধনভাণ্ডার ও রাসূল ﷺ এর প্রতি এশকু-মহব্বত আমাদের দ্বারা লাভ করার লক্ষ্যে আমাদের আপন আপন পিতা-মাতা মহা ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করেছিলেন। এখন এই উত্তরাধিকার আমাদের নিজেদের সন্তানদের কাছে হস্তান্তর করা আমাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলোর কাছে এই বার্তা ধারাবাহিকভাবে পৌঁছুতে পারে। এই উপায়ে এক চেরাগ পরবর্তী চেরাগের প্রজ্জ্বলন বজায় রাখবে। এই কাজটি যথাযথভাবে পালনে আমরা যদি ব্যর্থ হই, তাহলে আমাদের গাফিলতির দায়ে শেষ বিচার দিবসে আমাদেরকে অনস্বীকার্যভাবে জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে।

৯.৪.২ চিন্তার খোরাক

আমাদের জীবন সম্পর্কে আমরা চিন্তাভাবনা করলে সার্বিকভাবে দেখতে পাবো যে, আমাদের বেশির ভাগই নিজেদের আরাম-আয়েশের ও সুবিধার জন্যে আমাদের পিতা-মাতা হতে ধনসম্পদ, জমিসম্পত্তি ও ব্যবসা লাভ করেছে। পরবর্তীতে আমরা রাত-দিন নিরলসভাবে কাজ করছি, যাতে আমরা দুনিয়া ত্যাগের আগে আমাদের সন্তানদের জন্যে এ জগতের যতোটুকু সম্ভব রেখে যেতে পারি। এটা কতো দুর্ভাগ্যজনক যে, আমরা ঈমানদারির মৌলনীতি ও প্রিয়নবী ﷺ এর এশকু-মহব্বতেরও প্রাপক ছিলাম, কিন্তু তা আমাদের সন্তানদের কাছে হস্তান্তর করার ন্যূনতম চেষ্টাও আমরা করিনি। আমাদের সন্তানবর্গ যদি একই চর্চা অনুকরণ করে, তাহলে আমাদের নাতি-পুত্রির জন্যে তা কী ইঙ্গিত বহন করবে? অমূল্য ঈমানী দৌলত হতে তাদের জন্যে কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকবে কি?

৯.৪.৩ ঈমান হেফায়ত বা রক্ষার কৌশল

মুসলিম জগতের করুণ দশা সত্যি হতাশাজনক। ধর্মনিরপেক্ষতা ও অবিশ্বাসের কালো থাবা তাঁদের ওপর মন্দ প্রভাব ফেলেছে, আমাদেরই তরুণ প্রজন্মের ঈমানী দৌলত কেড়ে নিতে। এমনি সময়ে সবচেয়ে সম্মানিত রাসূল ﷺ এর সীরাত/জীবনী ও হেদায়াত/সু-পথপ্রদর্শনের সাথে আমাদের ও আমাদের সন্তানদের পরিচিত হওয়া আরো বেশি জরুরি। আমাদের অধীন সমস্ত উপায়-উপকরণের সদ্যবহার করে আমাদেরকে সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হবে নিজেদের ও সন্তানদের অন্তরগুলো প্রিয়নবী ﷺ এর এশকু-মহব্বত দ্বারা জ্যোতির্ময় করে তোলার, যাতে এই দ্যুতি চিরস্থায়ী হয় পরবর্তী প্রজন্মগুলোর এ থেকে ফায়দা লাভের উদ্দেশ্যে।

এই প্রয়াস তবু রাসূল ﷺ এর শিক্ষাসমূহ প্রচার-প্রসারের আকারে এবং কুরআন ও সুন্নাহ'র বার্তা সংক্রান্ত স্টাডি সার্কেল/পাঠচক্র প্রতিষ্ঠা দ্বারা সারা বছর ধরে চলে। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ

এর উচ্চ সম্মান সম্পর্কে সুপ্রচারণা যাতে আরো বেগবান করা যায়, সে লক্ষ্যে পবিত্র রবীউল আউয়াল মাসে এই প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা উচিত; এই বরকতময় মাসে তাঁর মার্জিত সৌন্দর্য, সুস্বাণময় কোঁকড়া কেশদাম, বায়ু-প্রবাহিত মদীনার রাস্তাঘাট ও সবুজ গুম্বজের প্রশান্তিময় পরিবেশ সম্পর্কেও উল্লেখ করা উচিত। এসব বর্ণনা শ্রোতাবৃন্দের অন্তর ও আত্মাকে বিমোহিত করে। তাঁর বেলাদতের সময়কালে মা আমিনা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক ও তাঁর সহজ-সরল ও নির্মল শৈশবকালে মা হালিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক প্রত্যক্ষকৃত অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলীর উল্লেখও থাকা বাঞ্ছনীয়। সংক্ষেপে, পুরো মাস ব্যাপী রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গভীর মহব্বত অন্তরগুলোতে সঞ্চার করতে হবে তাঁরই পবিত্র বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমন ও যৌবনের আশ্চর্যজনক উপাখ্যানগুলোর বর্ণনা উপস্থাপনের মাধ্যমে।

অতএব, প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি আমাদের সন্তানদের এশকু-মহব্বত বৃদ্ধির প্রত্যাশায় মীলাদ মাহফিল-সমাবেশে যোগদানের জন্যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে এই সুবর্ণ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার চেয়ে বেশি কার্যকর আর কী হতে পারে? এই উপায়ে আশা করা যায়, আমাদের যুব সম্প্রদায়ের অন্তর ও আত্মা সর্বোচ্চ মর্যাদাবান নবী ﷺ এর ব্যক্তিত্বের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে সম্পর্কযুক্ত হতে পারবে।

৯.৫ দা'ওয়া বা ধর্মপ্রচারের দিক

মীলাদুন্নবী ﷺ এর বিভিন্ন দিকগুলোর মধ্যে মীলাদের দা'ওয়া দিকটি মহা তাৎপর্য বহন করে। রবীউল আউয়াল মাস আগমন করলে এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে বিভিন্ন মায়হাবের অনুসারীদের দাওয়াত করা হয়। মীলাদ মাহফিলগুলো মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় এবং নানা কার্যক্রম বা কর্মসূচি সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে পালিত হয়, যাতে প্রিয়নবী ﷺ এর সীরাত/জীবনী ও চরিত্রবৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। তাঁর প্রশংসায় না'ত-শে'র/পদ্য ইত্যাদি আবৃত্তি ও গাওয়া হয়। তাঁর উন্নত নৈতিকতা, প্রশংসনীয় আচার-আচরণ ও সুন্দর স্বভাবের শিক্ষণীয় দিকগুলো বিস্তারিত আলোচিত হয়; আর তাঁকে অনুসরণ-অনুকরণের ওপর বেশ গুরুত্বারোপও করা হয়। এসবই শ্রোতাদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের অনুভূতি জোরদার করে থাকে।

এটা একটা প্রশ্নাতীত বাস্তবতা যে, মীলাদ সমাবেশগুলো সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করার ও সত্য প্রচারের চমৎকার ও ফলদায়ক একটি মাধ্যম। এ রকম সুবর্ণ সুযোগ অলস বসে থেকে হাতছাড়া করা উচিত নয়। উলামাবৃন্দ ও ধর্মপ্রচারকমণ্ডলীর জন্যে এটা একান্ত জরুরি যে, তাঁরা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মানুষের মনোযোগ মহানবী ﷺ এর সুনৈতিকতা ও আদব-আখলাক, তাঁর জীবনীর বিভিন্ন দিক, এবাদত-বন্দেগী ও লেনদেনের প্রতি আকর্ষণ

করবেন। এই আশীর্বাদপূর্ণ/বরকতময় মাসে লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি মানুষের এশকু-মহব্বত জাগিয়ে তোলা; আর তা করার বেলায় অন্যান্য মাসের চেয়ে রবীউল আউয়াল আরো বেশি কার্যকর। তাঁর পুতঃপবিত্র জীবন, গুণাবলী ও আদব যা অংশগ্রহণকারীদের মাঝে তাঁরই প্রতি শ্রদ্ধা ও মুগ্ধতা এবং গুণগ্রাহিতা বৃদ্ধি করে, সে সব বিশেষ দিকের প্রতি আলোকপাত করা উচিত; এ থেকে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন এবং বাড়ি ফিরে নিজেদের জীবনে তা প্রয়োগ করতে পারবেন।

(পূর্ববর্তী যুগগুলোতে) মক্কাবাসীবৃন্দ মীলাদের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বেলাদত-স্থান যেয়ারত করার রীতি অনুশীলন করতেন; তাঁরা সেখানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন এবং তাঁর জীবনী আলোচনা করতেন। কুতুবউদ্দীন আল-হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই ঘটনার চাম্ফুস সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন:

وَيَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى سُوقِ اللَّيْلِ وَيَمَشُّونَ فِيهِ إِلَى مَحَلِّ الْمَوْلِدِ الشَّرِيفِ بِإِزْدَحَامٍ وَيَخْطُبُ فِيهِ شَخْصٌ.

—তাঁরা মসজিদ থেকে বের হয়ে ‘সূকু আল-লায়ল’ গমন করেন, যেখানে তাঁরা জনাকীর্ণ পবিত্র বেলাদত-স্থানে হেঁটে যান; (এরপর) তাঁদের মাঝে জ্ঞানী কোনো ব্যক্তি খুতবা দেন। ৬৪৬

৯.৬ উদ্বুদ্ধকরণের দিক

প্রতিটি বিষয়ের দুটো দিক বর্তমান:

- (১) বহিঃ/বাহ্যিক দিক; এবং
- (২) অভ্যন্তরীণ দিক।

৬৪৬. কুতুবউদ্দীন আল-হানাফী, ‘কিতাব আল-এ’লাম বি-আলম বায়ত আল্লাহ আল-হারাম ফী তারীখ মক্কাত আল-মুশাররাফাহ’, ৩৫৫-৩৫৬ পৃষ্ঠা।

কোনো বস্তু বা বিষয়ের বহিঃ বা বাহ্যিক দিক হলো তা-ই, যাকে খোলা চোখে সহজে দেখা যায়, অথচ অভ্যন্তরীণ দিকটি গোপনীয় বা লুক্কায়িত এবং দেখা যায় না। সার্বিকভাবে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় যে, কোনো বিষয় বা বস্তু যতো গোপনীয় হয়, তার মূল্য ততোই বৃদ্ধি পায়। নিত্যদিনের সাধারণ উদাহরণই ধরা যাক, আপনার কাছে রয়েছে দুটো আপেল (যার একটি সাধারণ, আর অপরটি বিশেষ জাতের); প্রথমটি বিশেষ সুঘ্রাণ বা স্বাদবিশিষ্ট নয়। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় ধরনটি সুস্বাদু, সুঘ্রাণযুক্ত ও মসৃণ ছালবিশিষ্ট, বেশ কিছু সময় যাবৎ যার স্বাদ আনন্দন ও যার মিষ্টতার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায়। সার্বিকভাবে বলতে গেলে দুটোই অনুরূপ দেখতে এবং একই জাতের ফল, অথচ স্বাদ, মসৃণতা ও সুঘ্রাণের দিক থেকে তাদের মধ্যে এক গুণগত পার্থক্য বিরাজমান। বাহ্যিক আকার ও আকৃতির মধ্যে যাই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হোক না কেন, তা দৃষ্টির অন্তরালে থাকা স্বাদ, মিষ্টতা, সুঘ্রাণ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের মতো অতোখানি মূল্যবান নয়। আরেক কথায়, অভ্যন্তরীণ গুণাবলী বাহ্যিক গুণাবলীর চেয়ে অধিকতর মূল্যবান।

৯.৬.১ আমল বা ধর্ম অনুশীলনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিশেষ দিকসমূহ

ইসলাম ধর্মের অনুশাসন অনুসারে পালিত পুণ্যদায়ক/নেক আমল বা অনুশীলনীগুলো সম্পর্কে সবচেয়ে সম্মানিত রাসূল ﷺ ঘোষণা করেন:

[إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ]

—নিশ্চয় প্রতিটি কর্ম তার উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভরশীল।^{৬৪৭}

৬৪৭. আল-বুখারী, ‘আল-সহীহ’: ‘কিতাবু বা’আদ আল-ওহী,’ ‘ওহীর সূচনা’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:৩ #১; মুসলিম, ‘আল-সহীহ’: ‘কিতাবুল এমা’রা,’ ‘নিয়্যতের ওপর কর্মসমূহ নির্ভরশীল’ শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১৫১৫ #১৯০৭; আল-তিরমিযী, ‘আল-জামেউস্ সহীহ’: ‘কিতাবু ফাযায়েলিল জিহাদ,’ ‘প্রদর্শনোদ্দেশ্যে ও দুনিয়ার মোহে জিহাদরত ব্যক্তি সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৭৯ #১৬৪৭; আবু দাউদ, ‘আল-সুনান’: কিতাবুত্ তালাকু,’ ‘তালাকু ও নিয়্যত দ্বারা যা বোঝানো হয়’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:২৬২ #২২০১;

এবাদতের পদ্ধতি হিসেবে আল্লাহ তা’আলা ওয়াক্ফিয়া (পাঁচ ওয়াক্ফ) নামায প্রতিষ্ঠা করতে আদেশ করেছেন, যা দাঁড়ানো, রুকু, সেজদাহ ও (তাশাহহুদে) বসার সমষ্টি; এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (আল্লাহর) প্রশংসা ও মহিমা প্রকাশ এবং কুরআন মজীদে আয়াতসমূহের তেলাওয়াত/পাঠ; তবু আল্লাহর দরবারে এর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান এমন এক মাপকাঠির ভিত্তিতে হয়, যা অন্তর ও মস্তিস্কের গভীরে নিহিত। উদ্দেশ্য যদি হয় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো কারণে, তাহলে এ ধরনের নামায সহস্র সহস্র সংখ্যক হলেও তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ কর্তৃক কবুল বা গৃহীত হবে না। কবি ইক্বালের ভাষায় ব্যক্ত হয়:

جو میں سر بسجده ہوا کبھی تو، زمیں سے آنے لگی صدا

ترا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نمازیں

আমি যবে সেজদায় হই অবনত,
একটি কণ্ঠস্বর ভূমি হতে হয় শ্রুত,

‘তোমার অন্তর প্রদর্শনীতে রত,

তবে কী প্রত্যাশায় তোমার এ ব্রত?’^{৬৪৮}

মসজিদটি যদিও রাতারাতি ঈমানদারদের দ্বারা নির্মিত,

তবু মোদের অন্তর যুগ-যুগ পাপী হওয়ায় পুণ্যবান হতে ব্যর্থ।^{৬৪৯}

এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ভগ্নামি, কপটতা ও পুণ্যবান হওয়ার ভান করার পরিণতি হবে (খোদা তা’আলা কর্তৃক) প্রত্যাখ্যান; কেননা আমাদের নেক আমল তথা পুণ্যদায়ক কর্ম গৃহীত হবার পূর্বশর্ত হচ্ছে আন্তরিক নিয়্যত বা উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যসমূহ লুক্কায়িত হয় এবং তা খালি চোখে দেখা যায় না; তার কোনো বাহ্যিক আকার-আকৃতি নেই। এমতাবস্থায় খালেস/একনিষ্ঠ অন্তরে দুই রাক’আত নফল (অতিরিক্ত) নামাযও মন্দ নিয়্যত তথা অভিপ্রায়ে আদায়কৃত লাখো রাক’আত নামাযের চেয়ে অধিকতর মূল্যবান। আমাদের কর্মে সদুদ্দেশ্য ও আন্তরিকতা কেবল

আল-নাসাঈ, ‘আল-সুনান’: ‘কিতাবুত্ তাহা’রা,’ ‘ছোট প্রথাগত অযুর নিয়্যত’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:৫৮ #৭৫; এবং ইবনে মাজাহ, ‘আল-সুনান’: ‘কিতাবু যুহদ,’ ‘নিয়্যত’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:১৪১৩ #৪২২৭।

৬৪৮. কবি ইক্বাল, কুল্লিয়াত: বাঙ্গ-এ-দারা, ২৮১ পৃষ্ঠা।

৬৪৯. কবি ইক্বাল, কুল্লিয়াত: বাঙ্গ-এ-দারা, ২৯১ পৃষ্ঠা।

তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন আমরা সর্বান্তঃকরণে নিজেদেরকে প্রকৃত ঈমানদারির আওতায় আনতে পারবো- অন্তরজুড়ে এমন সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে, যাঁতে সবচেয়ে করুণাশীল রাসূল ﷺ এর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও তাঁর সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা উদ্বেলিত হতে থাকবে। আমাদের পুণ্যকর্মের মতো (নবী পাকের সাথে) এই আত্মিক সম্পর্কেরও রয়েছে দুটো দিক: অভ্যন্তরীণ দিক ও বাহ্যিক দিক।

৯.৬.২ পুণ্যদায়ক আমলের সারাংশ বা নির্যাস হচ্ছে নবী পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ভালোবাসা

সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি উৎসর্গিত সমস্ত এবাদত-বন্দেগী ও নেক আমল, যা আমরা প্রিয়নবী ﷺ কে মান্য করে পালন করি তাঁরই স্থাপিত নজিরের অনুকরণে, তা আমাদের কর্মেরই বাহ্যিক দিক মাত্র। এ সব প্রচেষ্টা হচ্ছে স্রেফ নেক/পুণ্যদায়ক কর্মসমূহের প্রতিষ্ঠাকরণ ও বাস্তবায়ন; তবে যে সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য প্রকৃতপক্ষে এগুলোকে আল্লাহর দরবারে স্বীকৃত/গৃহীত হবার দিকে পরিচালনা করে, তা হলো প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। হযরত আনাস বিন মালিক رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ وسلم ﷺ ব বলেন:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

-তোমাদের মধ্যে কেউই প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না, যতোক্ষণ না আমি তার কাছে তার পুত্র ও পিতা এবং সমগ্র মানবজাতি হতে অধিকতর প্রিয়ভাজন হই। ৬৫০

৬৫০. আল-বুখারী কৃত 'সহীহ': 'কিতাবুল ঈমান,' 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'কে ভালোবাসা ঈমান' শীর্ষক অধ্যায়, ১:১৪ #১৫; মুসলিম প্রণীত 'সহীহ': 'কিতাবুল ইমা'রা,' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'কে ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক অধ্যায়, ১:৬৭ #৪৪; আল-নাসাঈ রচিত 'আল-সুনান': 'কিতাবুল

হযরত আবু হুরায়রাহ رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে মহানবী ﷺ عليه وسلم ফরমান:

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ.

-আল্লাহর নামে শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের মধ্যে কেউই প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না, যতোক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতামাতা ও সন্তানদের চেয়ে প্রিয় হই। ৬৫১

এ সব হাদীস দ্ব্যর্থহীনভাবে আমাদের জানায় যে যাবতীয় সৎকর্মের সারমর্ম হচ্ছে প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি প্রকৃত এশক-মহব্বত। এই গুণগত বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত থাকলে অনুমানকৃত এসব সৎকর্ম নিষ্ফল ও শূন্যে পরিণত হবে; সর্বশক্তিমান আল্লাহর দৃষ্টিতে এই আমলগুলো একেবারে মূল্যহীন ও অসার হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মীলাদ/মীলাদ এ অপরিহার্য প্রেম-ভক্তি পুনরুজ্জীবন-পন্থার চাবিকাঠি। কেননা এই উপলক্ষে যে প্রশংসাসূচক না'ত/পদ্য/কাব্যগীতি আবৃত্তি করা হয় এবং যে ভাষণ দেয়া হয়, তা প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি আমাদের অন্তরে লালিত প্রেমের মৃদু আলোকে পুনঃপ্রজ্জ্বলিত করে। অতএব, এসব অনুষ্ঠান প্রেমায়ী পুনঃপ্রজ্জ্বলিত করার একটি মাধ্যম, যা আমাদের অন্তরগুলোকে তাঁরই সান্নিধ্যের প্রভায় উদ্ভাসিত করে। এ প্রসঙ্গে কবি ইক্বাল বলেন:

در دل مسلم مقام مصطفی است

آبروی مازنام مصطفی است

ঈমান,' 'ঈমানের চিহ্ন' শীর্ষক অধ্যায়, ৮:১১৪-১১৫ #৫০১৩-৫০১৪; এবং ইবনে মাজাহ লিখিত 'আল-সুনান': 'আল-মুকাদ্দমা,' 'ঈমান' শীর্ষক অধ্যায়, ১:২৬ #৬৭।

৬৫১. আল-বুখারী প্রণীত 'সহীহ': 'কিতাবুল ঈমান,' 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'কে ভালোবাসা ঈমান' শীর্ষক অধ্যায়, ১:১৪ #১৪; এবং আল-নাসাঈ রচিত 'আল-সুনান': 'কিতাবুল ঈমান,' 'ঈমানের চিহ্ন' শীর্ষক অধ্যায়, ৮:১১৪ #৫০১৫।

ঈমানদারের অন্তরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-প্রেম বসত-রত,
মোদের গর্ব ও সম্মান তাঁরই পবিত্র নাম হতে উদ্ভূত। (ভাবানুবাদ)

আরেক কথায়, প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি কেবল প্রকৃত প্রেম-ভক্তি অন্তরে রাখলেই আমাদের কর্মসমূহ আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক গৃহীত হতে পারে। নতুবা সেগুলো স্রেফ এক ঝাঁক আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আর কিছু হবে না। মুসলিমদের প্রথম তিন প্রজন্ম এমন এক যুগে বসবাস করতেন যখন প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি ভালোবাসা ছিলো এক বাস্তবতা। আমাদের এই যুগের বৈসাদশ্যস্বরূপ, তাঁদের ঈমানদারি সংরক্ষণে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনই তাঁদের ছিলো না। তাঁদের সুদৃঢ় ঈমান ও খাঁটি এশকু-মহব্বত সম্পর্কে হাদীসের সমস্ত বইপত্রে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রিয়নবী ﷺ এর সীরাত/জীবনী লেখকবৃন্দ বিবৃত করেন, রাসূল ﷺ এর প্রতি ওই তিন প্রজন্মের লালিত আন্তরিক প্রেম-ভক্তি এতোখানি সমৃদ্ধ ও অটল ছিলো যে, সমস্ত সৃষ্টিকুলের মাঝে তা বণ্টন করা হলে তাদের জন্যে তা শেষ বিচার দিবস অবধি পর্যাপ্ত হতো।

বর্তমান এই ক্ষয়ের যুগে আমাদের প্রসঙ্গে ফিরলে পরিদৃষ্ট হয়, আমাদের ঈমানদারি দুর্বল হয়ে পড়েছে আর ফলশ্রুতিতে শয়তানী অপশক্তির বিদ্রোহপূর্ণ অবিরাম আক্রমণের মুখে তা কাবু হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের দুর্বল ও ভঙ্গুর ঈমান-আকীদাহ’কে অক্ষুণ্ন রাখার সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় হলো সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাসূল ﷺ এর প্রতি অন্তরে প্রকৃত এশকু-মহব্বত ক্রমান্বয়ে অনুপ্রবিষ্টকরণ; আর এই প্রেমভক্তি পরবর্তী প্রজন্মগুলোর মাঝে স্থানান্তরকরণ। এই প্রয়াস সারা বছরই বজায় রাখা উচিত এবং পবিত্র রবীউল আউয়াল মাসে বহুবিধ উপায়ে বৃদ্ধি করা উচিত। এটা কার্যকরভাবে সুসম্পন্ন করা হলে নবী পাক ﷺ এর প্রতি সম্মান ও এশকু-মহব্বতের ছাপ আমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হবে, ঠিক যেমনটি কোনো পাথরের ওপরে কোনো অন্তর্লিখন খোদাই করা হয়ে থাকে।

৯.৭ আধ্যাত্মিক দিক

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর অলৌকিক বর্ণনাগুলোর শ্রবণ কোনো ব্যক্তির আধ্যাত্মিকতাকে প্রস্ফুটিত করার একটি মাধ্যম। এ সব মাহফিল-সমাবেশ আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস। কেউ আপন দুঃখকষ্ট দূর করার জন্যে সবচেয়ে দয়াবান রাসূলুল্লাহ ﷺ

ﷺ এর কাছে নিজের পক্ষে শাফাআতকারী হবার আবেদন-নিবেদনের পাশাপাশি তাঁর সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বৃদ্ধিকল্পে সম্ভাব্য সমস্ত উপায় খুঁজে বের করতে হবে। মীলাদ/মীলাদের প্রতি আপত্তিকারীদের দাবির মুখে যদি আমরা নতি স্বীকার করি, তাহলে নিশ্চিতভাবে এ সব সম্ভাব্য উপকারিতা থেকে আমরা বঞ্চিত হবো। অতএব, এ ধরনের মঙ্গলজনক মাহফিল-সমাবেশগুলোতে প্রত্যেকের পুতঃপবিত্র ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকা উচিত। প্রত্যেকেরই এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে মীলাদ মাহফিল আয়োজন, এতদুদ্দেশ্যে দানকৃত অর্থ ও কুরবানী স্রেফ সর্বশক্তিমান আল্লাহ ও তাঁর হাবীব ﷺ এর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সম্পাদিত।

আহাদিস (হাদিসসমূহ) আমাদের জানায় যে, আমাদের সালাত-সালাম প্রিয়নবী ﷺ এর সামনে পেশ করা হয়, আর আমাদের আমল/কর্মও উপস্থাপন করা হয়। সৃষ্টিকুল শিরোমণি নবী করীম ﷺ আমাদের নেক/পুণ্যময় কর্মের সংবাদ শুনলে সন্তুষ্ট হন; আর আমরা ভুল করলে তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে আমাদের পক্ষে সুপারিশ করেন।^{৬৫২} আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে মীলাদ

৬৫২. নোট: আল-বাযযার কৃত ‘আল-বাহর আল-যুখার’ (আল-মুসনাদ), ৫:৩০৮-৩০৯ #১৯২৫; ইবনে আবী উসামা বিশুদ্ধ বা সহীহ সনদে ‘মুসনাদ আল-হারিস’, ২:৮৮৪ #৯৫৩ গ্রন্থে এটা বর্ণনা করেন; হাকিম তিরমিযী প্রণীত ‘নওয়াদির আল-উসূল ফী আহাদীস আল-রাসূল’, ৪:১৭৬; আল-দায়লামী রচিত ‘আল-ফিরদৌস বি-মা’সুর আল-খিতাব’, ১:১৮৩ #৬৮৬; ক্বাজী আয়াজ লিখিত ‘আল-শিফা বি-তা’রিফ হুত্বুক আল-মুস্তফা’, ১:১৯; আল-হায়সামী তাঁর ‘মজমাউ আল-যওয়াঈদ ওয়া মাশ্বা’ আল-ফাওয়াঈদ’ ৯:২৪ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে আল-বাযযার ও তাঁর সূত্রের বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদীসটি বিশুদ্ধ; ইবনে কাসীর কৃত ‘আল-বেদায়া ওয়াল-নেহায়া’, ৪:২৫৭; এবং যায়ন আল-দ্বীন

মাহফিলে আমরা যা কিছু করি, তার সবই সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল ﷺ এর দরবারে উপস্থাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের সমস্ত উপাদান বা দিক যদি আন্তরিক ও বৈধ হয়, তাহলে এটা প্রিয়নবী ﷺ এর রেযামন্দি/সম্ভৃষ্টি অর্জনের পাথেয় হবে; আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর হাবীব ﷺ এর অসীলায় বা খাতিরে তাঁরই অনুমোদনের সীলমোহর দ্বারা এটাকে আশীর্বাদধন্য করবেন।

আন্তরিকতার প্রশ্নে শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহেলভী (১১১৪-১১৭৪ হিজরী) কর্তৃক তাঁর পিতা শাহ আবদুর রহীম (১০৫৪-১১৩১ হিজরী) সম্পর্কে লিখিত বর্ণনাটি শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের জন্যে উজ্জ্বল একটি দৃষ্টান্ত। তিনি লেখেন যে তাঁর বাবা প্রতি বছর মীলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষে অতিথিদের দাওয়াত করে খাওয়াতেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে কোনো এক বছর তাঁর আর্থিক অনটনের কারণে তিনি উন্নতমানের কোনো তবারুফক পরিবেশন করতে পারেননি। এমতাবস্থায় তিনি সিদ্ধকৃত ছোলা পরিবেশন করেন। সেই রাতে প্রিয়নবী ﷺ তাঁর স্বপ্নে ওই একই খাবার নিজের সামনে নিয়ে দেখা দেন, আর তাঁর গোলামের এই বিনীত অথচ আন্তরিক আচরণে খুশি ও সুখ প্রকাশ করেন। ৬৫৩

মীলাদ উদযাপনকালে আমাদের এ সব বর্ণনা থেকে শিক্ষা নিতে হবে, আর আমাদের আন্তরিক উদ্দেশ্যের প্রতি ঘনিষ্ঠ নজর রাখতে হবে এবং এমন কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে, যা সৃষ্টিকুল শিরোমণি প্রিয়নবী ﷺ এর সম্ভাব্য অসম্ভৃষ্টি সৃষ্টি করতে পারে।

দশম অধ্যায়

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদযাপন কি বেদআত?

আবুল ফযল ইরাকী নিজ ‘তারহ আল-তাসরীব ফী শরহ আল-তাকরীব’ ৩:২৯৭ পৃষ্ঠকে এই রওয়ায়ত/বিবরণকে সহীহ বলেছেন।
৬৫৩. শাহ ওলীউল্লাহ, ‘দুর্ল সামীন ফী মুবাশিরাতিন্ নাবীয়্যাল আমীন,’ ৪০ পৃষ্ঠা।

মীলাদুন্নবী صلى الله عليه وسلم এবং তার গুণাবলী ও নানা পুরস্কার-সংক্রান্ত শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি বিচার-বিশ্লেষণের পরে এ আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বেদআত (ধর্মে নতুন প্রচলন)-এর ধারণা ও তার বিভিন্ন দিক নিয়ে এক্ষণে আলোচনা করা হবে। প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم ও তাঁর সাহাবা কেরাম رضي الله عنهم أجمعين এর যুগে অনন্তিত্বশীল প্রতিটি নতুন প্রথা বা রীতি-ই স্রেফ তার নতুন হওয়ার ভিত্তিতে অথচ নির্ভরযোগ্যতার ভিত্তিতে নয়- প্রত্যাখ্যাত ও না-জায়েয তথা অবৈধ ঘোষিত হবে মর্মে দ্রাস্ত্য ধারণাটির অপনোদনে এখানে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হবে। দ্বীন-ইসলামে নতুন প্রচলনের সংজ্ঞা সম্পর্কে মনগড়া এই বেদআতের মতবাদটির অসারতা কুরআন মজীদ ও হাদীস শরীফের সুস্পষ্ট প্রামাণিক দলিলাদির আলোকে আলোচনা করা হবে। এটা বোঝা উচিত যে মীলাদুন্নবী صلى الله عليه وسلم এমন একটি জায়েয আমল/অনুশীলনী যার অনুমতি শরীয়তেই রয়েছে।

১০.১ বেদআতের আক্ষরিক অর্থ

‘বেদআত’ শব্দটির মূল হচ্ছে ‘বাদ’আ,’ যার আক্ষরিক অর্থ ‘কোনো নতুন প্রচলন বা উদ্ভাবন, যার কোনো পূর্ব-নজির নেই।’

ইবনে মানযূর (৬৩০-৭১১ হিজরী) এর মতানুযায়ী:

أَبْدَعْتَ الشَّيْءَ: إِخْتَرَعْتَهُ لَا عَلَى مِثَالٍ.

—তুমি এটা উদ্ভাবন করেছো; তুমি এটা পূর্ব-নজির ছাড়াই উদ্ভাবন করেছো।^{৬৫৪}

হাফেয ইবনে হাজর আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিজরী) বেদআত সম্পর্কে বর্ণনা দেন এভাবে:

الْبِدْعَةُ أَصْلُهَا مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ.

৬৫৪. ইবনে মানযূর, ‘লিসান আল-আরব’, ৮:৬।

—বেদআত শব্দটি মূলতঃ ব্যবহারিক অর্থে বোঝায়, কোনো পূর্ব-নজির ছাড়া যা প্রচলিত হয়েছে।^{৬৫৫}

১০.১.১ আল-কুরআন হতে এর অর্থ নিশ্চিতকরণ

কুরআন মজীদে অনেক আয়াতে ‘বিদআত’ শব্দটি হতে উৎপন্ন বিভিন্ন শব্দ দৃশ্যমান হয় এবং সেগুলোতে ব্যক্ত অর্থ ওপরে উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেবল দুটো আয়াত এখানে উদ্ধৃত করা হবে:

১. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা‘আলা নিজেকে ‘আল-বদী’ (উদ্ভাবক/প্রবর্তক) বলে উল্লেখ করেছেন, কেননা তিনি কোনো পূর্ব-নজির ছাড়া আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন:

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

—তিনিই আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীকে অস্তিত্ব দানকারী। আর যখন কোনো কিছু (অস্তিত্বশীল করার) সিদ্ধান্ত নেন, তখন একে কেবল এটুকুই বলেন, ‘হও’ তখন তা হয়ে যায়।^{৬৫৬}

২. অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা ফরমান:

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.

—তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে অস্তিত্বদানকারী।^{৬৫৭}

এ দুটো আয়াতে করীমা থেকে স্পষ্ট হয় যে, আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টিকে একটি বেদআত তথা উদ্ভাবন/প্রবর্তন হিসেবে (আল-কুরআনে) বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক-ই সেগুলোকে অনন্তিত্ব থেকে অস্তিত্বশীল করেছেন। তাই তাঁর নাম মোবারক হচ্ছে ‘বদী’ (উদ্ভাবক/প্রবর্তক)।

৬৫৫. ইমাম আসক্বালানী, ‘ফাতহুল বারী’, ৪:২৫৩; এবং শওকানী, ‘নায়ল আল-আওতার শরহ মুনতাক্বা আল-আখবার’, ৩:৬৩।

৬৫৬. আল-কুরআন, ২:১১৭।

৬৫৭. আল-কুরআন, ৬:১০১।

১০.২ বেদআতের প্রায়োগিক অর্থ

ইসলামী জ্ঞান বিশারদবৃন্দের দৃষ্টিতে বেদআত (নতুন প্রচলন) এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

১. ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৭ হিজরী) এর মতানুসারে:

الْبِدْعَةُ هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে যা ছিলো না, তা উদ্ভাবন/প্রচলন করা-ই হচ্ছে বেদআত।^{৬৫৮}

২/ ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী (৭৩৬-৭৯৫ হিজরী) এর মতানুযায়ী:

الْمُرَادُ بِالْبِدْعَةِ مَا أُحْدِثَ مِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الشَّرْعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ شَرْعًا، وَإِنْ كَانَ بِدْعَةً لُغَةً.

-বেদআত দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে এমন উদ্ভাবন বা প্রচলনকৃত বিষয়কে, যার মূল আমাদের দ্বীনের (তথা শরীয়তের) মধ্যে পাওয়া যায় না। আর যে বিষয়টির মূলভিত্তি শরীয়তের মধ্যে বিদ্যমান, তা শরঈ আইনানুযায়ী বেদআত নয়, যদিও ভাষাগত তা হতে পারে।^{৬৫৯}

হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হিজরী) বেদআতে হাসানা (মানে প্রশংসনীয় বেদআত) ও বেদআতে সাইয়েয়াহ (মানে মন্দ বেদআত) এর মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যাকালে ব্যক্ত করেন:

وَالْتَّحْقِيقُ أَنَّمَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسَنِ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ حَسَنَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ مُسْتَقْبَحَةٌ.

৬৫৮. ইমাম নববী প্রণীত তাহযীবুল আসমা' ওয়াল-লুগাত', ৩:২২।

৬৫৯. ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী কৃত 'জামিউল উলূম ওয়াল-হিকাম ফী শারহে খামসীন হাদীসান মিন জওয়ামি-ইল-কালাম,' ২৫২ পৃষ্ঠা; আযীম আবাদী রচিত 'আওন আল-মা'বুদ শরহ সুনান আবী দাউদ,' ১২:২৩৫; এবং মোবারকপুরী লিখিত 'তোহফাতুল আহওয়াযী শরহ জামে' আল-তিরমিযী,' ৭:৩৬৬।

-এতদসংক্রান্ত বাস্তবতা হলো, শরীয়তে প্রশংসনীয় শ্রেণিভুক্ত করা যায় এমন সমস্ত বিষয়-ই প্রশংসাযোগ্য; আর যা যা শরীয়তে অপছন্দনীয় শ্রেণিভুক্ত, তার সবই নিন্দনীয়/দূষণীয়।^{৬৬০}

ওপরের সংজ্ঞাগুলো এ ব্যাপারটি স্পষ্ট প্রতীয়মান করে যে প্রতিটি নতুন বিষয়-ই শ্রেফ নতুন বিষয় হওয়ার কারণে আপনাআপনি হারাম তথা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। বরঞ্চ এর বৈধতা বা অবৈধতার প্রশ্ন বিচার্য হয় এতে শরীয়তে প্রশংসনীয় বলে বিবেচিত বৈশিষ্ট্যাবলী নিহিত আছে কি-না তা-ই দ্বারা; আর এভাবেই এটাকে বিদআতে হাসানা (প্রশংসাযোগ্য নব প্রচলন) হিসেবে শ্রেণিকরণ করা হয়। পক্ষান্তরে, এতে শরীয়তে নিষিদ্ধ বৈশিষ্ট্যাবলী অন্তর্নিহিত থাকলে এটাকে বিদআতে সাইয়েয়াহ তথা দূষণীয় নব প্রচলন হিসেবে শ্রেণিকরণ করা হয়।

এই সব প্রাথমিক মন্তব্য হতে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্তমান সময়ে যে আকারে অস্তিত্বশীল, সেভাবে পুণ্যবান পূর্বসূরীবৃন্দের যুগে অস্তিত্বশীল ছিলো না; তথাপিও এটা শরীয়তে একটা বৈধ ও প্রশংসাযোগ্য আচার বা রীতি। আর এটা এ কারণে যে, কুরআন মজীদ তেলাওয়াত, আল্লাহ তা'লার যিকর, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসায় শের-গজল আবৃত্তি/পরিবেশন, গরিব-দুঃস্থদের মাঝে দান-সদকাহ ও উদারভাবে খাদ্য (তবারুক) বিতরণের মতো এর অবিচ্ছেদ্য গঠনাত্মক উপাদানগুলো শরীয়তেরই বিধানকৃত আমল/অনুশীলনী। এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যুগগুলো ও আমাদের জামানার মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হলো, আমাদের পূর্বসূরীবৃন্দ যেদিন আল্লাহ তা'লার কাছ থেকে কোনো বড় নেআমত তথা আশীর্বাদ লাভ করতেন, তাঁরা নিজেদের রীতি ও আচার অনুসারে মহান প্রভুর দরবারে সেদিনটিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। বর্তমান সময়ে জীবনের প্রতিটি দিক যেমন তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, ঠিক তেমনি মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

এর প্রশংসায় শের-গজল আবৃত্তি/পরিবেশন, গরিব-দুঃস্থদের মাঝে দান-সদকাহ ও উদারভাবে খাদ্য (তবারুক) বিতরণের মতো এর অবিচ্ছেদ্য গঠনাত্মক উপাদানগুলো শরীয়তেরই বিধানকৃত আমল/অনুশীলনী। এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যুগগুলো ও আমাদের জামানার মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হলো, আমাদের পূর্বসূরীবৃন্দ যেদিন আল্লাহ তা'লার কাছ থেকে কোনো বড় নেআমত তথা আশীর্বাদ লাভ করতেন, তাঁরা নিজেদের রীতি ও আচার অনুসারে মহান প্রভুর দরবারে সেদিনটিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। বর্তমান সময়ে জীবনের প্রতিটি দিক যেমন তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, ঠিক তেমনি মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

৬৬০. ইমাম আসকালানী কৃত 'ফাতহুল বারী,' ৪:২৫৩; এবং আল-শওকানী রচিত 'নায়ল আল-আওতার শরহ মুনতাক্বা আল-আখবার,' ৩:৬৩।

উদযাপনের রীতিও একইভাবে বিবর্তিত হয়েছে। এটাকে আরো পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে নিম্নে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো।

১০.৩ স্থানীয় (লোকজ) সংস্কৃতির প্রতিটি দিক-ই কি বেদআত?

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা কুর'আন ও সুন্নাহ'র নিরিখে নিজেদের প্রতিটি ও সকল কর্মকে বিচার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। (এমতাবস্থায়) সব কিছুকেই বেদ'আত ঘোষণা করা হচ্ছে। মীলাদুন্নবী صلى الله عليه وسلم এর জুলূস-মিছিল ও অন্যান্য অনেক ইতিবাচক বিষয়, যেগুলো আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেগুলোকে ওই সব লোক বেদ'আত বলে সমালোচনা করছেন যাঁরা সেগুলোর প্রতি আপত্তি উত্থাপন করছেন। এমন কিছু নির্দিষ্ট বিষয় আছে যেগুলো প্রকৃতিগতভাবে ধর্মীয় এবং তাই কুরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে ব্যাখ্যা বা দালিলিক প্রমাণসাপেক্ষ; কেননা সেগুলো ফতোয়া তথা শরঈ বিধি-বিধান জারির আওতাধীন। শরীয়তে কোনো কর্মের বৈধ ভিত্তি আছে কী নেই, সে সম্পর্কে জানতে অনুসন্ধান করতে হবে; ভিত্তি প্রমাণ করা গেলে এটা শরঈ বিধান বলে সাব্যস্ত হবে; কিন্তু তা সাব্যস্ত করা না গেলে এটা সম্পর্কে কোনো শরঈ বিধান নেই। আর এটা সম্পর্কে কোনো শরঈ সিদ্ধান্ত না থাকলে এটাকে নিম্নের তিনটি কিসিমে বিভক্ত করা যেতে পারে:

প্রথমতঃ এটা হতে পারে যে নির্দিষ্ট কিছু আমল/কর্ম কোনো বিশেষ সংস্কৃতি বা স্থানীয় ঐতিহ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। সেগুলো হয়তো অবধারিতভাবে ধর্মীয় বিষয়াদির সাথে সরাসরি যুক্ত না-ও হতে পারে, কেননা সেগুলো কোনো নির্দিষ্ট স্থানীয় এলাকার নিয়ম, সংস্কৃতি বা অভ্যাসের দিক মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ এটা হতে পারে যে নির্দিষ্ট কিছু কাজ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনে, পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত হয়। সামাজিক প্রবণতা ও সামষ্টিক পছন্দের প্রতিফলন এতে পাওয়া যায়।

আর তৃতীয়তঃ এটা হতে পারে যে সুনির্দিষ্ট কোনো এলাকার ঐতিহ্যগত ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন নির্দিষ্ট কিছু বিষয়কে অপরিহার্য করে তোলে।

১০.৩.১ আসহাব (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-বৃন্দের সাংস্কৃতিক আচার ও প্রথা

মহান সাহাবা-এ কেরাম رضي الله عنهم أجمعين এর সাংস্কৃতিক জীবন ছিলো অপেক্ষাকৃত সহজ-সরল। আমরা তাঁদের যুগকে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবো যে, তাঁদের মসজিদ ও ঘরবাড়ির ডিজাইন ছিলো অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও জটিলতামুক্ত: তাঁদের বাড়িঘর নির্মাণে ব্যবহৃত হতো খেজুর/তাল গাছের কাণ্ড; অপর দিকে কা'বা গৃহ নির্মিত হয়েছিলো পাথর দ্বারা। তাঁরা চাইলে নিশ্চয় মসজিদে নববী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'কে শক্ত নির্মাণ-সামগ্রী দ্বারা তৈরি করতে পারতেন, কিন্তু তাঁদের সংস্কৃতি ও প্রথা ছিলো সহজ-সরল এবং প্রকৃতির কাছাকাছি। তাঁদের খাদ্য ও বস্ত্র-সংক্রান্ত পছন্দ এবং আচারের ক্ষেত্রেও এর প্রতিফলন ঘটেছিলো। সংক্ষেপে, সভ্যতা ছিলো চাহিদাহীন, আর তাই তাঁদের জীবনের প্রতিটি দিক, যেমন পানাহার ও আনন্দফুর্তি, এই সরলতাকেই প্রতিফলন করতো। অতএব, প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم এর মীলাদ/বেলাদত উদযাপনে তাঁদের আচরণও তাঁদেরই অনন্য সংস্কৃতির প্রতিফলনকারী ছিলো।

১০.৩.২ মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশ

পাকিস্তান রাষ্ট্রে পাকিস্তান দিবস ও কায়দে আযম দিবসে মিছিল বের করা হয়। এটা পাকিস্তানী নাগরিকদের স্থানীয় রেওয়াজ; কোনো আইনী বিষয় নয়, বরং সাংস্কৃতিক একটি অনুষ্ঠান। মীলাদুন্নবী صلى الله عليه وسلم তে খুশি ও সুখ প্রকাশ করা কুরআন ও সুন্নাহ হতে প্রমাণিত, আর এর প্রত্যাশা হলো প্রত্যেক ঈমানদারের অন্তর এতে আনন্দে উদ্বেলিত হবে। তবে এই খুশি ও সুখের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশ রয়েছে, যেগুলো

সময়ের পরিক্রমণে পরিবর্তিত হতে পারে; কেননা সেগুলো কারো সংস্কৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট।

১০.৩.২.১ মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জুলূস-মিছিল সংস্কৃতির আওতাধীন

বৈধ সাংস্কৃতিক ভাব প্রকাশের উৎসব হিসেবে পাকিস্তান দিবস যদি বাৎসরিকভাবে উদযাপিত হতে পারে, তাহলে প্রিয়নবী ﷺ এর আশীর্বাদপূর্ণ বেলাদত/মীলাদ দিবস, যেটা ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন, সেটা কেন উদযাপিত হবে না? পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে যদি পূর্ণ সামরিক কুচকাওয়াজ গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে, তাহলে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দিবসে কেন অনুরূপ করা যাবে না? একইভাবে, অন্যান্য দিবস উপলক্ষে (ভবনসমূহ) সাজানো ও (রাস্তাঘাটে) আলোকসজ্জা করা হয়; তাহলে মীলাদুন্নবী ﷺ দিবসে তা কেন নয়? কোনো জাতি যদি আপন জাতীয় উৎসবগুলোতে গর্ববোধ করতে পারেন, তাহলে এই উম্মত কেন নিজেদের গর্ববোধের আবেগকে নিজেদের রাসূল ﷺ এর বেলাদত দিবসে প্রকাশ করতে পারবেন না, যে রাসূল ﷺ হলেন জগতসমূহেরই জন্যে খোদায়ী রহমত/করণা? ওপরে উক্ত খুশি ও সুখ প্রকাশের সাংস্কৃতিক প্রথাগুলোর জন্যে যেমন দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না, ঠিক তেমনিভাবে মীলাদুন্নবী ﷺ উপলক্ষে আয়োজিত জুলূস-মিছিলের জন্যেও প্রামাণিক দলিলের প্রয়োজন পড়ে না। সুখ ও খুশি প্রকাশ অথবা প্রতিবাদের সময় আমরা মিছিল-সমাবেশ করি, যা আমাদের (জাতিগত) সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ও রেওয়াজ হয়ে গিয়েছে। এ বিষয়টি সম্পর্কে (সম্যক) জেনেও মীলাদের মিছিলে কারো অংশগ্রহণ ও প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি তাঁর দ্বারা সালাত-

সালাম পাঠের সময় আমরা কেন দালিলিক প্রমাণ তালাশ করার প্রয়োজন বোধ করে থাকি?

প্রশ্ন করা হতে পারে: মীলাদের সময় আরবীয় জাতি জুলূস-মিছিলের আয়োজন করেন না কেন? এর সহজ উত্তর হলো, মিছিল তাঁদের সংস্কৃতিতে আমাদের মতো অতোটা (ব্যাপকভাবে) প্রচলিত নয়। আরব দেশগুলোতে মীলাদ উদযাপিত হয়, যেমন - সংযুক্ত আরব আমীরাত ও মিসর; কিন্তু জুলূস-মিছিল করাটা তাঁদের সংস্কৃতিতে (তেমন একটা) নেই। পাকিস্তানে মিছিল এমনই ব্যাপক ও সার্বিক যে কারো হকি খেলার দলও যদি ম্যাচ জেতে, অমনি দলের সমর্থকবর্গ নিজেদের আনন্দ প্রকাশের উদ্দেশ্যে এভাবে মিছিল বের করে। বিজয়ী হকি দলটি এবং এমন কী নির্বাচনে বিজয়ী কোনো রাজনৈতিক দলও মিছিল বের করতে এরকমই অভ্যস্ত, যাতে বিজয়ীকে স্বাগত অভ্যর্থনা দেয়া যায়।

সংক্ষেপে, শরীয়তে নিষিদ্ধ করা হয়নি এ ধরনের যে-কোনো কাজ, যা কোনো সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে সৃষ্ট হয়েছে, তা জায়েয তথা বৈধ/অনুমতিপ্রাপ্ত হিসেবে ঘোষিত হয়েছে; আর যদি সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বেলাদত/মীলাদ উপলক্ষে খুশি প্রকাশের জন্যেই ওই কাজটির মূল উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেটার প্রতি আপত্তি উত্থাপনের কোনো কারণই আর থাকা উচিত নয়।

১০.৩.২.২ মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দাঁড়িয়ে সালাত-সালাম পেশ সংস্কৃতির আওতাধীন

প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি সালাত-সালাম পেশের সময় ভারত উপমহাদেশের অধিবাসী মুসলমানবৃন্দ দাঁড়াতে অভ্যস্ত; পক্ষান্তরে, আরব বিশ্বের প্রথা সাধারণতঃ বসে সালাওয়াত পাঠ [বঙ্গানুবাদকের নোট: ইমাম তক্বীউদ্দীন সুবকী রহমতুল্লাহে আলাইহি দাঁড়িয়ে সালাওয়াত পাঠ করেছিলেন; তিনি শামদেশীয়/সিরীয় পুণ্যাত্মা]। তবে মক্কা শরীফের অধিবাসীদের একটি বড় দলও সালাত-সালাম পেশের সময় উঠে দাঁড়ান। এসব বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়ার পরেও এই আমলটির প্রতি

কোনো বৈধ কারণ ছাড়া আপত্তি উত্থাপন করা একদম অযৌক্তিক। ক্বিয়াম বা দণ্ডায়মান হওয়াকে বৈধ প্রমাণ করার পক্ষে দলিল শরীয়তে বিদ্যমান, আর এটা সংস্কৃতিরও একটা উপাদান বটে। এটা কারো রুচি ও পছন্দ অনুসারে করা হয়: কিছু মানুষ রাসূলুল্লাহ صلی الله علیه وسلم এর প্রতি সালাত-সালাম পেশের সময় বসে থাকতে পছন্দ করেন; পক্ষান্তরে, অন্যান্যরা দাঁড়াতে পছন্দ করেন। [লেখকের নোট: ক্বিয়াম প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে এই বইয়ের ৮ম অধ্যায় দেখুন- ‘মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর গঠনাত্মক উপাদান]।

১০.৩.২.৩ মীলাদে সাজানো সংস্কৃতির আওতাধীন

পূর্বসূরী পুণ্যাআমগুলীর প্রকৃতিতে ও চরিত্রবৈশিষ্ট্যে নেক আমল তথা পুণ্যকর্ম সাধনের ধারণা এমনই গভীরভাবে বদ্ধমূল ছিলো যে, তা সম্পাদনে বাড়তি উৎসাহ-উদ্দীপনা বা উদ্বুদ্ধকরণের আর প্রয়োজন পড়েনি তাঁদের; এক্ষেত্রে খোদ ঐশী আজ্ঞা-ই যথেষ্ট ছিলো। আমাদের যুগে এ পরিস্থিতির বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা নেক আমল পালনে দ্বিধাগ্রস্ত ও একগুঁয়ে (-ভাবে বিমুখ)। আমাদের এ স্থবির স্বভাবের দরুন মসজিদের ব্যাপক অলংকরণ/সাজানো (যদিও তার প্রতি কুরআন-হাদীসে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই) জাতীয় পদ্ধতি প্রয়োগে আমাদের মাঝে নেক আমল পালনের উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এ রকম হবার পেছনে কারণ কী? এর উত্তর হলো এই যে, স্পষ্ট ও পর্যবেক্ষণযোগ্য কারণগুলো ঝোঁকের মাধ্যমে হয়ে দাঁড়ায়, যেমনটি আল্লাহ তা’আলা ঘোষণা করেন:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

—হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় শালীন পোশাক পরিধান করো।^{৬৬১}

প্রতিপাদ্য বিষয়ের এ দিকটি শরীয়তের ফিক্বহী তথা বিধানগত সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং (ইসলামী) সংস্কৃতির সাথে জড়িত। দাড়ির

শোভাবর্ধন, চোখে সুরমা লাগানো, চুলে তেল মাখা, আর শালীন/শোভনীয় জামাকাপড় পরিধান করা প্রিয়নবী صلی الله علیه وسلم এরই সুল্লাত হতে আগত; এগুলো বাহ্যিকভাবে আবেদন রাখে। এ ধরনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির মানসিক ফায়দাগুলো সম্পর্কে অধিক সচেতন নবী পাক صلی الله علیه وسلم এসব বিষয়ের প্রতি বারবার গুরুত্বারোপ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ব্যক্ত করেন:

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا يَغْنِي الثُّومَ.

—যে ব্যক্তি এসব সবজি (যথা-পেঁয়াজ/রসুন) খায়, আমাদের মসজিদগুলোর কাছে তার আসা উচিৎ নয়, যতোক্ক্ষণ না (তার মুখ থেকে) সেগুলোর দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়।^{৬৬২}

যে ব্যক্তি পেঁয়াজ ও রসুন ভক্ষণ করেন, তিনি কি এমন কোনো মহাপাপ সংঘটনের দোষে দুষ্ট যে তিনি মসজিদের কাছেই আসতে পারবেন না? অবশ্যই না! সবচেয়ে সম্মানিত রাসূল صلی الله علیه وسلم ডিক্রী জারি করেছিলেন যে ওই ব্যক্তির জন্যে পেঁয়াজ/রসুন জাতীয় সবজি খাওয়ার পরপরই মহান আল্লাহ তা’আলার ঘর মসজিদে এসে নামায পড়া হতে বিরত থাকা উচিৎ, কেননা সেগুলোর ছড়ানো দুর্গন্ধ দ্বারা নামাযে অন্যান্য মুসল্লিদের মনোযোগ নষ্ট হবে। শারীরিক সৌন্দর্যের বিষয় ও ইন্দ্রিয়গুলোকে প্রভাবিত করে এমন স্পষ্ট উপাদানগুলো সম্পর্কে লভ্য এ রকম আহাদিস ইঙ্গিত করে যে, ইসলাম হচ্ছে হেকমত তথা জ্ঞানভিত্তিক ধর্ম, যা মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের ব্যাপারে জড়িত।

৬৬২. মুসলিম, ‘আল-সহীহ’: ‘কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদী’ আল-সালা’, ‘পেঁয়াজ বা তৎজাতীয় সবজি, রসুন ইত্যাদির প্রতি নিষেধাজ্ঞা’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:৩৯৪ #৫৬১; এবং আবু দাউদ, ‘আল-সুনান’: ‘কিতাবুল আতীমা’, ‘রসুন ভক্ষণ’ সম্পর্কিত অধ্যায়, ৩:১৬০-১৬১ #৩৮২৪-৩৮২৫।

বিদ'আতের মৌলভিত্তি ও মীলাদের সাংস্কৃতিক দিকগুলোর প্রতি আলোকপাত করার পরে আমরা এবার বিদ'আতের প্রকৃত সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করবো:

১০.৪ বিদআতের প্রকৃত অর্থ

নিম্নের হাদীসগুলো বিদ'আতের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেবে এবং শরীয়তে আসলে কী জিনিস বিদ'আত তথা নতুন উদ্ভাবন বা প্রচলনের জন্য দেয় তার প্রতি আলোকপাত করবে।

১. ঈমানদার মুসলমানবৃন্দের মা হযরতে আয়েশাহ (রাঃ) আনহা) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

—কেউ যদি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন কোনো কিছু প্রচলন করে যা তাতে নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।^{৬৬৩}

২. অপর এক হাদীস হযরতে আয়েশাহ (রাঃ) আনহা) বর্ণনা করেন, যা'তে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

—কেউ যদি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যার কোনো ভিত্তি ধর্মে নেই, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত।^{৬৬৪}

৬৬৩. মুসলিম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত 'আল-সহীহ': কিতাবুল আকুদিয়া, 'মিথ্যে জারিকৃত বিধানের রহিতকরণ' অধ্যায়, ৩:১৩৪৩ #১৭১৮; ইবনে মাজাহ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) রচিত 'আল-সুনান': আল-মুকাদ্দামা, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভাষণের প্রতি সম্মান' শীর্ষক অধ্যায়, ১:৭ #১৪; এবং আহমদ বিন হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রণীত 'আল-মুসনাদ', ৬:২৭০ #২৬,৩৭২।

৬৬৪. আল-বুখারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) রচিত 'সহীহ': কিতাবুস্ সুলাহ, 'তারা কোনো অন্যায়ে একমত হলে সুলেহ প্রত্যাখ্যাত' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৯৫৯ #২৫৫০; এবং আবু দাউদ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখিত 'আল-সুনান': কিতাবুস্ সুন্নাহ, 'সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক অধ্যায়, ৪:২০০ #৪৬০৬।

৩. হযরতে আয়েশাহ (রাঃ) আনহা) আরো বর্ণনা করেন হুজুরে পূর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

—কেউ যদি এমন কোনো আমল/অনুশীলনী চর্চা করে যা আমাদের দ্বারা আদিষ্ট নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।^{৬৬৫}

১০.৪.১ ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন এবং 'ফাহুয়া রাহদ' বাক্যটির সঠিক উপলব্ধি

(ওপরে আলোচিত) 'উদ্ভাবন করে' (أَحْدَثَ), 'যা ধর্ম হতে নয়' (مَا لَيْسَ) এবং 'যার কোনো ভিত্তি ধর্মে নেই' (مَا لَيْسَ فِيهِ) বাক্যগুলো মনোযোগ পাবার দাবিদার। সাধারণ রীতি অনুসারে, 'উদ্ভাবন' (أَحْدَثَ) শব্দটির উপলব্ধি মানে হলো 'ধর্মের মধ্যে নতুন কোনো প্রকার প্রচলন করা।' পক্ষান্তরে, 'যা ধর্ম হতে নয়' (مَا لَيْসَ مِنْهُ) কথাটি আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয় যে এটা এমন কিছুর উদ্ভাবন করাকে বোঝায় যা ইসলামের অংশ নয়। (এক্ষণে) প্রশ্ন দাঁড়াতে পারে যে, 'আহদাসা' শব্দটি যদি নতুন কোনো বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করা বোঝায়, তাহলে 'মা লাইসা মিনহু' বা 'মা লাইসা ফীহি' বলার প্রয়োজনীয়তা কোথায় ছিলো? এর কারণ এই যে, সে বিষয় বা বস্তু যদি ধর্ম হতেই আগত হয়, মানে ধর্মেরই অংশ হয়, তাহলে তাকে নতুন বিষয় বা বস্তু (মুহদাসা) বলা যাবে না, যেহেতু নতুন বিষয়কে তখনই তা বলা হয়ে থাকে যখন তা প্রথমাবস্থাতেই ধর্মের মধ্যে অনন্তিত্বশীল হয়।

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, হাদীসগুলো মনোযোগসহ পড়লে বোঝা যাবে যে প্রতিটি নতুন বিষয়-ই প্রত্যাখ্যাত নয়; বরঞ্চ কেবল সেসব নতুন বিষয়-

৬৬৫. মুসলিম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত 'আল-সহীহ': কিতাবুল আকুদিয়া, 'মিথ্যে জারিকৃত বিধানের রহিতকরণ' শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১৩৪৩ #১৭১৮; আহমদ বিন হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রণীত 'আল-মুসনাদ', ৬:১৮০ ও ২৫৬ #২৫,৫১১ ও ২৬,২৩৪; এবং আল-দারু কুতনী লিখিত 'আল-সুনান', ৪:২২৭ #৮১।

ই প্রত্যাখ্যাত, যেগুলো ধর্মের অংশ নয়; যদি সেই নতুন বিষয় ধর্মের পরিসরের মধ্যে হয়, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত নয়, বরঞ্চ গৃহীত।

আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যাকল্পে বলা যায়, ‘কেউ যদি আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা ধর্ম হতে নয়/যার কোনো ভিত্তি ধর্মে নেই, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত’ - মর্মে হাদীসটির মধ্যে ‘তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত’ - বাক্যটি শ্রেফ ‘যা ধর্ম হতে নয়’ বা ‘উদ্ভাবন করে’ কথাগুলোর প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে না; বরং তা প্রযোজ্য (মানে প্রয়োগযোগ্য) হতে হবে তখনই, যখন উভয়ই একসাথে এসে যুক্ত হবে: অর্থাৎ, যখন ‘যদি কেউ উদ্ভাবন করে’ এবং ‘যা ধর্ম হতে নয়/যার কোনো ভিত্তি ধর্মে নেই’ - এই দুটো (শর্ত) এসে একত্রিত হয়, কেবল তখনই ওই কাজটি প্রত্যাখ্যাত হবে। কেননা এটা একটা নতুন প্রথা/রীতি এবং এর কোনো ভিত্তি ধর্মে নেই; মানে শরীয়তে এর কোনো পূর্ব-নজির কিংবা দালিলিক প্রমাণ নেই। সেই নতুন রীতি/প্রথাটি প্রত্যাখ্যাত হবার জন্যে ধর্মের কোনো দিকের সাথেই সেটার কোনো রকম সংশ্লিষ্টতা বা সম্পৃক্ততা থাকা একদম চলবে না (অর্থাৎ, কুরআন ও সুন্নাহ’তে সেটার পক্ষে কোনো প্রমাণ-ই বিদ্যমান নেই)।

অতএব, কোনো নতুন বিষয়/বস্তুকে বিদ’আত তথা উদ্ভাবন ও গোমরাহী/পথভ্রষ্টতা ঘোষণা করতে হলে নিম্নের দুটি শর্ত অনিবার্যভাবে পূরণ করতে হবে:

প্রথমত: দ্বীন বা ধর্মে এটার কোনো (মূল) উৎস নেই, আর এতে কোনো পূর্ব-নজির বা প্রামাণিক দলিলও বিদ্যমান নেই।

দ্বিতীয়ত: এই নতুন কর্ম (‘মুহদাসা’) কেবল ধর্মের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বা সাংঘর্ষিক-ই নয়, বরঞ্চ এটা দ্বীনকে নাকচ করে দেয় অথবা ধর্মের কোনো বিধান বা সুন্নাহের লঙ্ঘন করে থাকে।

ওপরে উল্লেখিত তৃতীয় হাদীসটিতে ‘এমন আমল/অনুশীলনী যা আমাদের দ্বারা আদিষ্ট নয়’ মর্মে কথাটির ব্যাপারে ভুল তথ্যভিত্তিক এমন এক অভিমত বিরাজমান যে প্রতিটি কর্ম, হোক না কেন তা মরহূমের প্রতি সওয়াব রেসানী/বখশানো, মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অথবা সদাচরণ ও আধ্যাত্মিকতা-সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়, তা

বিদ’আত হিসেবে বিবেচিত হবে, যদি তা কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক সমর্থিত না হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিরেট মূর্খতা ও সংকীর্ণ মানসিকতা হতে নিঃসৃত। এই অর্থ (এ মর্মে যে কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত নয় সকল বিষয়-ই প্রত্যাখ্যাত) যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে শরীয়তের মধ্যে মোবাহ (মানে স্পষ্টভাবে নাকচ নয়) অনুশীলনীগুলো সম্পর্কে কী বলা হবে? এমতাবস্থায় সেগুলোও প্রত্যাখ্যানের বাধ্যবাধকতায়ুক্ত হয়ে পড়বে।

উপরোক্ত হাদীসগুলো হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিটি বিষয়/বস্তু-ই বিনা চিন্তায় প্রত্যাখ্যাত নয়। বরঞ্চ শুধু যেসব নতুন বিষয়ের মূল শরীয়তে নেই কিংবা কুরআন-সুন্নাহ’তে (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) পূর্ব-নজির অথবা উল্লেখ নেই, অথচ ধর্মের মৌলিক স্তরে যোগ করা হয়েছে (যেমন - ‘দুরুরীয়াত আল-দ্বীন,’ মানে ইসলাম ধর্মে বাধ্যতামূলক অনুশীলনী ও অত্যাবশ্যক আকীদা-বিশ্বাস), কেবল সেগুলোই প্রত্যাখ্যাত হবে। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর ঘোষিত ‘প্রতিটি বিদ’আত-ই পথভ্রষ্টতা’ মর্মে বাণীটি এ ধরনের বিদ’আতকে উদ্দেশ্য করেছে; এ রকম নতুন প্রচলনকে ফিতনা বা ধর্মদ্রোহিতা হিসেবে শ্রেণিকরণ করা হবে। [নোট: ‘দুরুরীয়াত আল-দ্বীন’ মানে ধর্মের অত্যাবশ্যক সেসব মৌলনীতি, যার অস্বীকার কাউকে অবিশ্বাসীতে পরিণত করে]

এই আলোচনার আলোকে স্পষ্ট দৃশ্যমান হয় যে, মীলাদের মধ্যে কুরআন-সুন্নাহবিরোধী কোনো উপাদান-ই নেই। পক্ষান্তরে, এতে বিদ্যমান রয়েছে অনেক নেক ও প্রশংসনীয় (মোস্তাহাব) আমল, যেগুলো শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে একেবারে সঙ্গতিপূর্ণ।

১০.৫ ধর্মে নতুন বিষয়ের প্রবর্তন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে এর উদ্দিষ্ট অর্থ

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে ‘বিদ’আত’ (‘নতুন উদ্ভাবন/প্রচলন’) ও ‘ইহদাস ফীদ-দ্বীন’ (‘ধর্মের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার’) শব্দগুলো বুদ্ধি ও উপমাগত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ মর্মে যে, এমন নতুন বিষয়/বস্তু যার প্রমাণ শরীয়তে বিদ্যমান তা (ধর্মীয়) বিধানে বিদ’আত নয়, যদিও ভাষাগতভাবে তাকে হয়তো তা বলা হতে পারে। এবার আমরা

সেসব বিষয় বা বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো, যেগুলোর ক্ষেত্রে বিদ'আত শব্দটি সঠিকভাবে প্রয়োগ হয়ে থাকে। ক্লেয়ামত তথা শেষ বিচার দিবস অবধি সদ্যবহার করা যাবে এমন একটি (উন্নত) মান (এখানে) স্থাপন করা প্রয়োজন, যা দ্বারা আমরা যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে পারবো ওই সব বিষয়ের কোন্ কোন্গুলো বিদ'আতের আওতায় পড়বে এবং কোন্ কোন্গুলো পড়বে না। এই সঠিক/যথাযথ প্রয়োগের নিটমাস পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সাধনকারী কিছু হাদীস নিচে দেয়া হলো:

১. 'ইহদাস্ ফীদ-দ্বীন' তথা 'ধর্মের মধ্যে কিছু আবিষ্কার করা' বোঝায় সেসব গোমরাহী ও ধর্মদ্রোহিতাকে যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেসাল-প্রাপ্তির পরে খলীফা আবু বকর র.রা. এর খেলাফত আমলে দেখা দিয়েছিলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ র.রা. এর বর্ণনা করেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান:

أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْخَوْضِ وَلَيَرْفَعَنَّ مَعِيَ رَجُلًا مِنْكُمْ ثُمَّ لِيُخْتَلَجَنَّ دُونِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أَصْحَابِي فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَذَرِي مَا أَحَدْتُوا بَعْدَكَ .

-আমি তোমাদের আগে হাউজ-এর কাছে গিয়ে হাজির হবো। আর (ওই সময়) তোমাদের কতোগুলো লোককে অবশ্যই আমার সামনে আনা হবে; আবার আমার সামনে থেকে তাদেরকে পৃথকও করা হবে। তখন আমি বলবো, 'হে প্রতিপালক! এরা তো আমার উম্মত।' তখন বলা হবে, 'আপনার পরে এরা কী নতুন বিষয় প্রচলন করেছে, তা তো আপনি জানেন না।' ৬৬৬

২. হযরত আবুদ দারদা র.রা. এর বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

৬৬৬. সহীহ বুখারী, 'কিতাবু রিকাক', আল-হাওজ সংক্রান্ত অধ্যায়, ৫:২৪০৪ #৬২০৫; সহীহ মুসলিম, 'কিতাবুল ফাযায়েল', 'প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)' এর হাওজ সম্পর্কে ঘোষণা' অধ্যায়, ৪:১৭৯৬ #২২৯৭; এবং আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত 'মুসনাদ', ১:৪৩৯ #৪১৮০।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أُلْفِيَنَّ مَا نُوزِعْتُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَلَى الْخَوْضِ. فَأَقُولُ: هَذَا مِنْ أَصْحَابِي. فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَذَرِي مَا أَحَدْتُوا بَعْدَكَ، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَدْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: [لَسْتُ مِنْهُمْ].

-আমি দেখতে চাই না (এ দৃশ্য যে) তোমরা (আখেরাতে) আমার হাউজ তথা জলাশয়ে আসবে এবং এরপর তা থেকে (তোমাদেরকে) টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে নেয়া হবে। আমি (তখন) বলবো, "এরা তো আমারই সাহাবা।" অতঃপর আমাকে বলা হবে, "আপনি জানেন না তারা আপনার (বেসাল-প্রাপ্তির) পরে কী আবিষ্কার করেছে।" হযরত আবুদ দারদা র.রা. এর

আরজ করেন, "এয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যাতে তিনি আমাকে ওই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত না করেন।" প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দেন, "তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও। ৬৬৭"

হযরত আবুদ দারদা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উচ্চারিত 'তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও' - মর্মে বক্তব্যটাই প্রামাণ্য দলিল হিসেবে যথেষ্ট যে কারা ফিতনা সৃষ্টিকারী তিনি তা জানতেন।

৩. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব র.রা. এর বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমান:

৬৬৭. ইমাম তাবারানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) রচিত 'আল-মু'জামুল আওসাত,' ১:১২৫ #৩৯৭; আত তাবারানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখিত 'মুসনাদুল শা'মিয়ীন', ২:৩১১ #১৪০৫; ইবনে আবী আ'সিম কৃত 'আল-সুন্নাহ,' ২:৩৫৭ #৭৬৭; ইমাম দায়লামী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রণীত 'আল-ফিরদৌস বি-মা'সূর-ইল-খিতাব,' ১:৫০ #১২৯; এবং আল-হায়সামী রচিত 'মজমাউয্ যাওয়াঈদ ওয়া মামবা'আ আল-ফাওয়াঈদ,' ৯:৩৬৭ ও ১০:৩৬৫।

إِنِّي مُنْسِكٌ بِحُجْرَتِكُمْ هَلُمَّ عَنِ الثَّارِ، وَأَنْتُمْ تَهَافُتُونَ فِيهَا أَوْ تَفَاحُمُونَ تَفَاحُمَ
الْفَرَاشِ فِي الثَّارِ وَالْجُنَادِبِ يَعْنِي فِي الثَّارِ، وَأَنَا مُنْسِكٌ بِحُجْرَتِكُمْ، وَأَنَا فَرَطٌ
لَكُمْ عَلَى الْخَوْضِ، فَتَرْدُونَ عَلَيَّ مَعًا وَأَشْتَاتًا، فَأَعْرِفُكُمْ بِسِيمَاكُمْ،
وَأَسْمَائِكُمْ كَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ الْفَرَسَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: كَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ
الْغَرِيْبَةَ مِنَ الْإِبِلِ فِي إِبِلِهِ — فَيُؤْخَذُ بِكُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ، فَأَقُولُ: إِلَيَّ يَا رَبِّ!
أُمِّي أُمِّي. فَيَقُولُ أَوْ يَقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْتُوا بَعْدَكَ، كَانُوا
يَمْشُونَ بَعْدَكَ الْقَهْقَرَى.

—আমি তোমাদের দ্বারা দোষখের আগুনে নিজেদেরকে ছুঁড়ে ফেলা থেকে
আটকে ধরে রেখেছি। তবে তোমরা তথাপিও তাতে পতিত হচ্ছে; (অথবা
তিনি বলেন:) তোমরা সেটার দিকে দল বেঁধে ছুটছো, যেমনটি
পোকামাকড় আগুনের দিকে ছুটে থাকে; যদিও বাস্তবতা এই যে আমি
তোমাদেরকে আটকে ধরে রেখেছি (তাতে পতিত হওয়া থেকে)। আমি
তোমাদের আগে আল-হাউজে (বেহেশতী জলাশয়ে) হাজির হবো, যেখানে
তোমাদেরকে আমার কাছে আনা হবে - একত্রে বা ছড়ানো-ছিটানোভাবে।
আমি তোমাদেরকে তোমাদের নাম ও চিহ্ন দ্বারা এমনভাবে চিনতে
পারবো, যেমনিভাবে কোনো ব্যক্তি তার ঘোড়াকে চিনতে পারে, অথবা
তার উটগুলোকে চিনতে পারে। তবে (এরপর) তোমাদেরকে বাম দিকে
টেনেহিঁচড়ে নেয়া হবে, যার দরুন আমি বলবো: ‘হে প্রভু, আমাকে
(ফিরিয়ে) দিন আমার উম্মত! আমার উম্মত!’ আল্লাহ উত্তর দেবেন, অথবা
এ কথা (আমায়) বলা হবে: ‘হে হাবীব! আপনি জানেন না তারা আপনার
পরে কী বিষয়/বস্তু উদ্ভাবন করেছে। তারা দ্বীন থেকে ফিরে গেছে (মানে
মুরতাদ হয়ে গেছে)।’^{৬৬৮}

৬৬৮. আল-বায়হার কৃত ‘আল-বাহর আল-যুখা’র’ (আল-মুসনাদ), ১:৩১৪-৩১৫ #২০৪;
আল-ক্বাদা’ঈ নিজ ‘মুসনাদ আল-শিহাব’ ২:১৭৫ #১১৩০; আল-সিদ্বী প্রণীত ‘মুসনাদে
উম্মে ইবনে খাত্তাব’, ১:৮৪; মুনিরী রচিত ‘আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব মিনাল-
হাদীসিশ্ শরীফ’, ১:৩১৮ #১১৬৯; এবং আল-হায়সামী লিখিত ‘মজমাউয্ যওয়াঈদ ওয়া
মামবা’আ আল-ফাওয়াঈদ’, ৩:৮৫।

এই বিষয়ের ওপর অন্যান্য অনেক হাদীস বিদ্যমান, যেগুলো প্রিয়নবী
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর বেসালপ্রাপ্তির অল্প কিছু কাল পরের
(ঘটনা) সংক্রান্ত এবং যেগুলোতে ‘ইহদাস’ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। ধর্মের
মধ্যে বুনিয়ে পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে বড় বড় ফিতনাগুলোকেই
‘ইহদাস’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ওপরে উল্লেখিত হাদীসগুলোতে
হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাবুন্দের (রাঃদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) যুগে
ধর্মদ্রোহিতার রূপ পরিগ্রহকারী ‘মুহদাসাত আল-উমূর’ তথা নতুন
প্রচলনকৃত বিষয়াদির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এসব বিদআতের গোমরাহী
পরিবেশনকারীরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর যাহেরী
জিন্দেগীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, কিন্তু পরবর্তী সময়ে হয়ে গিয়েছিলো
মুরতাদ (ধর্মদ্রোহী), যাকাত দানে অস্বীকারকারী, ভণ্ড নবী দাবিদার ও
খাওয়ারিজ/খারেজী [সাবাইয়্যা চক্রও- বঙ্গানুবাদক]। অনেক হাদীসে এর
পক্ষে প্রমাণ রয়েছে। নিচে সেগুলো বর্ণিত হলো:

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে
প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم:

تُحْشَرُونَ حُفَاةَ غُرَاةٍ غُرَاةٍ ثُمَّ قَرَأَ: كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا
إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ { فَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرَجَالٍ مِنْ أَصْحَابِي
ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشَّمَالِ فَأَقُولُ: أَصْحَابِي فَيَقَالُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ
عَلَى أَعْقَابِهِمْ مِنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ:
{ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ
عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ؛ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ
فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَرَبَرِيُّ: ذُكِرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ قَبِيصَةَ قَالَ: هُمْ
الْمُرْتَدُّونَ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ

–“তোমাদেরকে খালি পা ও বিবস্ত্র অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।” অতঃপর প্রিয়নবী صلى الله عليه وسلم আয়াতে করীমা পাঠ করেন: ‘যেভাবে আমরা (বিশ্বজগতকে) প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম (তাদের নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর), সেভাবে আমরা সৃষ্টির পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করবো। এ অঙ্গীকার পূর্ণ করা আমাদের কর্তব্য, আমরা (এ পুনরাবৃত্তি) অবশ্যই সম্পাদন করবো’।^{৬৬৯} (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,) “প্রথমে পয়গাম্বর ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম)’কে বস্ত্রাবৃত করা হবে। এরপর আমার কিছু সাহাবীকে ডান ও বাম দিক হতে ধরে (নেয়া) হবে; আমি তখন বলবো: ‘আমার সাহাবা!’ আমাকে বলা হবে, ‘আপনি তাদের ছেড়ে আসার পরে তারা আপনার থেকে ফিরে গিয়ে মুরতাদ্ধ/ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে।’ অতঃপর আমি বলবো যেমনটি আল্লাহর পুণ্যবান বান্দা ঈসা ইবনে মরিয়ম (আলাইহিস্ সালাম) বলেছিলেন: ‘আমি তাদেরকে এ (বিষয়) ছাড়া কিছুই বলিনি যার নির্দেশ আপনি আমাকে দিয়েছিলেন, “তোমরা (কেবল) আল্লাহরই ইবাদত করো, যিনি আমার (-ও) প্রতিপালক, এবং তোমাদের (-ও) প্রতিপালক।” আর আমি তাদের (আকীদা ও আমলের) ওপর (সে সময় পর্যন্ত) সতর্ক প্রহাররত ছিলাম, যতোক্ষণ পর্যন্ত আমি সেসব লোকের মাঝে বিদ্যমান ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি উঠিয়ে নিলেন (আসমানে), তখন আপনি একা-ই তাদের (অবস্থার) ওপর নজর রেখেছিলেন; আর আপনি সর্ব বিষয়ে সাক্ষী। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার (-ই) বান্দা, আর যদি আপনি ক্ষমা করে দেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান’।^{৬৭০}”

মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ বলেন: আবু আবদিলাহ বর্ণনা করেন যে কুবায়াসাহ বলেছেন, ‘তারা ওই সমস্ত মুরতাদ্ধ যারা খলীফা আবু বকর (রাঃ) আনহু)’এর শাসনামলে ধর্মত্যাগ করেছিলো; অতঃপর খলীফা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।’^{৬৭১}

৬৬৯. আল-কুরআন, ২১:১০৪।

৬৭০. আল-কুরআন, ৫:১১৭-১১৮।

৬৭১. সহীহ বুখারী: ‘কিতাব আল-আম্মিয়া’, ‘আল্লাহর বাণী - মরিয়ম তাঁর পরিবার সদস্যদের থেকে পৃথক হওয়ার সময়কার বৃত্তান্ত পাঠ করো’ শীর্ষক অধ্যায়; ৩:১২৭১-১২৭২

৫. হযরত আসমা’ বিনতে আবী বকর (রাঃ) আনহা) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমান:

إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ وَسَيُؤَخِّدُ نَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، مِئِّي وَمِنْ أُمَّتِي فَيَقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ وَاللَّهِ، مَا بَرَحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ.

فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفَتَنَ عَنْ دِينِنَا.

–আমি আল-হাউজের ধারে থাকবো (আমার কাছে তোমাদের পৌঁছে দেবার অপেক্ষায়), যতোক্ষণ না কিছু লোককে আমার সামনে থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি আরজ করবো, ‘হে আমার রব/প্রভু, এরা আমারই, আমারই উম্মত।’ তখন আমাকে বলা হবে, ‘আপনি কি জানেন, আপনার পরে তারা কী করেছিলো? আল্লাহর কসম, তারা (মুরতাদ্ধ হিসেবে ধর্ম থেকে) ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিবৃত্ত হযনি।’

ইবনে আবী মুলাইকা (রাঃ) আনহু তা’আলা আনহু) বলেন, ‘এয়া আল্লাহ! আমরা (মুরতাদ্ধ হিসেবে) দ্বীন হতে ফিরে যাওয়া ও আপনার দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনায় অধঃপতিত হওয়া থেকে আপনারই কাছে আশ্রয় চাই।’^{৬৭২}

৬. হযরত জাবির বিন আবদিলাহ (রাঃ) আনহু) বর্ণনা করেন যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

#৩২৬৩; সহীহ বুখারী: ‘কিতাবুল আম্মিয়া’, ‘আল্লাহর বাণী- আর আল্লাহ ইবরাহীমকে আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন’ শীর্ষক অধ্যায়; ৩:১২২২ #৩১৭১; এবং তিরমিযী কৃত ‘আল-জা’মেউস্ সহীহ’: ‘কিতাব সীফা আল-কিয়ামা, ‘(হাশরের) সমাবেশ সম্পর্কে যা উল্লেখিত হয়েছে’ শীর্ষক অধ্যায়; ৪:৬১৫ #২৪২৩।

৬৭২. আল-বুখারী, ‘সহীহ’: ‘কিতাবুল রিক্বা’কু; ‘আল-হাউজ সংক্রান্ত’ অধ্যায়, ৫:২৪০৯ #৬২২০; এবং মুসলিম, ‘সহীহ’: ‘কিতাবুল ফাযায়েল’, ‘রাসূল (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)’এর হাউজ-সম্পর্কিত ঘোষণা’ শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৭৯৪ #২২৯৩।

أَنَا عَلَى الْحَوْضِ أَنْظُرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ قَالَ: فَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، مَنِّي
وَمِنْ أُمَّتِي قَالَ: فَيُقَالُ: وَمَا يُدْرِيكَ مَا عَمِلُوا بِعَدِّكَ مَا بَرِحُوا بِعَدِّكَ
يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ.

—আমি হাউজের ধারে থাকবো (আমার কাছে তোমাদেরকে পৌঁছে দেবার অপেক্ষায়)। কিছু লোককে আমার কাছ থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে; আমি তখন আরজ করবো, ‘হে আমার প্রভু, এরা আমারই, আমারই উম্মত।’ অতঃপর আমাকে বলা হবে, ‘আপনি কি জানেন না তারা আপনার পরে কী করেছে? তারা (মুরতাদ হিসেবে দ্বীন থেকে) ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে নিবৃত্ত হয়নি।’^{৬৭৩}

এই বর্ণনাগুলোর সবই আমাদের অবস্থানকে মজবুত করে এ মর্মে যে, এখানে ‘মুহদাসা’ত আল-উমূর’ তথা নতুন প্রচলিত বিষয়সমূহ ধর্মত্যাগ (ইরতিদাদ)’কে উদ্দেশ্য করেছে, যা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর বেসালপ্রাপ্তির অল্প সময়কাল পরেই সংঘটিত হয়েছিলো।

নিম্নের বিষয়গুলো এ ব্যাপারে আরো আলোকপাত করবে:

৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃরাঃরাঃ আনহুঃ) বর্ণিত হাদীস, যেটা ‘আল-মারফু’ আল-মুত্তাসিল’ (অর্থাৎ, এমন এসনাদ যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আরোপিত এবং তাঁর সাথে নিখুঁতভাবে সংযুক্ত), সেটার শেষাংশে ‘আপনি তাদের ছেড়ে আসার পরে তারা ধর্ম হতে ফিরে গিয়েছিলো’ মর্মে বাক্যটি সেসব লোককে উদ্দেশ্য করেছে যারা নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর বেসালপ্রাপ্তির পরে ধর্মত্যাগ করেছিলো। অতএব, ‘ইহদাস’ প্রবর্তকবর্গ (মানে নতুন কিছুর প্রচলনকারীরা) ধর্মদ্রোহী/মুরতাদ ছিলো।

৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃরাঃরাঃ আনহুঃ) বর্ণিত হাদীসটির শেষে ইমাম বুখারী (রাঃরাঃরাঃ আনহুঃ) মুহাদ্দীস কুবায়াসা বিন উক্ববা

(রাঃরাঃরাঃ আনহুঃ)’এর কথা উদ্ধৃত করেন, যিনি আমাদের অবস্থানকে সমর্থন যোগান এই বলে:

هُمُ الْمُرْتَدُونَ الَّذِينَ ارْتَدَوْا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

—‘তারা ওই সমস্ত মুরতাদ যারা খলীফা আবু বকর (রাঃরাঃরাঃ আনহুঃ)’এর শাসনামলে ধর্মত্যাগ করেছিলো; অতঃপর খলীফা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।’

৯. হযরত আসমা’ বিনতে আবী বকর (রাঃরাঃরাঃ আনহাঃ)’এর বর্ণনা উদ্ধৃত করার পরে ইমাম বুখারী (রাঃরাঃরাঃ আনহুঃ) তাবেঈ হযরত ইবনে আবী মুলাইকা (রাঃরাঃরাঃ আনহুঃ)’এর দুআ’ লিপিবদ্ধ করেন, যিনি বলেন:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا.

—‘এয়া আল্লাহ! আমরা (মুরতাদ হিসেবে) দ্বীন হতে ফিরে যাওয়া ও আপনার দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনায় অধঃপতিত হওয়া থেকে আপনারই কাছে আশ্রয় চাই।’

১০. উপরোক্ত হাদীসে ‘আল্লাহর কসম, তারা (মুরতাদ হিসেবে ধর্ম থেকে) ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিবৃত্ত হয়নি’ মর্মে বাক্যটিও আমাদের অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করেছে।

১১. হাদীসসমূহের একটিতে হযরত আব্দু দার্দা’ (রাঃরাঃরাঃ আনহুঃ) আরজ করেন, “এয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), অনুগ্রহ করে আল্লাহ তা’লার কাছে দুআ’ করুন যাতে তিনি আমাকে তাদের (ধর্মত্যাগী মুরতাদদের) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করেন।” প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর আর্জির উত্তরে বলেন, “তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।” ইমাম তাবারানী (রাঃরাঃরাঃ আনহুঃ) ‘মুসনাদুল শা’মিয়ীন’ পুস্তকে (২:৩১১ #১৪০৫) এই হাদীস বর্ণনা করার পরে লেখেন:

فَمَاتَ قَبْلَ عُثْمَانَ بِسَنَتَيْنِ.

—তিনি (আব্দু দার্দা’- রা.) খলীফা উসমান (রাঃরাঃরাঃ আনহুঃ)’এর দু বছর আগে বেসালপ্রাপ্ত হন।

৬৭৩. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃরাঃরাঃ আনহুঃ), ‘আল-মুসনাদ,’ ৩:৩৮৪ #১৫,১৬১; এবং আল-হায়সামী কৃত ‘মজমাউয়্ যাওয়াঈদ ওয়া মামবাআ’ আল-ফাওয়াঈদ,’ ১০:৩৬৪।

এ থেকে বোধগম্য হয় যে, ‘ইহদাস্ ফীদ্বীন’ তথা ধর্মে নতুন কোনো কিছু প্রচলন করা সেসব ‘ইরতিদাদ’/ধর্মত্যাগের সীমালঙ্ঘনকে উদ্দেশ্য করেছে, যেগুলো সঠিক পথে পরিচালিত খলীফা (রাহিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) বৃন্দের শাসনামলে সংঘটিত হয়েছিলো।

১২. এই বিষয়টিকে আরো খোলাসা করার খাতিরে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক দিক তুলে ধরেছেন ইমাম হা’কিম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর ‘আল-মুসতাদরাক আলাস্ সহিহাইন’ গ্রন্থে। তিনি বর্ণনা করেন, ‘আল-ফিতনাতুল উলা’ তথা প্রথম বিবাদময় সীমালঙ্ঘন-শেষে প্রখ্যাত তাবৈঈ ইমাম হুসাইন বিন খারিজা (রাহমতুল্লাহি আলাইহি) এক স্বপ্নে দেখেন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও পয়গাম্বর ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) আলোচনারত; নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পয়গাম্বর ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম)’এর কাছে অনুরোধ করেন দু’আ করতে যাতে তাঁর উম্মতকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। এর উত্তরে হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) বলেন:

إِنَّكَ لَا تَذَرِي مَا أَحَدْتُنَا بَعْدَكَ، أَرَأَيْتُمْ دِمَاءَهُمْ وَقَتَلُوا إِمَامَهُمْ.

–আপনি জানেন না তারা আপনার (বেসালের) পরে কী নতুন (রীতিনীতি) প্রচলন করেছে; তারা (মুসলমানবৃন্দের) রক্ত ঝরিয়েছে এবং তাঁদের ইমাম (উসমান রাহিয়াল্লাহু আনহু) কে শহীদ করেছে।^{৬৭৪}

ইমাম ইবনে হাজর আসক্বালানী (রাহমতুল্লাহি আলাইহি) ‘আল-ইসা’বা ফীত্ব তামইয়ীযিস্ সাহাবা’ (২:১২৭ #১৯৭৯) কিতাবে এবং ইমাম ইবনে আবদিল বার (রাহমতুল্লাহি আলাইহি) ‘আল-তামহীদ লিমা’ ফীল্ মুওয়ান্না মিনাল-মা’আনী ওয়াল-আসা’নীদ’ (১৯:২২২) বইয়ে এই বর্ণনাটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন এই বলে যে, ‘আল-ফিতনাতুল উলা’ ছিলো খলীফা উসমান (রাহিয়াল্লাহু আনহু) এর শাহাদাৎ বরণ ও তৎপরবর্তীতে উদ্ভূত বিবাদ-বিসম্বাদ ও সীমালঙ্ঘন। এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় যে যারা খলীফা (রাহিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) কে শহীদ করেছিলো তারাই ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী আর তারাই ধর্মের মধ্যে নতুন (প্রথা) প্রচলনের দায়ে দুষ্ট। এসব

বিদ’আতী ছিলো সংকীর্ণমনা গোঁড়াপন্থী যারা সিফফীনের যুদ্ধের পরে খারেজী নামে পরিচিত হয়ে যায়। [সাবাইয়্যা চক্রও ফিতনায় জড়িত ছিল–বঙ্গানুবাদক]

১০.৬ খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে উদ্ভূত ‘মুহদাসাত আল-উমূর’ (নতুন বিষয়াদি)

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর বেসালপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরে সঠিক পথপ্রাপ্ত খলীফা (রাহিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) বৃন্দের শাসনামলে অনেক নতুন বিষয় (বিদআত) ধর্মে প্রচলন করা হয়। সেসব নতুন বিষয়ের (মুহদাসাত) একটি তালিকা নিচে পেশ করা হলো। এগুলোকে বিদআত হিসেবে নিশ্চিত করা হয় এবং এসবের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হয়:

১০.৬.১ মিথ্যে নুবুওয়্যাত আরোপের সীমা লঙ্ঘনকে বেদআত ঘোষণা করা হয়

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর বেসাল শরীফের পরে মিথ্যে নুবুওয়্যাত দাবিকে একটি ‘ইহদাস্ ফীদ্বীন’ তথা নতুন উদ্ভাবন বলে ঘোষণা করা হয়। আসওয়াদ বিন উনযাহ আল-’আনসি, তুলাইহা আল-আসাদী ও মুসাইলামা আল-কাযযাব ছিলো এ ধরনের ভণ্ড নবী দাবিদার, যাদের বিরুদ্ধে খলীফা আবু বকর আস্ সিদ্দীক (রাহিয়াল্লাহু আনহু) ও সাহাবা কেরাম (রাহিয়াল্লাহু তা’আলা আনহুম) যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

১০.৬.২ রিদ্বাহ’র (ধর্মত্যাগের) সীমা লঙ্ঘনকে বেদআত ঘোষণা করা হয়

হযরত উসা’মা বিন যায়দ (রাহিয়াল্লাহু আনহু) এর (অধীন) সৈন্যবাহিনীর প্রস্থানের পরে আরব উপদ্বীপে আরেক দুর্যোগ দেখা দেয় এ আকারে যে,

এই সব গোত্রের দ্বারা ইসলাম ধর্মকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের পাশাপাশি তারা চরম ঔদ্ধত্যসহ যাকাত দানেও অস্বীকৃতি জানায়। খলীফা আবু বকর (রাঃ) যিলাল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং উচ্চারণ করেন তাঁরই এই বিখ্যাত বাণী:

—আল্লাহর কসম! আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে; কেননা নিশ্চয় যাকাত রাষ্ট্রীয় কোষাগারের (মানে বায়তুল মালের) প্রাপ্য অধিকার। আল্লাহর নামে শপথ! একটা মাদী ছাগল যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর সময়ে তারা পরিশোধ করতো, সেটাও যদি তারা আটকে রাখে, তাহলেও আমি তাদের সাথে লড়বো সেটা আটকে রাখার দায়ে। ৬৭৬

৬৭৫. ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত 'তারীখ আল-উমুম ওয়াল-মুলুক'; ২:২৫৪।

৬৭৬. আল-বুখারী, সহীহ: কিতাবু যাকাত, 'যাকাতের বাধ্যবাধকতা' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৫০৭ #১৩৩৫; আল-বুখারী, সহীহ: কিতাবু ইসতিজা'বা আল-মুরতাদীন, 'ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা অস্বীকারকারীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড' শীর্ষক অধ্যায়, ৬:২৫৩৮ #৬৫২৬; এবং মুসলিম, সহীহ: কিতাবুল ঈমান, 'লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিধান যতোক্ষণ না তারা উচ্চারণ করে - আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁরই প্রেরিত রাসুল' শীর্ষক অধ্যায়, ১:৫১ #২০।

হযরতে ইমামে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফত আমলে খারেজী গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। সফফীন নামের একটি স্থানে হযরতে ইমামে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরতে আমীরে মু'য়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মধ্যে এক যুদ্ধ বেশ কিছু দিন ধরে চলে। এতে সহস্র সহস্র মহান সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) ও তাবৈঈন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম) শাহাদাৎ বরণ করেন।^{৬৭৭} অবশেষে উভয় পক্ষ দু জন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করে তাঁদের সালিশের মধ্যস্থতায় কুরআন ও সুন্নাহ'র অলোকে এই লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটাতে সক্ষম হন। হযরত আবু মূসা আবদুল্লাহ বিন ক্বায়স আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নিয়োগ করেছিলেন হযরতে ইমামে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু; অপর পক্ষে, হযরত 'আমর বিন 'আস্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নিয়োগ করেছিলেন হযরতে আমীরে মু'য়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। অতঃপর একটি সন্ধিচুক্তিপত্র স্বাক্ষরের দ্বারা বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়েছিলো।

৬৭৭. বঙ্গানুবাদকের নোট: সম্প্রতি প্রকাশিত মওলানা মুহা'র মুহাম্মদের লিখিত 'হযরত আম্মার (রাঃ)দ্বিগ্লাম্বাহ তা'আলা আনহু'এর শাহাদাত ও সাবাহিয়া-চক্রের ভূমিকা' শীর্ষক বইয়ে ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে সিমফাফীন যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা তেমন বেশি নয় বলে জানানো হয়েছে। এই অতিরঞ্জন করেছে রাফেযী শিয়া-চক্র।

تُحَكِّمُونَ فِي أَمْرِ اللَّهِ الرَّجَالَ؟ لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ.

অর্থ: তোমরা কি আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে মানুষকে হাকিম/সালিশি মানছো? আল্লাহর হুকুম ছাড়া অন্য কোনো হুকুম/সালিশি সিদ্ধান্ত নেই।^{৬৭৮}

‘উরওয়া এই মন্তব্য করে হযরত আশ’আস্ বিন ক্বায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’এর সওয়াবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেটাকে তরবারির আঘাত হানে। এতে হযরত আশ’আস্ (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) মাটিতে পড়ে যান আর গোত্রগুলোর মাঝে এক মহা লড়াই বেধে যাবার উপক্রম হয়। হযরতে ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) কূফা’ নগরীতে প্রত্যাবর্তনের পরে এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরে বলেন:

اللَّهُ أَكْبَرُ! كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِمَا بَاطِلٌ، إِنَّ سَكَنُوا عَمَمَنَاهُمْ، وَإِنْ تَكَلَّمُوا حَبَّجَنَاهُمْ، وَإِنْ خَرَجُوا عَلَيْنَا قَاتَلْنَاهُمْ.

—আল্লাহ সবচেয়ে মহান! এ কথা (অবশ্যই) সত্য, কিন্তু (এতে তাদের) উদ্দেশ্য ভ্রান্ত। তারা যদি চুপ থাকে, তাহলে আমরা তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবো; তারা যদি বিতর্ক করে, তাহলে আমরা প্রামাণ্য দলিল দ্বারা তাদের পরাস্ত করবো; আর যদি তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে, তাহলে আমরাও তাদের সাথে লড়াই করবো।^{৬৭৯}

খলীফা ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)’এর বিরুদ্ধে খারেজী গোষ্ঠী মানুষকে উস্কে দিতে লাগলো এই অনুরোধসহ যে, তাঁরা যেনো পাহাড়ে আশ্রয় নেন অথবা অন্য কোনো শহরে স্থানান্তরিত হন; এর পাশাপাশি খারেজীরা হযরতে ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)’এর কথাকে দৃশ্যীয় বিদ’আত বলে নিন্দা করতে থাকে। ‘আল্লাহর আইন’ প্রতিষ্ঠায় সংকল্পবদ্ধ হয়ে এই বিদ্রোহীরা ‘নাহরাওয়া’ন’ এলাকায় সমবেত হয় এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে। এই স্থানেই তারা সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ

৬৭৮. ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত ‘তারীখুল উমুম ওয়াল-মুলুক’, ৩:১০৪; ইবনে আসীর প্রণীত ‘কা’মিল ফীত তারীখ’, ৩:১৯৬; এবং ইবনে জাওয়ী রচিত ‘আল-মুনতাহাম ফীত তারীখিল মুলুক ওয়াল-উমাম’, ৫:১২৩।

৬৭৯. ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখিত ‘তারীখুল উমুম ওয়াল-মুলুক’, ৩:১১৪; এবং ইবনে আসীর কৃত ‘আল-কা’মিল ফীত তারীখ’, ৩:২১২-২১৩।

ইবনে খাব্বা’ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’কে শহীদ করে দেয়; এ কথা জানতে পেরে হযরতে ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বলেন:

دُونَكُمْ الْقَوْمَ.

—এই গোষ্ঠীর মূলোৎপাটন করো।

অতঃপর ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) কর্তৃক একটি সৈন্য বাহিনী প্রেরিত হয় আর এরই ফলশ্রুতিতে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেধে যায়। জুনদুব (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

فَقَتَلْتُ بِكَفِّي هَذِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَنِي مَا كَانَ دَخَلَنِي ثَمَانِيَةَ قَبْلِ أَنْ أَصِلَ الظُّهْرَ، وَمَا قُتِلَ مِنَّا عَشْرَةٌ وَلَا نَجَا مِنْهُمْ عَشْرَةٌ.

—আমি যোহরের নামায আদায় করার আগ পর্যন্ত নিজ হাতে তাদের আটজনকে হত্যা করেছিলাম। আমাদের (পক্ষের) এমন কী দশ জনও নিহত হননি; আর তাদের (পক্ষের) দশ জনও বাঁচেনি।^{৬৮০}

ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)’এর সময়কালে এভাবেই খারেজী বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সবচেয়ে সম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবা কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)’কে যে ক্রেশের কথা ইশারায় বলেছিলেন, এসব ঘটনা তারই বাস্তব রূপ। এগুলোকেই ‘মুহদাসা’তুল উমূর’ তথা ‘উদ্ভাবিত বিষয়াদি’ বলা হয়েছিলো, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর বেসাল-প্রাপ্তির অল্পকাল পরেই মাথাচাড়া দিয়েছিলো। অতএব, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ অনুযায়ী, এই চারটি গজানো দলই (যথা - ভণ্ড নবী দাবিদার, মুরতাদ/ধর্মত্যাগী, যাকআত পরিশোধে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ও খারেজী গোষ্ঠী) ছিলো ‘ইহদা’স্ ফীদ্বীন’ তথা ‘ধর্মে নতুন কোনো বিষয়ের প্রচলনকারী।’ কৌতূহলোদ্দীপকভাবে, হাদীসগুলোতে

৬৮০. ইমাম তাবারানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত ‘আল-মু’জামুল আওসাত’, ৪:২২৭ #৪০৫১; এবং আল-হায়সামী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) প্রণীত ‘মজমাউন্ যওয়াঈদ ওয়া মান্বাআ’ আল-ফওয়াঈদ’, ৪:২২৭।

‘ইহদা’স্’ (উদ্ভাবন/প্রচলন) শব্দটিকে শুধুমাত্র ‘ইরতিদাদ’ বা ধর্মত্যাগ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই ‘বিদআতুদ্ দালা’লাত’ (পথভ্রষ্ট নতুন প্রচলন) জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং এতদ্বারা সেসব নতুন বিষয়ের প্রচলনকে বোঝায়, যেগুলোর ফলশ্রুতিতে ধর্মত্যাগ ঘটে থাকে।

১০.৬.৪.১ আমাদের যুগে কোনো কিছুকে ‘নতুন প্রবর্তিত বিষয়’ (মুহদাসাত আল-উমূর) বলার সঠিক পদ্ধতি কী?

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং বিদ’আত বলতে কী বোঝায় তা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এ মর্মে যে, এটা ‘মুহদাসা’ত আল-উমূর’ তথা ‘নতুন প্রচলিত বিষয়াদি’কে উদ্দেশ্য করে থাকে। (আরেক কথায়) এটার উদ্দেশ্য এমন সব সীমা লঙ্ঘন যা ধর্মের মৌলিক শিক্ষার পরিবর্তন সাধন করে, অথবা যার ফলশ্রুতিতে ধর্মকে অস্বীকার করা হয়; এ ধরনের বিষয় সারবত্তায় ধর্মত্যাগ বা ধর্মদ্রোহিতা (ইরতিদাদ/মুরতাদী)। অতএব, পথভ্রষ্ট নতুন প্রচলন (আল-বিদ’আত আদ দালা’লাত) ছোটখাটো মতপার্থক্যকে বোঝায় না; বরঞ্চ এর প্রয়োগ এমনই এক পর্যায়ে যার ফলশ্রুতিতে ধর্মদ্রোহিতা কিংবা ধর্মত্যাগ (খুরুজ ‘আনিল্ ইসলাম) ঘটে থাকে। এরকম বিষয় উম্মতের সামনে ‘ইখতিলা’ফ কাসীর’ তথা ব্যাপক বিভক্তি/বিভেদের গুরুতর কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে সুন্নাহ অথবা ধর্মীয় বিষয়াদির কর্তন তথা বর্জন হতে পারে।

এ কিসিমের মুখ্য বিভক্তিগুলো হলো, মিল্লাতের অত্যাবশ্যক নীতিমালার কোনো একটির অস্বীকার; যেমন - আল্লাহ’তে বিশ্বাস; তাঁর ফেরেশতাকুল, আসমানী কিতাবসমূহ, নুবুয়্যত, শেষ বিচার দিবস, তাকুদীর ও পারলৌকিক জীবনে অবিশ্বাস; ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের কোনো একটি অস্বীকার, যথা - আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর প্রতি অবিশ্বাস, ওয়াক্জিয়া নামায, রোযা, যাকাত কিংবা হজ্জ অস্বীকার; ইসলাম ধর্মের মধ্যে যোগ-বিয়োগ করা; খতমে নুবুয়্যতের (মানে আখেরী নবী হওয়ার) সাথে ভিন্নমত পোষণ; আল-কুরআনের বিকৃতি সাধন (আয়াতে করীমার যোগ-বিয়োগ দ্বারা); হাদীস ও সুন্নাহ’র

কর্তৃত্বকে সামগ্রিকভাবে নাকচ করা; খারেজী/রাফেযীর মতো পথভ্রষ্ট দলগুলোর সাথে নিজেকে জড়ানো; সম্মুখ জিহাদের বিধানকে রহিতের আহ্বান করা; সুদের অনুমতি দান এবং অনুরূপ বিষয়াদি। এ ধরনের আকীদা-বিশ্বাস পোষণ উম্মতের জন্যে সীমা লঙ্ঘন হবে, আর শেষ বিচার দিবস অবধি এগুলো বিদ’আত আদ দালালা’ত তথা পথভ্রষ্ট নতুন প্রচলনের আওতায় পড়বে। এই আকীদা পোষণকারী ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে নিষ্কিণ্ত হবে।

এই কারণে বিদ’আত শব্দটি দ্বারা কেবলমাত্র ধর্মত্যাগ ও তার নানা বহিঃপ্রকাশকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর বেসালপ্রাপ্তির অল্প কিছুকাল পরে দেখা দিয়েছিলো। বিষয়টি যদি এরকম না হতো, তবে বিদ’আত আদ দালা’লাত শব্দটি প্রয়োগ করা যেতো না। তাই আমাদের এ যুগে এর সঠিক প্রয়োগের খাতিরে একটি প্রতিষ্ঠিত মান যাচাই পদ্ধতির সদ্ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। মীলাদ, উরস-ফাতিহা, ঈসা’ল-এ-সওয়া’ব (রুহের প্রতি সওয়াব বখশানোর) মাহফিল ইত্যাদি ইখতিলাফী/মতপার্থক্যপূর্ণ আনুষঙ্গিক বিষয়াদিকে ‘মুহদাসা’তুল উমূর’ বা ‘আল-বিদ’আতুদ্ দালা’লাত’ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত হবে না, কেননা এসব বিষয় কাউকে মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত করে না। বরঞ্চ এগুলো মূলতঃ শরীয়তে সুপ্রতিষ্ঠিত। ‘মুহদাসা’তুল উমূর’ সেসব সীমা লঙ্ঘনকে বোঝায়, যেগুলো উম্মতের মাঝে বড় ধরনের বিভেদ সৃষ্টি করে, যার দরুন মুসলিম সমাজ বহু দলে বিভক্ত হন এবং তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়, আর ওই সীমা লঙ্ঘনের ফলে অনেক মানুষ নিহত হন।

সেসব লোক যাঁরা মীলাদ উদযাপন কিংবা বেসালপ্রাপ্ত পুণ্যাআবন্দের প্রতি সওয়াব বখশানোকে ‘মুহদাসা’তুল উমূর’ কিংবা ‘আল-বিদ’আতুদ্ দালা’লাত’ ঘোষণা করেন, তাঁদের জন্যে তা বড় ধরনের এক লজ্জার ব্যাপার বটে। এরকম বিষয়গুলোকে বিদ’আত ঘোষণা করে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে খোদ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এরই প্রদত্ত সংজ্ঞাকে নাকচ করে থাকেন; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর প্রতি এই ঔদ্ধত্য প্রদর্শন তাঁর সহীহ হাদীসসমূহ অস্বীকারেরই সামিল। বাস্তবতা হলো, এগুলো ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশংসনীয় বিষয়।

ফকীহ তথা বিধানশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী হাজারো বিষয়ে একে অপরের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন; কোনো একটি বিষয় প্রশংসনীয়, না নিন্দনীয়, এমন কী কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় হালাল/জায়েয, না হারাম/না-জায়েয, তা নিয়েও তাঁরা মতপার্থক্যে জড়িয়েছেন। এসব প্রশংসনীয় কাজ (মোস্তাহাব্বাত)-কে বিদ'আত বলা উচিত নয়; কেননা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, এ ধরনের কোনো অভিযোগ আচরিত বা অনুশীলিত রীতিটিকে ইরতিদাদ তথা ধর্মত্যাগ ও কুফর/অবিশ্বাসের পর্যায়ে নিয়ে যাবে; আর এর (শরঈ) হুকুম হচ্ছে সেটার অনুশীলনকারীদের প্রতি জিহাদ ঘোষণা। মীলাদ/ মওলুদ/ মীলাদকে যাঁরা আল-বিদ'আতুদ দ্বালা'ত বিবেচনা করেন, তাঁরা মীলাদ উদযাপনকারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ লড়ছেন কি?

সাহাবা কেরাম রাহিয়াল্লাহু আনহুম আজমাদ্দিনের যুগে কুরআন মজীদের সংকলন, তারা'বীহ নামায জামা'আতে আদায় এবং জুমু'আহ দিবসের নামাযে আযান মুসলিম সর্বসাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করা হয়েছিলো। একইভাবে, মীলাদ অনুষ্ঠানও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর সাথে মহব্বতের বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক জোড়া লাগানোর এবং সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি পূর্ণ তাবেদারির আকাঙ্ক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত ও সুদৃঢ়করণের একটি মাধ্যম হতে পারে। আর অনুরূপভাবে, ইত্তিকালপ্রাপ্তদের রুহের প্রতি সওয়াব বখশানোও তাঁদের গুনাহ মার্ফের ও মর্যাদা উন্নীতকরণের মাধ্যম হতে পারে।

১০.৭ সাহাবা (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)-বৃন্দের বর্ণনার আলোকে বিদ'আতের সংজ্ঞা (ধারণা)

ওপরের আলোচনায় বিদ'আতের আক্ষরিক অর্থ ব্যাখ্যা করার সময় আমরা স্পষ্ট করেছি যে বিদ'আত আক্ষরিকভাবে বোঝায় কোনো নতুন বস্তু/বিষয়; এর পাশাপাশি 'নতুন প্রচলনকৃত বিষয়াদি' (মুহদাসাত আল-উমূর) ও 'ধর্মে নতুন কোনো কিছুর প্রচলন' (ইহদাস ফীদ্বীন) বলতে বোঝায় ধর্মত্যাগ (ইরতিদাদ), কিংবা এমন পর্যায়ের সীমা লঙ্ঘন যা 'ধর্মত্যাগে

পরিণত করে' (খুরুজ 'আনিল ইসলাম)। আমরা এক্ষণে সাহাবা কেরাম (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)-মণ্ডলীর বর্ণনাসমূহ হতে এই বিদ'আতের সংজ্ঞাটির পক্ষে উদাহরণ পাওয়া যায় কি-না তা গবেষণা করে দেখবো, যা এ বিষয়টিকে আরো খোলাসা করবে। সর্ব-হযরত আবু বকর সিদ্দীক, উমর ফারুক ও উসমান যিনুরাইন (রাহিয়াল্লাহু আনহুম)'এর সাথে জড়িত এতদসংক্রান্ত ঘটনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও এতে থাকবে, কেননা তাঁদের অনুশীলিত রীতিনীতি-ই প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর পরে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বেসালপ্রাপ্তির পরে সংঘটিতব্য সীমা লঙ্ঘনকে নিবারণের লক্ষ্যে তাঁরই সুন্নাহ (রীতিনীতি) ও তাঁর উত্তরসূরী সঠিক পথপ্রাপ্ত খলীফাবৃন্দের (রাহিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সুন্নাহ'কে আঁকড়ে ধরতে আদেশ করেছিলেন।

১০.৭.১ আল-কুরআনের সংকলন ও শায়খাইন (প্রথম দুই খলীফা)-এর আচরিত প্রথা

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর বেসালপ্রাপ্তির পরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাহিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হলে নবী দাবিদার ভণ্ড মুসায়লামা আল-কাযযাবের বিরুদ্ধে ইয়ামা'মা এলাকায় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যার ফলশ্রুতিতে আনুমানিক ৭০০ কুরআনে হাফেজ (কুরআন মুখস্থকারী) সাহাবা (রাহিয়াল্লাহু আনহুম) শহীদ হন। এর আগে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর যাহেরী তথা প্রকাশ্য হায়াতে জিন্দেগীর সময়ে আল-কুরআন একটি একক গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি। বরঞ্চ কিছু সূরাহ ও আয়াত অন্যান্যগুলোর থেকে আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন বস্তুর ওপরে লিপিবদ্ধ হয়েছিলো। হযরত উমর ফারুক (রাহিয়াল্লাহু আনহু) অনুভব করেন যে এভাবে সামরিক জেহাদের পরিস্থিতি বজায় থাকলে এমন এক দিন হয়তো আসবে যখন কুর'আন মজীদের সংরক্ষণ সত্যি দুষ্কর হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। এই শিক্ষা বোধ নিয়েই হযরত উমর ফারুক (রাহিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা আবু বকর সিদ্দীক (রাহিয়াল্লাহু আনহু)'এর কাছে প্রস্তাব করেন যে কুরআন

মজীদকে একটি একক গ্রন্থের আকারে সংকলন করা উচিত। এ কথা শুনে খলীফা আবু বকর (রাঃ) বললেন:

كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا مَا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

অর্থ: আমি কীভাবে এমন কাজ করতে পারি, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেন নি?

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) উত্তরে বলেন, “হে আমিরুল মোমেনীন! এ কথা সত্য যে এই কাজটি হাবীবে খোদা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের জাহেরী (প্রকাশ্য) হায়াতে জিন্দেগীতে করেন নি। তবে এটা খায়র-বরকতময় (هُوَ وَاللَّهُ خَيْرٌ)। আমাদের এ কাজ বাস্তবায়নে দ্বিধাবিহীন হওয়া উচিত নয়।” এই আলোচনা চলাকালে খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বক্ষ (মানে অন্তর) আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক সম্প্রসারিত হয়, আর তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত যায়দ বিন সা‘বিত (রাঃ)-কে কুর‘আন মজীদ একত্রিত করে একটি সংকলন আকারে প্রকাশের জন্যে ডেকে পাঠান; (কেননা) হযরত যায়দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জাহেরী হায়াতে জিন্দেগীর সময় কাতিবে ওহী বা ওহী লেখক ছিলেন। খলীফা (রাঃ) তা‘আলা আনহু) এর আদেশ পেয়ে এই সুব্হৎ কাজ সুসম্পন্ন করার লক্ষ্যে তিনি কুরআন মজীদ যেসব বস্তুর ওপরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো সেই খেজুরপাতা, শ্বেতপাথর ও অনুরূপ সমস্ত বস্তু সংগ্রহ করেন এবং কুরআন হেফজকারী মহান সাহাবী (রাঃ) আনহু) বৃন্দের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। কুরআন মজীদে এই সংকলনটি খলীফা আবু বকর (রাঃ) হতে (উত্তরসূরী) খলীফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর কাছে হস্তান্তরিত হয় এবং অবশেষে এটা তাঁর কন্যা ও ঈমানদারবৃন্দের মাতা হযরতে হাফসা (রাঃ) আনহা) এর জিম্মায় চলে আসে। পরবর্তী পর্যায়ে খলীফা হযরতে উসমান যিনুরাইন (রাঃ) তাঁর কাছে ওই সংকলনটি হস্তান্তরের জন্যে

অনুরোধ জানান, আর এরপর খলীফা সেটাকে পুনঃপ্রকাশ করে মুসলিম জাহানের সর্বত্র বিতরণ করেন।^{৬৮১}

এভাবেই আল-বিন্দ‘আতুল হাসানাহ তথা প্রশংসনীয় নতুন প্রচলনের সর্বপ্রথম ঘটনা ঘটে সর্ব-হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ফারুক (রাঃ) এর মোবারক (পুণ্যময়) হাতে।

১০.৭.২ জামা‘আতে তারাবীহ’র নামায আদায়ের প্রবর্তন

কুরআন মজীদ সংকলনের মতো এই অগ্রণী কাজটিও হযরতে উমরে ফারুক (রাঃ) এর (সূক্ষ্ম/দূরদর্শী) চিন্তার ফসল। হাদীসসমূহে উল্লেখিত হয়েছে যে, সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সারা (যাহেরী/প্রকাশ্য) জীবনে তারাবীহ’র নামায পবিত্র রমজান মাসের তিনটি রাতে জামা‘আতে আদায় করতেন। অতঃপর উম্মতের প্রতি এই নামায ফরয হয়ে যাবার আশঙ্কায় সবচেয়ে দয়াবান পয়গাম্বর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ আশীর্বাদময় গৃহে তারাবীহ’র নামায আদায় করেন; আর তাঁর মহান সাহাবা কেরাম (রাঃ) আনহু) ও তাঁরই অনুসরণে ব্যক্তিগতভাবে তা আদায় করতেন। এই রীতি (উত্তরসূরী) খলীফা হযরতে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর আড়াই বছরের খেলাফত আমলে অব্যাহত থাকে। হযরতে উমরে ফারুক (রাঃ) যখন তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হন তিনি অনুধাবন করেন, প্রত্যেকে যেহেতু নিজে নিজে তারাবীহ’র নামায আদায় করছেন, সেহেতু এতে উদ্বুদ্ধ থাকার বেলায় ঘাটতি দেখা দেবার সম্ভাবনা আছে, যার ফলশ্রুতিতে এই নামায পরিত্যক্ত হতে পারে। তাই তিনি (ইজতিহাদ প্রয়োগ সাপেক্ষে) এই

৬৮১. সহীহ বুখারী: কিতাব আল-তাফসীর, আল্লাহর বাণী - “নিশ্চয় তোমাদের কাছে তাশরীফ এনেছেন তোমাদেরই মধ্য হতে এমন সম্মানিত রাসূল যার কাছে তোমাদের কণ্ঠে পড়া বড়ই কষ্টদায়ক; তিনি তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুমিনদের জন্যে পূর্ণ দয়ার্দ আর বড়ই দয়ালু (আল কুরআন: সূরা তওবা, ১২৮),” ৪:১৭২০ #৪৪০২; এবং আল-তিরমিযী, আল-জামেউস্ সহীহ: কিতাব আল-তাফসীর আল-কুর‘আন, ‘আল কুরআন: সূরাহ তওবা হতে’ শীর্ষক অধ্যায়, ৫:২৮৩ #৩১০৩; বর্ণনাকারী - হযরত যায়দ বিন সা‘বিত রাঃ আনহু।

সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন এবং মদীনাবাসীদেরকে তারাবীহ'র নামায প্রসিদ্ধ হাফিজের কুরআন হযরত উবাইদ ইবনে কা'আব (রাঃরাঃরাঃ আনহুঃ) এর ইমামতিতে পড়তে আদেশ দেন। সাহাবা কেরাম (রাঃরাঃরাঃ আনহুমঃ)-কে জামা'আতে নামাযটি আদায় করতে দেখে হযরতে উমরে ফারুক (রাঃরাঃরাঃ আনহুঃ) বিস্ময়ে বলেন:

نَعْمُ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ.

অর্থ: কতোই না সুন্দর এই নতুন প্রচলন (বিদ'আত)! তোমরা রাতের যে অংশে ঘুমিয়ে থাকো, তা রাতের ওই অংশের চেয়ে উত্তম যে অংশে তোমরা সালাত আদায় করো।^{৬৮২}

খলীফা হযরতে উমরে ফারুক (রাঃরাঃরাঃ আনহুঃ) এর এই বক্তব্যকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিখ্যাত তাবেঈ হযরতে আবদুর রহমান বিন আবদিল ক্বারী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বিবৃত করেন:

يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

অর্থ: তিনি (খলীফা) উদ্দেশ্য করেছেন রাতের পরের অংশকে, যেহেতু মানুষেরা (তারাবীহ) নামায রাতের প্রথমার্শে আদায় করতেন। [লেখক শায়খ তাহিরুল কাদেরীর নোট: একটি প্রশ্ন মনে জাগতে পারে যে যদি এবাদতের ক্ষেত্রে রাতের পরের অংশ বেশি ফযীলতপূর্ণ হয়, তবে খলীফা উমর (রাঃরাঃরাঃ আনহুঃ) এই নামায রাতের প্রথমার্শে চালু করেছিলেন কেন? হাফিজ ইবনে হাজর আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিজরী) নিজ 'ফাতহুল বারী' ৪:২৫৩ গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা দেন এই বলে - هَذَا تَصْرِيحٌ مِنْهُ - بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ أَوَّلِهِ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ فَرَادَى أَفْضَلُ مِنَ النَّجْمِيعِ - অর্থাৎ, “তাঁর (খলীফার) থেকে এটা একটা স্পষ্ট বক্তব্য যে রাতের পরের অংশের নামায প্রথমার্শের

৬৮২. আল-বুখারী, আল-সহীহ: কিতাবু সালা'ত আত-তারাবীহ, 'রমজান মাসে রাতের নামায যে ব্যক্তি পড়ে' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৭০৭ #১৯০৬; আল-মালিক, 'মুওয়াত্তা', ১:১১৪ #২৫০; এবং আল-বায়হাক্বী, 'আল-সুনানুল কুবরা', ২:৪৯৩ #৪৩৭৯।

তুলনায় উৎকৃষ্টতর। কিন্তু এ ভাষ্যে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে একাকী আদায়কৃত তারাবীহ নামায জামা'আতে আদায়কৃত নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর।” অতএব, এটা পরিস্ফুট যে তারাবীহ নামায যদিও নিশ্চিতভাবে রাতের পরের অংশে (একাকী) আদায় করা প্রশংসনীয় (মুস্তাহাব) কাজ (যখন অন্যান্যরা নিদ্রাগত), তবুও তা জামা'আতে আদায়ের ক্ষেত্রে ফযীলত অনেক বেশি।

১০.৭.৩ শুক্রবারের জুমু'আর নামাযের আগে দ্বিতীয় আযান

জুমু'আর নামাযে খুতবার আগে দ্বিতীয় আযানের প্রচলন করা হয় খলীফা হযরতে উসমান বিন আফফান (রাঃরাঃরাঃ আনহুঃ) এর খেলাফত আমলে। ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিজরী) লেখেন:

أَنَّ الثَّانِيْنَ الثَّانِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ.

-জুমু'আর (শুক্রবারের) দ্বিতীয় আযানটি মসজিদে নামাযীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় খলীফা উসমান যিনুরাইন (রাঃরাঃরাঃ আনহুঃ) এর আদেশক্রমে প্রচলন করা হয়।^{৬৮৩}

একইভাবে, কুরআন সংকলনের সময়ে প্রাথমিক যুগের পূর্বসূরী সালাফ আস্ সালাহীন বা পুণ্যাত্মাবৃন্দ (রাঃরাঃরাঃ আনহুমঃ) যেমনটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটার কোনো পূর্ব-নজির স্থাপন করেননি, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের যুগেও এমন কিছু লোক আছেন যাঁরা মীলাদ ও অনুরূপ নেক আমল তথা পুণ্যময় অনুশীলনী সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেন এই প্রশ্ন নিয়ে যে পূর্ববর্তী পুণ্যাত্মাবৃন্দ এই আমলগুলো পালন করেননি কেন। আর মহান সাহাবা কেরাম (রাঃরাঃরাঃ আনহুমঃ আজমাঈন) মণ্ডলীর অন্তরগুলো যেমনটি উন্মুক্ত হয়েছিলো এবং ফলশ্রুতিতে তাঁরা এসব নতুন বিষয়কে গ্রহণ/বরণ করে নিয়েছিলেন, ঠিক

৬৮৩. আল-বুখারী, 'সহীহ': কিতাবুল জুমু'আ, 'আযান ঘোষণার সময় মিম্বরে উপবেশন' শীর্ষক অধ্যায়, ১:৩১০ #৮৭৩।

তেমনিভাবে আমরাও মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর উদযাপনকে একটি নেক আমল ও খোদায়ী/ঐশী আশীর্বাদের অসীলা/কারণ হিসেবে গ্রহণ করেছি (বর্তমানে)।

১০.৮ বিদ'আতের ধারণা এবং কতিপয় সাম্প্রতিককালের উদাহরণ

এতদসংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নে সমসাময়িক কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো:

১০.৮.১ ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন (বা প্রতিষ্ঠা)

ইসলামী শরীয়তে মুসলিমবৃন্দের শাসনের পক্ষে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তবে তা কীভাবে সুসম্পন্ন হবে, কোন্ পদ্ধতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ কী হবে, আর ক্ষমতার বিভাগ কেমনে হবে, সেসব বিষয়ে শরীয়তের কোনো প্রকাশ্য নির্দেশনা নেই। প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র নিজস্ব বিবেচনা অনুসারে আপন আপন অনুভূত প্রয়োজনীয়তা পূরণের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছেন।

১০.৮.২ মসজিদ নির্মাণ

দ্বীন-ইসলামের প্রাথমিক দিনগুলোতে মজবুত কাঠামোর ইমারত নির্মাণকে সমর্থন করা হতো না; তাই শরীয়তের মর্মানুসারে এভাবে মসজিদ নির্মাণ না-জায়েয বিবেচনা করা হতো। অতঃপর এক সময় আসে যখন ইসলামী খেলাফত পৃথিবীর পূর্ব হতে পশ্চিমে বিস্তৃতি লাভ করে। ফলস্বরূপ মুসলমানদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবন পদ্ধতি একই সাথে বিবর্তিত হতে থাকে। প্রত্যেকে নিজের জন্যে চমৎকার ও মনোরম ভবনসমূহ নির্মাণ আরম্ভ করেন। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোতে অসাধারণ প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করা হয়েছিলো। অতঃপর ধর্মীয় আলেম-উলামা এই নতুন ধারার সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে অলঙ্কৃত মসজিদ নির্মাণকে কেবল জায়েয (অনুমতিপ্রাপ্ত)-ই ফতোয়া দেননি, বরং ইসলামের গৌরব বজায় রাখার জন্যে এটাকে অত্যাৱশ্যকও বিবেচনা করেন।

মসজিদ নির্মাণের পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন এসে থাকলে এটার ফায়দা আজ সহজে অনুধাবন করা যায়। প্রাথমিক যুগে বসতবাড়ি অত্যন্ত সাধারণ নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা তৈরি করা হতো; অতএব তাঁরা যখন মসজিদ নির্মাণ করতেন তখন নিজেদের ঘরবাড়ি যা দ্বারা নির্মাণ করতেন, মানুষের কাছে সেগুলোর আকর্ষণ ধরে রাখার জন্যে ঠিক ওই একই নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করতেন। এটা কোনো লজ্জার বিষয় ছিলো না। কিন্তু মানুষেরা যখন মজবুত নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা নিজেদের ভবনগুলো তৈরি আরম্ভ করেন, তখন অনুরূপ সামগ্রী দ্বারা মসজিদেরও নির্মাণ হওয়া উচিত বলে যুক্তিটির ধার অনুভূত হতে থাকে, যাতে সেগুলোর আকর্ষণ মানুষের কাছে বহাল থাকে। ফলে এটা জায়েয হবার পক্ষে ফতোয়া জারি করা হয়।

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, কেউ দ্বীন-ইসলামকে আক্ষরিক অর্থে বুঝতে চেষ্টা করলে তা হবে বিচ্যুতি (ইল্লা' মা'শা'আল্লাহ)। কিন্তু আমরা যদি ইসলামের প্রকৃত ভাবের প্রতি গভীরভাবে ধ্যান করি, তাহলেই এবং একমাত্র তখনই ধর্মের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করা যাবে।

১০.৮.৩ কুরআন মজীদেদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যাকরণ

সর্বসাধারণে কুরআন মজীদ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় এই পবিত্র ধর্মশাস্ত্রলিপিকে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা/তাফসীর করা প্রয়োজনীয় ছিলো। তবু যাহেরী তথা আক্ষরিক অর্থ গ্রহণকারী লোকেরা, ধর্ম সম্পর্কে যাদের জ্ঞান অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং যারা নিজেদের অতি-রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে একগুঁয়ে ভাবাপন্ন, তারা এই নতুন উদ্যোগকে এমন কী অবৈধ/হারাম বলেও সমালোচনা করে। অতঃপর শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহেলভী (১৭০৩-১৭৬২ হিজরী) যখন আল-কুরআনকে প্রথমবারের মতো পারসিক ভাষায় অনুবাদ করেন, তখন তাঁর সময়কার মওলভীবর্গ কুফর/অবিশ্বাস ও বিদ'আতের ফতোয়া জারি করে সেটার বিরোধিতা করে। তাদের দৃষ্টিতে আরবী লিপি থেকে ফার্সীতে ভাষান্তর ছিলো শ্রেফ বিদ'আত ও কুফর। তবে সময়ই এ সাক্ষ্য বহন করেছে যে এ নতুন কাজটি জনস্বার্থে করা হয়েছিলো। ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে এটা আপন যুগের চাহিদা পূরণ করেছিলো; কিন্তু ওই সব মওলভী এর ফায়দা বা উপকারিতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলো।

১০.৯ উলামাদের মতানুযায়ী বিদ'আতের শ্রেণিবিন্যাস

ইসলামী ঐতিহ্যের বৈচিত্র্যকে স্মরণে রেখে ইমামমণ্ডলী ও মুহাদ্দিসীন-উলামাবন্দ বিদ'আত তথা নতুন প্রচলনকে ইতিহাসের আলোকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। নিম্নে এর বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো:

১০.৯.১ ইমাম আল-শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিজরী)

শাফেঈ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস আশ্ শাফেঈ (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বিদ'আতকে নিম্ন পদ্ধতিতে শ্রেণিকরণ করেন:

الْمُحَدَّثَاتُ مِنَ الْأُمُورِ ضَرْبَانِ: مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا فَهَذِهِ الْبِدْعَةُ ضَلَالَةٌ، وَمَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لَا خِلَافَ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذَا، فَهَذِهِ مُحَدَّثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ، قَدْ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ: نِعَمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ .

—নতুন প্রচলিত বিষয়াদি দুই কিসিমের: প্রথমটি হলো যা কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবা কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)'এর বাণী/বর্ণনা কিংবা উম্মতের ঐকমত্যের পরিপন্থী; এটা বিদ'আতুদ দলালাত তথা পথভ্রষ্ট নতুন প্রচলন। অপর নতুন প্রচলিত বিষয় হলো খায়র তথা উত্তম কোনো কিছুর ওপর ভিত্তিশীল, যা (শরীয়তের উপরোক্ত উৎসগুলোর) খেলাফ নয়। এটা বিদ'আতে গায়রে মাযমুমাহ তথা দূষণীয় নয় এমন নতুন প্রচলন। খলীফা হযরতে উমরে ফারুক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রমজান মাসের তারাবীহ নামায জামা'আতে আদায় হতে দেখে বলেছিলেন, “এটা কতোই না মঙ্গলময় নতুন প্রচলন!”^{৬৮৪}

৬৮৪. আল-যাহাবী, ‘সিয়্যারু আলম আল-নুবালা’, ১০:৭০; আল-সৈয়ুতী, ‘আল-হা'উয়ী লিল্ ফাতাওয়া’, ২০২ পৃষ্ঠা; এবং আল-সৈয়ুতী, ‘হুসনুল মাকুসিদ ফী 'আমালিল্ মওলিদ', ৫২-৫৩ পৃষ্ঠা।

১০.৯.২ ইযয আল-দ্বীন বিন আবদিস্ সালাম (৫৭৭-৬৬০ হিজরী)

ইমাম ইযয আল-দ্বীন বিন আবদিস্ সালাম (রহমতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর ‘ক্বাওয়াঈদুল আহকাম ফী মাসা'লিহিল আনাম’ শিরোনামের পুস্তকে লেখেন:

الْبِدْعَةُ فِعْلٌ مَا لَمْ يَعْهَدْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَنْقَسِمُ إِلَى خَمْسَةِ أَحْكَامٍ يَغْنِي الْوُجُوبَ وَالنَّدْبَ... الخ. وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنْ تُعْرَضَ الْبِدْعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ فَأَيُّ حُكْمٍ دَخَلَتْ فِيهِ فَهِيَ مِنْهُ، فَمِنْ الْبِدْعِ الْوَاجِبَةُ تَعَلُّمُ النُّحُو الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ، وَمِنْ الْبِدْعِ الْمُحَرَّمَةُ مَذْهَبُ نَحْوِ الْقَدَرِيَّةِ، وَمِنْ الْبِدْعِ الْمَنْدُوبَةِ إِحْدَاثُ نَحْوِ الْمَدَارِسِ وَالْاجْتِمَاعِ لِصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ، وَمِنْ الْبِدْعِ الْمُبَاحَةِ الْمُصَافَحَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَمِنْ الْبِدْعِ الْمَكْرُوهَةِ زُخْرَفَةُ الْمَسَاجِدِ وَالْمَصَاحِفِ أَيْ بَغْيِ الدَّهَبِ .

অর্থ: বিদ'আত তথা নতুন প্রচলন এমন একটি রীতি যা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর যুগে অস্তিত্বশীল ছিলো না। এটা পাঁচ কিসিমের (শরঈ) হুকুমে বিভক্ত, যথা- ওয়া'জিব/অত্যাবশ্যক, মানদূব/প্রশংসনীয়... ইত্যাদি। এ সম্পর্কে জানার পন্থা হলো নতুন প্রচলনটিকে শরীয়তের নীতিমালার আলোকে তুলনা করা হলে অতঃপর যে শ্রেণির অওতায় সেটা পড়বে, তা-ই হবে ওর হুকুম। অতএব, আল-বিদ'আতুল ওয়া'জিব তথা অত্যাবশ্যক নতুন প্রচলন দ্বারা ‘নাহ’ বা শব্দ-বিন্যাস শিক্ষা করা যায়, যা কুরআন ও সুন্নাহকে বোঝার একটি মাধ্যম। আল-বিদ'আতুল মুহারামা তথা নিষিদ্ধ বিদ'আত হলো দলবিভক্তি, যেমন ক্বাদরীয়া নামের (দ্রাস্ত) গোষ্ঠী। আল-বিদ'আতুল মানদূবা তথা প্রশংসনীয় নতুন প্রচলনগুলোর মধ্যে রয়েছে মাদ্রাসা ও তারাবীহ'র নামায জামা'আতে আদায়। আল-বিদ'আতুল মুবা'হা তথা বৈধ (বিবেচিত) নতুন প্রচলনের মধ্যে রয়েছে নামাযের পরে করমর্দন। আর আল-বিদ'আতুল মাকরুহা

তথা দূষণীয় নতুন প্রচলন হলো মসজিদসমূহের ও কুরআনের কপিগুলোর অলঙ্করণ (স্বর্ণ ভিন্ন অন্য কিছু দ্বারা)।^{৬৮৫}

১০.৯.৩ মোল্লা আলী ক্বারী আল-হানাফী (ইন্তেকাল: ১০১৪ হিজরী)

মোল্লা আলী ক্বারী আল-হানাফী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ‘মিশকাতুল মাসা’বীহ’ গ্রন্থের ওপরে লেখা তাঁর শরহ/ব্যখ্যামূলক ‘মিরক্বা’তুল মাফা’তীহ’ পুস্তকে বিবৃত করেন:

قَالَ الشَّيْخُ عَزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْقَوَاعِدِ: أَمَّا وَاجِبَةٌ كَتَعْلَمُ التَّحْوِيلَهُمْ كَلَامَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكَتَدْوِينَ أَصُولِ الْفَقْهِ وَالْكَلامِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ. وَأَمَّا مُحَرَّمَةٌ كَمَذْهَبِ الْجَرِّيَّةِ وَالْقَدْرِيَّةِ وَالْمُرْجِيَّةِ وَالْمُجَسِّمَةِ. وَالرَّدُّ عَلَى هَؤُلَاءِ مِنَ الْبِدْعِ الْوَاجِبَةِ لِأَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ مِنْ هَذِهِ الْبِدْعِ فَرَضٌ كِفَايَةٌ. وَأَمَّا مَنْدُوبَةٌ كِإِحْدَاثِ الرِّبْطِ وَالْمَدَارِسِ وَكُلِّ إِحْسَانٍ لَمْ يَعْهَدْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَكَالتَّرَاوِجِ أَيْ بِالْجَمَاعَةِ الْعَامَّةِ وَالْكَلامِ فِي دَقَائِقِ الصُّوفِيَّةِ. وَأَمَّا مَكْرُوهَةٌ كَزُخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ وَتَزْوِينِ الْمَصَاحِفِ يَعْني عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ فَمُبَاحٌ. وَأَمَّا مُبَاحَةٌ كَالْمُصَافَحَةِ عَقِيبَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ أَيْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا وَإِلَّا عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ مَكْرُوحٌ، وَالتَّوَسُّعُ فِي لَذَائِذِ الْمَأْكَلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَسَاكِينِ وَتَوْسِيعُ الْأَكْمَامِ .

—শায়খ ইযয-উদ্দীন ইবনে আবদিস্ সালাম (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) নিজের রচিত ‘আল-ক্বাওয়াঈদ’ গ্রন্থের শেষে বলেন: “বিদ’আত বা নতুন প্রচলন হতে পারে ওয়া’জিব তথা অত্যাবশ্যক, যেমন - নাহ (শব্দ বিন্যাস) শিক্ষা করা, যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর বাণী বোঝা যায়; ফিক্বাহ-শাস্ত্রের নীতিমালা সংকলন করা;

৬৮৫. ইমাম ইবনে হাজার আল-হায়সামী মক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), ‘আল-ফাতাওয়া’ আল-হাদীসিয়া’, ২০৩ পৃষ্ঠা।

আর হাদীস শাস্ত্রের বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা আলোচনা করা। নিষিদ্ধ বিদ’আত হলো ভ্রান্ত মাযহাব/দল সৃষ্টি করা, যেমন - জাবারীয়া, ক্বাদারীয়া, মুরজিয়া ও মুজাসসামা। এসব দলকে রদ করা ওয়া’জিব-সূচক নতুন প্রচলন, কেননা শরীয়তকে এসব বিদ’আত থেকে সুরক্ষিত রাখা ফরযে কিফায়া তথা (আলেমদের জন্যে) বাধ্যতামূলক। মানদূব তথা প্রশংসনীয় বিদ’আত হলো খানকা ও বিদ্যালয় নির্মাণ, (ইসলামী) প্রথম শতাব্দীতে অনুশীলিত হয়নি এমন সমস্ত উত্তম বা পুণ্যদায়ক কর্ম, জামা’আতে তারাবীহ’র নামায আদায়, সূফী মতাদর্শের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করা। মকরুহ তথা দূষণীয় নতুন প্রচলন হলো মসজিদ ও কুরআনের কপিগুলোকে অলঙ্করণ, যা শাফেঈ মাযহাবের সিদ্ধান্ত, তবে হানাফী মাযহাবে এগুলো মুবা’হ তথা বৈধ/অনুমতিপ্রাপ্ত। আর মুবা’হ-সূচক নতুন প্রচলন হলো ফজর ও আসরের নামাযের পরে মোসা’ফাহাহ তথা করমর্দন করা, যা শাফেঈ মাযহাবের মতানুসারে বৈধ, কিন্তু হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিতে মকরুহ/অপছন্দনীয়; (এছাড়াও মুবা’হ হচ্ছে) নানান সুস্বাদু খাবার ও পানীয় গ্রহণ; প্রশস্ত বাড়িঘরে বসবাস ও লম্বা হাতাবিশিষ্ট জামা পরিধান।^{৬৮৬}

১০.৯.৩.১ ‘প্রত্যেক বিদ’আত-ই ভ্রান্তি’ - হাদীসটির সঠিক মর্ম উপলব্ধি

মোল্লা আলী ক্বারী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) ‘কুল্লু বিদ’আতিন দ্বলালা’ত’ তথা ‘সকল বিদ’আত/নতুন প্রচলনই গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা’ মর্মে হাদীসের সঠিক উপলব্ধির আলোকে আরো লেখেন:

أَيُّ كُلِّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ضَلَالَةٌ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا)) وَجَمَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ الْقُرْآنَ وَكَتَبَهُ زَيْدٌ فِي الْمُصْحَفِ وَجَدَّدَ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

৬৮৬. মোল্লা আলী ক্বারী, ‘মিরক্বা’ত আল-মাফা’তীহ শারহ মিশকা’ত আল-মাসা’বীহ’, ১:২১৬।

—প্রতিটি ‘দূষণীয়’ বিদ’আত-ই ভ্রান্তি বা পথভ্রষ্টতা, কেননা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমান: “কেউ দ্বীন-ইসলামে কোনো সুন্দর/উত্তম রীতির প্রচলন করলে সে সওয়াবের হক্কার হবে এবং তার পরে যারা ওই আমল বা রীতির অনুশীলন করবে, তাদের সওয়াবেরও ভাগীদার হবে সে।” সর্ব-হযরত আবু বকর ও উমর (রাঃদিয়াল্লাহু আনহুমা) কুরআন মজীদ সংকলন করেন এবং য়াদ (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) তার প্রতিলিপিসমূহ লেখেন; এই প্রচেষ্টা খলীফা উসমান (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) এর শাসনামলে পুনরায় চালু হয়।^{৬৮৭}

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বিদ’আতের বিভিন্ন শ্রেণিকরণ সম্পন্ন করার পরে বিবৃত করেন:

وَفِي الْحَدِيثِ: (كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ). وَهُوَ مُحْمُولٌ عَلَى الْمُحَرَّمَةِ لَا غَيْرَ.

—“প্রতিটি বিদ’আত গোমরাহী, আর প্রতিটি পথভ্রষ্টতা-ই জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে” মর্মে হাদীসটির উদ্দেশ্য (শ্রেফ) নিষিদ্ধ বিষয়াদি, অন্য কিছু নয়।^{৬৮৮}

বিদ’আতের এই শ্রেণিকরণ থেকে বোঝা যায়, শরীয়তে প্রশংসনীয় বিষয়াদির অন্তর্গত যে-কোনো নতুন প্রচলন উত্তম (প্রবর্তিত) রীতি; পক্ষান্তরে, দূষণীয় (মানে শরীয়তের পরিপন্থী) বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রচলনগুলো মন্দ বিদ’আত। আর এই দুটো শ্রেণির আওতাভুক্ত নয় এমন বিষয়াদি মোবাহ-সূচক নতুন প্রচলন।

৬৮৭. মোল্লা আলী ক্বারী, ‘মিরক্বাত আল-মাফা’তীহ শারহ মিশকাত আল-মাসা’বীহ’, ১:২১৬; এবং শাকীর আহমদ উসমানী, ‘ফাতহুল মুলহিম বি-শরহে সহীহে মুসলিম’, ২:৪০৬।

৬৮৮. ইমাম ইবনে হাজার হায়সামী মক্কী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), ‘আল-ফাতাওয়াউল হাদীসিয়া’, ২০৩ পৃষ্ঠা।

১০.১০ বিদ’আতের শ্রেণিবিভাগ

বিদ’আত সম্পর্কে ওপরের আলোচনার আলোকে ইমামমুন্সলী ও মুহাদ্দিসীন উলামাবৃন্দের দ্বারা আমাদেরকে প্রদত্ত বিদ’আতের শ্রেণিবিভাগ নিচে দেয়া হলো।

মৌলিক পর্যায়ে বিদ’আত দুই প্রকার:

১. আল-বিদ’আতুল হাসানা (প্রশংসনীয় নতুন প্রচলন)
২. আল-বিদ’আতুল সাইয়্যে’আ (নিন্দনীয়/মন্দ নতুন প্রচলন)

এগুলো আবার নিম্নের উপশ্রেণিতে বিভক্ত:

১০.১০.১ বিদ’আতে হাসানা (প্রশংসনীয় নতুন প্রচলন)-এর উপশ্রেণিসমূহ

প্রশংসনীয় নতুন প্রচলন তিনটি উপশ্রেণিতে বিভক্ত:

১. আল-বিদ’আতুল ওয়া’জিবা (আবশ্যিক নতুন প্রচলন)
২. আল-বিদ’আতুল মুসতাহাব্বা/আল-বিদ’আতুল মুসতাহসানা (প্রশংসনীয় নতুন প্রচলন)
৩. আল-বিদ’আতুল মুবা’হা (বৈধ নতুন প্রচলন)

১০.১০.১.১ আল-বিদ’আতুল ওয়া’জিবা বা আবশ্যিক নতুন প্রচলন

এটা এমন এক বিষয় যা হয়তো বাহ্যতঃ নতুন প্রচলন বলে দৃশ্যমান হতে পারে, কিন্তু এর অস্তিত্ব প্রয়োজনীয়, ঠিক যেমনটি দ্বীনের ওয়া’জিব/আবশ্যিক বিষয়গুলো জরুরি; এটা ছেড়ে দেয়া হলে ধর্মে একটা বাধা এসে দাঁড়াবে। আল-বিদ’আতুল ওয়া’জিবা তথা আবশ্যিক নতুন প্রচলনের উদাহরণসমূহ নিচে প্রদান করা হলো: কুরআনের আয়াতে জের, জবর, পেশ ইত্যাদি চিহ্ন স্থাপন, ধর্মকে বোঝার জন্যে আরবী শব্দবিন্যাস ও রূপ শেখা ও পাঠদান, কুরআনের তাফসীর ও হাদীসের শরাহ (ব্যাখ্যা/বিশ্লেষণ) ও ফিক্বাহ/ধর্মীয় বিধানশাস্ত্রের জন্যে উসূল তথা নীতিমালা প্রণয়ন, অন্যান্য বিদ্যাশাস্ত্রের পাঠদান, ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের লক্ষ্যে

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ইসলামী বিদ্যার জন্যে পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং এসব বিদ্যা শাখার নামকরণ।

১০.১০.১.২ আল-বিদ'আত আল-মুস্তাহাব্বা/মুস্তাহসানা তথা প্রশংসনীয় নতুন প্রচলন

এটা হয়তো এর উৎস ও বাহ্যিক আবরণে নতুন হতে পারে, কিন্তু শরীয়ত এটাকে অবৈধ/না-জায়েয ঘোষণা করেনি; এটা ওয়া'জিব বা আবশ্যিক নয়, তবে মুসলমান সমাজ সাধারণতঃ এটাকে প্রশংসনীয় বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন, যা অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁরা সওয়াব অর্জন করে থাকেন; কেউ এটা অনুশীলন না করলে গুনাহগার হবেন না, তবে এর অনুশীলনকারী সওয়াব অর্জন করবেন। এই নতুন প্রচলনের উপশ্রেণির উদাহরণ হলো: মুসাফির তথা ভ্রমণকারীদের জন্যে লজিং ঘর/পাছশালা নির্মাণ; শিক্ষাকেন্দ্র ভবন নির্মাণ; ইতিপূর্বে অনন্তিত্বশীল উত্তম রীতি/প্রথাসমূহ চালুকরণ; জামা'আতে তারা'বীহ নামায আদায়; তাসাউফ/সূফীতত্ত্ব ও তরীক্বতের সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠান; এবং মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), উরস ও অনুরূপ অন্যান্য অনুষ্ঠান করা যা'তে মানুষেরা সওয়াবের উদ্দেশ্যে তাতে সমবেত হতে পারেন- স্রেফ শর্ত থাকবে এই যে, তাতে কোনো গুনাহ সংঘটন করা হবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন:

فَمَا رَأَاهُ الْمُؤْمِنُ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَاهُ الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ.

—ঈমানদার ব্যক্তি যে বিষয়/বস্তুকে উত্তম বিবেচনা করেন, তা আল্লাহর দৃষ্টিতেও উত্তম; আর ঈমানদারবৃন্দ যে বিষয়/বস্তুকে মন্দ বিবেচনা করেন, তা আল্লাহর দৃষ্টিতেও মন্দ।^{৬৮৯}

৬৮৯. আল-বায়হার কৃত 'আল-বাহরুয্ যুখা'র' (আল-মুসনাদ), ৫:২১২-২১৩ #১৮১৬; আল-তায়ালিসী প্রণীত 'আল-মুসনাদ', ১:৩৩ #২৪৬; ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রচিত 'মুসনাদ', ১:৩৭৯ #৩৬০০; আল-হাকিম লিখিত 'আল-মুসনাদ', ৩:৮৩ #৪৪৬৫; আল-হায়সামী নিজ 'মোজমাউয্ যাওয়াঈদ ওয়া মামবা'আ-উল-ফাওয়াঈদ', ১:১৭৭-

এই সংজ্ঞার আলোকে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলো একটি প্রশংসনীয় নতুন প্রচলন, যা ঈমানদার মুসলমানবৃন্দ সওয়াবের উদ্দেশ্যে পালন করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) এর ভাষ্যানুযায়ী, এটা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক গৃহীত (মকবুল), কেননা আল-সওয়া'দুল আ'যম তথা ঈমানদারবৃন্দের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এটাকে উদযাপন করেন।

১০.১০.১.৩ আল-বিদ'আত আল-মুবাহা তথা অবস্থাতে বৈধ বলে বিবেচিত নতুন প্রথা

শরীয়তে নিষিদ্ধ নয় ও মুসলমান সমাজ কর্তৃক বৈধ হিসেবে বিবেচিত এবং সওয়াব পাবার আশায় নয় এমন অনুশীলিত নতুন যে-কোনো রীতি বা প্রথা আল-বিদ'আতুল মুবা'হা বলে সাব্যস্ত। এর কিছু নমুনা হলো ফজর ও আসরের ওয়াজিয়া নামাযের পরে করমর্দন এবং সুস্বাদু খাবার ও পানীয় গ্রহণ।

১০.১০.২ দৃষণীয় বা মন্দ নতুন প্রথার উপ-শ্রেণিসমূহ

আল-বিদ'আতুল সাইয়ে'আ তথা দৃষণীয়/মন্দ নতুন প্রচলন দুটি উপ-শ্রেণিতে বিভক্ত:

১. আল-বিদ'আতুল মুহার্রামা তথা নিষিদ্ধ নতুন প্রচলন
২. আল-বিদ'আতুল মাকরুহা তথা অপছন্দনীয় নতুন প্রচলন।

১৭৮ গ্রন্থে লেখেন যে ইমাম আহমদ (রাঃহামাতুল্লাহি আলাইহি) আল-বায়হার (রাঃহামাতুল্লাহি আলাইহি) ও আল-তাবরা'নী (রাঃহামাতুল্লাহি আলাইহি) এটা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের ইসনাদে বর্ণনা করেছেন (ওয়া রিজা'লুহু মুওয়াসসিকুন); আর আল-আজলুনী নিজ 'কাশফুল খাফা' ওয়া মাযীল আল-আলবা'স' ২:২৪৫ #২২১৪ পৃষ্ঠকে বিবৃত করেন যে এটা একটা উত্তম বিবরণ (মওকুফ হাসান)।

১০.১০.২.১ আল-বিদ'আতুল মুহাররামা তথা নিষিদ্ধ নতুন প্রচলন

নিষিদ্ধ নতুন প্রচলন (আল-বিদ'আতুল মুহাররামা) এমন একটি নতুন বিষয় যা ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক, অথবা বিবাদ-বিভক্তির কারণ; যথা - ক্বাদারীয়া, জাবারীয়া, মুরজি'আ ও আহমদীয়া দলগুলোর মতো দলের প্রবর্তন। এসব ভ্রান্ত দলের খণ্ডন হচ্ছে আল-বিদ'আতুল ওয়া'জিবা তথা অত্যাব্যশ্যক নতুন প্রচলন।

১০.১০.২.২ আল-বিদ'আতুল মাকরুহা তথা অপছন্দনীয় নতুন প্রচলন

এটা দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে সেসব নতুন প্রচলনের প্রতি, যা সুন্নাতে মু'য়াক্কাদা (বাধ্যতামূলক সুন্নাতে) ও সুন্নাতে গায়রে মু'য়াক্কাদা (বাধ্যতামূলক সুন্নাতের আওতাভির্ভূত রীতি)'কে রহিত করে। পূর্ববর্তী পুণ্যাব্দ জরুরাত-বিহীন (মানে অপ্রয়োজনীয়) মসজিদের অলঙ্করণকে আল-বিদ'আতুল মাকরুহা তথা অপছন্দনীয় নতুন প্রচলনের উপ-শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করতেন।

১০.১০.৩ হাদীসের আলোকে বিদ'আত শ্রেণিকরণের প্রামাণ্য দলিল

ওপরে প্রদত্ত বিদ'আতের সংজ্ঞা ও এর শ্রেণিকরণকে প্রমাণের ক্ষেত্রে হযরত জারীর বিন আদিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমান:

[مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ].

অর্থ: কেউ দ্বীন-ইসলামে কোনো সুন্দর/উত্তম রীতি প্রচলন করলে সে এর সওয়াব পাবে এবং তাদেরও সওয়াব সে পাবে, যারা তার পরে এর অনুশীলন করবে; আর এতে তাদের সওয়াবের অংশ কমবে না। পক্ষান্তরে, কেউ ধর্মে কোনো মন্দ রীতি প্রচলন করলে সে এর গুনাহের

ভাগীদার হবে এবং তাদেরও গুনাহের অংশীদার সে হবে, যারা তার পরে এর অনুশীলন করবে; আর এতে তাদের গুনাহের অংশ কমবে না।^{৬৯০}

(ওপরের) এই হাদীসটিতে ব্যবহৃত 'সান্না' (سَنَّ) শব্দটি ভাষাগতভাবে বলতে গেলে 'আবদা'আ' শব্দটির প্রতিশব্দ বা সমার্থবোধক শব্দ, যার অর্থ 'কোনো কিছু (নতুন) প্রচলন করা।' এ থেকেই আল-বিদ'আতুল হাসানা তথা প্রশংসনীয় নতুন প্রচলনের ধারণাটির উদ্ভব হয়েছে; পক্ষান্তরে, 'কেউ ধর্মে কোনো মন্দ রীতি প্রচলন করলে' মর্মে বাক্যটি আল-বিদ'আতুল সাইয়্যে'আ তথা মন্দ/দূষণীয় প্রচলনের প্রতি ইঙ্গিত করে। এখন যদি কেউ আপত্তি উত্থাপন করেন এ মর্মে যে 'সুন্না' শব্দটি কেবল সুন্নাহকেই উদ্দেশ্য করেছে এবং বিদ'আতকে নয়, তাহলে (প্রশ্ন দাঁড়ায়) এটাকে 'হাসানা' বা 'উত্তম/সুন্দর' গুণবাচক শব্দ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্য কী? এমন কোনো সুন্নাহ কি থাকতে পারে যা উত্তম নয়? আল্লাহ মাফ করুন! অধিকন্তু, এই আপত্তির কিছু ভিত্তি হয়তো থাকতো, যদি 'মান সান্না' (কেউ রীতি প্রচলন করার) ক্রিয়াপদটির স্থলে 'মান আমিলা' (কেউ অনুশীলন করার) ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করা হতো। কেননা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর উম্মতের মধ্যে কারো পক্ষে নতুন কোনো সুন্নাহ প্রচলন করা আদৌ কি সম্ভব? তাঁর কর্তব্য শ্রেফ (আদেশ) শ্রবণ ও পালন নয় কি? অতএব, এটা এখানে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে 'সান্না' শব্দটি এর জনসাধারণে প্রচলিত 'সুন্নাহ' অর্থে প্রয়োগ করা হয়নি, বরং এখানে এর আক্ষরিক অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে যার মানে 'কোনো নতুন রীতি/প্রথার প্রচলন।'।

৬৯০. মুসলিম, আল-সহীহ: কিতাবুয্ যাকাত, 'সাদাক্বার তাকিদ, যদিও তা হয় অর্ধেক খেজুর, বা দয়াপূর্ণ কথা, কেননা তা জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষার বর্ম' শীর্ষক অধ্যায়, ২:৭০৪-৭০৫ #১০১৭; মুসলিম, আল-সহীহ: কিতাবুল ইলম, যে ব্যক্তি কোনো উত্তম বা মন্দ প্রথা প্রতিষ্ঠা করে এবং যে হেদায়াত বা ভ্রান্তির দিকে আহ্বান করে' শীর্ষক অধ্যায়, ৪:২০৫৯ #১০১৭; আল-নাসাঈ, আল-সুনান: কিতাবুয্ যাকাত, 'পরিশোধযোগ্য যাকাত প্রদানে উৎসাহ দান' শীর্ষক অধ্যায়, ৫:৭৬ #২৫৫৪; ইবনে মাজাহ, আল-সুনান: আল-মুকাদ্দমা, 'যে ব্যক্তি উত্তম বা মন্দ প্রথা প্রচলন করে' শীর্ষক অধ্যায়, ১:৭৪ ও ৭৫ #২০৩ ও ২০৬-২০৭; এবং আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৪:৩৫৭-৩৫৯।

বিদ'আতের উপরোল্লিখিত শ্রেণিবিভাগ মুহাদ্দিসীন ইমামমণ্ডলী ও ফকীহবৃন্দ আপন আপন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পদ্ধতি অনুসারে প্রদান করেছেন; আরো বিস্তারিত জানার জন্যে অনুগ্রহ করে আমাদের 'কিতাবুল বিদ'আত' বইটি দেখুন।

ওপরের বিস্তারিত আলোচনার সারমর্ম হলো, আমাদের উচিত নয় কোনো কাজকে পর্যবেক্ষণ করে এ চিন্তায় আটকে পড়া যে 'এটা আমাদের সবচেয়ে সম্মানিত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর যুগে ছিলো কি-না?' বরঞ্চ আমাদের বিবেচনা করতে হবে এই আমল/অনুশীলনীটি হয়তো কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বা রীতিনীতির ওপর ভিত্তিশীল, যা হয়তো যুগের চাহিদা বা প্রয়োজন সাপেক্ষ হতে পারে; অথবা হয়তো এতে কোনো জ্ঞান-প্রজ্ঞা (হিকমত) বা ফায়দা/উপকারিতা নিহিত রয়েছে যা জনগণের বৃহত্তর স্বার্থসংশ্লিষ্ট। আমাদের বিবেচনাযোগ্য বিষয় হলো, আমরা আমলটিকে পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নেবো এর ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহ'তে আছে কি না; মানে এই উৎসগুলো দ্বারা এটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত কি না? কোনো কর্ম/অনুশীলনী দৃষণীয় হবার আরেকটি কারণ হলো যদি এটা ওয়া'জিব, সুন্নাহ বা মোস্তাহাব কোনো আমলের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়। কুরআন ও সুন্নাহ হতে যদি কোনো নতুন আমলকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ/প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে তা আর নিন্দনীয়, আপত্তিকর বা ভ্রান্তিপূর্ণ হওয়ার আওতায় পড়ে না। আর তা কুরআন ও সুন্নাহ হতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠা করা না গেলেও এ দুটো উৎসের সাথে সাংঘর্ষিক যদি না হয়, তাহলে তাতেও কোনো দোষ বা মন্দ নিহিত থাকবে না। অর্থাৎ, এটাকে পথদ্রষ্টতা/গোমরাহী বা ভ্রান্তি সাপেক্ষ বলা ভুল হবে। এটা স্রেফ তখনই না-জায়েয ও মন্দ/নিন্দনীয় নতুন প্রচলন হিসেবে সাব্যস্ত হবে, যখন ওই নতুন প্রচলন কুরআন ও সুন্নাহগত শাস্ত্রলিপি বা কোনো প্রতিষ্ঠিত আজার খেলাফ হয়; কিংবা ধর্মের মৌলিক গঠনাত্মক বিধানের পরিপন্থী হয়; অথবা শরীয়তের মর্মবাণীকে নাকচ করে।

১০.১১ মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভিত্তি আল-কুরআন ও হাদীস শরীফেই নিহিত

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে বিভিন্ন কুরআনী আয়াত ও অসংখ্য হাদীস হতে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর উদযাপন ও তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বৈধতার পক্ষে বিস্তারিত মজবুত (শরঈ) দলিলাদি দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর পবিত্র বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমন উপলক্ষে খুশি উদযাপন মূলতঃ আল্লাহ তা'আলারই প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। বস্তুতঃ আমাদের প্রতি তাঁর মহা অনুগ্রহেরই কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ এটা; এক্ষেত্রে খুশি প্রকাশ ওই আশীর্বাদের ঘোষণা বা তা প্রচার করার একটি মাধ্যম, আর তাই এটাকে ঈদ উৎসব হিসেবে গ্রহণ করা একটি প্রশংসনীয় কাজ/আমল, যা অনুসরণ বা অনুকরণযোগ্য। এই উপলক্ষে খুশি প্রকাশ কেবল আল্লাহ তা'আলারই আচরিত রীতি নয়, বরং সবচেয়ে মর্যাদাবান পয়গাম্বর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর মহান সাহাবা কেলাম (রাহিয়াল্লাহু আনহুম)'বৃন্দের অনুশীলিত রীতি হিসেবেও ঘোষিত, যা তাঁদেরই বিভিন্ন বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে। অধিকন্তু, পূর্ববর্তী (আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের) উম্মতবৃন্দের স্থাপিত ঐতিহ্যবাহী নজিরও এর পক্ষে সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান, ঠিক যেমনটি আল-কুর'আনে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কেউ এর বৈধতা নিয়ে বিতর্ক করতে চাইলে, অথবা এটাকে বিরোধিতার উৎস বানাতে, কিংবা এটা না-জায়েয ও নিন্দনীয় মর্মে দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখলে, তিনি একজন জ্ঞানবিবর্জিত একগুঁয়ে ব্যক্তি হিসেবেই সাব্যস্ত হবেন।

১০.১২ উম্মতে মুহাম্মদীয়্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কোনো ভ্রান্তিতে ঐকমত্য পোষণ করবেন না

শরীয়ত বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক সংজ্ঞা ও নীতিমালা ব্যক্ত করেছে; তবে এগুলোর উপস্থাপনা ও বিস্তারিত বর্ণনা পেশের দায়িত্ব উম্মত ও মুসলমানদের গণ্যমান্য আলেম-উলামার কাঁধে ন্যস্ত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ

(রাহিয়াল্লাহু আনহু) এর ভাষ্য তুলে ধরেছিলাম। তাঁর বক্তব্য সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা সমর্থিত, যেগুলোর ইসনাদ/সনদ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে ফেরত গিয়েছে (মারফু')। এসব হাদীস অনুসারে, 'আস-সওয়া'দুল আ'যম' তথা উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ (উলামা) কখনোই পথভ্রষ্ট হবেন না। বরঞ্চ যারা ওই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হতে বিচ্যুত হবে, তারাই পথভ্রষ্ট/গোমরাহ। যুগে যুগে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীসমূহ সৃষ্টি করা হয়েছে, যাদের আকীদা-বিশ্বাস ও দুনিয়ার দর্শন/চিন্তাভাবনা ছিলো উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সাথে আমূলভাবে পৃথক। এই সংখ্যালঘু দলগুলো সংখ্যাগুরু দলটিকে কাফের/অবিশ্বাসী, মুশরিক/অংশীবাদী, অজ্ঞমূর্খ ও বিদ'আতী/নতুন প্রচলনকারী বলে দোষারোপ করেছে, অথচ বাস্তবে তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট। অতএব, এমন মতপার্থক্য ও বিভ্রান্তির সময়ে ঈমানদারবৃন্দের প্রতি বৃহত্তর ওই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত আনাস বিন মালিক (রাহিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করেছেন:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ.

—আমার উম্মত (সামষ্টিকভাবে) ভ্রান্তি/বিচ্যুতিতে একমত হবে না; অতএব, তোমরা কোনো মতপার্থক্য দেখতে পেলে 'সওয়াদুল আ'যম' তথা বৃহত্তর দলটিকে আঁকড়ে ধরা তোমাদের প্রতি বিধেয় হলো।^{৬৯১}

সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মতকে আগাম জানিয়েছিলেন ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বিভক্তি সম্পর্কে; কেবল

৬৯১. নোট-১: ইমাম জালালউদ্দীন সৈয়তী (রহ.) নিজ 'হাশীয়া-এ-সুনান-এ-ইবনে মাজাহ' গ্রন্থের ২৮৩ পৃষ্ঠায় বিবৃত করেন যে এ হাদীসে উল্লেখিত 'সওয়াদুল আ'যম' বলতে আহলে সুন্নাতকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। নোট-২: হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে মাজাহ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর 'আল-সুনান' পুস্তকে: কিতাবুল ফিতান, 'আস্ সওয়াদুল আ'যম' অধ্যায়, ২:১৩০৮ #৩৯৫০; ইবনে আবী আসিম, 'আল-সুন্নাহ', ৪১ পৃষ্ঠা #৮৪; আল-তবারানী, 'আল-মু'জামুল কবীর', ১২:৪৪৭ #১৩,৬২৩; এবং আল-দায়লামী, 'আল-ফিরদাউস বি-মা'সুর আল-খিতাব', ১:৪১১ #১৬৬২।

'সওয়াদুল আ'যম' (বৃহত্তর মুসলমান জনগোষ্ঠী) ছাড়া ফিতনাবাজ প্রতিটি দলই জাহান্নামে যাবে মর্মেও জানিয়েছিলেন তিনি। হযরত আবু উমা'মা (রাহিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমান:

تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَأُمَّتِي تَزِيدُ عَلَيْهِمْ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ.

—বনু ইসরাঈল বংশ ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছিলো; আর খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ৭২ দলে; আমার উম্মত (মানে মুসলমান জাতি) তাদের চেয়েও একটি বেশি দলে বিভক্ত হবে। সবাই জাহান্নামে যাবে কেবল 'সওয়াদুল আযম' (তথা বৃহত্তর বা সামষ্টিক দল) ব্যতিরেকে।^{৬৯২}

আস্ সওয়াদুল আ'যম তথা বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে (ঐক্যবদ্ধ) থাকার প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করে হযরত আবু যর গিফারী (রাহিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী, যিনি ফরমান:

إِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِنْ اثْنَيْنِ، وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ فَعَلَيْكُمْ بِالْجُمَاعَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا عَلَى هُدًى.

—দুই একের চেয়ে উত্তম, তিন দুইয়ের চেয়ে উত্তম, আর চার উত্তম তিনের চেয়ে। অতএব, তোমাদের প্রতি বিধেয় হলো জামা'আত (সামষ্টিক

৬৯২. আল-তাবারানী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), 'আল-মু'জামুল আওসাত', ৭:১৭৬ #৭২০২; ইবনে আবী শায়বাহ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), 'আল-মুসান্নাফ', ৭:৫৫৪ #৩৭,৮৯২; হারিস, 'আল-মুসনাদ', ২:৭১৬ #৭০৬; আল-বায়হাকী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), 'আল-সুনান আল-কুবরা', ৮:১৮৮; এবং আল-হায়সামী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি), 'মজমাউয্ যওয়াঈদ ওয়া মামবা'আ আল-ফওয়াঈদ', ৭:২৫৮।

দল)’এর অনুসরণ, কেননা আল্লাহ তা’আলা কখনোই আমার উম্মতকে একতাবদ্ধ করবেন না হেদায়াত তথা সঠিক পথের ওপর ছাড়া।^{৬৯০}

ওপরের হাদীসগুলোতে উদ্ধৃত ‘আল-জামা’আত’ শব্দটি উম্মতের সামষ্টিক সংখ্যাগরিষ্ঠকে উদ্দেশ্য করেছে। আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা যায়, হযরত আউফ বিন মালিক (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসটিতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘আল-জামা’আত’কে ‘আস্ সাওয়াদুল আ’যম’ (সংখ্যাগরিষ্ঠ দল) হিসেবেই উল্লেখ করেছিলেন:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ.

—আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে; স্রেফ একটি দল জান্নাতে প্রবেশ করবে, অবশিষ্ট ৭২ দল জাহান্নামে যাবে।

يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟

—মহৎ সাহাবাবুন্দ (রাঃদিয়াল্লাহু আনহুম) জিজ্ঞেস করেন, ‘এয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তারা কারা?’

الْجُمَاعَةُ.

—প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বলেন, ‘আল-জামা’আত’ তথা সামষ্টিক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ।^{৬৯৪}

৬৯০. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃমাতুল্লাহি আলাইহি), ‘আল-মুসনাদ’, ৫:৩৫৭-৩৫৯ #২১,৩৩১; এবং আল-হায়সামী (রাঃমাতুল্লাহি আলাইহি), ‘মজমাউয্ যওয়াঈদ ওয়া মামবা’আ আল-ফওয়াঈদ’, ১:১৭৭ ও ৫:২১৯।

৬৯৪. ইবনে মাজাহ (রাঃমাতুল্লাহি আলাইহি), ‘আল-সুনান’: কিতাবু ফিতান, ‘উম্মতের বিভক্তি’ শীর্ষক অধ্যায়, ২:১৩২২ #৩৯৯২; এবং লালকাঈ, ‘ইতিকাদু আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা’আত’, ১:১০১ #১৪৯।

নিম্নবর্ণিত হাদীসগুলোতে ‘আল-জামা’আত’ শব্দটির উদ্দেশ্যকৃত অর্থ যে সাওয়াদুল আ’যম তথা ‘সামষ্টিক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ’, তা স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান পয়গাম্বর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমান:

لَا يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا، يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجُمَاعَةِ، فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ.

—আল্লাহ তা’আলা কখনোই এই উম্মতকে কোনো গোমরাহীর ওপরে একতাবদ্ধ করবেন না। আল্লাহর (ক্ষমতা ও সুরক্ষার) হাত রয়েছে জামা’আতের ওপর; অতএব, সাওয়াদুল আ’যম (তথা সামষ্টিক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ)’কে অনুসরণ বা মান্য করো, কেননা যে ব্যক্তি তা থেকে বিচ্যুত হয়, সে জাহান্নামে নিষ্কিণ্ড হবে।^{৬৯৫}

অধিকন্তু, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে সবচেয়ে সম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

আল্লাহ তা’আলা আমার উম্মতকে - অথবা, উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’কে- কোনো ভ্রান্তির ওপর একমত করবেন না। আল্লাহর (হেফাজতের) হাত বৃহত্তর জামা’আত তথা সামষ্টিক দলের সাথে রয়েছে এবং যে ব্যক্তি ওই দলত্যাগ করে সে জাহান্নামের আগুনের দিকে বিচ্যুত হয়।^{৬৯৬}

এর মানে কিন্তু কোনোক্রমেই এ নয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটি ক্লেশ/দুর্দশা থেকে একদম মুক্ত, কিংবা কোনো রকম সমস্যা তাঁদের মাঝে উদ্ভব হবে

৬৯৫. আল-হাকিম, ‘আল-মুসতাদরাক’, ১:১৯৯-২০১ #৩৯১-৩৯৭; ইবনে আবি আ’সিম, কিতাবু সুন্নাহ, ১:৩৯ #৮০; লালকাঈ, ‘ইতিকাদু আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা’আত’, ১:১০৬ #১৫৪; আদ দায়লামী, ‘আল-ফিরদৌস বি-মা’সুরিল খিতাব’, ৫:২৫৮ #৮১১৬; এবং হাকিম তিরমিযী, ‘নওয়া’দিরুল উসুল ফী আহাদীসি রাসূল’, ১:৪২২।

৬৯৬. ইমাম তিরমিযী (রাঃমাতুল্লাহি আলাইহি) কৃত ‘আল-জামেউস্ সহীহ’: ‘কিতাবুল ফিতান;’ ‘জামা’আতকে আঁকড়ে থাকার ব্যাপারে আমাদের কাছে যা বর্ণিত হয়ে এসেছে’ শীর্ষক অধ্যায়; ৪:৪৬৬ #২১৬৭; ইমাম হাকিম (রাঃমাতুল্লাহি আলাইহি) রচিত ‘আল-মুসতাদরাক’, ১:২০০ #৩৯৪; এবং দানী প্রণীত ‘আল-সুনানুল ওয়া’রিদা ফীল-ফিতান’, ৩:৭৪৮ #৩৬৮।

না। এটা একটা বাস্তবতা যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটি হতে অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তবে উম্মতকে পুনরুজ্জীবিত করা ও তাঁদের অবস্থা পুনরায় সুসংহত করা কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন তা করা হবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর শিক্ষা অনুযায়ী এবং আস্ সওয়াদুল আ'যম তথা বড় দলটিকে আঁকড়ে ধরে থেকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটিকে গোমরাহ-পথভ্রষ্ট ঘোষণা করা এবং তা থেকে বিচ্যুত হওয়া প্রকৃতপক্ষে এক মহাভ্রান্তি এবং এর পাশাপাশি মোনাফেক্বীও; আর এটাই সবচেয়ে দয়াবান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন। মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর উদযাপনও হচ্ছে সেসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এমন একটি (বিষয়), যা সম্পর্কে উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল (মানে উলামাবৃন্দ) অনুমতি দিয়েছেন/জায়েয বলেছেন; এটা এমন এক বিষয় যেটা সম্পর্কে শরীয়তের দলিলের ভিত্তিতে তাঁরা আমল তথা অনুশীলন করে এসেছেন। আজকে কেউ যদি এ মর্মে অভিযোগ উত্থাপন করে যে উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলটি (এ ব্যাপারে) ভ্রান্তিতে অধঃপতিত, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে নিজেরই জন্যে গর্ত খুঁড়ে নিয়েছে; কেননা মূলতঃ সে বিবৃত করেছে সে একজন বিপথগামী, আর সে জাহান্নামের আগুনের দিকেই নিজের পথ বেছে নিয়েছে।

১০.১৩ ধর্মের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করা অত্যাৱশ্যক

এটা একটা দুঃখজনক ব্যাপার যে ইসলাম ধর্মের নির্দিষ্ট কিছু প্রবক্তা ছোটখাটো মতপার্থক্যের বিষয়াদিকে অজুহাত হিসেবে নিয়ে সেগুলোকে ঈমানদারি ও কুফরের মধ্যকার সংগ্রামে পরিণত করেছেন। এই ধরনের লোকেরা ইসলামের প্রকৃত মর্মকে উপেক্ষা করে থাকেন। এই কারণেই মুসলমান তরুণ প্রজন্মগুলো, যাদেরকে ধর্মের প্রকৃত চেহারা কখনোই প্রদর্শন করা হয় না, তারা ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে; তাদের উপলব্ধি/সমঝদারি বৃদ্ধির পরিবর্তে এসব তরুণকে নিজেদের ধর্মের সাথে পরিচয় করানো হচ্ছে এর প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে জানা ব্যতিরেকেই। দিন যতোই অতিবাহিত হচ্ছে এ ব্যবধান ততোই বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে। এটা কেনো হচ্ছে? এই কি হতে পারে যে - ইল্লা মা' শা' আল্লাহ - কোনো

ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য এতে জড়িত রয়েছে? নাকি কিছু লোক কেবল আপন নির্বোধতাতেই এ ধর্মকে কঠিন বানিয়ে ফেলতে চাচ্ছে? যাই হোক না কেনো, আমাদের তরুণ সম্প্রদায়, বিশেষ করে তাদের মধ্যে শিক্ষিত শ্রেণি যারা পশ্চিমা সংস্কৃতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত, তারা ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা আন্তরিকভাবে শরীয়তের প্রকৃত নীতিমালা উপস্থাপন করলে মানুষেরা ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে উৎসাহ সহকারে দ্বীন অনুশীলনে ব্যাপৃত না হবার কোনো কারণই নেই।

কতিপয় কিঞ্চিদজ্জ (মৌলভী) মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর উদযাপনকে বিরোধিতার বস্তুতে পরিণত করেছেন এ ঘোষণা দ্বারা যে এটা নিষিদ্ধ/হারাম; কেননা স্পষ্টত এটা ইসলামী ইতিহাসের প্রাথমিক অংশে অনুশীলিত ছিলো না। এই প্রসঙ্গে বিদ'আত/নতুন প্রচলনের সংজ্ঞা ও এর শরঈ বিধান প্রসিদ্ধ আলেম-উলামার দৃষ্টিতে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে; আর পরিভাষাগতভাবে মীলাদ একটা নতুন প্রচলন, কিন্তু এটাকে সমালোচনা ও ভর্ৎসনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার জন্যে কেবল বিদ'আত বলাই যথেষ্ট নয়। এ রকম করাটা স্রেফ সংকীর্ণতা ও একগুঁয়েমি হবে। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, প্রতিটি প্রজন্মে বিষয়াদির পরিস্থিতি ও আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন সাধিত হয় আপন আপন যুগের চাহিদা অনুযায়ী। হজ্জের কথাই ধরুন, সময়ের পরিক্রমণে এই ফরজ পালনের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে। আজকে মানুষ আর উটে চড়ে অথবা পায়ে হেঁটে হজ্জে গমন করেন না; এক সময় যে দূরত্ব অতিক্রম করতে সময় লাগতো কয়েক মাস, তা এখন কয়েক ঘণ্টায় পার হওয়া যায়। একইভাবে, ইসলাম ধর্মের অন্যান্য বেনা/ভিত্তিস্তম্ভও আগের মতো পদ্ধতিতে চর্চা করা হয় না। কিছু আধুনিক ও সমসাময়িক চাহিদা এগুলোতে একীভূত হয়েছে, কিন্তু মৌলিকত্বে পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

এরই আলোকে আমরা যদি মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'কে এটার বর্তমান কাঠামোতে গ্রহণ করি, তাহলে দেখতে পাবো এটা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর সুন্যের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা যেমন মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদযাপনে সমাবেশের আয়োজন করে সবচেয়ে সম্মানিত রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রশংসায় না'ত/কাসীদা আবৃত্তি এবং তাঁর গুণাবলী ও অনুপম বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করি, যা আমাদের সমাবেশ আয়োজনের আসল উদ্দেশ্য বটে, ঠিক তেমনি এ ধরনের সমাবেশ তাঁর যুগেও আয়োজিত হতো, আর প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং তাঁর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তির সমাবেশের আয়োজন করতেন।

ইসলামে বিদ'আতের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে আমার 'কিতাবুল বিদ'আত' বইটি দেখুন।

একাদশতম অধ্যায়

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট মতবাদগত বিষয়াদি

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট মতবাদগত বিষয়াদি

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর পক্ষে আমরা কুরআন ও সুন্নাহ হতে অসংখ্য দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করেছি; আর আমরা সেসব প্রসিদ্ধ ইমাম ও মুহাদ্দীস-আলেমের বিস্তারিত তালিকাও তাতে উল্লেখ করেছি যাঁরা এ বিশেষ দিনক্ষণকে উদযাপন করা কেবল জায়েয-ই বিবেচনা করতেন না, বরঞ্চ শরীয়ত মোতাবেক কাজীকৃত ও অগণিত রহমত-বরকতের উৎস-ও বিবেচনা করতেন। অতএব, প্রত্যেক ঈমানদারের নিজ নিজ সর্বশক্তি প্রয়োগ ও বীরত্ব প্রদর্শন করে এই অনন্য সুযোগকে সদ্ব্যবহার করা উচিত। এখানে এই শেষ অধ্যায়টিতে আমরা আমাদের আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটাবো সেসব মতবাদগত বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করে, যেগুলো মীলাদের সাথে সংশ্লিষ্ট। এভাবে আমরা এ প্রশংসনীয় ও জায়েয বিষয়টির সমালোচকদের দ্বারা উত্থাপিত আপত্তিগুলোর প্রতি সামগ্রিক জবাব দেবার আশা করি (আমীন)।

১১.১ মীলাদুন্নবী (দ.) শব্দটির প্রয়োগ

মীলাদের সমালোচকবর্গ এ ব্যাপারটি তুলে ধরতে অত্যন্ত আগ্রহী যে, 'মীলা'দ' শব্দটি স্রেফ ভারত উপমহাদেশেই প্রসার লাভ করেছে, অথচ আরব জাহানে 'মীলাদ' শব্দটিরই ব্যাপক প্রচলন নেই। এটা একটা সার্বিক ভুল ধারণা। বাস্তবে উর্দু ভাষা গঠিত ও গৃহীত হয়েছিলো বিজয়ী (মোঘল আকবর বাদশাহ'র) সেনাবাহিনীর দ্বারা; আর এতে সংমিশ্রিত ছিলো আরবী ও ফার্সী/পারসিক ভাষার মতো বিভিন্ন ভাষার শব্দ ও বাক্যসমূহ। 'ওয়ালাদ', 'ওয়া'লিদ', 'ওয়া'লিদা', 'মওলুদ', 'মীলা'দ ও 'মুতাওয়াল্লিদ' ইত্যাদি শব্দ আরবী থেকে গৃহীত নানা শব্দের উদাহরণ। আরবী ও পারসিক ভাষা থেকে গৃহীত এ রকম অনেক শব্দ ও অভিব্যক্তি রয়েছে, যা উর্দু ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। 'মীলাদ' শব্দটি আরবী ভাষায় অধিকতর প্রচলিত, কিন্তু প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর সীরাত/জীবনীগ্রন্থগুলোতে 'মীলাদুন্নবী (দ.)' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে।

বস্তুতঃ মীলা'দ একটি আরবী শব্দ, যা ব্যবহার করেছেন সর্ব-ইমাম তিরমিযী (২১০-২৭৯ হিজরী), ইবনে জারীর তাবারী (২২৪-৩১০ হিজরী), ইবনে কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিজরী), আল-সৈয়ুতী (৮৪৯-৯১১ হিজরী) এবং আল-আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হিজরী); এর পাশাপাশি আরো ব্যবহার করেছেন অন্যান্য কুরআন তাফসীরবিদ, হাদীসবেত্তা, ইতিহাসবিদ ও প্রিয়নবী (র)'এর জীবনীকারবৃন্দ।

১১.১.১ আরবী ভাষাবিদদের বইপত্রে মীলাদ শব্দটির ব্যবহার

নিম্নের ভাষাবিদবৃন্দ 'মীলাদ' শব্দটি নিজেদের বইপত্রে উদ্ধৃত করেছেন:

১. ইবনে মানযুর (৬৩০-৭১১ হিজরী), আবদুল ক্বাদির আল-রাযী আল-হানাতী (ইন্তেক্বাল: ৬৬০ হিজরীর পরে), মুরতজা আল-যুবায়েদী (১১৪৫-১২০৫ হিজরী) ও আল-জওহারী লেখেন:

وَمِيلَادُ الرَّجُلِ: اسْمُ الْوَقْتِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ.

-কোনো ব্যক্তির মীলাদ- এটা ইসিম তথা বিশেষ্য সে সময়কালের জন্যে, যা'তে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন।^{৬৯৭}

২. বিখ্যাত 'আল-মু'জাম আল-ওয়াসীত' (২:১০৫৬) এবং 'তাজ আল-উরুস মিন জওয়াহির আল-ক্বামুস' (৫:৩২৭) আরবী অভিধান দুটোতে বিবৃত হয়:

الْمِلَادُ: وَقْتُ الْوِلَادَةِ.

-মীলাদ হলো জন্মের সময়কাল।

৬৯৭. ইবনে মানযুর, 'লিসান আল-আরব', ৩:৪৬৮; আল-রাযী, 'মুখতার আল-সিহাহ', ৪২২ পৃষ্ঠা; আল-যুবায়েদী, 'তাজ আল-উরুস মিন জওয়াহির আল-ক্বামুস', ৫:৩২৭; এবং আল-জওহারী, 'আল-সিহাহ ফীল-লুগাত ওয়াল-উলুম', ২:৭১৩।

হাদিসশাস্ত্র ও ‘আসা’র’ তথা (সাহাবা কেরাম রাঃদিয়াল্লাহু আনহুমের) বাণীসমৃদ্ধ লিপিগুলোতে ‘মীলা’দ’ শব্দটির ব্যবহার বিদ্যমান। ইমাম তিরমিযী (২১০-২৭৯ হিজরী) নিজ ‘আল-জামেউস্ সহীহ’ গ্রন্থের কিতাবুল মানা’ক্বিব-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে ‘বাব’-এর শিরোনাম দিয়েছেন: ‘বাবু মা’ জা’য়া ফী মীলা’দিন্ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) [অর্থাৎ, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর মীলাদ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে]। অতএব, আরবী ভাষায় ‘মীলাদ’ শব্দটির কোনো উৎস নেই মর্মে দাবি করা একেবারেই অমূলক। উপরোক্ত এই বিবরণে বিবৃত হয়:

-বনু ইয়া'মুর ইবনু লাইস গোত্রের ভ্রাতা কুবা'স ইবনু আশ'ইয়াম (রাঈওয়াল্লাহু আনহু)'কে হযরত উসমান ইবনু আফফান (রাঈওয়াল্লাহু আনহু) প্রশ্ন করেন, আপনি বড় নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? তিনি উত্তরে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার চাইতে অনেক বড়, তবে আমি তাঁর আগে জন্মগ্রহণ করি। ৬৯৮

হযরত ক্বুবা‘স বিন আশইয়াম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)’এর প্রদত্ত - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ “- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার চাইতে অনেক বড়, তবে আমি তাঁর

৬৯৮. ইমাম তিরমিযী (রহ.) লিখিত ‘আল-জামেউস্‌ সহীহ’: ‘কিতাবুল মানা’কিব’, ‘প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর মীলাদ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে’ শীর্ষক অধ্যায়, ৫:৫৮৯ #৩৬১৯; ইমাম আল-শায়বানী (রহ.) কৃত ‘আল-আহাদ ওয়াল-মাসা’নী’, ১:৪০৭ #৫৬৬; ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (রহ.) প্রণীত ‘তারীখুল উম্মু ওয়াল-মুলুক’, ১:৪৫৩; ইমাম বায়হাকী রচিত ‘দালায়েল আন্‌ নবুওয়্যাত ওয়া মা’রিফা আহওয়াল সা’হিব আল-শরীয়াত (দ.) ১:৭৭; এবং ইবনে কাসীর লিখিত ‘আল-বিদায়া ওয়ান্‌ নিহায়া’, ২:২১৬-২১৭।

সর্বাধিক মর্যাদাবান পয়গাম্বর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মক্কা থেকে মদীনায হিজরত করেন, তখন তিনি ‘সাওর’ গুহায় আশ্রয় নেন; একই সময়ে মক্কার মুশরিকবর্গ তাঁকে আটক করার জন্যে খুঁজছিলো। হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে:

وَطَلَبْتُ قُرَيْشَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ الطَّلَبِ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى بَابِ الْغَارِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ عَلَيْهِ الْعَنْكَبُوتَ قَبْلَ مِيلَادِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْصَرَفُوا.

—কুরাইশ গোত্র প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপক খোঁজে অবতীর্ণ হয়, যতোক্ষণ না তারা গুহার মুখে পৌঁছোয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ (উপহাসার্থে) বলে, ‘এতে এক মাকড়সার জাল আবৃত, যা মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মীলাদের সময়কালেরও আগেকার।’ অতঃপর তারা অন্যত্র চলে যায়।^{৬৯৯}

অপর এক বর্ণনায় এসেছে-

فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى فِمِّ الْعَرِ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: ادْخُلُوا الْعَارَ. فَقَالَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلِيفٍ: وَمَا أَرَى بِكُمْ أَيْ حَاجَتِكُمْ إِلَى الْغَارِ؟ أَنْ عَلَيْهِ لَعْنُكِبُونًا كَانَ قَبْلَ مِيلَادِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

—কুরাইশ-বর্গ যখন গুহার মুখে পৌঁছে তখন তাদের মধ্যে একজন বলে, ‘গুহার ভেতরে প্রবেশ করো।’ অতঃপর উমাইয়্যা বিন খালাফ বলে, ‘আমার দৃষ্টিতে তোমাদের এতে কী প্রয়োজন? গুহার মুখে একটি

৬৯৯. ইবনে সা'আদ বর্ণিত 'আল-তাবাক্বাত আল-কুবরা,' ১:২২৮; এবং ইমাম সুয়ুতী (রহ.) প্রণীত 'কিফায়া আল-তা'লিব আল-লাবীব ফী খাসা'ইস-ইল-হাবীব,' ১:৩০৫।

মাকড়সার জাল রয়েছে, যা নিশ্চয় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এরও মীলাদের আগেকার।^{৭০০}

ইবনে আওন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

قُتِلَ عَمَّارٌ، رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى وَتِسْعِينَ سَنَةً، وَكَانَ أَقْدَمُ فِي الْمِيلَادِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

—হযরত আম্মার ইবনে এয়াসের (রাহিয়াল্লাহু আনহু) ৯১ বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর মীলাদের আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।^{৭০১}

ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিজরী) জাহেলীয়া যুগে ‘মুহাম্মদ’ নামকরণ হয়েছেন এমন ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুতকালে মুহাম্মদ বিন মুসলিমা (রা.) সম্পর্কে লেখেন:

وَهُوَ غَلَطٌ فَإِنَّهُ وَلِدَ بَعْدَ مِيلَادِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُدَّةٍ، فَفُضِّلَ لَهُ خَمْسَةٌ، وَقَدْ خَلَصَ لَنَا خَمْسَةٌ عَشَرَ.

—আর এটা ভুল, কেননা নিশ্চয় তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর মীলাদের কিছুকাল পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতএব, পাঁচজন (যাঁদের নাম জাহেলীয়া যুগে মুহাম্মদ রাখা হয়েছিলো তাঁরা) প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর আগের। আর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, (ওই নামে সর্বমোট) ১৫ জন ছিলেন।^{৭০২}

হযরত ইবনে আব্বাস (রাহিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন:

৭০০. আল-হালাবী বর্ণিত ‘ইনসান আল-উম্ম ফী সীরাত আল-আমীন আল-মা’মুন’ গ্রন্থে, ২:২০৯; আল-কালানী কৃত ‘আল-ইকতিফা’ বি-মা’ তাদমানাহু মিন মাগা’যী রাসুল আল্লাহ,’ ১:৩৩৯; এবং আল-সৈয়ুতী রচিত ‘কিফা’য়া আল-তা’লিব আল-লাবীব ফী খাসায়েস আল-হাবীব,’ ১:৩০৬।

৭০১. ইবনে সা’আদ বর্ণিত ‘আল-তাবাক্বাত আল-কুবরা’ গ্রন্থে, ৩:২৫৯; ইবনে আসাকির কৃত ‘তা’রীখ দিমাশক্ব আল-কবীর,’ ৪৩:৪৭১; এবং মিশযী প্রণীত ‘তাহযীব আল-কামা’ল ফী আসমা’ আল-রিজা’ল,’ ২১:২২৪।

৭০২. আল-আসক্বালানী, ‘ফাতহ আল-বারী,’ ৬:৫৫৭।

كَانَ بَيْنَ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ أَلْفَ سَنَةٍ وَتِسْعِمِائَةِ سَنَةٍ وَلَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا فَتْرَةٌ، وَإِنَّهُ أُرْسِلَ بَيْنَهُمَا أَلْفٌ نَبِيٍّ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سِوَى مَنْ أُرْسِلَ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَكَانَ بَيْنَ مِيلَادِ عِيسَى وَالنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ وَتِسْعٌ وَتِسْتُونَ سَنَةً.

—পয়গাম্বর মুসা ইবনে ইমরান (আলাইহিস্ সালাম) ও পয়গাম্বর ঈসা ইবনে মরিয়ম (আলাইহিস্ সালাম)’এর মধ্যে ১৯০০ বছরের এক সময়কাল অতিক্রান্ত হয় যখন কোনো ‘ফাতরা’ ছিলো না (মানে যখন নবুয়্যতের সময়কালে বিরতি ছিলো)। এই সময়ে বনু ইসরাঈল বংশে ১০০০ পয়গাম্বর (আ.)’কে প্রেরণ করা হয়; এর বাইরে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীতে প্রেরিত পয়গাম্বর (আলাইহিমুস্ সালাম)’বৃন্দকে বাদ দিয়েই (ওই সংখ্যা)। পয়গাম্বর ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর (নবুয়্যতের) মধ্যবর্তী সময়কাল ছিলো ৫৬৯ বছর।^{৭০৩}

ওপরের বর্ণনাগুলোর সার-সংক্ষেপ হলো, বহু বিশ্বস্ত, সুযোগ্য ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস উলামা এমন আহাদিস সংকলন করেছেন, যেগুলোতে ‘মীলাদ’ শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে; আর এটাই এখানে লক্ষণীয় বিষয়। এই শব্দটি নিশ্চিতভাবে ভারত উপমহাদেশে উদ্ভাবিত হয়নি।

১১.১.৩ লেখনীতে মীলাদ শব্দটির ব্যবহার

সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন পয়গাম্বার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর মীলাদ বিষয়ে বহু বিখ্যাত ও কর্তৃত্বশীল লেখক বইপত্র লিখেছেন। এই পুস্তকের ইতিপূর্বকার একটি অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছিলো। কিছু কিছু লেখক ‘মীলাদ’ শব্দটিকে নিজেদের বইয়ের শিরোনামে ব্যবহার করেছেন। হাজ্বী খলীফা তাঁর ‘কাশফ আল-যুনুন’ আন

৭০৩. ইবনে সা’আদ বর্ণিত ‘আল-তাবাক্বাত আল-কুবরা’, ১:৫৩; ইমাম ইবনে জারীর তাবারী, ‘তা’রীখ আল-উম্ম ওয়াল-মুলুক,’ ১:৪৯৫; এবং আল-কুরতুবী, ‘আল-জামেউ লি-আহকাম আল-কুরআন,’ ৬:১২২।

উসা'মী আল-কুতুব ওয়াল-ফুনুন' শীর্ষক গ্রন্থে এমনি একটি পুস্তক সম্পর্কে লেখেন:

[دُرُجُ الدَّرَرِ فِي مِيلَادِ سَيِّدِ الْبَشَرِ] لِلْسَّيِّدِ أَصِيلِ الدِّينِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُسَيْنِيِّ الشَّيْزَانِيِّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ٨٨٤ أَرْبَعِ وَثَمَانِينَ وَثَمَانٍ مِائَةً .

—‘দুরাজুদ্ দুরার ফী মীলাদি সাইয়েদিল বাশার’ শিরোনামের বইটির রচয়িতা সাইয়েদ আসীলুদ্দীন আব্দিল্লাহ বিন আবদির রহমান আল-হুসাইনী আশ্ শীরা'যী (৮৮৪ হিজরী)।^{৭০৪}

ইবনে আল-জাওয়াযী (৫১০-৫৭৯ হিজরী) মীলাদ সম্পর্কে দুটো পৃথক পৃথক বই লেখেন; সেগুলোর একটির নাম ‘বয়া’ন আল-মীলাদ আল-নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

এসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে প্রত্যেক জ্ঞানী ও অভিমত ব্যক্তকারী ব্যক্তিই জানতে পারবেন ‘মীলাদ’ শব্দটি ভারতীয়দের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়নি, বরং এটা একটা আরবী শব্দ যা স্মরণাতীতকাল থেকেই আরবীয় জাতি ব্যবহার করে আসছেন। এরপরও কেউ এ নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করলে (বোঝা যাবে) তাঁর মধ্যে কোনো কিছু গলদ আছে। (বস্তুত) আরব ও অনারব মুসলমানদের মাঝে ধর্মীয় পরিভাষায় কোনো পার্থক্য থাকা উচিত নয়।

১১.২ মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুশি প্রকাশের ঈদ, শরীয়তের ঈদ নয়

মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শরীয়তের ঈদ নয়, আমরাও এটাকে সেভাবে বিবেচনা করি না; কিন্তু এই দিনটির তাৎপর্য শরীয়তের ঈদের দিনের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। এটা এ কারণে যে খুশি প্রকাশ করা (মানুষের) একটা জন্মগত স্বভাব। অতএব, এটাকে খুশি প্রকাশের ঈদ হিসেবে বিবেচনা করা কোনো বাড়াবাড়ি নয়। ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বছরে শুধু একবারই আসে, অপর দিকে

মীলাদের সমাবেশ/মাহফিল এবং সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর যিকর/স্মরণ কোনো স্থান-কালের শর্তারোপ ছাড়াই সারা বছর পালিত হয়। ‘ঈদ’ শব্দটি সেই দিনটিরই প্রতি আরোপ করা হয়, যেদিনটিতে প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে সম্মানিত পয়গাম্বর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই ধরাধামে শুভাগমন করেন; কেননা মানুষেরা ঈদ শব্দটিকে মহানন্দ ও সুখের দিন বোঝাতে ব্যবহার করতেন (ওই সময়)।

‘মীলাদ’ শব্দটির সাধারণ ব্যবহারের ভিত্তিতে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হচ্ছে একটি ঈদের দিন। এর উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মতোই, যিনি তাঁর কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা প্রেমাস্পদের আগমন উপলক্ষে চিৎকার করে বলেন: ‘আপনার আগমন (আমার জন্যে) একটি ঈদ!’ এই অর্থের যথাযথ প্রতিফলন নিচের আরবী দ্বিচরণ কবিতায় দেখতে পাওয়া যায়:

عَيْدٌ وَعَيْدٌ وَعَيْدٌ صِرْنَ مُجْتَمِعَةً

وَجْهُ الْحَبِيبِ وَعَيْدُ الْفِطْرِ وَالْجُمُعَةِ

ঈদ, ঈদ, ঈদ - (সবই) হয়েছে একত্রে জমা

প্রেমাস্পদের চেহারা, ঈদুল ফিতর ও জুমুআ'। [ভাবানুবাদ]

সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমন দিবসকে একটি ঈদ হিসেবে বর্ণনা করা এবং ‘ঈদ আল-নববী’ বলে সম্বোধন করা এ বাস্তবতাকে নাকচ করে না যে শরীয়তে কেবল দুটো ঈদের দিনই রয়েছে: ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা। তবে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, মীলাদ এই দুই ঈদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ও অধিকতর আশীর্বাদধন্য; কেননা একমাত্র প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর অসীলা বা মাধ্যমেই আমরা ইসলামের অপর দুই আশীর্বাদময় দিবস ও অন্যান্য বড় বড় দিবসের প্রাপক হয়েছি। এই ধরণীতলে তাঁর মীলাদ (তথা শুভাগমন) না হলে আমরা ইসলাম ধর্ম, নুবুয়্যত, কুরআন মজীদ, মে'রাজ (উর্ধ্বগমন), হিজরত, বদরের যুদ্ধে ঐশী সাহায্য কিংবা মক্কার সুস্পষ্ট বিজয় কিছুই পেতাম না। সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পয়গাম্বর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি ১২ই

রবীউল আউয়াল তারিখে এ ধরায় শুভাগমন করেন, তাঁরই মধ্যস্থতায় এসব এবং আরো অনেক নেআমত/আশীর্বাদ আমাদের প্রতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রকৃত আশেক-ভক্তবৃন্দ খুশির প্রতিটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তকে তাঁরই পবিত্র সত্তার (যিকর-তায়কিরাময়) উদযাপনে অভ্যস্ত; আর এ খুশি বহুগুণে বৃদ্ধি পায় পবিত্র রবীউল আউয়াল মাসে; যেদিন তাঁর মীলাদ হয়েছিলো ঠিক সেই তারিখই এর পরমক্ষণ হয়। আমরা কেন ১২ই রবীউল আউয়াল তারিখে মীলাদ উদযাপন করি তার ব্যাখ্যা খুঁজতে চাওয়া একেবারেই অনুচিত, কেননা এতে বোঝা যাবে প্রশংসার উত্তর জানতে চাচ্ছেন আমরা কেন সেদিনটিতে খুশি হই যেদিন সবচেয়ে সম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধরাধামে শুভাগমন করেছিলেন। এটা অনেকটা এই প্রশ্ন করার মতো যে আমরা কেন তাঁর খাতিরে খুশি, যিনি সাত আসমান পেরিয়ে উর্ধ্বগমন করেছিলেন। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি সামান্যতম বিশ্বাস ও প্রেম-ভক্তি যে মুসলমানের অন্তরে বিরাজমান, তিনি কি এ রকম প্রশ্ন করতে পারেন? এই অনর্থক প্রশ্নের জবাবে শুধু এতোটুকু বলাই যথেষ্ট হবে: “আমাদের মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেদিন এই ধরণীতলে শুভাগমন করেন, আমি সেদিনটিতে খুশি উদযাপন করি এবং মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি আমার গভীর মহব্বত বিদ্যমান; কেননা আমি একজন মো’মেন।” এই ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন, গরিবদেরকে খাওয়ানো, জুলূস-মিছিল, সৃষ্টির সেরা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রশংসা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি যে একদম বৈধ ও প্রশংসনীয় আমল/কাজ, সে ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহই নেই।

অধিকন্তু, পবিত্র রবীউল আউয়াল মাসে সর্বাধিক মহিমাম্বিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যিকর-তায়কিরাম তথা স্মরণ বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণগুলোও এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কেননা এটা উপলক্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটা সেই সময় যখন মানুষেরা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যিকর-তায়কিরামূলক সমাবেশে দলে দলে যোগ দেন। সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনায় প্রত্যয় জন্মে যে

বিশেষ তাৎপর্যের দরুন নির্দিষ্ট দিনক্ষণ অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি ফযীলত/আশীর্বাদময় ও মাহাত্ম্যপূর্ণ। এ উপায়ে এসব নৈকট্যের মুহূর্তগুলো দ্বারা প্রভাবিত আনন্দঘন স্মরণের মাঝে রয়েছে এমন আবেদন, যা অন্য কোনো সময়ে অর্জন করা যায় না। এভাবে মানুষেরা বর্তমানের সাথে অতীতকে সংযুক্ত করেন এবং একসাথে ভবিষ্যতকেও সংযুক্ত করেন; আর এতে যিকরের এক আলাদা স্বাদ তাঁরা আস্বাদন করেন, ঠিক যেমনটি বর্ণনা করেছেন কবি:

بازگوار مجید و آزار ان مجید

تا دور دیوار آری به وجد

প্রিয় নগরী ও এর বাসিন্দাদের স্মরণে রেখো অবিরত;
যাতে এর প্রাচীর ও দরজাগুলোতে ঘটে বহিঃপ্রকাশ,
তোমাদেরই আবেগ-উচ্ছ্বাস। [ভাবানুবাদ]

মীলাদের মাহফিলগুলো আল্লাহ তা‘আলার যিকর তথা স্মরণের প্রতি মানুষকে আহ্বানের একটি মোক্ষম সুযোগও। বস্তুতঃ এই মুহূর্তগুলো (প্রকৃত ভালোবাসায়) পরিপূর্ণ অভিনিবেশ ও পরমানন্দের হাল-অবস্থা ধারণ করে, যা (হেলায়) ক্ষেপণ করা উচিত নয়। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সীরাত/জীবনী, নীতি-নৈতিকতা, আচার-ব্যবহার ও লেনদেনের মতো বিষয়াদির প্রতি (মাহফিলে) অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার সুবর্ণ সুযোগের সদ্যবহার করার বাধ্যবাধকতা বক্তা ও আলেম-উলামার ওপর বর্তায় (এ সময়)। তাঁদের উচিত হাজারানে মজলিশকে কল্যাণকর ও পুণ্যদায়ক কর্ম সংঘটনে উৎসাহিত করার পাশাপাশি উন্মত্ত যেসব দুঃখকষ্ট ভোগ করছেন এবং সীমা লঙ্ঘনে আক্রান্ত হয়েছেন, সেগুলো সম্পর্কেও সতর্ক করা; আর কীভাবে মুসলমান সাধারণ নিজেদেরকে দোষখের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারেন, সেসব উপায়গুলোও বাতলে দেয়া। মীলাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয় প্রদর্শনী বা পরিচিতদের সাথে সামাজিকতা রক্ষা করা, বরঞ্চ এসব পবিত্র মাহফিল-সমাবেশের মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যম হওয়া চাই মীলাদের মাহফিলগুলো। যে অংশগ্রহণকারী এই ধর্মীয় ফায়দা অর্জনে ব্যর্থ হয়, সে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মঙ্গল ও আশীর্বাদ হতে বঞ্চিত (হতভাগা) ছাড়া কিছু নয়!

১১.৩ মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণাবলী ও মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বর্ণনা প্রদানে মুহাদ্দেসীনবুন্দের দৃষ্টিভঙ্গি

সর্ব-ইমাম মুসলিম (২০৬-২৬১ হিজরী), তিরমিযী (২১০-২৭৯ হিজরী) ও অন্যান্য মহান মুহাদ্দীস-উলামার দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিলো যে, তাঁরা যখনই প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর গুণাবলী ও উন্নত বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর মীলাদ শরীফেরও স্মরণ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর অনুপম গুণগত বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচনাকালে সম্মানিত ইমামমণ্ডলী স্রেফ তাঁর সীরাত/জীবনীর প্রতি আলোকপাতের পরিবর্তে তাঁরই মীলাদ, উন্নত বংশপরিচয় ও তাঁর যাত মোবারক তথা পবিত্র সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোও আলোচনা করতেন।

ইমাম মুসলিম (রহমতুল্লাহি আলাইহি) নিজ 'সহীহ' গ্রন্থের 'কিতাব আল-ফাযায়েল' অংশ এবং ইমাম তিরমিযী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) আপন 'আল-জামে' আস্ সহীহ' পুস্তকের 'কিতাব আল-মানা'ক্বিব' অংশের সূচনা করেছেন হযরত ওয়া'সিলা বিন আসক্বা" (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'এর বর্ণনা দিয়ে, যিনি উদ্ধৃত করেন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর হাদীস:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ مِنْ وَلَدٍ إِبرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ وَلَدٍ إِسْمَاعِيلَ بَنِي كِنَانَةَ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

—আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বর ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর সন্তানদের মধ্য হতে পয়গাম্বর ইসমাইল (আলাইহিস্ সালাম)-কে বেছে নিয়েছেন এবং ইসমাইল-এর বংশে কিনানাহ গোত্রকে বংশ (হিসেবে) বেছে নিয়েছেন; কিনানাহ গোত্র হতে কুরাইশ বংশকে বেছে নিয়েছেন; কুরাইশ

বংশ থেকে হাশিম উপগোত্রকে বেছে নিয়েছেন এবং বনী হাশিম হতে আমাদের বেছে নিয়েছেন।^{৭০৫}

এই হাদীসে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ পবিত্র বংশবৃত্তান্ত সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তিনি এতে 'এস্তফা' (اصْطَفَى) তথা 'মনোনীত করা' শব্দটিও ব্যবহার করেছেন; কেননা এটা তাঁর সম্মানসূচক উপাধি: 'আল-মুস্তফা' তথা 'মনোনীত জন।' এই উপাধি তাঁর পুরো খান্দানের প্রতিও আরোপিত।

ইমাম মুসলিম (২০৬-২৬১ হিজরী) তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থের 'কিতাবুল ফাযায়েল' বইটি এবং ইমাম তিরমিযী (২১০-২৭৯ হিজরী) তাঁর 'আল-জামে'উস্ সহীহ' পুস্তকের 'কিতাবুল মানা'ক্বিব' বইটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র সুউচ্চ নৈতিক গুণাবলী বা শিষ্টাচার, কিংবা তাঁর শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা দ্বারা সূচনা করেন নি, বরং পুরো অধ্যায়টুকুই মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র প্রতি উৎসর্গ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) একই বইয়ের 'বাবু ফযল আন্ নবী' (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চমৎকার গুণাবলী) শীর্ষক অধ্যায়ে এই বিষয়ের অবতারণা পুনরায় করেছেন ২,৩ এবং ৪নং হাদীসে। কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হলো, পঞ্চম হাদীসে মানব অস্তিত্বের সূচনালগ্নে পয়গাম্বর আদম (আলাইহিস্ সালাম)'এর সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনাকালে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র আশীর্বাদময় মীলাদের আগে তাঁরই (পবিত্র সত্তার) সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে এভাবে:

৭০৫. ইমাম তিরমিযী (রহ.), আল-জামিউস্ সহীহ: 'কিতাবুল মানা'ক্বিব', প্রিয়নবী (দ.)'এর উন্নত গুণগত বৈশিষ্ট্যাবলী' শীর্ষক অধ্যায়, ৫:৫৮৩ #৩৬০৫; সহীহ মুসলিম, 'কিতাবুল ফাযায়েল,' 'রাসূলুল্লাহ (দ.)'এর বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও নুবুয্যতের আগে তাঁর হাতে নুড়ি পাথরের দ্বারা তাঁরই প্রতি সালাত-সালাম পাঠ' শীর্ষক অধ্যায়, ৪:১৭৮২ #২২৭৬; ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.), 'আল-মুসনাদ,' ৪:১০৭; ইবনে আবী শায়বাহ (রহ.), 'আল-মুসনাফ,' ৬:৩১৭ #৩১,৭৩১; আবু ইয়া'লা (রহ.), 'আল-মুসনাদ,' ১৩:৪৬৯-৪৭২ #৭৪৮৫-৭৪৮৭; ইমাম তাবারানী (রহ.), 'আল-মু'জামুল কবীর,' ২২:৬৬ #১৬১; ইমাম বায়হাকী, 'আল-সুনান আল-কুবরা,' ৬:৩৬৫ #১২,৮৫২; এবং ইমাম বায়হাকী, 'শু'য়াবুল ইমান,' ২:১৩৯ #১৩৯১।

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) আল্লাহ্ আনহু বর্ণনা করেন যে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আল্লাহ্ আনহুম সর্বাধিক মর্যাদাবান রাসূল (সাঃ) আল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর কাছে আরজ করেন:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ؟

-হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আপনার নুব্বুয়্যত কখন অবধারিত হয়েছে?

এই জিজ্ঞাসা ছিলো অসচরাচর, কেননা মহান সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আল্লাহু আনহুম) বৃন্দে মধ্যে কে না জানতেন যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নুবুয্যত ঘোষণা করেছিলেন চল্লিশ বছর বয়সে, যখনই তিনি হেরা গুহায় ওহী পেয়েছিলেন! তাঁরা নিশ্চিতভাবে এটা জানতেন। নুবুয্যতের ঘোষণার সময়কাল সম্পর্কে কোনো সন্দেহ কিংবা ভুল ধারণা ছিলো না। তাহলে এ ধরনের প্রশ্ন করার কী প্রয়োজন ছিলো? বিষয়টি এতো স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহান সাহাবা (রাঃ) মণ্ডলীকে কেন তাঁরা এটা জানেন না বলে প্রত্যুত্তর দেননি; কেননা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আল্লাহু আনহুম) নবী হিসেবে তাঁর মনোনীত হওয়া এবং নুবুয্যত প্রদানের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে ভালোই অবগত ছিলেন। এই কারণেই তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান পয়গাম্বর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

وَأَدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

-(আমি তখনো নবী ছিলাম) যখন আদম (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর শরীর ও রূহের মধ্যে ছিলেন।^{৭০৬}

৭০৬. ইমাম তিরমিযী, আল-জামেউস সহীহ: 'কিতাবুল মানা'ক্বিব', 'রাসূল (দ.)'এর চমৎকার গুণাবলী' শীর্ষক অধ্যায়, ৫:৫৮৫-৩৬০৯; ইবনে মুস্তফা'দ তাঁর 'কিতাব আল-কুদর' (২৭ পৃষ্ঠা #১৪) পুস্তকে বিবৃত করেন যে এর বর্ণনাকারীবৃন্দ বিশ্বস্ত (সিক্কা); তামাম রেযা কৃত 'কিতাব আল-ফাওয়াঈদ', ১:২৪১-৫৮১; ইবনে হিব্বান (রহ.), 'কিতাব আল-সিক্কা'ত', ১:৪৭; লা'লাকাঈ প্রণীত 'ই'তিক্বাদ আহল আ'স সুন্নাহ', ১:৪২২-১৪০৩; আল-হাকিম (রহ.) রচিত 'আল-মুসতাদরা'ক', ২:৬৬৫-৪২১০; আল-বায়হাক্বী (রহ.) লিখিত 'দালায়েল আল-নুবুয্যাত ওয়া মা'রিফাত আহওয়াল সা'হিব আল-শরীয়ত (দ.)', ২:১৩০; আল-সৈয়তী (রহ.) কৃত 'আল-দুর্র আল-মানসুর ফীত তাফসীর

এই হাদীসের মানে হলো, সবচেয়ে মর্যাদাবান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'কে নবী মনোনীত করা হয়েছিলো এমন এক সময়কালে যখন পয়গাম্বর আদম (আলাইহিস্ সালাম)'এর মোবারক রুহ তথা পবিত্র আত্মা ও দেহের সৃষ্টি (প্রক্রিয়া) সুসম্পন্ন হয়নি। এখানে এই হাদীসটি আমাদের বর্ণনা করার কারণ, এটা অপরিহার্যভাবে তাঁর সীরাতের সাথে সম্পর্কিত না হলেও তাঁর মীলাদের সাথে বাস্তবিকভাবে সম্পর্কিত। ইমাম তিরমিযী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) কর্তৃক এর উল্লেখ “কিতাব আল-মানা’ক্বিব’ অংশে হওয়া এবং অন্যান্য বইয়ে না হবার কারণ এই যে, এটা ফিক্বহী তথা শরঈ বিধানগত সিদ্ধান্ত, নৈতিক আচার-ব্যবহার বা শিষ্টাচারের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরঞ্চ মীলাদুনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিষয়টির সাথে সুনির্দিষ্টভাবে সম্পর্কিত।

১১.৩.১ কিতাব আল-মানা'ক্বিবের অধ্যায়গুলো বিন্যাসে ইমাম তিরমিযী (রহ.)'এর গৃহীত পদ্ধতি

ইমাম তিরমিযী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এর প্রণীত ‘আল-জামেউস্ সহীহ’ গ্রন্থের ‘কিতাব আল-মানা’ক্বিব’-এর প্রথম অধ্যায়টির শিরোনাম ‘বাব-এ-ফজল-এ-নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। দ্বিতীয় অধ্যায়টির শিরোনাম ‘বাবু মা জা’য়া ফী মীলাদিন্ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর সীরাত মোবারক বা পবিত্র জীবনী ও তাঁর রেসালাত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয় সাধারণত তাঁরই আশীর্বাদময় মীলাদের ঘটনাবলী আলোচনার পরে; কেননা ঐতিহাসিকভাবে এগুলো (মীলাদের) পরে ঘটেছিলো। এটা কি সম্ভব প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মীলাদের আগেই রাসূল মনোনীত হয়েছেন? বাস্তবতা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর মীলাদ হয়েছে প্রথমে, আর রিসালাতের ঘোষণা এসেছে অনেক পরে। অতএব,

বিল-মা'সূর,' ৬:৫৬৯; এবং নাসিরুদ্দীন আলবানী নিজ 'সহীহ আল-সীরাত আল-নববীয়া' (৫৪ পৃষ্ঠা, #৫৩) পুস্তকে এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

কেউ মীলাদ উদযাপন করলে তিনি মহাসম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর সাথে এক আত্মিক বন্ধন গড়ে তোলেন, যার দরুন তিনি প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর অন্তরে অবস্থিত আধ্যাত্মিক জ্যোতির (নূরের) মঞ্জুরি পান। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর উন্নত গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব মাথায় রেখেই ইমাম তিরমিযী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এই অধ্যায়টিকে প্রথমে এনেছেন। এটা হতে পারে কিছু লোক এ ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে পারবে না, কারণ তারা হয়তো অনুভব করতে পারে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর গুণাবলী আলোচনার কোনো অবকাশ সেখানে নেই, যেখানে তাঁর আচার-আচরণ ও শিক্ষাসমূহের ওপরে জোর দেয়া উচিত। যারা এ ধরনের বক্তব্য দেয়, তাদের উচিত ইমাম তিরমিযী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)'এর গবেষণাকর্ম আরো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা। সর্ব-ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, ও অন্যান্য অনেক ইমাম এবং মুহাদ্দীস উলামা (রহমতুল্লাহি আলাইহিম) নিজেদের বইয়ের অধ্যায়সমূহের আরম্ভ করেছেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর গুণগত বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোচনা দিয়ে এবং এরপর তাঁর মীলাদের উল্লেখ করেছেন।

ইমাম তিরমিযী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)'এর 'আল-জামেউস সহীহ' গ্রন্থের 'কিতাব আল-মানা'ক্বিব' অংশের তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হলো 'বা'বু মা জা'য়া ফী বা'দ নবুয়্যাত আন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।' এটা একটা ঐতিহাসিক, বুদ্ধিসম্মত ও যুক্তিনির্ভর আলোচনার বিন্যাস, যার সূচনা হয়েছে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর সৃষ্টি ও অলৌকিক মীলাদের সাথে সংশ্লিষ্ট রওয়াযাত/বর্ণনা দ্বারা; অতঃপর রেসালাতের ঘোষণার মতো তাঁরই জীবনের অন্যান্য ঘটনার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী (রহমতুল্লাহি আলাইহি)'এর গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর পয়গাম্বর হিসেবে মনোনীত হওয়ার আলোচনা দ্বারা। এভাবে হাদীসগুলোর বিন্যাস করে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এ বাস্তবতার প্রতি যে নুবুয়্যতের ঘোষণা চল্লিশ বছর বয়সে হলেও নুবুয়্যত দান করা হয়েছিলো পয়গাম্বর আদম (আলাইহিস্ সালাম)'এরও সৃষ্টির আগে। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে,

নুবুয়্যত দান ও তা ঘোষণা করার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিরাজমান। পরিতাপের বিষয় হলো, কিছু লোক নিজেদের বিভ্রান্তির দরুন এই দুটোর মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে অক্ষম, আর তারা শেষমেশ এগুলোর মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলে।

(হাদীসের) এই বিন্যাস-পদ্ধতি ইমাম তিরমিযী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) ও ছয়টি বিশুদ্ধ/সহীহ হাদীসগ্রন্থপ্রণেতা অন্যান্য ইমামের আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আমাদেরকে সম্যকদর্শন দেয়। উদাহরণস্বরূপ, বা'বু ফী আয়াতে ইসবাতে নুবুয়্যত আন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) অধ্যায়ের সূচনা করেছেন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর পবিত্র যাত (সত্তা) মোবারকের প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণ করে। এই হাদীসে একটি উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়েছে, যা'তে উল্লেখিত হয়েছে মক্কার একটি পাথর সম্পর্কে, যেটা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণ করতো। হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে সবচেয়ে মর্যাদাবান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: মক্কায় এমন একটা পাথর আছে যেটা আমাকে যে রাতে নবী ঘোষণা করা হয়, সেই রাতগুলোতে আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করতো। নিশ্চয় আমি ওই পাথরটিকে এখনো চিনি।^{৭০৭}

হযরতে ইমামে আলী (কার্রামাল্লাহু ওয়াজহাহু) বর্ণনা করেন:

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَخَرَجْنَا فِي بَعْضِ نَوَاحِيهَا فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

অর্থ: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর সাথে ছিলাম; অতঃপর আমরা শহরের কোনো এক দিকে বের হলাম। (পথে) এমন কোনো পাহাড় ও গাছই অবশিষ্ট ছিলো না, যেগুলো তাঁর প্রতি সালাম পেশ

৭০৭. ইমাম তিরমিযী কৃত 'আল-জামেউস সহীহ': কিতাবুল মানাক্বিব, 'রাসূল (দ.)'এর রেসালত-প্রমাণকারী মো'জেযা/অলৌকিক ঘটনাগুলো' শীর্ষক অধ্যায়, ৫:৫৯২ #৩৬২৪; আবু ইয়া'লা (রহ.) প্রণীত 'আল-মুসনাদ', ১৩:৪৫৯ #৭৪৬৯; আল-তাবারানী (রহ.) রচিত 'আল-মু'জাম আল-আওসাত', ২:২৯১ #২০১২।

করে নি এ কথা বলে: “হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আপনার প্রতি সালাম/শান্তি বর্ষিত হোক!”^{৭০৮}

এটা ওই একই সালাম-সম্ভাষণ যা মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর মাহফিলগুলোতে পাঠ করা হয়। আফসোস! গাছ ও পাথর প্রভৃতি সৃষ্টিকুল শিরোমণি হযরত রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর প্রতি সালাত-সালাম পেশ করে থাকে; অথচ আজকে কতোগুলো সংকীর্ণমনা লোক যারা তওহীদবাদী বলে দাবিদার, তারা এই আশীর্বাদময় কাজকে এমন কী বিদ’আত বলেও ঘোষণা করার ফাঁদে পতিত হয়েছে, যদিও জামেউত্ তিরমিযী ও সহীহ মুসলিম শরীফের মতো সহীহ হাদীসগ্রন্থগুলোর সূচনা এই বিন্যাস-পদ্ধতিতে হয়েছে। সর্ব-ইমাম মুসলিম (রহমতুল্লাহি আলাইহি) ও বুখারী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এই আকীদা-বিশ্বাসের প্রবক্তা ছিলেন, যেহেতু প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় (তাদের গ্রন্থের) অধ্যায়সমূহ উৎসর্গিত হয়েছে। পবিত্র মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর প্রতি ইমাম তিরমিযী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) একটি অধ্যায় উৎসর্গ করেছেন এবং ‘মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’ শব্দটি তাতে উল্লেখ করেছেন।

১১.৪ মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণাবলী ও মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বর্ণনা প্রদানে ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি

হাদিসশাস্ত্রবিদ (মুহাদ্দেসীন) উলামামণ্ডলী ছাড়াও ইতিহাসবিদ ও জীবনীকারবৃন্দ এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর সীরাত/জীবনী আলোচনাকালে তাঁরা তাঁর আশীর্বাদময় মীলাদ ও নির্মল খান্দান সম্পর্কে অধ্যায়সমূহ রচনা করেছেন।

৭০৮. ইমাম তিরমিযী কৃত ‘আল-জামেউস্ সহীহ’: কিতাবুল মানাকীব, ‘রাসূল (দ.)’এর রেসালত-প্রমাণকারী মো’জযা/অলৌকিক ঘটনাগুলো’, ৫:৫৯৩ #৩৬২৬; আল-হাকিম নিশাপুরী লিখিত ‘আল-মুসতাদরাক’, ২:৬৭৭ #৪২৩৮; এবং আল-মাক্দাসী প্রণীত ‘আল-আহাদীস আল-মুখতা’রাত’, ২:১৩৪ #৫০২।

১. ইবনে ইসহাক (৮০-১৫১ হিজরী) সীরাত-বিষয়ক প্রথম বইটি রচনা করেন, যা ‘আল-সীরাত আন্ নববীয়া’ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিরোনামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি এই বইটির সূচনা করেন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর পবিত্র বেলাদত/ধরণীতলে শুভাগমন ও খান্দানের উল্লেখ দ্বারা। এতে নিম্নোক্ত দুটো অধ্যায়ের শিরোনাম পাওয়া যায়:

(ক) যিকর সাদ আল-নসব আয-যাকী মিন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইলা’ আদম (আলাইহিস্ সালাম)’;

(খ) মীলাদ রাসূল-আল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।^{৭০৯}

২, ইবনে হিশাম (ইন্তেকাল: ২১৩ হিজরী) নিজের প্রণীত আল-সীরাত আন্ নববীয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর মীলাদ ও খান্দানের অধ্যায়গুলোকে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে বিন্যাস করেন:

(ক) যিকর সাদ আল-নসব আয-যাকী মিন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইলা’ আদম (আলাইহিস্ সালাম)’;

(খ) উইলাদাত রাসূল-আল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া রাদা’আতিহি।^{৭১০}

৩. বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনে সা’আদ (১৬৮-২৩০ হিজরী) তাঁর লিখিত ‘আত্ তাবাক্বাত আল-কুবরা’ (১:২০, ২৫ ও ১০০) পুস্তকটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর মীলাদ ও বংশ পরিচয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দ্বারা আরম্ভ করেছেন।

৪. ইমাম মুহাম্মদ আল-খারকুশী আন্ নীশা’পুরী (ইন্তেকাল: ৪০৬ হিজরী) আপন ‘কিতাব শরফ আল-মুস্তফা’ পুস্তকের প্রথম খণ্ডে মীলাদ-বিষয়ক বেশ কিছু অধ্যায় রচনা করেন যার শিরোনাম: ‘জুম্মা আবওয়া’ব যুহুরিহি ওয়া মওলিদিহি আশ্ শরীফ।’

৭০৯. ইবনে ইসহাক, আল-সীরাত আন্ নববীয়া, ১৭ ও ৯৯ পৃষ্ঠা।

৭১০. ইবনে হিশাম, আল-সীরাত আন্ নববীয়া, ২৩ ও ১৫৩ পৃষ্ঠা।

৫. আবু নু'য়াইম আল-আসবাহা'নী (৩৩৬-৪৩০ হিজরী) তাঁর 'দালায়েল আন্ নুবুয়্যাত' (১:১৪-১৮) গ্রন্থে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন: 'যিকর ফাদীলাতিহি বি তীব মওলিদিহী ওয়া হাসাবিহি ওয়া নাসাবিহি।'

৬. প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও জীবনীকার আল-বায়হাকী (৩৮৪-৪৫৮) নিজ অনন্য কীর্তি 'দালায়েল আন্ নুবুয়্যাত ওয়া মা'রিফাত আহওয়াল সা'হিব আশ্ শরীয়াহ' শীর্ষক গ্রন্থে (১:১৭) মীলাদ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন নিম্নোক্ত শিরোনামের অধ্যায়ে: 'জুম্মা আবওয়া'ব মওলিদ আন্ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।'

৭. আল-মাকুরীযী (৭৬৯-৮৪৫ হিজরী) 'ইমতা'আ আল-আসমা'আ বি মা'লিন নবী মিনাল-আহওয়াল ওয়াল-আমওয়া'ল ওয়াল-হাফাদা ওয়াল-মাতা' শীর্ষক বইয়ে বেশ কিছু রচনাংশ বিধৃত করেছেন।

৮. আল-কুসতলানী (৮৫১-৯২৩ হিজরী) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর অলৌকিক মীলাদ/ধরাধামে গুভাগমন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছেন নিজ 'আল-মাওয়া'হিব আল-লাদুন্নিয়া বিল-মিনাহ আল-মুহাম্মদীয়াহ' শিরোনামযুক্ত গ্রন্থের 'আল-মাকুসাদ আল-আউয়াল' শীর্ষক অধ্যায়ে।

৯. ইউসুফ আল-সা'লিহী আল-শা'মী (ইন্তেকাল: ৯৪২ হিজরী) আপন 'সুবুল আল-হুদা' ওয়া 'রাশা'দ ফী সীরাত খায়র আল-'ইবা'দ' (১:৩২৫-৩৭৪) শীর্ষক গ্রন্থে 'জুম্মা আবওয়া'ব মীলাদিহী আশ্ শরীফ' শিরোনামের অধীনে কিছু সংখ্যক অধ্যায়ের সংকলন করেছেন।

১০. খলীফা বিন খাইয়্যাত (১৬০-২৪০ হিজরী) তাঁর 'আত্ তারীখ' কিতাবে মীলাদ-বিষয়ক একটি অধ্যায় রচনা করেছেন যার শিরোনাম 'মওলিদ রাসূল-আল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া ওফা'তিহী।'

১১. আত্ তাবারী (২২৪-৩১০ হিজরী) আপন 'তারীখ আল-উমাম ওয়াল-মুলুক' শিরোনামের পুস্তকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর মীলাদ ও পবিত্র খান্দান সম্পর্কে পর্যাপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

১২. ইবনে আসা'কির (৪৯৯-৫৭১ হিজরী) নিজ 'তারীখ দিমাশকু আল-কবীর' (৩:২৯ ও ৩৯) গ্রন্থে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর মীলাদ ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

১৩. ইবনে জাওয়াযী (৫১০-৫৯৭ হিজরী) নিজ 'আল-মুনতায়াম ফী তারীখ-ইল-মুলুক ওয়াল-উমাম' পুস্তকের প্রথম খণ্ডে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর মীলাদ ও খান্দান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৪. ইবনুল আসীর আল-জায়ারী (৫৫৫-৬৩০ হিজরী) আপন 'আল-কা'মিল ফীত্-তারীখ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর মীলাদ ও পুতঃপবিত্র বংশ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

১৫. ইমাম যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হিজরী) তাঁর 'তারীখ আল-ইসলাম ওয়া ওয়াফিয়া'ত আল-মাশা'হীর ওয়াল-আ'লম' কিতাবের মধ্যে 'আস্-সীরাত আন্ নববীয়া' অংশে 'মওলিদুহুল মুবারক' শীর্ষক অধ্যায়ে মীলাদ সম্পর্কে লিখেছেন।

১৬. ইবনে আল-ওয়াদী (ইন্তেকাল: ৭৪৯ হিজরী) তাঁর লিখিত 'তাতিম্মা আল-মুখতাসার ফী আখবার-ইল-বাশার' শীর্ষক ইতিহাসবিষয়ক পুস্তকের প্রথম খণ্ডে 'মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়া শারায় নাসাবিহী আল-তা'হির' শিরোনামে একটি অধ্যায় সংকলন করেছেন।

১৭. ইবনে কাসীর (৭০১-৭৭৪ হিজরী) নিজ 'আল-বেদায়া ওয়ান্-নেহায়া' কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে মীলাদ সম্পর্কে লিখেছেন।

১৮. হুসাইন আল-দিয়া'রবাকরী (ইন্তেকাল: ৯৬৬ হিজরী) আপন 'তা'রীখ আল-খামীস্ ফী আহওয়াল আনফুস্ নাফিস্' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের সূচনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর মীলাদ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে

উল্লেখ করেছেন; এর পাশাপাশি তিনি আন্যান্য নবী-রাসূল (আলাইহিমিস্ সালাম)'বৃন্দের মীলাদের কথাও উল্লেখ করেন।^{৭১১}

ওপরে উদ্ধৃত রেফারেন্সগুলো এবং ইতিহাস ও সীরাতে-শাস্ত্রের এ সকল মহান ইমামের বর্ণিত হাদীস/রওয়াত বা বর্ণনাসমূহ থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তাঁরা সবাই নিজেদের বইপত্রের প্রারম্ভে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর আশীর্বাদময় মীলাদের ঘটনাবলী ও পবিত্র খান্দানের বৃত্তান্ত উল্লেখ করেছেন। এছাড়া, বস্তুতঃ সীরাতে ও ইতিহাসের অন্যান্য সমস্ত বইপুস্তকে এ বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে 'মীলাদ' ও 'মীলাদ' শব্দগুলো প্রাথমিক প্রজন্মগুলোর সময়কালেই ব্যবহৃত হয়েছে; বস্তুতঃ প্রসিদ্ধ আলেম-উলামা নিজেদের বইপত্রের অধ্যায়গুলোর শিরোনাম রচনা করেছেন এই শব্দগুলো দিয়েই। অতঃপর কেউ এই তথ্য জানার পরও যদি দাবি করে থাকেন যে 'মীলাদ' ও 'মীলাদ' শব্দগুলোর কোনো ভিত্তি বা উৎস নেই, তাহলে তা নিঃসন্দেহে হবে চরম দুর্ভাগ্যজনক।

১১.৫ মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষে শরীয়তের দলিল দাবি প্রসঙ্গে

ঐশী বিধিবিধান থেকে নির্গত নীতিমালা প্রতিটি বৈধ কাজের ভিত্তিমূল; প্রতিটি আমল/পুণ্যকর্ম প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর সুন্যাতের ওপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। এটাই দ্বীন-ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করে এবং অন্য সব ধর্ম থেকে এটাকে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে। এই প্রসঙ্গে আমরা ইতিমধ্যে কুরআন ও হাদীসের লিপি হতে প্রমাণ করেছি যে ঈদের আকারে মীলাদ উদযাপন দ্বারা খুশি প্রকাশ করা জায়েয/অনুমতিপ্রাপ্ত। তবে দুর্ভাগ্যজনক এই যে, এতদসত্ত্বেও কতিপয় লোক কোনো কারণ ছাড়াই এ উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতি শির্ক ও বিদ'আতের ফতোয়া অবিরাম প্রয়োগ করে চলেছে। এ সকল সংকীর্ণ

মনের অধিকারী ব্যক্তি সব বিষয়েই কুরআন ও হাদীসের দলিল প্রদর্শনের দাবিতে আচ্ছন্ন। তারা ভ্রান্তভাবে ধরে নিয়েছে যে এ ধরনের আমল বা কাজের কোনো ভিত্তি ইসলামী শরীয়তে নেই। কবি ইক্ববাল এসব লোক সম্পর্কে কী সুন্দর বলেছেন:

دل ینا بھی کر خدا سے طلب

آنکہ کانور دل کانور نہیں

খোদার কাছে চাও দর্শনে সক্ষম (নির্মল) অন্তর
কেননা চোখের আলো তো নয় অন্তরের নূর। [ভাবানুবাদ]

মীলাদের পক্ষে যারা দলিল দাবি করে, তারা কি কখনো অন্যান্য সমস্ত খুশির উপলক্ষে একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের চিন্তা মাথায় রেখেছে? এই অনবধান লোকেরা কি কখনো খুশি প্রকাশের সময় বিষয়টিকে খতিয়ে দেখেছে এবং তাদের আনন্দফুর্তির পক্ষে কুরআন-হাদীসের সমর্থনসূচক দলিল আছে কি-না তা যাচাই করেছে?

১. কোনো দম্পতি দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সন্তান লাভ করলে কি মিষ্টি বিতরণ ও মানুষকে দাওয়াত করে তা উদযাপন করেন না? এই উপলক্ষে তাঁরা কি হাদীস-শাস্ত্রের বই তালাশ করেন এটা দেখতে যে মহান সাহাবায়ে কেরাম (রাহিয়াল্লাহু আনহুম)'বৃন্দের মধ্যে কারো পুত্র সন্তান লাভে তাঁরা একই রকম খুশি হয়েছিলেন কি-না?

২. প্রতি বছর যখন বাচ্চাদের জন্মদিন পালন করা হয় এবং উপহার দেয়া হয়, তখন কি ওই সব লোকের মাথায় এ চিন্তার উদয় হয় যে এই আনন্দফুর্তির পক্ষে কুরআন বা হাদীসের কোনো প্রমাণ আছে কি-না?

৩. আমাদের পুত্র বা কন্যার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা প্রশ্নে আমরা কয়েক মাস আগে থেকেই এন্তেজাম বা প্রস্তুতি নেই। দাওয়াতপত্র ডিজাইন ও বিতরণ করা হয়, আর রসুম-রেওয়াজ ও উপহারসামগ্রী আদান-প্রদান বাবদ প্রচুর অর্থব্যয় করা হয়। বিয়ের দামী জামাকাপড়েও বিশাল অঙ্কে টাকা খরচ করা হয় এবং বড় করে 'ওয়ালীমা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি মেহমানদারি করা হয়। আমরা কি এক মুহূর্তের তরেও দ্বিধাস্থিত হয়ে ভেবে দেখেছি যে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রাসূল

৭১১. বৈরুত, লেবানন, মু'আসসাসা আল-শু'বান লি-নাশর ওয়াত-তওয়া'। - মওলিদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর মহান সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এই জাতীয় ব্যাপক আনন্দফুটির অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত ছিলেন কি-না? এছাড়া তাঁরা এরকম ব্যয়বহুল ও ভুরিভোজের আয়োজন করেছিলেন কি-না? পরিহাসের বিষয় হলো, আমাদের সম্মানদের বিয়ের প্রশ্নে আমরা কুরআন ও সুন্নাহের দলিল তালাশ করি না, অথচ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর পবিত্র মীলাদের প্রশ্নে শরঈ দলিল দাবি করার মতো দুঃসাহস দেখাতে মোটেও পিছপা হই না!

৪. খৃষ্টীয় সালের ২৩শে মার্চ তারিখ পাকিস্তান দিবস। এই দিনে স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হয়, যার ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় [শায়খ তাহিরুল ক্বাদেরী একজন পাকিস্তানী, তবে বর্তমানে তিনি কানাডায় বসবাস করেন]। দিবসটি উদযাপনে মনোরম কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয় এবং সরকারি পর্যায়ে এ দিবস পালনে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বৃটিশের কাছ থেকে পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের দিনটি ১৪ই আগস্ট; সেটাও একই পন্থায় উদযাপন করা হয়ে থাকে। এ উপলক্ষে গার্ড অফ অনার, সামরিক কুচকাওয়াজ এবং বিমান ও ট্যাংক বহরের জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনী এক সাধারণ চিত্র হয়ে দাঁড়ায়। ৬ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তান প্রতিরক্ষা দিবস পালনে সেনাবাহিনী দেশটির নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় সাধারণ মানুষের দেখার জন্যে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শনী দেয়। এসব উদযাপন বৈধ হলেও কেউই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর সুন্নাহ হতে এগুলোর ন্যায্যতা প্রতিপাদন করার জন্যে দলিল তালাশ করেন না।

৫. পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও জনক মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেবের জন্মদিবস পালন উপলক্ষে বিদ্যালয়, অফিস-আদালত ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান এমনভাবে বন্ধ থাকে যেনো ঈদ পালন করা হচ্ছে। এ উপলক্ষে মিছিলের আয়োজন করা হয় এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে সংগ্রামকারীদের প্রয়াসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁদের প্রশংসাস্তুতি পাঠের জন্যে কাছের ও দূরের বক্তা ও শিক্ষাবিদমণ্ডলীকে আমন্ত্রণ করা হয়। এসব কার্যক্রমের জন্যে পবিত্র ধর্মশাস্ত্রলিপি থেকে কোনো দলিল খোঁজা হয় না। কেননা আমরা দৃশ্যতঃ এটা ধরে নেই যে উক্ত জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টা স্মরণ করা বাধ্যতামূলক; অথচ জগতসমূহের জন্যে (খোদায়ী) করুণা হিসেবে

প্রেরিত পবিত্র সত্তার (দ.) মীলাদ দিবস পালনের প্রশ্নে হঠাৎ আমাদের কুরআন ও হাদীসের 'দালিলিক প্রমাণ' তালাশের কথা স্মরণ হয়ে যায়; আর আমরা এই দাবিতে একগুঁয়ে মনোভাব গ্রহণ করি। ইমাম আহমদ রেজা খাঁন (রহ.) এই করুণ দশা কী সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন দেখুন:

اور تم پر مرے آقا کی عزت نہ سہی

نجدیو! کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا

তোমরা অযোগ্য আমার আক্বা (দ.)'এর সুবিবেচনা লাভের ক্ষেত্রে
ওহে নজদী! কে ঈমান শিক্ষার অনুগ্রহ করেছেন তাও কি গেলে ভুলে? ৭১২

৬. কোনো বিদেশি কূটনীতিক দেশে এলে তাঁকে স্বাগত জানাতে ২১ বার বন্দুকের (ফাঁকা) গুলি আকাশে ছোঁড়া হয়। এ জন্যে কুরআন ও হাদীসের কোনো দলিল চাওয়া হয় না।

৭. রাষ্ট্রের কোনো শাসক মৃত্যুবরণ করলে তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়; শবযাত্রা, বন্দুকের গুলি ছোঁড়া, ড্রাম বাজানো, পুষ্পমাল্য অর্পণ, সংক্ষেপে এ জাতীয় কর্মসূচিতে খরচ করতে কার্পণ্য করা হয় না। ধর্মীয় বিদ্বানবর্গ ও অন্যরা নির্বিশেষে এসে তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা জানান; কিন্তু কেউই এর বৈধতার প্রশ্নে কোনো ফতোয়া জারি করেন না; এসব কাজের পক্ষে যুক্তি পেশের উদ্দেশ্যে কেউই সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর অথবা তাঁর মহান সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)'বৃন্দের জীবন হতে কোনো উদাহরণ (দলিলস্বরূপ) তালাশ করেন না।

আমরা এ কথা বোঝাতে চাচ্ছি না যে এসব আয়োজন অবৈধ, কেননা এগুলো এমন এক মাধ্যম যা দ্বারা আমরা আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দের সংগ্রাম ও সাধনার প্রতি স্বীকৃতি জানাতে পারি এবং জাতি হিসেবে নিজেদের গর্ব (সারা বিশ্বে) প্রকাশ করতে পারি; তাই এ ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা উচিত। এখানে আমাদের মূল বক্তব্য হলো, যারা সদাসর্বদা মীলাদের পক্ষে (শরঈ) দলিল প্রদর্শনের দাবি উত্থাপন করে থাকে, তারা

কেন এধরনের আয়োজনের পক্ষে দলিল প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না? নীতিগত প্রশ্নে এরকম দ্বৈততা কেন? তারা কি বিস্মৃত হয়েছে মহান আল্লাহ তা‘আলার এই আদেশ সম্পর্কে যে ‘তাঁরই ফযল ও রহমত-প্রাপ্তিতে মুসলমানদের খুশি উদযাপন করা উচিত? আর এই খুশি উদযাপন যে তাঁদেরই জমানো সম্পদের চেয়ে শ্রেয়তর (তাও কি ওই লোকেরা ভুলে গিয়েছে)?’

সমগ্র জগতে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভের ক্ষেত্রে যে পবিত্র সত্তা সবচেয়ে বেশি যোগ্য, তিনি প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তাঁকে ভালোবাসা ঈমানের সারমর্ম; না, বরঞ্চ খোদা ঈমান। ঈমান হচ্ছে অন্তরের একটি অবস্থা যাকে ‘হাল’ বলা হয়। এটা এমন একটা সম্বন্ধ বা সম্পর্ক যার ভিত্তি হলো ভালোবাসা; এটা এমনই প্রেমাত্মক যা হৃদয়ে প্রজ্জ্বল্যমান। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর প্রতি এ ইশক-মহব্বত যখন কোনো মু‘মিনের অন্তরকে প্রজ্জ্বলিত করে, তখন তিনি নিজ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদযাপন করেন এবং তাঁর ঘরদোর সজ্জিত করেন। আমাদের এটা জানা অত্যাবশ্যক যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে তাঁর মাহবুব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর পবিত্র মীলাদ উদযাপন আমাদের আধপোড়া (মানে অসম্পূর্ণ) ইবাদত-বন্দেগীর চেয়েও বেশি পুতঃপবিত্র।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, যারা মীলাদের সমালোচনায় মুখর, এর প্রতি শির্ক ও বিদ‘আতের ফতোয়া ঝাড়তে ব্যস্ত, তারা নিজেদের সন্তানদের পেছনে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করতে একটি বারের জন্যেও কুণ্ঠিত নয়; অথচ যখন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর আশীর্বাদময় মীলাদের সময় সুসমাগত হয়, তখন তারা নিজেরা একটি পয়সা খরচ করতে তো থাকে অনিচ্ছুক, বরঞ্চ অন্যদেরকেও তা ব্যয় করতে বারণ করে থাকে। এ ধরনের লোকদের জানা উচিত যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’র ধরাধামে শুভাগমনের চেয়ে বেশি খুশি ও সুখের কোনো কিছুই নেই; অন্য সব সুখ ও আনন্দ তাঁর শুভাগমন উদযাপনের মোকাবিলায় মূল্যহীন।

১১.৬ মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উদযাপন তওহীদেরই বহিঃপ্রকাশ

এ কথা উপলব্ধি করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ যে মীলাদের উদযাপন বাস্তবিকপক্ষে তওহীদেরই একটি অনুশীলনী/বহিঃপ্রকাশ; এটা আল্লাহর ঐশী একত্বের পক্ষে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দলিলগুলোর একটা; কেননা এতে আমরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করছি যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন আল্লাহ তা‘আলার একজন এবাদতকারী বান্দা এবং তাঁরই মাহবুব তথা প্রিয়তম (ও অনুপম) সৃষ্টি। কারো জন্মদিবস পালন হচ্ছে তাঁর খোদা না হওয়ার চিহ্ন; কারণ আল্লাহ তা‘আলা জন্ম দেন না, জন্ম নেনও না^{৭১৩}। আল্লাহ পাক পয়গাম্বর ইয়াহইয়া (আলাইহিস্ সালাম) সম্পর্কে ঘোষণা করেন:

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ.

—আর শান্তি বর্ষিত হোক ইয়াহইয়ার প্রতি, যেদিন তিনি জন্মলাভ করেছেন।^{৭১৪}

অনুরূপভাবে, পয়গাম্বর ঈসা (আলাইহিস্ সালাম)’এর ভাষ্য আল্লাহ উদ্ধৃত করেন:

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ.

—আর আমার প্রতি শান্তি, যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি।^{৭১৫}

এ কারণেই মীলাদের উদযাপন দ্বারা আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছি যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন আল্লাহ পাকের (অনুপম) সৃষ্টি। সর্বাধিক মর্যাদাবান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর চেয়ে বড় বা শ্রেষ্ঠতর আর কোনো সৃষ্টি নেই। মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)’এর মাহফিল/সমাবেশগুলো ঘোষণা করে থাকে যে আল্লাহ তা‘আলাই স্রষ্টা এবং প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

৭১৩. আল-কুর‘আন, ১১২:৩।

৭১৪. আল-কুর‘আন, ১৯:১৫।

৭১৫. আল-কুর‘আন, ১৯:৩৩।

তাঁরই (অনুপম) সৃষ্টি, যাঁর মীলাদ তথা (ধরণীতলে) শুভাগমন হয়েছিলো। তওহীদের এর চেয়ে বড় বহিঃপ্রকাশ আর হতে পারে কি? দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বিদ'আতী লোকেরা এমন কী তওহীদের এই আত্মরিক অনুশীলনীকেও শির্ক বলে অভিযুক্ত করেছে, যা নিছক ভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়।

১১.৭ মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপলক্ষে অর্থব্যয় করা অপচয় নয়

মীলাদ উপলক্ষে খুশি হয়ে অর্থব্যয় করা অপচয় নয়, কেননা এটা ধার্মিকতাপূর্ণ অনুশীলনী; আর ফিক্বাহবিদ (ধর্মীয় বিধানশাস্ত্রজ্ঞ)-মণ্ডলীর মতানুসারে ধার্মিকতাপূর্ণ কাজে কোনো অপচয় নেই। নিম্নে ফিক্বাহবিদবৃন্দের কিছু (শরঈ) রায়/সিদ্ধান্ত বিধৃত হলো, যাঁদের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব তথা প্রশংসনীয় বিষয়াদিতে অর্থব্যয় করা অপচয় নয়:

১. হযরত হাসান বিন সাহল (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু)'এর পুত্র বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা এমন এক ব্যক্তির দেখা পান যিনি মানুষের মাঝে পানি সরবরাহ করতেন। হযরত হাসান বিন সাহল (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) ওই ব্যক্তিকে তাঁর আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তরে বলেন যে আর্থিক অনটন তাঁকে গ্রাস করেছে, অথচ তিনি কন্যাদায়গ্রস্ত একজন পিতা। হযরত হাসান বিন সাহল (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) ওই ব্যক্তির করুণ দশা দেখে ভীষণ মর্মান্বিত হন এবং তিনি তাঁর জন্যে ১০০০ দিরহাম মঞ্জুরের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু (হিসেবে) ভুলবশতঃ তাঁকে এক লক্ষ দিরহাম মঞ্জুর করা হয়। হযরত হাসান বিন সাহল (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু)'এর স্ত্রী নিজ স্বামীর তরফ থেকে এ রকম সৌজন্যমূলক কাজকে অনুমোদন করতে পারলেন না, তবে তিনি তাঁকে তিরস্কার করতেও লজ্জাবোধ করলেন। অতঃপর গাসসা'ন বিন 'ইবাদ (রা.), যিনি নিজেও একজন উদার ও দানশীল ভদ্রলোক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন, তিনি হযরত হাসান বিন সাহল (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু)'কে তিরস্কার করলেন এ কথা বলে:

أَيُّهَا الْأَمِيرُ! إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

—ওহে নেতা! নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না অপব্যয়ীদের।

হযরত হাসান বিন সাহল (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) উত্তর দেন:

لَيْسَ فِي الْخَيْرِ إِسْرَافٌ.

—উত্তম কর্মে কোনো অপচয় নেই।

অতঃপর হযরত হাসান বিন সাহল (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) ওই বৃদ্ধ ব্যক্তির দুঃখদুর্দশার কথা বর্ণনা করেন এবং বলেন:

وَاللَّهُ! لَا رَجْعُ عَنْ شَيْءٍ خَطَّئُهُ يَدِي.

—আল্লাহর নামে শপথ করছি, আমি আমার হাতে যা মঞ্জুর করেছি, তা ফেরত নেবো না।^{৭১৬}

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন:

لَيْسَ فِي الْحَلَالِ إِسْرَافٌ، وَإِنَّمَا السَّرْفُ فِي ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي.

—বৈধ বস্তুতে বা বিষয়ে অপচয় নেই। অপচয় কেবল অবাধ্যতায় নিহিত।^{৭১৭}

৩. হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

الْحَلَالُ لَا يَحْتَمِلُ السَّرْفَ.

—হালাল বিষয়াদিতে অপচয়ের সম্ভাবনা নেই।^{৭১৮}

ওপরের সিদ্ধান্তগুলো স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে দান-সদকায় ও নেক-কর্মে যতোই খরচ করা হোক না কেন, তা অপব্যয় হিসেবে কখনোই পরিগণিত

৭১৬. ইবনে জওবী, 'আল-মুনতায়াম ফী তারীখ আল-মুলুক ওয়াল-উমাম,' ১১:২৪০-২৪১ #১৩৯২; খতীব বাগদাদী, 'তারীখ বাগদাদ,' ৭:৩২২; এবং ইবনে জারাদা, 'বুগইয়া আল-তলব ফী তারীখ হালাব,' ৫:২৩৮৬।

৭১৭. শারবীনী, 'মুগনী আল-মুহতা'জ ইলা মা'রিফাত মা'আনী আলফায় আর-মিনহা'জ,' ১:৩৯৩; এবং দামইয়া'তী, 'ই'য়ানাত আল-তা'লিবীন,' ২:১৫৭।

৭১৮. আবু নুয়াইম, হিলইয়াত আল-আউলিয়া ওয়া তাবাক্বাত আল-আসফিয়া', ৬:৩৮২; শারবীনী, 'মুগনী আল-মুহতা'জ ইলা মা'রিফাত মা'আনী আলফায় আর-মিনহা'জ,' ১:৩৯৩; এবং দামইয়া'তী, 'ই'য়ানাত আল-তা'লিবীন,' ২:১৫৭।

হযরত আবু ওয়াদ্লিল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন: আমি একবার কা'বা শরীফের কাছে হযরত শায়বাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)'এর পাশে চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলাম; অতঃপর তিনি বলেন, 'এখানেই (খলীফা) উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বসতেন। আমি নিয়ত করেছি কা'বা শরীফের সম্পদ বণ্টন করবো।' আমি তাঁকে বললাম, 'কিন্তু আপনার দু জন साथী (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এই রকম করেননি।' হযরত শায়বাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উত্তর দেন, 'তাই যদি হয়, তাহলে তাঁদের পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করা আমার জন্যে বাধ্যতামূলক হবে (মানে আমি এ সম্পদ বণ্টন করবো না)।' ৭১৯

ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালা'নী (৭৭৩-৮৫২ হিজরী) কা'বা শরীফের সম্পদ বণ্টন না করার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:

-এতে নিহিত রয়েছে দ্বীন-ইসলামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং শত্রুদের মাঝে ভীতির সঞ্চার।^{৭২০}

৭১৯. আল-বুখারী, সহীহ: কিতাবুল হজ্জ্ব, কা'বা শরীফের আচ্ছাদন শীর্ষক অধ্যায়, ২:৫৭৮
#১৫১৭; আল-বুখারী, সহীহ: কিতাবুল-ই-তিসাম বিল-কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ,
রাসূলুল্লাহ (দ.)'এর সুন্নাহের অনুসরণ/অনুকরণ শীর্ষক অধ্যায়, ৬:২৬৫৫ #৬৮৪৭;
আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৩:৪১০; আহু তাবারানী, আল-মু'জামুল কবীর,
৭:৩০০ #৭১৯৬; এবং আল-বায়হাক্বী, আস সুন্নান-উল-কুবরা', ৫:১৫৯ #৯৫১১।

৭২০. আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৩:৪৫৭।

—ইমাম তক্বীউদ্দীন সুবকী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এই হাদীসটিকে কা'বা শরীফে ও মসজিদে নববীতে স্বর্ণ এবং রৌপ্যনির্মিত ফানুসের প্রদীপ ঝালানোর পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন।^{৭২১}

কা'বা শরীফের আচ্ছাদন সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) লেখেন:

—কা'বা শরীফকে বুটিদার রেশমি বস্ত্র দ্বারা আবৃত করার পক্ষে (ইমাম/উলামার) ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৭২২

কাজী যাইনউদ্দীন আবদুল বাসিত (রহ.) কে কা'বা শরীফের আচ্ছাদন ডিজাইন করার জন্যে শাহী এক ফরমান দেয়া হয়, যার দায়িত্ব তিনি সুদক্ষ ও সুচারুভাবে পালন করেন। ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালা'নী (৭৭৩-৮৫২ হিজরী) এই ব্যাপারে বিবৃত করেন:

بَسَطَ اللَّهُ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَعُمُرِهِ، فَبَالَغَ فِي تَحْسِينِهَا حَيْثُ يَعْجُزُ الْوَاصِفُ عَنْ صِفَةِ حُسْنِهَا، جَزَاهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ أَفْضَلَ الْمَجَازَةِ.

—আল্লাহ তাঁর রিযিক ও বয়স বহুগুণ বাড়িয়ে দিন, কেননা (কা'বা শরীফ অলঙ্করণের) এই সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনাতীত। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কার মঞ্জুর করুন। ৭২৩

অতএব, আমরা এ সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে কা'বা শরীফকে দামী বস্ত্রাবৃতকরণ এবং দুটো পবিত্র মসজিদকে স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত প্রদীপ এবং ঝাড়বাতি দ্বারা অলঙ্করণের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের অন্তরে ভীতির

৭২১. প্রাপ্ত ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী কৃত ‘ফাতহুল বারী’।

৭২২. প্রাগুক্ত ফাতহুল বারী ।

৭২৩. প্রাণ্ডক ফাতহুল বারী, ৩:৪৬০।

সম্পন্ন করা কিংবা এ ধর্মের শৌর্য ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য। এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে সবচেয়ে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মীলাদ (দিবস) উপলক্ষে আমাদের রাস্তাঘাট, মসজিদ ও ঘরবাড়ি সাজানোর মাধ্যমে আমরা নিজেদের আন্তরিক আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে কীভাবে তা অবৈধ বা না-জায়েয হতে পারে? প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) না হলে গোটা সৃষ্টি জগৎ অস্তিত্বই পেতো না। তিনি-ই সমগ্র সৃষ্টিকুলের অন্তরাত্মা তথা প্রাণস্পন্দন। তাঁর কারণেই আমরা কা'বা শরীফ পেয়েছি। যদি কা'বা শরীফকে দামী বস্ত্র ও স্বর্ণের প্রদীপ দ্বারা সাজানো বৈধ হয়, তাহলে কারো পক্ষে এ তর্ক করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মীলাদ দিবসে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, মসজিদ ইত্যাদি সাজানো এবং আলোকসজ্জা করা যে কোনোভাবেই হারাম/অবৈধ? বস্তুতঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মীলাদ (দিবস) উপলক্ষে অলঙ্করণের আয়োজন করা একটি গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসনীয় বিষয়।

১১.৯ মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাহফিল আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা

এই গ্রন্থজুড়ে আমরা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছি যে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মীলাদ দিবস পালন করা একটি প্রশংসনীয় আমল বা অনুশীলনী, যা অবশ্যাবশ্য পুরস্কৃত হবে। তবে এ কথা স্মরণে রাখা জরুরি যে মীলাদের সকল দিক আন্তরিক ও বৈধ পন্থায় যতোক্ষণ না পালন করা হবে, ততোক্ষণ এই খুশির উৎসবের সম্ভাব্য নেয়ামত-আশীর্বাদ হতে আমরা বঞ্চিত হবো। মীলাদের মজলিশগুলো যাতে বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয় দিক থেকে খাঁটি নিয়ত সহকারে কোনো রকম দোষত্রুটি ছাড়াই পালন করা যায় তা নিশ্চিত করতে হবে; নতুবা মীলাদের অন্তর্ভুক্ত ধারণাকৃত সমস্ত ধর্মীয় আমল পালন করেও আমরা আল্লাহ তা'আলার গয়ব-আযাব ও তাঁরই সবচেয়ে সম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর না-রাজি অর্জন করে বসতে পারি।

মীলাদ অনুষ্ঠান মাহফিলের আকারে হোক অথবা জুলূসের আকারেই হোক, এর লক্ষ্য যেহেতু সবচেয়ে মর্যাদাবান রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন, সেহেতু প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যাহেরী জিন্দেগীতে যেমনটি আদবকায়দা ও পবিত্রতা রক্ষা করা হতো ঠিক তেমনিভাবেই তা রক্ষা করা অত্যাবশ্যক হবে। কোনো রকম নেতিবাচক বা অবৈধ কর্ম যাতে সংঘটিত না হতে পারে, তা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। এর পাশাপাশি, এসব পবিত্র মাহফিলের আয়োজন, তবারুক/খাদ্য বিতরণ, দান-সদকাহ, ওয়াজ-নসীহত এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ড যা মহা ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে করা হয়, তা কেবল আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রেযামন্দির খাতিরেই করা উচিত। হাদীসসমূহ আমাদেরকে জ্ঞাত করে যে আমাদের সালাত-সালাম ও সম্ভাষণের পাশাপাশি আমাদের আমলনামাও সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় পেশ করা হয়; তিনি তাতে উত্তম কিছু দেখলে খুশি হন, অথচ আমরা কোনো মন্দ কাজ করলে তিনি দুঃখভারাক্রান্ত হন।^{৭২৪}

মীলাদের ক্ষেত্রেও কোনো ব্যতিক্রম নেই। সবচেয়ে সম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিছক আনন্দের কথা একটু ভাবুন, যদি তাঁকে জানানো হয় যে তাঁর অনুগত ও নিবেদিত সেবকবৃন্দ তাঁরই মীলাদ দিবস উদযাপনে মাহফিলের আয়োজন করেছেন এবং তাঁকে দুনিয়াতে প্রেরণের জন্যে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এ কাজটি খাঁটি নিয়ত ও আন্তরিকতা সহকারে না করলে আল্লাহ তা'আলা

৭২৪. আল-বায়হার, 'আল-বাহর আল-যুখার' (আল-মুসনাদ), ৫:৩০৮-৩০৯ #১৯২৫; ইবনে আবী উসামা তাঁর 'মুসনাদ আল-হারিস', ২:৮৮৪ #৯৫৩ গ্রন্থে এটা সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন; হাকিম তিরমিযী, 'নওয়া'দির আল-উসূল ফী আযা'দীসি রাসূল', ৪:১৭৬; আদ দায়লামী, 'আল-ফিরদৌস বি-মা'সূর-ইল-খিতাব', ১:১৮৩ #৬৮৬; কাজী আয়াজ, 'আশ শিফা বি তা'রিফে হুকুক আল-মোস্তফা', ১:১৯; আল-হায়সামী মক্কী নিজ 'মজমাউয্ যওয়াঈদ ওয়া মামবা'আ আল-ফওয়াইদ', ৯:২৪ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে এই হাদীসটি আল-বায়হার বর্ণনা করেছেন এবং এর সকল বর্ণনাকারীই সিক্কা তথা বিশ্বস্ত; ইবনে কাসীর, 'আল-বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া', ৪:২৫৭; এবং আবুল ফযল ইরাকী আপন 'তারছুল তাসরীব ফী শরহিল তাকরীব' ৩:২৯৭ গ্রন্থে ঘোষণা করেছেন যে এই হাদীসের সনদ সহীহ।

কীভাবে তাঁর ঐশী করুণা দ্বারা এটাকে আশীর্বাদধন্য করবেন? আমাদের জন্যে এটা একটা ভাববার বিষয় বটে। এই উপলক্ষে আমাদের সম্পদ অকৃপণ হস্তে খরচ করলেই তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্বীকৃতি নিশ্চিত করবে না, যদি আন্তরিকতা ও খাঁটি নিয়্যত তাতে না থাকে। এ কারণেই সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি প্রকৃত প্রেম-ভক্তি ও শ্রদ্ধাই আমাদের আমলগুলোর গৃহীত হবার প্রাথমিক পূর্বশর্ত।

আন্তরিকতার পাশাপাশি, আত্মিক ও বাহ্যিক পবিত্রতা বজায় রাখাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। স্বয়ং প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তাঁর জাহেরী হায়াতে জিন্দেগীর সময়ে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা যেমন একটা চিন্তা ছিলো, এই একই মূল্যবোধের প্রতিফলন মীলাদ মাহফিলগুলোতেও তেমনি হওয়া চাই, যেহেতু এগুলো মূলতঃ তাঁরই সম্মানে আয়োজিত হচ্ছে। প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রুহানী উপস্থিতি দ্বারা হয়তো মাহফিলগুলোকে সুশোভিত করতেও পারেন। নিম্নবর্ণিত উপাখ্যানগুলো এই বাস্তবতাকে প্রতিফলন করে:

লেখকের (মানে ড: তাহিরুল ক্বাদেরী সাহেবের) পিতা ড: ফরিদউদ্দীন ক্বাদেরী সাহেব একটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা মৌলভী আবদুল হাই লাখনভীর সাথে সম্পর্কিত। মৌলভী লাখনভী হুজ্জা টানতে অভ্যস্ত ছিলেন। একবার হুজ্জা টেনে মুখে কুলি না করেই তিনি এক মীলাদের মজলিশে হাজির হন। সেখানে তাঁর মুখ থেকে হুজ্জার গন্ধ বের হতে থাকে। সেই রাতে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্বপ্নে আগমন করেন এবং বলেন, “ওহে আবদুল হাই, তুমি আমাদের মজলিশে হুজ্জার গন্ধ মুখে নিয়ে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারটি অনুভব করতে পেরেছো কি?”

প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মনমানসিকতা এতোখানি ধার্মিক, নির্মল ও সুরুচির ছিলো যে তিনি তাঁর মহান সাহাবা কেলাম (রা.) কে পৈঁয়াজ ও রসুন খেয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছিলেন,

যাতে তাঁদের মুখ থেকে দুর্গন্ধ না বেরোয় এবং ফলশ্রুতিতে অন্যান্য এবাদতকারীর (এবাদতে) ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে।^{৭২৫}

অনুরূপভাবে, এমন অনেক বর্ণনা বিদ্যমান, যাতে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর যাহেরী জিন্দেগীতে এবং বেসালপ্রাপ্তির পরেও শরঈ বিধিবিধানের ও ইশারা/ইঙ্গিতের আকারে দুর্গন্ধ ছড়ানো যাবতীয় বস্তুকে নিষিদ্ধ করেছেন। শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহেলভী (১১১৪-১১৭৪ হিজরী) নিজ ‘আল-দুর্রুস সামীন ফী মুবাশিরা’ তিন নবী আল-আমীন শীর্ষক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ২৮তম হাদীসটিতে তাঁর পিতা শাহ আবদুর রহীম (১০৫৪-১১৩১ হিজরী) বর্ণিত একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেন। তিনি বর্ণনা করেন:

একবার দু জন ধার্মিক ব্যক্তি (যাঁদের একজন আলেম ও আবেদ এবং অপরজন শ্রেফ আবেদ) সর্বাধিক সম্মানিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে একই সময়ে স্বপ্নে দেখার মহাসম্মান লাভ করেন। তবে কেবল আবেদ ব্যক্তিকেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র উপস্থিতিতে উপবেশনের অনুমতি দেয়া হয়। এই ধার্মিক ব্যক্তি এতে বিভ্রান্তিতে পড়েন এবং জিজ্ঞেস করেন কেন ওই (পুণ্যবান) আলেম ব্যক্তি এই বিশেষাধিকার হতে বঞ্চিত হন। তাঁকে জানানো হয় যে পুণ্যবান আলেম ব্যক্তিটি তামাক সেবন করতেন, যা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অপছন্দ ছিলো। পরের দিন আবেদ ব্যক্তিটি ওই আলেমকে দেখতে যান এবং তাঁকে নিজের বিশেষাধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণে অব্বোরে ক্রন্দনরত দেখতে পান। তিনি যখন উপলব্ধি করতে পারেন যে তামাক সেবনই তাঁর এ মহাসম্মান লাভে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তৎক্ষণাৎ তিনি তা সেবন বাদ দেন এবং এই ক্ষতিকর অভ্যেস পরিত্যাগ করেন। পরের রাতে উভয় ব্যক্তি আব্বোরে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে স্বপ্নে দেখার চমৎকার সুযোগ লাভ করেন। এবার ওই পুণ্যবান আলেম ব্যক্তি কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সান্নিধ্য লাভ করেই ধন্য হলেন না, বরং সৃষ্টিকুল

৭২৫. সহীহ মুসলিম, ‘কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদী আস্ সালাহ,’ ‘পিয়াজ, রসুন ইত্যাদি ভক্ষণে নিষেধাজ্ঞা’ শীর্ষক অধ্যায়, ১:৩৯৪ #৫৬১; এবং সুনানে আবী দাউদ, ‘কিতাবুল আতজ্জমা,’ ‘পিয়াজ ভক্ষণ’ শীর্ষক অধ্যায়, ৩:১৬০-১৬১ #৩৮২৪-৩৮২৫।

শিরোমণি স্বয়ং প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর পাশে বসার সৌভাগ্যও অর্জন করলেন।^{৭২৬}

১১.১০ যেসব দিক সংস্কারের প্রয়োজন

সর্বোচ্চ মর্যাদাবান রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর বরকতময় মীলাদের প্রতি অন্তরের ভালোবাসা ও ভক্তি নিয়ে যে সকল মানুষ মীলাদের আয়োজন করেন কিংবা তাতে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর আশীর্বাদময় মীলাদের উদযাপনকে ঈমানের অংশ বিবেচনা করেন, তাঁরা সত্যি সৌভাগ্যবান। এগুলোর সবই সত্য ও সঠিক, কিন্তু তবুও তাঁদের এটা বিবেচনায় নেয়া জরুরি যে এ ঈমানদারির পূর্বশর্ত হচ্ছে মৌলিক শর্তাবলীর পূরণ। হায়! শুধু যদি এ সকল মানুষ প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর শিক্ষা ও তাঁর দরবারের আদব-কায়দা সম্পর্কে সম্যক অবগত হতেন (কতোই না ভালো হতো তবে)!

এসব বরকতময় উপলক্ষগুলো হতে নেয়ামত-আশীর্বাদ লাভের খাতিরে প্রত্যেকের কেবল সেসব মীলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণ করা উচিত, যেগুলো শরীয়তগর্হিত কাজ হতে মুক্ত। পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমান যুগে কতিপয় মূর্থ লোক আল্লাহ তা'আলার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের আচার-আচরণ সম্পর্কে অনবধান হয়ে এসব বরকতময় ও নেয়ামতপূর্ণ মাহফিলগুলোকে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা দ্বারা কলুষিত করেছে। এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা নির্বুদ্ধিতার ও প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের পরিচায়ক। ড্রাম বাজিয়ে অশ্লীল গান পরিবেশন, যুব সম্প্রদায়ের উদ্দাম নৃত্য এবং নারী-পুরুষের অনিয়ন্ত্রিত মেলামেশাকে নিন্দা করতে হবে; এ জাতীয় কর্মকাণ্ড সবচেয়ে সম্মানিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সারমর্মকেই নাকচ করে দেয়। এই অবৈধ আচরণকে দূর করতে হলে মীলাদের প্রতি সমালোচকদের বিরোধিতা করার কোনো ন্যায্যতা বা অজুহাত থাকা চলবে না।

৭২৬. শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী, 'আল-দুর্রুস সামীন ফী মুবাশিরা'তিন্ নবী আল-আমীন', ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা।

অতএব, এরকম অবাধ্যতার জন্যে দায়ী লোকদেরকে আশীর্বাদময় মাহফিলগুলো বরবাদ না করার জন্যে সতর্ক করা আমাদের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে; নতুবা এ জাতীয় পবিত্র ও পুণ্যময় আয়োজন নিছক আচারে পরিণত হবে আর এগুলোতে বরকত/আশীর্বাদ তিরোহিত হবে। আমরা কখনোই খোদা তা'আলার সন্তুষ্টি ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর অনুগ্রহ ততোক্ষণ পাবো না, যতোক্ষণ না আমরা মীলাদ মাহফিল ও জশনে জুলুস অনুষ্ঠানগুলোকে পাপময় আচার থেকে পৃথক করছি। এসব ঘণিত আচার-আচরণ দূর করা না গেলে সেগুলো খোদায়ী গযব-আযাবের কারণ হবে (নিঃসন্দেহে)।

এ এক করুণ পরিস্থিতি যে এই সব ভয়ঙ্কর আচার-আচরণের সমালোচনা এবং এগুলো রোধ করতে সরকার কিংবা কর্তৃপক্ষ তেমন কোনো চেষ্টা করছেন না। বোধ হয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নীরবতা ও নিক্রিয়তা - ইল্লা মা' শা'আল্লাহ - তাদেরই ব্যক্তিগত ফায়দার লোভের ফলশ্রুতি। সম্ভবত এ কারণে অনেকে চোখ বন্ধ করে রেখেছে সেসব বিষয়ের প্রতি, যেগুলোকে জোরালোভাবে জনসমক্ষে নিন্দা করা উচিত; তারা হয়তো আশঙ্কা করে যে এই অনাচারগুলোকে কড়াভাবে প্রতিহত করলে মানুষেরা ওই সব মাহফিলে যোগ দেয়া বন্ধ করে দেবেন এবং এরই ফলস্বরূপ তাদের (ধর্মোপদেশমূলক) ভাষণ হতে প্রাপ্ত সম্পদ ও সুনামে এবং অনুষ্ঠানের স্পনসারশিপ-এও ভাটা পড়তে পারে। তাদের নীরবতা ও নিক্রিয়তার পেছনে যদি পার্থিব লাভই কারণ হয়ে থাকে, তাহলে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর মীলাদ দিবস হতে নির্লজ্জভাবে সুবিধা গ্রহণের মতো কতোখানি ঘণিত দুরবস্থায় যে তারা অধঃপতিত তা বলাই বাহুল্য!

সরকারের আর চুপ করে বসে থাকা উচিত নয়। এসব ভুলত্রুটি শুধরানো নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা নেয়া অত্যাৱশ্যক। সরকার (রাজনৈতিক) বিরোধিতার মুখে পড়লে প্রশাসনযন্ত্র তা নির্দয়ভাবে দমনে তৎপর হয় এবং বিরোধীদের কারারুদ্ধ করে থাকে; অথচ মীলাদ ও উরস মাহফিলের নামে কতিপয় নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত ব্যক্তি অগ্রহণযোগ্য নাচ-গানবাদ্য ও সার্কাস প্রকাশ্যে আয়োজনের সুযোগ গ্রহণের দ্বারা আউলিয়া কেরাম (রহমতুল্লাহি আলাইহিম)'এর পবিত্র শিক্ষার বিরোধিতা করলেও সরকার

সংস্কারমূলক কোনো পদক্ষেপ নেয় না কেনো? রাষ্ট্রপক্ষকে এসব অধার্মিকতার প্রসার নির্বিল্পে চলতে দেয়ার মুখ্য দায়ভার বহন করতে হবে, কেননা এই অবৈধ কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে আইনি ব্যবস্থা নিতে তারা অস্বীকার করেছে। এ ধরনের অনৈতিক ও অগ্রহণযোগ্য আচরণ যাতে ভবিষ্যতে আর না হয়, সে লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের আশু ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

উরস্ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করা এবং আল্লাহর প্রিয় আউলিয়া (রহ.)'বৃন্দের শিক্ষাসমূহের সাথে পরিচিত হওয়া। মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর জশনে জুলুস-গুলো আয়োজিত হয় প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর প্রশংসাস্তুতির জন্যে; আর তাঁর স্বকীয় গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা এবং শরীয়ত মোতাবেক বরকতময় মীলাদ উদযাপনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু হায়! অন্তরের কতো বেদনাময় নিম্নের ফার্সী এই বাণী:

حقیقت حرافات میں گھوئی
یہ امت روایت میں گھوئی

বিকৃতির মাঝে আসল উদ্দেশ্য গেছে হারিয়ে
এ উম্মত বিভ্রান্ত আজ জালিয়াতির অতল গহ্বরে।^{৭২৭} [ভাবানুবাদ]

ধর্মের নিদর্শনগুলোকে কতিপয় ব্যক্তি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে, অথচ সরকার ও চিন্তাশীল মানুষ রয়েছেন নীরব।

১১.১১ বাড়াবাড়ি এড়িয়ে চলার আবশ্যিকতা

আজকে উম্মাতের করুণ দশা এই যে, তাঁরা দুটো চরম পন্থায় বিভক্ত: একটি চরম পন্থা মীলাদকে নিষিদ্ধ বিদ'আত বলে সরাসরি এর তিরস্কার তীব্রভাবে করে থাকে; আর অপর চরম পন্থা - ইল্লা মা' শা'আল্লাহ - এ মাহফিল থেকে কিছুই অর্জন করতে পারে না, কেবল হারাম/অবৈধ কর্মকাণ্ডের আলামত ছাড়া, যার দরুন ফযীলতের একটি আমলের ভাবমূর্তি চরমভাবে কলুষিত করা হচ্ছে। এক্ষণে অতীব প্রয়োজনীয় হলো উভয়

পক্ষের জন্যে বাড়াবাড়ি পরিত্যাগ করা এবং এর বিকল্পস্বরূপ ভারসাম্য রক্ষা করা এবং ধৈর্যশীল হওয়া। এই উম্মত 'মীলাদ' ও 'সীরাত', এ দুটো ব্যানারের নিচে আশঙ্কাজনকভাবে বিভক্ত হয়েছেন, আর উভয় দলই একে অপরকে তিরস্কার করছেন বিদ'আতী ও অজ্ঞমূর্খ বলে। এতে হিতে বিপরীত হবে এবং এটা অবাস্তবও; সীরাত কীভাবে রূপায়িত হতে পারতো যদি মীলাদ না হতো? একইভাবে, সীরাতের রেফারেন্স ছাড়া মীলাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই বা কীভাবে বাস্তবায়িত হতো? মীলাদ ও সীরাত হচ্ছে একই মুদার এপিঠ-ওপিঠ এই জন্যে যে, দুটোই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর যিকর-তায়কিরাহ, প্রশংসাস্তুতি ও ভালোবাসায় অসীলস্বরূপ। তাই এগুলোকে একটি প্রদীপের দুটো রশ্মি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। মীলাদকে আধুনিক যুগের সৃষ্টি মনে করে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা চলবে না; পক্ষান্তরে, এটাকে কল্লকাহিনি, অসৎ ও নিষিদ্ধ রুসুম-রেওয়াজ প্রচার-প্রসারের হাতিয়ারও বানানো চলবে না।

মীলাদ মাহফিলগুলোতে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ অযু অবস্থায় উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়; আর তাঁদের অন্তর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর প্রতি এশক্ব-মহব্বত দ্বারা পরিপূর্ণ থাকা উচিত। মীলাদের অনুষ্ঠান সুশোভিত হওয়া উচিত সবচেয়ে দয়াবান প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর সীরাত মোবারকের নানা বর্ণনা দ্বারা, যা তাঁর বর্ণনাতে সৌন্দর্যের ও প্রিয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রতি অংশগ্রহণকারীদের অন্তর ও মস্তিষ্কে আকর্ষণ করবে। তাঁর মোবারক যাত/সত্তার প্রতি আবেগ-উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ প্রশংসাস্তুতির সুরমূর্ছনা মীলাদ মাহফিলের পরিবেশে প্রতিধ্বনিত হওয়া উচিত। এটাই হওয়া চাই প্রত্যেক মুসলমানের আন্তরিক প্রচেষ্টা। সংস্কার ও পুনর্জাগরণের অতি প্রয়োজনীয় সমাধান একমাত্র এ পথেই, যা উম্মতকে চূড়ান্ত সাফল্য ও পরিভ্রাণের দিকে পরিচালনা করবে। নইলে মুসলিম আলেম-উলামা ও প্রচারকবৃন্দ এ দুটো বাস্তবতা তথা মীলাদ ও সীরাতের মাঝে বিভক্তিরেখা টানা অব্যাহত রাখলে সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ ও সঠিক পথের দিকে পরিচালিত হবেন কীভাবে?

এসব আলেম ও প্রচারক যদি দ্বীন হেফাযত এবং প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রশ্নে আন্তরিক হন, তাহলে প্রত্যেক ধরনের বিদ'আত এবং অবৈধ অভ্যেস ও প্রথার বিরুদ্ধে

বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের আঞ্জাম দেয়ার দায়িত্ব তাঁদের কাঁধে বর্তায়। এই মাহফিলগুলোতে অনুপ্রবিষ্ট অনৈতিক উপাদানগুলো অপসারণ করে এগুলোর পবিত্রতা রক্ষার্থে নজরদারি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সরকারেরও দায়বদ্ধতা রয়েছে। এই পবিত্র উপলক্ষকে অনুচিত ফুর্তি দ্বারা কলুষিত করতে কেউ দুঃসাহস দেখালে তাকে যথাবিহিত শাস্তি বিধান করতে হবে।

আল্লাহ তা‘আলার দরবারে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)‘এর ওয়াস্তে আমরা প্রার্থনা করি যেনো তিনি আমাদের করুণ দশা হতে আত্ম-সংশোধন লাভে তাঁরই অফুরন্ত দয়া ও করুণা আমাদের প্রতি মঞ্জুর করেন; মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)‘এর উদযাপনের অসীলায় আমরা যেনো আল্লাহ পাকের রহমত-বরকত লাভ করি; প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)‘এর সীরাত মোবারক থেকে আমরা যেনো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শিক্ষা গ্রহণ করি এবং এর পাশাপাশি সকল ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে দূরে সরে থাকতে পারি, আমীন বি-জা‘হি সাইয়েদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

সমাপ্ত

[বঙ্গানুবাদকের নোট: সীরাত মানে জীবনী, সীরাতুন্নবী মাহফিল নয়]

প্রমাণপঞ্জী

১. আল-কুরআনুল হাকীম;
২. আমদী : সাইফুদ্দীন আবুল হাসান আলী বিন আবি আলী বিন মুহাম্মদ (৫৫১-৬৩১হি./১১৫৬-১২৩৩ খ্রি.) আল আহকাম ফী উসুলিল আহকাম, বৈরত, লেবনান, দারুল কিতাব আল ইলমিয়া, ১৪০০হি./১৯৮০খ্রি.;
৩. ইবনে আবি শায়বাহ : আবু বকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম বিন উসমান কুফী (১৫৯-২৩৫হি./৭৭২-৮৪৯খ্রি.) আল মুসান্নাফ, রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯হি.;
৪. ইবনে আবি আসেম : আবু বকর বিন উমর বিন দ্বিহাক বিন মখলদ শায়বানী (২০৬-২৮৭হি./৮২২-৯০০খ্রি.) আয যুহদ, কায়রো, মিসর, দারুল রায়ান লিত তুরাস, ১৪০৮হি.;
৫. ইবনে আবি আসেম : আবু বকর বিন উমর বিন দ্বিহাক বিন মখলদ শায়বানী (২০৬-২৮৭হি./৮২২-৯০০খ্রি.) আস সুন্নাহ, বৈরত, লেবনান, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০০হি.;
৬. ইবনুল আসীর : আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল করিম বিন আবদুল ওয়াহিদ শায়বানী জায়রী (৫৫৫-৬৩০হি./১১৬০-১২৩৩খ্রি.), উসদুল গাবাহ ফী মারিয়াতিস সাহাবাহ, বৈরত, লেবনান, দারুল কিতাব আল আলমিয়া;
৭. ইবনুল আসীর : আবুল হোসাইন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল করিম বিন আবদুল উয়াহেদ শায়বানী জায়রাযী (৫৫৫-৬৩০হি./১১৬০-১২৩৩খ্রি.), আল কামেল ফিত তারিখ, বৈরত, লেবনান, দারুল সদর;
৮. ইবনে তাইমিয়া : আহমদ ইবনে আবদুল হালীম আবদুস সালাম হারানী (৬৬১-৭২৮হি./১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.) : আস সারেমুল মাসলুল, বৈরত, লেবনান, দারুল ইবনে হাযম, ১৪১৭হি.;
৯. ইবনে জারুদ : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবন আলী ইবন জারুদ নিশাপুরী (৩০৭ হি.) : আল মুনতাক্বা মিনাস সুনানিল মুসনাদাহ, বৈরত, লেবনান, মুআস্সাসাতুল কিতাবিছ ছাকফিয়াহ, ১৪১৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.;
১০. ইবনে জা‘দ : আবুল হাসান আলী ইবনে জা‘দ ইবন ‘উবায়দ জাওহারী, হাশেমী (১৩৩-২৩০ হি./৭৫০-৮৪৫ খ্রি.) : আল-মুসনাদ, বৈরত, লেবনান, মুয়াস্সাসাতুল নাদের, ১৪১০ হি./১৯৯০ খ্রি.;
১১. ইবনে জাওযী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবায়দুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ খ্রি.) : সাফওয়াতুস সাফওয়া, বৈরত, লেবনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৯ হি./১৯৮৯খ্রি.;
১২. ইবনে জাওযী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে উবায়দুল্লাহ (৫১০-৫৭৯ হি./১১১৬-১২০১ খ্রি.) : আল মুনতাহিম ফী তারিখিল মুলুকী ওয়াল উমাম, বৈরত, লেবনান, দারুল সদর, ১৩৫৮হি.;

১৩. ইবনে হিব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ ইং) : আস্ সহীহ, বৈরুত, লেবনান, মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.;
১৪. ইবনে হায়্যান : আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন জা'ফর বিন মুহাম্মদ বিন হায়্যান আবু মুহাম্মদ আল আনসারী (২৭৪-৩৬৯হি.) **তাবকাভুল মুহাদ্দিসীন বি আসবাহন ওয়াল ওয়ারিদীন আলায়হা**, বৈরুত, লেবনান, মুআস্সাসাতুর রিসালা, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি.;
১৫. ইবনে হায়র আসকালানী : আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন আহমদ কিনানী (৭৭৩-৮৫২হি./১৩৭২-১৪৪৯খ্রি.) **আল ইসাবাহ ফী তামিযিস সাহাবাহ**, বৈরুত, লেবনান, দারুল জায়ল, ১৪১২হি./১৯৯২খ্রি.;
১৬. ইবনে হায়র আসকালানী : আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন আহমদ কিনানী (৭৭৩-৮৫২হি./১৩৭২-১৪৪৯খ্রি.) **তাহযিবুত তাহযিব**, বৈরুত, লেবনান, দারুল ফিকর, ১৪০৪হি./১৯৮৪খ্রি.;
১৭. ইবনে হাজর আসকালানী : আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন আহমদ কিনানী (৭৭৩-৮৫২হি./১৩৭২-১৪৪৯খ্রি.) **ফতহুল বারী**, লাহোর, পাকিস্তান, দারুল নাশরিল কুতুব আল ইসলামিয়া, ১৪০১হি./১৯৮১খ্রি.;
১৮. ইবনে হাজর আসকালানী : আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন আহমদ কিনানী (৭৭৩-৮৫২হি./১৩৭২-১৪৪৯খ্রি.) **লিসানুল মিন্যান**, বৈরুত, লেবনান, মুআস্সাসাতুল আ'লামী লিল মাতবু, ১৪০৬হি./১৯৮৬খ্রি.;
১৯. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি./১৩৭২-১৪৪৯ খ্রি.) : **আল মাতালিবুল 'আলিয়া**, বৈরুত, লেবনান, দারুল মা'রিফা, ১৪০৭হি./১৯৭৮খ্রি.;
২০. ইবনে হায়ম : আলী ইবনে আহমদ ইবনে ইবনে সা'ঈদ আন্দলুসী (৩৮৪-৪৫৬ হি./৯৯৪-১০৬৪ খ্রি.), **আল আহকাম ফী উসুলিল আহকাম**, ফায়সালাবাদ, পাকিস্তান, দিয়ায়ুস সুন্নাহ এদারাতুত তরজুমা'তু ওয়াত তা'রিফ, ১৪০৪হি.;
২১. ইবনে হায়ম : আলী ইবনে আহমদ ইবনে ইবনে সা'ঈদ ইবনে হায়ম আন্দলুসী (৩৮৪-৪৫৬ হি./৯৯৪-১০৬৪ খ্রি.), **আল মুহল্লা**, বৈরুত, লেবনান, দারুল আফাক আজ-জাদিদ;
২২. ইবনে খুযায়মা : আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (২২৩-৩১১ হি./৮৩৮-৯২৪ খ্রি.) : **আস-সহীহ**, বৈরুত, লেবনান, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯০ হি./১৯৭০ ইং;
২৩. ইবনে রাহওয়াই : আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে ইবরাহিম ইবনে মাখলাদ ইবনে ইবরাহিম ইবনে আবদুল্লাহ (১৬১-২৩৭ হি./৭৭৮-৮৫১ খ্রি.) : **আল-মুসনাদ**, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল ঈমান, ১৪১২ হি./১৯৯১ খ্রি.;
২৪. ইবনে রজব হাম্বলী : আবুল ফরজ আবদুর রহমান বিন আহমদ (৭৩৬-৭৯৫হি.) **জামিউল উলুম ওয়াল হিকম ফি শরহে হামসিনা হাদীসা মিন জাওয়া মিউল কলাম**, বৈরুত, লেবনান, দারুল মারুফ, ১৪০৮হি.
২৫. ইবনে সা'আদ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (১৬৮-২৩০হি./৭৮৪-৮৪৫খ্রি.) **আত তাবকাভুল কুবরা**, বৈরুত, লেবনান, দারুল বৈরুত লিত তাবা'আতি ওয়ান নাশার, ১৩৯৮হি./১৯৭৮খ্রি.;

২৬. ইবনে আবদুল বারী : আবু উমর ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ (৩৬৪-৪৬৩হি./৯৭৯-১০৭১খ্রি.) **আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব**, বৈরুত, লেবনান, দারুল জায়ল, ১৪১২হি.;
২৭. ইবনে আবদুল বার : আবু উমর ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ (৩৬৪-৪৬৩হি./৯৭৯-১০৭১খ্রি.) **আত তামহীদ**, মাগরিব (মরক্কো), ওয়ারাত উমুমিল আওকাফ ওয়াশ শূয়ুনুল ইসলামিয়া, ১৩৮৭হি.;
২৮. ইবনে আসাকির : আবুল কাসেম আলী বিন হাসান বিন হিব্বতিল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন হোসাইন দামেশকী (৪৯৯-৫৭১হি./১১০৫-১১৭৬খ্রি.) **তারিখু দামেশক আল কাবির**, (তারিখে ইবনে আসাকীর) বৈরুত, লেবনান, দারুল ইয়াহইয়্যাত তুরাসিন আরবীয়া, ১৪২১হি./২০০১খ্রি.;
২৯. ইবনে আসাকির : আবুল কাসেম আলী বিন হাসান বিন হিব্বতিল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন হোসাইন দামেশকী (৪৯৯-৫৭১হি./১১০৫-১১৭৬খ্রি.) **তাহযীব তারিখে দামেশক আল কাবির**, বৈরুত, লেবনান, দারুল মায়সর, ১৩৯৯হি./১৯৭৯খ্রি.;
৩০. ইবনে কার্নী : আবদুল বাকী (২৬৫-৩৫১হি.) **মু'জামুস সাহাবা**, মদিনাতুল মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল গুরাবাহ আলু আসরিয়া, ১৪১৮হি.;
৩১. ইবনে কুদামা : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন আহমদ আল মুকাদসী (মৃ. ৬২০হি.) **আল মুগনি ফি ফিকহিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আশ শায়বানী**, বৈরুত, লেবনান, দারুল ফিকর, ১৪০৫হি.;
৩২. ইবনে কায়সারানী : আবুল ফদল মুহাম্মদ বিন তাহের বিন আলী বিন আহমদ মুকাদসী (৪৪৮-৫০৭হি./১০৫৬-১১১৩খ্রি.) **তাক্বিরাতুল হুফায**, রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুল সামী'ঈ, ১৪১৫হি.;
৩৩. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি./ ১৩০১-১৩৭৩ খ্রি.) : **আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া**, বৈরুত, লেবনান, দারুল ফিকর, ১৪১৯ হি./১৯৯৮খ্রি.;
৩৪. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি./ ১৩০১-১৩৭৩ খ্রি.) : **তুহফাতুল তালিব বি সা'রিফাত মুখতাসার ইবনিল হাজেব**, মক্কাতুল মুক্কারামাত, সৌদি আরব, দারুল হেরা, ১৪০৬হি.;
৩৫. ইবনে কাসীর : আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে ওমর (৭০১-৭৭৪ হি./ ১৩০১-১৩৭৩ খ্রি.) : **তাক্বীরু কুরআনিল 'আযীম**, বৈরুত, লেবনান, দারুল মা'রিফা, ১৪০০ হি./১৯৮০খ্রি.;
৩৬. ইবনে মাজাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ কাযবিনী (২০৯-২৭৩হি./৮২৪-৮৮৭খ্রি.) **আস সুন্নান**, বৈরুত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৪১৯হি./১৯৯৮খ্রি.;
৩৭. ইবনে মুবারক : আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ বিন ওয়াযিদ মরুযী (১১৮-১৮১হি./৭৩৬-৭৯৮খ্রি.) **কিতুব যুহদ**, বৈরুত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৪১৯হি./১৯৯৮খ্রি.;
৩৮. ইবনুল মুলকিন : উমর বিন আলী বিন আল মুলকিনুল আনসারি, (৭২৩-৮০৪হি.) **হুলাসাভুল বাদরুল মুনীর ফি তাখরিজি কিতাবিশ শরহিল কবীর লির রাফি'**, রিয়াদ, সৌদি আরব মকতাবাতুল রাশিদ, ১৪১০হি.

৩৯. ইবনে মুনাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াহু ইয়া (৩১০-৩৯৫হি./৯২২-১০০৫খ্রি.) আল ঈমান, বৈরুত, লেবনান, মুআসাসাতুর রিসালা, ১৪০৬ হি.;
৪০. ইবনে হিশাম : আবু মুহাম্মদ আবদুল মালেক হিমইয়ারী, (মৃ.২১৩হি./৮২৮খ্রি.) আস সিরাতুন নববীয়াহ, বৈরুত, লেবনান দারুল হায়ল, ১৪১১হি.;
৪১. আবু দাউদ : সুলাইমান বিন আশআছ সাজিসতানী (২০২-২৭৫হি./৮১৭-৮৮৯খ্রি.) আস সুনান, বৈরুত, লেবনান, দারুল ফিকর, ১৪১৪হি./১৯৯৪খ্রি.;
৪২. আবু সা'উদ : মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ 'উমাদী (৮৯৮-৯৮২হি./১৪৯৩-১৫৭৫খ্রি.) ইরশাদুল 'আকলিস সালীম ইলা কুরআনিল করীম, (তফসীরে আবি সা'উদ) বৈরুত, লেবনান, দারুল আহয়ারুত তারাসুল আরব,
৪৩. আবু 'উলা মুবারকপুরী : মুহাম্মদ আবদুর রহমান বিন আবদুর রহীম (১২৮৩-১৩৫৩হি.) তুহফাতুল আহওয়ীয়া, বৈরুত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া;
৪৪. আবু 'আওয়ানা : ইয়াকুব ইবনে ইবরাহিম ইবনে যাইদ নিসাপুরী (২৩০-৩১৬হি./৮৪৫-৯২৮খ্রি.) আল মুসনাদ, বৈরুত, লেবনান, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৯৮খ্রি.;
৪৫. আবু নাদিম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ ইং) : হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, বৈরুত, লেবনান, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০০ হি./১৯৮০ খ্রি.;
৪৬. আবু নাদিম : আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন ইসহাক বিন মুসা বিন মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি./৯৪৮-১০৩৮ খ্রি.) : আল মুসনাদুল মুসতাহরাজ আলা সহীহিল মুসলিম, বৈরুত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৯৯৬খ্রি.;
৪৭. আবু ইয়া'লা : আহমাদ বিন আলী বিন মুসান্না বিন ইয়াহইয়া বিন ঈসা বিন হেলাল মুসলী, তামিমী (২১০-৩০৭ হি./৮২৫-৯১৯ খ্রি.) : আল-মুসনাদ, দামিশক, সিরিয়া, দারুল মামুন লিত তুরাস, ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খ্রি.;
৪৮. আবু ইয়া'লা : আহমাদ বিন আলী বিন মুসান্না বিন ইয়াহইয়া বিন ঈসা ইবনে হেলাল মুসলী, তামিমী (২১০-৩০৭ হি./৮২৫-৯১৯ খ্রি.) : আল মু'জাম, ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান, এদারাতুল 'উলুম আল আসারিয়া, ১৪০৭হি.;
৪৯. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খ্রি.) : ফাওয়ায়িলুস সাহাবা, বৈরুত, লেবনান, মুআসাসাতুর রিসালাহ;
৫০. আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খ্রি.) : আল মুসনাদ, বৈরুত, লেবনান, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮খ্রি.;
৫১. আযদী : রাবী' বিন হাবীব বিন উমর বসরী, আল জা'মেসসহী মুসনাদুল ইমাম আর রাবী' বিন হাবিব, বৈরুত, লেবনান, দারুল হিকমাত, ১৪১৫হি.;
৫২. ইসমাদিল : আবু বকর আহমদ বিন ইবরাহিম বিন ইসমাদিল ইসমাদিলী, মু'জামুশ শযুখ আবী বকর আল ইসমাদিলী, মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, মকতাবাতুল ইলম ওয়াল হিকাম, ১৪১০হি.;

৫৩. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাদিল বিন ইবরাহিম বিন মুগীরাহ (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ খ্রি.), আল আদাবুল মুফরাদ, বৈরুত, লেবনান, দারুল বশায়ির আল ইসলামীয়া, ১৪০৯হি./১৯৮৯খ্রি.;
৫৪. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাদিল বিন ইবরাহিম ইবনে মুগীরাহ (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ খ্রি.) : আত-তারিখুল কাবির, বৈরুত, লেবনান, দারুল কিতাব আল ইলমিয়া;
৫৫. বুখারী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাদিল বিন ইবরাহিম ইবনে মুগীরা (১৯৪-২৫৬ হি./৮১০-৮৭০ খ্রি.) আল-জামিউস সহীহয়ান, বৈরুত, লেবনান, দামিক, সিরিয়া, দারুল কলম, ১৪০১ হি./১৯৮১ ইং;
৫৬. বাযযার : আবু বকর আহমদ বিন ওমর বিন আবদুল খালেক বসরী (২১০-২৯২ হি./৮২৫-৯০৫ খ্রি.) আল মুসনাদ, বৈরুত, লেবনান, ১৪০৯ হি.;
৫৭. বাগভী : আবু মুহাম্মদ হোসাইন বিন মাসউদ বিন মুহাম্মদ (৪৩৬-৫১৬ হি./১০৪৪-১১২২ খ্রি.) : শরহুস সুন্নাহ, বৈরুত, লেবনান, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হি./১৯৮৩ খ্রি.;
৫৮. বায়হাকী : আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বিন আলী বিন আবদুল্লাহ বিন মুসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.) : আল এতেকাদ, বৈরুত, লেবনান, দারুল আফাক আল জাদীদ, ১৪০১হি.
৫৯. বায়হাকী : আবু বকর আহমদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.) : আস সুনানুস সুগুরা, মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুদ দার, ১৪১০হি./১৯৮৯খ্রি.;
৬০. বায়হাকী : আবু বকর আহমদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.) : আস সুনানুল কুবরা, মক্কা মুকারমা, সৌদি আরব, মাকতাবাতু দারিল বায, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি.;
৬১. বায়হাকী : আবু বকর আহমদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.) : আস সুনানুল কুবরা, মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুদ দার, ১৪১০হি./১৯৮৯খ্রি.;
৬২. বায়হাকী : আবু বকর আহমদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুসা (৩৮৪-৪৫৮ হি./৯৯৪-১০৬৬ খ্রি.) : শূ'আবুল ঈমান, বৈরুত, লেবনান, দারুল কুতুব আল আলমীয়া, ১৪১০হি./১৯৯০খ্রি.;
৬৩. তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সওরাহ বিন মুসা দিহাক সুলামী (২১০-২৭৯ হি./৮২৫-৮৯২ খ্রি.) আস সুনান, বৈরুত, লেবনান, দারুল গারব আল ইসলামী, ১৯৯৮ খ্রি.;
৬৪. হারেছ : ইবনে আবি উসামা (১৮৬-২৮২হি.) বগিয়াতুল বাহিছ 'আনযাওয়ায়িদ-এ মুসনাদেলে হারিছ, মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, মরকায় খিদমাতিস ওয়াস সিরাতিন নবুবীয়াহ, ১৪১৩হি./১৯৯২খ্রি.;
৬৫. হাকেম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ খ্রি.) : আল মুসনাদুলক আলাস সহীহয়ান, বৈরুত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৪১১/১৯৯০খ্রি.;

৬৬. হাকেম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি./৯৩৩-১০১৪ খ্রি.) : আল মুসতাদরকু আলাস সহীহায়ন, মক্কা, সৌদি আরব, দারুল বাস লিন নশর ওয়াত তাওফি';
৬৭. হুসামুদ্দীন হিন্দী : আলা উদ্দীন আলী মুত্তাকী (মৃ.৯৭৫হি.), কানযুল 'উম্মাল, বৈরুত, লেবনান, মুয়াসসাযাতুর রিসালা, ১৩৯৯/১৯৭৯;
৬৮. হোসাইনী : ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ (১০৫৪-১১২০হি.) আল বায়ান ওয়াত তা'রিফ, বৈরুত, লেবনান, দারুল কিতাব আল আরবীয়া, ১৪০১হি.;
৬৯. হাকেম তিরমিযী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাসান বিন বশীর, নাওয়াদিরুল উসুল ফি আহাদিসির রসূল, বৈরুত, লেবনান, দারুল জায়েল, ১৯৯২খ্রি.;
৭০. হালবী : আলী বিন বুরহান উদ্দীন (১৪০৪হি.) আস সিরাতুল হালবীয়া, বৈরুত, লেবনান, দারুল মা'রাফা, ১৪০০হি.;
৭১. হুমায়দী : আবু বকর আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (২১৯ হি./৮৩৪ ইং), আল-মুসনাদ : বৈরুত, লেবনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, কায়রো, মিসর, মাকতাবাতুল মুতানাব্বি;
৭২. খতীবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ বিন আলী বিন সাবেত বিন আহমাদ বিন মাহদী বিন সাবেত (৩৯২-৪৬৩ হি./১০০২-১০৭১ খ্রি.), তারিখে বাগদাদ, বৈরুত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া;
৭৩. খতীবে বাগদাদী : আবু বিন আহমাদ বিন আলী বিন সাবেত বিন আহমাদ বিন মাহদী বিন সাবেত (৩৯২-৪৬৩ হি./১০০২-১০৭১ খ্রি.) : আল কিফায়াহু ফী ইলমির রিওয়াইয়াহু, মদীনা, সৌদি আরব, আল মাকতাবাতুল আলমিয়া;
৭৪. খতীবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ বিন আলী বিন সাবেত বিন আহমাদ বিন মাহদী বিন সাবেত (৩৯২-৪৬৩ হি./১০০২-১০৭১ খ্রি.), মাওদাহ আওহাম আল জাম'উ ওয়াত তাফরিক, বৈরুত, লেবনান, দারুল মা'রাফা, ১৪০৭খ্রি.;
৭৫. খিলাল : আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হারুন বিন ইয়াযিদ খিলাল, আবু বকর, (৩৩৪-৩১১হি.) আস সুন্নাত, রিয়াদ, সৌদি আরব ১৪১০হি.;
৭৬. দারেমী : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান (১৮১-২৫৫হি./৭৯৭-৮৬৯ খ্রি.), আস-সুনান, বৈরুত, লেবনান, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি.;
৭৭. দারে কুতনী : আবুল হাসান আলী বিন ওমর বিন আহমদ বিন মাহদী বিন মাসউদ বিন নু'মান (৩০৬-৩৮৫ হি./৯১৮-৯৯৫ খ্রি.) : আস সুনান, বৈরুত, লেবনান, দারুল মা'রাফা, ১৩৮৬ হি./১৯৬৬ খ্রি.;
৭৮. দায়লমী : আবু সুজা' শীরওয়াই বিন শহরদার বিন শীরওয়াই বিন ফানাখসরু হামদানী, (৪৪৫-৫০৯হি./১০৫৩-১১১৫খ্রি.), আল ফিরাদাউস বিমা'সুরিল খিতাব, বৈরুত, লেবনান, দারুল কিতাব আল ইলমিয়া, ১৯৮২খ্রি.;
৭৯. যাহাবী : শাসসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আহমাদ আয যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.), মিয়ানুল 'ইতিদাল ফি নুকদির রিজাল, বৈরুত, লেবনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া;
৮০. যাহাবী : শাসসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আহমাদ আয যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.) : সিয়াকু 'আলামিন নুবালা, বৈরুত, লেবনান, মুয়াসসাযাতুর রিসালা, ১৪১৩ হি.;
৮১. যাহাবী : শাসসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আহমাদ আয যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হি.) : তাযকেরাতুল হুফায;

৮২. রুইয়ানী : আবু বকর মুহাম্মদ বিন হারুন (৩০৭ হি.), আল মুসনাদ, কায়রো, মিসর, মুয়াসসাযাতুর কুরতুবা, ১৪১৬ হি.;
৮৩. যাই'লী : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ হানাফী, (মৃ.৭৬২হি.) নাসবুর রাইয়া লি আহাদিসিল হিদায়া, মিসর, দারুল হাদীস, ১৩৫৭হি.;
৮৪. সা'ঈদ বিন মনসুর : আবু উসমান আল খারাসানী, (মৃ.২২৮হি.), আস সুনান, রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুল 'ওসায়মী, ১৪১৪হি.;
৮৫. সুযুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান বিন আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫খ্রি.) : আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন, মাতবাহ আমীর, মনশুরাতুল রিয়াদুল বিদার;
৮৬. সুযুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান বিন আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫খ্রি.), তারিখুল খুলাফা, বাগদাদ, ইরাক, মকতাবাতুশ শারক আল জাদিদ;
৮৭. সুযুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান বিন আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন উসমান (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫খ্রি.), আল জামিউস সগীর ফি আহাদিসিল রশীরিন নাযীর, বৈরুত, লেবনান, দারুল কিতাব আল ইলমিয়া;
৮৮. সুযুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান বিন আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন উসমান (৮৪৯-৯১১হি./১৪৪৫-১৫০৫খ্রি.), আদ দুররুল মনসুর ফি তাফসিরিল মা'সুর, বৈরুত, লেবনান, দারুল মা'রাফা;
৮৯. সুযুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান বিন আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন উসমান (৮৪৯-৯১১হি./১৪৪৫-১৫০৫খ্রি.), লুবাবুন নুকূল ফি আসবাবিন নুযুল, কায়রো, মিসর, মাতবাহ মুত্তাফা আলবাবিল হালবিয়া, ১৩৫৪হি./১৯৩৫খ্রি.;
৯০. সুযুতী : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান বিন আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর বিন উসমান (৮৪৯-৯১১হি./১৪৪৫-১৫০৫খ্রি.), শরহ সুনানি ইবনে মাজাহ, করাচী, পাকিস্তান, ক্বাদীমি কুতুবখানা;
৯১. শাশী : আবু সাঈদ হাযছম বিন কুলায়ব বিন শুরায়হ (মৃ.৩৩৫হি./৯৪৬খ্রি.), আল মুসনাদ, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকম, ১৪১০খ্রি.;
৯২. শাফি'ঈ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস বিন আব্বাস বিন উসমান বিন শাফি'ঈ কুরাশী, (১৫০-২০৪হি./৭৬৭-৮১৯খ্রি.) আল মুসনাদ, বৈরুত, লেবনান, দারুল কিতাব আল ইলমিয়া;
৯৩. শাফি'ঈ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস বিন আব্বাস বিন উসমান বিন শাফি'ঈ কুরাশী, (১৫০-২০৪হি./৭৬৭-৮১৯খ্রি.) আস সুনানুল মা'সুরা, বৈরুত, লেবনান, দারুল মা'রাফা, ১৪০৬;
৯৪. শাওকানী : মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ (১১৭৩-১২৫০হি./১৭৬০-১৮৩৪খ্রি.) নাযলুল আওতার শরহ মুনতাকাল আখবার, বৈরুত, লেবনান, দারুল ফিকর, ১৪০২হি./১৯৮২খ্রি.;
৯৫. শায়বানী : মুহাম্মদ বিন হাসান (১৩২-১৮৯হি.) আল মুতা', কারাসি, পাকিস্তান, মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা;

৯৬. শায়বানী : আবু বকর আহমদ বিন আমর বিন দাহহাক বিন মাখলাদ (২০৬-২৪৭হি./৮২২-৯০০খ্রি.) আল আহাদ ওয়াল মাসানী, রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুল রায়া, ১৪১১হি./১৯৯১খ্রি.;
৯৭. সাযদাবী : মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন জমী, আবুল হোসাইন, (৩০৫-৪০২) মা'ওজামুস শুয়েহু, বৈরুত, লেবনান, মুয়াস্সাসাতুল রিসালা, ১৪০৫ হি.;
৯৮. তাহেরুল কাদেরী : ড. মুহাম্মদ তাহের আল-কাদেরী, ইরফানুল কুরআন, লাহোর, পাকিস্তান, মিনহাযুল কুরআন পাবলিকেশন্স;
৯৯. তাবরানী : সুলাইমান বিন আহমদ (২৬০-৩৬০হি./৮৭৩-৯৭১খ্রি.) মুসনাদুস শামিয়ীন, বৈরুত, লেবনান, মুয়াস্সাসাতুল রিসালা, ১৪০৫হি./১৯৮৪খ্রি.;
১০০. তাবরানী : সুলাইমান বিন আহমদ (২৬০-৩৬০হি./৮৭৩-৯৭১খ্রি.) আল মু'জামুল আওসত, রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৪০৫হি./১৯৮৪খ্রি.;
১০১. তাবরানী : সুলাইমান বিন আহমদ (২৬০-৩৬০হি./৮৭৩-৯৭১খ্রি.) আল মু'জামুস সগীর, বৈরুত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৪০৩হি./১৯৮৩খ্রি.;
১০২. তাবরানী : সুলাইমান বিন আহমদ (২৬০-৩৬০হি./৮৭৩-৯৭১খ্রি.) আল মু'জামুল কবীর, মুসল, ইরাক, মাতবাতুয যাহরা আল হাদীসা;
১০৩. তাবরানী : সুলাইমান বিন আহমদ (২৬০-৩৬০হি./৮৭৩-৯৭১খ্রি.) আল মু'জামুল কবীর, কায়রো, মিসর, মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া;
১০৪. তাবরানী : আবু জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ খ্রি.) : তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, বৈরুত, লেবনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৭ হি.;
১০৫. তাবরানী : আবু আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ, (৬৯৪হি.) যাখায়িরুল 'উক্বা ফী মানকিব যিল কুরবা, দারুল কুতুব আল আসরিয়াহ;
১০৬. তাবরানী : আবু আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ, (৬৯৪হি.) আর রিয়াদুন নাদরাহ, বৈরুত, লেবনান, দারুল গরিব আল ইসলামিয়া, ১৯৯৬খি.;
১০৭. তাহাবী : আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন সালমা বিন আবদুল মালিক বিন সালমা (২২৯-৩২১ হি./৮৫৩-৯৩৩খ্রি.), শরহ মা'আনিল আসার, বৈরুত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৩৯৯হি.;
১০৮. তাহাবী : আবু জাফর আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন সালমা বিন আবদুল মালিক বিন সালমা (২২৯-৩২১ হি./৮৫৩-৯৩৩খ্রি.), মুশকিলুল আসার, বৈরুত, লেবনান, দারুল সদর;
১০৯. তায়ালসী : আবু দাউদ সুলায়মান বিন দাউদ জারুদ (১৩৩-২০৪ হি./৭৫১-৮১৯ ইং), আল মুসনাদ, বৈরুত, লেবনান, দারুল মা'রাফা;
১১০. আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বলী (২১৩-২৯০হি.) আস সুন্নান, দাম্মাম, দারুল ইবনু কায়্যাম, ১৪০৬হি.;
১১১. আবদ বিন হুমাইদ : আবু মুহাম্মদ ইবনে নসর আল-কাসী (২৪৯ হি./৮৬৩খ্রি.), আল মুসনাদ, কায়রো, মিসর, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খ্রি.;
১১২. 'আবদুর রায্যাক : আবু বকর বিন হুমাম বিন নাফে' সান'আনী (১২৬-২১১ হি./৭৪৪-৮২৬ ইং) : আল মুসান্নাফ, বৈরুত, লেবনান, আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.;

১১৩. 'আজলুনী : আবুল ফিদা ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ বিন আবদুলহাদী বিন আবু গাণি জারাহী (১০৮৭-১১৬২হি./১৬৭৬-১৭৪৯খ্রি.) কাসফুল খাফা ওয়া মাযিল আলবাস, বৈরুত, লেবনান, মুয়াস্সাসাতুল রিসালা, ১৯০৫খ্রি.;
১১৪. আযীমাবাদী : আবু তায়্যিব মুহাম্মদ সামসুল হক, আওনুল মা'বুদ শরহ সুন্নানি আবি দাউদ, বৈরুত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৪১৫হি.;
১১৫. কুরতুবী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া উমুবী (২৮৪-৩৮০ হি./৮৯৭-৯৯০খ্রি.) : আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন, বৈরুত, লেবনান, দারুল ইয়াহইয়া আত-তুরাসিল আরাবি;
১১৬. কাযত্বীনী : আবদুল করীম বিন মুহাম্মদ আর-রাফী'ঈ, আত্ তাডত্বীনু ফী আখবারী ক্বযত্বীনু, বৈরুত, লেবনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৮৭ খ্রি.;
১১৭. কদ্বায়ী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন সালমাহ ইবনে জা'ফর (মৃ. ৪৫৪হি.) : মুসনাদুশ শিহাব, বৈরুত, লেবনান, মুয়াস্সাসাতুল রিসালাহ, ১৪০৭ হি.;
১১৮. কিনানী : আহমদ বিন আবী বকর বিন ইসমাঈল (৭৬২-৮৪০ হি.) : মিসবাহুয যুজাজা ফী যাওয়ানিদ ইবনে মাজাহ, বৈরুত, লেবনান, দারুল আরাবিয়া, ১৪০৩ হি.;
১১৯. লালকাযী : আবুল কাসেম হিবাতুল্লাহ বিন হাসান বিন মনসুর (৪১৮ হি.) : শরহ উসুল ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি ওয়া ইজমায়িস সাহাবা, রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুল তায়্যিবাহ, ১৪০২ হি.;
১২০. মালিক : ইবনে আনাস বিন মালিক বিন আবী 'আমর বিন হারেছ আসবাহী (৯৩-১৭৯ হি./ ৭১২-৭৯৫খ্রি.) : আল মুয়াত্তা, বৈরুত, লেবনান, দারুল ইয়াহইয়া আত তুরাসুল আরবিয়া, ১৪০৬ হি./১৯৮৫ খি.;
১২১. মারফী : মুহাম্মদ বিন নসর বিন আল হাজ্জাজ, আবু আবদুল্লাহ, (২০২-২৯৪হি.) আস সুন্নাহ, বৈরুত, লেবনান, মুয়াস্সাসাতুল কিতাবিছ ছাক্বাফিয়াহ, ১৪০৮;
১২২. মা'আমের বিন রাশিদ আল আযদী (১৫২হি.) আল জামি', বৈরুত, লেবনান, আল মাক্তাব আল ইসলামিয়া, ১৪০৩হি.;
১২৩. না'ঈম বিন হাম্মাদ : (মৃ.২৮৮হি.) আল ফিতন, কায়রো, মিসর; বৈরুত, লেবনান: মুয়াস্সাসাতুল কিতাবিছ ছাক্বাফিয়াহ, ১৪০৮;
১২৪. মিয়যী : আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন যাকি আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বিন আবদুল মালেক বিন ইউসুফ বিন আলী (৬৫৪-৭৪২হি./১২৫২-১৩৪১খ্রি.) তাহযিবুল কামাল, বৈরুত, লেবনান, মুয়াস্সাসাতুল রিসালা, ১৪০০হি./১৯৮০খ্রি.;
১২৫. মুসলিম : ইবনুল হাজ্জাজ কুমায়রী (২০৬-২৬১হি./৮২১-১৭৫খ্রি.) আস সহীহ, বৈরুত, লেবনান, দারুল ইয়াহইয়া আত তুরাস আল আরবী;
১২৬. মুকাদ্দসী : মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহেদ হাম্বলী(মৃ.৬৪৩হি.) আল আহাদিসুল মুখতার, মক্কা মুকাররমা, সৌদি আরব, মাকতাবাতুল নাহদাহ আল হাদীসিয়া, ১৪১০হি./১৯৯০খ্রি.;
১২৭. মুকাদ্দসী : মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহেদ হাম্বলী(মৃ.৬৪৩হি.) আল আহাদিসুল মুখতার, ফাযায়িলু বাইতিল মুকাদ্দিস, শাম, দারুল ফিকর, ১৪০৫হি.;

১২৮. মুকরিয় : আবু 'আমর উসমান বিন সা'ঈদ দানী (৩৭১-৪৪৪হি.) আস সুনানুল ওয়া রিদাহ্ ফিল ফিতন, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১৪১২হি.;
১২৯. মুনাবী : আবদুর রউফ বিন তাজুল আরেফিন বিন আলী বিন যায়নুল আবেদীন (৯৫২-১০৩০হি./১৫৪৫-১৬২১খ্রি.), ফয়যুল কাদির শরহ্ জামেয়িস সগীর, মিসর, মাকতাবা তিজারিয়া কুবরা, ১৩৫৬হি.;
১৩০. মানযারী : আবু মুহাম্মদ আবদুল আযিম বিন আবদুল কাবী বিন আবদুল্লাহ বিন সালমাহ বিন সা'দ (৫৮১-৬৫৬হি./১১৮৫-১২৫৮খ্রি.) আত তারগীব ওয়াত তারহীব, বৈরুত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৪১৭হি.;
১৩১. নাসায়ী : আহমদ বিন শূ'আয়ব (২১৫-৩০৩ হি./ ৮৩০-৯১৫ খ্রি.), আস সুনান, বৈরুত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৪১৬হি./১৯৯৫খ্রি.;
১৩২. নাসায়ী : আহমদ বিন শূ'আয়ব (২১৫-৩০৩ হি./ ৮৩০-৯১৫ খ্রি.), আস সুনানুল কুবরা, বৈরুত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৪১১হি./১৯৯১খ্রি.;
১৩৩. নাসায়ী : আহমদ বিন শূ'আয়ব (২১৫-৩০৩ হি./ ৮৩০-৯১৫ খ্রি.), ফাদায়েলুস সাহাবাত, বৈরুত, লেবনান, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৪০৫হি.;
১৩৪. নববী : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শরফ বিন জমআ' বিন হিয়াম (৬৩১-৬৭৭হি./১২৩৩-১২৭৮খ্রি.), শরহ্ সহীহিল মুসলিম, করাচি, পাকিস্তান, কাদিমী কুতুবখানা, ১৩৭৫হি./১৯৫৬খ্রি.;
১৩৫. নববী : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শরফ বিন জমআ' বিন হেযাম (৬৩১-৬৭৭হি./১২৩৩-১২৭৮খ্রি.), তাহযিবুল আসম ওয়াল লুগাত, বৈরুত, লেবনান, দারুল ফিকর;
১৩৬. হিনাদ : হিনাদ বিন সার কুফী (১৫২-২৪৩হি.) আয্ যুহদ, কুয়েত, দারুল খোলাফা লিল কিতাব আল ইসলামিয়া, ১৪০৬হি.;
১৩৭. হায়সামী : নুরুদ্দিন আবুল হাসান নুরুদ্দিন আলী বিন আবু বকর বিন সুলায়মান (৭৩৫-৮০৭হি./ ১৩৩৫-১৪০৫খ্রি.) মাজমাউয যাওয়াদ, কায়রো, মিসর, দারুল রায়য়ান লিত তুরাহ + বৈরুত, লেবনান, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি.;
১৩৮. হায়সামী : নুরুদ্দিন আবুল হাসান নুরুদ্দিন আলী বিন আবু বকর ইবনে সুলায়মান (৭৩৫-৮০৭ হি./ ১৩৩৫-১৪০৫খ্রি.) মাওয়ারিদুয জামআন ইলা যাওয়াদে ইবনে হিব্বান, বৈরুত, লেবনান, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া;